প্রথম প্রকাশ
অগ্রহায়ণ, ১৩৭৮
ডিসেম্বর, ১৯৭১

প্রকাশক ঃ
ফজলে রাব্বি
পরিচালক
প্রকাশন-মুদ্রণ-বিক্রয় বিভাগ
বাংলা একাডেমী, ঢাকা-২

মুদ্রণে ঃ
বাংলা একাডেমীর মুদ্রণ শাখা

সোমেন্দ্রনাথ বসু
ও
সুচেতা বন্দ্যোপাধ্যায়
স্ম র ণে

'নদীতটসম কেবলি বৃথাই প্রবাহ আঁকড়ি রাখিবারে চাই,
একে একে বুকে আঘাত করিয়া ঢেউগুলি কোথা যায়॥'

সূচি

ক্ষিতিমোহন সেন ও অর্ধশতাব্দীর শান্তিনিকেতন

কথারম্ভ

পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেনের মৃত্যুর তারিখ ছিল ১৯৬০ সালের ১২ মার্চ। পরের দিন বাংলা এবং ইংরেজি সব সংবাদপত্রে প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হল সেই শোকসংবাদ, প্রকাশিত হল তাঁর ছবি, তাঁর জীবন-পরিচয়। লেখা হল : 'প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষাধারায় যে কয়জন বরেণ্য মনীষী জ্ঞানৈশ্বর্যে বাংলাকে সমৃদ্ধ ও মনীষায় উজ্জ্বল করে তুলেছিলেন ক্ষিতিমোহন তাঁদের অন্যতম।'[১] মাত্র কয়েক বছর আগেই প্রয়াণ ঘটেছিল আচার্য যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি ও আচার্য যদুনাথ সরকারের। সে কথা স্মরণ করে বলা হল : 'বাংলা আজ দরিদ্র। তার উপর ক্ষিতিমোহনের তিরোধানে বলতে ইচ্ছা হয় একে একে নিবিছে দেউটি।' বাংলার আরও অন্তত দুটি বরণীয় জ্ঞানদীপও তখন নিভে গেছে—আচার্য হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও মহামহোপাধ্যায় বিধুশেখর শাস্ত্রীর তিরোভাবে। সাহিত্যিক-অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী শান্তিনিকেতনের পুরোনো ছাত্র। আচার্য ক্ষিতিমোহনের পরলোকগমনে নিজের অনুভবের কথা বলতে গিয়ে তাঁর লেখনী-মুখে অনিবার্যভাবেই এসে পড়ল এই দুটি অসামান্য মানুষেরও নাম। তারপর তিনি লিখলেন : 'বাংলা দেশের দুর্ভাগ্য এই যে, যে আলোটি নিভে যায়, তার জায়গায় আর নতুন আলো জ্বলে না। আচার্য ক্ষিতিমোহনের শূন্যতাও পূর্ণ হবে না, আর যতই দিন যাবে সেই শূন্যতার অপরিমেয়তা বোধগম্য হতে থাকবে। লোকে সেই অতলস্পর্শ শূন্যতার ধারে দাঁড়িয়ে বুঝতে পারবে কত বড় একটা ইন্দ্রপতন ঘটে গিয়েছে।'[২] হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিধুশেখর শাস্ত্রী, ক্ষিতিমোহন সেনের মতো কয়েকজন মানুষের হাতে প্রজ্বলিত দীপের আলোয় শান্তিনিকেতন-বিশ্বভারতী কী ভাস্বরতা পেয়েছিল তার স্পষ্ট ধারণা তাঁদের ছিল, যাঁরা জানতেন এঁদের ত্যাগ ও সাধনার মূল্য। সেই ষাটের দশকের গোড়ায় দাঁড়িয়ে অনেকেই সংশয় বোধ করেছিলেন যে, এমন বিরল সাধনার পথ ধরে সারাজীবন চলবার মতন মানুষ আর আসবেন কি না। তাঁরা সেদিন প্রমথনাথের মন্তব্যে অতিরঞ্জনের পরিবর্তে এক মর্মান্তিক সত্যের উচ্চারণ শুনেছিলেন, এমন অনুমান করতে দ্বিধা নেই।

সুপণ্ডিত সাহিত্যিক সৈয়দ মুজতবা আলীও প্রমথনাথ বিশীর মতো পণ্ডিত বিধুশেখর ও পণ্ডিত ক্ষিতিমোহনের ছাত্র। তিনি একটি প্রবন্ধে বলেছেন : '...ভারতীয় সংস্কৃতি, ভারতীয় সভ্যতা—ধর্ম দর্শন কাব্য অলঙ্কার এ নিয়ে তিনি [রবীন্দ্রনাথ] সবচেয়ে বেশী আলোচনা করেছেন দুটি পণ্ডিতের সঙ্গে : স্বর্গত বিধুশেখর শাস্ত্রী ও ক্ষিতিমোহন সেন। এই বিশ্বভারতীর নির্মাণে রবীন্দ্রনাথের প্রধান উৎসাহদাতা ও সচিব ছিলেন বিধুশেখর ও ক্ষিতিমোহন (সংগীতে দিনেন্দ্রনাথ, চিত্রে নন্দলাল)।' এই প্রবন্ধেই পাই : 'আজ বিশ্বভারতী কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থদানের উপর নির্ভর করে, কিন্তু তার মূল্য যতই হোক না কেন,

বিধুশেখর ক্ষিতিমোহন যে মূলধন তাঁদের গুরুদেবের পদপ্রান্তে রেখেছিলেন তার উপর নির্ভর করে চিন্ময় মৃন্ময় ধ্যানে এবং কর্মকাণ্ডে—অদ্যকার ব্রহ্মচর্যাশ্রম-বিশ্বভারতী। ...এঁদের কাছে বিশ্বভারতী চিরঋণী।'[৩]

আচার্য ক্ষিতিমোহনের মৃত্যুতে সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা শোকপ্রকাশ করেছিলেন। তাঁদের কারও মনে হয়েছিল ভারতসংস্কৃতির ইতিহাসে তাঁর নাম অমর হয়ে থাকবে, কেউ ভেবেছিলেন এই মৃত্যুতে বাংলা তথা ভারতের অপূরণীয় ক্ষতি হল, কেউ কেউ ব্যক্তিগত ক্ষতির কথাও বলেছিলেন, তেমনই আবার তাঁর কাছে বিশ্বভারতীর অপরিশোধ্য ঋণের কথাটাও অনেকেই সবচেয়ে স্মরণযোগ্য মনে করেছিলেন। শিল্পাচার্য নন্দলাল বসুর মনে হয়েছিল তিনি একজন পরম আত্মীয় ও বন্ধুকে হারিয়েছেন ক্ষিতিবাবুর মৃত্যুতে। ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীও তাঁর ব্যক্তিগত ক্ষতির কথা বলেছিলেন, বলেছিলেন ক্ষিতিমোহনের কাছে বিশ্বভারতীর মানুষের ঋণের কথা : 'তাঁহার নিকট আমাদের ঋণের পরিমাণ অপরিসীম। শান্তিনিকেতনবাসীরা নানাদিকে নানাক্ষেত্রে তাঁহার নিকট হইতে প্রেরণা পাইয়াছেন। আশ্রমের মন্দিরে আচার্যের আসনে বসিয়া তিনি বছরের পর বছর যে-সকল মন্ত্রোচ্চারণ করিয়াছেন, উপদেশ দিয়াছেন তাহা কোনোদিন ভুলিবার নহে। ... পাণ্ডিত্যের সঙ্গে তিনি সরসতার সংমিশ্রণ করিয়াছিলেন, তাঁহার অপূর্ব কথকতাও ভুলিবার নহে। তাঁহার উদাত্ত গম্ভীর কণ্ঠে বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ এবং কথকতা এখনও কানে বাজিতেছে।' আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় স্মরণ করেছিলেন ক্ষিতিমোহনের সঙ্গে তাঁর সুদীর্ঘ কালের সম্পর্কের কথা। বলেছিলেন : 'তাঁহার স্নেহ ও উপদেশ আমার জীবনের পাথেয় ছিল। বহু বিষয়ে তাঁহার পাণ্ডিত্য ও প্রতিভা আমাকে আকৃষ্ট করিয়াছে।' আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর শোক-বিবৃতিতে আশ্রমিক-জীবনে ক্ষিতিমোহনের ভূমিকার উপরই বেশি জোর পড়ল— 'তাঁর উপস্থিতি আশ্রমবাসীদের প্রেরণা দিত, মনে বল দিত, শান্তিনিকেতনের আশ্রমিক জীবনে তিনি অন্যতম প্রধান অবলম্বন ছিলেন।'[৪]

মৃত্যু-উত্তর এমন সব শ্রদ্ধা-সম্মানের অর্ঘ্য নিবেদন সত্ত্বেও এ কথা ভুলে যাচ্ছি না যে চোখের সামনে ধরে-থাকা নিজেরই হাতের মুঠোটা দূরবর্তী পাহাড়ের বিরাটত্বকে আড়াল করে রাখে—সেও জীবনেরই ধর্ম। ক্ষিতিমোহন বেঁচে থাকতে এমন মানুষ অলভ্য ছিলেন না যাঁরা শুধু তাঁর প্রাত্যহিক ছোটোখাটো দোষ-ত্রুটিগুলি বড়ো করে দেখেছেন, তাঁকে দেখেননি। তবুও সুদীর্ঘকাল ধরে শান্তিনিকেতন-বিশ্বভারতীর অবিসংবাদিত কুলস্থবির ক্ষিতিমোহন। সরকারি পদমর্যাদার ছাপ-মারা নয় সে পরিচয়। অর্ধ-শতাব্দীকাল শান্তিনিকেতনে বাস করে, শান্তিনিকেতন-বিশ্বভারতীর মহাব্রতে তাঁর মানসসম্পদ উৎসর্গ করে জীবিতকালেই তিনি সেখান থেকে এই শ্রদ্ধা ও সম্মান আপন অধিকারে অর্জন করেছিলেন।

তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত পরে লেখা এক প্রবন্ধে সৈয়দ মুজতবা আলী বলেছিলেন : 'বস্তুত এ রকম বহুমুখী প্রতিভাবান ব্যক্তি সব দেশেই বিরল। কেউ তাঁকে জানেন সংস্কৃত শাস্ত্রের পণ্ডিতরূপে, কেউ মধ্যযুগীয় সন্তদের প্রচারকরূপে, কেউ রবীন্দ্রপ্রতিভার সম্যক রসজ্ঞ ও টীকাকাররূপে, কেউ চৈনিক-ভারতীয় বৌদ্ধধর্মের লুপ্ত গৌরব উদ্ধারার্থী গবেষকরূপে, কেউ বাউল-ফকিরের গূঢ়-রহস্যাবৃত তত্ত্বজ্ঞানের উন্মোচকরূপে, কেউ

শব্দতত্ত্বের অপার বারিধি অতিক্রমণরত সন্তরণকারীরূপে, কেউ সুখ-দুঃখের বৈদিককার্যে পুরোহিতরূপে, কেউ এই আশ্রমের অনুষ্ঠানাদিকে প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যানুযায়ী রূপ দিবার জন্য উপযুক্ত মন্ত্র আহরণে রত ঋষিরূপে,—আমরা তাঁকে চিনেছি গুরু রূপে।' বিচিত্র ভূমিকায় দেখা এই গুরুর কিঞ্চিৎ বিস্তৃততর পরিচয় দিতে গিয়ে শিষ্যের মনে হয়েছে তাঁর সম্পূর্ণ পরিচয় দেওয়া তাঁর শক্তির বাইরে। প্রবন্ধের প্রথমেই তিনি নিজের বেদনাটুকু প্রকাশ করেছিলেন : 'আমরা যারা বাল্য বয়স থেকে ক্ষিতিমোহন সেনের স্নেহচ্ছায়ায় বড় হয়েছি এবং আশ্রমবাসী সকলেই যারা সেদিনও পর্যন্ত এখানকার সর্বজনপূজ্য আচার্যশ্রেষ্ঠরূপে [তাঁকে] পেয়ে সংকটের সর্বশ্রেষ্ঠ কাণ্ডারী ও আনন্দের সর্বশ্রেষ্ঠ অধিকারী জেনে মনে মনে গভীর পরিতৃপ্তি অনুভব করতাম, আজ তাদের শোক সবচেয়ে বেশী।'[৫]

ক্ষিতিমোহনের আর এক ছাত্র মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরীও প্রমথনাথ ও মুজতবা আলীর মতোই ব্যথিত হৃদয়ে সেই সময়ে লিখেছিলেন : 'জানি মানুষের জীবন নশ্বর, মৃত্যু অনিবার্য। কিন্তু কোনো কোনো মানুষের জীবন এতই মূল্যবান যে তাঁদের ক্ষতি যেন কিছুতেই মন মেনে নিতে চায় না। তাঁদের মৃত্যুতে যেন বিরাট এক শূন্যতার গহ্বর সৃষ্টি হয়—যে গহ্বর কোনোদিনই পূরণ হবার নয়। আচার্য ক্ষিতিমোহন তেমনি একজন।'[৬]

রবীন্দ্র-বিশেষজ্ঞ ও বিশ্বভারতীর প্রাক্তন শিক্ষক নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আর-একভাবে বলেছেন ক্ষিতিমোহনের কথা। তিনিও ছাত্র, ছেলেবেলা থেকেই শান্তিনিকেতনে পড়াশোনা করেছেন। তাঁর কথায় :

> তাঁকে বড়ই কাছের মানুষ করে পেয়েছিলাম শৈশবকাল থেকে. এবং সেই কারণেই বোধ হয় তাঁকে তাঁর দৈনন্দিন ছোটোখাটো দোষ-ত্রুটির ঊর্ধ্বে তাঁর চারিত্রিক অনাবিলতায় সেদিন সমগ্রভাবে গ্রহণ করতে পারিনি। তাঁর জীবনযাপনার কোনো কোনো ক্ষেত্রে সংগতির চেয়ে অসংগতিই অনেকসময় চোখে পড়েছে। আজ মনের গভীরে নিঃসংশয়ে উপলব্ধি করি, —তাঁর চরিত্রটি ছিল পথিক চরিত্র, নিষ্প্রাণ জড়বাদী স্থিতিশীলতা ছিল না তাঁর ধর্মে, তাঁর মানসতায়।[৭]

নিজের দৃষ্টি-সংকীর্ণতার বাধা অকপটে স্বীকার করে নির্মলচন্দ্র 'চরৈবেতি' মন্ত্রটির প্রসঙ্গ টেনে এনেছেন তাঁর লেখায়, যে মন্ত্র ক্ষিতিমোহনের অন্যতম প্রিয় মন্ত্র। যাঁরা তাঁকে প্রকৃতই জানতেন, তাঁর পরিচয় দিতে গিয়ে এ মন্ত্র তাঁদের স্মরণে আসা খুব স্বাভাবিক।

মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরীর কথা একটু আগেই বলছিলাম। তাঁর মুখে শুনি : 'সেকালে জন্মগ্রহণ করলে তিনি হতেন রাজর্ষি কেননা তাঁর মধ্যে সমুদয় সাত্ত্বিক এবং রাজসিক গুণের পরম বিকাশ ঘটেছিল।' এই লেখকের মতে যদিও ক্ষিতিমোহনের অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও মনীষার কথা সুবিদিত, তবু সেই তাঁর একমাত্র বা প্রধান পরিচয় নয়, তাঁর প্রধান পরিচয় তাঁর ব্যক্তিত্বে। 'সেই ব্যক্তিত্বের সংজ্ঞা দুর্জ্ঞেয়। এককথায়, এমনকি অনেক কথায়ও তাঁকে বোঝানো মুস্কিল।'[৮]

এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে ক্ষিতিমোহন সেন রবীন্দ্রনাথের এক অসামান্য আবিষ্কার। কী প্রত্যাশায় যে সনির্বন্ধে তাঁকে নিয়ে এসে ১৯০৮ সালে শান্তিনিকেতনে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তার ইতিবৃত্তটুকু হারিয়ে যায়নি। আর অন্যদিকে, প্রত্যক্ষ পরিচয়ের আগে থেকেই যাঁকে বহু সম্মানে হৃদয়াসনে বসিয়েছিলেন, সেই রবীন্দ্রনাথের প্রতি

ক্ষিতিমোহনের শ্রদ্ধাভক্তি-ভালোবাসার কোনো সীমা নেই। শিষ্যের আনুগত্য নিয়ে গুরুর মতো মেনেছেন তাঁকে। একবার তরুণ সহকর্মী অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ দত্তকে বলেছিলেন : 'দেখ, আমরা ছিলাম মাটির তাল, গুরুদেব আমাদের হাতে ধ'রে গড়ে পিটে তৈরি করে নিয়েছেন।'[৯] এ কথা মানতে পারেননি হীরেন্দ্রনাথ, তাঁর মনে হয়েছিল :

> ক্ষিতিমোহনবাবু মাটির তাল নন, সোনার তাল। রবীন্দ্র-প্রতিভার বহ্নিস্পর্শে সে স্বর্ণাভা উজ্জ্বলতর হয়েছে; ...। ক্ষিতিমোহনের প্রতিভা তিনিই আবিষ্কার করেছেন এবং প্রতিভাকে উদ্দীপিত করবার জন্য যে উৎসাহ ও প্রেরণা আবশ্যক তাও তিনি জুগিয়েছেন। তাহলেও বলব ক্ষিতিমোহনবাবু শুধু পাণ্ডিত্য নয় অন্যান্য যে-সব অনন্যসাধারণ গুণের অধিকারী ছিলেন তাতে তাঁর প্রতিভার স্ফূরণ যে-কোনো স্থানে যে-কোনো অবস্থাতেই হতে পারত।

ক্ষিতিমোহনকে যাঁরা যথার্থ বুঝেছেন তাঁরা এ নিয়ে কেউ তর্ক তুলবেন বলে মনে হয় না। কিন্তু কী ছিল বিধাতার মনে, তাঁর জীবনসাধনার মুখ্য আসনখানি শান্তিনিকেতনেই পাতা হল, আর কোথাও নয়। আর কিছু যেন হতেই পারত না। ক্ষিতিমোহনের ভাগ্যনিয়ন্তা তাঁর জীবনতরীটি এনে শান্তিনিকেতনের ঘাটেই ভিড়ালেন, সেই অবধি তিনি শান্তিনিকেতনের, শান্তিনিকেতন তাঁর।

> ক্ষিতিমোহনবাবু যে খালি পায়ে হাতে বই-খাতাপত্রের থলিটি ঝুলিয়ে পঞ্চাশ বৎসরকাল শান্তিনিকেতনের রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়েছেন তাঁর সেই মূর্তিটি শান্তিনিকেতন ল্যান্ডস্কেপের একটি অচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছিল। পথ চলতে চলতে যাকে দেখেছেন তারই সঙ্গে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে দুটো কথা বলেছেন। স্নেহমিশ্রিত হাস্য-পরিহাসে অনেকখানি মাধুর্য বিকীর্ণ হত।[১০]

প্রত্যক্ষদর্শীর কলমে মানুষটির পরিণত বয়সের এই যে ছবি আঁকা হয়েছে[১১] এ তো কেবল দীর্ঘ চাকুরিজীবনের অভ্যাসে গড়ে-ওঠা গতানুগতিকতার ছবি নয়, যে মূলধন নিয়ে তিনি শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন, প্রতিদিন তাঁর আচার-আচরণে যে স্বভাবধর্ম প্রকাশ পেত, যেখানে তাঁর চরিত্রের ভর—এ ছবিতে সে সবেরই পরিচয় আছে। শান্তিনিকেতনের সেই প্রথম যুগে তপোবনের মতো নিরন্তর জ্ঞানচর্চা ও বিদ্যাদানের লক্ষ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত অনাড়ম্বর আনন্দময় এক মহান জীবনধারা বিকাশের অঙ্গীকার রূপ নিয়েছিল রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মচর্যাশ্রমের পরিকল্পনায়। পঞ্চাশ বছর ধরে সেই অঙ্গীকার যিনি জীবনে পালন করে এলেন, দ্রুতহাতের কয়েকটিমাত্র রেখার টানে আঁকা এই-সব ছবিতে তারই উজ্জ্বল প্রকাশ স্বভাবতই মনকে টানে।

কিন্তু ছবি যখন দেখি, কেবল ছবিই তো দেখি না, একটি পশ্চাদপটের প্রেক্ষিতে তা দেখি। ঠিকমতো প্রেক্ষণী না পেলে ছবির রূপ ফোটে না। জীবন সম্পর্কেও সেই কথা। ক্ষিতিমোহনের এই যে ছবির বর্ণনা উল্লেখ করেছি এইমাত্র, তার মূল্য বুঝতে গেলে এবং তিনি যে কোথা থেকে কীভাবে এসে কেমন করে শান্তিনিকেতনের সঙ্গে এমন ওতপ্রোতভাবে মিলে গেলেন তার ইতিহাস অনুধাবন করতে গেলে তাঁর সম্পূর্ণ জীবন-ক্যানভাসের পটভূমিতেই স্থাপন করতে হবে তাঁর এই ছবি। তার জন্য পিছিয়ে যেতে হবে অনেক দূর, শুরু করতে হবে ক্ষিতিমোহনের জন্ম ও গড়ে-ওঠার দিনগুলি থেকে।

পূর্বপরিচয় : প্রাক্‌শান্তিনিকেতন পর্ব

ঠাকুরদা ও পিতামাতা

ক্ষিতিমোহনের জন্মের তারিখ ২ ডিসেম্বর ১৮৮০, বাংলা ১৬ অগ্রহায়ণ ১২৮৭। পূর্ববঙ্গের বৈদ্যপ্রধান সমৃদ্ধ গ্রাম সোনারঙ্গা, ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের অন্তর্গত। সংস্কৃত চর্চার বিশেষ ঐতিহ্য ছিল এই গ্রামের। এই গ্রামের নাম-করা এক অধ্যাপক-বংশে জন্মেছিলেন ক্ষিতিমোহন। তাঁদের পরিবারের নিষ্ঠাবান ও আচারপরায়ণ বলে খ্যাতি ছিল, তার চেয়ে বেশি খ্যাতি ছিল পাণ্ডিত্যের, তবে তাঁদের অর্থের প্রাচুর্য ছিল না।[১]

কিন্তু ক্ষিতিমোহন তো তাঁর নিজের বাল্যপরিচয় দিতে গিয়ে পূর্ববঙ্গের আদিনিবাসের কথা যত না বলেন তার চেয়ে অনেক বেশি বলেন 'আমরা কাশীর মানুষ, অর্থাৎ বাঙালী।'[২] কেন তাঁরা প্রবাসে চলে গেলেন তার উত্তর আছে তাঁর ঊর্ধ্বতন দুই পূর্বপুরুষের জীবনের সিদ্ধান্তে। তাঁর পিতামহ কবিরাজ রামমণি শিরোমণি বহুশাস্ত্রবিদ ছিলেন। পাণ্ডিত্য ও সত্যনিষ্ঠার জন্য সকলেই শ্রদ্ধা করতেন তাঁকে. গ্রামের সকলের কাছেই 'মেজকর্তা' বলে পরিচিত ছিলেন তিনি। একটু মেজাজি মানুষ, কোনো অন্যায় সহ্য করতে পারতেন না। তাঁর কোষ্ঠীতে বাহাত্তর বছর বয়সে মৃত্যুযোগ ছিল. তাই সেই বছরের শুরুতে কাশীবাস করবেন বলে স্বগ্রাম ও অধ্যাপনা ছেড়ে নদীপথে কাশীযাত্রা করলেন। মজার কথা হল, এর পরেও তিনি পঁচিশ বছর জীবিত ছিলেন এবং কাশীতেই অধ্যাপনা করতেন।[৩] তাঁর রিষ্টি-বছরের শেষে স্বামীর পায়ের ধুলো মাথায় ঠেকিয়ে সজ্ঞানে কাশীপ্রাপ্তি ঘটল তাঁর স্ত্রীর, স্বামীকে তিনি যেন নিজের আয়ু দিয়ে গেলেন।[৪]

১৮৯৩ সালে ভাদ্র মাসের শুক্লা ত্রয়োদশীতে সাতানব্বই বছর বয়সে পিতামহের মৃত্যুর দিনটি ক্ষিতিমোহনের বেশ মনে ছিল। তার আগে প্রতিপদ থেকে তিনি প্রতিদিন ছাত্রদের মুখে এক এক অধ্যায় ভাগবত শুনছিলেন, দ্বাদশীর দিন ভাগবত পড়া শেষ হল। পরের দিন এসে পৌঁছোল শেষের ডাক। শেষকৃত্যের জন্য ছাত্র ও গুণগ্রাহীরা মিলে তাঁকে মণিকর্ণিকার ঘাটে নিয়ে গেলেন।[৫]

রামমণি শিরোমণির পুত্র ভুবনমোহন সেন ক্ষিতিমোহনের পিতা। ক্ষিতিমোহন লিখেছেন : 'আমার পিতা ভুবনমোহন ছিলেন চিকিৎসক। পিতামহ যখন দেশের বাস উঠাইয়া দিয়া মৃত্যুর প্রতীক্ষায় কাশীতে আসিলেন, তখন আমার পিতা তাঁহার সহিত একত্রে থাকিবার জন্য কাশীতে আসিয়া বাস করেন।'[৬] ভুবনমোহনের চার পুত্র ও এক কন্যা—অবনীমোহন, ধরণীমোহন, ক্ষিতিমোহন, মেদিনীমোহন ও প্রমোদিনী। ক্ষিতিমোহন

পিতামহ সম্পর্কে যথেষ্ট সরব, কিন্তু পিতা সম্পর্কে তিনি প্রায় নীরবই বলা চলে। জানা যাচ্ছে ভুবনমোহন বরাবরই কাশীতে থাকতেন এবং দীর্ঘকাল বেঁচেছিলেন। ১৯২৩ সালে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কাশীতে যান ক্ষিতিমোহন, তখন যে তিনি পিতার সঙ্গে দেখা করেছিলেন তার উল্লেখ আছে তাঁর দিনলিপিতে।[৭] ১৯২৪ সালের গোড়ার দিকে কাশীতে পিতাকে লেখা ক্ষিতিমোহনের একটি চিঠি দেখেছি, তার থেকে অনুমান করি ১৯২৪-২৫ সালের আগে তাঁর মৃত্যু হয়নি। পিতা সম্পর্কে ক্ষিতিমোহনের একটু মন্তব্য আছে স্ত্রীকে লেখা তাঁর সেই সময়কার চিঠিতেও। ১৯৫২ সালে শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সংঘের সংবর্ধনার উত্তরে ক্ষিতিমোহন যে ভাষণ দেন, তাতে বলেছিলেন শান্তিনিকেতনে যোগ দেওয়ার আহ্বান যখন পেলেন প্রথম, কী বাধায় তিনি দ্বিধান্বিত হয়েছিলেন সাড়া দিতে। সেই প্রসঙ্গেও একটুখানি উল্লেখ আছে তাঁর পিতার।

ক্ষিতিমোহনের কনিষ্ঠা কন্যা অমিতা সেনের কাছে শুনেছি :

> বাবা কোনোদিন তাঁর বাবার কথা বলতেন না, মা বলতেন। খুব প্রশংসা করতেন। বাবা কিন্তু মায়ের কথা যেমন বলতেন বাবার কথা বলতেন না। মার কাছে শুনেছি আমার যে দিদি আড়াই বছর বয়সে মারা যায়, 'ফেণী'—তার অসুখের চিকিৎসা করেছিলেন ঠাকুরদা। সেইখানেই সে মারা যায়। ঠাকুরদা একাই কাশীতে থাকতেন। চিঠিপত্রে যোগাযোগ থাকত। বাবা কোথাও গেলে ফিরে এসে পৌঁছ-সংবাদ দিতেন। বাবা কর্তব্য যা সব করেছেন। ঠাকুরদা বেঁচেছিলেন দীর্ঘকাল—রাঙাদির বিয়ে হয়ে গেছে, রেবা হয়েছে—রেবা ছোটো, সেই সময় কাশীতে তাঁর মৃত্যু হয়। বাবা শ্রাদ্ধ করেছেন, মস্তকমুণ্ডন করেছেন। যা বিধি সব পালন করেছেন।[৮]

ক্ষিতিমোহনের মা দয়াময়ী দেবী। আগেই বলেছি ক্ষিতিমোহনের পিতৃবংশ ছিলেন রক্ষণশীল। কিন্তু তাঁর দাদামশায় বিচারক ছিলেন এবং মামারা উচ্চশিক্ষার জন্য বিলাত গিয়েছিলেন। সেজন্য গ্রামের সমাজে তাঁরা একঘরে হয়েছিলেন। আত্মীয়তার কারণে ক্ষিতিমোহনের মাও সপরিবারে এই উৎপীড়নের শিকার হন। একই গ্রামে দুই পরিবারের বাস ছিল। ক্ষিতিমোহনের বিবাহের পর নববধূ কিরণবালাও এসে সেই ধোপা-নাপিত বন্ধের কারণে যে-সব সমস্যা দেখা দিত তার মুখোমুখি হয়েছিলেন। গ্রামের মুরুব্বিদের পরামর্শে শেষপর্যন্ত পরে দয়াময়ীর ভাইরা প্রায়শ্চিত্ত করে জাতে ওঠেন, কিন্তু দয়াময়ী কোনোদিন এই অসংগত সামাজিকবিধান মেনে প্রায়শ্চিত্ত করতে রাজি হননি। ফলে সামাজিক ক্রিয়াকর্ম বন্ধ ছিল, ভাইদের প্রায়শ্চিত্তের আগে তাঁর পিতৃগৃহে যাওয়ার পথটুকু বন্ধ হয়ে যায়নি।[৯]

এই সংস্কারমুক্ত অনমনীয় স্বভাবের মানুষটি বিরল চরিত্রের অধিকারিণী ছিলেন। একটা মজার ঘটনা বলি। বাবা-মায়ের একটা গল্প করতে ক্ষিতিমোহন খুব ভালোবাসতেন। শুনলে পাঠক বুঝবেন তাঁর কৌতুকরসে সরস মনটির যে দেশজোড়া খ্যাতি, তার উত্তরাধিকার কেমন করে তাঁর উপর বর্তেছিল। দয়াময়ী দেবীর চেহারা খুব সুন্দর ছিল। কাশীতে একদিন তিনি গঙ্গাস্নান করে ফিরছেন, স্বামী-স্ত্রী দুজনেই আছেন, ফেরার পথে দয়াময়ী একটু এগিয়ে গিয়ে পথ চলেছেন, ভুবনমোহন একটু পিছিয়ে আছেন। এমন সময় জনকতক

পান্ডা এসে পথ আটকাল। বোধ করি চেহারা দেখে সত্যি রানিমা মনে করেছে। বললে—এ রানিমা ভুখা আছি, খেতে দাও মা! অর্থাৎ দাবি হল ভরপেট খাওয়ার টাকা দিতে হবে। স্বাভাবিকভাবেই পিছনে ভুবনমোহনের দিকে ইঙ্গিত করলেন দয়াময়ী, অর্থাৎ পয়সা চাইতে হলে ওঁর কাছে যাও। পান্ডারা পিছিয়ে গিয়ে ভুবনমোহনকে ধরতেই তিনি সামনের দিকে ইঙ্গিত করলেন, আরে আমার কাছে কী! সামনে রানিমা যাচ্ছেন তাঁর কাছে চাও, আমি তো ওঁর গোমস্তা। কথায় কৌতুক কি শ্লেষ যাই থাক, দয়াময়ীর কানে পৌঁছোল ঠিকই। আর সেই লোভীর দল—যাদের ভোলানোর জন্যে বলা, তারাও ঠিকই ভুলল। পান্ডারা আবার দয়াময়ীর কাছে এসে দাবি পেশ করলে। দয়াময়ী আর পিছনে তাকালেন না, মুখ তুলে পান্ডাদের দিকে চেয়ে বললেন, তোরা তো আচ্ছা বোকা। তহবিল কি আমি সঙ্গে করে নিয়ে ঘুরছি। তহবিল তো গোমস্তার কাছে। সত্যি তো! পান্ডার দল এবার চটে উঠে ভুবনমোহনকে ঘিরে ধরল। তবে রে! রানিমা হুকুম দিয়েছেন, তুই কেন দিবি না! তোর টাকা! দে শিগগির! দয়াময়ী দেবী নির্বিকার, নিজের মনে আপন গন্তব্যে চলেছেন।[১০]

শোনা যায় ছেলেদের শিক্ষা শেষ হলে কাশী থেকে তিনি সোনারঙ্গে শ্বশুরের ভিটায় ফিরে আসেন। ক্ষিতিমোহনের মনের উপর মায়ের গভীর প্রভাব পড়েছিল। সারা পরিবারের মধ্যেই দয়াময়ী দেবী সম্পর্কে একটি প্রগাঢ় সম্ভ্রমবোধ ছিল। মায়ের কথা বলতে খুব ভালোবাসতেন ক্ষিতিমোহন। শান্তিনিকেতনের কাজে যোগ দিতে তিনিই উৎসাহ দিয়েছিলেন পুত্রকে। ক্ষিতিমোহন লিখেছেন শান্তিনিকেতনের কাজে যোগ দেওয়ার ব্যাপারে 'বাধা দিচ্ছেন সবাই। একমাত্র ভরসা দিলেন আমার মা।' যে বেতনের প্রতিশ্রুতি ছিল বিদ্যালয়ের টাকার অভাবে তা পেতেন না, নিয়মিত বেতন পাওয়াই দুরূহ ছিল। তার উপরে আশ্রমে এসে যখন দেখলেন সবার ত্যাগে ও ভালোবাসায় কীভাবে চলছে বিদ্যালয়, মায়ের পরামর্শে তিনিও সেই পথই বেছে নিলেন। সংসার-খরচে টানাটানি পড়তই। 'আমার মা-ই নানাভাবে অর্থগত এই অভাবটা পরিপূরণ করে সংসার চালিয়ে দিতেন। আমার মা কখনও গুরুদেবকে দেখেননি, দূর থেকে লেখা পড়েই তাঁর প্রতি অসীম শ্রদ্ধা ছিল।' ২৮ নভেম্বর ১৯১৩ তাঁদের গ্রামের বাড়িতে তাঁর দেহান্ত হয়।[১১]

শুনেছি দয়াময়ী দেবীর মৃত্যুর পরে শান্তিনিকেতনে মন্দির হয়েছিল। ক্ষিতিমোহনের মাতৃবিয়োগে রবীন্দ্রনাথ মন্দিরে কিছু বলেছিলেন, 'লুকিয়ে আস আঁধার রাতে তুমি আমার বন্ধু' গানটা গাওয়া হয়েছিল। অ্যান্ডরুজ তাঁর নিজের মায়ের মৃত্যুর পরে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ক্ষিতিমোহনকে একটা চিঠি লিখেছিলেন, দয়াময়ী দেবীর মৃত্যুতে শান্তিনিকেতনে এই মন্দিরপ্রসঙ্গ তা থেকে সমর্থিত হয়। একটি জীবনের প্রতিদিনের ভালোমন্দ লাগা, তার চাওয়াপাওয়া, সুখ-দুঃখ তো বহু দূরের কথা, তার গভীরতম আনন্দ বা সুতীব্র ব্যথারই বা কতটুকু উত্তরকালের বোধে ধরা দেয়? দেয়ই না বলা চলে। কিন্তু সেদিন অ্যান্ডরুজ তাঁর নিজের ব্যথিত হৃদয় দিয়ে ক্ষিতিমোহনের মাকে হারানোর বেদনাটুকু আর-একবার নতুন করে যে অনুভব করেছিলেন, তার ভিতর দিয়ে আমরাও যেন অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁর

মাতৃবিচ্ছেদাতুর মনকে স্পর্শ করতে পারি। বিশেষ করে এই কারণে এ চিঠির কিছুটা তুলে দিতে চাই। অ্যান্ডরুজ লিখেছিলেন :

> প্রিয় ক্ষিতিমোহন, শান্তিনিকেতনে কদিন আগে তোমার শোকে সমবেদনা জানাতে গিয়ে আমি ভাবিনি তোমার কাছ থেকে ঠিক সেই সমবেদনা আমাকেও ফিরে চাইতে হবে একই শোকের কারণে। আমার একান্ত প্রিয় মা কদিন হল চলে গেছেন। ...
>
> তবু প্রিয় ক্ষিতিমোহন, কীভাবে আমার সবচেয়ে বড় সহায়, আমার শান্তি ফিরে পেলাম আজ আমি তোমায় তা বলছি। কল্পনায় আমি আশ্রমে ফিরে গেলাম, সেই সেদিনের সন্ধ্যার শান্ত মন্দিরে, গুরুদেব প্রার্থনারত আমরা নীরবে বসে, অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে; আমি তাঁর কথা বুঝতে না পারলেও তার ভাবটি অনুভব করতে পারছিলাম। মৃত্যুর গভীর অনুভূতিপূর্ণ মন নিয়ে আমি তখন সেখান থেকে চলে এলাম। পরে রাত্রিবেলায় আমি আবার মন্দিরে ফিরে যাই, সেখানকার স্নিগ্ধ শান্তি অনুভব করি। মন্দির থেকে ফিরে এসে দেখি, উপরতলায় গুরুদেব একা। আমায় তোমার মায়ের কথা, তাঁর সুন্দর সমর্পিত জীবনের কথা বলে শোনালেন। সেই সন্ধ্যা আমার স্মৃতিতে যে গভীর দাগ কেটে রইল তা আর কোনোদিন মুছবে না।

মায়েব চিরবিচ্ছেদবেদনা ক্রমশ কীভাবে আনন্দে পরিণত হল তার বর্ণনা দিয়ে অ্যান্ডরুজ যোগ করলেন :

> প্রিয় ক্ষিতিমোহন, তোমাকে খুলে এসব বললাম, জানি এ সবই তোমার কাছ থেকে এসেছে। তোমার কাছে কিছুই অজানা নয়, তুমি বুঝতে পারবে বলেই তোমাকে বলতে চেয়েছি। তোমাকে যে কীসের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে সে আমি তখনকার থেকে এখন হাজার গুণে বেশি বুঝতে পারছি। তোমার শোক অনুভব করতে পারছি। সেই দিনটির শান্তি হারিয়ে যায়নি, আমি তোমাকে লিখতে বসে, তোমার কথা ভেবে সেই শান্তি ফিরে পাচ্ছি এ আমার স্থির বিশ্বাস। আমার মা নতুন জগতে গেছেন, তাঁর জন্য তুমি প্রার্থনা কোরো, আমি যেমন তোমার মায়ের জন্য করেছিলাম।[১২]

ছেলেবেলার দিনগুলি

এ-সব অবশ্য অনেকদিন পরের কথা। আপাতত ফিরে যাওয়া যাক অনেক পিছনের সেই দিনগুলিতে, যে-দিনগুলির কথা-প্রসঙ্গে ক্ষিতিমোহন তাঁর ছোটোবেলাকার স্মৃতিবিজড়িত কাশীর কথা বলেন, বলেন 'কাশী আমার জন্মভূমি, শিক্ষাভূমি. গুরুস্থান। এই স্থানে আমি চিরবালক।[১৩]

ভারতসংস্কৃতির কেন্দ্রবিন্দু কাশী। ক্ষিতিমোহন বলেন, 'এ সাধনার রাজ্য, সব দেশের সমতুল্য দিয়া কাশী তৈয়ারি, জ্ঞাননগরী, তপোভূমি। বৈদিক কাশী কোথায় ছিল জানি না, তবে এ নগর নিশ্চয় বুদ্ধ, শঙ্কর, রামানুজ, রামানন্দ, তুলসী ও কবীরের। অহল্যাবাঈ রানিভবানীর এই কাশী।'[১৪] কাশীর প্রতি তাঁর প্রবল টান, তাঁর লেখায় নানা প্রসঙ্গে এসে পড়ে কাশীর কথা। বলতে গেলে অবোধ বয়স থেকে এই শহরে তাঁর বিচরণ। কাশীর গঙ্গা, তার তীরবর্তী প্রাচীন-অর্বাচীন সব ঘাট, বিশ্বনাথ-অন্নপূর্ণার মন্দির, দুর্গাবাড়ি, আরও

অজস্র সব ছোটোবড়ো দেবালয়, কত সাধকের সাধনপীঠ, কত শত ধর্মসম্প্রদায়ের মঠ— এই পরিমণ্ডলের ভিতরেই বাল্য কৈশোর অতিক্রান্ত হয়েছে তাঁর। সব এলাকাই পরিচিত, সব রাস্তাঘাট চেনা। কাশী ছেড়ে আসবার পরে আবার যখন মাঝে মাঝে সেখানে গেছেন, কারণে-অকারণে সারা শহর ঘুরে ঘুরে বেড়াতেন। প্রিয়জনরা সঙ্গে থাকলে সব অলিতে-গলিতে তাদের নিয়ে ঘুরতেন। বলতেন এ-সব গলির প্রতিটি পাথর আমার চেনা। অমিতা সেনের কাছে শুনেছি :

> কাশীতে গেলে বাবা যেন উদ্বেলিত হয়ে উঠতেন। সারা শহরে ঘুরে ঘুরে বেড়াতেন। আমি বড় হবার পর যেবার যান—আমার বয়স তখন তেরো, সঙ্গে করে নিয়ে সব দেখাতেন, মাও ছিলেন। ভিড়ের জন্য উঁচু করে তুলে ধরে বিশ্বনাথের আরতি দেখিয়েছিলেন মনে আছে। অথচ বাবা তো ধর্মতান্ত্রিকতা মানতেন না, কিন্তু যা আছে সব দেখতে হবে এই ছিল তাঁর মত। কাশীতে বিশ্বনাথের ভোরবেলার আরতি মেয়েদের দেখতে নিয়ে যেতে তাঁর আপত্তি হয়নি।[১৫]

কাশীর পরিমণ্ডলে মন তাঁর বেড়ে উঠেছিল সতেজ গাছের মতো। বড়ো হয়ে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছেন, সেখানে জীবনের সেই জ্ঞান-উন্মেষের দিনগুলিতে এমন সব মানুষের কথা শুনেছেন, এমন সব মানুষ নিজে দেখেছেন, যাঁদের মধ্যে কোনো সংকীর্ণতার বাধা ছিল না। অন্তরের অবচেতনে তারই ছাপ দৃষ্টিকে অন্ধ হতে দেয়নি, মুক্তমনে দেখতে শিখিয়েছে সবকিছুকে। হয়তো সেই জন্যই ধর্মতান্ত্রিকতার মোহও যেমন জীবনকে আচ্ছন্ন করেনি, সংস্কারমুক্ত মনের অতি শুদ্ধতার গোঁড়ামিও সে মনের সহজ চলার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি।

আর কাশীর বাল্যস্মৃতিতে তাঁর অপরূপ মমতা মাখানো। মনে ছিল নিতান্ত শৈশবে তৈলঙ্গস্বামীর কাঁধে উঠতেন, তাঁর পায়ের উপরে চেপে বসতেন। শিশুদের সঙ্গে বিনা ভাষায় একটি সহজ সখ্য গড়ে উঠত সেই মহাসাধকের। তিনি তাদের ভালোবাসতেন, মিঠাই খাওয়াতেন, তাঁর ভালোবাসার টানে শিশুরা বাঁধা পড়ত।[১৬] যে মানুষের সারা জীবন কাটবে সাধুসন্ত অন্বেষণে, তাঁদের সঙ্গ ও তাঁদের দর্শন-সাধনা-উপলব্ধির বাণীসংগ্রহের নেশায়, অবোধ বয়সে তৈলঙ্গস্বামীর সংস্পর্শের দ্বারাই বোধ করি তার সম্ভাবনার বীজ রোপিত হয়েছিল।

ছোটোবেলা থেকেই ক্ষিতিমোহন সাধুসন্ন্যাসী ও ভক্তদের প্রতি আকৃষ্ট হতেন। সেকালের কাশীর কথা মনে করে বলেছেন : 'তৈলঙ্গস্বামী, মাতাজী, বিশুদ্ধানন্দ, ভাস্করানন্দ প্রভৃতি সন্ন্যাসীর দলই বা কোথায় এক সঙ্গে এমন দেখা দিয়াছেন।'[১৭] এই মাতাজি এবং আর-এক সাধিকা মাহেশ্বরী দেবীর উল্লেখ করেছেন অন্যত্রও : 'বাল্যকালে আমরা কাশীতে বরুণাসঙ্গমে তপস্বিনী মাতাজীকে দেখিয়াছি।' আর উল্লিখিত এই দ্বিতীয় সাধিকাকে সকলে বুয়াজি বলতেন, রাধাস্বামী সম্প্রদায়ের মহারাজ সাহেব পণ্ডিত ব্রহ্মাশংকর মিশ্রের বোন তিনি। কাশীর মেয়ে বলে সবার পিসিমা ছিলেন এবং ক্ষিতিমোহনেরও ছেলেবেলা থেকে সুযোগ হয়েছিল এঁর সঙ্গে পরিচয়ের।

উত্তর ও পশ্চিম ভারতে দুর্গাপূজার উৎসবের নাম নবরাত্রি। কাশীতে প্রতি বছর এই নবরাত্রির উৎসব দেখেছেন। মনে হয় সেখানকার সব উৎসবস্মৃতির মধ্যে এই আনন্দময়

শারদোৎসবের স্মৃতি মনের মধ্যে সবচেয়ে উজ্জ্বল হয়ে ছিল চিরদিন। বালক যখন, রাত থাকতে উঠে বন্ধুদের সঙ্গো দল বেঁধে দুর্গাবাড়ি যেতেন। সেটাই যে সত্যি লক্ষ্য ছিল তা অবশ্য নয়—বাঙালিটোলার গলি থেকে বেরিয়ে খোলা আকাশের নীচে পথ চলতে চলতেই উৎসবের স্পর্শ সর্বাঙ্গো এসে লাগত, শিউলি ফুলের সুবাসে ভারী বাতাসে বুক ভরে নিশ্বাস নিতেন। পূজা-অর্চনায় মনোযোগ দেওযার বয়সও তখন নয়, সেদিকে মনও টানত না, তবে পথে কলকাতার ভূ-কৈলাসেব জমিদারদের বাগান থেকে দেবী দুর্গার জন্য শিউলি ফুল সংগ্রহে উৎসাহের অভাব ঘটত না। কোনোদিন সন্ধ্যাবেলা দুর্গাবাড়ি ছাড়িয়ে রামনগরের কাছে গঙ্গার ঘাট পর্যন্ত চলে যেতেন। তখন আকাশের মেঘ কেটে গিয়ে নতুন চন্দ্রালোকে সব দিক মধুময় হয়ে উঠেছে, সন্ধ্যার পরে ঘাটে ঘাটে নহবত বাজছে।

এই কাশীতে সাত-আট বছর বয়সে শুনতেন চণ্ডীর গান। নানা প্রসঙ্গো এই চণ্ডীর গানের কথা স্মরণ করেছেন ক্ষিতিমোহন। তাঁর 'ভারতের দেবীপীঠ' প্রবন্ধে বলেছেন :

> বাল্যকালে কাশীতে দুর্গাপূজার সময় নবরাত্রের উৎসবে শুনিয়াছিলাম—
>
> আদ্যেতে বন্দনা কবি হিঙ্গুলার ভবানী
> তারপবে বন্দনা কবি পাওযাগড়ের কালী।
>
> মনে আছে পালা-রচযিতাদের কাহাবও কাহারও নাম ছিল মুসলমান। সবগুলি ঠিক স্মরণে নাই। কাশীতে পাতালেশ্বরে জপসাগ্রামের রামানন্দ সরকারের বাড়িতে ভারত দেওয়ানজী নামে এক অতিশয় বৃদ্ধ ভদ্রলোক ওই পালা গাওয়াইতেছিলেন। পালার মধ্যে কত কত রচয়িতারই নাম ছিল সে আজ বহুদিনের কথা। তখন বছর সাত-আটেক ছিল আমার বয়স। তবু আজো সেই স্মৃতিটা মধুর রসে ভরিয়া আছে। নামগুলি মনে রাখিবার মতো বিজ্ঞতা তখন কোথায়?[১৮]

তখন সেই অপরিণতবুদ্ধি বালকের ধারণা ছিল না হিঙ্গুলার ভবানী বলতে কী বোঝায়, কোথায় বা পাওয়াগড়ের কালী। কিন্তু তেমনই আবার বঙ্গাদেশ থেকে বহুদূরে বাস করেও বঙ্গীয় ধর্ম-সংস্কৃতির অনেক কিছুর সঙ্গোই পরিচয়ের সুযোগ হয়েছিল। তাব মধ্যে কথকতা আর বাউলগানের কথাটা বিশেষ করে বলতে হয়। কারণ ক্ষিতিমোহন কথকতা আর বাউলগানের টানে সারাজীবনই বন্দী। তা বলে বাংলার ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে কিন্তু কোনোদিনই বন্দিত্ব স্বীকার করেনি তাঁর মন। নিজের জীবনে কাজে ও কথায় তিনি প্রমাণ করেছেন যে ভারত তাঁর স্বদেশ, কোনো সংকীর্ণ অর্থে তাঁকে বাঙালি বলা যাবে না। শৈশবকাল থেকেই এই ভারতবর্ষের সঙ্গো তাঁর পরিচয়ের শুরু।

মাঝে মাঝে তাঁর লেখায় কাশীর বজ্রবারাহী মন্দিরের কথা এসেছে। সে মন্দিরে শেষরাত্রে পূজা হত দেবীর, অনেক অদ্ভুত অনুষ্ঠান হত। একবার বন্ধুদের সঙ্গো তিনি তৈলঙ্গাস্বামীর আশ্রমে তান্ত্রিকমতে দুর্গাপূজা দেখতে গিয়েছিলেন।

কাশীতে বাস করে ছেলেবেলা থেকেই সমস্ত ভারতবর্ষকে যেন চোখের সামনে দেখতে পেতেন। সব প্রদেশের মানুষ আসেন এখানে তীর্থ করতে, শেষ বয়সে কাশীপ্রাপ্তির ইচ্ছায় এসে বাস করেন, আবার ভিন্ন প্রদেশ থেকে এসে যাঁরা পুরুষানুক্রমে এখানেই বাস করেন, তাঁরা কাশীর মানুষও হন আবার নিজের নিজেব দেশজ সামাজিক ধর্মীয় প্রভৃতি প্রথা এবং

আচার-আচরণও বজায় রাখেন, বিধিবিধান মেনে চলেন। তাই এক জায়গাতেই ভারতের সব ভাবের মানুষকে দেখবার সুযোগ তাঁর হয়েছিল। ভারতের অনেক ভাষার সঙ্গেও পরিচয় হয়েছিল। অনেকগুলি ভারতীয় ভাষা যে তিনি জানতেন, তার সূত্রপাতও এইখানেই।

একে তো সারা বছরই সমস্তরকম পূজা-পার্বণে মুখরিত হয়ে থাকত এই দেবস্থান। তার উপরে 'পরিক্রমার পথে আমাদিগেব কাশীতীর্থে যাত্রীসমাগম হয় বারোমাস। দেশ-বিদেশের নর-নারী তাহাদিগের ভাষা এবং ব্যবহারাদি সকলই ভিন্ন প্রকার। অষ্টপ্রহরে শহরে যেন এক উৎসবের আবহাওয়া, নগরে সকলের সাজও উৎসবের। সবই আমার মনকে গভীরভাবে আবিষ্ট করিত।'[১৯] শিশুকাল থেকেই দেখতেন প্রয়াগের মাঘ মাসের মেলা ভাঙতে-না-ভাঙতে সাধুসন্তদের শুভাগমনে কাশী একেবারে সরগরম হয়ে ওঠে। গঙ্গার প্রশস্ত তটভূমিতে অভ্যস্ত জায়গা বেছে নিয়ে যে-যার-দলের আস্তানা স্থাপন করতেন। ভোরবেলায় দশাশ্বমেধ ঘাটে বেড়াতে গিয়ে ক্ষিতিমোহন দেখতে পেতেন চারদিক যেন বদলে গেছে, হয়তো বা গভীর রাতে এই-সব সাধুসন্ন্যাসীরা এসে ধুনি জ্বালিয়েছেন। শীতের সকালেও তাঁদের সুঠাম অনাবৃত দেহ, সেই-সব তপোজ্জ্বল শরীবের গঠন দেখে তাঁর অল্পবয়সের চোখও মুগ্ধ হয়ে যেত। বেশ টের পাওয়া যেত কয়েকটা দিন এঁদের আগমনে গৃহস্থ পাড়াও মুখর হয়ে উঠেছে। আর ক্ষিতিমোহন নিজে সেই বালক-বয়সে কী এক নেশায় তাঁদের সঙ্গে ছায়ার মতন ঘুরে বেড়াতেন, আর তাঁদের বাণী শুনতেন। তাঁরা সকলেই স্নেহ করতেন তাঁকে।[২০]

ক্ষিতিমোহনের বিবরণ থেকে জানতে পারা যায় যে কত দূরপথের তীর্থযাত্রীদের অভিজ্ঞতার কথা শোনবার সুযোগ সেই কম-বয়সেই তাঁর হত। তিনি লিখেছেন :

> আমারও ছেলেবেলায় যখন পৃথিবীতে বাহির হইবার সামর্থ্য হয় নাই, তখন নানা দেশের তীর্থযাত্রীদের কাছে বসিয়া তাঁহাদের গল্পগুলি শুনিতাম। 'শুনিতাম' বলিলে ঠিক হয় না, গল্পগুলি 'গিলিতাম'। কাশীতে আমার জন্ম, সেখানে ভারতের সব প্রদেশের যাত্রীরা আসেন। সেই-সব যাত্রীদের অনেকে ভারতের বাহিরে তিব্বতে, মঙ্গোলিয়াতে, চীনে, রুশ-তুরস্ক-পারস্য-আবব-মিশর প্রভৃতি দেশেও তীর্থযাত্রায় যাইতেন। সন্ন্যাসী, যোগী, গোঁসাই প্রভৃতি সাধুরা এই-সব বিষযে অগ্রণী। যে-সব মঠে ও ধর্মশালায় তাঁহারা আসিতেন সেখানে আমার হরদম যাতায়াত ছিল। নানাদেশের নানাতীর্থের কিছু কিছু চিহ্ন তাঁহারা ধারণ বা বহনও করিতেন। ইহার দ্বারাই তাঁহারা পরস্পরের তীর্থযাত্রার প্রসার বুঝিয়া লইতে পারিতেন।[২১]

অনেকসময় মন্দির-চৌহদ্দিতে সত্যানুসন্ধানীর দল সমবেত হতেন। কিছুদিন ধরে ধর্মীয় আলোচনা, ভজন-গান ইত্যাদি চলত। একটু বড়ো হতে ক্ষিতিমোহনও সুযোগ পেলেই এই দলে একটু জায়গা করে নিতে শুরু করলেন। পরিণত বয়সে নিজের কালের কাশী সম্বন্ধে যেন মুগ্ধবিস্ময়ে বলেছেন :

> কাশীর সেই যুগ একেবারে ভারতীয় সাধনা ও পাণ্ডিত্যের মহাযুগ। বামনাচার্য, বাল শাস্ত্রী, গঙ্গাধর, দামোদর, বাপুদেব, সুধাকর, কৈলাশচন্দ্র, রাম শাস্ত্রী, শিবকুমার, রাখালদাস প্রভৃতির মতো পন্ডিত একসঙ্গে কোন্ যুগে কোন্ দেশে উদিত হইয়াছেন?[২২]

লেখাপড়া। শিক্ষকরা

এই-সব পণ্ডিতদের অনেকে ক্ষিতিমোহনের শিক্ষাগুরু। নিজের কথাপ্রসঙ্গে তাঁর মনে এই-সব অধ্যাপকদের সম্পর্কে গভীর শ্রদ্ধার বোধ উৎসারিত হয়ে ওঠে : 'তবুও আমার সৌভাগ্য আমার বিদ্যা আরম্ভ হয়েছিল সংস্কৃত নিয়ে। তখন কাশীতে যে-সব মহা মহা পণ্ডিত ছিলেন, তাঁরা কেউ গৃহী, কেউ সন্ন্যাসী, কিন্তু তাঁরা প্রত্যেকে এক-একটি দিকপাল, বৃহস্পতিতুল্য। এমন যোগাযোগ শত শত বৎসরেও ঘটে না।'[২৩] তবে সেই সঙ্গে তাঁর লেখা থেকে এও জানতে পারি যে, বাল্যে কৈশোরে বাংলাভাষা চর্চার কোনো সুযোগ তাঁদের ছিল না। তবু বাংলা অক্ষর পরিচয়টুকু হয়েছিল, না হলে প্রবাসী বাঙালি পরিবারের ছেলেরা হিন্দিই শিখত। ক্ষিতিমোহনও শিখেছিলেন, হিন্দি তাঁর মাতৃভাষারই শামিল ছিল। বহুকাল পরে শান্তিনিকেতনের ছাত্রদের উদ্দেশে তিনি বলেছিলেন :

> তোমরা ভাগ্যবান। বাংলাদেশে জন্মেছ। ছেলেবেলা থেকে গুরুদেবের নাম জান। আমার জন্ম বাংলার বাইরে। সেখানে তখন বাংলা ভাষা বা সাহিত্যের কোনো চর্চা ছিল না। বাঙালি ছেলেরা পড়তেন উর্দু হিন্দি। আমার তবু বাংলা বর্ণপরিচয় ঘটেছিল শিশুবোধক পড়ে। আর আমার পুঁজি ছিল কৃত্তিবাস, কাশীদাস, কাশীখণ্ড ও কালিকাবিলাস। সবই বটতলায় ছাপা।[২৪]

ক্ষিতিমোহনরা থাকতেন বাঙালিটোলায় পাতালেশ্বরে। গঙ্গাধর শাস্ত্রী নামে এক দক্ষিণী পণ্ডিতের চতুষ্পাঠীতে তাঁব পাঠ আরম্ভ হয়। ঊনবিংশ শতকের শেষের দিকে এ দেশের মানুষের মনে পাশ্চাত্য শিক্ষার সুফল সম্পর্কে প্রশ্ন দেখা দেয়। তাছাড়া ক্ষিতিমোহনের পরিবার মূলত রক্ষণশীলই ছিলেন। তাঁর বড়ো দুই ভাই শিক্ষার জন্য কলকাতায় গিয়ে আধুনিক প্রভাবের মধ্যে পড়ে গিয়েছিলেন, সেজন্যও ক্ষিতিমোহনকে কাশীতেই রেখে সংস্কৃত পড়ানোর সিদ্ধান্ত করেন তাঁর অভিভাবকরা,—এ কথাও যেমন তিনি বলেছেন, তেমনই আবার অন্যত্র বলেছেন, তখন দেশে শিক্ষার দুটি ধারা প্রচলিত ছিল—মক্তবে ফারসি শিক্ষা দেওয়া হত আর সংস্কৃত শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল টোলে-চতুষ্পাঠীতে। অনেক সময়ই দেখা যেত একই পরিবারে দুই ভাই দু-ধারার। তাঁদের নিজেদেরও তাই হয়েছিল। তাঁর বড়োদাদা অবনীমোহন সোনাবঙ্গেই জন্মেছিলেন। কিন্তু কাশীতেই তাঁর প্রথম শিক্ষালাভ। মক্তবে ফারসি পড়ে তিনি সেই ধারায় শিক্ষিত হয়ে ওঠেন, সংস্কৃতের প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিল না। ক্ষিতিমোহন তার উলটো—'আমি ও আমার অন্য ভাইরা ছিলাম সংস্কৃতের ভক্ত। তখনকার দিনে ফারসী ধারার সম্বন্ধে আমি ছিলাম গোবিন্দদাস।'[২৫] অবশ্য ফারসিতে যতটা অজ্ঞ নিজেকে তিনি এখানে বলেছেন, সত্যিই ততটা অজ্ঞ তিনি ছিলেন না। 'কবীর' গ্রন্থের উৎসর্গে নিজেই জানিয়েছেন যে হিন্দুস্থান ও পারস্যের সুফি ভক্তদের বাণী আস্বাদনের অধিকার তিনি অর্জন করেছিলেন তাঁর বড়োদাদার কাছে।[২৬] অকালপ্রয়াত এই অগ্রজ সম্পর্কে চিরদিন তাঁর গুরুসম মান্যতাবোধ ছিল। অন্য এক প্রসঙ্গ-সূত্রেও জানা যায় যে ক্ষিতিমোহন ছিলেন উর্দু ফারসি ভাষায় ওয়াকিবহাল। একবার শান্তিনিকেতনের ছাত্রদের নিয়ে গিয়েছিলেন মুর্শিদাবাদ বেড়াতে। সেখানে নবাব আলিবর্দি

খাঁ ও সিরাজদ্দৌলার সমাধির উপরের লেখা পড়ে তিনি তাদের চিনিয়ে দিতে পারলেন কোন্‌টা কার সমাধি। সুধীরঞ্জন দাস তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন এই ভ্রমণের বৃত্তান্ত। সেইখানেই বিবরণ দিয়েছেন দেওয়াল দিয়ে ঘেরা বেশ খানিকটা বাগানের মাঝখানে বড়ো এক গম্বুজের তলায় শ্বেতপ্রস্তরের স্তূপ দেখেছিলেন তাঁরা। লেখা পড়ে ক্ষিতিমোহন চিনিয়ে দিয়েছিলেন : 'এটি নবাব আলিবর্দী খাঁর সমাধি'। আলিবর্দি খাঁর সমাধির পাশে নেহাত সাদাসিধে একটা কবরের উপরে একখানা সাদা পাথরের ফলক—সেটি পড়ে ক্ষিতিমোহন ছাত্রদের বললেন : 'এইটি নবাব সিরাজদ্দৌলার সমাধি'। সকলে স্তব্ধ হয়ে বেশ খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন সেখানে।[২৭]

আবার পুরোনো প্রসঙ্গে ফিরি। টোলের পাঠ শেষ করে কাশীর কুইন্‌স কলেজে স্নাতক বিভাগে অধ্যয়ন করেন ক্ষিতিমোহন এবং তারপরে যথানিয়মে পড়াশোনা করে এই কলেজ থেকে স্নাতকোত্তর উপাধি লাভ করেন। তখন কুইনস কলেজ এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ছিল।

একটি উল্লেখ থেকে বোঝা যাচ্ছে, তিনি ১৮৯৯ সালে চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণিতে পড়তেন।[২৮] এখান থেকেই এম.এ. পাস করেন ১৯০২ সালে। তা হলে অনুমানে বলা চলে যে কলেজে প্রবেশ করার আগে উনবিংশ শতকের শেষ দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত বা হয়তো ১৮৯০-৯৮ সাল পর্যন্ত চতুষ্পাঠীতে তিনি পড়াশোনা করেছেন। 'শিক্ষার স্বদেশীরূপ' প্রবন্ধে ভারতের প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় শিক্ষাব্যবস্থার পরিচয় দিয়েছিলেন, কাশীর চতুষ্পাঠীর খবর পাওয়া যায় তাতে।[২৯] নিখিলবঙ্গ শিক্ষক-সম্মিলনীর ঢাকা অধিবেশনেও এ দেশের শিক্ষাব্যবস্থার সেকাল-একাল নিয়ে আরও বিস্তৃত আলোচনা করেছিলেন।[৩০] তা থেকে জানতে পারি প্রাচীন যুগের জ্ঞানদীপ্ত কাশী মধ্যযুগে যখন নিষ্প্রভ হয়ে পড়েছিল তখন রানি ভবানী ও রানি অহল্যাবাই-এর মতো দুই মহীয়সী নারীর বদান্যতা তাকে নবজীবন দিল। তাঁরা বহু অধ্যাপককে কাশীতে প্রতিষ্ঠিত করলেন, তাঁদের দানে অনেকগুলি ব্রহ্মপুরী বা ছাত্রনিবাস স্থাপিত হল। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের এবং বহির্ভারতেরও বহু ছাত্র কাশীতে পড়তে এসে সেখানে আশ্রয় পেতেন। কাশীর এক-এক অংশ এক-একটি দেবালয়ের অধীন বা তার অন্তর্গৃহ। নিয়ম ছিল, এক-একটি অন্তর্গৃহের অধ্যাপকেরা বছরের নির্দিষ্ট কোনো সময় সমবেত হয়ে নিজের নিজের অধ্যাপনার বিষয় ও সময় স্থির করে নেবেন। সেই সঙ্গে অন্য অন্তর্গৃহগুলির বড়ো বড়ো অধ্যাপকদের চতুষ্পাঠীর অধ্যাপনা-পরিকল্পনার সঙ্গেও যোগ থাকত। ফলে ছাত্ররা তাদের নিজেদের অন্তর্গৃহের অধ্যাপকদের কাছে যেমন পাঠগ্রহণ করতে পারতেন, তেমনই নিজেদের ইচ্ছা অনুযায়ী অন্য অন্তর্গৃহের অধ্যাপকদের কারও কারও কাছেও পাঠগ্রহণ করতেন। মন্দিরে মন্দিরে দণ্ড-ঘণ্টাধ্বনি হত, সময়ের নির্দেশ তা থেকেই পাওয়া যেত। কয়েক শতাব্দী ধরে দেশে জ্ঞানের প্রদীপ জ্বেলে রেখেছিল এই চতুষ্পাঠীগুলি। এসব পুরোনো দিনের কথা হলেও ক্ষিতিমোহনের নিজের ছাত্রাবস্থায় কাশীর পুরোনো কালের চতুষ্পাঠীর নিয়মকানুন, অধ্যাপনাপদ্ধতি বা পাঠক্রম যে আমূল পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল, এমন নয়। তিনি নিজে তো ১৯৩৬ সালে

লেখা এই প্রবন্ধেও এ কথা বলেন যে সেসময়েও, তার মানে সেই বিংশ শতকের ত্রিশ-চল্লিশের দশকেও কাশীতে চতুষ্পাঠীর অন্ত নেই এবং মহাজ্ঞানী পণ্ডিতের দল সেখানে ভারতের প্রাচীন জ্ঞানচর্চাকে জাগিয়ে রেখেছেন। কলকাতায় অনুষ্ঠিত শিক্ষাসপ্তাহে-পড়া সেই প্রবন্ধে ক্ষিতিমোহন বরং অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে আরও বলেছিলেন : 'তাঁহাদের অধিকাংশই আজ যে কি দারিদ্র্যের মধ্যে জীবনযাপন করেন তাহা আপনাদের ধারণারও অতীত। অথচ আমাদের অন্ধভক্তির মোটা মোটা দানে পরিপুষ্ট কাশীর পান্ডা প্রভৃতির দল। আদর্শভ্রষ্ট এই সব তীর্থগুরুরা নিজেরাও চলিয়াছে রসাতলে, সমাজকেও টানিয়া চলিয়াছে সঙ্গে সঙ্গে।'

এই চতুষ্পাঠীগুলির প্রাণবান আদর্শের পরিচয় পাওয়ার সুযোগ যে তাঁর নিজের হয়েছিল, তাঁর ছাত্রজীবনের স্মৃতির টুকরো টুকরো ছবি সে কথাই বলে। গঙ্গাধর শাস্ত্রীর টোলে তাঁরা দর্ভপাণি হয়ে বসে পাঠগ্রহণ করতেন, পাঠশেষে অধ্যাপককে 'ভূমিগত প্রণতিপূর্বক' বিদায় নিতে হত। গুরুশিষ্যের সম্বন্ধ ছিল শ্রদ্ধা ও স্নেহের। অধ্যাপকরা ছাত্রদের সন্তানের মতন দেখতেন, অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে বিদ্যা দান করতেন। কোনো কোনো অধ্যাপকের মধ্যে এই নিষ্ঠার এমন আশ্চর্য প্রকাশ দেখেছিলেন ক্ষিতিমোহন, যা কোনোদিন ভুলতে পারেননি। গঙ্গাধর শাস্ত্রী তাঁর তরুণ পুত্রের মৃত্যুতেও অধ্যাপনা বন্ধ করেননি, শুধু তাঁর ছাত্রদের সেদিন মনে হয়েছিল শাস্ত্রীমশায় যেন বড়ো ক্লান্ত, বড়ো জীর্ণ হয়ে পড়েছেন। ক্ষিতিমোহন পরে তাঁর কাছে অভিযোগ করলে তিনি বলেছিলেন, যে বিদ্যার্থীরা পাঠ নিতে এসেছেন তাঁদের সময় নষ্ট করার অধিকার তাঁর নেই—শোক একলার, সাধনা সকলের। পাঠশালায় যেমন মারধর গালাগালি তাড়না নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার ছিল, চতুষ্পাঠীতে তা কখনও হত না, সেখানকার পরিবেশে শুচিতা ছিল। অধ্যাপকরা নিজেরা সুমার্জিত ভাষা ব্যবহারের দ্বারা, আচার-আচরণে কঠোর সংযম রক্ষার দ্বারা এবং এসব বিষয়ে কোনোপ্রকার স্খলন ঘটলে আত্মানুশাসনের দ্বারা ছাত্রদের প্রত্যক্ষে-পরোক্ষে চরিত্রগঠনে সহায়তা করতেন। কেশব শাস্ত্রী প্রমুখ আরও কোনো কোনো অধ্যাপকের কাছে পাঠ নিয়েছিলেন ক্ষিতিমোহন। ছাত্ররা যাতে ইচ্ছামতো বিষয়ে বিভিন্ন অন্তর্গৃহের অধ্যাপক-সন্নিধানে পাঠ নিতে পারেন তার সুব্যবস্থা যে তখন কাশীতে ছিল তা আগেই বলেছি। প্রমথনাথ তর্কভূষণ, মহামহোপাধ্যায় বামাচরণ ভট্টাচার্য, গোপীনাথ কবিরাজ প্রমুখ স্বনামধন্য পণ্ডিত ও দার্শনিকরা তাঁর সহপাঠী ছিলেন। মহামহোপাধ্যায় বিধুশেখর শাস্ত্রীও তাঁর কাশীর বন্ধু।[৩১]

নির্ধারিত পাঠক্রমের মধ্যেই সাহিত্য ব্যাকরণ জ্যোতিষ প্রভৃতি প্রভূত অধ্যয়নের সুযোগ পেয়েছিলেন ক্ষিতিমোহন। ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন বিবিধ ভারতীয় শাস্ত্র ও দর্শনে। কাশীতে পূর্বকালে ও তৎসাময়িককালে নব্যন্যায়ে যে-সব অসামান্য বাঙালি পণ্ডিত ছিলেন, 'চিন্ময়বঙ্গ'-এ তাঁদের নাম করেছেন। বলা বাহুল্য সর্বভারতীয়স্তরে আরও বহু বিশিষ্ট পণ্ডিতের সঙ্গে তাঁদের মতো কাশীর ছাত্ররা পরিচিত ছিলেন। যে আশ্চর্য স্মৃতিশক্তির অধিকার তিনি অর্জন করেছিলেন সেও ছিল আবাল্য সনাতন ভারতীয় শিক্ষাপদ্ধতি অনুসরণের ফল।

সন্তমতে দীক্ষা

কখনও কখনও তাঁর লেখায় তাঁর মেধাবী সহপাঠীদের নাম চোখে পড়ে। সে যুগের টোলে-পড়া ছাত্ররা অনেকেই বিশেষ মেধাবী হতেন। আর স্মৃতিশক্তির উৎকর্ষ বোধ করি কমবেশি সব ছাত্রেরই হত। মেধাবী ছাত্রদের আরও বেশি হত। ভারতীয় টোলে মেধা ও স্মৃতিশক্তির চর্চা অত্যন্ত স্বাভাবিক ধারায় ছাত্রপরম্পরায় চলে এসেছে চিরদিন। ক্ষিতিমোহন এবং তাঁর সহাধ্যায়ীরা কলেজে পড়তে এসে তাঁদের স্মৃতিশক্তির জোরে অধ্যাপক ও অন্য ছাত্রদের বিস্মিত করে তুলতেন। ক্ষিতিমোহনের অভ্যাস ছিল ক্লাসে কেবল শোনা এবং বাড়ি গিয়ে কিছু লিখে রাখা। কুইন্‌স কলেজে সাহেব অধ্যক্ষ একবার ভাবতীয় দর্শন সম্বন্ধে কতকগুলি ধারাবাহিক বক্তৃতা দিলেন। কিন্তু তারপরে তাঁর মূল লেখাগুলি হারিয়ে যায়। ছাত্রদের কাছে খোঁজ করতে ক্ষিতিমোহন মুখে মুখেই তখনই সবটা বলে দিতে পেরেছিলেন। সেটা লেখা হল। পরে হারানো কপি পাওয়া যেতে মিলিয়ে দেখা গেল ক্ষিতিমোহনের মুখে-বলা থেকে প্রস্তুত লেখার সঙ্গে মূল লেখার গরমিল সামান্যই। ক্ষিতিমোহনের স্মৃতিশক্তির এসব গল্প শান্তিনিকেতনে কিংবদন্তির মতো প্রচলিত ছিল। বরাবরই তাঁর স্মৃতিশক্তির নমুনা দেখে সকলেই বিস্ময় মানতেন। ছাত্রাবস্থায় স্মৃতির এই ক্ষমতা আরও বিস্ময়কর ছিল। রবীন্দ্রনাথ নাকি বলতেন : 'নিষ্ঠুর স্মৃতি আপনার মশাই'।[৩২]

ক্ষিতিমোহন গল্প করতেন এইরকম স্মৃতিশক্তির অধিকার তাঁর সহপাঠীদের অনেকেরই ছিল। সেটা আবিষ্কার করে সেই সাহেব অধ্যক্ষ একবার স্টেটসম্যান পত্রিকার সম্পাদকীয় থেকে ক্লাসে খানিকটা পড়ে শোনালেন—পরখ করতে চান ছাত্ররা কে কতটা না দেখে আবৃত্তি করতে পারেন। দেখা গেল বলতে গেলে সকলেই একবার শুনে গড়গড় করে বলে যেতে পারেন। হয়তো কারও দু-একটা ভুল হয় মাত্র। একজন ছাত্র আবার আবৃত্তি কবতে উঠে জিজ্ঞাসা করলেন : 'আজ্ঞা করুন, গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত বলে যাব, না কি শেষ থেকে উলটোমুখী আসব।' এই ছাত্রটি হলেন রাম শাস্ত্রী, যিনি পরে খ্যাত হন 'রাম শাস্ত্রী শতাবধানী' নামে।[৩৩]

শাস্ত্রজ্ঞ, সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের মর্মজ্ঞ হিসেবে বলতে গেলে তরুণ বয়স থেকেই সমাদৃত ক্ষিতিমোহন, বৃহস্পতি-সদৃশ শিক্ষাচার্যদেব প্রতি শ্রদ্ধাপ্রকাশে সর্বদাই অকুণ্ঠিত তিনি, নিজেই বলেন তাঁর বংশানুক্রমিক পটভূমি এবং শিক্ষা সম্পূর্ণতই প্রাচ্যধারা অনুসারী বলা চলে,[৩৪] তবু কথা এই যে, নিজে তিনি পণ্ডিত হতে কোনোদিনই চাননি। তাঁর জীবনের মুখ্য অভিপ্রায়টি কী ছিল, তা বুঝতে গেলে কাশীর আর দুজন মহাপণ্ডিতের প্রসঙ্গ একটু আলোচনা করতে হবে, বাল্যকাল থেকেই যাঁদের সংস্পর্শে তিনি এসেছিলেন, যাঁদের মানসিকতা ও জীবনাচরণ সেই সময় থেকেই জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে তাঁকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। এঁদেব একজন হলেন মহামহোপাধ্যায় সুধাকর দ্বিবেদী, অন্যজন ঈশানচন্দ্র বিদ্যারত্ন। দ্বিতীয়জন তাঁর পিতামহের সতীর্থ, যদিও তাঁর চেয়েও বয়সে বড়ো। শতবর্ষজীবী এই মানুষটি পরমপণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু পাণ্ডিত্য তাঁর পরিচয় নয়। তাঁর মতন

এমন সহজ মুক্তমনা সাধক পুরুষ বড়ো-একটা দেখতে পাওয়া যায় না। না ছিল তাঁর পূজা-অর্চনার কোনো বাঁধা-নিয়ম, বিশ্বনাথধামে বাস করেও না-যেতেন তিনি বিশ্বনাথের মন্দিরে। কখনও কখনও অষ্টপ্রহর ভাবসমাধিতে মগ্ন হয়ে থাকতেন। সব মানুষকেই কাছে টেনে নিতেন, উচ্চ-নীচ ভেদ-বিচার ছিল না। আবার অন্তরজনের কাছে রহস্য করে বলতেন : 'আমারও তো ভাই বিশ্বনাথের মন্দিরে যাইতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু যাইবার উদ্যোগ করিতেই দেখি বিশ্বনাথই আমার মন্দিরে আসিয়াছেন; তাঁহাকে ছাড়িয়া আমি চলিয়া যাই কেমন করিয়া?' নিজের মনে উচ্চারণ করতেন চণ্ডীর বাণী : 'সর্বরূপময়ী দেবী, সর্বদেবীময়ং জগৎ'।[৩৫]

শিশুকাল থেকেই এঁকে ক্ষিতিমোহন পিতামহের বন্ধু হিসেবে পরমাত্মীয় বলে জানতেন। অকস্মাৎ এই মহাত্মার স্বরূপ তাঁকে নতুন করে চেনালেন মহামহোপাধ্যায় সুধাকর দ্বিবেদী।[৩৬] সুধাকর দ্বিবেদী তাঁর অধ্যাপক। বালক বয়সেও তাঁর কাছে পড়েছেন, আবার যখন কুইন্‌স কলেজে ভরতি হলেন তখন সুধাকর দ্বিবেদীও মহামহোপাধ্যায় উপাধি লাভ করেছেন এবং সেখানে অধ্যাপনা করছেন। গঙ্গাধর শাস্ত্রী প্রমুখ আরও কোনো কোনো অধ্যাপককেও ক্ষিতিমোহন, চতুষ্পাঠী থেকে কলেজে গিয়েও পেয়েছেন। সুধাকর দ্বিবেদী একদিকে এক বিরাট পণ্ডিত, বিশেষ করে গণিত ও জ্যোতিষশাস্ত্রে অসাধারণ অধিকার, উনতিরিশ বছর বয়সে তিনি সংস্কৃত কলেজে জ্যোতিষের প্রধান অধ্যাপক হন, নানা শাস্ত্রে তাঁর গভীর প্রবেশ। অন্যদিকে তিনি এক রসজ্ঞ সাধক, এক মহাজ্ঞানী। ভারতের মধ্যযুগীয় সন্তদের বাণীতে যে অত্যাশ্চর্য গভীর আধ্যাত্মিক সাধনা ও উপলব্ধির বহুমুখী প্রকাশ ঘটেছে তার সন্ধান প্রথম ক্ষিতিমোহনকে দিলেন সুধাকর। ক্ষিতিমোহন তো ছেলেবেলা থেকেই কাশীর সাধুমহাত্মাদের কণ্ঠে কবীর-দাদূর ভজন শুনে আকৃষ্ট হয়েছেন, কী কৌতূহলে তাঁদের মঠে-আখড়ায় গিয়ে উপস্থিত হয়েছেন। দেখেছেন তাঁদের মধ্যে যাঁদের সামান্য অক্ষরজ্ঞান আছে, তাঁদের সংগ্রহে ছেঁড়া টুকরো কাগজে লেখা সাধকের বাণী। এখন তাঁর ঔৎসুক্যের কথা জানতে পেরে সুধাকর দ্বিবেদী তাঁকে এই সব সন্তবাণীর নিহিতার্থ বোঝবার পথটা চিনিয়ে দিলেন। এই প্রাচীন দেশের নিরক্ষর স্তরের মধ্যে নিহিত বহুযুগের পরম্পরাবাহিত এক আশ্চর্য ঐশ্বর্যময় সাধনজগতের রহস্যদ্বার যতই একটু একটু করে খুলতে লাগল ততই উৎসুক হয়ে উঠতে লাগলেন ক্ষিতিমোহন। অল্প সময়ের মধ্যেই সন্তবাণীর গভীর নেশা পেয়ে বসল তাঁকে।[৩৭]

পরে সুধাকর দ্বিবেদী দুই সাধকের সঙ্গো পরিচয় করিয়ে দিলেন। তার একজন পূর্বপরিচিত ঈশানচন্দ্র বিদ্যারত্ন, যাঁকে নতুন আলোয় নতুনরূপে জানলেন তখন, আর একজন তাঁরই অন্তরঙ্গা এক ফকির—আবদুল রসিদ, কাশীর পানপাড়া বা পানদরিয়ার মসজিদে তিনি থাকতেন। তাঁর সাধনস্থল ছিল গঙ্গার ওপারে। সেই থেকে ক্ষিতিমোহন এঁদের দুজনেরই উপাসনায় সময় করে যোগ দিতে চেষ্টা করতেন, যদিও দু-জায়গা মহল্লার দু-প্রান্তে। এঁরা দুজনে তাঁর দীক্ষাগুরু, সন্তমতে যখন তিনি দীক্ষা নিলেন এঁরাই উভয়ে আচার্যের দায়িত্ব পালন করেন। এ কথা আগেই বলেছি, ক্ষিতিমোহনের অভিভাবকেরা

সতর্ক ছিলেন যাতে তিনি পাশ্চাত্য ভাবধারার অনুবর্তী হয়ে না পড়েন, তাই তাঁকে কাশীতেই রেখে সংস্কৃত পড়াবার ব্যবস্থা হয়। এই দীক্ষাগ্রহণ প্রসঙ্গে তাই তিনি লিখেছেন : 'আচার রক্ষার জন্য চারিদিকে কঠোর ব্যবস্থা কিন্তু তাহারই মধ্যে আমার জীবনের বিধাতা হাসিয়াছিলেন। আচারের রাজ্যে বিপদ দেখা দিল কিন্তু তাহা ইংরাজির তরফ হইতে নহে।'[৩৮] বংশের প্রচলিত ধারার বিরুদ্ধে তাঁর এই বিদ্রোহ নিতান্ত অপ্রাপ্তবয়সে, নিজেই বলেছেন চোদ্দো বছর বয়স থেকেই কবীরপন্থী তিনি, সেই বয়সেই তাঁর দীক্ষা হয়। এর জন্য পারিবারিক কোনো বিরুদ্ধতার মুখে পড়তে হয়েছিল এমন কথা কোথাও লেখেননি ক্ষিতিমোহন, কিন্তু এটা ঠিক যে তাঁর নিজের জীবনটা ভিতরে ভিতরে বদলে গেল।

> ঘটনার দুর্বিপাকে যে পথে অগ্রসর হইলাম সে পথের সন্ধান কিছুই নাই, এ সময়ে আমাদেরই দেশের নিরক্ষর স্তরের মধ্যে নিহিত ঐশ্বর্যের সন্ধান যেন পাইলাম। স্পষ্ট মনে পড়ে সে বছরের সেই পুণ্য তারিখ খৃষ্টাব্দ ১৮৯৫, দিন ২রা ফেব্রুয়ারি। সেই দিন আমি সন্তমতী সাধকের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করি। ... তাহার পর বিদ্যা ও পুঁথির সব সুসজ্জিত মন্দির ছাড়িয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া আমি দিন কাটাইয়াছি, পুঁথি তখন আমার কাছে গৌণ হইয়া গেল। অন্তরের রসধারা তখন বহিতে চলিল অন্যপথে।[৩৯]

তাঁর দীক্ষা-দিনের বাংলা তারিখ ২০ মাঘ। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ যেমন নিজের দীক্ষার দিনটিকে জীবনের একটি বিশেষ এবং পবিত্র দিন মনে করতেন, ক্ষিতিমোহনও তাই। তরুণ বয়স থেকেই তিনি ব্রাহ্মসমাজের সংস্পর্শে এসেছিলেন এবং তার দ্বারাও প্রভাবিত হয়েছিলেন। সে প্রসঙ্গ পরে আলোচনা করব।

আর-একটি কথা বলি। ১৮৯৫ সালের এই দীক্ষার সময় থেকেই ক্ষিতিমোহন দিনলিপি রাখতে শুরু করেন ধারণা করা হয়ে থাকে। তারও আগে লেখা তাঁর কোনো দিনলিপির সন্ধান পাওয়া যায়নি। চিরজীবন দিনলিপি লেখার অভ্যাস তাঁর ছিল।[৪০] এই দিনলিপি খাতায় বিদ্যারত্নমশায় এবং ফকিরসাহেব দুজনেরই কিছু কিছু উপদেশ লেখা ছিল। তাঁদের উপাসনায় যখন যোগ দিতেন, নানা বয়সের নানা মানুষের সঙ্গে দেখা হত। গঙ্গার ওপারে ফকিরসাহেবের সাধনস্থানেও গিয়ে হাজির হতেন। এ ছাড়া সপ্তাহের মধ্যে কয়েকদিন এপারে শহরের মধ্যে কোথাও নিজেরাই তাঁরা উদ্যোগী হয়ে মিলিত হতেন। সেখানে আবদুল রসিদ, বিদ্যারত্নমশায় এবং কাশীর অধ্যাপকরাও কেউ কেউ থাকতেন, তাঁরাই ডেকে আনতেন তাঁদের। কখনও কখনও অধ্যাপনার কাজে আটকে গিয়ে অধ্যাপক সুধাকর দ্বিবেদী আসতে না পারলে তাঁর সঙ্গ থেকে বঞ্চিত হতেন, ধর্মালোচনা তবুও বাদ যেত না।[৪১]

শাস্ত্রচর্চা ও অশাস্ত্রীয় ব্রাত্যধর্ম। সাধুসঙ্গের নেশা

অপুথিয়া পথের ডাকে বিদ্যাচর্চার মূল পথ থেকে যে ভ্রষ্ট হয়ে গেলেন ক্ষিতিমোহন এমন অবশ্য নয়। তবে গ্রন্থকীট হয়ে থাকা স্বভাবে ছিল না। নির্দিষ্ট পথে পড়াশোনা চলল ঠিকই, কিন্তু যাকে তিনি 'অন্যপথ' বলেছেন, ভিতরের কী এক ব্যগ্রতা সেই অন্যপথে টেনে বের

করল তাঁকে। তাঁর কথা থেকেই জানতে পারি দেবগুরু বৃহস্পতির মতো সব অধ্যাপকদের পায়ের তলায় বসে সম্ভ্রমে-শ্রদ্ধায় পাঠ নিয়েছেন, আর তাঁর মন ব্যাকুল ছিল কবীর-দাদূ প্রভৃতি সন্ত ও ভক্তদের বাণীর জন্যে। সাধক-তপস্বীদের খবর পেলেই তাঁদের সঙ্গ নিতেন। কাশীতে নানা সম্প্রদায়ের সাধুসন্ন্যাসীর আসা-যাওয়া, কাশীতীর্থ পরিক্রমায় তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষিতিমোহন ঘুরতেন। সন্তবাণী পরম সমাদরের বস্তু ছিল এই-সব সাধনপথের পথিকদের কাছে—কবীর দাদূ রজ্জাব রবিদাসের ভজন সর্বদাই গাইতেন তাঁরা। আগ্রহভরে শুনতে শুনতে ক্ষিতিমোহন ক্রমেই তাঁদের অমূল্য সৃষ্টি সম্পর্কে অবহিত হয়ে উঠতে লাগলেন, সে কথা এর আগে বলেছি। কবীরপন্থী রবিদাসি প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মঠে গিয়ে পরিচয় হল সেখানকার সাধকদের সঙ্গে। তাঁদের মুখে মুখে প্রচলিত সন্তবাণীগুলি সংগ্রহ করার নেশা সেইসময় থেকেই তাঁকে অমোঘ আকর্ষণে টানল, ক্রমশ প্রাচীন সন্তদের সাধনতত্ত্বের পরিচয় লাভ করলেন। এইখানেই তাঁর জীবনের মূল অভিপ্রায়টির শিকড় আছে। নিজেরই আত্মিক তাগিদে অল্প বয়সেই তিনি সন্তধর্মের বিশালক্ষেত্রে প্রবেশ করতে চেয়েছিলেন। সেই চেষ্টাই তাঁকে তাঁর স্বদেশের শাস্ত্রপরিপন্থী এক গভীর ও উদার ধর্মের জগতে প্রতিষ্ঠিত করে দিল—সে ধর্ম লোকধর্ম।

আর-একটু বড়ো হওয়ার পরে দলের সঙ্গে সাধুদর্শনে বেরিয়ে পড়তে লাগলেন। সেই থেকেই ছুটিতে ছুটিতে পায়ে হেঁটে উত্তর ভারতের নানা জায়গায় ঘোরার শুরু। ঘুরতে ঘুরতে অনেক গ্রামে বন্ধুও হয়ে যেত কেউ। এমন কথাও বলেছেন যে মাত্র পনেরো-ষোলো বছর বয়সে একবার এক বৃদ্ধ সাধুর সঙ্গে বেরিয়ে এক বছরেরও বেশি সময় কাশীর বাইরে ছিলেন।

> ক্ষিতিমোহনবাবু একদিকে অধ্যাপক, অপরদিকে পর্যটক। ভারতের দূর দূর অঞ্চলে ঘুরে বেড়িয়েছেন, বহু তীর্থক্ষেত্রেও গিয়েছেন—দেবদেবী দর্শনে নয়, জ্ঞাতব্য তত্ত্ব এবং তথ্যের অন্বেষণে।[৪২]

তারই সঙ্গে দেশটাকে এমন অন্তরঙ্গভাবে, এমন প্রত্যক্ষভাবে তাঁর জানা হয়েছিল যা আর অন্য কোনোভাবে হতে পারত না। রবীন্দ্রনাথের সেই কথাটাও স্মরণীয়—'আমার মতে শিক্ষার প্রণালী হচ্ছে বৈরাগির রাস্তায়'। অকিঞ্চন বেশে মুসাফিরের মতন সেই প্রথমজীবন থেকেই ক্ষিতিমোহন ভারতবর্ষের নানাদিকে ঘুরেছেন—তার দ্বারা যেমন করে তিনি তাঁর দেশের মানসসম্পদকে জেনেছিলেন, জেনেছিলেন তাঁর দেশের মানুষকে; কেবল পাণ্ডিত্য, কেবল পুথির পড়া তা তাঁকে দিতে পারত না। তার সূত্রপাতটা অবশ্য ছোটো গণ্ডির মধ্যে—কাশী এবং তার আশপাশের অঞ্চলে তখন তাঁর চলাফেরা সীমাবদ্ধ।

তাঁদের একটা ছোটোখাটো দল ছিল. তাঁরা জন চার-পাঁচ বন্ধু মিলে অসমসাহসে সাধুসন্ত খুঁজে বেড়াতেন এবং খুঁজতে গিয়ে অনেক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হত। কখনও খুব নামযশওয়ালা সাধুদর্শন করতে গিয়ে আবিষ্কার করতেন আসলে তার মধ্যে কোনো পদার্থই নেই, আবার কখনও কোনো লক্ষ্মীছাড়া বহুনিন্দিত মানুষের মধ্যে মহাপুরুষের দর্শন লাভ করতেন। সেই বয়সেই একটা কথা নিজের অভিজ্ঞতায় বুঝেছিলেন যে সাধকদের প্রকৃত

পরিচয় পেতে হলে খুব ধীরভাবে অন্তরঙ্গ হয়ে তাঁদের সঙ্গে একাত্ম হতে হয়। কাশীতে থাকতে যে-সব সাধুসঙ্গ লাভ করেছিলেন তার দু-একটি ঘটনা পরে তাঁর লেখায় স্থান পেয়েছে। জীবনটা তখন যেন সকালবেলার আলোয় যাত্রা করে বেরিয়েছে—কোনো কোনো মানুষ কোনো কোনো ঘটনা থেকে সে তার চলার পথের অমূল্য পাথেয় সংগ্রহ করে নিয়েছিল, স্মৃতিচারী এই রচনাগুলি থেকে তা বেশ বোঝা যায়। এক ব্যতিক্রমী সাধককে দেখার বিবরণ আছে তাঁর 'ভক্তকাহিনী' রচনায়। কাশীর অপর পারে রিন্দবাবা নামে এক অঘোরপন্থী কাপালিক বাস করতেন, ছোটোবেলা থেকেই এ খবর জানা ছিল। তাঁর গুহার চারদিকে নরমুণ্ড নরকঙ্কাল ছড়ানো, সামনে শ্মশান, জায়গাটাও কাশীর ব্রিজ থেকে বহু দূর—মানুষ ভয়ই পেত সেখানে যেতে তবু মনোরথসিদ্ধির আশায় দিনেরবেলায় লোকেরা অনেক সময় তাঁর গুহার সামনে খাবার মদ প্রভৃতি রেখে আসত। শুনতে পাওয়া যেত মাঝরাতে ঘণ্টাখানেকের জন্য গুহা থেকে বেরিয়ে এসে রিন্দবাবা সে-সব খাবার কিছু খেতেন, কিছু বা না খেতেন, মদের বোতল খালি হয়ে যেত। পরদিন সকালে প্রসাদার্থীরা এসে সে-সব দেখে নিজেদের শুভাশুভ নিজেরাই নির্ণয় করতেন। এ-হেন রিন্দবাবার দর্শন পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় এক রাত্রে ক্ষিতিমোহনরা দু-তিন জনে সেখানে গিয়ে অপেক্ষা করে রইলেন। মধ্যরাত্রি পার হয়ে যেতে সেই সাধু বাইরে বেরোতে যখন তাঁরা কাছে গিয়ে প্রণাম করলেন, তখন অত্যন্ত অপ্রসন্ন হয়ে গুহার ভিতরে ফিরে গেলেন তিনি। তবু হাল না ছেড়ে রাতের পর রাত সেই একইভাবে গুহার দ্বারে অপেক্ষা করতে করতে অবশেষে তিনি প্রসন্ন হলেন। আবিষ্কার করা গেল তিনি কাপালিক নন, মদ-মাংস তাঁর সেব্য নয়, মানুষ যাতে ভয় পেয়ে তাঁর কাছে না আসে, এ-সবই সেজন্য তাঁর ভান। আসলে তিনি ভারতীয় ও সুফি সাধনার মর্মজ্ঞ দক্ষিণাচারী তান্ত্রিক, মাতৃভাবের সাধনা তাঁর। এর পর থেকে ক্ষিতিমোহনরা প্রায়ই গিয়ে তাঁর কাছে হাজির হতেন। গভীর রাতে গঙ্গার ধারে বসে কথা বলতেন সেই সাধক, ক্রমশ সন্ধ্যার পরেও কথা হতে লাগল। সাধনমার্গের নানা কথা তিনি বলতেন। শেষে একদিন নবরাত্রির উৎসবের সময় অনুরোধ-উপরোধ এড়াতে আর না পেরে নিজের কথাও বললেন। তাতে জানা গেল কাঠিয়াবাড়ে জন্ম এই বহুশাস্ত্রবিদ মানুষটির। নানা তীর্থ ঘুরতে ঘুরতে বহু সাধু-মহাপুরুষের সংস্পর্শে এসে তাঁদের কৃপায় সাধনমার্গে প্রবেশ করেন। কিন্তু তাঁর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি তাঁর সাধনার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াল। মনে হতে লাগল সুফি সাহিত্য গুলিস্তাঁয় যে বাদশার ছেলে ও চাষার ছেলের আখ্যান আছে তাঁরও যেন সেই অবস্থা। বাদশা চাপা পড়ে আছেন বহুমূল্য সমাধি-মন্দিরের পাথরের তলায়, সেখানে বিধাতার আহ্বান পৌঁছোয় না, আর চাষা শুয়ে আছেন গোলাপগাছের নীচে, বিধাতার ডাক শুনলেই মাটিটুকু সরিয়ে তাঁর চরণতলে গিয়ে উপস্থিত হবেন। এই সাধক শাস্ত্রচর্চা ছাড়লেন, বিদ্যার গর্ব ছাড়লেন, কাশীর কাছে বহু সাধকের সাধনধন্য স্থানে এসে আশ্রয় নিলেন, তবু দেখলেন সব গিয়েও সাধনার খ্যাতিটুকু তাঁর বাকি রয়ে গেছে। তাই চারপাশের পরিবেশ বীভৎস করে রেখেছেন, সাধনায় সিদ্ধির জন্য প্রাণপণ করছেন। ক্ষিতিমোহনদের কাছে ধরা পড়ে গেছেন বলে এখান থেকেও চলে

যেতে মনস্থির করলেন। বিমর্ষ হয়ে সাধু বলেছিলেন—তালগাছের শেষ আড়াই হাতের মতন সাধনার এই শেষ স্তরটুকুই সবচেয়ে কঠিন। তোমরা আমার হয়ে মায়ের কাছে প্রার্থনা কোরো, তিনি আমার এই মহাভার দূর করুন। তিনি মহিষাসুরমর্দিনী—অভিমানের মতন এমন মহিষাসুর আর নেই। ক্ষিতিমোহন লিখেছেন : 'তাঁর কথা শেষ হল। মনটাও বড় বিষণ্ণ হয়ে গেল। সেদিন শারদীয়া পূজার উৎসব চলেছে। তারই মধ্যে সাধুটির প্রার্থনায় আমরাও যোগ দিলাম। মাগো অসুরমর্দিনী, আমাদের সকল অসুর তুমি দমন কর।' সূফি গল্পটা আগেও জানতেন। সাধুর মুখে তার মর্মার্থ শুনে অভিভূত হয়ে গেলেন, সেই অনুভব জীবনে কোনোদিন তাঁর মন থেকে হারিয়ে যায়নি।[৪৩]

আর-এক আশ্চর্য মানুষের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল—এক্কাওয়ালা অযোধ্যা। ১৮৯৭ সালের ঘটনা। নাগোয়ার সড়ক দিয়ে সেদিন রামনগরের ঘাটে বেড়িয়ে ফিরছিলেন তাঁরা তিন বন্ধু। তখন হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় হয়নি, পথ একেবারে নির্জন। বরং তাঁদেরই হাসি-গল্পে সে পথ মুখর হয়ে উঠেছিল। সেই গল্প শোনবার লোভে অযোধ্যা তাঁদের অনেক তোষামোদ করে বিনা ভাড়ায় তাঁর খালি এক্কায় তুলেছিলেন। সেই অবধি বন্ধুত্ব। ক্ষিতিমোহনের সঙ্গেই একটু বেশি অন্তরঙ্গতা হয়ে গেল এইজন্যে যে, অযোধ্যারও তাঁরই মতো সাধুসঙ্গ লাভের বাতিক ছিল। ক্রমে এমন হল, কলেজ যাওয়ার সময় পথ থেকে তাঁকে এক্কায় তুলে নিয়ে পৌঁছে দিতেন, বাড়িতেও আসতেন, বাড়িতে ক্রিয়াকর্ম থাকলে এসে কাজের দায়িত্ব নিতেন। সাধুদের মেলার খবর পেলে সেখানে যাওয়ার ব্যাকুলতা ছিল অযোধ্যার, সাধুসন্তের খবরও রাখতেন। সন্তমতে তাঁর দীক্ষা, তবে শৈব-শাক্ত-বৈষ্ণব সব সম্প্রদায়ের সাধকদেরই তিনি খবর রাখতেন, শ্রদ্ধার সঙ্গে যোগ দিতে পারতেন তাঁদের সঙ্গে। তবু তাঁর নিজের সাধনার জোর কতটা, সাধনার মর্ম কতটা তিনি বোঝেন, এ-সব বুঝতে ক্ষিতিমোহনের সময় লেগেছিল। আলাপ হওয়ার বছর তিনেক পরে একটা ঘটনায় অযোধ্যাকে অনেকটাই বোঝবার সুযোগ পেয়েছিলেন।

১৯০০ সাল। সেবার মাঘমেলা দেখতে ক্ষিতিমোহন এলাহাবাদ গিয়েছিলেন, সম্ভবত সেবার অর্ধকুম্ভ ছিল। প্রয়াগে গঙ্গাযমুনা-সংগমে পুণ্যার্থীর ভিড়, বিস্তীর্ণ বালির চড়ায় মাথার উপর কোনোমতে একটু আচ্ছাদন তুলে অসংখ্য মানুষ বাস করছেন প্রচণ্ড শীতের কষ্ট সহ্য করে। একদিন তারই মধ্যে আবার ভয়ংকর শিলাবৃষ্টি হয়ে গেল। মানুষের দুর্ভোগের সীমা নেই, মারাও গেল কত মানুষ। সেই দুর্যোগের মধ্যে ক্ষিতিমোহনও ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, সাহেবদের আস্তাবলে ঢুকে কোনোরকমে শিলাবৃষ্টির প্রকোপ এড়ালেন। এমন সময় এক্কাওয়ালা অযোধ্যার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, এলাহাবাদেই তাঁর আসল বাড়ি। সাধুদের আখড়া বহু, রাজসিক আয়োজন চারদিকে সাধুসেবার, তার মধ্যে দুজনে নিরাশ হয়ে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ জানতে পারলেন কয়েক ক্রোশ দূরে ভাগবতবাবা নামে এক সাত্ত্বিক সাধুর আস্তানা। অযোধ্যার সঙ্গে ক্ষিতিমোহন সেখানে চললেন। সেইদিনই তাঁর এক সাহেবি পোশাক-পরা কলেজের বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়েছিল, তিনিও সঙ্গী হলেন। শেষ ক্রোশখানেক এক্কা যেতে পারবে না, নিজের গাড়ি-ঘোড়ার ব্যবস্থা করে সেই

পথটুকু অযোধ্যা আলাদা গেলেন। আর বহু পথ হেঁটে তাঁরা দুই বন্ধু অবশেষে এক ছোটো নদীর ধারে এলেন, সেটা পেরোতে হবে। মানুষজন কেউ নেই, কিন্তু সেই সময়ে এক গ্রাম্য লোক সেই পথে এলে পথের নিশানা জিজ্ঞাসা করার সুযোগ হল। সেও সেই দিকেই যাবে, বললে আমার পিছনে পিছনে এসো, নদীতে জল বেশি নয়। কাপড় গুটিয়ে নিয়ে ক্ষিতিমোহন তার পিছনে পিছনে নদী পার হওয়ার জন্য তৈরি হলেন। কোটপ্যান্ট-পরা বন্ধুর সে সুবিধা নেই, বন্ধুটির অনুরোধে সেই লোক তাঁকে পিঠে করে নদী পার করে দিল। বকশিশ নিতে নারাজ হয়ে বললে আপনারা বাইরে থেকে এসেছেন, আমাদেব অতিথি। নদী পার হয়ে সে তাঁদের রাস্তা দেখিয়ে দিয়ে ভিন্ন পথে গেল।

সাধুর আখড়ায় পৌঁছে জানা গেল ভাগবতবাবা ভিতরে আছেন, একটু পরে তাঁর দেখা পাওয়া যাবে। ভক্তেরা রয়েছেন, অযোধ্যাও এলেন। ভক্তদের আতিথেয়তায় ক্ষুধাতৃষ্ণা মিটল। আখড়ায় দু-একজন রীতিমতো পন্ডিত দেখলেন, শোনা গেল তাঁরা নিয়মিত ভাগবতবাবার কাছে বসে ভক্তিশাস্ত্র পাঠ করেন। যে গভীরতত্ত্ব টীকা-ভাষ্য দিয়ে বোঝা যায় না, সহজ কথায় অনায়াসে তা ব্যাখ্যা করেন বাবাজি। এক পন্ডিত কয়েকবছর এইখানেই আছেন, শ্রদ্ধা আর সাধন-অনুরাগের বাঁধনে তিনি বাঁধা। তিনি বললেন এক যুগের সাধক অন্য যুগের সাধকের জন্য যে মর্মবাণী রেখে যান, তারই নাম শাস্ত্র। পন্ডিতের দল কেবল সে বাণী বহন করেন খামে আঁটা চিঠির মতো, সে প্রেমপত্রের মর্ম বোঝেন বাবাজির মতো সাধক, তিনিই অধিকারী প্রেমিক।

এর পর স্বয়ং ভাগবতবাবার দর্শন যখন পেলেন তাঁরা, দুই কলেজে-পড়া বন্ধু বিস্ফারিত চোখে দেখলেন তিনিই সেই নদীপারের কান্ডারি। ভাগবতবাবা সন্তবাণীর আশ্চর্য রসধারায় অবগাহন করিয়ে ধীরে ধীরে সস্নেহে তাঁদের লজ্জা ও আত্মগ্লানির কালিমা ধুয়ে দিলেন। এইখানেই ক্ষিতিমোহন স্পষ্ট উপলব্ধি করলেন এক্কাওয়ালা অযোধ্যা সামান্য মানুষ নন, তিনি সাধক, কবীর প্রভৃতি সন্তের বাণীর গূঢ় অর্থ তাঁর অন্তরে পৌঁছেছে।[৪৪]

অযোধ্যার সঙ্গে বহু সাধুসন্দর্শনে গেছেন ক্ষিতিমোহন, অনেক সাধুর খবর পেয়েছেন তাঁর কাছে। অতি সহজ ভাষায় যে-সব সন্ত-কাহিনি তিনি শোনাতেন তার 'সন্তরসের' তুলনা ছিল না। এক সন্ধ্যায় সংকটমোচনের মন্দিরে বসে এক অসামান্যা রমণীর সাধন-জীবনে প্রবেশের গল্প বলেছিলেন। যৌবনে তিনি ছিলেন বাইজি। একদিন উষাকালে নিজের বাড়ির বারান্দায় বসে তন্ময় হয়ে তিনি কবীরের ভজন গাইছিলেন, নীচের রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে স্বনামধন্য মহাসাধক কৃপালদাসের মনে এক অভূতপূর্ব ভাবের সঞ্চার হল সেই গান শুনে, চরম উপলব্ধির দীপশিখাটি যেন জ্বলে উঠল সেই ক্ষণে। সেই গায়িকার মধ্যে এক শাশ্বত ভাগবত-পথচারিণীকে প্রত্যক্ষ করলেন সাধক কৃপালদাস। সাক্ষাৎ দেবীজ্ঞানে তাঁকে প্রণাম করে তিনি বললেন—সব বাধা-বিঘ্নের মধ্যে দিয়েও যে সাগর অভিমুখে চলেছ তুমি—আমি বৃদ্ধ জীর্ণ—সেই উদ্দেশে আমারও অর্ঘ্যটুকু আজ থেকে তুমি বহন কোরো। হতচকিতা প্রণতা মেয়েটির মাথায় হাত দিয়ে সাধু চলে গেলেন। কিন্তু মেয়েটির জীবন একেবারে বদলে গেল। বহু সন্ধানে সেই বৃদ্ধ সাধুকে খুঁজে বের করে তাঁর কৃপা লাভ করে

কঠোর সাধনায় সিদ্ধ হলেন। অযোধ্যার কাছে জানা গেল এখন সেই সাধিকা বৃদ্ধ বয়সে নাগোয়ার অদূরে কদম্বেশ্বর বা কনোয়া তীর্থের কাছে একটি কুটিরে বাস করেন। সেইদিন প্রথম তাঁকে সেই সাধিকাদর্শনে নিয়ে গেলেন অযোধ্যা, তিনি বসে বসে তখন আপন মনে ভজন গাইছিলেন। গান থামতে তাঁরা যখন কাছে গেলেন প্রথমটায় ধমকে উঠলেন, তারপর অযোধ্যাকে দেখে আশ্বস্ত হলেন। তাঁকে তিনি যে খুবই চেনেন তা বোঝা গেল, বোঝা গেল তিনি প্রায়ই এঁর কাছে আসেন। ক্রমশ ক্ষিতিমোহনও পরিচিত হয়ে উঠলেন। কবীর ও অন্যান্য সন্তদের ভজনগান বহু সংগ্রহ করেছিলেন তাঁর মুখ থেকে। মধ্যযুগীয় সাধকদের সাধনার অনেক রহস্য তাঁরই কাছে জানা হয়েছিল। আর তাই তাঁকে চিরকাল গুরুর মতো স্মরণ করেছেন। তাঁর আদেশ ছিল কোনোদিন তাঁর গুরুর নাম প্রকাশ না করতে। বলেছিলেন : 'আমার গুরু বহু মহাসাধকের গুরু। আমার পরিচয়ে পাছে তাঁহার অবমাননা হয়, তাই তাঁহার নাম প্রকাশ করিও না।'[৪৫]

'কৃপালদাস' ছদ্মনাম, সেই সাধ্বীর গুরুর আসল নাম প্রকাশ করেননি ক্ষিতিমোহন। তাঁর লেখায় তাঁর নিজের জীবনের অভিজ্ঞতার অল্পস্বল্প যেটুকু পরিচয় আছে, তা থেকে সামান্য একটু আভাস পাওয়া যায় কীভাবে তিনি নানা ধরনের সাধুসন্তদের জীবন ও সাধনার ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছিলেন, কোন্ বিচিত্র পথে সাধুভক্তদের মুখ থেকে মরমিয়া সাধনার গভীর উপলব্ধির বাণীগুলি তাঁর সংগ্রহভান্ডারে একে একে সঞ্চিত হয়েছিল। সেই কথা মনে করেই তাঁর প্রথমজীবনের অভিজ্ঞতা থেকে কয়েকটি কাহিনি শোনালাম। ছোটো ছিলেন বলে তখন অনেক জায়গায় অনায়াসে প্রবেশাধিকার পেতেন। এই যে সাধিকার কথা বলছিলাম, ইনি তো ছেলের মতো ভালোবাসতেন। তাই অনেক আবদার করা চলত যা বড়োদের পক্ষে করা সম্ভব ছিল না। আবদার করে এঁর কাছে অনেক গান শুনেছেন।

রবীন্দ্রকাব্যের সঙ্গে পরিচয়। পরিচয় বঙ্গদেশের যুগ-আন্দোলনের সঙ্গে

কাশীর জীবনের অজস্র প্রাপ্তির মধ্যে একটা অপ্রাপ্তিও ছিল। বাংলাচর্চার কোনো সুযোগ তাঁদের ছিল না। বিদ্যালয় থেকে উচ্চস্তর পর্যন্ত শিক্ষাক্ষেত্রে বাংলা সর্বত্রই অচল। অধিকাংশ বাঙালিই তীর্থাশ্রয়ী বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, তাঁরা বড়োজোর রামায়ণ মহাভারত পাঠ করতেন, গঙ্গার ঘাটে কথকতা শুনতেন, বাংলাচর্চা সেই পর্যন্তই, সাহিত্যের ধার তাঁরা ধারতেন না। অল্পবয়সিদের মনেও যে বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে অপরিচয়ের কারণে কোনো খেদ ছিল তা নয়। বাংলা সাহিত্যের কোনো খবর ক্ষিতিমোহনও রাখেননি। সেদিনের কথা স্মরণ করে লিখেছিলেন :

> কাশী পৃথিবীর বাহিরে, শিবের ত্রিশূলের উপর প্রতিষ্ঠিত। আমরা তখন পড়ি সংস্কৃত এবং ভাষারূপে পড়ি হিন্দী। আমি আমার নিজের খেয়ালে গোপনে গোপনে আলোচনা করিতাম কবীর রবিদাস দাদূ প্রভৃতি সন্তদিগের বাণী এবং বাউলদিগের কিছু গান।[৪৬]

কিন্তু এর মধ্যে কালীকৃষ্ণ মজুমদার নামে একজন তরুণ জ্ঞানরসিক ভদ্রলোক কাশীতে এলেন। তিনি দশাশ্বমেধ ঘাটে বসে ক্ষিতিমোহনদের কজনকে তখনকার বঙ্গাদেশের সাহিত্যিক প্রগতির কথা শোনালেন। রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর কয়েকটি কাব্যগ্রন্থের নাম সেই প্রথম শুনলেন ক্ষিতিমোহন। এর কিছুদিন পরে বিপিন দাশগুপ্ত নামে আর-এক তরুণের সঙ্গো আলাপ হতে সেই প্রথম রবীন্দ্রকাব্যের স্বাদ পেলেন। গঙ্গার ঘাটে নিরিবিলিতে বসে কয়েকদিন ধরে বিপিন দাশগুপ্ত রোজই রবীন্দ্রনাথের কবিতা শোনাতে লাগলেন। ক্ষিতিমোহনরা তিন-চারজন মাত্র শ্রোতা। ক্ষিতিমোহন লিখেছেন :

> অন্যেরা কি বুঝিলেন জানি না, কারণ, বাংলার সাহিত্যের সহিত তাঁহাদিগের পরিচয় বিশেষ কিছুই ছিল না। আমার কিন্তু এতই ভালো লাগিতে লাগিল যে তাহা আমি আজও প্রকাশ করিতে পারি না। ওই যে মধ্যযুগের সন্তদিগের বাণী এবং বাউলদিগের গানের সহিত আমার যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় ছিল, তাহাতে মনে হইল এই-সব কথা তো আমার নিকট অপরিচিত নয়। এইগুলি আমার অন্তরের বস্তু। সেই প্রাচীন ও নবীন বাণীর মধ্যে যুগ-যুগান্তরের না-জানা রক্তের টান আছে।[৪৭]

আবার বলেছেন :

> আমি সেই কাব্যের মধ্যে চিরপরিচিত উপনিষদ ও সন্ত-কবিদের ভাব দেখতে পেলাম। তখন থেকেই রবীন্দ্রনাথ আমার পরম আত্মীয়।[৪৮]

বিপিন দাশগুপ্ত 'কড়ি ও কোমল' কাব্যের 'চিরদিন' কবিতাটা পড়ে শোনাবার পর জিজ্ঞাসা করেছিলেন কবিতাটা বোঝা গেল কি না এবং ক্ষিতিমোহন যেটুকুই বুঝে থাকুন, তাঁর ব্যাখ্যা শুনে সন্তুষ্ট হয়েছিলেন তিনি। জানি না তারই পুরস্কারস্বরূপ কি না, দেশে ফেরবার সময় রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন' প্রভৃতি কয়েকটা বই তিনি পড়তে দিয়ে গেলেন। বলা বাহুল্য সে-সব বই কতবার যে পড়লেন ক্ষিতিমোহন তার ঠিক নেই। পরে টালি সংস্করণ কাব্যগ্রন্থাবলি সংগ্রহ করতে পেরে নিজেকে তাঁর ভাগ্যবান মনে হল। বইটা সেই থেকে বছর সাতেক সব সময়ের সঙ্গী ছিল, তারপর কেউ পড়তে নিয়ে ফেরত দিলেন না আর।

> তার কবিতাগুলির পাশে পাশে সব পুরাতন ভক্তবাণীর উল্লেখ ক'রে রাখতাম। রবীন্দ্রকাব্য যে কত ভালো লাগত কী বলবো। সন্তবাণী তো শত-শত বছরের পুরোনো, আর রবীন্দ্রনাথ জীবন্ত।[৪৯]

বহুদিন পরে একটি হিন্দি প্রবন্ধে ক্ষিতিমোহন বলেছিলেন :

> বাঙালি হলেও আমার জন্ম যুক্তপ্রদেশে। ছেলেবেলায় বাংলা সাহিত্যের সঙ্গো আমার পরিচয় ছিল না। বিশেষত খুব বাল্যকাল থেকেই আমি সাধু-সন্তদের পিছনে পিছনে ঘুরে বেড়িয়েছি। সে-সময় কবীর দাদূ আদি সন্তের বাণীতেই মনপ্রাণ পূর্ণ ছিল। তারপর উনিশ-কুড়ি বছর বয়সে একদিন এক রবীন্দ্রভক্তের মুখে যখন প্রথম একটি কবিতা শুনলাম তখন মনে হল যে বাণীর সঙ্গো আমার আন্তরিক পরিচয় আছে, এই কবিতাও ঠিক সেই জাতীয়। তাই শোনামাত্রই তার সঙ্গো আমার নিবিড় পরিচয় হয়ে গেল। সে কবিতা মুহূর্তের জন্যও আমার বিজাতীয় মনে হল না। বরং এমন হল যে-সব সন্তবাণী এতদিন আমার কাছে অস্পষ্ট ছিল, সেও রবীন্দ্রকাব্যের সাহায্যে দিনে দিনে সুস্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল, তার মর্ম প্রকাশ পেল। অর্থাৎ মধ্যযুগীয় সন্তবাণীর আলোয় আমি রবীন্দ্রনাথকে চিনলাম, আর রবীন্দ্রনাথের আলোয় চিনলাম 'অটপটী বাণী'-কার সন্তদের।[৫০]

তখন তিনি তো স্বপ্নেও জানেন না যে ভবিষ্যতে শিক্ষকজীবনে তিনি দীর্ঘদিন বাংলা সাহিত্য পড়াবেন, পড়াবেন রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু রবীন্দ্রসাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় হওয়ার আগেই নিজের অজানিতে তিনি আর-এক দুর্লভ সৌভাগ্যের অধিকার অর্জন করেছিলেন। কাশীতেই স্বামী বিবেকানন্দের কণ্ঠে রবীন্দ্রসংগীত শোনবার সুযোগ তাঁর হয়েছিল: ক্ষিতিমোহন লিখেছেন, কাশীতে স্বামী বিবেকানন্দকে যে-কয়জনের মধ্যে দেখা যেত, তাঁদের সকলকেই সন্ধ্যাবেলা পাওয়া যেত যজ্ঞেশ্বর তেলী নামে এক ভদ্রলোকের বাড়িতে। স্বামীজি কাশীতে থাকাকালীন ক্ষিতিমোহন রোজই সন্ধ্যায় সে বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হতেন এবং গান শুনতেন। সেই অল্প বয়সে এই-সব বাড়িতে তাঁর অবাধ যাতায়াত ছিল। স্বামীজির কণ্ঠে শোনা রবীন্দ্রনাথের যে-গানগুলি তাঁর মনে স্থায়ী ছাপ রেখে গিয়েছিল তা হল 'এ কি এ সুন্দর শোভা', 'মরি লো মরি আমায়', 'সখী আমারি দুয়ারে কেন আসিল'। ক্ষিতিমোহন কিন্তু তখন জানেন না এ-সব গানের রচয়িতা কে।[৫১]

সেই বয়সে বঙ্গদেশের সাহিত্য-সংস্কৃতির কিছু কিছু দিকের সঙ্গে যে পরিচয় হয়নি তা নয়। তাঁর দিনলিপিতে ক্ষিতিমোহন 'বঙ্গদর্শন', 'ভারতী', 'সাধনা', 'সঞ্জীবনী'-র নাম উল্লেখ করেছেন, এ-সব বাংলা সাময়িকপত্রিকা তাঁদের বাড়িতে ডাকযোগে আসত। রবীন্দ্রনাথের 'মানভঞ্জন' গল্পটা বেরিয়েছিল 'সাধনা'-র বৈশাখ ১৩০২ সংখ্যায়, পড়ে এত ভালো লাগল যে তার চুম্বকটুকু লিখে রেখেছিলেন। তখন তো পত্রিকায় সব-সময় লেখকের নাম থাকত না, সম্ভবত তাই গল্প পড়লেও লেখককে তাঁর চেনা হয়নি। আর কিছুকাল পরে ১৮৯৯ সালের গরমের ছুটিতে বেড়াতে গেলেন কলকাতায়। ছুটিশেষেও ফিরছেন না দেখে কাশী থেকে তাঁকে নিতে লোক পাঠানো হল। ফেরবার পথে ট্রেনে মাঝরাতে যখন তাঁর সঙ্গী এবং অন্য সব যাত্রী ঘুমিয়ে আছেন, ক্ষিতিমোহন নিঃসাড়ে নেমে গিয়ে দেওঘর চলে গেলেন। ভোরের দিকে গিয়ে পৌঁছোলেন রাজনারায়ণ বসুর গৃহে। তাঁর সঙ্গে চিঠিতে যোগাযোগ ছিল, এই প্রথম এবং এই শেষ সেই ঋষিপ্রতিম মানুষটিকে স্বচক্ষে দেখলেন। তিনিও সস্নেহে অভ্যর্থনা করলেন। তিন দিন আদর-যত্নে কাটিয়ে কাশী ফিরে গেলেন ক্ষিতিমোহন। ৩১ জুলাই ১৮৯৯ তারিখের দিনলিপিতে এই সাক্ষাতের বিবরণ আছে, লেখা আছে কথাবার্তা যা হয়েছিল তাও। এর দু-মাস পরেই রাজনারায়ণ বসুর মৃত্যু হয়।[৫২]

বোঝা যায়, শুধু সন্তবাণী নিয়েই তাঁর দিন কাটেনি। আধুনিক বাংলার যুগ-আন্দোলনের নানা দিক সম্পর্কেও যথাসময়ে সচেতন হয়ে উঠেছিলেন, রাজনারায়ণ বসুর সঙ্গে পত্রবিনিময় এবং তাঁকে একা দেখতে চলে যাওয়ার মতো বেপরোয়া পরিকল্পনা যেন তাঁর প্রস্তুয়মান ভুবনটার একটুখানি অস্পষ্ট ইঙ্গিত দেয়। স্বয়ং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পায়ের তলায় বসে উপনিষদের ব্যাখ্যা শুনবেন এ বাসনাও লালন করতেন ভিতরে ভিতরে। যাই হোক, ইতিমধ্যে আপন মানসিক প্রবর্তনায় ব্রাহ্মসমাজের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন। কীভাবে বাইরের যোগাযোগ তাঁর ভিতরকার আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে মিলে এই আকর্ষণের পরিবেশ গড়েছিল তার হদিস স্পষ্ট হবে না ঠিকই, তবে যে সময়ের কথা বলছি তাব কিছু কালের মধ্যেই যে তাঁরা সমবয়স্ক ও সমমনস্ক কয়েকটি তরুণ

মিলে ব্রাহ্মসমাজে যেতে আরম্ভ করেছিলেন এমন অনুমান ভিত্তিহীন না হতে পারে, দলের মধ্যে ব্রাহ্ম-বন্ধুও ছিলেন। কলকাতাবাসী নন বলে ক্ষিতিমোহন নিয়মিত যেতে পারতেন না নিশ্চয়, কিন্তু মাঘ-উৎসবের মতো বিশেষ উপলক্ষে আগে থেকে কলকাতায় এসে সকালে ও সন্ধ্যায় সমাজের সমবেত উপাসনা ও প্রার্থনায় যোগ দেওয়ার জন্য উৎসুক হয়ে থাকতেন। ১৯০০ সালের আর-একটা ঘটনা উল্লেখ করি। হয়তো তাঁর সেই অভিজ্ঞতা তাঁকে রামমোহন ও ব্রাহ্মসমাজ সম্পর্কে আরও বেশি আগ্রহী করে তুলল। সেবার নববিধান ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক ঈশানচন্দ্র সেন কাশীতে ক্ষিতিমোহনদের বাড়িতে অতিথি হলেন, তিনি তাঁর কাকার বন্ধু। তখন ক্ষিতিমোহনের বাবা-মা তীর্থে গেছেন, তাই আতিথ্যের ভার পড়ল তাঁরই উপর। বেশ আলাপ হয়ে গেল, তাঁকে কাশীর মঠ-মন্দির সাধুসন্ন্যাসী দেখাতে লাগলেন, তিনিও দেখছেন শ্রদ্ধার সঙ্গে। ক্ষিতিমোহন খুশি, জন্মকাল থেকে কাশীতে আছেন, সেখানকার ছোটোবড়ো সবকিছুই জানেন, এ কথা মনে করে বেশ তৃপ্তি পাচ্ছেন। একদিন ঈশানচন্দ্র জানতে চাইলেন রামচন্দ্র মৌলিক নামে রামমোহন-সমসাময়িক শিক্ষাবিদ কোথায় থাকেন। ক্ষিতিমোহন নিশ্চিন্তেই উত্তর দিয়েছিলেন যে এ নামে কেউ কাশীতে নেই। ঈশানচন্দ্র সে কথা না মেনে খোঁজ করতে বলায় ক্ষুণ্ণও হয়েছিলেন। কাশীর খবর তিনি জানবেন না! পরে আবিষ্কার করলেন এক খুব বৃদ্ধ মানুষ কুড়ি-পঁচিশ বছর পা ভেঙে শয্যাগত হয়ে আছেন, তিনিই রামচন্দ্র মৌলিক, কিন্তু তখনও তাঁর বুদ্ধি ও স্মৃতিশক্তি অম্লান। কয়েকদিন ঈশানচন্দ্রের সঙ্গে গিয়ে, তাঁর কথাবার্তা ও রামমোহন-স্মৃতিচারণ শুনে, রামমোহন-সংক্রান্ত মূল্যবান সব বই-পত্রিকা-কাগজপত্র তাঁর সঞ্চয়ে আছে দেখে ক্ষিতিমোহন অনেক জেনেছিলেন। পরেও তাঁর কাছে যেতেন, তাঁর কাছে শুনতেন পুরাতন যুগের অনেক কথা। তবে বেশিদিন আর তিনি জীবিত ছিলেন না। তবু রামমোহন রায় যে একজন লোকোত্তর মহাপুরুষ ছিলেন এ ধারণা করে নিতে পেরেছিলেন মৌলিক মশায়ের কথা শুনেই।[৫৩]

আসলে বরাবরই ক্ষিতিমোহনের ভিতরের তৃষ্ণাটাই মানুষের মতো মানুষ দেখতে পাওয়ার—তা সে অতীতেরই হোক বা তাঁর সমকালের। সাধুসন্ন্যাসীর খোঁজে যেমন ঘুরেছেন, যেমন খুঁজে বেড়িয়েছেন আউল-বাউল-সাঁই-দরবেশ, উচ্চশিক্ষিত আধুনিক সমাজের প্রগত মনের মানুষকেও তেমনই সন্ধান করে ফিরেছেন। তাই দেখতে পাই ছাত্রাবস্থাতেই কাশী ও এলাহাবাদে সমকালের বেশ কিছু বিশিষ্ট মনস্বী বাঙালির সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল, যাঁদের ব্যক্তিত্ব ও গভীর জ্ঞান, কারও কারও ত্যাগব্রতী আদর্শবাদী জীবন মনে রেখাপাত করেছিল। উদ্‌বুদ্ধ হয়েছিলেন কায়স্থ পাঠশালার রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের মতো স্থিতধী, নির্ভীক, আদর্শপরায়ণ মানুষের নিরলস কর্মসাধনায়, যখন পরিচয় হয়নি তখনও এলাহাবাদে গেলে সসম্ভ্রমে ঈষৎ ব্যবধান থেকে তাঁকে দেখবার সুযোগ করে নিয়েছেন, দেখে মনে হয়েছে ধন্য হলেন। অভিধানপ্রণেতা জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস, পাণিনি ব্যাকরণের সম্পাদনার জন্য খ্যাত শ্রীশচন্দ্র বসু প্রভৃতি মানুষকে তরুণ বয়সে ভালো লেগেছিল। প্রবাসী বাঙালিদের বঙ্গীয় সাহিত্য-সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত করাবার অনুপ্রেরণায় এই সময়েই একবার এই-সব বিশিষ্ট ব্যক্তির এলাহাবাদে একটি সম্মেলন আহ্বান করেন, বলা বাহুল্য ক্ষিতিমোহন সেখানে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। ক্রমশ এই চেষ্টা থেকে প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য-সম্মেলন ও 'প্রবাসী' পত্রিকার জন্ম হল।[৫৪]

পৈতৃক ভিটায়

এমন মনে করার কারণ নেই যে প্রবাসে ছিলেন বলে ক্ষিতিমোহন বাংলার গ্রামজীবন সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিলেন। ভারত স্বাধীন হওয়ার আগে পর্যন্ত পৈতৃক ভিটার সঙ্গো তাঁদের অস্তিত্বের শিকড় জড়ানোই ছিল। ছুটিতে, সামাজিক কাজকর্মে তাঁরা দেশে যেতেন, গিয়ে থাকতেন। 'হিন্দু সংস্কৃতির স্বরূপ' গ্রন্থে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের আকৃতি আচরণ প্রথা বেশভূষাগত সাদৃশ্য ও পার্থক্যের খুঁটিনাটি বিচার-বিশ্লেষণ কেন এত মূল্যবান, তা বলতে গিয়ে তাঁর মনে পড়েছে ছেলেবেলায় দেখতেন বাংলা দেশেও বৃদ্ধেরা দ্রাবিড় পন্ডিতদের মতো অর্ধেক মাথা মুন্ডিত করে বাকি অর্ধেক শিখা রাখতেন। আবার মেয়েরা যে দীপাদি নিয়ে বরকে বরণ করে দক্ষিণ ভারতেও তার প্রচলন আছে এবং এর দ্বারা বশীকরণ করা হচ্ছে এই অভিযোগে কোথাও কোথাও বিয়ের সময় একটা সাজানো মারামারি চলে জেনে তাঁর মনে পড়ে : "পূর্ববঙ্গো আমরা ছেলেবেলায় এইরূপ মারামারি দেখিয়াছি। ইহাকে 'ছোলা ছোঁয়ানো' বলিত। তাহা এখন বোধ-হয় আর নাই।"[৫৫] 'প্রাচীন ভারতের নারী'-তে বলেছেন এখনকার কালে শিক্ষিত সমাজে বেশি বয়সে কন্যাদের বিবাহ হচ্ছে বলে দ্বিতীয় বিবাহ অনুষ্ঠান অনেক জায়গাতেই লোপ পেয়েছে, 'কিন্তু আমরা বাল্যকালে এই আচার পল্লীগ্রামে পালিত হইতে দেখিয়াছি।' সেসময় ব্রহ্মচর্যব্রত পালনের একটা অভিনয় হত, কন্যা শূদ্রমুখ দেখতেন না, ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করে খেতেন—সেই ভিক্ষাকে বলত 'মাঙ্গান'।[৫৬] আবার 'বাংলার সাধনা'-য় বলেছেন : 'ছেলেবেলায় আমরা অনেক মালসী গান শুনতে পেতাম। এখন সেগুলি ক্রমে লুপ্ত হয়ে এসেছে।' এ গানে যে উপাস্য ও উপাসকের মধ্যে মাতা ও পুত্রের মতো একটি ঘনিষ্ঠ যোগ, তাঁর লেখায় সেই কথাটা এসেছে বাংলার ধর্মের মধ্যে যে মানবিকতার দর্শন প্রাধান্য পেয়েছে সেই প্রসঙ্গো। মালসী ছিল দেওয়ান রামলোচন, রামপ্রসাদ, কমলাকান্তের মতো সাধক-গীতিকারদের সময়ের আগেকার শক্তিগান।

বড়ো হওয়ার পরে দেশের সঙ্গো যোগটা আরও বাড়ল ক্ষিতিমোহনের। ড. ভবতোষ দত্ত লিখেছেন : 'ছেলেদের শিক্ষা সমাপ্ত হলে দয়াময়ী সোনারঙ্গা ফিরে আসেন।'[৫৭] আমাদের ধারণা পৈতৃক গ্রামে তাঁদের যাতায়াত বাড়তে লাগল ১৮৯৭-৯৮ সাল থেকে। অবশ্য এটা অনুমান মাত্র, তবে ১৩৬২ সালে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে ক্ষিতিমোহন লিখেছিলেন :

> প্রায় ষাট বছর পূর্বে কাশীতে বাস করেও আমরা দেশে পূর্বপুরুষের বাসস্থানে এলাম। ঘর-দুয়ার করে দেশের আড্ডাটা জমিয়ে তুললাম। যদিও কাশীধাম আমরা তখনও ছাড়িনি। কাজেই দেশে এসে যতদিন বাস করতাম আমার গতিবিধি ছিল টোলে ও চতুষ্পাঠীতে, আর আমার দাদার কাছে আসর বসত ফারসীভক্তদের। অনেক মুসলমান সজ্জনও তাঁর আসরে আসা-যাওয়া করতেন।[৫৮]

তাঁর প্রবন্ধে প্রসঙ্গা ছিল সমাজে হিন্দু এবং মুসলমান-সম্প্রদায় আত্মীয় বন্ধুর মতো মিলেমিশে বাস করেছে তখনও পর্যন্ত, হিন্দু ধর্ম-সংস্কৃতি থেকে মুসলমানকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন

করে দূরে সরিয়ে রাখার উপায় ছিল না তাদের ভূমিকার কারণেই। এই প্রবন্ধের মতো কোনো কোনো লেখায় ক্ষিতিমোহনের এ বয়সে দেখা পল্লিগ্রামের চিত্র উঁকি দিয়ে যায়।

আগেই এ কথা বলেছি যে, ক্ষিতিমোহন এম.এ. পাস করেন ১৯০২ সালে এবং কাশীতেই তিনি আয়ুর্বেদশাস্ত্রও অধ্যয়ন করেছিলেন। 'চিন্ময় বঙ্গ'-য় তিনি লিখেছেন বাল্যকালে এই শাস্ত্র তাঁকে পড়তে হয়েছিল। শিক্ষা সমাপ্ত না-হওয়া পর্যন্ত নিশ্চয় স্বগ্রামে তিনি ছুটিতে আসতেন বা অল্পদিন থাকতেন। তবে তখন থেকেই তাঁর বাংলাদেশের বাউলদের কাছে যাতায়াত আরম্ভ হয়েছিল কি না বলতে পারি না। ক্ষিতিমোহন অবশ্য নিজে ইঙ্গিত দিয়েছেন পূর্ববঙ্গে প্রথম বাউলগান সন্ধান তিনি শুরু করেন ১৮৯৭-৯৮ সালে। এ-সত্য সুবিদিত যে বাংলা ভাষায় সন্তবাণী প্রকাশ করে তিনি যেমন মধ্যযুগীয় এই সাধন ও ভক্তিসংগীতের সঙ্গে প্রথম আমাদের পরিচয় ঘটালেন, তেমনই বাউল ধর্মসাধনা ও তার সাধনসংগীতের সঙ্গেও তিনিই প্রথম পরিচয় করিয়ে দিলেন শিক্ষিত শহুরে মানুষের। কেন তিনি এ কাজে নিয়োজিত হলেন পরে আসা যাবে সে কথায়, তবে এটা ঠিক যে তাঁর আগে কোনো শিক্ষিত ব্যক্তি বাউলগান বা তার তত্ত্ব নিয়ে মাথা ঘামাননি।

কাশীতে থাকতেই বাউলগানের সঙ্গে তাঁর পরিচয়। যে বয়সে বাউলদের সম্পর্কে কোনো ধারণাই ছিল না, সেই বয়সেই তিনি কাশীতে কয়েকজন বাউলকে জানতেন। ছোটোবেলা থেকেই চেনা হয়েছিল ছকু ঠাকুর, মহিম গোঁসাই প্রভৃতির সঙ্গে। বাউল সাধকেরা কাশীর মন্দিরে বা ঠাকুরবাড়িতে আশ্রয় পেতেন। সেই-সব মন্দিরের সিঁড়িতে কোনোমতে একটুখানি জায়গা করে নিয়ে বসলেই গানের পর গান শোনা যেত তাঁদের কণ্ঠে। ছকুঠাকুর দক্ষিণ বিক্রমপুরের মানুষ, শেষজীবনে এসে বাস করেন কাশীতে, তাঁর বৃদ্ধ বয়সে ক্ষিতিমোহন তাঁকে দেখেন। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথকে তিনি শুনিয়েছিলেন এঁরই কাছে শেখা বাউল গঙ্গারাম, শেখ মদন প্রভৃতির গান। এ কথা সকলেই জানেন যে, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের হিবার্ট বক্তৃতায় রবীন্দ্রনাথ এই-সব গানের অনুবাদ ব্যবহার করেন। বাল্যকালে দেখা আর-এক বাউলসাধকের অত্যন্ত গুণমুগ্ধ ছিলেন ক্ষিতিমোহন। তিনি নিতাই বাউল। ক্ষিতিমোহনের অনেক লেখাতেই তাঁর প্রসঙ্গ এসেছে। কাশীর রাজা নিতাইকে স্নেহ করতেন, গঙ্গার ঘাটে নিজের প্রতিষ্ঠিত এক মন্দিরে তাঁর থাকবার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন, কোনো ঠাকুরবাড়িতে একবেলা অন্নভোগ জুটত। তাঁর গান শুনে কেউ বা কখনও রাত্রেও খেতে দিতেন। ক্ষিতিমোহনের মাও দিতেন। ক্ষিতিমোহন মুগ্ধ হয়ে তাঁর গান শুনতেন, ক্রমে তাঁর কাছ থেকেই এ-সব গানের ভিতরকার সত্যের পরিচয় পেতে শুরু করলেন। জীবনটাকে যেমন করে দেখেন নিতাই, মানবিক সম্পর্কের ভিতর দিয়েই যে অপার্থিব পরমসত্তার সত্য অনুভবের জন্য ব্যাকুল হন, তার অতলস্পর্শ রহস্য ক্ষিতিমোহনকে মাতিয়ে তুলল। যে-সব বিশেষ বিশেষ জায়গায় বছরের বিশেষ বিশেষ সময়ে বাউলসাধকরা সমবেত হন, নিতাই বাউলের কাছেই প্রথম তার সন্ধান পেলেন। সেই সন্ধানের সূত্র ধরেই বীরভূমের কেন্দুলি মেলায় যাওয়া। তখনও তাঁর চেতন মনের

বৃত্তে শান্তিনিকেতন বা বোলপুরের কোনো অস্তিত্বই নেই। কাশী থেকে কেন্দুলিতে যেতে গেলে পান্ডবেশ্বরে নামতে হত, সেখান থেকে হাঁটাপথ বা গোরুর গাড়ি ভরসা। ক্ষিতিমোহন যে হেঁটে যেতেন তাতে সন্দেহ নেই।

বাংলা দেশের বাউল-সম্প্রদায়ের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার ইচ্ছায় ক্ষিতিমোহন প্রথম গিয়েছিলেন রাজাবাড়ির মঠের কাছে মেঘনার চরে। এ সন্ধানও তাঁকে দিয়েছিলেন নিতাই বাউল, পরে ছকু ঠাকুর। কৈবর্ত-সাধকদের মধ্যে স্থানীয় বাউলগান শুনে সংবাদ নিয়ে জানলেন এ গান তাঁরা পেয়েছেন দাশু বৈরাগীর কাছে। রাজাবাড়ির কাছেই তাঁর আখড়া। দাশু বৈরাগীকে প্রথম দেখার বর্ণনা পাই তাঁর নিজের কলমে : 'তাঁহার চক্ষু দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় এ-মানুষ সত্য প্রত্যক্ষ করা মানুষ।' সেসময় প্রায় যেতেন দাশু বৈরাগীর আখড়ায়। দাশুকে দেখে যেমন, তেমনই বিমুগ্ধ হতেন তাঁর দুই শিষ্য বল্লভ আর দুর্লভকে দেখে। তাঁরা দিনরাত সকলের সেবা করেন কিন্তু নিজেরা ধরা দেন না। তাঁদের সাধকসত্তার পরিচয় মেলে না।[৫৯] এঁদের প্রসঙ্গও ক্ষিতিমোহনের রচনায় কখনও কখনও এসেছে। বাউলগান সংগ্রহের সেই প্রথম পর্বে সাধক গঙ্গারামের রচনা সংগ্রহ করার মানসে তিনি বহিনখাড়া ধলসত্রে, আরিয়াল খাঁর তীরে ইদিলপুরে, দক্ষিণ সাহাবাদপুরে এবং ধলেশ্বরী তীরের আবদুলপুরে যান।

বিবাহবন্ধন। সহধর্মিণী কিরণবালা

এদিকে ক্ষিতিমোহন কেবলই সুফি-সন্ত-বাউলের খোঁজে ঘুরে বেড়াতেন বলে তাঁর মায়ের মনে তখন ভাবনা ঢুকেছে—সন্ন্যাসী হয়ে যাবে নাকি ছেলে।[৬০] তাই হয়তো তাঁরই উদ্যোগ বেশি ছিল। এম.এ. পরীক্ষার পরে ২৬ বৈশাখ ১৩০৯ সালে বরিশাল জেলার গৈলা গ্রামনিবাসী মধুসূদন সেনের জ্যেষ্ঠা কন্যা কিরণবালার সঙ্গে ক্ষিতিমোহনের বিবাহ হল।[৬১] মধুসূদন সেন পেশায় ইঞ্জিনিয়াব ছিলেন, সরকারি উচ্চপদে চাকরি করতেন। তিনি বিত্তবান মানুষ। এই বিয়ের সম্বন্ধ করেন কিরণবালার গৃহশিক্ষক শশীবাবু। কাশীতে গিয়ে ছেলে দেখে এসে তিনি খবর দিলেন রাজপুত্রের মতো ছেলে। এইখানে একটু বলি, ক্ষিতিমোহনের চেহারার খ্যাতি শান্তিনিকেতনেও ছিল। অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ দত্ত আমাদের বলেছিলেন যে অবনীন্দ্রনাথের পুত্রের মুখে তিনি ক্ষিতিমোহনের চেহারার প্রশংসা শুনেছিলেন। শান্তিনিকেতনে যখন কর্মজীবন শুরু করেছেন সে-সময় কলকাতায় গেলে রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছায় ক্ষিতিমোহন জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে যেতেন অবনীন্দ্রনাথকে সংস্কৃত কাব্যচর্চায় সাহায্য করতে এবং তাইতেই অবনীন্দ্রনাথের কিশোর পুত্রের চোখে পড়েছিল তাঁর সেই যৌবন বয়সের চেহারা। হীরেন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে অধ্যাপনা করতে এসে যখন নিজে তাঁকে দেখেন তখন তাঁর চেহারা ভেঙে গেছে, গায়ের রং রোদে পুড়ে বাদামি, তবুও তাঁর দীর্ঘকায় সুপুরুষ চেহারা হীরেন্দ্রনাথের নজর কেড়ে নিয়েছিল।

কিরণবালা সুন্দরী নন, তাঁর চেহারা সাধারণ। প্রাচুর্যের মধ্যে তিনি বড়ো হয়েছিলেন। যখন বিয়ের সম্বন্ধ হল তিনি বাড়িতে শিক্ষকের কাছে পড়াশোনা করছেন। পিতা মধুসূদন সেন কখনও তাঁকে খেতে বসে টেবল ম্যানার্স শেখাচ্ছেন, কখনও নিজে টমটম গাড়ি চালাতে চালাতে পাশে-বসা কন্যার হাতে লাগাম তুলে দিচ্ছেন। তা দেখে কিরণবালার মা বলতেন—মেয়ে কী করবে এ-সব শিখে—বিয়ে তো দিচ্ছ টোলের পণ্ডিতের বংশে। মধুসূদন তাঁর প্রায় সব কয়টি কন্যারই বিয়ে দিয়েছিলেন দরিদ্র পণ্ডিত বংশে। বিয়ে হয়ে কিরণবালা এসেছিলেন সোনারং গ্রামে তাঁর শ্বশুরবাড়িতে। সেখানে তাঁকে পুকুরঘাটে বাসন মাজা থেকে গোরুর সেবা পর্যন্ত অনেক কিছুই করতে হত। এক পূর্বপরিচিত প্রত্যক্ষদর্শী তাঁর পিতাকে গিয়ে সে সংবাদ দিলেন—কী বিয়ে দিয়েছেন! মেয়ে তো বাসন মাজছে, গোয়াল সাফ করছে। মধুসূদন সেন বিচলিত হলেন না, বরং বললেন 'হ্যাঁ আমার মেয়ে তাই করবে, আমি জেনেই দিয়েছি।'[৬২]

কিরণবালা কোনোদিনই স্বামীগৃহে আর্থিক সচ্ছলতার মুখ দেখেননি, না সোনারঙে, না শান্তিনিকেতনে। বিয়ের সময় পর্যন্ত ক্ষিতিমোহনের জীবিকার কোনো পাকা বন্দোবস্ত হয়নি। কয়েক বছর পরে যখন শান্তিনিকেতনের কাজে যোগ দিলেন এবং স্থায়ীভাবে সেখানেই থেকে গেলেন, তখন আরও অর্থ উপার্জন, আরও সচ্ছলতা, আরও স্বাচ্ছন্দ্য এবং আরামের গার্হস্থ্য পরিবেশের মধ্যে ক্রমশ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার যে স্বপ্ন সাধারণ মাপের মানুষ দেখতে চায়, বলতে গেলে তার পথটাই বন্ধ হয়ে গেল। বৃহৎ সংসারের নানাবিধ দায়দায়িত্ব ছিল ক্ষিতিমোহনের, অভাব-অনটনের মধ্যেই চলতে হত, কিন্তু এ-সব সত্ত্বেও তাঁরা দুজনে একটি সার্থক ও সুখী দাম্পত্যজীবন রচনা করতে পেরেছিলেন। অমিতা সেন আমাদের বলেছিলেন : 'সোনারঙে মাকে পাতার জ্বালে রাঁধতে হত। এক এক বউয়ের রাঁধবার পালা এক এক দিন, যার পালা সেদিন তাকেই পাতা কুড়োতে হত। মা বলতেন সেও আমার খুব ভালো লাগত। আর যেদিন গোবর-জড়ানো পাটকাঠির জ্বালে রাঁধতেন, সে তো সেদিন খুব আরামে রান্না হল। তেমনই শান্তিনিকেতনে টানাটানি, খুব বুঝে হিসেব করে চলতে হত। এমন নিবিড় ভালোবাসার বন্ধনে দুজনে বাঁধা ছিলেন বলেই এত কষ্ট করতে পেরেছিলেন মা।'[৬৩]

যে-বয়সে কোনো কষ্টই গায়ে লাগে না তখন কিরণবালার সেই বয়স, যখন সবই সহজেই মধুর লাগে। আর ঘুরে ঘুরে জ্বালানির জন্য শুকনো পাতা কুড়োতে যাঁর ভালো লাগত, তাঁর নিজের স্বভাবই তাঁকে ভিতর থেকে সহজ রসের জোগান দিয়েছে সবসময়। অন্যদিকে বিয়ের বছর চারেক পরে স্ত্রীকে লেখা ক্ষিতিমোহনের একটি চিঠি থেকে কিছুটা উদ্ধৃত করলে তাঁরও দৃষ্টিভঙ্গির একটা দিক একটু স্পষ্ট হবে, বোঝা যাবে সংসারে নারীর কর্তব্য-অকর্তব্য সম্পর্কে কী তিনি মনে করতেন, স্ত্রীর কাছে কী প্রত্যাশা ছিল বা। শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে বরাবরই তাঁর সম্পর্ক আন্তরিক, কিরণবালার মা-বাবা তাঁকে সন্তানের মতো স্নেহ করতেন, তাঁর অভিভাবকের মতন ছিলেন। ক্ষিতিমোহনও মান্য করতেন, কারণে-অকারণে তাঁদের স্নেহময় সহায়তার মূল্য অগ্রাহ্য করতেন না। কিন্তু অন্তত এই

একটি চিঠিতে দেখতে পাই কিরণবালার ধনী পিতৃগৃহে অল্পবয়সি কন্যা ও বধূদের কর্মহীন অলসজীবন তাঁকে ভয়ানক বিচলিত করেছে। কিরণবালাকে লিখছেন :

> আর দেখি আলস্য [...] আমার পাদাগ্র হইতে কেশ পর্যন্ত ঝাঁ ঝাঁ করিয়া ওঠে। যেখানে এই প্রথম বয়সের মেয়েরা বৌরা দিব্য স্বচ্ছন্দে আলস্যে দিন কাটায় কোন কাজই গায়ে মাখে না সেখানে যাওয়াও যা নরকে যাওয়াও তা। তোমাকে আমি সেখানে হয়ত রাখিতামই না—যদি মার অসুবিধা না হইত। এবং তোমার কাছে যদি আমি যথেষ্ট প্রত্যাশা না করিতাম। আমি যথেষ্ট আশা রাখি তুমি আমার ভবিষ্যৎ ভাবিয়া নিজ কর্তব্য করিবে।[৬৪]

কিরণবালা নিপুণা গৃহিণী ছিলেন, সংসারে তাঁকে কঠোর পরিশ্রম করতে হত। অনটন সত্ত্বেও তিনি সামান্য উপকরণ দিয়েই গৃহের পরিবেশ শ্রীমণ্ডিত করে রাখতেন। এ কথা যেমন শুনেছি তাঁর কন্যার মুখে, তেমনই শুনেছি তাঁর উপরে ক্ষিতিমোহনের অগাধ নির্ভরতার কথা। গৃহ আর গৃহিণী সমার্থক ছিল তাঁর কাছে।

স্ত্রীকে লেখা ক্ষিতিমোহনের খানকতক পুরোনো চিঠি আমাদের দেখবার সুযোগ হয়েছিল, তার মধ্যে সবচেয়ে পুরোনোটা বিয়ের অল্পদিন পরেই লেখা, চিঠির তারিখ ২৯ জুন, ১৯০২। সোনারং থেকে গৈলায় কিরণবালার পিতৃগৃহে লিখেছিলেন ক্ষিতিমোহন। মধুসূদন সেন অবশ্য কর্মসূত্রে সপরিবারে নানা সময়ে নানা জায়গায় থাকতেন। তাই কিরণবালার পিতৃগৃহ মানেই গৈলা বোঝাত না, সেই তরুণী বয়স থেকে আর যখন গৃহিণী হয়ে উঠেছেন তখন পর্যন্ত শান্তিনিকেতন থেকে ছুটিতে বা অন্য কোনো উপলক্ষে বাবা-মার কাছে তিনি আছেন মানে সে জায়গা কখনও বকসার, কখনও কটক, আবার কখনও রাজশাহি বা বহরমপুর। নতুন বিয়ের পরে মাত্র কয়েকদিন আগেই কিছুদিনের জন্য দুজনে ছাড়াছাড়ি হয়েছে, কিরণবালা বাপের বাড়িতে গেছেন। বিচ্ছেদকাতরা নববধূর চিঠিখানি সেইদিনই হাতে এসে পৌঁছেছে। তার উত্তরে ক্ষিতিমোহনের বিরহী চিত্ত আপনাকে অনাবৃত করে মেলে ধরল। একটা অমূল্য প্রাপ্তির সুখানুভব সাময়িক বিচ্ছেদের বেদনাকে উত্তীর্ণ হয়ে যাচ্ছে, প্রত্যাশায়, ভবিষ্যতের কল্পনায়, স্বভাবসুলভ কৌতুকবোধের ঈষৎ স্পর্শে রঙিন ক্ষিতিমোহনের অন্তরকে সেই চিঠির দর্পণে বেশ দেখে নেওয়া যায়। ক্ষিতিমোহন লিখলেন :

> স্নেহের সুবচনী,
>
> তোমার পত্র অদ্যই পাইলাম। সুখের যদি একটা থার্মোমিটার (Thermometer) থাকিত, তাহাতেও [..] করিয়া দেখিতাম বুঝাইতে পারি কিনা কতটা সুখ হইয়াছে। তোমার উত্তর দিতে দেরী হইয়াছে বলিয়া কাতরভাবে ক্ষমা ভিক্ষা চাহিয়াছ। কেন ভাই? এত সহস্র ত্রুটিপূর্ণ মানবজীবনে এই ভ্রমবহুল পৃথিবীতে বল কাহার না ভুল হয়? ওগো, এজন্য যদি কাতরভাবে ক্ষমা চাহিতে হয়—তবে ক্ষমা চাহিয়া আর ক্ষমা করিয়াই ক্ষুদ্র জীবনটুকু কাটিয়া যায়।
>
> তবে আমি ৫ দিন যাবৎ প্রত্যহই পোষ্ট অফিসে যাই। নৌকা করিয়া জল ভাঙ্গিয়া—সেই পোষ্ট অফিসে বসিয়া থাকি—কত চিঠি পাই। কিন্তু একখানি চিঠি আছে—যাহা পাইয়া আমার অপূর্ণ প্রাণ পূর্ণ হইয়া উঠে সেই চিঠিখানি পাই না। ক্ষমা কিসের ভাই? আমাদের পরস্পরের ত্রুটি পরস্পরের কাছে নিত্যই ক্ষমার বস্তু থাকিবে। তবে আমার আবেগ উৎকণ্ঠার দিকে চাহিও—তবেই আর বলিবার কিছুই থাকিবে না।

আমাদের বিদায়ের সেই শোকাবহ কথা আর তুলিও না। আমার বড় ইচ্ছা ছিল কমলাঘাট* পর্যন্ত যাই—কিন্তু বাবার অভিপ্রায়বিরুদ্ধ হওয়ায় যাই নাই। যাহা হউক ভগবানের ইচ্ছা থাকিলে আমাদের দেখা হওয়া অসম্ভব নহে—তবে এমন বৃথা দিবস যাপন ভাবিতে বড়ই কষ্ট হয়। তোমার কষ্ট হইয়াছিল শুনিয়া আমারও কষ্ট হয়— কিন্তু যে স্নেহবশত তোমার কষ্টবোধ হইয়াছে সেই স্নেহের কথা ভাবিলে (হাসিও না ভাই) [...] নিবেদনে গর্ব্ববোধ করি। ভাই, এই সহস্র দুঃখপীড়িত সংসারে এই নিত্য বিপদজর্জ্জরিত জগতে— স্নেহই মানবের একমাত্র সুকোমল আশ্রয়। —মরুভূমিতে ওয়েসিস— আর পৃথিবীতে স্নেহ [...] মানুষ সহস্রভাবে পীড়িত হইয়া এখানে আসিয়া একটু হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচে—এইখানে একটু বিশ্রাম করে। এমন সম্পদের কথা ভাবিলে আবার দীন চিত্তে শত শত বলবতী আশা ও নবীন উৎসাহ তরুণ জীবন জাগিয়া ওঠে।

'স্নেহ' শব্দের অর্থব্যাপ্তি একটুখানি দার্শনিকতার আড়াল রচনা করলেও যে সেই মুহূর্তে বিশেষ একটি মনের ভালোবাসার আশ্রয়ের জন্যই তাঁর মন ব্যাকুল, তাতে সন্দেহ নেই। আবার এই সামান্য কয়দিনের বিচ্ছেদের কারণে এত আকুলতার প্রকৃত অর্থ যে সংসারে কেউ বুঝবে এমন আশা নেই। দুঃখ করে লিখলেন :

তোমার সঙ্গে দেখা করিতে আমার যে কিরূপ ইচ্ছা করে তাহা কেমন করিয়া বুঝাই বল? সবে দিন ১৫ হইয়াছে— মানুষে শুনিলে পাগলা গারদে পাঠাইতে চাহিবে। বাস্তবিক পৃথিবীতে হৃদয়ের উচ্ছ্বাসই যেন গোপনীয় লজ্জার বিষয়। প্রেমিক প্রেমটুকু লুকাইয়া রাখেন, ভক্ত ভক্তি গোপন করেন। বিরহী দীর্ঘনিশ্বাসটুকু নির্জ্জনে ফেলে, অশ্রুবিন্দুটুকু আঁধারে মুছিয়া ফেলে। কেন? এই মজার নিয়ম! যেন হৃদয় থাকাটা বড়ই লজ্জা। হৃদয়হীনতাটাই এখানে বড় গৌরবের বিষয়।

বিরহ এবং হৃদয়াবেগের অনুষঙ্গেই হয়তো কৃষ্ণ-রাধার ভাবটুকু মনে এল আর স্বভাবসরস মনটিও যে বিরহভারে একেবারে চাপা পড়েছিল এমন নয়। কিরণবালার চিঠিতেও পুনর্মিলনের জন্য ব্যাকুলতা লক্ষ করে নিশ্চয় বেশ একটুখানি ভালো লাগার অনুভবও ঘিরে ধরেছে। লিখছেন :

যাহা হউক তোমার আকর্ষণটুকুও তবে কম নহে— তোমারও আকুলতা নেহাৎ মন্দ রকম নয়—কথা এই যে দেখা হইবার উপায় কি? আমিও এখানে বলিতে পারি না— 'গৈলা চলিলাম' তোমাদের ওখানে গিয়া বলিতে পারি না 'এই আসিলাম' তুমিও সেই যাত্রাদলের রাধিকা ঠাকুরাণীর মতন বলিতে পার না 'সখী কৃষ্ণ এনে দে— নহিলে মরিব আমি যমুনার জলে/ঐ পাখিগুলি গেয়ে ওঠে—বনে ফোটে ফুল/যমুনার জল বহে ছল ছল—সারাটা পৃথিবী কেমন আকুল/তোরা বল সে ভুলে আছে কি বলে'।

উপায় যখন নেই, প্রতিকার যখন সাধ্য নয়, তখন চোখের জল মুছে কাজে লেগে যাওয়াই ভালো এবং সে কাজটা হল পড়াশোনায় মন দেওয়া। বালিকাবধূকে উপদেশ দিতে গিয়ে 'বিরহী যক্ষ'-এর মন সকৌতুকে মেঘদূত কাব্যপ্রসঙ্গ একটু ছুঁয়ে গেল। লিখলেন :

তবেই তো ভাই অবস্থাটা শোচনীয় না? উভয়েরই বাসনা উভয়ের হৃদয়ে চুপ করিয়া বসিয়া থাকি। এরূপ ভাবে থাকিলে উপায় নাই—অন্য গতিও নাই। তাই বলি চক্ষুর জল মুছিয়া

সোনারং গ্রামের ভিতর দিয়ে দিয়ে খাল কাটা ছিল কমলাঘাট পর্যন্ত। সেখান অবধি গিয়ে নৌকা যে বড়ো নদীতে পড়ত তার নাম শীতলক্ষা বা ধলেশ্বরী। নদী পেরিয়ে নারায়ণগঞ্জ। সেখান থেকে বরিশাল, গৈলা বরিশালে।

কাজে লাগিয়া যাও। ওই যে মেঘগুলি সেগুলিও দক্ষিণা বায়ুতে উত্তর দিকে চলিয়াছে দক্ষিণে যায় না। মেঘদূত তবে আর হইবে কেমন করিয়া। তবে তোমার সুবিধা আছে বটে—কিন্তু তোমার তো আর 'ভটচাজ্জি বাতিক' নাই যে মেঘকেই বক্তৃতা দিয়া দিবে।

এই একই চিঠি থেকে আরও উদ্ধৃতি দেওয়ার ইচ্ছা দমন করতে পারছি না। পরের অংশে পড়াশোনার প্রসঙ্গ বেশ খানিকটা জায়গা জুড়ে আছে :

নগী তাহার শ্বশুরবাড়ি গিয়াছে পরে তুমি আরও একেলা বোধ করিতেছ। খুব পড়াশোনায় ডুবিয়া থাকিও—তবেই আর খালি খালি বোধ হইবাব কারণ থাকিবে না। এখন কার কাছে পড়িতেছ? অঙ্ক আর হাতের লেখার দিকে নজর দিও। বিশেষতঃ হাতেব লেখায়। যদি সংস্কৃত পড়ার সুবিধা বোধ না কর তবে ভালরূপে ইংরেজী পড়িও—কারণ সংস্কৃত আমি তোমাকে সহজেই শিখাইতে পারিব। তবে ব্যাকরণের শব্দরূপ ও ধাতুরূপগুলি মুখস্থ করিও—সেগুলিতে শিক্ষকের সাহায্য লাগে না—অথচ ঐগুলি জানিলে অনেক সহজেই বাকি বিষয়টা আয়ত্ত করা যায়। যে বিষয়ে যতটা পড়িয়াছ—সর্বদা আলোচনা করিবে—দেখিও যেন শেখা বিদ্যা ভুলিয়া মারিয়া দিও না। Exercise করিতেছ শুনিয়া বড়ই সুখী হইলাম—এটি খুব রীতিমত রক্ষা করিবে আহার নিদ্রার ন্যায় ইহাকে নিত্য সম্পাদ্য মনে করিবে এবং কখনই ইহা বাদ দিও না।[৬৫]

এই সময়ে লেখা চিঠিগুলিতে পড়াশোনার ব্যাপারে স্ত্রীকে উৎসাহ এবং পরামর্শ দেওয়ার ঝোঁকটা চোখে পড়ে খুব। একটা চিঠিতে লিখছেন : 'তোমার লেখাপড়া রীতিমত চলিতেছে শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম। ... সংস্কৃত পড়া কি অত্যন্ত কঠিন বোধ করিতেছ? রোজকার কাজ রোজই হইতেছে তো?' আবার লিখছেন : 'তোমার পিতার যে ইস্কুলে পাঠাইতে অনিচ্ছা আছে। তজ্জন্য একখানি পত্র মাকে লিখিতেছি। সেইখানি পড়িলেই তাঁহার মতের পরিবর্তন হইবে বলিয়া আশা করি। এ বিষয়ে কোনো চিন্তা করিও না।'[৬৬]

বিয়ের পরে কিরণবালা কিছুদিন বেথুন স্কুলে পড়েছিলেন শুনেছি। একটি চিঠিতে তারও ইঙ্গিত আছে : 'বেথুন কলেজ খুলিয়াছে। হয়তো এবার বাড়ি হইতে আসিয়া হয়তো বা তুমি পুনরায় স্কুলে যাইতে পার। এমত অবস্থায় যাহাতে দ্বিতীয় শ্রেণীর উপযুক্ত হও সেইরূপ চেষ্টা তোমার প্রতিদিন করা উচিত।'[৬৭]

ক্ষিতিমোহনের নিজের বাড়ির পরিবেশ কতটা নারীশিক্ষার অনুকূল ছিল বলতে পারি না। তবে সেকালের গ্রামের বাঙালি মধ্যবিত্ত পরিবারের সাধারণ আবহাওয়া যেমন ছিল তার থেকে তা খুব পৃথক হওয়ারও কারণ নেই। স্ত্রী শিক্ষিতা হবেন এটা একেবারেই ক্ষিতিমোহনের ব্যক্তিগত ইচ্ছা। তাঁর নতুন যুগের আলোয় জেগে-ওঠা মন জীবনসঙ্গিনীকে সেই আলোর স্পর্শ দিতে চেয়েছে, চেয়েছে অজ্ঞতা আর অবরোধের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসবার রাস্তা দেখিয়ে দিতে। কলকাতা থেকে লেখা এক চিঠিতে এমন কথাও আছে, 'আজ বাবা এখানে আসিয়াছেন—আজই আবার বাড়ি যাইবার কথা। তিনি গেলেও তোমার পড়াশুনা রীতিমত চালাইবে।'[৬৮] অনুভব করা যায় কর্তব্য এবং গুরুজনদের সেবাযত্নের নামে সেকালে বাড়িব মেয়ে-বউদের যে অখণ্ড মনোযোগ সংসার দাবি করত, ক্ষিতিমোহনের ভয় পাছে তা কিরণবালার পড়ার সামান্য

অবকাশটুকুও কেড়ে নেয়। কিরণবালার বিধিবদ্ধ শিক্ষা বেশি দূর এগিয়েছিল এমন মনে করার কারণ নেই। ক্ষিতিমোহন-কিরণবালার প্রথম সন্তান রেণুকা বোধ হয় ১৯০৪ সালে জন্মান, সুতরাং নিয়মিত পড়াশুনার বিঘ্ন যথেষ্ট ছিল। তবে কিরণবালা স্বামীর মনের সঙ্গিনী হতে চেষ্টা করেছিলেন প্রথম থেকেই এবং ব্যর্থ হননি। কোনোদিনই তাঁর বিদ্যানুরাগ হারিয়ে যায়নি সংসারের চাপে। ক্ষিতিমোহনও হারাতে দেননি। দেখতে পাই আরও বছর দুই পরেও লিখছেন : 'তোমার এখনকার পড়ার বিবরণ দিবে। জান তো ইংরাজী পুস্তকখানি তোমার শেষ করা চাই। জান তো তোমার ব্রত আরও কত আছে। আমার মিনতি তোমার প্রতিশ্রুতি সব মনে করিয়া কাজ কর। আমাকে বলিবারই আবশ্যক হইবে না।'[৬৯]

মনে তো হয় বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও পাঠচর্চাব্রত অভঙ্গ রাখার প্রতিশ্রুতির কথাই চিঠিতে ক্ষিতিমোহন বলতে চেয়েছিলেন। আরও কয়েক বছর পরে শান্তিনিকেতনে সংসার পাতার পরে সেখানকার পরিবেশ কিরণবালার মনোবীণার সুর বেঁধে নিতে নিত্যসহায়ক হয়েছে। পুরোনো কালের সেই শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথকে ঘিরে প্রতিদিন সন্ধ্যায় ঘরোয়া সভা বসত, আশ্রমিকরা সব আসতেন। সেখানে ক্ষিতিমোহনও যেমন নিয়মিত যেতেন, তেমনই যেতেন কিরণবালা। যতদিন রবীন্দ্রনাথ ছিলেন, কিরণবালা এই প্রাত্যহিক অভ্যাস ছাড়েননি। বিশ্বভারতীর সাহিত্য আলোচনার নিয়মিত ক্লাসেও যোগ দিয়েছেন, কলাভবনে নন্দলাল বসুর কাছে ছবি আঁকা ও মূর্তিগড়ার কাজ শিখেছেন। ক্ষিতিমোহন নিজেও কিরণবালার কাব্যরসবোধের বিশেষ মূল্য দিতেন। মেয়েদের কাছে ক্ষিতিমোহন বলতেন : 'আমার চেয়ে তোদের মায়ের কাব্যবোধ অনেক গভীর।'

ক্ষিতিমোহন প্রথম বয়সে যে কী ব্যাকুলতায় স্ত্রীকে সাহিত্যের সঙ্গীরূপে পেতে চেয়েছেন, একটি চিঠিতে তার একটুখানি আবেগবিহ্বল আভাস আছে—'আমার চিরকল্পনা—আমি মেঘদূত পড়িব তুমি আলুলায়িত কুন্তলে অবতংস শোভিত কর্ণে সেই মধুর গাথা শুনিবে—উভয়ে বিভোর হইব। সে চিন্তা কি নিষ্ফল হইবে।'[৭০] তখনও নবীন প্রাণের উপর সদ্য পড়ে-আসা সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাব যে অত্যন্ত সক্রিয়, সে আর বলে দিতে হয় না। এর প্রায় বছর দুই আগে লেখা চিঠিতেও দেখি তাঁর বিরহী চিত্ত মেঘদূত-এর যক্ষের মতনই অস্থির : কালিদাস যে বলেছেন, 'মেঘালোকে ভবতি সুখিনোঽপ্যন্যথাবৃত্তি চেতঃ কণ্ঠাশ্লেষ প্রণয়িনিজনে কিং পুনর্দূর সংস্থে'—সেই অবস্থাই যেন ক্ষিতিমোহনেরও। কিরণবালা কি লিখেছিলেন সংসারের নানা কাজে সারাদিন তাঁর কেটে যায়? ক্ষিতিমোহনের চিঠিতে সম্ভবত তারই উত্তরে কর্মের দর্শন নিয়ে বেশ খানিকটা নাড়াচাড়া করা হল। অবশ্য চিঠিটার মূল বক্তব্য ছিল সারাদিন মেঘ করে আছে, প্রিয়সান্নিধ্যব্যাকুল মনে তিনি আশা করে আছেন আর কোনো মেঘ-ছাওয়া দিনে তাঁরই মতো কিরণবালাও প্রিয়সঙ্গসুখ আকাঙ্ক্ষা করে তাঁর কথা ভাববেন :

আজ সমস্ত দিন ঘন মেঘে আকাশ আবৃত। আজ যেন তোমাদের আমার চিত্তের আরও নিকটে পাইতেছি। আলোকে যাহা চোখে পড়ে না—দিবসে যাহা দৃষ্টি আকর্ষণ করে [না] —রাত্রিতে তাহাই আমাদের নয়নের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়। 'যাহা দিনে দেখি না তাহা রাত্রিতে দেখি'—কথাটা বড় কৌতূহলের বটে — কিন্তু বড় সত্য কথা। সুখের দিনে এমন অনেক জিনিষে আমাদের উপেক্ষা আসে—কিন্তু দুঃখদুর্দশার দিনে তাহাই আমাদের ঘনিষ্ঠ বান্ধব হইয়া উঠে। সুখের সময় মৃত ও দূরস্থ প্রিয়জনকে পাই না—ভগবানকে পাই না। পাই যখন চিত্ত দুর্দশার ভাবে অবসন্ন—যাতনায় জীর্ণ ও শ্রান্তিতে লুণ্ঠিত। দুঃখ-শোক ফেলার সামগ্রী নহে—ইহা বড় যত্নের ও বড় সাধনের ধন। আজ এই মেঘান্ধকার প্রকৃতি আমাকে কলিকাতা হইতে যেন টানিয়া লইয়া একেবারে তোমাদের মধ্যে লইয়া যাইতেছে। আজ যেন দূরের বিশ্ব আমার নিকট এমন এক সাগ্রহ নিমন্ত্রণ পাঠাইয়াছে যাহা উপেক্ষা করা চলে না। আজ সত্যই আমার চিত্ত এখানে নাই। হয়তো তোমার কাছের প্রকৃতি অদ্য সূর্য্যালোকে উৎফুল্ল। আজ হয়তো প্রকৃতির অন্যান্য পদার্থের মত তুমিও শত কার্য্যে ব্যস্ত। কাজ করিয়া যাও কিরণ। এই পৃথিবীর আলোক ফুরাইবার আগে যত পার কাজ কর। মৃত্যুর পরপারে অনন্ত বিশ্রাম সঞ্চিত আছে—জীবন থাকিতে কাজ কর—বিশ্রাম তো তখনই খুব পাইবে। আজ বাঁচিয়াও যদি মড়ার মত হইয়া যায়—তবে মৃত্যুকে ভয় কর কেন? তাই বলি যতদূর শক্তি চলে কাজ করিয়া লও। কিন্তু তথাপি যখন এক আধদিন অন্ধকার দিন আসে তখনই বন্ধু-বান্ধবদের স্মরণ করিবার দিন। আজ আমি তোমাদের কথা ভাবিতেছি—প্রার্থনা তুমিও যেন এইরূপ মেঘমলিন দিন মাঝে মাঝে পাও।[৭১]

গয়া থেকে লেখা একটি চিঠি

প্রসঙ্গান্তরে যাওয়ার আগে এইরকম বিয়ের বছর দেড়েকের মধ্যে স্ত্রীকে লেখা ক্ষিতিমোহনের আর-একখানি চিঠির উল্লেখ করছি। হয়তো কোনো কাজে অথবা বিনা কাজেই সেসময়ে তিনি গয়া গিয়েছিলেন। কেন যথাসময়ে কিরণবালার চিঠির উত্তর দিতে পারেননি তার কৈফিয়ত দিতে গিয়ে বললেন তাঁর বন্ধুর খুব জ্বর হয়েছে, ডাক্তার কবিরাজ সেখানে পরিচিত কেউ নেই, সেজন্য তাঁকেই চিকিৎসা ও শুশ্রূষার ভার নিতে হয়েছে। আগের দিন তাই একেবারেই সময় করতে পারেননি। সম্ভবত এর আগে কিরণবালা গয়ায় কিছুদিন ছিলেন, পিতার চাকুরিসূত্রেই হয়তো। নোংরা ঘিঞ্জি শহর বলে তো গয়ার কুখ্যাতি চিরকালের, তাঁরও অভিজ্ঞতা ভিন্নপ্রকার হয়নি। কেননা ক্ষিতিমোহন লিখছেন : 'গয়ার উপর তোমার ঘৃণা লাগিয়া গিয়াছে—তাহা লাগিতে পারেই বটে। কিন্তু যদি লোকেদের উপেক্ষা করিয়া এই স্থানের শোভা উপভোগ করা যায় তবে এমন চমৎকার স্থান খুব কমই আছে।' অবশ্য কিরণবালা শুধুই ঘৃণা প্রকাশ করেননি তাঁর চিঠিতে, ক্ষিতিমোহনের চিঠিতে গয়ার বর্ণনা পড়ে এখানে আসতেও চেয়েছেন। তার উত্তরে ক্ষিতিমোহন লিখেছেন :

গয়ার বিবরণ শুনিয়াই তোমার গয়ায় আসিতে ইচ্ছা করিতেছে গয়া যদি চক্ষে দেখিতে তবে না জানি কতই আনন্দিত হইতে। নদী আমাদের বাড়ী হইতে এক মিনিটের পথ। ছাত হইতে নদীর

খেলা দেখি। আমাদের নূতন যে বাসা হওয়ার কথা তাহা যদি হয় তবে নদীর একেবারে উপরে হইবে। সেই বাড়ীর খিড়কীর নীচেই নদী। চারিদিকে ফুলের বাগান বাংলা ধরণের ঘর—পাকা উঠান পিছে আছে—অথচ ভাড়া মাসিক ৮৲ টাকা।

কেবলমাত্র এইটুকুর জন্য হলে এ-চিঠির উল্লেখ হয়তো বা অকিঞ্চিৎকর মনে হতে পারত। গয়া থেকে কাছাকাছি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থানগুলিতে বেড়াতে যাওয়ার ইচ্ছা, চিঠিতে সে-সব কথাও লিখেছেন, তবে তারও উল্লেখ না করলে কিছু হয়তো বা এসে যেত না। কিন্তু প্রতিদিন খুব ভোরবেলা উঠে অনেক দূর একা বেড়াতে যাওয়ার যে বর্ণনা এ-চিঠিতে আছে, তার মধ্য দিয়ে তাঁর নিজের একটি অন্তরঙ্গ দুর্লভ ছবি ফুটেছে, সেটি উপেক্ষা করা যায় না :

আমি এখানে রোজ ৩টা বা ৩॥ টার সময় প্রভাতে উঠি। ব্যায়ামাদি করিয়া ৪টা ৪॥ টার সময় বেড়াইতে বাহির হই। এক এক দিন এক এক দিকে যাই। কাল মুরলা পর্ব্বতে ও মঙ্গলা পর্ব্বতে গিয়াছিলাম। মঙ্গলা দেবীর মন্দিরদ্বারে বধকাষ্ঠ—তাহাতে সদ্য নিহত পশুরক্ত লাগিয়া আছে। হায় মা, তুমিই মঙ্গলা। সন্তানের রক্তে কেমন মঙ্গল কর তুমি?

আজ রামশিলায় বেড়াইতে গিয়াছিলাম। রামশিলা অতি মনোরম পর্ব্বত। কত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শিলাখণ্ড সব পড়িয়া আছে। আর সেই উচ্চ হইতে ফল্গু নদীর কি সুন্দর রমণীয় দৃশ্য—একেবারে চিত্ত বিগলিত হইয়া যায়। এইখানে ভগবান রাম নাকি তাঁহার দেবোপমা পত্নী সীতা ও ভ্রাতৃভক্ত ভাই লক্ষ্মণকে লইয়া আসিয়াছিলেন। সেই সত্যব্রত রামচন্দ্রের মূর্ত্তি দেখিলাম আর দেখিলাম সকল লোকপূজ্য কলঙ্কিত সংসারের অকলঙ্কিত চন্দ্রমা, ভারতের পবিত্রতার জননী সেই সীতা। সঙ্গে আত্মবিসর্জ্জনতায় পরম বীর দেবর লক্ষ্মণ। এমন পর্ব্বত [...] বিমোহিত হয়। বসিয়া বসিয়া মেঘদূতখানি পড়িলাম—সঙ্গে বই লইয়া গিয়াছিলাম। ২/১টি ভাল কবিতা পড়িলাম। তারপর সূর্য্য উঠিল—চলিয়া আসিলাম। রামশিলা বাড়ী হইতে আধ ঘণ্টা বা ৪০ মিনিটের পথ। এই পর্ব্বতে আমি প্রায়ই শেষ রাত্রিতে আসি। বড় সুন্দর দৃশ্য। একেবারে নির্জ্জন বহু উর্দ্ধে অনেকক্ষণ ধরিয়া উঠিয়া সেই স্তব্ধ নির্জ্জনতায় কি আনন্দ।

গয়ায় থাকতে শরৎ-প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য প্রায়ই তাঁকে রামশিলা পাহাড়ে টেনে নিয়ে যেত, কিন্তু স্থানীয় ভদ্রলোকেরা তাঁকে শেষরাত্রে এ-ভাবে একা ওই পাহাড়ের উপর যেতে নিষেধ করতেন। 'তাঁহারা বলেন ঐখানে নাকি বড় বড় বাঘ আছে। কয়েকদিন হয় একটি লোক মারিয়া একটি বাঘও মারা পড়িয়াছে—কিন্তু স্থানটা এমনই সুন্দর যে লোভ সংবরণ করা যায় না। কাজেই আমি যাই আর যে শোভা দেখি তাহা অতুলনীয়।' লিখেছেন ক্ষিতিমোহন এই চিঠিতে। তারপর যোগ করেছেন :

আমি বুদ্ধগয়া যাইব। এখান হইতে ২০ মাইল দূরে বরাবর পর্ব্বতে যাইব যেখানে বুদ্ধদেবের শিষ্যবর্গ শাস্ত্রসংগ্রহের জন্য মহাসঙ্ঘসভা আহ্বান করিয়াছিলেন। এখান হইতে ৪০ মাইল দূরে বিম্বিসারের রাজধানী প্রাচীন মগধের ও জরাসন্ধের রাজধানী রাজগৃহে যাইব। আর যাইব মহারাজা হরিশ্চন্দ্রের পুত্র রোহিত দাসের নগরে। তাহা আরও দূরে। এই-সব স্থান পর্ব্বতময় ও অতি রমণীয়।[৭২]

'স্বদেশী সমাজ' পাঠসভায় ও ব্রাহ্ম উৎসবে। কাশী থেকে চিঠি

এই-সব 'পর্ব্বতময় অতি রমণীয়' স্থান দেখে এসে কিরণবালাকে তার 'যথাযথ বিবরণ' দেওয়ার ইচ্ছা নিশ্চয় অপূর্ণ থাকেনি। এর কয়েক মাস পরে কাশী থেকে কলকাতায় এলেন আর-এক ইচ্ছা নিয়ে। রবীন্দ্রনাথের 'স্বদেশী সমাজ' পাঠসভায় উপস্থিত থেকে স্বচক্ষে কবিকে দেখবেন। ১৯০৪ সাল, শ্রাবণ মাস। মিনার্ভা থিয়েটার হলে রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধ পড়বেন ৭ শ্রাবণ ১৩১১, ইংরেজি তারিখ ২২ জুলাই। কিন্তু নির্দিষ্ট দিনে সভা শুরুর ঘণ্টাখানেক আগে সভাস্থানে পৌঁছে হলের ভিতরে ঢোকাই গেল না, এত ভিড়। মাঝখান থেকে গায়ের জামাটাই ছিঁড়ে গেল। বিষণ্ণ মনে কাটল কয়েকটা দিন। এমন সময় হঠাৎ কাগজে দেখলেন প্রবন্ধটা রবীন্দ্রনাথ আবার পড়বেন কার্জন থিয়েটারে ১৩ শ্রাবণ। এবারে সভারম্ভের বহুক্ষণ আগে যথাস্থানে গিয়ে উপস্থিত হলেন। হলের দারোয়ান বালিয়া জেলার লোক, ভোজপুরী কথ্য ভাষায় নিজের বাসনা জানাতে সে বোধ করি একটু বিশেষ খুশি হল। ভিতরে ঢুকে দেখা কাশীর দুই সতীর্থের সঙ্গে—প্রমথনাথ তর্কভূষণ ও রাজেন্দ্র বিদ্যাভূষণ।[৭৩] তাঁরা উদ্যোক্তার দলে। বন্ধুকে তাঁরা ডেকে নিয়ে স্টেজের উপরে বসিয়ে দিলেন। খুব কাছ থেকে রবীন্দ্রনাথকে দেখা হল, তবে পিছন থেকে দেখলেন বলে মুখ ভালো দেখা গেল না। প্রবন্ধ যখন পড়লেন, ক্ষিতিমোহনের মনে হল যেন গান শুনছেন। তখন দেশে বিপ্লবী আন্দোলনের একটা চেষ্টা দানা বাঁধছে। শিবনারায়ণ দাস লেনে ফিল্ড এন্ড একাডেমি নামে এক বিপ্লবী সমিতি গড়ে উঠেছিল।[৭৪] কলকাতায় থাকলে রবীন্দ্রনাথ কখনও কখনও সেখানে সন্ধ্যাবেলায় তরুণ ছেলেদের কিছু বলতেন। সন্ধান পেয়ে ক্ষিতিমোহন কয়েকদিন সন্ধ্যাবেলা সেখানেও গিয়ে তাঁর আলোচনা শুনলেন। কিন্তু সংকোচবশত আলাপ করা হল না।

প্রায় ছোটোবেলা থেকেই তাঁর নিরাকার পরব্রহ্মের ধ্যান ও উপাসনার প্রতি প্রবল আকর্ষণ। তরুণবয়সে ব্রাহ্ম বন্ধু ননীভূষণ গুপ্তের সঙ্গে মিশে ব্রাহ্মসমাজের সংস্পর্শে আসবার আগ্রহ এবং সুযোগ আরও বাড়ল। মাঘোৎসবের উপাসনায় যোগ দিতে কলকাতায় আসতেন, এ কথা আগে বলেছি। তাই সেই সূত্রে 'স্বদেশী সমাজ' পাঠসভার পরেও রবীন্দ্রনাথকে এই সময়ে কয়েকবার দেখে থাকতে পারেন। কিরণবালাকে লেখা এক চিঠিতে ক্ষিতিমোহন মাঘোৎসব উপলক্ষে তাঁর ব্যস্ততার কথা জানাচ্ছেন দেখতে পাই, জানাচ্ছেন কেন কলকাতায় পৌঁছোনোর খবর দিতে তাঁর দেরি হল। 'আমি এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছি এই ৪দিন যাবৎ অথচ তোমাকে একখানি পত্র দেই নাই—ইহাতে তুমি দুঃখিত হইতে পার। কিন্তু জান তো এখন মাঘোৎসব—প্রতি বর্ষে এই দিনে আমাদের কি ভয়ঙ্কর দৌড়াদৌড়ি দেখিয়াছ—তাহা স্মরণ করিয়া আমাকে ক্ষমা করিও।' চিঠি থেকে ধারণা হয় কিরণবালা তখন পিতার কর্মস্থল বকসারে এবং ক্ষিতিমোহন সেখান থেকেই কলকাতায় এসেছেন : 'আমার পৌঁছসংবাদ আমি পরদিন দিতে পারি নাই ভুলিয়া গিয়াছিলাম তাহা নহে— ঘুরিয়া সময় হারাইয়া ফেলিয়াছিলাম। যাহা হউক ননী তোমার বাবাকে এ সম্বন্ধে

খবর দিতে পারিয়াছিল।' ক্ষিতিমোহন কলকাতায় আসবার পরে বন্ধু ননীভূষণ এলাহাবাদ গেছেন, তাঁর হাতে ক্ষিতিমোহন রবীন্দ্রনাথের 'রাজভক্তি'[৭৫] প্রবন্ধের মুদ্রিত পুস্তিকা বকসারে তাঁদের জন্য পাঠিয়ে দিয়েছেন, 'দুঃখ রহিল—তাহা স্বয়ং পড়িয়া শুনাইতে পারিলাম না। এইটা রবিবাবুর মুখে শুনিয়া স্তব্ধ হইয়াছিলাম।' এ প্রবন্ধ রবীন্দ্রনাথ ফিল্ড এন্ড একাডেমিতে পাঠ করেন ১০ মাঘ, ক্ষিতিমোহন শুনতে গিয়েছিলেন।[৭৬]

আর তার পরদিন মাঘোৎসবের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে মন একেবারে অভিভূত। সকালে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে শিবনাথ শাস্ত্রীর বক্তৃতা শুনেছেন 'নবযুগের ঊষালোক'। আবার জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে সন্ধ্যায় গিয়ে আদি ব্রাহ্মসমাজের উপাসনাতেও যোগ দিলেন—মনে হল 'রবীন্দ্রনাথের Sermon একেবারে অমৃতময়—আর তাহার ভিতরে বিধাতার মধুর বাণী যেন স্ফুট ঝঙ্কারে বাজিয়া উঠিতেছে'।[৭৭] সেদিন যে রবীন্দ্রনাথের মুখে শুনলেন সংসারে প্রতিদিন আমরা যে সত্যকে স্বার্থের বিক্ষিপ্ততায় ভুলে থাকি, উৎসবের বিশেষ দিনে সেই অখণ্ড সত্যকে স্বীকার করবার দিন—এইজন্য উৎসবের মধ্যে মিলন চাই, উৎসব কখনও একলার নয়, আর তা কখনও প্রয়োজনের সীমানায় বদ্ধ নয়, সব প্রয়োজনের অধিক যা উৎসব তাকেই নিয়ে, —বেশ অনুভব করা যায় এ-সব কথায় ক্ষিতিমোহনের অন্তঃকরণে কী জোয়ারের উচ্ছ্বাস জেগে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ বলছিলেন প্রেমই উৎসবের দেবতা—মিলনই তাঁর সজীব সচেতন মন্দির। এই প্রেমের স্বাদ পাওয়ার জন্যই মানুষ উৎসবক্ষেত্রে সকলকে আহ্বান করে আনে। উৎসবদিনের অবারিত মিলন এই উপলব্ধির অবসর দেয় যে এই পৃথিবীতে আত্ম-পর, ধনী-দরিদ্র, উচ্চ-তুচ্ছ, পণ্ডিত-মূর্খ সকলেই একটি বাঁধনে বাঁধা পড়তে পারে অসংকোচে—তার নাম প্রেম। আর এই উপলব্ধি যার হল না সে-মানুষ সমস্ত উৎসব-সম্পদের মাঝখান থেকে রিক্ত হাতে ফিরে যায়। বোঝাতে চাইছিলেন কেন উৎসবের আয়োজন তেমন দুঃসাধ্য নয়, তার উপলব্ধি যেমন। বাহ্য আড়ম্বর থেকে অনেক দূরে নিভৃত আত্মলোকের সহজ আনন্দে যে মানুষ জগৎব্যাপ্ত নিত্য ব্রহ্মোৎসবের শরিক হতে চায়, ক্ষিতিমোহন তো নাবালক বয়স থেকেই তার দোসর। তাই শিবনাথ শাস্ত্রী-রবীন্দ্রনাথের বাণীর মর্ম তাঁর ভিতরে প্রাণরস সঞ্চার করে দিচ্ছিল। মাঠে-বাটে আখড়ায়-আশ্রমে সাধু-সন্ত-বাউল-ফকিরদের কাছ থেকে যে সত্য প্রেম ও আনন্দের মন্ত্র পেয়েছেন জীবনে, আর-এক রূপে তাকেই আবার তিনি পেয়েছেন তাঁর সময়কার শহর কলকাতার শিক্ষা-সংস্কৃতির শীর্ষবর্তী ব্রাহ্ম পরিমণ্ডলে, গভীর প্রত্যাশায় অভিনিবিষ্ট হয়ে শুনেছেন ব্রাহ্ম আচার্য ও চিন্তাবিদ্‌দের ধর্মীয় ব্যাখ্যান। যে মাঘোৎসবের কথা বলছি, সেবারই সকালে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রীর অসামান্য ব্যাখ্যান শুনে মনে হয়েছিল, শিবনাথের উত্তরাধিকার বহন করতে পারেন এমন যোগ্য প্রচারকের অভাব আছে, সেই কাজে নিজেকে যদি তিনি উৎসর্গ করে দিতে পারতেন তো ধন্য হতেন। তারপর মনে হল তাঁর কাছে তাঁর পরিবারের প্রত্যাশার কথা, ব্রাহ্ম ধর্মপ্রচারকদের ত্যাগব্রতী জীবনকে বরণ করে নেওয়ার সুযোগ কি তাঁর আছে! কিরণবালাকে চিঠিতে সেই কথাই লিখলেন :

এই ১১ই মাঘের পবিত্র উৎসব দিনে আমাদের হৃদয়ে পাবনী ব্রহ্মবাণী প্রবেশ করাইয়া দিবার চেষ্টা করা হইয়াছে—কত দূর যে জীবনে তাহা প্রবেশ করিল তাহা বুঝা যাইবে কাজে। সেই সময়কার সাময়িক উৎসাহে কি জীবনের অবস্থার কথা বুঝা যায়? সেই উৎসাহের সময় কত কথাই মনে হয়। মনে হইল এই ব্রাহ্মসমাজ আজ ভাল প্রচারক নাই—শিবনাথ শাস্ত্রী গেলে ঐ বেদী হইতে উত্থিত হইয়া সকলকে তৃপ্ত করিতে পারে এমন গম্ভীরা বাণী কোথায়? ইচ্ছা হইল তখনই নিজেকে আত্ম-বিসর্জ্জন করি—আমি গিয়া বলি—এই নাও আমি আছি—লও আমাকে—দাও ভগবানের কাজ—মাথায় তুলিয়া বহন করি। তখনই মনে হইল, হায়। আমি কি স্বাধীন! আমি বিবাহিত—অবশ্য ব্রাহ্মসমাজে প্রচারক হইতে অবিবাহিত বিবাহিতের কোন প্রভেদ নাই। কিন্তু আমাকে উপার্জ্জন করিতে হইবে তোমাদের সকল অভাব পূর্ণ করিতে হইবে। তখনই পিছাইয়া পড়িলাম।[৭৮]

তখন তো ক্ষিতিমোহন জানেন না যে, দীক্ষিত ব্রাহ্ম না-হয়েও পরে তিনি কত দীর্ঘকাল কলকাতায় ব্রাহ্মসমাজের উৎসব-অনুষ্ঠানে আচার্যের আসন অধিকার করবেন, শান্তিনিকেতনের মন্দিরে রবীন্দ্রনাথের শূন্য আসনে বসবেন। পঁচিশ বছরের যুবক ক্ষিতিমোহন তখনও শুধু এই ব্যাপারে কেন, সব দিক থেকেই তাঁর মধ্যে যে সম্ভাবনা সুপ্ত হয়ে আছে, সে সম্পর্কে অচেতন। তখনও তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়নি। নিজের মনকে প্রকাশ করবার, দশের মনকে উদ্‌বুদ্ধ করবার কোনো চেষ্টাই জেগে ওঠেনি তাঁর ভিতরে। তবু তারই মধ্যে এটা দেখতে পাচ্ছি যে মহৎ ভাবের উদ্দীপনায় প্রাণিত তাঁর মন এক বৃহৎ উদ্দেশ্যে জীবন উৎসর্গ করবার জন্য ব্যাকুল হয়েছে। সেই মনই আবার বকসার থেকে চলে আসবার সময় কিরণবালার সঙ্গে বিচ্ছেদ-মুহূর্তটির বেদনায় বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে :

এবার তোমাকে ছাড়িয়া আসিবার সময় দুঃসহ যাতনা অনুভব করিয়াছি। আসিবার সময় কিরণ, আর একবার বুকের কাছে তোমাকে টানিয়া লইবার* বিদায়ের ঘনতম আলিঙ্গনে তোমাকে ছাড়িতে চাহিয়াছিলাম—কিন্তু তাহা পারিয়া উঠি নাই। তারপর বাহিরে নীচে আসিয়া তোমাকে যখন ডাকিলাম তখন আমার মন যাহা করিতেছে তাহা আমিই জানি। তোমাকে এবার অশ্রুসিক্ত দেখিয়া আসিয়াছি সেই ব্যথা আমার প্রাণে লাগিয়া আছে। আমি জানি আমি যখন ধীরে ধীরে কেল্লার বাহিরে ঘুরিয়া ঘুরিয়া পথ দিয়া নামিতেছিলাম তখন আমার সাথের লণ্ঠনের [আলো] তোমার চক্ষুকে আকর্ষণ করিতেছিল। এমন কি যখন সড়কে পড়িলাম তখনও ভাবিতেছিলে যে এই ত যাইতেছে—যতক্ষণ আলো দেখা গেল বা তাহার অস্পষ্ট ছায়া দেখা গেল তখনও তুমি তাহার দিকে নিবদ্ধদৃষ্টি হইয়াছিলে। আমারও পথে হাঁটিতে হাঁটিতে কেবল মনে হইতে লাগিল "যাই এখনও ফিরিয়া যাই"। ষ্টেসনে গিয়া সত্যই ফিরিতেছিলাম—কিন্তু তখনই মনে হইল যে ফিরিলে কি? আবার যাইতেই তো হইবে—যখনই যাইব তখনই তো আবার এই শোকের লীলা চলিবে। অনেকবার তোমাকে ছাড়িয়াছি কিন্তু এবার তোমার অশ্রুসিক্ত মুখখানি আমাকে বড়ই বড়ই ক্লিষ্ট করিয়াছে।[৭৯]

একদিকে স্ত্রীর প্রতি গভীর ভালোবাসার টান, অন্যদিকে মনের মতো জনসভাগুলিতে যোগ দেওয়ার জন্য, প্রিয় বক্তার ভাষণ শোনবার জন্য ততোধিক আগ্রহ, মহৎ ভাবের প্রতি

* বাক্যগঠনে একটু অসংগতি আছে। সম্ভবত 'লইয়া' লিখতে গিয়ে 'লইবার' লেখা হয়েছে।

প্রবল আকর্ষণ—সবটা মিলিয়ে এই সময়কার ক্ষিতিমোহনের ব্যক্তিত্বের যে পরিচয় ফুটে উঠেছে এই চিঠিতে, সমশ্রেণির আর-একটি চিঠিও যদি এর পরেই উল্লেখ করি, হয়তো পাঠক বাহুল্য মনে না করতেও পারেন। পূর্ব-চিঠির মাসখানেক আগে লেখা এই চিঠি। বকসারে কিরণবালার খুব অসুখ করেছিল, সবে বোধ হয় তখন একটু ভালোর দিকে। ক্ষিতিমোহন সেখান থেকে কাশীতে এসেছেন কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগ দিতে, মিত্রগোষ্ঠীর সভাও হবে একই সময়।

10, Sadananda Bazar
Benaras City
1.12.'06 [1.1.1906]

প্রিয় কিরণ,

আজ নববর্ষ—প্রথম দিন। যদিও আমাদের অদ্য প্রথম দিন নহে তথাপি ইহা পৃথিবীর বহু জাতির ঘরে এই দিন নূতন উৎসাহ ও নূতন জীবনেব সম্বাদ আনিয়াছে। এমন দিনে যদিও আমি তোমার নিকট হইতে দূরে আছি তবুও অদ্য তোমার পত্রখানি আমাকে নূতন আনন্দ দিয়াছে। নববর্ষের সকল উৎসাহের সহিত তোমার এই পত্রখানি গ্রহণ করিলাম। প্রার্থনা করি আগামী বর্ষ তোমার শরীরে নূতন স্বাস্থ্য আনুক—মনে নূতন বল দিউক ও জীবনে নূতন উৎসাহ জাগাইয়া তুলুক।

বিগত কয়েকদিন যে আমার কিরূপ পরিশ্রম গিয়াছে তাহা বুঝিতেই পারিবে না। ধর না যেমন গতকল্য প্রভাতে Congress মণ্ডপে গিয়া বাসায় আসিয়াছি তারপর ১১টার সময় পুনরায় সেইখানে Congress-এ গিয়া ২।। টার সময় বাসার কাছে সুরেন্দ্রবাবুর lecture শুনিয়াছি। সন্ধ্যার পূর্ব্বে ৪ টায় মিত্রগোষ্ঠীর সভা—দক্ষিণে (ঠিক উল্টো দিকে) দুর্গাবাড়ির পথে। সন্ধ্যার পর Congress-এর কাছে শিবনাথ শাস্ত্রীর বক্তৃতা—রাত্রিতে মিত্রগোষ্ঠীর Theatre (সংস্কৃত)—পরে আবার বাসায় গিয়া শয়ন। এই সব হাঁটিয়া—কারণ এখন গাড়ী পাওয়া একরূপ অসম্ভব। এত বেশী দাম যে আমাব মত দরিদ্রের আর সভা বা বক্তৃতা শোনা হইয়া ওঠে না।

2-1-'06

পরশু দিন যে শিবনাথ শাস্ত্রীর বক্তৃতা হয়—তাহার পরে এখানকার ছাত্রদের পক্ষ হইতে তাঁহাকে একটা ধন্যবাদ দেই। ছোট্ট একটু বক্তৃতা করিয়াছিলাম—বাঙ্গালায়। তাহাতে আমার খুব প্রশংসা হইয়াছে। বহু লোক আমার সহিত পরিচয় করিতে আসিয়াছেন ও শহরে সর্বত্র আমার বক্তৃতার বিষয় আলোচিত হইয়াছে।

গতকল্য ১লা জানুয়ারী সঙ্গীত সমিতির বার্ষিক অধিবেশন হইয়াছে। জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব—সেখানে সভাপতি ছিলেন। তিনি খুব শিক্ষিত ও ভদ্রলোক। সেই সভায় আমি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "বন্দীবীর" বলি। তাহাতেও আমার খুব প্রশংসা হইয়াছে। সভায় তোমার বাবা উপস্থিত ছিলেন। একখানা Program [য] পাঠাইতেছি। অদ্য বলুর পত্র পাইলাম—তোমার বাবা চলিয়া যাইবার পর। তুমি ভাল আছ শুনিয়া পরম আনন্দিত হইলাম। তুমি এখন Chimer 6 দিনে ২ বার করিয়া কয়েকদিন ব্যবহার করিও। ৩/৪ দিন পরে ১ দিন ব্যবহার করিলেই চলিবে। ভাত এখন খুব কম—ও খুব সিদ্ধ খাইবে। পথ্য যুষ এখনও করিবে। ডিম্ব ও দুগ্ধ যথাসাধ্য খাইবে। ফল খাইতে পারিলে ভাল।

তোমার এবারকার পত্র পাইয়া আমি নিরতিশয় আনন্দিত হইয়াছি সত্য কিন্তু পত্রখানি পড়িতে আমার চক্ষের জল আসিয়াছে। তুমি যে আমাকে মনের ইচ্ছা সত্ত্বেও আমোদ ফেলিয়া যাইতে নিষেধ করিয়াছ তাহাতে যে তোমার ত্যাগের কথা ভাবিতেছি আর আমার মন উদাস হইতেছে। কিরণ, দেখ, তোমরা স্ত্রীলোক তোমরা যেমন অতি সহজে সকল সুখের আশা

ছাড়িতে পার, আমরা স্বার্থপর, —আমরা পারি না। নারীজাতির এই চিরন্তন ত্যাগস্বীকার তাহাদিগকে আমাদের বহু উর্ধ্বে রাখিয়াছে।

সত্য বটে তুমি আমাকে থাকিতে অনুমতি দিয়াছ। কিন্তু এই প্রবল আমোদ ও [...] আস্বাদের মধ্যে আমার মনে নিরন্তর তোমার বিষণ্ণ মুখচ্ছবি জাগিতেছে। কাল পর্যন্ত আমার কাজ শেষ হইবে। তারপর ৭২ ঔষধ তৈয়ার করিতে হইবে—তারপরে যেরূপ শরীর ক্লান্ত তাহাতে বিশ্রাম নিতান্ত প্রয়োজন। হয় এখানেই ২ দিন বিশ্রাম করিয়া যাইব নয়তো একেবারে Buxar গিয়া বিশ্রাম করিব।

এখন প্রতিদিন শত আনন্দের মধ্যে মনের ভিতর যেন একটা কি ভার আছে। "বিরহ" যে কি তাহা ভাল জানিতাম না। অবশ্য বন্ধুবান্ধবদের সহিত ছাড়াছাড়িতে অনেক কষ্ট অনেক বার পাইয়াছি কিন্তু এখন যথার্থ বুঝিতেছি যে ছাড়াছাড়ি [...] প্রতিদিনের প্রভাতের সহিত মনে পড়ে। আর সায়ংকালে যখন শীতসিক্ত চন্দ্রালোক—শুভ্র চন্দ্রকিরণ সমস্ত প্রকৃতির উপর স্তব্ধভাবে নিজের সৌন্দর্য্য শোভা বিস্তার করিতে থাকে তখনই মনটা নিতান্ত দুঃখিত হইয়া ওঠে। তখন মনের ভিতরটা যেন যথার্থভাবে কাঁদিয়া ওঠে। কয়দিন বা তোমার নিকট হইতে আসিয়াছি—অথচ এই কয়দিনেই মনটা এমন হইয়া উঠিয়াছে। বিশেষ এবার তোমাকে যে রোগক্ষীণ দেখিয়া আসিয়াছিলাম—কেবল তাহাই মনে পড়ে আর মনে পড়ে তোমার উত্তপ্ত কপাল ও কপোল—এখনও যেন ইচ্ছা করে ধীরে ধীরে হাত বুলাইয়া দেই। মনে হয় এখন তুমি আমার শরীরে ভর দিয়া—তোমার দুর্ব্বল দেহের ভার আমার উপর দিয়া চন্দ্রালোকে একটু সামান্য হাঁটিতে পার। মনে হয় যেন এই শীতের রাত্রিতে—তোমার ক্ষীণ দেহলতা আমার শরীরের উপর এলাইয়া দিতে পারিলে তুমি একটু স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব কর। এই যে সব ছোট ছোট সেবা যাহা আমার পক্ষেও সুখকর ও তোমার পক্ষেও আরামের তাহা আমি কেবল দূরে আছি বলিয়াই তোমাকে করিতে পারি না। আমি চাহি যেন শীঘ্র গিয়া নানারূপে তোমাকে প্রফুল্ল করিয়া তুলিতে পারি। যেন চন্দ্রালোকে তুমি আমার স্কন্ধে ভর দিয়া হাঁটিতে পার। ইতি

তোমার ক্ষিতি[৮০]

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গো পরিচয়ের প্রস্তুতিপর্ব

১৯০২ সালে এম.এ. পাস করার পর থেকে ১৯০৭ সালে দেশীয় রাজ্য চম্বায় চাকরি করতে যাওয়া পর্যন্ত সময়কাল সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট হবে এমন তথ্য হাতে নেই। অধ্যাপক ভবতোষ দত্ত বলেছেন,

> শিক্ষা সমাপ্ত করে ক্ষিতিমোহন নানাবিধ কাজে নিযুক্ত হয়েছিলেন। গ্রামের বিদ্যালয়ে বিনা বেতনে তিনি দুই-তিন বছর কাজ করেন। তারপর কলকাতার মেডিকেল কলেজেও তিনি কিছুদিন অধ্যয়ন করেন। ...মেডিকেল কলেজে বিধানচন্দ্র রায় তাঁর সহাধ্যায়ী ছিলেন।[৮১]

ড. ভবতোষ দত্ত এ কথাও লিখেছেন যে পল্লিসেবার কাজে সহায়তা হবে বলে তিনি ডাক্তারি পড়তে গিয়েছিলেন। তবে এ সম্পর্কে এর বেশি কিছুই জানি না। অধ্যাপক দত্তের ধারণা অনুসরণে বলছি যে মনে হয় নিজের অসুস্থতা এবং তাঁর বড়োদাদার আকস্মিক মৃত্যুর কারণে ক্ষিতিমোহন বেশিদিন মেডিকেল কলেজে পড়তে পারেননি।

এই অসুস্থতা প্রসঙ্গে এইটুকু বলি, মনে হয় এই সময়ে তাঁর হার্নিয়া অপারেশন হয়েছিল। এর একটু ইঙ্গিত বোধ করি আছে কিরণবালাকে লেখা চিঠিতে। এর ঠিক আগেই যে চিঠি থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছি, সেই চিঠিরই শেষে ক্ষিতিমোহন লিখেছিলেন : 'এখনও এই কলিকাতা হইতে মনে হইতেছে চলিয়া আইস, তুমি চলিয়া আইস—এই hospital-এ যখন রোগক্লিষ্ট হইয়া শুইয়া থাকিব তখন তোমার হস্তস্পর্শ আমার ললাটদেশে সকল বেদনার অবসান করিবে।'[৮২] মন তখন দুর্বল বলেই হয়তো ভাবের আবেগ এমন গভীর। অবশ্য এই প্রথম বয়সে স্ত্রীকে লেখা ক্ষিতিমোহনের কোন্ চিঠিই বা আবেগবর্জিত!

এইসময় ক্ষিতিমোহন চাকরির চেষ্টাও যে করছিলেন তার প্রমাণ পাই তাঁরই পরবর্তীকালের মন্তব্যে। কাশীতে অধ্যাপনার কাজ যাতে পান সে চেষ্টা চলছিল। এমন প্রস্তাবও ছিল যে তিনি কলকাতায় স্বাধীনভাবে কবিরাজি চিকিৎসা ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করুন। ইতিমধ্যে কিন্তু বড়োদাদা অবনীমোহনের অকালমৃত্যুতে তাঁদের পরিবারে একটা বড়ো রকমের ধাক্কা এসে লেগেছে। শোক তো ছিলই, ক্ষিতিমোহনের গভীর শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা ছিল বড়োদাদার প্রতি, কিন্তু এখন এই অঘটনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর উপরে সংসারের আর্থিক দায়ভাগ স্বীকারের এক অলিখিত শমনও জারি হয়ে গেল। অনতিবিলম্বে ক্ষিতিমোহন দেশীয় রাজ্য চম্বায় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের চাকরি নিয়ে চলে গেলেন।

কিন্তু তার মাস চোদ্দো-পনেরো আগে সোনারঙ্গে কালীমোহন ঘোষের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়েছিল, সেই ঘটনাটুকুর মধ্যেই শান্তিনিকেতনের ভূমিতে ক্ষিতিমোহনের জীবন-প্রতিষ্ঠার বীজ আছে। তাঁর নিজের লেখায় এই ঘটনার যে বিবরণ আছে তা হল, সেটা স্বদেশি আন্দোলনের যুগ, গ্রামেও ছড়িয়ে পড়েছে আন্দোলনের ঢেউ। তখন গ্রীষ্মকাল, বৈশাখ মাসে গ্রামে এসে খবর পেলেন একদল স্বদেশি বক্তা এসেছেন, দলের যিনি প্রধান তাঁর নাম কালীমোহন ঘোষ। মানুষটির শরীর অপটু কিন্তু তাঁর উৎসাহ প্রচুর। আলাপ ও ঘনিষ্ঠতা হতে দেরি হল না, কালীমোহন তাঁর ছোটো ভাইয়ের মতো হয়ে গেলেন। রবীন্দ্রনাথের তিনি পরম ভক্ত এবং তাঁর সঙ্গে, তাঁর পল্লিউন্নয়নের কাজের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ আছে জেনে যেমন আকর্ষণ বোধ করলেন ক্ষিতিমোহন, কালীমোহনও তেমনই ক্ষিতিমোহনের মুখে রবীন্দ্র-কবিতা শুনে তাঁকে আর ছাড়তে চাইলেন না। গ্রামে গ্রামে তাঁকে সঙ্গে নিয়ে বক্তৃতা করে বেড়াতে লাগলেন। সারা বিক্রমপুরে তাঁর স্বদেশি বক্তৃতা ছিল। গ্রীষ্মের শেষে কাশীতে ফিরে গেলেন ক্ষিতিমোহন, দুজনে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল।[৮৩]

কালীমোহনই প্রথম রবীন্দ্রনাথকে ক্ষিতিমোহনের কথা বলেন। আর যাঁরা ক্ষিতিমোহনকে চিনতেন তাঁরাও কেউ কেউ এর পরে বলেছিলেন হয়তো। ক্ষিতিমোহন নিজে লিখেছেন :

> আমার কথা কবি জানলেন কার কাছে? শ্রদ্ধাস্পদ রামানন্দবাবু (প্রবাসী সম্পাদক)? বন্ধুবর চারু বন্দ্যোপাধ্যায়? আমার কাশীর [illegible]তীর্থ বিধুশেখর ভট্টাচার্য? অথবা কালীমোহন ঘোষ? হয়তো সবাই কিছু কিছু বলে থাকবেন, কিন্তু কালীমোহনই বেশী।[৮৪]

রবীন্দ্রনাথের তো শান্তিনিকেতনের জন্য উপযুক্ত মানুষ খুঁজে বেড়ানোর শেষ ছিল না। ঠিক এই সময়ে কঠোর শৃঙ্খলাবোধ আনার তাগিদে শুকনো নিয়মকানুনের শিকলে যেন বাঁধা পড়ে গিয়েছিল আশ্রম-বিদ্যালয়। ২ জানুয়ারি ১৯০৮ ভূপেন্দ্রনাথ সান্যালকে একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লেখেন :

> কতর্ব্যবায়ুগ্রস্ত লোক জগতে দুর্লভ নয়; কিন্তু যথার্থ ভক্তিবস গভীর অন্তঃকরণের লোকের জন্য আমি হাৎড়ে বেড়াচ্চি—আপনাকে তেমন লোক আর একটি দিতে পারলে আমার বড় পবিতৃপ্তি হত। একবার যে সেই শরৎ চৌধুরী বলেছিলেন এখানে বাজনাবাদ্য দীপমালা সব আছে কিন্তু বর নেই সেকথা আমি ভুলতে পাবি নে। ...ভূপেনবাবু, মনকে কাজের মধ্যে শুষ্ক হতে দেবেন না—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উন্মুক্ত অমৃতসাগরের মধ্যে তাকে ডুবিয়ে নেবেন তাহলে সমস্তই সহজ হয়ে যাবে...অন্তর বাহির সমস্ত প্রসন্ন হবে। সেখানে প্রসন্নতাই জীবনের শ্রী—তার অভাব যেখানে সেখানে লক্ষ্মী নেই—সেখানে সমস্তই অপরিচ্ছন্ন এবং দরিদ্র—সেখানে কৃতকার্যতাও লাবণ্যহীন।[৮৩]

ভূপেন্দ্রনাথ নিজে তো সাধকপ্রকৃতির মানুষ, অন্তরের সেই তাগিদে কিছুকাল পরে তিনি আশ্রম ছেড়ে যান। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে তাঁরই একটি সমযোগ্য সহকারী সন্ধানের চেষ্টায় আছেন রবীন্দ্রনাথ। এমন সময় ক্ষিতিমোহনের সন্ধান পেয়ে তিনি উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। কবে কালীমোহন বললেন রবীন্দ্রনাথকে? ক্ষিতিমোহনের সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর তখন এক বছরেরও বেশি সময় পার হয়ে গেছে এবং তার মাস সাতেক আগে ক্ষিতিমোহন চাকরি নিয়ে চম্বা চলে গেছেন। সে-বার পাবনায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতির সভা হল ১১ ফেব্রুয়ারি ১৯০৮, বাংলা তারিখ ২৮ মাঘ ১৩১৪। সেই সভায় সভাপতিত্ব করতে এসে কালীমোহনের মুখে রবীন্দ্রনাথ ক্ষিতিমোহনের কথা শুনলেন। এই যুবক কালীমোহনের গ্রামের কাজে উৎসাহিত হয়ে তাঁর সঙ্গে গ্রামে গ্রামে ঘুরেছেন এবং শাস্ত্রজ্ঞ হয়েও তিনি উদার মতের মানুষ, প্রথাবদ্ধ সনাতন ধর্মের সংকীর্ণতায় আবদ্ধ নন, এ কথা জেনে তাঁকে শান্তিনিকেতনে আনবার জন্য গভীর আগ্রহ জন্মাল মনে। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে তাঁর অমৃতসরের ঠিকানায় চিঠি লিখলেন। কিছুদিন পরে আর-একটি চিঠিতে কালীমোহনের লোকপ্রেম কীরকম স্বভাবসিদ্ধ সে কথা লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, সেই সঙ্গে ক্ষিতিমোহন-প্রসঙ্গও এসে গেল। রবীন্দ্রনাথ লিখলেন :

> এই ছেলেটির কাছ থেকেই ক্ষিতিমোহনবাবুর কথা আমি প্রথম শুনি। তাঁর সাহিত্যানুরাগ ও বিদ্যাবুদ্ধির কথাতেই যে আমি উৎসাহিত হয়েছি তা নয়, এঁর মধ্যেও ঐ লোকপ্রেমের সংবাদ পেয়েছি। ইনিও এই বালকটির সঙ্গে গ্রামে গ্রামে কাজ করে ফিরেচেন—লোকসেবার উৎসাহ তাঁর পক্ষে যে কি রকম স্বাভাবিক সেইটে জেনেই আমি তাঁকে বোলপুরে আবদ্ধ করতে এত উৎসুক হয়েছি।

এই চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ আরও লিখলেন :

> তিনি যদিও প্রাচীন শাস্ত্রজ্ঞ, তথাপি আচরণে তিনি অত্যন্ত উদার। তিনি বলেন এই ঔদার্য তিনি শাস্ত্র হতেই লাভ করেচেন। হিন্দুধর্ম্মকে যাঁরা নিতান্ত সংকীর্ণ করে অপমানিত করেন তাঁদের

> মধ্যে এঁর দৃষ্টান্ত হয়ত কাজ করবে। অন্তত ছাত্রদের মনকে সঙ্কীর্ণতা থেকে মুক্ত করবার পক্ষে ইনি অনেকটা সাহায্য করতে পারবেন।[৮৬]

শান্তিনিকেতনে ভেদ ঘোচানোর শিক্ষারই প্রবর্তন করতে চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের ভেদ, মানুষের সঙ্গে মানুষের ভেদ, তার অধীত বিদ্যার সঙ্গে জীবনাচরণের ভেদ, ভারতের সনাতন ধর্ম-দর্শন-ঐতিহ্য-সংস্কৃতির সঙ্গে তার লোকজীবনের ভেদ, এর কোনোটাই যে স্বাভাবিক নয় তা তাঁর অজানা ছিল না। ক্ষিতিমোহনকে তো তখনও চোখে দেখেননি, তবু তাঁর সম্বন্ধে যেটুকু জেনেছিলেন তাতেই আশা করছিলেন ক্ষিতিমোহনের জীবনাচরণের ঔদার্য বিদ্যালয়ের ছাত্রদের প্রভাবিত করবে, সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত করবে তাদের মনকে। এম.এ. ডিগ্রিধারীর শরণাপন্ন হওয়ার মন ছিল না, ভাবুক চিত্তের স্পর্শ পাওয়ার জন্য উৎসুক হয়ে উঠেছিল তাঁর চিত্ত।

> বিদ্যালয়ে ভাবের প্রবাহ সত্যরূপে জাগ্রত করতে হলে ভাবুকের প্রয়োজন, বিদ্বানের নয়। ...আমাদের বিদ্যালয় থেকে ভাবুকতার অভাব না ঘোচাতে পারলে এর মধ্যে জীবনসঞ্চার করতে পাবব না—এ আমি নিশ্চয় জানি—ক্ষিতিমোহনবাবু নীরস কর্তব্যনিষ্ঠ নন—তাঁর চিত্তে ভাবরসের প্রবল আবেগ আছে এই সংবাদটি পেয়ে আমি তাঁর সম্বন্ধে উৎসাহিত হচ্ছি।[৮৭]

ক্ষিতিমোহনের শতবার্ষিকী উপলক্ষে লিখিত একটি প্রবন্ধে অধ্যাপক ভূদেব চৌধুরী এই চিঠির প্রসঙ্গ ধরে বলেছিলেন :

> ক্ষিতিমোহনের পরিপূর্ণ ভাব-অবয়বটি রবীন্দ্রনাথের মনের চোখেই ধরা পড়েছিল আদ্যোপান্ত; তখনও তিনি শান্তিনিকেতনের সেবাব্রতী হন নি, কবি কেবল তাঁকে ডাক দিয়েছেন সেই সাধনায়।

এই প্রসঙ্গসূত্রেই এই প্রবন্ধের আর-একটি মন্তব্যের বিশেষ দ্যোতনাটুকু মনকে আকৃষ্ট করে। অধ্যাপক চৌধুরী লিখেছিলেন :

> রবীন্দ্রনাথ সেদিন মগ্ন বিস্ময়ে ক্ষিতিমোহনকে আবিষ্কার করছিলেন; ব্যক্তিকে নয়, ব্যক্তিচরিত্রের গভীরে তাঁর চিরস্বপ্নের মানুষের ধর্মকে—যা নিরন্তর ধারায় যুগ যুগ ব্যাপী মানব-ইতিহাসের বহমানতা।[৮৮]

যে আর্তিতে কিশোরবয়স থেকেই ক্ষিতিমোহন বিদ্যাদেবীর সুপ্রতিষ্ঠিত মন্দির ছেড়ে লোকজীবন ও লোকধর্মের গভীরে তাঁর জীবনপথের নিশানা খুঁজেছেন সে তো এই চিরপ্রবহমান মানুষের ধর্মকে খোঁজার আর্তি। শান্তিনিকেতনে এসে একঅর্থে তাঁর সেই অন্বেষণ রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্য পেয়ে আরও সুস্পষ্ট লক্ষ্য অভিমুখী হয়েছে। আর রবীন্দ্রনাথ তাঁকে আহ্বান করে আশা করছিলেন তাঁর মতো মনে-প্রাণে ভাবুক একটি মানুষের সান্নিধ্যে শান্তিনিকেতনে মানবজমিন কর্ষণের কাজ আরও ভালো করে হতে পারবে। শান্তিনিকেতনের ছাত্রদের মাঠের মধ্যে নির্জনে শিক্ষা দিয়েও তাদের সত্য অর্থে লোকজীবনের উপযোগী করে গড়ে তোলবারই সংকল্প ছিল। 'ওরা যদি সাধারণ শিক্ষিত

বাঙালীর মত বইপড়া ভালোমানুষ লোক হয়ে ওঠে—ওদের অন্তঃকরণ যদি সত্যভাবে মানবপ্রেমে অভিষিক্ত না হয়ে ওঠে তাহলে আমাদের চেষ্টা ব্যর্থ হবে।'[৮৯]

কিন্তু আহ্বান যখন এল, ক্ষিতিমোহনের সামনে শান্তিনিকেতনের কাজে যোগ দেওয়ার নির্বাধ পথ খোলা ছিল না। রবীন্দ্রনাথের আহ্বান পেয়ে প্রথমে সব দিক বিবেচনা করে তিনি নিজেই এ কাজ গ্রহণে তাঁর অক্ষমতা জানিয়েছিলেন। আগেই বলেছি, তখন অকালে অবনীমোহনের মৃত্যুতে তাঁকেই সংসারের হাল ধরতে হয়েছে, দাদার বিধবা স্ত্রী ও নাবালক সন্তানদের অনেকটাই দায়িত্ব তাঁর উপরে। শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতে আগ্রহের অভাব না-থাকলেও সাড়া দেওয়া কঠিন ছিল। তবু অবশেষে সাড়া দিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাড়া আদায় করে নিলেন। সে কথা বলবার আগে চম্বার কথা বলি।

চম্বায়

ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে কাশ্মীরের পূর্বপ্রান্তে হিমালয়ের কোলে পাহাড়-ঘেরা এক ছোটো করদ রাজ্য চম্বা।[৯০] রাজকন্যা চম্পাবতীর আগ্রহে ৯২০ খ্রিষ্টাব্দে ইরাবতী নদীর ধারে চম্বার পত্তন হয়েছিল, এমন কথা বলত অনেকে। আবার সেখানকার লোকমুখের গ্রাম্যকথায় ক্ষিতিমোহন শুনেছিলেন চাঁপাবনের দেশ বলেই চম্বা নাম, চম্বার মালভূমিতে চাঁপা গাছ অনেক দেখা যায়। ইরাবতী নদীর চলিত নাম রাবি। আগেকার কালে তার দুই তীরে ক্রোশের পর ক্রোশ জঙ্গালে ঢাকা ছিল। ক্ষিতিমোহন যখন গেছেন তখন বন কেটে কিছু কিছু চাষ-আবাদ হচ্ছে, লোকালয় গড়ে উঠছে। নদী-উপত্যকায় বনভূমি আর শস্যের খেতে অজস্র সবুজের ছড়াছড়ি। এইখানেই ১৯০৭ সালে ক্ষিতিমোহন এলেন প্রধান শিক্ষক হয়ে। চম্বায় এসে যে নিয়োগপত্র পেলেন তাকে প্রধান শিক্ষকের পদ বলা হয়েছে। অধ্যাপক ভবতোষ দত্তের বইতে আছে শিক্ষাসচিব। সম্ভবত এই পদ শিক্ষাসচিব বা সভাপণ্ডিতের পদ বলেই গণ্য হত। যে-সব কাজের দায়িত্ব ছিল তার প্রথমটা শিক্ষকতা, দ্বিতীয়টা চম্বায় যে-সব টোল ও চতুষ্পাঠী ছিল সেগুলি পরিদর্শন এবং তার পণ্ডিতদের বৃত্তিদানের ব্যবস্থা করা। এ ছাড়া চম্বায় তখন একটা শিল্পসংগ্রহশালা গড়ে তোলবার পরিকল্পনা হয়েছে, ক্ষিতিমোহনের তৃতীয় কাজ ছিল সেই পরিকল্পনা ও তার রূপায়ণে সহায়তা করা।[৯১]

চম্বার সে সময়কার রাজা ভুরি সিং ক্ষিতিমোহনের সমবয়সি, বেশ বন্ধুত্ব হয়ে গেল। রাজার অনুরোধে রোজ খানিকক্ষণ তাঁর সঙ্গে সংস্কৃতকাব্যচর্চা করতেন। তাছাড়াও দিনের মধ্যে অনেকবার দেখা হত রাজার সঙ্গে। তাঁর থাকবার ব্যবস্থা হয়েছিল বিদ্যালয়-সংলগ্ন একটা আলাদা বাড়িতে, তার একদিকে জনবসতি, আর একদিকে সারি সারি পাহাড় আর জঙ্গাল। রাজবাড়ি থেকেই খাবার আসত এবং গৃহকর্মের জন্য ভৃত্য, যাতায়াতের জন্য বাহন, সবই রাজব্যয়ে পাওয়া যেত।

বিদ্যালয় ও দপ্তরের কাজ শেষ হলে রোজ বিকেলের দিকটায় ছাত্রদের নিয়ে বেড়াতে বেরোতেন। নদীর ধারে বেশ বড়ো আকারের একটা পাথর বেছে নিয়ে সকলে তার উপরে বসে সেদিনকার মতো আসর জমাতেন। পথচলতি পরিচিত-অপরিচিত আরও অনেক মানুষও একে একে এসে কাছাকাছি ছড়ানো পাথরের কোনোটায় আসন নিতেন, আলোচনায় যোগ দিতে কারও বাধা ছিল না। তবে খোলা আকাশের নীচে বসে কথাবার্তা বলবার খুব বেশি অবকাশ যে পাওয়া যেত তা নয়। অল্প সময়ের মধ্যেই সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসত, ঠান্ডা বাড়ত ক্রমশ। বাড়ি ফেরবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠতেন সকলে, আসর ভেঙে যেত। অনেকদিন পরে 'যুগগুরু রামমোহন' প্রবন্ধ লেখবার সময় চম্বায় দেখা অত্যন্ত সরল ও অজ্ঞ পাহাড়িদের প্রসঙ্গ ক্ষিতিমোহনের মনে এসেছিল। রামমোহনের ব্যক্তিত্বের বিশালতা ও মহত্ত্ব আমরা ধারণা করতে পারি না, এই প্রবন্ধে এ কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন :

> বহুদিন আগে আমি কিছুকাল হিমালয়ে বাস করিতাম। সেখানকার সরল পর্বতবাসীরা কুড়ির বেশি সংখ্যাই বোঝে না। একদিন নক্ষত্র-মণ্ডলীর বিশালতা ও দূরত্বের কথা উঠিল। কিছুতেই বোঝানো গেল না। পর্বতবাসীরা সরল, না বুঝিলেও তাহারা বিস্মিত হইয়া চাহিয়া রহিল। আর আমাদের ধারণাশক্তি বিশাল না হইলেও আমরা যে সুচতুর; তাই বিস্ময়ের বদলে এইরূপ ক্ষেত্রে অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া বলিয়া উঠি, 'তিনি এমনই কি বড় ছিলেন?' সরল পর্বতবাসীর মত বিস্ময় প্রকাশ করিবার মহত্ত্বও যে আমাদের নাই।[৯২]

নতুন শিক্ষকটিকে ছাত্ররা ভালোবাসত। একবার কয়েকটা দিন অনধ্যায় ছিল, ক্ষিতিমোহনকে সেই কদিনের জন্য নিজের এবং বিদ্যালয়ের প্রয়োজনে অমৃতসরে আসতে হল। তখন চম্বা থেকে দীর্ঘ পার্বত্যপথ পেরিয়ে আসতে হত অমৃতসরে, তার জন্য ঘোড়াই ছিল একমাত্র বাহন। ক্ষিতিমোহন ঘোড়ায় চড়ে এলেও তাঁর সঙ্গপিপাসু ছেলের দল তাঁর সঙ্গে সঙ্গে পায়ে হেঁটে পথ চলত। ক্ষিতিমোহনও হাঁটতেন তাদের সঙ্গে, আবার কখনও ঘোড়াতে উঠতেন। তাঁর পথের সাথী সেই তরুণ ছেলেগুলোর-না ছিল ক্লান্তি আর না ছিল উৎসাহের অভাব।[৯৩]

কাশীতে থাকতে কথকতা শুনতে ভালোবাসতেন, আর চম্বায় এসে পেলেন গল্পের আসর। নিজে মিশুক প্রকৃতির মানুষ, যেমন রোজ ছাত্রদের নিয়ে বৈকালিক অবকাশে নানান আলাপ-আলোচনায় আড্ডা জমিয়ে বসতেন, তেমনই চম্বাবাসীদের জমাট গল্পের আসরে নিয়মিত গিয়ে হাজির হতেন। এই তাঁর স্বভাব, যেখানেই যাবেন জেনে নেবেন সেখানকার কী বৈশিষ্ট্য, কোন্ কোন্ সম্প্রদায়ের মানুষ সেখানে বাস করে, কেমন তাদের সমাজের গঠন, কেমন তাদের সামাজিক রীতিনীতি আচারব্যবহার। তিনি দেখবেন তাদের শিল্প-স্থাপত্য, মঠ-মন্দির, পুথিপত্র, আলাপ করবেন মানুষের সঙ্গে, গান শুনবেন। চম্বাতে স্বভাব অনুযায়ীই চলেছিলেন প্রথম থেকে। দেখলেন ওখানকার সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা, শিল্প-সংস্কৃতি। শীতের দেশ, কাজের পরে মানুষজন সব একসঙ্গে জটলা বেঁধে বসে গল্প শুনতে ভালোবাসে, ভালো গল্পবলিয়ের কদর খুব, দক্ষ কথক সম্মান পান। ক্ষিতিমোহনের

নিজের শোনা ও সংগ্রহ করা সব যুদ্ধকাহিনি, রাজপুরুষদের উপাখ্যান, ভূতের গল্প পরে শান্তিনিকেতনে বলতেন, কখনও বা লেখাতেও তারা জায়গা করে নিয়েছে। রাজা রসালুর কাহিনি যেমন।[৯৪]

কাশীতে হরিকিশোর তর্কবাগীশ ছিলেন এক অসামান্য নৈয়ায়িক এবং বীণকার। ক্ষিতিমোহন তাঁকে জানতেন। 'ন্যায়শাস্ত্র ও সঙ্গীতশাস্ত্রের এমন অপূর্ব সমন্বয় বড় একটা দেখা যায় না।' তর্কবাগীশমশাই একবার বৈরাগ্যবশে ভারতের নানা তীর্থে ভ্রমণ করেন। অনেক দিন আগেই তাঁর কাছে ক্ষিতিমোহন হিমালয়ের দুর্গম তীর্থগুলির কথা শুনেছিলেন। বিশেষ করে হরগৌরী তীর্থ আর সেখানকার উচ্ছিষ্ট দেবীর কথা তাঁর মুখে শুনে সেই তীর্থ ও মন্দির দেখবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা ছিল, কিন্তু তখন ভাবতেই পারতেন না যে সত্যই জীবনে তা দেখবার সুযোগ তাঁর হবে। অনুমান করি, চম্বার চাকরিকালেই ক্ষিতিমোহন এই উচ্ছিষ্ট দেবীর মন্দির দেখতে যান, দেবীর নাম জল্পা-ভবানী। যে-প্রবন্ধে এ-প্রসঙ্গ আছে তাতে তিনি উল্লেখ করেছেন তখন তিনি ঘটনাক্রমে হিমালয় প্রদেশে ইরাবতী উপত্যকায় গিয়েছিলেন। 'দুনেরা' নামে এক ডাকবাংলায় এক সাহেবের সঙ্গে আলাপ হল। ইরাবতী নদীরই ধারে তবে অনেকটা উপরে খাজিয়ার বলে এক হ্রদের তীর থেকে কিছু দূরে বিশাল বিশাল দেবদারু গাছের ছায়ায় সেই অতি প্রাচীন দেবীমন্দির, সেই সাহেবের মুখে শুনলেন এ-গল্প। দেবীকে যে ভোগ দেওয়া হয়, প্রথম রাতে বনের হিংস্র ভালুকরা এসে খেয়ে যায় সেই ভোগ, প্রত্যেকদিন উৎকৃষ্ট মধু দেওয়া হয় ভোগে, হয়তো তারই লোভে ওরা ভোগ খেতে আসে। কিন্তু মন্দিরের আশে-পাশে কিংবা ভিতরে কখনও কোনো যাত্রীকে আক্রমণ করে না আর সেখানে শিকাব নিষিদ্ধ বলে নিজেরাও নিরাপদ থাকে। শিকার নিষেধের ব্যাপারেই সাহেবের ক্ষোভ। সন্ধান পাওয়ার কিছুদিন পরে ক্ষিতিমোহন সেই মন্দিরে যাওয়ার সুযোগ পেলেন। অনেক সাধুসন্তের সমাগম হয় সেই মন্দিরে, সুতরাং তারপর তাঁদের সঙ্গলাভের আশায় মাঝে মাঝেই যেতে লাগলেন। সেখানে এক বৃদ্ধ সাধুর মুখে আর এক উচ্ছিষ্ট দেবী ও তাঁর এক কুমারী সাধিকার আশ্চর্য বৃত্তান্ত শুনেছিলেন, প্রবন্ধে তার বিবরণ দিয়েছেন। কিন্তু অল্পদিন পরেই ওখান থেকে চলে আসেন বলে তাঁর নিজের আর সেখানে যাওয়া হয়নি।[৯৫]

জ্বালামুখী রোড স্টেশন থেকে জ্বালামুখী তীর্থ মাত্র তেরো মাইল দূর। আগে সেখানে যেতে হলে অমৃতসর এসে সেখান থেকে পাঠানকোট হয়ে বহু পথ টাঙ্গায় গিয়ে তবে গন্তব্যে পৌঁছনো যেত। চম্বা থেকে দুবার ক্ষিতিমোহন গিয়েছিলেন, দুবারই এই তীর্থের পথে বাঙালি বৃদ্ধা তীর্থযাত্রিণীদের দেখতে পেয়ে বিস্মিত হয়েছিলেন। এই তীর্থের পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি লিখেছেন : 'হিমালয়ের কাংড়া প্রদেশের পাদমূলে প্রসিদ্ধ জ্বালামুখী তীর্থ। এখানে শারদ ও বাসন্তী নবরাত্রে খুব বড় মেলা হয়। এখানে দেবী মন্দিরে একটি অগ্নিশিখাকেই শক্তিরূপে অর্চনা করা হয়।' প্রসঙ্গত কাংড়ার চিন্তাপর্ণী ও বিদ্যেশ্বরী মন্দিরও যে সুপ্রসিদ্ধ সে-কথা বলেছেন, সম্ভবত গিয়েছিলেন। আর এক খুব প্রাচীন মন্দিরেরও উল্লেখ করেছেন, ১৮৯৭ সালের ভূমিকম্পে সে মন্দির ভেঙে যায়।[৯৬]

কাশ্মীরের পূর্বভাগে চম্বা ও অন্যান্য জায়গায় বহু নাগদেবীর মন্দির আছে, কোথাও কোথাও এই নাগদেবীর পূজা সম্পন্ন হয় অতি সমারোহে। ক্ষিতিমোহনের এই প্রবন্ধে সে প্রসঙ্গ ছাড়াও চণ্ডী প্রভৃতি দেবীর অত্যন্ত প্রাচীন সব মন্দির-প্রসঙ্গ আছে, রাবি নদীর কাছে হাজার হাজার বছরের প্রাচীন দেবদারু গাছের ছায়ায় ঢাকা ঘন বনের মধ্যে দেবী জল্পা ভবানীর মন্দিরের কথাও আছে। সে মন্দিরে মাঝে মাঝেই যেতেন ক্ষিতিমোহন, বলেছি সে-কথা। তাঁর লেখায় শুধু যে শক্তিস্বরূপিণী দেবীর কথা আছে তা মোটেই নয়, এই মর্তধামের মেয়েদের কথাও যথেষ্ট আছে।

চম্বার মেয়েদের রীতিমতো প্রশংসা ক্ষিতিমোহনের লেখায়, তারা যেমন সুন্দরী তেমনই পরিশ্রমী, তাদের অনায়াস গতিবিধি-কাজকর্ম চোখে না পড়ে যায় না। ফসল খেতে, খামারবাড়িতে তারাই বেশি কাজ করে। গোশালার রক্ষণাবেক্ষণ থেকে গোরু দোওয়া সবই ওদের কাজ। ক্ষিতিমোহন দেখেছিলেন এত পরিশ্রম করেও লোকসংগীত এবং লোকনৃত্যের সমবেত চর্চাকে তারা সজীব করে রেখেছে। সেই যে কাজের প্রয়োজনে বেরিয়ে দুনেরা ডাকবাংলায় আশ্রয় নিয়েছিলেন, মুগ্ধ করেছিল চারপাশের প্রাকৃত শোভা, সারারাত পার্বত্য নদীর স্রোতধ্বনি গানের মতো কানে বেজেছিল। আবার সকালবেলা পথ চলতে চলতেই নজরে পড়েছিল কাঠের বোঝা মাথায় নিয়ে যাচ্ছে তেরো-চোদ্দো বছরের এক মেয়ে। মনের মধ্যে তার সৌন্দর্য-ছবিখানি যেন চিরকালের পটে আঁকা হয়ে গিয়েছিল। লিখেছেন : "মনে হল যেন কুমারী ভবানী। খ্যাঁদা বোঁচা পার্বত্য কন্যা নয়। এ একেবারে টিকুলো নাক, এবং 'তরুণ হরিণ-নেত্রা'। এ-হয়তো কাদম্বরী-বর্ণিত কুলুতেশ্বর দুহিতার দেশের মেয়ে। কী অপূর্ব রূপ!"[৯৭]

তখন চম্বার মতো হিন্দু রাজ্যে মেয়েরা সর্বত্র স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়াতে পারত। ক্ষিতিমোহনের লেখায় পাই :

> তুষার গলিয়া গেলে সমস্ত বৃক্ষলতা ও পর্ব্বতগাত্র একেবারে হঠাৎ ফুলে ফুলে ঢাকিয়া যায়। সেইরূপ সময়ে সেই দেশে অতুলনীয় বসন্ত উৎসব। বৈশাখের প্রথমে এই উৎসবে একটি দিন আছে যেদিন নারীরাই সর্ব্বেসর্ব্বা—এই দিন মাধব উৎসব। যে কোনো পুরুষকে ধরিয়া তাঁহারা যে কোনো প্রকারে নিগ্রহ করিতে পারেন—তাহাতে বিন্দুমাত্র আপত্তি করিলে নারীগণ তাহাকে কঠিন অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করিতে পারেন। রাজার শক্তিও সেই দণ্ডকে রোধ করিতে পারে না। সেইদিন রাজাও ভয়ে ভয়ে আপনাকে প্রচ্ছন্ন রাখেন।[৯৮]

এই মাধব উৎসবের দিনে ক্ষিতিমোহনকেও বেশ দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছিল। তখন বসন্তকাল সমাগত, আর বরফ পড়ছে না, নবজীবনের রং লেগেছে গাছপালায়। যদিও পথের এধারে-ওধারে তখনও এখানে-ওখানে বরফ জমে আছে। 'দশ দিক তুষারমুক্ত প্রসন্ন দেখিয়া অপরাহ্নকালে আমি জল্লাভবানীর সেই দেবদারু অরণ্যে বেড়াইতে বাহির হইলাম।' তখনও মাধব উৎসবে নারীদের আধিপত্যের ব্যাপারটা কিছুই জানেন না, জানেন না যে এই দিন ভবানী মন্দিরেও স্থানীয় মেয়েদেরই সর্বময় কর্তৃত্ব এবং সেখানে তারা নাচগান করে। এমন বিপজ্জনক দিনে নির্বোধের মতো তাঁকে বাড়ির বাইরে যেতে দেখে এক বন্ধু নিজের বিপদ তুচ্ছ করে তাঁকে অনুসরণ করলেন। তিনি অনেকদিন আছেন

ওদেশে, সুতরাং ওখানকার আচার-আচরণ তাঁর জানা। কিন্তু তিনি যখন বেরোলেন তখন ক্ষিতিমোহন চম্বা নগরের অনেকখানি নীচে রাবি নদীর সেতুর উপরে। ওপারে পৌঁছে পাহাড়ে উঠে তিনি যখন দেবীভবানীর বনে ঢুকেছেন তখন সেই বন্ধু এসে তাঁকে ধরলেন। তাঁর মুখে ব্যাপার শুনে জল্লা-ভবানীর মন্দিরে না গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা ফিরতি পথ ধরলেন। চলাচলের পাকা রাস্তা ছেড়ে দুর্গম পাকদণ্ডী ধরে চুপি চুপি নেমে আসছেন, যাতে কারও চোখে পড়ে না যান, এমন সময় হঠাৎ দেখলেন একদল তরুণী তাঁদের পথরোধ করে দাঁড়িয়ে। বন্ধু বললেন : 'এই জায়গাটাও দেবীর ক্ষেত্রের মধ্যে, সেজন্য এরা ততটা নিগ্রহ না করতেও পারে। কিন্তু যা-ই করুক যেন আপত্তি করবেন না, তাহলে কপালে কঠিন দণ্ডভোগ থাকতে পারে।' মেয়েরা তাঁদের গ্রেফতার করে এক মুহূর্ত ভাবল কী করা যায়, তারপর পথের ধার থেকে খানিকটা করে বরফ তুলে নিয়ে দুজনেরই ঘাড়ের দিক দিয়ে গরম কোটের ভিতরে ঢুকিয়ে দিল। প্রচণ্ড শৈত্যের একটা অনুভব নামতে লাগল মেরুদণ্ড বেয়ে—'মাথায় আহত সর্পের মতো দেহটা মোচড়াইতে চাহিল, অনেক কষ্টে উভয়ে চাপিয়া রহিলাম। কিছুমাত্র আপত্তি জানাইলাম না, মেয়েরা কি ভাবিয়া উচ্চ হাসিয়া দয়া করিয়া আমাদের ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। রক্ষা পাইলাম।'[৯৯]

তখন বিস্মিত এবং বিচলিত হয়েছিলেন, কিন্তু পরে তো আরও নানা অভিজ্ঞতা হয়েছে ভারত পরিক্রমায় বেরিয়ে, তাঁর লেখাব মধ্যে তার কতটুকুরই বা পরিচয় আছে। এও জানা হয়েছিল যে চম্বা এবং তার আশপাশের অঞ্চলে সে-সময়ও স্মৃতিযুগেরও বহু পূর্ববর্তী বৈদিককালের মতো সব সামাজিক বিধিবিধান প্রচলিত। আর দেখলেন বৃহন্নন্দিকেশ্বরপুরাণ, দেবীপুরাণ ও কালিকাপুরাণ মতে সেখানে দেবীপূজা হয়ে থাকে। বহুদিন পরে 'হিন্দু সংস্কৃতির স্বরূপ'-এ এই-সব চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা তাঁর আলোচনায় এসেছে। খোঁজ নিয়ে জেনেছিলেন বাংলাদেশ থেকে মুসলমানের দ্বারা বিতাড়িত হয়ে বল্লাল বংশীয় বাঙালি রাজা বিজয়সেন এখানে এসে রাজ্য জয় করে বসতি করেন। নিজেই টের পেলেন যে তাঁদের একালের ভাষাতেও এক-আধটা পূর্ববঙ্গীয় শব্দে এবং কতক কতক আচারেও মূল বাসভূমির মাটির গন্ধ রয়ে গেছে।

একটা প্রবন্ধ লিখেছিলেন 'কাশ্মীরে তপস্বিনী' নামে। সেটা ১৯৫২ সাল। কাশ্মীর নিয়ে তখন জোর রাজনৈতিক তৎপরতা চলেছে। ক্ষিতিমোহনের মনে হচ্ছিল : '.... এখন ঘন ঘন কাশ্মীর ও তার রাজনীতিওয়ালাদের খবরাখবর আসা-যাওয়া করবে। কিন্তু সে-সব কি কাশ্মীরের মরমের খবর?' এই প্রবন্ধ লেখবার চল্লিশ বছরেরও বেশি আগে তাঁর নিজের জীবনে দুর্লভ সুযোগ এসেছিল কাশ্মীরের মর্মের খবর জেনে নেওয়ার। ইরাবতী নদীর উপত্যকা থেকে ভদ্রওয়ার কিস্তওয়ার দিয়ে যে পথ, সেই পথে তিনি কাশ্মীরে যেতেন। সে-পথের অপরূপ সৌন্দর্যের কথা স্মরণ করে বলেছেন : 'সেই পথের সঙ্গে আমার অনেক অভিজ্ঞতা জড়িত হয়ে আছে।' তখন কারণে-অকারণে তিনি ঘুরে বেড়াতেন কাশ্মীরের গ্রামে-গঞ্জে। ভারতের দক্ষিণ-পূর্ব দিকের একপ্রান্তে নিম্নভূমিতে তাঁর নিজের দেশ, আর উত্তর-পশ্চিম দিকের আর একপ্রান্তে উচ্চ পার্বত্যভূমিতে কাশ্মীর। দুদেশের

আবহাওয়া প্রকৃতি ফল-ফুল-ফসলে কোনো মিল থাকার কথা নয়, তবু বাংলা আর কাশ্মীরের মধ্যে কী যেন একটা নিগূঢ় সম্বন্ধ অনুভব করতেন। মানুষের স্বভাবে জীবনযাত্রায় কুলাচারে বেশ একটু মিল চোখে পড়ত। অবস্থানগত এমন আশমান-জমিন ফারাক সত্ত্বেও মনে হত কাশ্মীরের নদী, সেখানকার নৌকার গড়ন, তার মাঝি এবং মাঝির গানের সুর—সব যেন বাংলা দেশের মতো। কাশ্মীরের শাস্ত্রজ্ঞানের কিছু পরিচয় পেয়েছিলেন, তা থেকেও মনে হয়েছিল এ দেশ বাংলারই মতো সূক্ষ্ম বুদ্ধি বিচারের দেশ। চোখে পড়েছিল বাংলারই মতন এখানেও শৈব আর তন্ত্রশাস্ত্রের আদর। আয়ুর্বেদের রসপাক বিধানে আর জ্যোতিষ গণনা-পদ্ধতিতেও দুদেশের মিল আছে।[১০০]

এই সময়েই দেখেছিলেন কাশ্মীর ও তার কাছাকাছি অঞ্চলে কাতন্ত্র বা কলাপ ব্যাকরণের বহুল প্রচলন। পূর্ববঙ্গে ব্যাকরণ বলতে কলাপ ব্যাকরণই বোঝায়, ক্ষিতিমোহন তাঁর 'চিন্ময় বঙ্গ' বইতে বঙ্গীয় মানস কীভাবে নানা বিচিত্র দিকে ভারতে ও বহির্ভারতে নিজেকে প্রসারিত করে দিয়েছিল, তার বিবরণ দেওয়ার সময় স্মরণ করেছেন চম্বা ও তার চারপাশে দেখা এই ব্যাকরণ ও তার টীকাগুলির প্রসঙ্গ। হিমালয় গাড়বাল প্রভৃতি প্রদেশেও এমনকী কাতন্ত্র ব্যাকরণের বাংলা টীকার আদর ছিল, এও তাঁর নিজের চোখে দেখা। 'চম্বার অন্তর্গত ব্রহ্মপুর গ্রামীয় বৃদ্ধ প্রভাকর বোড় (১৯০৭) মহাশয় কাতন্ত্রের বাংলা টীকার বিষয়ে অভিজ্ঞ ছিলেন। কাশ্মীরের সন্নিহিত পশ্চিম তিব্বতের বৌদ্ধ মঠে লামাদের মধ্যে কোথাও কোথাও কাতন্ত্র প্রকরণের সমাদর আছে।' ক্ষিতিমোহন বইপত্রের প্রামাণ্য ভিত্তিতেই এ-ধরনের কথা বলেন বটে, তবুও তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার জোরটুকুও টের পাওয়া যায়। সেই জোরেই তিনি বলতে পারেন 'কাশ্মীরে প্রথমে দুর্গাসিংহ-বৃত্তি ছাড়াই কাতন্ত্র প্রচলিত হইয়াছিল। সে দেশে দুর্গাসিংহ-বৃত্তি আসে বহু পরে। তাই সেখানে পণ্ডিতেরা দুর্গাসিংহের বৃত্তির সঙ্গে পরিচিত হইবার পূর্বে নিজেরাই কাতন্ত্রের বহু টীকা রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাই তাঁহাদের ক্রম ও বিন্যাস ভিন্ন রকমের।'[১০১]

চম্বা ও তার সন্নিহিত অঞ্চলে এবং তার সংলগ্ন তিব্বতের দিকটায় বহু শতাব্দীর মঠ-মন্দির যে তখনও অটুট, যুগ যুগ ধরে সেখানে যে নিভৃতে শিল্পকলার চর্চা চলছে, বহুকালের প্রাচীন বিদ্যা যে অব্যাহত, নিজের অভিজ্ঞতায় ক্ষিতিমোহনের ধারণা হয়েছিল যে এর কারণ হল এই স্থানের ভৌগোলিক অবস্থান। একে তো দুর্গম পার্বত্য জায়গা, তার উপরে বছরের অধিকাংশ সময় বরফে ঢাকা থাকে। এই-সব অসুবিধা শত শত বছর ধরে এই দিকটাকে বাইরের শত্রুর আক্রমণ থেকে বাঁচিয়েছে, শিখ ও মুসলমান আগ্রাসী বিস্তারলোলুপতার কাছেও নতি স্বীকারে বাধ্য করেনি।

নানা বিষয়ে বাংলার সঙ্গে কাশ্মীরের সাদৃশ্য খুঁজে পেলেও বাংলায় যেমন বৈষ্ণব বৈরাগী বাউল আছে, এখানে যেমন লোকধর্মাচরণে প্রেমভক্তির প্রাধান্য, প্রথমে কাশ্মীরে তাঁর সে-ধরনটা চোখে পড়েনি। কাশ্মীরের প্রাকৃতজনচিত্তে প্রেমভক্তিরসস্রোতের সন্ধান পেতে পারেন ভাবেননি। এই সময় কবি ইকবালের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হল। তখনই প্রথম জানতে পারলেন প্রেমভক্তি আন্দোলনের ধারাতেও বাংলার সঙ্গে কাশ্মীরের মিল আছে।

ইকবাল তাঁকে বলেছিলেন : 'কাশ্মীরে মুসলমান ধর্ম প্রচার করেছিলেন সূফী প্রেমিক ভক্তের দল। তাদের ষোলটি গদি বা আখড়া কাশ্মীরে ছিল। তাই কাশ্মীরে হিন্দুমুসলমানে এমন প্রেমভক্তির যোগ। বাংলার বাউলদের মতো বহু ভক্ত কাশ্মীরে আছেন। তার মধ্যে লালদেদ একজন।'[১০২]

এ কথা জানবার পরে ক্ষিতিমোহন এই নারীসাধিকা সম্পর্কে অনুসন্ধান ও পড়াশোনা করেন। তার ফলে, এই অসামান্যা সাধিকা কাশ্মীরে বাউলভাবের সাধনা প্রবর্তন করেন, এই তথ্য জানা হলেও তাঁর সুযোগ হয়নি এই ভাবের কোনো সাধককে দেখবার। এমন সময় একবার কাশ্মীরে থাকা-কালেই সেই সুযোগ হাতের কাছে এল, অথচ অল্পবয়সের অনভিজ্ঞতায় তিনি তার সদ্ব্যবহার করতে পারলেন না। সে দেশে থাকতে নিজের খেয়ালে পায়ে হেঁটে যখন প্রচুর ঘুরে বেড়াতেন, তখন সর্বদাই সাধারণ গৃহস্থদের কাছ থেকে সহজ সাদাসিধে রকমের আতিথ্য পেতেন। তাতে হৃদ্যতা ছিল অথচ কোনো কৃত্রিমতা বা বাহ্য আড়ম্বর ছিল না। একবার হল কি :

> ১৯০৭ সাল। কাশ্মীরের অপূর্ব গ্রামপথে চলেছি। একদিন একটি ছোটো মেয়ে দৌড়ে এসে পথ আটকালো। বরফের মেঘ উঠেছে। মাঝে মাঝে বরফ পড়বে। একটু বিশেষ রকমের বরফ পড়বার আশঙ্কা দেখে গ্রামের গৃহস্থেরা রাস্তায় মেয়েটাকে বসিয়ে রেখেছে। কেউ যেন দুর্যোগে এগিয়ে না যায়। বরফ পড়া শুরু হবে, সম্মুখে আশ্রয় নেই। আশ্রয় না পেলে যাত্রীকে মরতে হবে। তখন সেই দেশে এরূপ আতিথ্য খুবই ছিল।[১০৩]

অনেক পথচারীই গ্রামে আশ্রয় নিয়েছেন, ক্ষিতিমোহনও নিলেন, কাছাকাছি কয়েকখানা বাড়িতে আরও অনেকে আশ্রয় পেয়েছেন। বরফের ঝড় এল, কয়েকটা দিন সেখানে আটকে রইলেন। যে-গৃহস্থঘরে আশ্রয় পেলেন তাঁরা ধনী নন, তবে মোটা অন্নবস্ত্রের স্বচ্ছলতা আছে। দুধ, ঘি, মাখন প্রচুর, ঘোলেরও তাই অভাব নেই, আর আছে যথেচ্ছ খাবার মতো মধু। কাছেই আর এক বাড়িতে এক বৃদ্ধা সাধিকার সাক্ষাৎ পেলেন—শতছিন্ন বেশবাস, চোখের দৃষ্টি শান্ত ও গভীর। গ্রামের গৃহস্থরা তাঁকে বেশ জানেন, অত্যন্ত সম্মান করেন। কটা দিন তাঁর সংস্পর্শে আনন্দে কাটছিল, সবে ভাবছিলেন তাঁর কাছ থেকে কিছু মূল্যবান সন্তবাণী সংগ্রহ করতে পারবেন। এমন সময় একদিন শেষরাত্রে দুর্যোগ একটু কমতেই তিনি কাউকে না জানিয়ে কোথায় চলে গেলেন, অনেক খোঁজাখুঁজি করেও ক্ষিতিমোহন আর তাঁর দেখা পেলেন না। এমন সুযোগ হাত-ছাড়া হয়ে গেল বলে খুব দুঃখ হল। গ্রামবাসীরাও আফশোষ করতে লাগলেন। তাঁদের কাছেই জানলেন ইনি একসময়ে সম্পন্ন গৃহস্থ ছিলেন, সন্তান হারিয়ে সাধনপথের আশ্রয় নেন। তাঁর সাধনার কথা শুনে মনে হল তাঁর ভাবগতিক অনেকটা বাউলদের মতো। লালদেদের বাণী শুনেছিলেন সেই সাধিকার মুখে, তাঁর প্রত্যক্ষ পরিচয় জানা হয়নি, তবু পরোক্ষে জেনেও মনে হল সাধ্বী লালদেদের বাণী প্রাণিত হয়ে উঠেছে এঁর জীবনে। যেদিন চলে গেলেন, ঠিক তার আগের রাতেই বসে বসে গুনগুন করে লল্লা বা লালদেদের সহজ সাধনপদগুলি গাইছিলেন। তার একটি মূল কাশ্মীরিপদ ক্ষিতিমোহন উদ্ধৃত করেছেন :

যিহ যিহ কর সূয় অর্চুন্‌,
যিহ রসঞি উচ্চর্যমৃ তিয়্‌ মনথর্‌।
—যা কিছু করি তাই তোমার পূজা, যা কিছু বলি তাই তোমার স্তবমন্ত্র।

শুনতে শুনতে বুঝতে পারছিলেন, ভারতে কবীরের অনেক আগে থেকেই লল্লাদেদের মতো সহজ ভাবসাধকরা ছিলেন। দুর্লভ সৌভাগ্যে সেই বৃদ্ধা সাধিকার জীবনে সেই সাধনা প্রত্যক্ষ করলেন। শুধু অতৃপ্তি রয়ে গেল তাঁর সঙ্গ আরও পেলেন না বলে। পাছে কেউ সম্মান দেখায় বা দাক্ষিণ্য করতে চায়, পাছে কেউ আটকায় তাঁকে, তাই তিনি সকলকে ফাঁকি দিয়ে রাতারাতি কোথায় চলে গেলেন।

এর পরে লল্লাদেদের বাণী খুঁজেছেন নানা জায়গায়, জেনেছেন ইউরোপীয় পণ্ডিতরাও কেউ কেউ এই সাধিকা বিষয়ে তথ্যসন্ধান করেছেন। তাঁর আগ্রহ দেখে কাশ্মীরের বন্ধুরা পরে সাধিকা লালদেদের বাণীসংগ্রহ তাঁকে দিয়েছিলেন, তাতে ষাটটি বাণী ছিল।[১০৪]

ক্ষিতিমোহনের প্রবন্ধে চম্বা-প্রসঙ্গ দেখে তো মনে হয় সে-সময় অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারে তাঁর নিত্যনতুন সঞ্চয় সেই সাতাশ-আটাশ বছর বয়সের মনটাকে যেন বেশ আনন্দেই রেখেছিল। সে কথা হয়তো ভুল নয়, আবার দেশ ও প্রিয়জন থেকে বিশ্লিষ্ট সেই সময়কার জীবনের বেদনা ও নিঃসঙ্গতা যে তাঁকে কতখানি পীড়িত করছিল তারও একটুখানি আভাস রয়ে গেছে একখানি সমকালীন চিঠিতে। 'চম্বা ভায়া ডালহৌসি পঞ্জাব' থেকে ১২ এপ্রিল ১৯০৮ নববর্ষের প্রাক্কালে কিরণবালাকে ক্ষিতিমোহন লিখেছিলেন চিঠিটা :

> প্রিয়তমে, অদ্য পত্র লিখিবার পূর্ব্বেই তোমাকে নববর্ষের গভীর প্রীতি জানাইতেছি। তোমাকে আমার প্রীতি আর কেমন করিয়া জানাইব? যাহা তুমি অন্তঃকরণে বোঝ তাই বুঝিয়া লও। প্রার্থনা করি নববর্ষে নূতন নূতন সুখ ও দুঃখ সেই পরম সখার চরণের দিকে ক্রমশঃ তোমাদের টানিয়া নিউক।

চিঠিতে সদ্যোজাত পুত্র কঙ্করের উল্লেখ আছে, উল্লেখ আছে কন্যা রেণুকার, তাঁকে ছোটোবেলায় 'নেড়ী' বলে ডাকতেন ক্ষিতিমোহন। লিখেছেন :

> আচ্ছা নেড়ী কি আমায় মনে করে? এবং সে কি আমাকে চিনিতে পারিবে? তোমার কি মনে হয়? আমার [কথা] সে কখনও বলে কি?

ক্ষিতিমোহন-কিরণবালার তৃতীয় সন্তান পুত্র ক্ষেমেন্দ্রমোহনের জন্ম ১৯ মাঘ ১৩১৪, অর্থাৎ ১৯০৮ সালের গোড়ার দিকে। সোনারঙে জন্মেছিলেন তিনি। ডাকনাম কঙ্কর, তাঁর পিতামহী নাম রেখেছিলেন সুপ্রসন্ন, পরে রবীন্দ্রনাথ নামকরণ করেন ক্ষেমেন্দ্রমোহন। যে চিঠি থেকে এইমাত্র উদ্ধৃতি দিয়েছি, সেই চিঠির শেষের দিকে ক্ষিতিমোহন কিরণবালাকে তাঁর পিতার কর্মস্থল বকসারে আসতে লিখেছিলেন : 'তোমার জন্য আমার মনও ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে।' হয়তো অদূর ভবিষ্যতে কোনো ছুটিতে স্ত্রী-সন্তানদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার ইচ্ছা ছিল, জানতে চেয়েছিলেন কবে থেকে বকসারের ঠিকানায় তিনি কিরণবালাকে লিখবেন। আর এই-সব কথার মাঝখানে বোধ করি অতর্কিতে লেখনীমুখে নিজের ভিতরকার ব্যথাটুকু বেরিয়ে এল :

কখন একটু পড়ি, কখন বাহিরে বসিয়া প্রকৃতির শোভা দেখি—কিন্তু সকল সময়েই মনের মধ্যে নিরন্তর তোমাদের অভাব জাগিতেছে। দিবারাত্রি দিন গুনিতেছি—ঘণ্টা গুনিতেছি—সপ্তাহ গুনিতেছি—time table দেখিতেছি প্রভৃতি কত রকমে যে মনের সঙ্গে প্রবঞ্চনা চালাইতেছি তাহা বলিতে পারি না। হায় কবে যে দেখা হইবে সেই দিনের প্রতীক্ষায় তো আমারও চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছে। তোমার কাজ আছে। ছেলেপিলে আছে—কথার লোক আছে—আর আমার ভগবান ছাড়া আর কেহই নাই তিনিই আমাকে শক্তি দেন।[১০৩]

এই চিঠিতেই ক্ষিতিমোহন আরও জানালেন যে তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি চিঠির উত্তর দিয়েছেন। একটি নয়, শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে তাঁর যোগদানের প্রস্তাব নিয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর বেশ-কয়েকটি চিঠির আদান-প্রদান হল। এইবার সেই প্রসঙ্গে আসি।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পত্রালাপ

রবীন্দ্রনাথ সর্বপ্রথমে যে চিঠিটা লিখে ক্ষিতিমোহনকে শান্তিনিকেতনের কাজে যোগ দেওয়ার জন্য আহ্বান করেন :

শিলাইদহ
নদিয়া

সবিনয় নমস্কারপূর্ব্বক নিবেদন

বোলপুরে আমি কিছুদিন হইতে একটি ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম স্থাপন করিয়া বালকদিগকে শিক্ষা দিতেছি। আপনার সম্বন্ধে আমি যেরূপ সংবাদ পাইয়াছি তাহাতে এখানকার কর্ম্মে আপনাকে আবদ্ধ করিবার জন্য বিশেষ উৎসুক হইয়াছি। যদি অনুগ্রহ করিয়া আমার এই কার্য্যে যোগদান করেন তবে আমি সহায়বান হইব। এবং যাহাতে আপনার আর্থিক ক্ষতি না হয় সেইরূপ ব্যবস্থা করিয়া দিব। আমার বিশ্বাস সেখানকার কর্ম্মে আপনি আনন্দলাভ করিতে পারিবেন। ইতি ১লা ফাল্গুন ১৩১৪

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর[১০৬]

ক্ষিতিমোহনের হাতে চিঠিখানা পৌঁছোল দিন চারেক পরে। '১৯০৭ সাল, ডিসেম্বর মাস। আমি হিমালয়ে আছি। পোস্টাপিসে গিয়ে একখানি চিঠি পেলাম। অপূর্ব হস্তাক্ষর। খুলে দেখলাম লেখক শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি আমাকে শান্তিনিকেতনে আশ্রমের কাজে ডাকছেন।'[১০৭] কদিনের মধ্যেই আর-একটা চিঠি পেলেন বন্ধু বিধুশেখর ভট্টাচার্যের কাছ থেকে, তিনিও ক্ষিতিমোহনকে লিখেছেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁকে শান্তিনিকেতনের কাজে পেতে চান।

ক্ষিতিমোহন একেবারেই প্রস্তুত ছিলেন না এই আহ্বানের জন্য। আনন্দও যেমন হল, দ্বিধাও বোধ করলেন। প্রথমে তিনি রবীন্দ্রনাথের চিঠির প্রাপ্তি-স্বীকার করে নিজের দ্বিধা ও

অযোগ্যতার কথাই জানালেন : 'আশ্রমের কাজ! কোন্ সাহসে যোগ দেব। তাঁকে নিজ অযোগ্যতার কথা জানালাম'।[১০৮]

আশ্রমের কাজ বলেই যে ক্ষিতিমোহন নিজেকে যথেষ্ট উপযুক্ত মনে করতে না-পেরে দ্বিধান্বিত ছিলেন তা কিন্তু নয়, বাইরের বাধাই বেশি জোরালো ছিল এবং সে বাধা অর্থনৈতিক। তিনি লিখেছেন :

> সংসারী মানুষ। বড় ভাই মারা গেছেন। পুত্রশোকাতুর বৃদ্ধ পিতা শক্তিহীন। সব ভার আমার উপর। আশ্রমের কাজে যোগ দেব কোন্ সাহসে? হিমালয়ের কাজে ভবিষ্যৎ ছিল। কাশীর কলেজের ইংরাজ অধ্যাপকরাও ভালোবাসতেন, তাঁরাও ডাকছিলেন। কবিরাজীটাও পড়া ছিল—এই কুলবিদ্যা নিয়ে কলিকাতায় বসবার কথা সবাই বলছিলেন, অন্যদিকেও ডাক ছিল।[১০৯]

তা সত্ত্বেও মনটা যেন কবির ডাকে শান্তিনিকেতনের দিকেই ঝুঁকে পড়ছিল। তাঁর কথা থেকে বোঝা যায় যে, সে-সময় চম্বার নির্বাসন থেকে কাশীতে অধ্যাপনা কাজে তাঁকে ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা চলছিল। শুভানুধ্যায়ীদের তরফ থেকে আর-একটা প্রস্তাব ছিল কলকাতায় চলে গিয়ে তিনি আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করুন। ক্ষিতিমোহন কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথকে আর-একটা চিঠি লিখলেন। তৎকালীন চম্বার চাকরির কিছু শর্ত ও কয়েকটা সমস্যা ছাড়া আর কোনো ভাবনা ছায়া ফেলল না তাতে। অন্তত সেই মুহূর্তে আর্থিক লাভালাভ, উচ্চপদ, কবিরাজি পেশার স্বাধীন উপার্জন—কোনোটাই তাঁর রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে সাড়া দেওয়ার আন্তরিক ইচ্ছাকে অতিক্রম করতে পারেনি। ক্ষিতিমোহন লিখেছিলেন :

অমৃতসর ১২ই ফাল্গুন ১৩১৪

সপ্রণাম নিবেদনমিদং

আমি পার্বত্যপথে আপনার পত্র (১লা ফাল্গুনের পত্র) পাইয়া তাহার প্রাপ্তিস্বরূপে একখানি পত্র লিখিয়াছি। অদ্য বিশদভাবে পত্র দিতেছি।

আপনার ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে কার্য্য করা আমার পক্ষে গৌরব বলিয়া মনে করি এবং কার্য্যও খুব প্রার্থনীয় মনে হয়। যা একটা 'কিন্তু' ছিল সেটা আপনার পত্রে আপনি সমাধান করিয়া দিয়াছেন। কাজেই আর্থিক কথা অদ্য উল্লেখের প্রয়োজন নাই।

এখন কবে আমি যোগদান করিতে পারি সেটাই বিবেচ্য। রাজার সঙ্গে যেরূপে আমার কথাবার্ত্তা তাহাতে তিন মাসের পূর্ব্বে তাঁহাকে পদত্যাগের কথা জ্ঞাপন করিতে হইবে। সে অনুসারে আমি যখন মার্চ্চের শেষে চম্বা রাজ্যে ফিরিব এবং এপ্রিলে ত্যাগপত্র দিব তখন হইতে জুলাই মাস পর্য্যন্ত আমাকে রাজ্যে থাকিতে হইবে।

এখানে জুন মাসটা ছুটি। আমি বহুদিন বাড়ীতে যাই নাই। সে সময়টা ছুটি উপলক্ষ্যে বাড়ী হইয়া আসিতে পারিব এ আমার একটা যুক্তি। স্বার্থপর যুক্তিও বটে। দেশে গিয়া লোকেরও সন্ধান করিব।

এই চম্বা রাজ্য সুরা ও ব্যভিচারের আশ্রয়স্বরূপ। এখানে এইসব ব্যসন দূষণীয় নহে। কাজেই ছেলেরা ভয় করে চরিত্রহীন শিক্ষকদের নিষ্পেষণকে। আমি পদত্যাগের কথা

ভাবিতেছি এই খবর শোনামাত্রই ছাত্ররা আমাকে ধরিয়াছে, একজন ভাল লোক দিয়া যাইবেন। ছাত্ররা জানে পরবর্তী শিক্ষক মনোনয়ন আমাকেই করিতে হইবে।

আমি আমার কার্য্যত্যাগের বিষয় রাজার সেক্রেটারীকে জানাইয়াছি। তবে রাজাকে না জানাইলে তাহা বিধিসঙ্গত জ্ঞাপনরূপে পরিগণিত হইবে না। আশা করি আপনি ইহাতে সম্মতি দান করিয়া আমাকে নিশ্চিন্ত করিবেন। কারণ এতটুকু সময় আমি চাহিয়া না লইলে এই সুদুর রাজ্যে একজন শিক্ষক নির্ব্বাচন ঘটিয়া উঠিবে না।

আপনি আমার পত্রখানি পাইলেই অনুগ্রহপূর্ব্বক ইহার উত্তর অমৃতসরের ঠিকানায় দিয়া বাধিত করিবেন। এবং যাহাতে জুলাই ১০/১৫ দিনে সেখানে যোগদান করিলে আমার চলে সেইরূপ ব্যবস্থা করিবেন। ইতি

প্রণত ক্ষিতিমোহন সেন

পুঃ আমি যদি আমার কর্ত্তব্য শেষ করিয়া ইহার পূর্ব্বেও সেখান হইতে আসিতে পারি তবে তাহা জানাইব।[১১০]

এদিকে ক্ষিতিমোহন যেদিন এই চিঠি লিখলেন, সেইদিনই রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রথম চিঠিখানার উত্তর দিলেন, যে চিঠিতে ক্ষিতিমোহন শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের কাজে যোগদানে তাঁর অক্ষমতা জানিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ লিখলেন :

শিলাইদহ
নদিয়া

ওঁ

সবিনয় নমস্কারপূর্ব্বক নিবেদন

আপনার পত্র পড়িয়া নিরাশ হইলাম, তথাপি আশা পরিত্যাগ করিতে প্রবৃত্তি হইতেছে না। যে লক্ষ্য ধরিয়া আজ ছয় বৎসর কাল এই বিদ্যালয়কে প্রতিষ্ঠাদান করিবার চেষ্টা করিতেছি তাহা সিদ্ধ করিবার জন্য উপযুক্ত সহায়ের একান্ত আবশ্যক। এই কারণেই আপনার সন্ধান পাইয়া, আপনার অসম্মতি সত্ত্বেও পুনর্ব্বার আপনাকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছি। এই বিদ্যালয়ে আপনি নিজের শক্তিকে সর্ব্বথা প্রয়োগ করিবার সুযোগ পাইবেন—ইহাতে যথার্থই আপনি সৃষ্টি করিয়া তুলিবার আনন্দ পাইবেন এবং ঈশ্বরের প্রসাদে এই সৃষ্টির দ্বারা দেশের একটি স্থায়ী মঙ্গলের প্রতিষ্ঠা হইতে পারে। এই কাজে আপনাদের সহায়তা আমি কেবলমাত্র প্রার্থনা করিব না—দাবী করিব। দেশে প্রকৃত শিক্ষার প্রয়োজন অত্যন্ত অধিক, এই প্রয়োজন পূবণ করিবার জন্য যদি আহ্বান প্রাপ্ত হন তবে কোনোমতেই তাহাকে অবহেলা করিবেন না। আমি ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতেছি—এ ক্ষেত্র কর্ষণের দ্বারা ফলবান করিবেন আপনারা—এই চেষ্টাকে অকৃতার্থ হইতে দিবেন না। একবার গভীরভাবে ও উদারভাবে কথাটাকে ভাবিয়া দেখিবেন—যদি নিতান্তই অন্তঃকরণ হইতে কোনো সায় না পান তবেই আমি অন্যত্র সন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইব। ইতি ১২ই ফাল্গুন ১৩১৪

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর[১০৯]

ইতিমধ্যে ক্ষিতিমোহনের ১২ ফাল্গুনের চিঠি পেয়ে শান্তিনিকেতনে আসতে তিনি সম্মত আছেন জেনে রবীন্দ্রনাথ আশ্বস্ত হয়ে আর-একটা চিঠি লিখলেন :

শিলাইদহ

ওঁ নদিয়া

সবিনয় নমস্কারসম্ভাষণমেতৎ

আপনার পত্রখানি পাইয়া আশ্বস্ত হইলাম। জুলাই পর্য্যন্তই অপেক্ষা কবিব। কার্ত্তিকের মাঝামাঝি অথবা অগ্রহায়ণের প্রারম্ভেই আমাদের বিদ্যালয়ের শেশন আরম্ভ হয়। ভাদ্র মাস হইতে প্রায় আড়াই মাস তিন মাস বন্ধ থাকে। যদি শ্রাবণ মাসে আপনি নিষ্কৃতি পান তবে ছুটির কয়টা মাস বাদেই আপনাকে কাজে যোগ দিতে হইবে। যদি জ্যৈষ্ঠ অন্তত আষাঢ়ের মধ্যেও আসেন তবে পূর্ব্বেই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে পারিবেন। যেরূপ ভাল বিবেচনা করেন আমাকে জানাইবেন এবং মাসিক বৃত্তি কিরূপ হইলে আপনাকে ক্ষতিগ্রস্ত না হইতে হয় তাহাও আমাকে লিখিবেন। আমাদের বিদ্যালয়টি সাশ্রম অর্থাৎ বোর্ডিং—অধ্যাপকগণ এখানে ছাত্রদের সহিত একত্রেই বাস করেন। ইতি ১৬ই ফাল্গুন ১৩১৪

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর[১১২]

রবীন্দ্রনাথকে যখন ক্ষিতিমোহন ১২ ফাল্গুন চিঠি লেখেন, তখনই তিনি আরও দুটো চিঠি লিখেছিলেন—পিতাকে কাশীতে এবং সোনারঙ্গো মাকে, কিরণবালাও তখন সেখানেই। পিতার কাছ থেকে যে উত্তর এল তাতে কিছু উপদেশ ও নির্দেশ ছিল। বন্ধুরাও কেউ কেউ খবর পেয়ে তাঁকে কিছু লিখেছিলেন। তাই রবীন্দ্রনাথের আর কোনো চিঠি পাওয়ার আগেই নিজের ১২ ফাল্গুনের চিঠির সূত্র ধরে তিন দিন পরে তাঁকে আর-একটা চিঠি লিখতে হল :

অমৃতসর। ১৫ই ফাল্গুন ১৩১৪

সপ্রণাম নিবেদনমিদং

আমি গত পরশ্ব এক পত্র লিখিয়াছি। তাহাতে আর্থিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন করি নাই—প্রয়োজনও মনে করি নাই। অদ্য বন্ধুবান্ধবদের ও পিতৃদেবের পত্র পাইলাম। তাঁহারা আর্থিক ব্যবস্থার কথা না জানিয়া বোলপুরের কার্য্য স্বীকার করিতে দিবেন না। অদ্য সে প্রস্তাব বাধ্য হইয়া উপস্থিত করিতেছি।

আপনি লিখিয়াছেন যাহাতে আমার আর্থিক ক্ষতি না হয় সেরূপ ব্যবস্থা করিবেন। এখানে আমি অল্পদিন হইল ১০০্ টাকা মাসিক বেতনে আসিয়াছি। বৎসরে ১০্ বৃদ্ধি হইয়া ৬ বৎসরে ১৬০্ টাকা হইবে; আগামী জুলাই হইতে ১১০্ টাকা পাইব। ইহা বিদ্যালয়ে অধ্যাপনার মাহিনা।

আমাকে মধ্যে মধ্যে রাজা এবং রাজ্যের কার্য্যে ভ্রমণ করিতে হয়—তাহাতে বার্ষিক বরাদ্দ আছে। এখানে বাড়ী ভৃত্য পাচক অশ্বযানাদি রাজার ব্যয়ে পাই। অনতিবিলম্বে একটা মিউজিয়াম হইবে তাহার ভারও আমাকে লইতে হইবে। আপনার ওখানে মাসিক কত পাইতে পারি? এবং কত পর্য্যন্ত বৃদ্ধি হইবে এবং বার্ষিক বৃদ্ধি কত?

অনেক চেষ্টা করিয়াও প্রশ্নগুলিকে কিছুমাত্র হৃদ্য করিতে পারিলাম না—তাই যেমন মনে আসিল লিখিয়া দিলাম। ক্ষমা করিবেন। আমি বাধ্য হইয়া অতি সঙ্কোচের সহিতই কথাগুলি উপস্থিত করিতেছি বাধ্য হইয়া—কেননা আমার উপার্জ্জনশীল জ্যেষ্ঠভ্রাতা হঠাৎ আমাদের ছাড়িয়া পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি পরদুঃখকাতর ছিলেন—বহু ঋণ করিয়া যান—তাঁহার

চিকিৎসাতেও ঋণ হয়। আমার পিতা এই শোকে মুহ্যমান হইয়া ব্যবসা ত্যাগ করেন। এবং এখন দৈন্যের যাহা কিছু চাপ সব আমার শোকাতুরা জননীকে সহ্য করিতে হয়—তাই ইচ্ছা হইলেই সৎকার্য্যে নিজেকে উৎসর্গ করিতে পারি না। না হইলে বোলপুরের কার্য্যটি জীবনে কতবার যে শ্রেষ্ঠতম প্রার্থনীয় মনে করিয়াছি তাহা বলিতে পারি না। যাহাদের মনোরথ হৃদয়ে উঠিয়া হৃদয়েই লীন হয়—তাহাদের সম্বন্ধে বোধহয় আপনি অল্পই জানেন।

শেষ কথা যদি আর্থিক অবস্থা আমার অনুকূল হয় তবে আপনার নিতান্ত প্রয়োজন থাকিলে মে মাসের শেষভাগে বা জুনের প্রথমে যখন অবকাশ পাইব তখনই বোলপুরে কার্য্য আরম্ভ করিব। বাড়ী যাইব না। বরং জুলাই মাসে ১৫ দিনের অবকাশ লইয়া আসিয়া এখানকার ছাত্রদেব প্রমোশন দিয়া বেতন লইয়া ও চার্জ বুঝাইয়া দিয়া যাইব।

প্রণত

শ্রীক্ষিতিমোহন সেন[১১১]

এই চিঠি পাওয়ার আগেই রবীন্দ্রনাথ ১৯ ফাল্গুন ১৩১৪ উত্তর দিলেন। ১২ ফাল্গুনের চিঠিতে ক্ষিতিমোহনকে লিখেছিলেন : 'আমি ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতেছি—সে ক্ষেত্র কর্ষণের দ্বারা ফলবান করিবেন আপনারা—এই চেষ্টাকে অকৃতার্থ হইতে দিবেন না।' অনুরোধ ছিল তাঁর প্রস্তাবটা যেন ক্ষিতিমোহন একবার গভীর ও উদারভাবে ভেবে দেখেন। তাতে যদি তিনি অন্তরের সায় না পান তবেই রবীন্দ্রনাথ আর-কোনো শিক্ষকের সন্ধান করবেন। এবার লিখলেন :

শিলাইদহ

ওঁ

বিনয়সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন

গত পরশ্ব যদিচ আপনাকে নিষ্কৃতি দিয়া পত্র লিখিয়াছি* কিন্তু তথাপি অন্তঃকরণকে ফিরাইতে পারি নাই—বোধ হয় আপনাকে পাইবই বলিয়াই এইরূপ ঘটিতেছে। আজ আপনার পত্র পাইয়া আমি মন হইতে সমস্ত বাধা দূর করিয়া দিলাম। আপনি যেরূপ প্রস্তাব করিয়াছেন তাহাতে আমি আনন্দের সহিত সম্মতি জানাইতেছি। এক্ষণে মাসিক একশত ও প্রতি বৎসরে দশ টাকা করিয়া বৃদ্ধি লইয়া ক্রমে দেড়শত পর্য্যন্ত যদি বৃত্তি স্থির করেন তবে আমার পক্ষে দুঃসাধ্য হইবে না। কারণ আর দুই বৎসরের মধ্যে আমেরিকা ইংলণ্ড হইতে চারিজন ছাত্রই ফিরিয়া আসিবে তখন আমার অনেকটা ভার লাঘব হইবে। আমার সাধ্যমত আপনাদের অসুবিধা হইবে না ইহা নিঃসন্দেহ। বিদ্যালয়ও ক্রমশই যেরূপ সাধারণের বিশ্বাস আকর্ষণ করিতেছে তাহাতে অনতিকালের মধ্যে এ বিদ্যালয় আমাদের সাহায্যের অপেক্ষা রাখিবে না বলিয়া আশা করিতেছি। এই সময়ে আমি এমন একজন কাহাকেও অন্বেষণ করিতেছি যিনি এই বিদ্যালয়টিকে সম্পূর্ণরূপে নিজের করিয়া লইবেন। জানি না, কি কারণে আপনার সহিত পরিচয় না থাকিলেও আপনাকেই আমার চিত্ত এই কাজে বরণ করিয়া লইতেছে। ঈশ্বর যদি

* 'গত পরশ্ব যদিচ আপনাকে ....' রবীন্দ্রনাথের পরশু লেখা চিঠি বলতে ১৬ ফাল্গুনে লেখা চিঠি বোঝায়। সেদিনের চিঠিতে কিন্তু ক্ষিতিমোহনকে নিষ্কৃতি দেওয়ার প্রসঙ্গ নেই। ১২ ফাল্গুনের চিঠিতে এই কথাটা আছে যে ক্ষিতিমোহন যেন আর একবার শান্তিনিকেতন আশ্রমে যোগদানের প্রস্তাবটা উদার ও গভীরভাবে ভেবে দেখেন, যদি নিতান্তই তাঁর অন্তরের সায় না থাকে তবেই রবীন্দ্রনাথ অন্যত্র শিক্ষকের সন্ধান করবেন।

ইচ্ছা করেন তবে নিশ্চয়ই আপনি সমস্ত সঙ্কোচ ও চিন্তা দূর করিয়া দিয়া ধরা দিবেন—আপনি না আসিয়া কোনমতেই থাকিতে পারিবেন না —আপনার পর্ব্বত হইতে আপনি নদীর মত এখানে ছুটিয়া আসিবেন। আমার নিজের কাজ হইলে আমি আপনাকে এমন করিয়া ডাকিতে পারিতাম না। আমি যাহাকে মনে করিয়া ডাকিতেছি তাহার কাছে নিষ্কৃতি পাইবেন না। আমি পাবনা কনফারেন্সের কাজের অত্যন্ত ব্যস্ততার মধ্যেও একটি বালকের কাছে আপনার কথা শুনিবামাত্রই অত্যন্ত নিঃসংশয় চিত্তে তৎক্ষণাৎ আপনাকে আহ্বান করিয়া লিখিয়াছি—আমার আহ্বান কখনই ব্যর্থ হইতে পারে না। ইতি ১৯শে ফাল্গুন ১৩১৪

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর[১১৪]

এই একই দিনে বিধুশেখর শাস্ত্রীকেও চিঠি দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। লিখেছিলেন : 'ক্ষিতিমোহনবাবুকে বিদ্যালয়ে আকর্ষণ করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছি। তাঁহার কিছু ক্ষতি করাইব—হয়ত অন্যদিকে লাভ হইতে পারিবে—তাহারও মূল্য আছে।'[১১৫]

এর মধ্যে ক্ষিতিমোহনের হাতে পৌঁছেছে রবীন্দ্রনাথের ১২ ফাল্গুনের চিঠি। রবীন্দ্রনাথ যে ধরেই নিয়েছেন তিনি শান্তিনিকেতনে যেতে চান না এতে মনটা ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে—কবি ভুল বুঝেছেন, অবিচার করেছেন তাঁর উপর। মুহূর্তের মধ্যে সেই ক্ষোভের মুখে চম্বার চাকরির উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ, অর্থপ্রাপ্তি ও অন্যান্য সুখ-সুবিধার খতিয়ান আড়াল করে দাঁড়াল তাঁরই যে অন্তর্বর্তী ভাবুক সত্তা, এই প্রথম সে স্বীকার করল এই তুষারাবৃত আরণ্যক জনপদে সে বলহীন, মহাসমুদ্রের কলতান শোনা যায় না, জীবননদী এখানে যেন স্তব্ধ হয়ে আছে। কত শত মানুষ দেশসেবার ডাক শুনে বেরিয়ে পড়ল, শুধু তিনিই ব্রতহীন। এবারে যে চিঠি রবীন্দ্রনাথকে লিখলেন, বাস্তব জীবনের কর্তব্য আর প্রয়োজনের কথাটা তাতেও ছিল, তবু এ কথাটাও স্পষ্ট উচ্চারণে আর দ্বিধা ছিল না যে যদি শান্তিনিকেতনের কাজে আত্মনিয়োগ করতে পারেন, আশ্রমের সেবাই তাঁর শ্রেষ্ঠ ব্রত হবে।

চিঠিটা উদ্ধৃত করি, ১৮ ফাল্গুন ক্ষিতিমোহন লিখেছিলেন :

অমৃতসর ১৮ই ফাল্গুন ১৩১৪

প্রণতিপূর্ব্বক নিবেদন,

আপনার পত্রখানা পাইয়া আমার প্রাণে যে কি করিতেছে তাহা জানাইতে পারি না। সাহিত্যের প্রসাদে আপনি আমাদের আত্মীয় হইতেও আত্মীয়। তাই নিঃসঙ্কোচে আপনাকে পরমাত্মীয়ের ন্যায় সব কথা লিখিয়াছি এবং লিখিতেছি।

আমার পত্র পড়িয়া আপনি যে ভাবিয়াছেন আমি বোলপুর যাইতে ইচ্ছা করি না—ইহা আপনি ভুল বুঝিয়াছেন এবং তাহাতে আমার প্রতি প্রচণ্ড অবিচার করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে আমি যে সেখানে যাইতে কত গভীরভাবে ইচ্ছা করি তাহা জানাইতে পারি না। সেবাবিমুখ জীবন লইয়া পবিত্র হিমারণ্যে বসিয়া আমি শক্তি পাই না। দেখি বড় বড় নদনদী শত শত পাষাণস্তূপ অতিক্রম করিয়া তাহাদের নির্ম্মল জলধারা লইয়া মলিন দেশের সেবা করিয়া মলিন হইয়া নিজেকে সাগরজলরাশিতে উৎসর্গ করিতে চলিয়াছে, আমিই কেবল ইহাদের তীরে

পাষাণের ন্যায় এই সেবাব্রতের মূকসাক্ষী মাত্র হইয়া রহিলাম। এক একদিন দেশজননীর দান অন্নগ্রাস তপ্ত অঙ্গারের ন্যায় বোধ হয়। হায়, ব্রতহীনের জননীর এই দানে কি অধিকার আছে?

আমি বিবাহিত—পরলোকগত জ্যেষ্ঠের পরিবার ও সন্ততি ও বিবাহযোগ্য কন্যার ভার আমার উপর। বৃদ্ধ পিতামাতা; তাই আপনাকে এত পত্র লিখিয়া বিরক্ত করিতেছি। আমার কমপক্ষে মাসিক ১০০৲ হইতে ১৫০৲ টাকার প্রয়োজন। এখন ১০০৲ বাৎসরিক ১০৲ বৃদ্ধি হইলেই হইবে। ইহা আমার কথা, আপনার নয়। যদি বোলপুরে যাই তবে কায়মনোবাক্যে সেখানকার কাজে নিযুক্ত হইব এবং আশ্রমের সেবা আমার শ্রেষ্ঠ ব্রত হইবে।

ইতি

ক্ষিতিমোহন সেন[১১৬]

ক্ষিতিমোহনের এই চিঠির উত্তরে কি না বলা যায় না, হয়তো তাই, ২৫ ফাল্গুন রবীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গে তাঁকে একটি ছোটো চিঠি লিখলেন :

শিলাইদহ

ওঁ

সবিনয় সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন

সময় সম্বন্ধে কোনো সীমা না বাঁধিয়াই আপনার জন্য অপেক্ষা করিব। যাহাতে আপনার ক্ষতি না হয় তাহাই করিবেন এবং যত শীঘ্র পারেন আমাদের জালে আসিয়া ধরা দিবেন। ইতি ২৫ ফাল্গুন ১৩১৪

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর[১১৭]

ঠিক এর পরদিন ২৬ ফাল্গুন ক্ষিতিমোহন রবীন্দ্রনাথকে যে চিঠি লিখলেন, সেটা রবীন্দ্রনাথের ১৯ ফাল্গুন লেখা চিঠির উত্তর। রবীন্দ্রনাথ যে লিখেছেন ঈশ্বর যদি ইচ্ছা করেন তাহলে তাঁর শান্তিনিকেতনের কাজে ক্ষিতিমোহনকে তাঁর পর্বত থেকে নদীর মতো ছুটে আসতে হবে সব চিন্তা ও সংকোচ দূর করে দিয়ে, ক্ষিতিমোহনের এই চিঠিতে তার উত্তর ছিল। শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে কাজ করতে যাবেন, মন স্থির। মনে হচ্ছে ঈশ্বরের আহ্বানের মতো এ কাজ যেন তাঁকে অযোগ্য জেনেও ডেকে নিচ্ছে।

সপ্রণাম নিবেদন,

অদ্য আপনার পত্র পাইলাম আমার পূর্ব্বপ্রস্তাব (১০০৲ টাকা বার্ষিক ১০৲ টাকা বৃদ্ধি হইয়া ১৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত) গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া আরও আনন্দিত হইলাম। আমার পূর্ব্বের পত্রে আমি ভগবানের উপর ভবিষ্যতের ভার দিয়া সম্মতি জানাইয়াছিলাম।

আপনার এই আহ্বানে আমি ভগবানের আহ্বান যে পাইয়াছি তাহা সর্ব্বতোভাবে বোধ করিতেছি। কারণ প্রাণের এমন ব্যাকুলতা এবং স্বীকারের পর এমন শান্তি কখনও বোধ করি নাই। আপনি আমার আশা ছাড়িয়া যে পত্র দিয়াছিলেন তাহা পড়িয়া আমার বুক ফাটিয়া যাইতেছিল। পত্রব্যবহার করিয়াছি তাহা অস্বীকার করিলে পৌরুষত্ব থাকে না। আজ আমার চিত্ত পরিপূর্ণ, নদনদীর সঙ্গে আমার তুলনা হয় না। নদী যায় সেবা করিয়া মলিন হইতে আমি যাইতেছি পবিত্র হইতে। আমার বড় সাধ ছিল মহর্ষির চরণতলে একদিন বসিয়া উপনিষদ বাক্য শুনিব। তাঁহাকে পাইলাম না, আপনার চরণতলে ব্রহ্মবাণী শিক্ষা করিতে চাহি। হিমালয়ে আমি পথ না পাইয়া ব্যাকুল হইয়া পাগলের মত বনে বনে ফিরিয়াছি।

আপনার কাছে কোন কথা গোপন করি নাই। কারণ আপনি ঘরের লোক। কি কাজ করিতে হইবে তাহার সামর্থ্য আমার আছে কিনা বুঝিলাম না। দেবতার আহ্বানের ন্যায় ইহা আমাকে হঠাৎ অযোগ্য জানিয়াও ডাকিয়া লইল।

প্রণত

ক্ষিতিমোহন সেন[১১৮]

এই প্রসঙ্গে সব-শেষ চিঠি ১১ বৈশাখ ১৩১৫ তারিখে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি। শান্তিনিকেতনে তিনি কবে যেতে পারবেন না-পারবেন জানিয়ে ক্ষিতিমোহন যে চিঠি বন্ধু বিধুশেখরকে লিখেছিলেন, সেই প্রসঙ্গ নিয়েই রবীন্দ্রনাথের চিঠিটা শুরু হয়েছে। তার পরে ক্ষিতিমোহন তাঁর শান্তিনিকেতন-ব্রতের অঙ্গীকার স্বীকার করেছেন এ বিষয়ে নিঃসংশয় হয়ে এই বিদ্যালয় সম্পর্কে নিজের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা একটু বললেন। ক্ষিতিমোহন জিজ্ঞাসাও করেছিলেন কী কাজ করতে হবে তাঁকে, লিখেছিলেন সে কাজ করবার সামর্থ্য তাঁর আছে কি না সেটা তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়নি। রবীন্দ্রনাথের এই চিঠি থেকে হয়তো একটু আভাস পেলেন।

বিনয়সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন

শাস্ত্রীমহাশয়ের পত্রে আপনার পথযাত্রার যে হিসাব দিয়াছেন তাহাতে আমাদের কোনো অসুবিধা দেখি না—কারণ, জ্যৈষ্ঠের শেষ পর্য্যন্ত অর্থাৎ প্রায় ১৫ই জুন পর্য্যন্ত বিদ্যালয় বন্ধ থাকিবে। আপনি যদি ২৫শে মে তারিখেও ছুটি পান তথাপি ২০ দিন সময় হাতে পাইবেন। বিদ্যালয়কে আকৃতি দান, ইহার প্রকৃতিকে উদ্বোধিত করিয়া তোলা কোনো এক ব্যক্তির শাসনাধীনে হইবে না। এ সম্বন্ধে আমি নিজের কর্ত্তৃত্বের দ্বারা বিদ্যালয়কে চালিত করি না। আমি চেষ্টা করি যাহাতে প্রত্যেক অধ্যাপক নিজের শক্তিকে স্বাধীনভাবে এই বিদ্যালয়ে প্রয়োগ করিতে পারেন—এমনি করিয়া সকলের স্বাধীন সহকারিতায় বিদ্যালয় ক্রমশ গঠিত হইয়া উঠিতেছে। প্রকৃতি ভেদবশতঃ প্রথম প্রথম পরস্পরের মধ্যে যে বিরোধ উপস্থিত হইত এখন ক্রমশ তাহা দূর হইয়া বিদ্যালয়ের মধ্যে প্রত্যেকে নিজের স্বাভাবিক স্থান অধিকার করিয়াছেন; ক্রমেই বিদ্যালয়টি যান্ত্রিক ভাব পরিত্যাগ করিয়া জৈবিক ভাব গ্রহণ করিতেছে। আপনিও ইহার মধ্যে প্রাণসঞ্চার করিয়া ইহাকে ভিতরের দিক হইতে উন্মেষিত করিয়া তুলিবেন, এই আশা করিতেছি। ভারতবর্ষে আমরা মিথ্যার জালে জড়ীভূত হইয়া পড়িয়াছি—বিদেশীর কাছে আমাদের বাহ্য অধীনতা কিছুই নহে কিন্তু আমাদের সমস্ত জীবন আমাদের অন্তঃকরণ মিথ্যার দাসত্বে বিক্রীত। ইহাই আমাদের সমস্ত দুর্গতির কারণ। আমাদের বিদ্যালয়ে সত্যের যেন অবমাননা না হয়—ছাত্রেরা যেন সত্যকে নির্ভয়ে স্বীকার করিয়া জীবনকে ধন্য করিতে পারে সেই পরম শক্তি তাহাদের মধ্যে সঞ্চার করিতে হইবে—এই আমার একান্ত কামনা জানিবেন। ইতি ১১ই বৈশাখ ১৩১৫

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর[১১৭]

নানা ওঠা-পড়ার মধ্যেও শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমে রবীন্দ্রনাথের যে অক্ষুব্ধ আত্মপ্রত্যয়ী ভাবনা রূপ নিয়েছিল, ক্ষিতিমোহনকে লেখা তাঁর এই চিঠিগুলিতে তারই

প্রকাশ দেখতে পাই। তখনও তো বলতে গেলে ক্ষিতিমোহন তাঁর অপরিচিত মানুষ, কিন্তু ঈশ্বরের উপর নির্ভর করে নিশ্চিত বিশ্বাস নিয়ে তিনি তাঁকে এক বৃহৎ প্রত্যাশা ও সংকল্পের মধ্যে ডেকে নিলেন। ক্ষিতিমোহনের জীবনে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হল। রবীন্দ্রনাথ যেন দূরকালের পটে দেখতে পাচ্ছিলেন ভবিষ্যতের ছবি—ঐহিক লাভ-ক্ষতির হিসাব-নিকাশ তুচ্ছ হয়ে মিলিয়ে গেছে কোন্ দিগন্তে, আন্তরিক কোন্ পরম প্রাপ্তির আলোয় আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন শান্তিনিকেতনের পথ ধরে চলেছেন একটানা পঞ্চাশ বছর। ভুল কি কোথাও কিছু ছিল না? কোনো বাধা, কোনো সীমাবদ্ধতা আড়াল করেনি কি শ্রেয়ের পথ, শান্তিনিকেতনের সত্য? হয়তো করেছে কখনও। কিন্তু সে খুব সাময়িককালের জন্যই, দুর্যোগ কেটে যেতে দেরি হয়নি।

আমাদের মনে হয়েছে ছন্দপতন নয়, শান্তিনিকেতনের জীবনকে কেন্দ্র করে রবীন্দ্রনাথ-ক্ষিতিমোহন সম্পর্কের ছন্দের মিলটাই আমাদের বেশি চোখে পড়বে। চম্বা থেকে টাকার হিসাব পাঠিয়েছিলেন না ক্ষিতিমোহন! সেখানে তখন কী পাচ্ছেন, শান্তিনিকেতনে কী পেলে তাঁর চলবে মোটামুটি! কবির সঙ্গে তাঁর লেনদেনের কারবার কেমন জমল সেটা ক্রমশ প্রকাশ্য : 'ব্যবসা মোর তোমার সাথে/চলবে বেড়ে দিনে রাতে/আপনাকে যে দেব তবু বাড়বে দেনা'। অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন : 'ক্ষিতিমোহন যেমন রবীন্দ্রনাথের আবিষ্কার, রবীন্দ্রনাথও তেমনি ক্ষিতিমোহনের কাছে দেখা দিয়েছিলেন অকস্মাৎ এক অজ্ঞাতপূর্ব মহাদেশ আবিষ্কারের বিস্ময়রূপে।[১২০] পারস্পরিক সেই আবিষ্কারপর্বের তখনও অনেকটাই বাকি, তার অনেকটাই তখনও অনাগতকালের গর্ভে। তবে একটা কথা ঠিক। রবীন্দ্রনাথ তো কোনোদিন ক্ষিতিমোহনকে আনুষ্ঠানিক সংবর্ধনা জানাননি, আম্রকুঞ্জের সভায় অভিনন্দিত করেননি, তাঁর নামে কোনো গ্রন্থ উৎসর্গ করেননি, কিন্তু তিনি যে এই ক্ষিতিমোহন নামক এক মহৎ সম্ভাবনাকে শান্তিনিকেতনের আশ্রম-বনস্থলীতে এনে রোপণ করলেন, তাঁর এই দূরদর্শী উদ্যোগই ক্ষিতিমোহনের প্রতি তাঁর শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য। আর ক্ষিতিমোহন? একালের উজ্জয়িনী শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ একধারে রাজা বিক্রমাদিত্য এবং কবি কালিদাস আর তাঁকে বেষ্টন করে তাঁর নবরত্নসভা — এ উপমা বহুব্যবহৃত। স্বয়ং দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর অবশ্য বলেন : 'অ্যাকা নবরতন ক্ষিতিমোহন'।[১২১] ক্ষিতিমোহন নিজে কী ভাবতেন তার একটুখানি পরিচয় আমরা আগেই পেয়েছি। পরেও আরও পাব। শান্তিনিকেতনে এসে এই যে রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সাহচর্য তিনি লাভ করলেন দীর্ঘদিন, সে-কথা মনে করে জীবনের শেষ পর্বে পৌঁছে একবার বলেছিলেন :

> এখন ভাবি, ২০ বিঘা জমির উপর প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতন আশ্রমে একটানা ৩৪ বৎসর গুরুদেবের সঙ্গে কাজ করিবার এবং ঘন সান্নিধ্যে আসিবার পরম সৌভাগ্য কয়জনের ঘটিয়াছে?[১২২]

রবীন্দ্রনাথের দেহাবসানের পরে আরও আঠারো বছর এই শান্তিনিকেতনেই তাঁর কেটেছিল, যতদিন না তাঁর নিজের জীবনতরিখানি পাড়ি দিল ভিন্নলোকে। সে কথা আরও পরে আসবে, এখন সেই শান্তিনিকেতন ও রবীন্দ্রসান্নিধ্যের কথা।

শান্তিনিকেতন ও রবীন্দ্র-সান্নিধ্য

প্রথম দর্শনে শান্তিনিকেতন

যা ভেবেছিলেন তার তুলনায় বেশ কিছুদিন আগেই, ক্ষিতিমোহন এপ্রিল মাসের শেষে নেমে এলেন হিমালয় থেকে। বিদায়ের সময় রাজা ভুরি সিং চম্বার আলোকচিত্রের একটি চমৎকার অ্যালবাম উপহার দিলেন, ক্ষিতিমোহনেরও ছবি ছিল তাতে, মনে হয় রাজার ফোটো তোলার ছিল শখ ছিল। অনেক মানুষের সঙ্গেই চেনা-পরিচয় হয়ে গিয়েছিল, অন্তরঙ্গদের কথা দিয়েছিলেন দু-একদিনের জন্য হলেও আবার তিনি আসবেন। রাজাও বলেছিলেন, চম্বাকে যেন ভুলবেন না। ইচ্ছা থাকলেও আর কোনোদিন কিন্তু যাওয়া হল না। তবু অনেক দিন পর্যন্ত চম্বার কোনো কোনো মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল চিঠিপত্রে, রাজা ভুরি সিংয়ের সঙ্গেও ছিল। চম্বা ছেড়ে আসার পনেরো বছর পরে যেবার রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ক্ষিতিমোহন চিনে গেলেন, পিকিং শহরের হোটেলে নিজের ঘরে বসে রাজার শুভেচ্ছাপত্র পেয়েছিলেন। বিশ্বভারতীর সংস্কৃতি বিনিময়-কর্মসূচি অনুযায়ী তাঁদের সেই চিন শফর, ভ্রমণরত প্রতিনিধিদের শুভকামনা জানিয়েছিলেন রাজা। ক্ষিতিমোহনের চম্বার চাকরিজীবন নিতান্তই অল্পমেয়াদি। তবুও চম্বা রাজ্যের প্রথা অনুসারে প্রতি বছর এই প্রাক্তন সভাপণ্ডিতের জন্য পুজোর সময় অর্থ, বস্ত্র ও অন্যান্য সামগ্রী মিলিয়ে তাঁর শান্তিনিকেতনের বাড়িতে কিছু উপহার আসত।[১]

চম্বার ছাত্রদের সঙ্গে যে চিরবিচ্ছেদ ঘটল উভয় পক্ষেই তার জন্য বেদনা ছিল। বিকল্প শিক্ষকের ব্যবস্থা করে দিতে বলেছিল তারা। সেই সংকল্প নিয়েই ফিরবেন, এ কথা ক্ষিতিমোহন রবীন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন চিঠিতে। জানি না কাজটা তিনি করতে পেরেছিলেন কি না।

মনে করেছিলেন পথে কাশীতে একবার নামবেন। হয়তো তাই একটু বেশি সময় হাতে নিয়ে নেমে এসেছিলেন চম্বা থেকে। কিন্তু কাশীর স্টেশনে যখন সকালবেলা গাড়ি থামল, জানতে পারলেন আগেরদিন কলকাতায় মানিকতলায় বোমা-ষড়যন্ত্র ধরা পড়েছে, খুব ধরপাকড় চলছে সেখানে। এর থেকে অনুমান করছি কাশী স্টেশনে ক্ষিতিমোহন পৌঁছেছিলেন ৩ মে সকালে। তাঁর তখন ভয় হল পাছে এই-সব গোলমালে সময়মতো শান্তিনিকেতনে পৌঁছোতে না পারেন। আশঙ্কা কি এই ছিল যে এই-সব আকস্মিক রাজনৈতিক গোলযোগের মধ্যে পিতা এবং অন্য হিতৈষীরা কলকাতায় যেতে দিতে

চাইবেন না? এমনও ভেবে থাকতে পারেন যে এ-সব কারণে সরকারি নিষেধের ফলে যাতায়াতের বিঘ্ন ঘটতে পারে। কলকাতায় এসে বন্ধু চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে জোড়াসাঁকোয় ঠাকুরবাড়িতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করলেন। বহুকাল পরে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে ক্ষিতিমোহন বলেছিলেন :

> কাশীর স্টেশনেই সংবাদপত্রে জানলাম মানিকতলার বোম্-কেসের কথা। কলকাতায় চলে এলাম। বন্ধু চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে কবিগুরুর সঙ্গে দেখা করতে জোড়াসাঁকোতে গেলাম।

এই তাঁর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ আলাপ। সেদিন রবীন্দ্রনাথ তাঁকে 'কত অজানারে জানাইলে তুমি' গানখানি শুনিয়েছিলেন। তিনি বললেন :

> অসময় বসন্তরোগ হওয়ায় আশ্রমে এখন ছুটি। আপনিও ছুটি সম্ভোগ করুন, দেশে যান। আষাঢ় মাসে এসে কাজে যোগ দেবেন।[২]

অসময় ছুটির প্রসঙ্গ কি ক্ষিতিমোহনের ভ্রম? তাঁকে লেখা ১১ বৈশাখের চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ তো স্পষ্টই লিখেছিলেন প্রায় ১৫ জুন পর্যন্ত বন্ধ থাকবে বিদ্যালয়, ২৫ মে ছুটি পেলেও ক্ষিতিমোহনের হাতে কুড়ি দিন সময় থাকবে। সে-বার জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ পর্যন্তই বিদ্যালয় বন্ধ ছিল, ১ আষাঢ় খোলে।[৩]

বিদ্যালয় যখন খুলল, হয়তো ক্ষিতিমোহন তার কয়েকদিন পরে এসেছিলেন। দুমাস বাড়িতে কাটিয়ে বেশ স্বচ্ছন্দে যে নতুন চাকরিতে যোগ দিতে পারেননি তাঁর নিজের মন্তব্যে হয়তো তার ইঙ্গিত আছে :

> চারদিকেই বাধা। চারদিকেই কবিগুরু আর শান্তিনিকেতনের সমালোচনা। কেউ বলেন ওটা ব্রাহ্ম জায়গা—অতি আধুনিক, কেউ বলেন ওটা আশ্রম—অতি সেকেলে; কেউ বলেন রবীন্দ্রনাথ কবি, ধনীর সন্তান, চূড়ান্ত অ্যায়েসী এবং নবাবী তাঁর মেজাজ। তবু যোগ দিলাম।[৪]

ক্ষিতিমোহন তাঁর 'আশ্রমে রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধে লিখেছেন যে তাঁকে ভয় দেখিয়েছিলেন কলকাতার লোকেরা আর রবীন্দ্রনাথের মতো বিরাট প্রতিভার সান্নিধ্যে থেকে একত্রে কাজ করতে হবে ভেবে শান্তিনিকেতনে আসবার আগে তিনি নিজেও যে কিছুটা ভয় পাননি তা নয়।

আত্মীয়-বন্ধুদের নানা প্রতিকূলতার বাধা কাটিয়ে যখন এলেন, ছুটির শেষে আশ্রম তখন জনসমাগমে পূর্ণ এবং বেশ বর্ষা নেমেছে। ট্রেন পৌঁছোল মধ্যরাত্রে, তখন বৃষ্টি পড়ছিল। খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে আকাশে একটু আলো ফুটতে পায়ে হেঁটে আশ্রমের উদ্দেশে যাত্রা করলেন। খানিক এগোতেই কানে এল কবির খালি গলার গান 'তুমি আপনি জাগাও মোরে'। আশ্রমে প্রথম প্রবেশক্ষণের সঙ্গে সেই মুহূর্তে জড়িয়ে গেল এ গান—এ কথা বহুবার স্মরণ করেছেন। প্রবাসী পত্রিকায় তাঁর প্রবন্ধ 'রবীন্দ্রনাথ ও তাঁহার আশ্রম' জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৬ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়, তাতে এ কথা পড়ে 'শহরের একটি সাহিত্যপত্র কৌতুকবোধ করিয়াছিলেন'।[৫] সেকালে শান্তিনিকেতনের আশ্চর্য শান্ত পরিবেশ এবং কবির আশ্চর্য জোরালো কণ্ঠ—এ দুয়ের যোগে সেই আপাত অসম্ভব ঘটনা যে সত্যই

অসম্ভব ছিল না, এ কথা বোঝাতে চেয়েছেন পরেও অন্য লেখায়। বোলপুরে এত বাড়িঘর-জনবসতি ছিল না। শান্তিনিকেতনের দেহলি বাড়ির দোতলায় দাঁড়িয়ে গাওয়া রবীন্দ্রনাথের গানের সুর তখনকার নিস্তব্ধ নিষ্কলুষ পরিবেশে বহুদূর থেকে শুনতে পাওয়া যেত, তাই বোলপুর-শান্তিনিকেতনের পরিবর্তিত পরিবেশের ধারণা নিয়ে সেদিনের অভিজ্ঞতার সত্যতা যাচাই করার হয়তো পথ নেই।

বোলপুর স্টেশন থেকে উত্তরমুখে গেলে ভুবনডাঙা গ্রামের প্রান্তবর্তী বিশাল প্রান্তরে দুটি ছাতিমগাছকে কেন্দ্র করে বিশ বিঘা জমির উপর যে শান্তিনিকেতন আশ্রম, সেইখানে এক নতুন জীবনের উষালগ্নে এসে দাঁড়ালেন ক্ষিতিমোহন। তখন বোলপুর-শান্তিনিকেতনের রাস্তাটা ছিল আশ্রমের পূর্বসীমানা। উত্তরে পুরোনো দিনের মেলার মাঠ, দক্ষিণে দীর্ঘ সার-বাঁধা শালগাছ, আর পশ্চিমে পরবর্তীকালের উত্তরায়ণ-গুরুপল্লির পথ। উত্তরদিকেই প্রধান তোরণ, তার কাছেই ছাতিমতলা। শাল-তাল-আমলকী-মহুয়ার ছায়ানীড়ে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ধ্যানের আসন। ছাতিমতলার দক্ষিণে 'শান্তিনিকেতন' বাড়ি। তার সামনে ডানদিকে ব্রহ্মমন্দির, স্থানীয় লোকেরা যাকে বলত কাঁচবাংলা। মন্দিরের পাশে ফুলবাগান। 'শান্তিনিকেতন' বাড়ির দক্ষিণে আমবাগান, তার পশ্চিমে বকুলবীথি, আর তার কাছেই আশ্রমের দক্ষিণ তোরণ মাধবীলতায় ছাওয়া। যে একমাত্র পাকা একতলা বাড়িতে ব্রহ্মচর্য আশ্রমের সূচনা তার মাঝের বড়ো ঘরটায় ছিল লাইব্রেরি, সম্ভবত পশ্চিমের ঘরে জগদানন্দ রায়ের তত্ত্বাবধানে ল্যাবরেটরি। তার পাশেই আদি কুটির, সেটা মাটির দেয়াল-দেওয়া লম্বা এক চালাঘর, টালির ছাউনি। কয়েক বছরের মধ্যেই প্রয়োজনে আরও কিছু বাড়িঘর গড়ে উঠেছিল। ১৯০৭ সালে একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথকে লিখতে দেখি যে বিদ্যালয়ের কাজে ক্রমশই বেশি করে তিনি জড়িয়ে পড়ছেন। ছাত্র অনেক বেড়েছে, দায়ও বেড়েছে। তাড়াতাড়ি অনেকগুলি ঘরদোর ফাঁদতে হয়েছে। ল্যাবরেটরি-ঘরের উপরে একটি দোতলা হয়েছে। তাতেও কুলাচ্ছে না, নানা প্রয়োজনে আরও কতকগুলি ঘর তৈরি করতে চারদিকে মিস্ত্রি লাগিয়েছেন, অর্থব্যয়ের আশঙ্কা করবারও অবকাশ পাওয়া যায়নি। 'আর কিছুদিন পরে এখানে আসিলে চিনিতেই পারিবেন না'—কোনো প্রাক্তন অধ্যাপককে যখন লিখছিলেন রবীন্দ্রনাথ, জানাচ্ছিলেন : 'বিদ্যালয়ে সম্প্রতি ৮০ জন ছাত্র হইয়াছে—পূজার পর একশত জনের বেশি হইবে বলিয়া আশঙ্কা আছে'[৬]—তার এক বছর পরে সেখানে শিক্ষকতার দায়িত্ব নিয়ে কাজে যোগ দিতে এসে আশ্রমটাকে কেমন দেখলেন ক্ষিতিমোহন, এ-সব থেকে তার একটা আভাস পাওয়া যাবে। কিরণবালাকে লেখা একটি তারিখহীন অসম্পূর্ণ চিঠি থেকে খানিকটা এখানে তুলে দিতে পারা যায়, চিঠিটা আশ্রমে এসে যোগ দেওয়ার অল্পদিনের মধ্যেই লেখা তা এর বিষয়বস্তু থেকে অনুমান করা যায়। ক্ষিতিমোহনের চোখে প্রথম-দেখা শান্তিনিকেতনের ছবিটি এখানে ধরা পড়েছে :

> এইখানকার আশ্রমের বিবরণ জানিতে চাহ। এই স্থান বোলপুর স্টেশন হইতে ১।। মাইল দূরে। খুব উচ্চ পাহাড়ী ভূমি। চারিদিকে উপত্যকার মত—তার এদিকে ওদিকে একটু একটু গুহা। পার্ব্বত্য নদীসকল এদিক ওদিকে আছে। পাথর ও কঙ্করময় জমী—কিছু উৎপন্ন হয় না। চারিদিকে অতি বিস্তৃত দৃঢ় প্রান্তর—মধ্যে মধ্যে তালবন ও প্রকাণ্ড বাঁধে জলরাশি রোদে

নাচিতেছে। বহু দূরে দূরে শ্যামল গ্রামগুলি দেখা যাইতেছে। আশ্রমের একদিকে অতি প্রাচীন দুইটি সপ্তপর্ণী গাছ আছে। এইখানে পুরাকালে অনেক ডাকাতি অনুষ্ঠিত হইত। এখন সেই কোণে বহু সংখ্যক সপ্তপর্ণী গাছ ও তাহার মধ্যে মহর্ষির উপাসনা করিবার শ্বেত প্রস্তরের বেদী তাহার উপরে লেখা—

"তিনি আমার মনের আনন্দ
প্রাণের আরাম
আত্মার শান্তি।"

এবং এদিক-ওদিক সর্ব্বত্র বহুতর ব্রহ্মবাণী লেখা। সপ্তপর্ণী গাছে কত মহাকাব্য লেখা। কত বেদী কত উপদেশে পূর্ণ। আশ্রমের চারিদিকে শালের ও সেগুনের বন। মধ্যে ফুলের বাগান। আমাদের বহু ঘর—ছেলেরা ও অধ্যাপকেরা একসঙ্গে থাকি। আমি দোতলা একখানা দালানের উপরে থাকি। রবিবাবুর একখানি ছোট্ট দোতলা ঘর। উপরে একখানা মাত্র ঘর। সেখানে তিনি থাকেন। চতুর্দ্দিকে অতি সুন্দর দৃশ্য। আশ্রমের একধারে প্রকাণ্ড শান্তিনিকেতন ও কাঁচের তৈয়ারী ব্রহ্মমন্দির। অন্য কোণে আমাদের পীড়া হইলে যাইবার উপযুক্ত হাসপাতাল ও ডাক্তারখানা। এইরূপ সর্ব্বত্র একটা পরিপূর্ণ শান্তি দেখা যায়। প্রভাতে দূর পূর্ব্বে সূর্য্যোদয় ও পশ্চিমে অস্ত—ইহাতে কোথাও বাধা নাই। সর্ব্বত্র অবাধ দৃষ্টি চলে। একদিকে রাজ [..] পর্ব্বতশ্রেণী দেখা যায়। এখান হইতে ৬ মাইল দূরে চণ্ডীদাসের জন্মস্থান নান্নুর ও ৮ মাইল দূরে জয়দেবের স্থান কেন্দুবিল্ব। কবি জন্মাইবার উপযুক্ত এই দেশ ও স্থান। এখান হইতে ১॥ ঘন্টা দূরে প্রাচীন বৌদ্ধ চিহ্ন এক 'ধম্ম' মন্দির আছে। ক্রমশঃ তোমাকে অন্যান্য খবর দিব।[৭]

এই হল ক্ষিতিমোহনের দৃষ্টিতে প্রথম-দেখা বোলপুর-শান্তিনিকেতনের ছবি, এর সঙ্গে যেন কিছুটা 'জীবনস্মৃতি'-র বর্ণনার মিল আছে। ক্ষিতিমোহন তো দেখলেন শান্তিনিকেতনকে, আর শান্তিনিকেতন কেমন দেখল তাঁকে। প্রথম শান্তিনিকেতনে-আসা ক্ষিতিমোহনের সেই আটাশ বছরের চেহারা মনে রেখেছিলেন বড়োমা হেমলতা দেবী : 'রাজপুত্তুরের মতো ক্ষিতিবাবু এসে দাঁড়ালেন, কী তাঁর গায়ের রং, মাথা ভরা ছিল কালো কোঁকড়া চুল, লম্বা ঋজু দেহ, বাঙালির ঘরে সাধারণত তো এমন দেখা যায় না।'[৮] সুধীরঞ্জন দাস তখন শান্তিনিকেতনের ছাত্র। তাঁর দেওয়া বর্ণনা এতটা উচ্ছ্বাসপ্রবণ না হলেও পূর্ববর্ণনার সমসাময়িক এবং সগোত্রীয় :

আশ্রমে ফিরে দেখলাম অনেক নূতন অধ্যাপক এসে গিয়েছেন। কাশী থেকে এম. এ. পাশ করে শাস্ত্রী উপাধি পাবার কিছু পরেই শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন আসেন আশ্রমে ১৯০৮ সালের আষাঢ় মাসে। গায়ের রঙ ছিল মোটামুটি গৌরবর্ণ, লম্বায় বাঙালি ভদ্রলোক হিসাবে বেশ একটু দীর্ঘকায় ছিলেন, প্রস্থেও কম ছিলেন এমন নয়। ঠোঁটের কোণে লেগে থাকত মুচকি হাসি।[৯]

আসতে না আসতেই ক্ষিতিমোহনের দেখা হল কাশীর সতীর্থ বিধুশেখর শাস্ত্রী এবং পূর্বপরিচিত ভূপেন্দ্রনাথ সান্যালের সঙ্গে। স্মৃতিরোমন্থন করতে গিয়ে বিশেষ করে যে সহকর্মীদের কয়েকজনের নাম তিনি উল্লেখ করেছেন তাঁরা হলেন জগদানন্দ রায়, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, অজিতকুমার চক্রবর্তী, দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, তাঁর চেয়ে এক বছর পরে-আসা নেপালচন্দ্র রায়। প্রথম এসে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে 'দেহলি'-তে দেখা করতে গিয়ে চোখে

পড়েছিল তাঁর সরল জীবনযাত্রা। তাঁর নবাবি মেজাজের খবর শুনে এসেছিলেন, এসে কী নবাবি দেখলেন, 'আচার্যের প্রতিভাষণ'-এ তা বেশ সবিস্তারে বলেছেন। বলেছেন অভাব-অনটনের কথা : 'আমি যখন এখানে এলাম তখন গুরুদেবের দারুণ অর্থাভাব। চারদিক থেকে আপন ব্যয় সংকোচ করছেন।' আবার বলছেন : 'আশ্রমে তখন লোকসংখ্যাও খুব কম। প্রতি বেলায় ছাত্র ও অধ্যাপকে মিলিয়া জন পঞ্চাশের পাত পড়ে।' অধ্যাপকদের সব দায়িত্ব নিতে হত, অর্থাভাবের কারণে বেতনও ছিল কম। ক্ষিতিমোহন যেমন এ কথাও স্মরণ করেছেন যে কোনো কোনো আশ্রমবাসী শিক্ষক এখানে থেকেও ধর্মের প্রেরণা বাইরে খুঁজতেন, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁদের ধর্ম ও আদর্শগত যোগ ছিল না, তেমনই উল্লেখ্য মনে করেছেন অজিত চক্রবর্তীর মতো সুদক্ষ শিক্ষক মাসে মাত্র ত্রিশ টাকা বেতন নিতেন। এ-সব দেখে তিনি নিজেও তাঁর মায়ের পরামর্শে যে বেতন পাওয়ার কথা ছিল তার খানিকটা ছেড়ে দিলেন।[১০] 'রবিজীবনী'-তে যদিও ড. প্রশান্তকুমার পাল এ কথার উল্লেখ করেছেন, তবু তাঁর মতে : 'তিনিই হলেন সর্বোচ্চ ডিগ্রিধারী ও সর্বাধিক বেতনভোগী শিক্ষক।'[১১] বেতন-প্রসঙ্গ পরে একটু আলোচনার ইচ্ছা রইল।

'বিদ্যালয়টি সাশ্রম অর্থাৎ বোর্ডিং—অধ্যাপকগণ এখানে ছাত্রদের সহিত একত্রেই বাস করেন', রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন ক্ষিতিমোহনকে। তাঁরও থাকবার জায়গা নির্দিষ্ট হল 'বীথিকা' নামে ছাত্রাবাসে, শালবীথির বাঁ ধারে, তিনিই গৃহাধ্যক্ষ। ছাত্রদের সঙ্গে থাকার ব্যবস্থার উল্লেখ আগেই পেয়েছি কিরণবালাকে লেখা চিঠিতে। নিতান্ত কালবৈশাখীর ঝড় বা বৃষ্টিবাদলে নিরুপায় না-হলে এ-সব ঘরের দরজা-জানলা দিনরাত খোলাই থাকত। একটা ব্যাপার দেখে একটু বিস্মিত এবং গর্বিত বোধ করেছিলেন যে তখনই আশ্রমে যারা পরিচারকের কাজ করত তারা প্রায় সকলেই জাতের বিচারে অন্ত্যজ, অথচ সেটা কোনো সমস্যা ছিল না। পরে এ প্রসঙ্গ লিখতে গিয়ে স্বভাবতই তিনি মন্তব্য করেছেন : 'বলা বাহুল্য এ ঘটনা অসহযোগ আন্দোলনের বহু পূর্বে এবং ইহার মূলে সেই সময়ে কোনো রাজনৈতিক হেতু থাকিবার কথা ছিল না।'[১২]

শান্তিনিকেতন-প্রেরণার মূলে রবীন্দ্রনাথের যে লোকোত্তর চেতনা কাজ করেছে বলে ক্ষিতিমোহন অনুভব করছিলেন, সেই চেতনাকে তিনি স্পর্শ করতে পারছিলেন কয়েকটি গানে—সে গানগুলি হল : 'এ কী এ সুন্দর শোভা', 'মরি লো মরি আমায়', 'সখি আমারি দুয়ারে কেন', 'ওগো কাঙাল আমারে কাঙাল করেছ'। এ গানগুলির প্রতি সারাজীবনই তাঁর বিশেষ আকর্ষণ এবং দুর্বলতা ছিল। শান্তিনিকেতনে আসবার পরে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আশ্রম-আদর্শ নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে এ গানগুলি তিনি কবির স্বকণ্ঠে শুনলেন—কোনোটা বা কবি তাঁর অনুরোধে গাইলেন, কোনোটা বা গাইলেন নিজেরই ইচ্ছায়। ক্ষিতিমোহনের এও এক দুর্লভ স্মৃতি। কাশীতে স্বামী বিবেকানন্দের গলায় এরই কোনো কোনোটি শুনেছিলেন। 'এ কী এ সুন্দর শোভা' গাইতে গাইতে স্বামীজির চোখ জলে ভরে এসেছিল, সে গান গাইতে গাইতে কবির চোখও সজল হয়ে

উঠেছে দেখে তিনি কী রকম অভিভূত হয়ে গিয়েছিলেন সে কথা তাঁর মনে ছিল। এমন আশ্চর্য অভিজ্ঞতা কেই বা ভুলে যেতে পারে।[১৩]

আশ্রমের কাজ করতে গেলে তার আদর্শের স্পষ্ট পরিচয়টি পাওয়া দরকার—এ কথা অনুভব করে ক্ষিতিমোহন যখন আশ্রমগুরুর সহায়তা প্রার্থনা করেন, তখন 'তিনি তাঁর আপন হাতে লেখা একখানি দীর্ঘ পত্র আমায় দিলেন তাতে আশ্রমের ভাব ও কর্মের একটি পুঙ্খানুপুঙ্খ চিত্র রয়েছে।' রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্ত্রী মৃণালিনী দেবীর অন্তিম অসুস্থতার সময়ে আশ্রমের সেসময়কার কর্মাধ্যক্ষ কুঞ্জলাল ঘোষকে যে চিঠি লিখেছিলেন, এটি সেই চিঠি। চিঠিখানি সেই অবধি দীর্ঘকাল ক্ষিতিমোহনের কাছে ছিল।[১৪]

কয়েক বছর আগে বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ আন্দোলনের প্রবল উন্মাদনা থেকে শেষ পর্যন্ত সরে এসেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, স্থিরবিশ্বাসে বলেছিলেন : '...অগ্নিকাণ্ডের আয়োজনে উন্মত্ত না হইয়া যতদিন আয়ু আছে, আমার এই প্রদীপটি জ্বালিয়া পথের ধারে বসিয়া থাকিব।'[১৫] এবার কবির আহ্বানে তাঁর সেই আলোর ঠিকানায় এসে দাঁড়িয়েছেন ক্ষিতিমোহন। এইসময় রবীন্দ্রনাথ যে এঁদের সহায়তায় নতুন উদ্যমে তাঁর বিদ্যালয়ের কাজকে ফলবান ও সার্থক করে তুলতে চাইছিলেন, সে কথাটা খুব সংক্ষেপে স্পষ্ট করে বলেছেন নেপাল মজুমদার :

> বহির্জগৎ হইতে নিজেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করিয়া কবি শান্তিনিকেতন আশ্রম-বিদ্যালয়টিকে মনোমতো রূপদান করিতে চাহিলেন। এই সময়েই ক্ষিতিমোহন সেন শান্তিনিকেতনে আসেন। ক্ষিতিমোহন আসিয়াই আশ্রমের সকল কাজে কবির সহায়ক হইলেন। জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের যুগে কবি যে-সব পরিকল্পনা করিয়াছিলেন তাহাই এখন তিনি ক্ষিতিমোহন-বিধুশেখর প্রভৃতির সহায়তায় বাস্তবে পরিণত করিতে উদ্যোগী হইলেন।[১৬]

ক্ষিতিমোহনের সহায়তা সত্যই কতটা সহায়ক হল আশ্রমবিদ্যালয় রূপায়ণে, আশা করি তার চেহারাটা তাঁর জীবনকাহিনির মধ্য দিয়ে কিছুটা অন্তত স্পষ্ট হয়ে উঠবে। আপাতত তাঁর সেই প্রথম জীবনে-পাওয়া শান্তিনিকেতনের অনাড়ম্বর সহজ দিনগুলির অন্তরের সত্যটুকু স্মৃতিচারণ প্রসঙ্গে তিনি যেমন প্রকাশ করেছেন, তারই একটুখানি এইখানে উদ্ধৃত করি :

> ৩৫-৩৬ বছর পূর্বের কথা। তখন শান্তিনিকেতন ক্ষুদ্র একটি প্রতিষ্ঠান। অভাব ও দারিদ্র্যের অন্ত ছিল না। কিন্তু অল্প যে-কয়জন ছাত্র ও সেবকদের দল সে সময় আসিয়া জুটিয়াছিলেন তাঁহাদের গভীর প্রীতিতে এবং গুরুদেবের মহত্ত্বের অজস্রতায় সব দুঃখ দারিদ্র্যের উপর নিরন্তর এক আনন্দের বন্যা বহিয়া যাইত।[১৭]

আসবার আগে মনে অনেক প্রশ্ন ছিল, দ্বিধা ছিল। চিঠিতে রবীন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন, 'কি কাজ করিতে হইবে তাহার সামর্থ্য আমার আছে কিনা বুঝিলাম না।' যদিও বহুদিন পরে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বিনয় করে নিজের অসামর্থ্যের কথা বলেছেন, কিন্তু সত্যি সত্যি আসবার পরে আর নিজের সামর্থ্য-অসামর্থ্য নিয়ে বিচার করবার অবকাশই পাননি। শান্তিনিকেতনে আসবার পর থেকেই দাবিতে-প্রত্যাশায় তাঁকে ঘিরে ধরেছে আশ্রম, ঘিরেছেন আশ্রমগুরু।

যোগ দেওয়ার পরে

ক্ষিতিমোহন শান্তিনিকেতনে আসবার অল্পদিন পরে শিলাইদহ থেকে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে লেখেন :

শিলাইদা
নদিয়া

বিনয়নমস্কারপূর্ব্বক নিবেদন,

এখানকার কাজের তাগিদে চলিয়া আসিতে হইল। কিন্তু আপনাদের ছাড়িয়া আসিবার ইচ্ছা ছিল না। এখানকার কাজে আমি একলা—সেখানে আপনাদের সকলের সঙ্গে মিলিয়া কাজ করিবার আনন্দ আমাকে নড়িতে দিতেছিল না। বিশেষত আপনার সঙ্গে পরিচয় ঘনাইয়া তুলিবার ইচ্ছাও মনে প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু আমার সেখানকার মৌচাকে মধু বেশ ভরিয়া উঠিবার মুখেই আমাকে চাক ছাড়িয়া চলিয়া আসিতে হইল—মনটা এখনো সেইদিক চাহিয়াই ভন্‌ভন্ করিয়া ঘুরিয়া মরিতেছে।

আপনি মনে করিতেছেন আপনি কেবল আপনার ছাত্রদের লইয়াই কাজ করিবেন—সেটা আপনার ভুল। আমরাও আছি। রসের অভাব হয়, পাথেয় কম পড়িয়া যায়—পরস্পরের কাছে ধার না লইলে মাঝে মাঝে পথের ধারে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িতে হয়। ছাত্রদিগকে পাইয়া আমাদিগকে অবহেলা করিবেন না।

বিদ্যালয়ের মধ্যে যে সত্যের আবির্ভাবকে সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ দেখিতে চাই, আমাদের নানাবিধ দৈন্যবশত তাহার ব্যাঘাত ঘটিতেছে। যিনি আবিঃ তিনি বিদ্যালয়ে আমাদের কাছে আবির্ভূত হইতেছেন না। এই কয়দিনে মনে এই আশা লইয়া আসিয়াছি যে এবার আপনার জীবনও আমাদের এই প্রার্থনায় যোগ দিবে—আবিরাবীর্ম এধি। আমাদের চিন্তা আমাদের ইচ্ছা আমাদের চেষ্টা অহোরাত্র সত্য হউক এই কামনা অনেকদিন হইতে করিতেছি—আপনাকে পাইয়া আজ বল পাইলাম।

বিদ্যালয় সম্বন্ধে আপনি যেরূপ ব্যবস্থা করিতে ইচ্ছা করেন করিবেন। আপনার কাজের পথ আপনার নিজেকেই কাটিয়া লইতে হইবে—আমি কেবল এই দেখিব যাহাতে আপনার কোনো অনাবশ্যক ব্যাঘাত না ঘটে। উপকরণের মধ্যে অভাব এমনকি প্রতিকূলতা যথেষ্ট আছে কিন্তু মঙ্গল চেষ্টামাত্রই বিঘ্নের দ্বারাই পরিণত হইয়া উঠে। ঈশ্বরের কাছ হইতে সফলতা পুরস্কার প্রতিদিন চুকাইয়া লইবার চেষ্টা করিব না—মজুরি বাকি ফেলিয়াই চলিব, অকৃতার্থতার দ্বারাও তাঁহার পূজা করিব—এই যদি পারি তবেই জানিব কাজ অগ্রসর হইতেছে। নহিলে তাঁহার পূজা ছাড়িয়া কাজেরই পূজা হইবে।

আপনার সঙ্গে মিলনের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া রহিলাম। এখানকার কাজে ছুটি পাইলেই দৌড় দিব।

আমাদের কোষাধ্যক্ষের সঙ্গে সেই রান্নাঘর প্রভৃতি সম্বন্ধে পরামর্শ চলিতেছে। আপনিও তাঁহার সঙ্গে মন্ত্রণা করিবেন। অজিতকেও ডাকিবেন। অন্য অধ্যাপক যাঁহারা আপনাদের সঙ্গে যোগ দিতে ইচ্ছুক তাঁহাদের সকলের সঙ্গে আপনাদের সকলের ঐক্য ভাবের দিক হইতে বা প্রণালীর দিক হইতে হয়ত হইবে না। কিন্তু যাঁহারা কাছে আসিতে চান তাঁহাদিগকে দূরে ঠেলা চলে না। সমস্ত অনৈক্য সত্ত্বেও ধৈর্য্যের সহিত তাঁহাদেরও স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিতে হইবে। অমিলকে মিলাইয়া লইবার জন্য পথের যেটুকু দীর্ঘতা বাড়িয়া যায় তাহা স্বীকার করিয়া

লইতেই হইবে। কাজ জিনিষটা ত কেবল সঙ্কল্পমাত্র নহে—বস্তুর বিচিত্র বিরোধের মধ্যেই ভাবকে আকার গ্রহণ করিতে হয়—নিতান্তই যেটুকু অনুকূল তাহাই সৌখীনভাবে বাছিয়া লইবার জন্য অপেক্ষা করিলে চলে না। যাহারা যোগ দিতে চায় তাহারা যে যেমন হোক সবাইকে বেশ বড় রকম করিয়া টানিয়া যদি একটা মোটা রকম করিয়াও কাজের কাঠামো খাড়া করা যায় সেও ভাল—অতিমাত্র সংশয় এবং বিতর্ক এবং ভাববিলাসিতা আমাদিগকে যেন না পাইয়া বসে—একেবারে বড় রাস্তায় আমাদিগকে বাহির হইয়া পড়িতে হইবে—সেখানে ধূলাকাদা এবং বাজে লোকের ভিড় আছে বটে কিন্তু তেমনি বৃহৎ আকাশ, খোলা বাতাস এবং উদাব আহ্বান আছে। Whitman-এর Song of the Open Road পড়িয়া দেখিবেন। ইতি ৫ই শ্রাবণ ১৩১৫

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর[১৮]

কোন্ প্রত্যাশা নিয়ে এ-সব কথা লিখছিলেন রবীন্দ্রনাথ তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। আগের দিনই অজিতকুমার চক্রবর্তীকে ক্ষিতিমোহন-প্রসঙ্গে তাঁকে লিখতে দেখি :

তাঁকে পেয়ে বিদ্যালয়ে আমাদের সাধনা সার্থকতার দিকে অগ্রসর হবে বলে মনে খুব আশা হয়েছে। তোমরা উভয়ের বলে পরস্পব বলী হতে পারবে এবং বিদ্যালয়কে বল দান করবে। তোমাদের ছেড়ে আসতে আমার মন চাচ্ছিল না কিন্তু এখানকার কাজকে আর ফেলে রাখা সম্ভব ছিল না। এখানেও হৃদয়ক্ষেত্রে চাষ দেবার কাজ—অনেক শক্ত ঢেলা ভাঙতে হবে—জমিকে প্রীতিবর্ষণের দ্বারা সরস না করতে পারলে কোনো ফসল ফলবে না।[১৯]

আবার দু-দিন পরেই কালীমোহন ঘোষকে বোলপুরে স্বাস্থ্য-উদ্ধার করতে আসবার পরামর্শ দিয়ে লিখলেন :

আমার বোধ হয় তুমি যদি কিছুদিনের জন্য বোলপুরে বায়ুপরিবর্তন করিয়া আসিতে পার তবে তুমি শীঘ্র আরোগ্যলাভ করিতে পারিবে। সেখানে ক্ষিতিমোহন আছেন। অন্য হোমিওপ্যাথ ডাক্তারও বহিয়াছেন। আমি ভাদ্র মাসের মাঝামাঝি সেখানে যাইব।[২০]

ঠিক এক মাস পরে তাঁকেই লিখেছেন :

ক্ষিতিমোহনবাবু বোলপুর বিদ্যালয়ের কাজে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ইঁহাকে পাইয়া আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি—ইঁহার দ্বারা বিদ্যালয়ের বিশেষ উপকার হইবে তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই। তুমি যে আমাকে ইঁহার সন্ধান বলিয়া দিয়াছ সেজন্য আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ আছি।[২১]

বেশ কয়েক বছর থেকে শান্তিনিকেতনে প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা রবীন্দ্রনাথকে ঘিরে অধ্যাপকরা বসতেন, নানা বিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনা হত। অনেক সময় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো প্রবীণ সর্বজনশ্রদ্ধেয় আশ্রমিকও এই জমায়েতে কিছু বলতেন।[২২] ক্ষিতিমোহন এসে খুব আগ্রহভরে যোগ দিয়েছিলেন এই সান্ধ্য আড্ডায়। বহুদিন থেকে তাঁর ডায়েরি লেখার অভ্যাস। কাশীতে তার এক ধরন ছিল, শান্তিনিকেতনে সেটা অনেকটা পালটে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের মুখের কথা লিখে রাখার দিকেই ঝোঁক পড়ল। নিয়মিত তিনি

লিখে রাখতেন বিভিন্ন সভায় এবং শান্তিনিকেতন-মন্দিরে রবীন্দ্রনাথ যা বলতেন, লিখতেন সান্ধ্য আসরের কথাবার্তাও। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য আশ্রমবাসী বা বহিরাগত ব্যক্তিদের কথা বা তাঁদের প্রসঙ্গও সমুচিত শ্রদ্ধায় তাঁর দিনলিপিতে স্থান পেত। বহুদিন পর্যন্ত তিনি এই দিনলিপি লিখতেন দুপুরবেলা খাওয়া-দাওয়ার পরে। এই সময় ছাত্র-শিক্ষক সকলেই দুঘণ্টা অবসর পেতেন, এ সময়টাই ছিল একান্ত নিজস্ব সময়। আশ্রমজীবনের গোড়ার দিকটায় দীর্ঘদিন এই দুপুরটাতেই লেখাপড়ার কাজ, চিঠিপত্র লেখা সব কিছুরই সময় পাওয়া যেত। তাঁর দিনলিপি ছিল সম্পূর্ণ স্মৃতিনির্ভর আর এতে তাঁর দিনের হিসাব ছিল আগের দিনের অপরাহ্ণকাল থেকে সেদিনের মধ্যাহ্ন পর্যন্ত। কোনো সভায় বা ঘরোয়া আলোচনা-আসরে খাতা-কলমের ব্যবহার করতে অভ্যস্ত ছিলেন না। সূর্যাস্তের পরে বাতির আলোয় লেখাপড়া করতেও অনভ্যস্ত ছিলেন।[২৩]

পর্জন্য ও শারদ উৎসব

ক্ষিতিমোহন পরে তাঁর এই-সব দিনলিপির অংশ প্রবন্ধে ব্যবহার করেছেন, বিশেষত যখন রবীন্দ্র-বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন তখন দিনলিপির উপর নির্ভর করেছেন। যেমন, তাঁর আসবার পরে যে পর্জন্য-উৎসব হয় আশ্রমে, তার বিবরণ দিতে গিয়ে যে তার নেপথ্য কাহিনি শুনিয়েছেন, বেশ বোঝা যায় সেখানে তাঁর দিনলিপির বেশ একটু ভূমিকা আছে। তিনি লিখেছেন :

> মনে আছে একদিন বর্ষার সন্ধ্যা। কয়েকজন গুরুদেবের চারদিক ঘিরিয়া বসিয়া আছি। বর্ষার অজস্রতায় একটি গভীর ভাব সকলের মনকে পাইয়া বসিয়াছে। গুরুদেব বলিলেন, "যদি আমরা প্রকৃতির প্রত্যেকটি ঋতুকে অন্তরের মধ্যে উপলব্ধি করিতে পারি তবেই আমাদের চিত্তের সব দৈন্য দূর হয়, অন্তরাত্মা ঐশ্বর্যময় হইয়া উঠে। প্রাচীনকালে আমাদের পিতামহেরা হয়তো এই তত্ত্ব জানিতেন। তাই প্রাচীন কালের আয়োজনের মধ্যে ঋতুতে ঋতুতে প্রকৃতিকে উপলব্ধি করার যে-সব উৎসব ছিল তাহার একটু আধটু অবশেষ এখনও খোঁজ করিলে ধরা পড়ে। আমরাও যদি ঋতুতে ঋতুতে নব নব ভাবে উৎসব করি তবে কেমন হয়?" আমরা মনে মনে স্থির করিলাম এই বর্ষাতেই একটি বর্ষা উৎসব করিতে হইবে।[২৪]

এ ঘটনা রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহ যাওয়ার আগেকার। এর পর বেশ কিছুদিনের জন্য রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহ চলে গেলেন। ক্ষিতিমোহনের বিবরণ অনুসারে শ্রাবণ মাস শেষ হয়ে এল, বীরভূমের স্বল্পায়ু বর্ষা ঋতু যায়-যায় দেখে আর রবীন্দ্রনাথের ফেরার আশায় না-থেকে বিধুশেখর শাস্ত্রী দিনেন্দ্রনাথ অজিতকুমার এবং তিনি মিলে আশ্রমে বর্ষা উৎসবের আয়োজন করলেন।[২৫] পিছনে নীলপর্দা-টাঙানো সাদামাঠা মঞ্চে বৈদিক পর্জন্য দেবতার বেদি সাজানো হল, বৈদিক সংহিতা থেকে নির্বাচিত হল পর্জন্যস্তুতি। বিধুশেখর-ক্ষিতিমোহন রামায়ণ থেকে বর্ষাবর্ণনার উপকরণও পেলেন প্রচুর, কালিদাসের ঋতুসংহার এবং অন্যান্য সংস্কৃত কাব্য থেকেও তাঁরা বর্ষাবর্ণনা পাঠ করলেন। কাশীর মন্দিরে সকাল-

সন্ধ্যায় বেদের অতি সুন্দর গান গাওয়া হয়ে থাকে, সেই স্তোত্র ও সুর শেখানো হয়েছিল দিনেন্দ্রনাথকে, উৎসবে সদলে দিনেন্দ্রনাথ বৈদিক বর্ষাসংগীত 'অচ্ছা বদ তবসং গীর্ভিরাভিঃ'* গেয়েছিলেন, সেও সম্ভবত তাঁদেরই কাছ থেকে শিখে। বৈষ্ণব কবিদের বর্ষার গান ও কবিতা বেছে নেওয়া হয়েছিল, অজিতকুমার ইংরেজ কবিদের বর্ষার কবিতা নির্বাচন করেছিলেন। আর সব-শেষে স্থান পেয়েছিল রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি কবিতা ও গান।[২৬] 'মোটের উপর উৎসবটি ভালোই হইল।' স্মৃতিচারণ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন ক্ষিতিমোহন। লিখেছেন দিনেন্দ্রনাথ ও অজিতকুমারের চিঠিতে উৎসবের বর্ণনা পড়ে রবীন্দ্রনাথ খুশি হয়েছিলেন। এই পর্জন্য উৎসবের মধ্য দিয়ে শান্তিনিকেতন আশ্রমে বসন্তে-বর্ষায়-শরতে ঋতুবন্দনার সূচনা হল, যার উদ্‌বোধন করেছিলেন বালক শমীন্দ্রনাথ মাত্র কয়েকমাস আগে।

শান্তিনিকেতনের জীবনের প্রথম দিককার এই-সব ঘটনার স্মৃতি চিরকাল ক্ষিতিমোহনকে ঘিরেছিল। রবীন্দ্রস্মৃতিমূলক প্রবন্ধগুলিতে, আচার্যের প্রতিভাষণ-এ বারবার এ-সব কথা তিনি স্মরণ করেছেন। অনেকদিন পরে একবার রবীন্দ্রসপ্তাহে ঋতু-উৎসবের কথা বলতে গিয়েও এই প্রথম বর্ষা-উৎসবের কথা বলেছিলেন।[২৭] এমনই তাঁর মনে চির-অম্লান হয়ে ছিল প্রথম 'শারদোৎসব' নাটক অভিনয়ের স্মৃতি, কতবার যে সে কথা বলেছেন। তাঁর লেখায় পাই :

> ১৯০৮, বর্ষা গেল। খুব ভাল করিয়া শারদ-উৎসব করিবার জন্য কবি উৎসুক হইলেন। আমাদিগকে বলিলেন বেদ হইতে ভাল শারদ-শোভার বর্ণনা খুঁজিয়া বাহির করিতে। সংস্কৃত সাহিত্যের নানা স্থানে খোঁজ চলিল। কবি লাগিয়া গেলেন শরৎকালের উপযুক্ত সব গান রচনা করিতে। একে একে অনেকগুলি গান রচিত হইল। ক্রমে তাঁহার মনে হইল গানগুলিকে একটা নাট্যসূত্রে বাঁধিতে পারিলে ভাল হয়। তাহার পর তৈরি হইয়া উঠিল শারদোৎসব নাটক। এই গানগুলির মধ্যে দুই-একটি পুরাতন গানও আছে। 'তুমি নব নব রূপে এসো প্রাণে' গানটি ১৮৯৪ সালের পত্রে উল্লিখিত (ছিন্নপত্র, পৃ ২০১)।[২৮]

এই নাটক রচনার স্মৃতিচারণ আছে তাঁর অন্য প্রবন্ধেও। লিখেছেন :

> ...৩রা ভাদ্র তারিখে তিনি গান বাঁধিলেন 'বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ' ও 'অমল ধবল পালে লেগেছে'। ৭ই ভাদ্র গান হইল 'আমার নয়ন ভুলানো এলে'। ইহার প্রাক্তন রূপ ছিল 'আমার সফল স্বপন এলে'—তারপর করিয়া দিলেন 'আমার নয়ন ভুলানো এলে'। তখন তিনি প্রকৃতির শুধু হয়তো আনন্দ রূপটিই দেখিতেছেন। ক্রমে তাঁহার মনে আসিল একটি গভীর তত্ত্বকথা। বর্ষায় এই পৃথিবী আকাশ হইতে অজস্র রসধারা পায়, শরতে সৌন্দর্য ও সমৃদ্ধিতে পৃথিবী তাহা

* প্রসঙ্গ 'অচ্ছা বদ্ তবসং গীর্ভিরাভিঃ'।

বিশ্বভারতীর 'মন্ত্র, কবিতা, গান/সুর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর' বইতে এই মন্ত্রের স্বরলিপি আছে। গ্রন্থশেষে 'বিজ্ঞপ্তি' অংশে জানানো হয়েছে এই স্বরলিপি হিন্দি বিশ্বভারতী পত্রিকার শ্রাবণ-আশ্বিন ২০০৩ বিক্রমাব্দ (১৯৪৬) সংখ্যায় প্রকাশিত হয়, স্বরলিপিকার বিদ্যাধর ভেঙ্কটেশ ওয়াঝলওয়ার। ক্ষিতিমোহন-বিধুশেখরের পূর্বপরিচিত যে সুরে ১৯০৮ সালের বর্ষা উৎসবে এ মন্ত্র দিনেন্দ্রনাথ গান করেছিলেন, এই স্বরলিপি কি তাহলে সেই সুরের নয়? তাতে কি নতুন করে রবীন্দ্রনাথ সুরারোপ করেছিলেন? কোনো গবেষক অনুসন্ধান এবং আলোকপাত করলে ভালো হয়।

ফিরাইয়া দিয়া ঋণশোধ করে—এই কথাই গুরুদেবের মনের মধ্যে তখন ছিল ভরপুর হইয়া। সেই কথাটাই শারদোৎসবের বীজসত্য।[২৯]

এ-সব প্রবন্ধ যখন ক্ষিতিমোহন লিখছিলেন, রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরে তখন অল্পদিনই মাত্র কেটেছে, রবীন্দ্র-গবেষণার বিচিত্র দিকে তখনও কাজ শুরু হয়নি। রবীন্দ্রসংগীতের স্থান-কাল-উপলক্ষ সম্পর্কে তথ্য তখনও নিতান্ত অপ্রতুল। সেই সময়ের প্রেক্ষাপটে প্রবন্ধে এই ধরনের তথ্য উপস্থাপনের যথেষ্ট মূল্য ছিল। 'মেঘের কোলে রোদ হেসেছে', 'আজ ধানের খেতে', 'আনন্দেরি সাগর হতে', 'তোমার সোনার থালায়' 'নব-কুন্দ-ধবল-দল'—এ গানগুলিও এই সময়কার রচনা, ক্ষিতিমোহনের লেখা থেকে জানা যায়। অবশ্য 'গীতাঞ্জলি'-তে অনেক গানের রচনাকাল কবি নিজেই উল্লেখ করেছেন, কিন্তু এখনও তো রবীন্দ্র-রচনাবলীভুক্ত 'গীতাঞ্জলি'-তে 'আজ ধানের খেতে' বা 'তোমার সোনার থালায়' গানে রচনাবর্ষের পাশে প্রশ্নচিহ্ন দেওয়া আছে। এ নাটকের দ্বিতীয় দৃশ্যের বেদমন্ত্র 'অক্ষি দুঃখোত্থিতস্যৈব সুপ্রসন্নে কণীনিকে' ক্ষিতিমোহন বা বিধুশেখর সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন, ক্ষিতিমোহন স্পষ্ট উল্লেখ করেননি, ইঙ্গিত দিয়েছেন। তবে তিনি এটা স্পষ্ট জানিয়েছেন যে এই নাটকের বন্দীদের রাজপ্রশস্তি 'রাজরাজেন্দ্র জয়' রবীন্দ্রনাথ নিজেই এর আগে অন্য কোনো উপলক্ষে রচনা করেন।[৩০] 'শারদোৎসব' গ্রন্থে রচনা-তারিখ আছে ৭ ভাদ্র ১৩১৫, ক্ষিতিমোহনের বিবরণ অনুসারে সেইদিনই সন্ধ্যাবেলায় রবীন্দ্রনাথ আশ্রমের সকলকে নাটকটা পড়ে শোনালেন, স্বকণ্ঠে সব-কটি গান সহযোগে। বলা বাহুল্য সকলে মুগ্ধ। পাঠের মধ্য দিয়ে এক-একটি চরিত্রের সঙ্গে পরিচয় ঘটছে আর শ্রোতারা মনে মনে ঠিক করে ফেলছেন কাকে কোন্ ভূমিকাটা দেওয়া হবে।[৩১]

এর পরে কয়েকদিন মহড়া এবং তারপরে শারদ অবকাশের আগে ৮ আশ্বিন 'শারদোৎসব' অভিনয় হল।[৩২] অভিনয়ের দু-দিন আগে আমেরিকায় সন্তোষচন্দ্র মজুমদারকে রবীন্দ্রনাথ লেখেন :

এখানে আমাদের ছুটি নিকটবর্ত্তী হয়ে এল। অন্যান্য বারে ছুটির অনেক দিন আগে থাকতেই ছেলেদের মন বাড়ীমুখে চঞ্চল হয়ে ছুটত—এবারে একটা কল ফাঁদা গেছে। ছুটির ঠিক আগেই শারদোৎসব উপলক্ষ্যে ছেলেদের দিয়ে একটা নাটক অভিনয়ের আয়োজন করা হয়েছে—তাই সবাই খুব মেতে রয়েছে। তার পূর্ব্বে যাদের বাড়ী যেতে হচ্চে তারা প্রসন্ন মনে যাচ্চে না। কাল রাত্রে ড্রেস রিহার্সাল হয়ে গেছে—দিনু লক্ষেশ্বর বলে একটা পার্ট নিয়েচে সেই সবচেয়ে আসর জমিয়ে তুলেছিল। ছেলেদের মধ্যে ভাল অভিনেতা হচ্চে নরেন খাঁ এবং জ্যোতির্ম্ময়। জ্যোতির্ম্ময়কে তোমরা দেখনি। পর্শু আটই তারিখে অভিনয় হবে। কলকাতা থেকে অনেক আমন্ত্রিত দর্শক আসবে—বোলপুরের ভদ্রলোকদেরও সমাগম হবে। আমার বোধ হচ্চে অভিনয়টা মন্দ হবে না। শারদোৎসব নাটকটা ছাপা হয়ে গেছে—বোধ হয় এই মেলেই বইখানা তোমরা পাবে। তোমাদের চেনা লোকদের মধ্যে অজিত ঠাকুরদাদার পার্ট নেবে। ওর জন্যে কলকাতা থেকে পাকা গোঁফ এবং টাক জোগাড় করে আনিয়েচি। সেই ছদ্মবেশে ওকে একেবারেই চেনা যায় না। তোমরা ক্ষিতিমোহনবাবুকে চেন না—ইনি আমাদের নতুন অধ্যাপক—বেশ রসযুক্ত এবং খুব ভাল লোক। সংস্কৃত ভাষায় পণ্ডিত, এম. এ. উপাধিধারী—ইনি সন্ন্যাসীঠাকুর সাজবেন।[৩৩]

ভূপেন্দ্রনাথ সান্যালকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠিতেও এই অভিনয়ের কথা একটু আছে: 'শারদোৎসবের একটি নাটিকা রচনা করেছি। ...ক্ষিতিমোহনবাবু এবং অজিতকে যোগ দিতে হয়েছে...আশ্বিনের আরম্ভেই কোনো তারিখে উৎসব হবে।'[৩৪]

রবীন্দ্রজীবনী থেকে আমরা ধারণা করি নাটক অভিনয়ের সময় কবি নিজে ছিলেন প্রম্পটরের দায়িত্বে, কিন্তু ক্ষিতিমোহনের স্মৃতিচারণ সে কথা বলে না। কথাটা একটু বিস্তারিত করেই বলতে হয়। এ নাটকে রবীন্দ্রনাথ ক্ষিতিমোহনের জন্য ঠাকুরদার পার্টটাই নির্দিষ্ট করেছিলেন। বলেছিলেন অভিনয় করতে অসুবিধা হবে না—ঠাকুরদা তো হাতের কাছেই আছেন। একটা কথা বলা হয়নি. কাশীতে ছেলেবেলা থেকেই ক্ষিতিমোহনকে সকলে ডাকতেন 'ঠাকুরদা' নামে, এমনকী কলেজের সাহেব অধ্যাপকরা'ও তাঁকে এই নামে জানতেন। শান্তিনিকেতনে আসতে-না-আসতে নামটা জানাজানি হয়ে গিয়েছিল, কেননা এখানে তাঁর কাশীর পরিচিত ভূপেন্দ্রনাথ, বিধুশেখর ছিলেন। দিনেন্দ্রনাথ, অজিতকুমারের মতো কেউ কেউ সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর 'নাতি' বনে গেলেন। ঠাকুরদার ভূমিকায় অভিনয়ের জন্য ঠাকুরদা আছেন হাতের কাছেই—রবীন্দ্রনাথের এ কথার নিহিতার্থটুকু তাই ক্ষিতিমোহনের এই নামের মধ্যে আছে। কিন্তু ক্ষিতিমোহন কিছুতে রাজি হলেন না এ পার্ট নিতে। গান তাঁর নিজেরও খুব প্রিয়, নাটকের এই ঠাকুরদা চরিত্রটিও সংগীতময় এবং একটি অপূর্ব সৃষ্টি তা নিয়ে তাঁর দ্বিমত ছিল না। তবু মনে হল এ চরিত্রকে গানে-অভিনয়ে সার্থক করে তুলতে পারবেন না তিনি। তাঁর আপত্তি দেখে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে সন্ন্যাসী-রাজা বিজয়াদিত্যের পার্ট দিলেন, অজিতকুমার হলেন ঠাকুরদা। কিন্তু গান বিজয়াদিত্যকণ্ঠেও আছে। তখন ঠিক হল ক্ষিতিমোহন অভিনয় করবেন, এ চরিত্রের কণ্ঠে গান থাকলেও তা সংখ্যায় অনেক কম, সে গানগুলি তাঁর অভিনয়ের সঙ্গে কবি ভিতর থেকে গাইবেন। রবীন্দ্রনাথ যে সেবারে 'শারদোৎসব' নাটকের সন্ন্যাসী-রাজার গানগুলি নেপথ্য থেকে গেয়েছিলেন, এ কথাটার উল্লেখ ক্ষিতিমোহন ছাড়া আর শুধুমাত্র করেছেন সুধীরঞ্জন দাস। ক্ষিতিমোহন যেখানেই এই নাটক অভিনয়ের স্মৃতিচারণ করেছেন সেখানেই—অভিনয় ভালো হয়েছিল, দর্শকরা খুশি হয়েছিলেন এ কথা বলতে গিয়ে আপাত-গাম্ভীর্যে প্রচ্ছন্ন কৌতুকরস মিশিয়ে গানের খ্যাতির কারণে তাঁকে যে অনেকদিন ধরে কী বিড়ম্বনার মধ্যে পড়তে হয়েছিল, তার স্পর্শটুকু দিতে কখনও ভোলেননি।

> বাইরের লোকেরা আমার গান শুনিয়া চমৎকৃত হইলেন। সকলেই বলিলেন, "এতদিনে এমন একজন লোক দেখা গেল যিনি গানে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সমান পাল্লা দিতে পারেন।" সহজে এই কৃতিত্ব লাভ করিয়া খুব খুশী হইয়াছিলাম বটে, কিন্তু পরে এইজন্য আমাকে বহু দুঃখ সহিতে হইয়াছে। যেখানেই যাইতাম লোকে গানের জন্য করিতেন পীড়াপীড়ি। "পারি না" বলিলে কেহ বিশ্বাস করিতেন না। তাঁহারা স্বকর্ণকে কেমন করিয়া অবিশ্বাস করিবেন। বহুদিন পর্যন্ত আমার দুর্গতির আর অন্ত ছিল না।[৩৫]

এই প্রথমবার 'শারদোৎসব' অভিনয়ে সুধীরঞ্জন দাস ছিলেন বালকদের দলে। সে-বার লক্ষেশ্বর হয়েছিলেন দিনেন্দ্রনাথ, কিন্তু সুধীরঞ্জনের স্মৃতিতে এই ভূমিকায় জগদানন্দ রায়ের

অভিনয়টাই ধরা ছিল, তিনিও বহুবার 'শারদোৎসব'-এ লক্ষেশ্বরের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। লক্ষেশ্বর চরিত্র-অভিনেতার আশ্চর্য প্রাণবন্ত অভিনয়ের বিপরীতে ক্ষিতিমোহনের অভিনয় বিচার করে সুধীরঞ্জন লিখেছেন,

> ক্ষিতিবাবুর শান্ত গম্ভীর কণ্ঠস্বর সন্ন্যাসীব সুগভীর বাক্যগুলিকে আরো যেন অর্থদ্যোতক করে তুলেছিল। আতিশয্যহীন অভিনয়ে কথাগুলি যেন সজীব হয়ে আমাদেব বালক-মনকেও স্পর্শ করেছিল। সন্ন্যাসীর গানগুলি গুরুদেবই গেয়েছিলেন অন্তরাল থেকে।[৩৬]

সেকালে শারদোৎসব বারবার অভিনীত হত। প্রমথনাথ বিশীর স্মৃতিচারণ থেকে জানা যায় পরে যখন 'শারদোৎসব' হয়েছে, ববীন্দ্রনাথ স্বয়ং নিতেন সন্ন্যাসীছদ্মবেশী রাজা বিজয়াদিত্যের ভূমিকা, কিন্তু যখন 'শারদোৎসব'-এর নবরূপ 'ঋণশোধ' অভিনয় হল, তখন রবীন্দ্রনাথ শেখর কবি ও ক্ষিতিমোহন সন্ন্যাসী-রাজার ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন।[৩৭]

ঠাকুরদা নামের প্রসঙ্গ। প্রথম শারদ অবকাশে একটি চিঠি

ক্ষিতিমোহনের ঠাকুরদা নামের প্রসঙ্গটা আবার একটু তোলা যাক। এ যে তাঁর ছেলেবেলাকার ডাকনাম তা না-জেনে অনেকে তাঁর চরিত্রের সঙ্গে মিলিয়ে এ নামের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। সহকর্মী অধ্যাপক প্রমদারঞ্জন ঘোষ লিখেছেন :

> জানি না কে প্রথম তাঁর ঠাকুর্দা নামকরণ করেন। যিনি ঐ নামকরণ করেন তিনি বোধহয় শারদোৎসব নাটকের সদানন্দ ঠাকুর্দা বা দাদাঠাকুরের চরিত্র আর সুবিদ্বান অথবা হাস্যরসিক ক্ষিতিবাবুর চরিত্র, এ দুয়ের মধ্যে কিছু মিল দেখেছিলেন। ...একদিকে সুবিদ্বান ক্ষিতিবাবু ছিলেন জ্ঞানীসমাজে উচ্চ আসনের অধিকারী, অপরদিকে আসর জমাবার ক্ষমতাও তাঁর ছিল অসাধারণ। তাই বোধ হয় শান্তিনিকেতনে তিনি ঠাকুর্দা নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁকে তাঁর সহযোগীরা ঠাকুর্দা বলেই সম্বোধন করতেন ; আর ক্ষিতিবাবুর স্ত্রীও অল্পবয়স থেকেই, নিজের নাতি-নাতনী লাভের পূর্ব থেকেই, পত্নীর অধিকারবলে ছিলেন আশ্রমের ঠান্‌দিদি।[৩৮]

ক্ষিতিমোহনের আর-এক সহকর্মী অসিতকুমার হালদার মন্তব্য করেছেন :

> অধ্যাপক ক্ষিতিমোহন সেন ছিলেন আমাদের প্রিয় বন্ধু। আমরা সবাই তাঁর প্রত্যক্ষদর্শী অভিজ্ঞ জ্ঞানবৃদ্ধ ভাব দেখেই ঠাকুর্দা বলতুম, যদিও বয়সে তেমন কিছু বড় ছিলেন না তিনি অন্যান্য শিক্ষকদের চেয়ে।[৩৯]

শান্তিনিকেতনের ছাত্র জয়ন্তীলাল আচার্য ক্ষিতিমোহনের খুব প্রিয় ছিলেন। ১৯৩৮ সালে আমেদাবাদে ক্ষিতিমোহন যে-সব আলাপ-আলোচনা করেছিলেন, পত্রিকায় তার অনুলেখন প্রকাশকালে আলোচক-পরিচিতি দিতে গিয়ে একই ভুল তিনিও করেছেন। তিনি লিখলেন, আসর জমানোর যে অব্যর্থ এবং অদ্বিতীয় কৌশল আচার্য ক্ষিতিমোহনের, অতি গম্ভীরকে সহজ করে বোঝাবার যে অতুলনীয় প্রণালি; জয়ন্তীলালের দুর্বল ভাষার জন্য লেখায় তা যথাযথরূপে প্রতিবিম্বিত হতে পারবে না। এই বিস্ময়কর সরস স্বভাবের জন্যই বঙ্গদেশে তাঁকে ঠাকুরদা আখ্যা দেওয়া হয়েছে।[৪০]

'শারদোৎসব' নাটকের প্রথম পাণ্ডুলিপি রবীন্দ্রনাথ উপহার দিয়েছিলেন ক্ষিতিমোহনকে। সেটি ও 'গীতাঞ্জলি'-র একটি পাণ্ডুলিপি তাঁর কাছেই ছিল। অনেকদিন পরে তাঁর পুত্র ক্ষেমেন্দ্রমোহন সেনের সৌজন্যে সেগুলি বিশ্বভারতী-রবীন্দ্রভবনে এসেছে।

ক্ষিতিমোহন চিরপথিক, সারা জীবন তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন সাধুসন্ত আউল-বাউলের সন্ধানে। তীর্থভ্রমণের নেশায়, জীবনপথের পাথেয়ের খোঁজে তিনি ঘরছাড়া। তাঁর সেই ঘরছাড়া মনকে শান্তিনিকেতন কখনও প্রতিহত করেনি। প্রথম এসে নতুন বন্ধুদের কাছে বলেছিলেন চম্বার আমন্ত্রণের কথা। তাঁরাও উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। পুজোর ছুটিতে ক্ষিতিমোহন প্রথমে এলেন বকসারে, সঙ্গে অজিতকুমার, দিনেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ও একটি ছাত্র চণ্ডীচরণ সিংহ। বকসারে গঙ্গার ধারে মধুসূদন সেনের অফিস ও বাড়ি, এঁরা আসবার পরে গানে গানে সমস্ত গঙ্গাতীর মুখরিত হয়ে উঠল।[৪১] বকসার থেকে কিরণবালা ও তাঁর ভাই ভ্রমণসঙ্গী হলেন। উত্তর ভারতের অনেকগুলি জায়গায় বেড়িয়ে ক্ষিতিমোহনরা এলেন অমৃতসরে। এখান থেকে চম্বার পথ খুব দীর্ঘ না-হলেও ব্যয়সাধ্য। ততদিনে ছুটি এবং পাথেয় তলানিতে এসে ঠেকেছে। সেজন্য আর যেতে সাহস হল না।

বাকি কয়েকটা দিন তাঁরা অমৃতসর এবং লাহোরে কাটিয়ে দিলেন। অথচ চম্বার নিমন্ত্রণ মনে নিয়েই তো তাঁরা আশ্রম থেকে বেরিয়েছিলেন। তবে একেবারে লোকসান হয়নি, সঞ্চয়ের ঝুলিতে কিছু জমাও হল এ যাত্রায়। যাওয়ার আগে রবীন্দ্রনাথ দিনেন্দ্রনাথকে এসরাজ যন্ত্রটা সঙ্গে নিতে বলেছিলেন, পথে হয়তো প্রয়োজনে লাগবে। এ প্রস্তাবের মধ্যে আর্থিক উপার্জনের চেয়ে গভীরতর কোনো ইঙ্গিত ছিল এমন নাও হতে পারে। একটু পরে ক্ষিতিমোহনকে এই সময়ে লেখা রবীন্দ্রনাথের একটা চিঠি আমরা উদ্ধৃত করব, সেখানে এই প্রসঙ্গটা আছে। সেখানে রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট লিখেছেন, দিনেন্দ্রনাথ এই যন্ত্র বাজিয়ে প্রয়োজনে কিছু সংগ্রহ করে আনতেও পারেন, কলকাতায় তেমন কাজ তিনি করেছেন কয়েকবার। এ ঘটনার বহুদিন পরে ক্ষিতিমোহন যখন স্মৃতিচারণ করেছেন, তাঁর মনের মধ্যে যেন রবীন্দ্রনাথের এই কথার সঙ্গে 'ফাল্গুনী'-র অন্ধ বাউলের গানের সুরে পথ দেখতে পাওয়ার নিগূঢ় ব্যঞ্জনাটুকু মিশে গিয়েছিল :

> যাত্রা করিবার সময় একটি এস্রাজ হাতে দিয়া দিনুবাবুকে কবি বলিলেন, "এই যন্ত্রটা সঙ্গে রাখিস। যখন আর উপায় থাকিবে না তখন দেখিস এই যন্ত্রের সুরে গান গাহিয়া তোরা পথ পাইবি।" তাঁহার এই ভবিষ্যদ্বাণী পরে আমাদেব বড় কাজে লাগিয়াছিল।[৪২]

একটু আগে বলেছিলাম চম্বা না-গিয়ে অমৃতসর-লাহোরে কয়েকটা দিন তাঁরা কাটিয়েছিলেন এবং সেটা একেবারে বৃথা যায়নি। এই ক-দিনে শিখদের গুরুদরবারে এবং অন্যত্র চমৎকার সব ভজন শোনেন তাঁরা, সুর সহ তার কয়েকটি সংগ্রহ করেন। রবীন্দ্রনাথের ভবিষ্যদ্‌বাণী কাজে লাগার তাৎপর্য এটাই। এই গান সংগ্রহে ক্ষিতিমোহনের ভূমিকা নিতান্ত গৌণ ছিল না। তাঁর সংগ্রহ-করা মূল শিখভজন অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথ 'বাজে বাজে রম্যবীণা' রচনা করেন 'রূপান্তর' থেকে জানা যায় এবং সেখানে স্পষ্ট নাম উল্লেখ না-থাকলেও অনুমান হয় আর যে শিখভজনটি এই সময় কবি ভাবে ও সুরে অপরিবর্তিত রেখে 'এ হরি সুন্দর' রচনা করেছিলেন, সেটিও ক্ষিতিমোহনেরই সংগৃহীত।

এই প্রসঙ্গে খুব স্পষ্ট তথ্যের উল্লেখ আছে সুধীরচন্দ্র করের লেখায়। পুজোর ছুটির পরে আশ্রমে ফিরে "প্রখরস্মৃতি ক্ষিতিবাবু 'বাদে বাদে রম্যবীণা বাদে', 'এ হরি সুন্দর' ও 'আজু কারি ঘটা ধুম কর আই' এই তিনটি গানের সুর ও কথা স্মৃতি থেকে উদ্ধার করে গুরুদেবকে শোনান। তাঁর ভালো লাগল।" এই তিনটি ভজনের সুর নিয়ে রবীন্দ্রনাথ রচনা করলেন : 'বাজে বাজে রম্যবীণা বাজে', 'এ হরি সুন্দর' এবং 'আজি নাহি নাহি নিদ্রা আঁখিপাতে'।[৪৩]

এবারে রবীন্দ্রনাথের সেই চিঠি উদ্ধৃত করি যার মধ্যে এসরাজ সঙ্গে নেওয়ার পরামর্শ আছে। এ চিঠি সদ্য-অভিনীত 'শারদোৎসব' নাটকের অনুষঙ্গমাখা, সহজ কৌতুকরসে-সিক্ত। এই একটি চিঠিই তাঁকে 'তুমি' সম্বোধনে লিখতে দেখি ক্ষিতিমোহনকে। আশ্রমিক খবরাখবর এবং ব্যক্তিগত কথা যা আছে তাও বাদ দিলাম না। রবীন্দ্রনাথ-ক্ষিতিমোহন সম্পর্ক ভাবের জগতেও যেমন, কাজের জগতেও তেমনই, সেখানে কিছুই ত্যজ্য নয়।

ওঁ

সন্ন্যাসীঠাকুর

লক্ষেশ্বর শেষকালে গেরুয়া ধরলে। তোমার চেলাধরা ব্যবসা দেখচি। এবার তার সঙ্গে ভাগে ব্যবসা করে তাকে লাভের অংশ কিছু দিয়ো—আমারও অংশীদার হবার ইচ্ছা ছিল—কিন্তু আমার দেবী আছে দেখচি, সব ব্যবসা এখনো ছাড়বার মত সময় হয় নি।

তোমার চেলাকে এসরাজ যন্ত্রটা নিয়ে যাবার কথা বলেছিলুম— জানি নে কি করেচে— পথের মধ্যে পাথেয়ের অভাব ঘটলে ঐ যন্ত্রটার সাহায্যে কিছু উপার্জ্জন করে তোমাদের সেবায় দিতে পারত। আমার প্রভু আমাকে কেবলি পুঁথি চিত্রবিচিত্র করে লিখতেই শিখিয়েছেন, সেটা যে পেট ভরবার বিদ্যা নয় তা বেশ বুঝতে পেরেচি। কিন্তু তোমার চেলা তার বাদ্যযন্ত্রটির যোগে হয়ত ঝুলি ভরে আনতেও পারে। এ কাজ সে কলকাতায় দু একবার করেচে। কিন্তু আমি ভাবচি তোমরা একদল বাঙালী পাঠশালা পলাতক, পশ্চিম দিগ্বিজয়ে চলেচ— রাজা তোমাদের প্রতি সন্দেহ করবে না ত? মাঝে মাঝে কোতোয়াল তোমাদের তল্পি ঝাড়া দেবে সন্দেহ নেই। আমাদের আশ্রম শূন্য হয়ে এল। ছেলেদের মধ্যে কেবল পটল ও ভোলা আছে— অধ্যাপকদের মধ্যে শাস্ত্রীমশায় শরৎবাবু ও যতীন এবং বাজে লোকদের মধ্যে ম্যানেজারবাবু ও আমি, ডাক্তার আজ যাচ্চেন সঙ্গে যাবেন হীরালাল, প্যারীকে খুব কুইনীন ঠুকে খাড়া করা হয়েছে—সেই খুঁটির জোর আবার যখন ক্ষীণ হয়ে আসবে তখন আবার হয়ত সে কাৎ হয়ে পড়বে। তেজেশ লাইব্রেরীর মধ্যে নিমগ্ন। আমার সম্বন্ধী কাল বোধ হচ্চে যাবে। বেলা পিসীমা ত আগেই গেছেন।

তোমার নাতি ভূপেনবাবুর সঙ্গে সাবেহগঞ্জে গেছে। প্রতাপ মজুমদার আমার বোট অধিকার করাতে আমার যেতে দেরী হবার আশঙ্কা হয়েছে। সেদিন পর্য্যন্ত তোমার নাতি ভূপেনবাবুর আতিথ্য আশ্রয় করে থাকবে। তোমার নাতি সম্বন্ধে আমার মন উৎকণ্ঠিত আছে। মাঝে মাঝে আমার নাতিটির এবং সন্ন্যাসীঠাকুরের খবরটা যেন পাওয়া যায়। ইতি ১১ই আশ্বিন ১৩১৫

ত্বদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর[৪৪]

উত্তর-পশ্চিম ভারতে ভ্রমণের আনন্দটুকু ফেরবার পরে বজায় থাকেনি। লাহোর-অমৃতসর থেকে দিনেন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য জ্বর নিয়ে ফেরেন, দিনেন্দ্রনাথ

চিকিৎসায় বেঁচে যান। সত্যেন্দ্রনাথ সেই মাত্র কয়েক দিনের জ্বরে মারা গেলেন। ক্ষিতিমোহন সোজা স্বগ্রামে চলে গিয়ে থাকবেন, আশ্রমে ফিরতে তাঁর দেরি হয়েছিল। বিদ্যালয় খুলে গেছে অথচ ক্ষিতিমোহন তখনও কাজে যোগ দেননি, রবীন্দ্রনাথ সেজন্য উদ্‌বিগ্ন বোধ করেছিলেন।[৪৫]

সেই সাময়িক বিলম্বের অন্তরায় কেটে গিয়েছিল নিশ্চয়, আশ্রমে ফিরে ক্ষিতিমোহন যথাকর্তব্য পালনে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। এইখানে স্ত্রীকে লেখা তাঁর একটি চিঠির একাংশ উদ্ধৃত করব। শান্তিনিকেতনে এসে আশ্রম ও তার পারিপার্শ্বিকের বর্ণনা দিয়ে যে চিঠি লিখেছিলেন, এটি তারই অংশ, গোড়ার পাতাটা পাইনি বলে তারিখটা জানা যাচ্ছে না। দেখা যাচ্ছে, ক্ষিতিমোহন এ সময় তাঁর দৈনন্দিন জীবনে কায়িক সংযম ও কৃচ্ছ্রসাধনের পথে আত্মোন্নতির চেষ্টা করবেন ভাবছিলেন।

> এখানে আমি সুখাকাঙ্ক্ষাব সঙ্গো যে যুদ্ধ করিতে চাহিতেছি তাহা বড় সামান্য যুদ্ধ নহে! কতদূর সমর্থ হইব তাহা ভগবানই জানেন। আমি শীঘ্রই কঠোর তপশ্চরণ আরম্ভ করিব। আমার নিভৃতে থাকিবার জন্য রবীন্দ্রবাবু একখানা ঘর করিয়া দিতেছেন। সেখানে আমি আমার প্রয়োজনে মৌন হইয়া কিছু দিন ও রাত্রি যাপন করিব। আমি ভৃত্যের কোন সেবা লইব না। ভাত এখনই খাই না—তখন ফলমূল ও ছোলা খাইয়া দুগ্ধপান করিয়া কালযাপন করিব। খালি চৌকীতে শুইব—আমার পানেব ও স্নানের জল নিজেই তুলিয়া আনিব। এইরূপে সর্ব্বপ্রকারে নিজেকে বঞ্চিত করিয়া—নিজেকে কঠোর শাসনের বশবর্ত্তী করিয়া নিজেকে শাসন করিতেছি। ছাতা বা জুতা ব্যবহার করি না—আহারাদি অত্যন্ত মোটা রকমের করি—কিন্তু তথাপি আমার বেশ সবল লাগিতেছে। আমার হৃদয় তথাপি দুর্ব্বল বোধ করি— আশীষ কর সবল হউক। আমার চিত্ত হইতে সব বিদ্বেষ, সব ক্রোধ গ্লানি মলিনতা দূর হউক। কাহাকেও যেন ব্যথা দিবার প্রবৃত্তি আমার মনে উদিত না হয়। আমার অপকারীকেও যেন অন্তর হইতে প্রীতি করিতে পারি। এই কঠোর সাধনায় আমার বল কোথাও পাইব?[৪৬]

এ চিঠি পড়ে আমাদের মনে হবেই যে, শান্তিনিকেতন আশ্রমে সংযমে, চারিত্রে, শৃঙ্খলাবোধে, আনন্দময়তায় যে জীবনচর্যায় দীক্ষা আহ্বানের প্রেরণা ছিল রবীন্দ্রনাথের কাজে এবং কথায়, ক্ষিতিমোহনের এই সংকল্পের অনেকটাই তার সঙ্গো মিলছে না। শান্তিনিকেতনে যে জুতো-ছাতার ব্যবহার ছিল না, সেও তো কৃচ্ছ্রসাধনের জন্য নয়। যে আকাশ-মাটি-জল-আলো-বাতাসের ঐশ্বর্য আমাদের চারপাশে, শিশুদের তার মধ্যে ছাড়া পাওয়ার অধিকার রবীন্দ্রনাথ ফিরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। মানুষকে সচেতন করতে চেয়েছিলেন যাতে সে নানা আববণে নিজেকে আবৃত করে জন্মগত অধিকারে-পাওয়া আপন সম্পদ থেকে আপনাকে বঞ্চিত করে না-রাখে।

তবে ক্ষিতিমোহনের মধ্যে যে সহজ জীবনীশক্তি এ পর্যন্ত দেখে এলাম, মনে হয় না 'নিবৃত্তিকেই একটা প্রচণ্ড প্রবৃত্তি করিয়া তোলা'-র মতো ভুল তিনি করবেন, তেমন প্রমাণও পাইনি। রবীন্দ্রনাথের কথাই মনে পড়ে। চাষা যখন লাঙল দিয়ে মাটি বিদীর্ণ করে, মই দিয়ে ঢেলা ভেঙে নিড়ানি দিয়ে সমস্ত ঘাস-গুল্ম উপড়ে ফেলে, আনাড়ি লোকের মনে হতে পারে জমিটার উপর উৎপীড়ন চলছে। কিন্তু এমন করেই ফল ফলাতে হয়। চাষা

তো আর ক্ষেত্রকে মরুভূমি করবার জন্য খেটে মরে না।[৪৭] ক্ষিতিমোহনও তখন আত্মগঠনপর্বের একটি স্তরের ভিতর দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি সুর বেঁধে নিচ্ছিলেন তাঁর যন্ত্রটিতে, একটি সুসংযত, সুসংহত জীবনযাপনার গতিপথ প্রস্তুত করছিলেন। আহার ও জীবনযাত্রার অন্যান্য ব্যাপারে সংযম তাঁর স্বভাবেই ছিল, সে সংযম চিরদিন পালন করেছেন। আবার সচেতন প্রয়াসও যে ছিল তার পিছনে, যুবক ক্ষিতিমোহনের এই চিঠির ভাবনা সেই সাক্ষ্য দেয়। 'তোমারি রাগিণী জীবনকুঞ্জে বাজে যেন সদা বাজে গো'—তাঁর নিভৃত অন্তরের প্রার্থনায় যেন তারই সুর শুনি—মন থেকে সব বিদ্বেষ ক্রোধ গ্লানি ও মলিনতা দূর হোক, দূর হোক কাউকে ব্যথা দেওয়ার প্রবৃত্তি। নিজেকে সম্পদবান করে তুলতে কবির কাছে ভিক্ষাপাত্র পেতেছেন এতদিন, এবার প্রত্যক্ষ তাঁর ধ্যানের প্রসাদ পাওয়ার জন্য তাঁর কাছে আবেদন জানালেন।

রবীন্দ্রনাথের 'শান্তিনিকেতন'

ভোরেই ওঠার অভ্যাস নিজের। তখন লক্ষ করতেন গুরুদেব তাঁর আগেই ওঠেন, মুক্ত আকাশেব তলায় ধ্যানে বসেন। আবাল্য আধ্যাত্মিক ব্যাকুলতায় তীর্থে-মঠে-আশ্রমে-আখড়ায ঘুরে ঘুরে বেড়িয়েছেন, সাধু-মহাত্মাদের মুখে তাঁদের নিজস্ব উপলব্ধির কথা শুনতে জঙ্গালে-শ্মশানে কোথায় না গেছেন ক্ষিতিমোহন। তাই গুরুদেবের ধ্যানলব্ধ ঐশ্বর্যের একটুখানি প্রসাদকণিকা পাওয়ার জন্য মন উৎসুক হত। আবেদন জানিয়ে ফল হল না, এ ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের গভীর সংকোচ ছিল। অবশেষে একদিন—সেদিন ১৬ অগ্রহায়ণ, ক্ষিতিমোহনের জন্মদিন, সেইদিন ক্ষিতিমোহন রবীন্দ্রনাথকে প্রণাম করে এই আশীর্বাদ ভিক্ষা চাইলেন। সংকোচ সত্ত্বেও এবার আর তিনি ফিরিয়ে দিতে পারলেন না, কিছুদিনের জন্য সম্মত হলেন। ক্ষিতিমোহন লিখেছেন :

> শীতকাল। অগ্রহায়ণ মাস। শান্তিনিকেতনের মন্দিরের বারান্দায় শেষরাত্রি ৪॥ টায় আমরা কয়েকজন একত্র হইতাম। তিনি তারও বহুপূর্বে সেখানে বসিতেন। ৪॥ টা হইতে ৫টা আমরা তাঁহার সদ্য-প্রাপ্ত ভাগবত সত্যের কিছু প্রসাদ পাইয়া উঠিয়া যাইতাম। তিনি তাহার পর আরও অনেকক্ষণ সেই আসনে বসিয়া থাকিতেন। কিছুকাল এইরূপ চলিল। যাঁহারা যাইতেন তাঁহারা তাহাতে খুবই উপকৃত ও তৃপ্ত হইতেন। কিন্তু তিনি আপনার মর্মের এইসব কথা শুনাইতে বড়ই সংকোচ বোধ করিতেন। কিন্তু তিনি কোথাও গেলে বা অন্য কারণে মাঝে মাঝে বাধাও পড়িত। তবু প্রতিদিন প্রভাতের এই ব্যবস্থা বেশীদিন চলিল না। ছয়টি মাস পূর্ণ না হইতেই তিনি নম্রভাবে একান্ত সংকোচ জানাইয়া বিদায় লইলেন।[৪৮]

এই হল রবীন্দ্রনাথের 'শান্তিনিকেতন ভাষণমালা' সূচনার ইতিবৃত্ত। প্রসঙ্গক্রমে ক্ষিতিমোহন লিখেছেন :

> ১৩১৫ সালের ১৭ই অগ্রহায়ণ হইতে ১৩১৬ সালের ৭ই বৈশাখ পর্যন্ত তিনি তাঁহার ঐসব অধ্যাত্ম মুহূর্তগুলির কথা লিখিয়া গিয়াছেন যাহা, তাহা আমাদের ভাষায় এক অমর সম্পদ

> হইয়া রহিল। ইহার পর তিনি উৎসবে বা বিশেষ কোনো কোনো দিনের উপাসনায় প্রকাশ্যভাবে যাহা বলিয়াছেন তাহার দ্বারাই শান্তিনিকেতনের এই ধারাকে বজায় রাখা হইয়াছে। প্রত্যুষের এই প্রসাদ বিতরণ আর চলে নাই।[৪৯]

একটি তথ্য উল্লেখযোগ্য। ক্ষিতিমোহন নিজেও লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ এই প্রভাতি উপাসনা শুরু করেন ১৭ অগ্রহায়ণ, আমাদের ধারণা 'শান্তিনিকেতন ভাষণমালা'-র তারিখ অনুসরণেই তিনি এ কথা বলেছেন। কিন্তু ড. প্রশান্তকুমার পাল লিখেছেন : "এর প্রথম রচনাটি 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত' 'কলিকাতা ১৭ অগ্রহায়ণ ১৩১৫' স্থান-কাল-চিহ্নিত। কিন্তু ক্ষিতিমোহনের বক্তব্য অনুযায়ী, ১৬ অগ্রহায়ণ তাঁর একটি বিশেষ দিনের আশীর্বাণীরূপেই প্রথম ভাষণটি শান্তিনিকেতন মন্দিরের বারান্দায় রাত্রিশেষে প্রদত্ত হয়েছিল।" ক্যাশবইতে হিসাব পাওয়া যাচ্ছে ১৬ অগ্রহায়ণ রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় আসেন, তা থেকে অনুমিত হয়েছে পূর্বদিনের প্রদত্ত ভাষণটি রবীন্দ্রনাথ পরের দিন কলকাতায় লেখেন এবং সেই অনুসারেই তার স্থান-কাল চিহ্নিত হয়। পরের ভাষণ 'সংশয়'ও সম্ভবত আগের দিনেই দেওয়া ভাষণ, সে-ও পরের দিন কলকাতায় লিখিত রূপ নিয়েছিল।[৫০]

তারিখের নির্দিষ্টতার চেয়ে যে কথাটি বড়ো, সেই একটি বড়ো প্রাপ্তি শান্তিনিকেতনের জীবনে ক্ষিতিমোহনের চিত্তকে নিত্যই অভিষিক্ত করেছে। যাকে তিনি 'উষালগ্নের সোপান-উপাসনা' বলেছেন, বাইরের দিক থেকে দেখতে গেলে তার প্রবাহ রুদ্ধ হলেও আসলে 'শেষ হয়ে হইল না শেষ'। তাঁর শিক্ষক এবং গুরুসদৃশ মহামহোপাধ্যায় সুধাকর দ্বিবেদী তাঁর স্বাভাবিক মনের টান যেদিকে সেই পথের সঠিক সংকেতটি ধরিয়ে দিয়েছিলেন। শান্তিনিকেতনের দিগন্তপ্রসারী পটভূমিতে সহজ জীবনযাপন ও গভীর ভাবসাধনের নিত্য আহ্বান তাঁকে তাঁর কাঙ্ক্ষিত পথে চলতে সহায়তা করেছে। আর ছিলেন আশ্রমগুরু রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং, তাঁর শান্তিনিকেতন-জীবনদর্শন ক্ষিতিমোহনকে আমোঘ আকর্ষণে টেনেছে। ব্যক্তিগত প্রয়োজনেও আশ্রমগুরুর কাছে তাঁর তৃষিত মন সর্বদাই অঞ্জলি পেতেছে, ব্যর্থও হয়নি।

শান্তিনিকেতন মন্দিরের পূর্বদিকের সিঁড়ির উপরে শেষরাতের আবছা অন্ধকারে সমবেত সামান্য কয়েকজন আগ্রহী প্রাণের কাছে রবীন্দ্রনাথ যে কথাগুলি বলতেন, সেইগুলিই 'শান্তিনিকেতন ভাষণমালা'-র প্রথম খণ্ডরূপে আত্মপ্রকাশ করে। তখন এবং পরে শান্তিনিকেতন মন্দিরে দেওয়া কবির ভাষণগুলির সংকলন প্রকাশের কাজে কোনো কোনো শ্রোতার অনুলিখন তাঁর সহায়ক হয়েছে। সেই একেবারে প্রথম দিকের ভাষণগুলির লিখিত রূপ প্রস্তুতে ক্ষিতিমোহনের দিনলিপির লেখাগুলির যথেষ্ট সাহায্য পাওয়া গিয়েছিল। তিনি নিজে মন্তব্য করেছেন :

> ... উপনিষদের বাণী লইয়া রবীন্দ্রনাথ যে নব নব তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা শান্তিনিকেতন হইতে প্রকাশিত হয়। এই প্রকাশনার কাজে আমি উদ্যোগী ও উৎসাহী ছিলাম।[৫১]

তাঁর দৃষ্টিতে :

> শান্তিনিকেতন উপদেশগুলি যে প্রেমময় চিত্ত হইতে নিষ্যন্দিত সেই প্রেমরসসিক্ত চিত্ত হইতেই তাঁহার নাটক অভিনয় চিত্র নৃত্য প্রভৃতি উচ্ছ্বসিত। তাই সকলে তাঁহার সহিত তাল রাখিয়া চলিতে অক্ষম।[৫২]

আবার এও বলেছেন :

> উপনিষদের বাণী লইয়া প্রাচীন যুগে বহু আচার্য বহু ভাষ্য লিখিয়া গিয়াছেন। গুরুদেবও 'শান্তিনিকেতন' গ্রন্থে এবং আরও নানা স্থানে উপনিষদের যে নব নব তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে উপনিষদের ভাষ্যকারদের মধ্যে তাঁহার একটি মহনীয় স্থান থাকা উচিত।[৫৩]

রবীন্দ্রনাথের নিজের কাছেও এই উপাসনাগুলি বিশেষ মূল্য ও মর্যাদালাভ করেছে। অনেক দিন পরে তিনি একটি চিঠিতে লিখেছিলেন :

> এবার প্রুফ দেখতে গিয়ে সমস্তটা তন্ন তন্ন করেই দেখা হয়েচে। সম্পূর্ণ নতুন করেই এর কথাগুলো আমার কানে পৌঁছল। এক সময় যখন প্রতিদিন সকালে অল্প কয়েকজন উপাসকদের মধ্যে এই কথাগুলি বলে গিয়েছি তখন বস্তুত নিজেকেই নিজে শুনিয়েছি—যদি না বলতুম তাহলে ও কথাগুলো আমারো শোনা হোতো না, আমার নিজের কাছে অপ্রকাশিত থেকে যেত।[৫৪]

নিজের জন্মদিন উপলক্ষে সুযোগ-সৃষ্টি করে নেওয়ার আগেও ক্ষিতিমোহন যে রবীন্দ্রনাথের প্রভাতি উপাসনায় যোগ দেওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন, তার একটি প্রমাণ আছে কালীমোহন ঘোষকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠিতে। ২ অগ্রহায়ণ ১৩১৫ রবীন্দ্রনাথ লেখেন :

> প্রাতঃকালে তাহাকে ও মেয়েদের লইয়া উপাসনা করি ও উপদেশ দিই। আজ ক্ষিতিমোহনবাবুও তাহাতে যোগ দিয়াছিলেন। ইহাতে আমার নিজেরও যথেষ্ট উপকার হইবে আশা করি।[৫৫]

অবশ্য এটা ক্ষিতিমোহন-বর্ণিত উষাকালের সোপান উপাসনা ছিল না সম্ভবত। তবে একটা কথা মনে হয় যে ক্ষিতিমোহন যতই রবীন্দ্রনাথের কাছে তাঁর একতরফা ঋণের কথা বলুন, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁকে অধমর্ণ বলে গণ্য করেননি। আমরা তো দেখেছি আশ্রমে ক্ষিতিমোহনকে আহ্বান করে আনার পিছনে তাঁর কী গভীর প্রত্যাশা সক্রিয় ছিল। তাঁর মধ্যে যে কেবলমাত্র একজন সুযোগ্য শিক্ষককেই খোঁজেননি রবীন্দ্রনাথ, তা নিজেই বলেছেন : 'যাঁরা সমস্ত দীনতার ভেতর থেকেও মানুষকে ভালোবাসতে পারেন, কোনো মূঢ়তা ও কুশ্রীতা যাঁদের মানুষের কাছ থেকে প্রত্যাহৃত করে না সেই লোকই আমাদের মনে মানবতীর্থে যাত্রা করে বেরোবার ঠিক উদ্যমটি ধরিয়ে দিতে পারেন।'[৫৬] —ক্ষিতিমোহনের মধ্যে সেই মানুষের সন্ধান পাওয়ার আশা জেগেছিল কবির মনে। তিনি নিয়ত অনুভব করতেন যে সত্যের আবির্ভাবকে বিদ্যালয়ের কাজে এবং নিজেদের সব চিন্তায়-ইচ্ছায়-চেষ্টায় প্রত্যক্ষ করতে চান, অন্তরের দৈন্যে তা আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। 'যিনি আবিঃ তিনি বিদ্যালয়ে আমাদের কাছে আবির্ভূত হইতেছেন না।' ক্ষিতিমোহনকে মাত্র কয়েকদিন দেখেই

তাঁর আশা হয়েছিল 'আবিরাবীর্ম এধি'— এই প্রার্থনায় তাঁদের সঙ্গো যোগ দেওয়ার লোক পাওয়া গেল। 'আপনাকে দেখিয়া আজ বল পাইলাম'—এ কথা লিখতে গিয়ে ক্ষিতিমোহনের সঙ্গো একটি পারস্পরিক আদানপ্রদানের সম্পর্ক স্থাপনের জন্য উৎসুক মন অনুনয় করে তাঁকে বলেছিল: 'আপনি মনে করিতেছেন আপনি কেবল আপনার ছাত্রদের লইয়াই কাজ করিবেন—সেটা আপনার ভুল। আমরাও আছি। রসের অভাব হয়, পাথেয় কম পড়িয়া যায়—পরস্পরের কাছে ধার না লইলে মাঝে মাঝে পথের ধারে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িতে হয়। ছাত্রদিগকে পাইয়া আমাদিগকে অবহেলা করিবেন না।' এ চিঠি আমরা পূর্বে উদ্ধৃত করেছি।[৫৭]

কয়েকটি চিঠির প্রেক্ষিতে। কিরণবালার চোখে

রসের ভোজে ক্ষিতিমোহনকে পাশে পেতে চান বলেই হয়তো ছুটির সময় যখন তিনি দূরে, রবীন্দ্রনাথ তখন তাঁকে লেখেন : 'আপনাদের দর্শন কবে পাইব।'[৫৮] অনেক সময় এমনও লেখেন : 'ছুটির শেষে আপনাদের সকলের সঙ্গো মিলিবার জন্য উৎসুক হইয়া আছি।'[৫৯] আবার যখন কোনো উপলক্ষে তিনি নিজে আশ্রমের বাইরে তখন বলেন : 'আপনার সঙ্গো মিলনের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া রহিলাম।'[৬০] অথবা 'আপনাদের সঙ্গো মিলিবার জন্য মন উৎসুক হইয়া আছে।'[৬১] ১৯১০ সালের প্রথম দিকে একবার ক্ষিতিমোহন অসুস্থতার কারণে আশ্রমে অনুপস্থিত ছিলেন।* বসন্তপূর্ণিমার দিন অকালপ্রয়াত আশ্রম-অধ্যাপক সতীশচন্দ্র রায়ের স্মৃতিসভার পরে তাঁকে লিখেছেন :

> কয়েকদিন অজিত ভূপেনবাবু প্রভৃতিকে প্রশ্ন করিয়া আপনার সংবাদ সংগ্রহ করিতে পারি নাই, মনে করিতেছিলাম স্বয়ং চিঠি লিখিয়া খবর আদায় করিব। এমন সময় কাল আপনার পোষ্টকার্ড পাইলাম। কাল পূর্ণিমার রাত্রে সতীশের শ্রাদ্ধসভা বসিয়াছিল। তাহার সম্বন্ধে আমার যাহা বলিবার ছিল তাহা আমি বলিয়াছিলাম। আশা করি ছেলেরা তাহার স্মৃতি শ্রদ্ধার সহিত হৃদয়ে গ্রহণ করিতে পারিয়াছে। আমাদের এই সকল কাজে আপনার অনুপস্থিতিতে খুব একটা শূন্যতা থাকিয়া যায়। শুধু বিশেষ কাজে কেন, আপনার অভাবের শূন্যতা আমরা প্রতিদিনই অনুভব করি।[৬২]

এ-সব চিঠি সম্পর্কে পত্রপ্রাপকের প্রতিক্রিয়া জানতে পারি না বলে দুঃখ হয়। আবার এইসঙ্গো রবীন্দ্রনাথের আর-একটা চিঠির কথা মনে পড়ছে, ক্ষিতিমোহন তাঁকে বন্ধুত্বের পরিবর্তে সম্মানের আসন দিয়ে দূরে সরিয়ে রেখেছেন বলে এমন তীব্র বেদনার সুর তাতে বেজেছে যে বিচলিত না হয়ে পারা যায় না। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :

> ..আপনার পার্শ্বে বসিবার জন্য আমি বারম্বার চেষ্টা করিয়াছি কিন্তু আপনি আমাকে দূরে ঠেকাইয়া রাখিয়াছেন। হয়ত আমার মধ্যে নম্রতার অভাব কল্পনা করিয়াছেন কিন্তু যদি আমার অন্তঃকরণ

* ২৬ চৈত্র ১৩১৬ গৌরগোপাল ঘোষকে লেখা রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠিতে উল্লেখ পাচ্ছি : 'ক্ষিতিমোহনবাবু রোগ হইতে মুক্ত হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন।'—শারদীয়া দেশ পত্রিকা ১৩৫৬

দেখিতে পাইতেন তাহা হইলে এরূপ ভুল করিতেন না। আপনাদের প্রসাদ পাইবার জন্য আমার মন ব্যাকুল থাকে—তৎপরিবর্তে আমাকে একটা সম্মান বরাদ্দ করিয়া কেবল আমাকে বঞ্চিত করিতেছেন মাত্র। যাক্ এসব কথা বেশি করিয়া বলা কিছু নহে। কারণ অন্তরের সামগ্রী সম্বন্ধে ফরমাস চলে না এবং তাহা ভিক্ষা করিয়াও মেলে না।[৬৩]

অনুমান করা হয়েছে ১৯১৪ সালে লেখা এ চিঠি। অনুমান সত্য হলে এ চিঠি যখন রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, তখন তিনি বিশ্বখ্যাতির অধিকারী, নোবেল পুরস্কারের বরমাল্য তাঁর কণ্ঠে। যে মানুষ এমন চিঠি লিখতে পারেন তাঁর মনের প্রকৃত পরিচয় দরদির কাছে প্রচ্ছন্ন থাকার কথা নয়। কোন্ প্রসাদ লাভের জন্য তাঁর মন এমন কাঙাল হয়েছিল ক্ষিতিমোহন কি তা সত্যই বোঝেননি? ক্ষিতিমোহনের দিক থেকে দেখতে গেলে এমন হওয়া অবশ্য অসম্ভব নয় যে, যে শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমবোধ নিয়ে তিনি রবীন্দ্রনাথের কাছে এসেছিলেন, প্রতিদিনের নৈকট্যও তার হ্রাস ঘটায়নি। যতই আপনজন মনে করুন, যতই কাছে থাকুন, ক্ষিতিমোহন কখনও ভোলেননি প্রতিভায় জ্ঞানে ব্যক্তিত্বে আসলে রবীন্দ্রনাথ কত বড়ো। তাঁর সঙ্গে একটা সম্ভ্রমজাত ব্যবধান বরাবরই তিনি বোধ করেছেন। তাঁদের বয়সের ব্যবধানও উপেক্ষা করবার মতো ছিল না। এ কথা আগেই বলেছি যে ক্ষিতিমোহন রবীন্দ্রনাথকে গুরুর আসনে বসিয়েছিলেন, পরম শ্রদ্ধেয় গুরুজন বলেই মনে করতেন তাঁকে, বন্ধু বলে নয়। জানি না, এই চিঠি লেখার পিছনে রবীন্দ্রনাথের কোনো সাময়িক আশাভঙ্গের বেদনা কাজ করছিল কি না। এটা দেখতে পাচ্ছি যে শান্তিনিকেতনের অধ্যাপকমণ্ডলী সেসময় রবীন্দ্রনাথকে আশ্রমের সর্বোচ্চ পদে বসাবার চেষ্টা করেছিলেন, তাতে তাঁর সম্মতি ছিল না। আলোচ্য চিঠির প্রথম অংশে তিনি লিখেছিলেন :

আমাকে আপনারা আশ্রমের একটা কোনো উচ্চপদ দিয়া একঘরে করিয়া রাখিবেন ইহাতে আমার অন্তরের সম্মতি নাই। সম্বন্ধ ভিন্ন ভিন্ন লোকের সঙ্গে স্বভাবতই ভিন্ন ভিন্ন হইয়া দাঁড়ায়। সন্তোষের সঙ্গে আমার যে সম্বন্ধ জগদানন্দের সঙ্গে সে সম্বন্ধ নহে—তাঁহার সঙ্গে যে সম্বন্ধ কালীমোহনের সঙ্গে তাহা হইতে পৃথক। এরূপ স্বাভাবিক সম্বন্ধ বহন করিতে কোনো ক্লেশ হয় না। কিন্তু কোনো একটি কৃত্রিম বারোয়ারি সম্বন্ধ জীবনের বাধাজনক। অবশ্য ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে ইহার প্রয়োজন আছে, কেহ-বা আপিসের বড় সাহেব, কেহ বা ইস্কুলের হেড মাস্টার। কিন্তু আমি ত এরূপ কোনো ব্যবসায়ের মধ্যে ধরা দিই নাই। আমি যাহা চিন্তা করি তাহাই আপনাদের সঙ্গে আলোচনা করিবার অধিকার মাত্র আমার আছে—আমি শিক্ষা দিব এমন কথা মনে করিতে আমার লজ্জা বোধ হয়।

এ চিঠির কী উত্তর দিয়েছিলেন ক্ষিতিমোহন তা তো জানবার উপায় নেই, তবে তাঁর উত্তর পেয়েই বোধ হয় রবীন্দ্রনাথ লিখলেন :

আমার অন্তরের প্রীতি জানিবেন। আপনার প্রেম যে আমার কি রূপ পথ্য ও পাথেয়, তাহাও মনে রাখিবেন।[৬৪]

রবীন্দ্রনাথ ও ক্ষিতিমোহনের সম্বন্ধ পারস্পরিক দেওয়া-নেওয়ার পথ ধরে নিজস্ব ছন্দে বিকশিত হয়েছে। সন্তোষচন্দ্র মজুমদার, জগদানন্দ রায়, কালীমোহন ঘোষ এবং অন্য আর সকলের সঙ্গে যেমন রবীন্দ্রনাথের ভিন্ন ভিন্ন সত্য-সম্পর্ক ছিল, যাকে রবীন্দ্রনাথ কৃত্রিম

বারোয়ারি সম্বন্ধের চেয়ে বেশি মানতেন, সেই রকমই তাঁর নিজস্ব সত্য-সম্পর্ক ক্ষিতিমোহনের সঙ্গেও। দেনা-পাওনার পাটিগণিত দিয়ে সে সম্বন্ধকে ধরা যায় না। সে চেষ্টাও করব না।

ক্ষিতিমোহন শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে শিক্ষকতাকর্মে যোগ দেওয়ার আট মাস পরে কিরণবালা সেখানে প্রথম আসেন। সেবার অবশ্য দিন পনেরো-কুড়ির জন্য বেড়াতে এসেছিলেন, স্থায়ীভাবে থাকতে আসেন কয়েক বছর পরে। 'মাঘোৎসব উপলক্ষে শান্তিনিকেতন থেকে আমার স্বামী গিয়েছিলেন কলকাতায়। উৎসবের পরে আমিও কলকাতা থেকে শান্তিনিকেতনে আসি। বয়স আমার তখন উনিশ।' সেই তখন থেকেই তিনি পাকাপাকিভাবে আশ্রমের সকলের ঠানদি। আর সেই প্রথম-দেখা থেকেই রবীন্দ্রনাথ তাঁরও গুরুদেব। সেবার অবশ্য সরাসরি তেমন আলাপ হয়নি, রবীন্দ্রনাথ অন্যদের কাছে তাঁর সুবিধা-অসুবিধার খোঁজখবর নিতেন। কিরণবালার স্মৃতিমূলক রচনায় প্রথম-দেখা আশ্রম ও আশ্রমগুরুর ছোটো ছোটো টুকরো ছবি আছে। সেবারই কখনও কখনও খুব কাছ থেকে রবীন্দ্রনাথকে দেখেছিলেন, সেই আদিযুগের শান্তিনিকেতনের নিস্তরঙ্গ প্রেক্ষাপটে অবকাশক্ষণে দেখা রবীন্দ্রনাথের ছবি আমরা তাঁর লেখায় পাই। প্রতিদিনকার উষালগ্নের মন্দিরচাতালে উপাসনাসমাবেশে কিরণবালাও যোগ দিয়েছিলেন। তিনি লিখেছেন :

> মন্দির এ সময়ে হত প্রতিদিন। বুধবারে বুধবারে এখন যেমন হয় অথবা আরো আগে যেমন হয়েছে, সে রকম নয়। ভোরের অন্ধকারেই গুরুদেব বলেছেন। খালি গলায় তিনি নিজে একটি বা কখনো কখনো দুটি গান গেয়ে বলতে আরম্ভ করতেন। যাঁরা শুনেছেন তাঁরাই বলবেন কী অপূর্ব সে গান।[৬৫]

এই গানগুলি মুদ্রিত গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়নি বলে ক্ষিতিমোহনেরও দুঃখ ছিল।

শান্তিনিকেতনে অনেকসময়ে সন্ধ্যাবেলা ছাত্র-শিক্ষক সকলে দল বেঁধে বেড়াতে বেরোতেন। বিশেষ করে শুক্লপক্ষে সকলে গান গাইতে গাইতে অনেক দূর বেড়িয়ে আসার রেওয়াজ ছিল। ক্ষিতিমোহন লিখেছেন :

> কখনও দল বাঁধিয়া জ্যোৎস্নারাত্রে ছেলেরা আশ্রমসমীপে পারুলডাঙার শালবনে বা খোয়াইয়ের পাথুরিয়া ময়দানে গিয়া উৎসব জমাইত। তাহার মধ্যে যখন হঠাৎ কবি স্বয়ং গিয়া যোগ দিতেন, তখন উৎসব আরও জমিয়া উঠিত। জ্যোৎস্নার আলোকে ছেলেরা ফিরিবার পথে হাঁটিবার পাল্লা দিত।[৬৬]

কিরণবালাও বরাবর এই বেড়াতে-যাওয়ার দলে থাকতেন। একবারের কথা তিনি স্মরণ করেছেন, হয়তো কয়েক বছর পরের ঘটনা।

> পর পর কয়েকটি গান গুরুদেব গাইলেন। আমার স্বামীকে গাইবার জন্যে ভীষণভাবে ধরলেন। তিনি কিছুতেই গাইবেন না। অজিতবাবু দিনুবাবুও জোর করলেন। শেষে তিনি গাইলেন পর পর দুটি ভজন গান।[৬৭]

ক্ষিতিমোহন গান জানতেন. তাঁর চিঠিপত্রেও কখনও কখনও গান গাইবার প্রসঙ্গ এসেছে। 'শারদোৎসব'-এর কথা তিনি যে-ভাবে লিখেছেন তাতে মনে হয় রবীন্দ্রনাথ বুঝি

ভেবেছিলেন তিনি গান গাইতে পারেন এবং ঠাকুরদা চরিত্র সৃষ্টি করে তাই তাঁকে অভিনয়ের জন্য নির্বাচন করতে চেয়েছিলেন, আসলে তিনি গান গাওয়ার ব্যাপারে একেবারেই অনধিকারী ছিলেন, তা কিন্তু যথার্থ নয়।

ক্ষিতিমোহনের মতো কিরণবালাও শান্তিনিকেতন-জীবনের শরিক হয়েছিলেন মনেপ্রাণে। শান্তিনিকেতনই তাঁর মনের ভুবন গড়ে তুলেছিল। কোনো কাজে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে আহ্বান করলে নিষ্ঠার সঙ্গে সে কাজ করেছেন। স্বামীর মৃত্যুর পরও তিনি দীর্ঘদিন বেঁচেছিলেন। কী যৌবনে কী বার্ধক্যে শান্তিনিকেতন কোনোদিনই তাঁর ভৌগোলিক বাসস্থান-মাত্র ছিল না।

যখন কাজের সঙ্গী

রবীন্দ্রনাথ ক্ষিতিমোহনকে শান্তিনিকেতনের কাজে আহ্বান করে লিখেছিলেন : 'এই বিদ্যালয়ে আপনি নিজের শক্তিকে সর্বথা প্রয়োগ করিবার সুযোগ পাইবেন—ইহাতে যথার্থই আপনি সৃষ্টি করিয়া তুলিবার আনন্দ পাইবেন।' আবার পরে লিখলেন যে তিনি এমন একজনকে খুঁজছেন বিদ্যালয়কে যিনি নিজের করে নেবেন। প্রত্যক্ষ পরিচয় না-থাকলেও তাঁর মন ক্ষিতিমোহনকেই এ কাজে বরণ করে নিতে চাইছে। তাহলেও ক্ষিতিমোহন মনের মধ্যে কোনো উচ্চাধিকারীর অভিমান নিয়ে কাজ শুরু করেননি। তিনি সবসময় নম্রচিত্তে শান্তিনিকেতনে গুরুদেবের সাধনার কথাই বলেছেন, মনে করেছেন সেই সাধনার রূপায়ণে তিনি এবং সেখানকার অন্য শিক্ষকরা সকলেই সামান্য যন্ত্রীমাত্র।

ক্ষিতিমোহনকে আহ্বান জানানোর সময় রবীন্দ্রনাথের মনে আশা বিদ্যালয় ক্রমে সাধারণের বিশ্বাস অর্জন করছে, অনতিকালের মধ্যেই এ বিদ্যালয় আর তাঁদের সাহায্যপ্রত্যাশী হয়ে থাকবে না। ক্রমশ দেশের মানুষের বিশ্বাস আকর্ষণ করলেও রবীন্দ্রনাথের বর্তমানে শান্তিনিকেতন এমন স্বাবলম্বী কোনোদিনই হয়ে ওঠেনি, যার আর কোনো সাহায্যের অপেক্ষা ছিল না। ক্ষিতিমোহনরা যখন একে একে যোগ দিচ্ছেন, তখন শান্তিনিকেতন সবে রূপ নিচ্ছে। তখন গণতান্ত্রিক রীতিতে অধ্যাপকদের দ্বারা নির্বাচিত তিন-সদস্যের অধ্যাপকমণ্ডলী বিদ্যালয় পরিচালনার দায়িত্বে থাকতেন। এই মণ্ডলী একজন অধ্যক্ষ নির্বাচন করতেন। যাবতীয় কাজ অধ্যাপকদের নিজেদের করতে হত, বা তার তত্ত্বাবধান করতে হত। প্রতি মাসে নিজেদের মধ্য থেকে একজন পরিদর্শক তাঁরা নির্বাচন করতেন, তিনি কাজের ত্রুটিবিচ্যুতি অনুসন্ধান করে অধ্যাপকমণ্ডলীকে জানাতেন। ছাত্রসভার উপর ভার ছিল ছাত্রশাসনের। প্রত্যেক পাঠ্যবিষয়ের জন্য এক-একটি সমিতি ছিল, সেগুলির পৃথক পৃথক পরিচালক ছিলেন। শিক্ষকরা প্রত্যেকে নিজের ক্লাসের ছাত্রদের প্রতিজনের বিষয়ভিত্তিক উন্নতি-অবনতির লিখিত রিপোর্ট সমিতির কাছে দাখিল করতেন।

মাসের শেষে সমিতির সভায় প্রতি ছাত্র সম্পর্কে আলোচনা করে পিছিয়ে-পড়া ছাত্রদের জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হত। ১৯১১ সালে আবার সাংবিধানিক পরিবর্তন ঘটে, সব কাজ পরিদর্শন ও নিয়ন্ত্রণের জন্য সর্বাধ্যক্ষ পদের সৃষ্টি হয়। অধ্যক্ষপদের সঙ্গে এই পদের কোনো পার্থক্য ছিল কি না স্পষ্ট না হলেও, মনে হয় ছিল না। অধ্যাপকমণ্ডলীর বদলে তখন থেকে ছাত্রপরিচালনার জন্য আদ্য মধ্য ও শিশুবিভাগের দায়িত্ব দেওয়া হল তিনজন অধ্যাপকের উপর। এ ছাড়া ছিল আশ্রমসম্মিলনী—মাসের অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় তার সভা বসত। সেদিন বিকেলে ক্লাস হত না। আশ্রমসম্মিলনীর লক্ষ্য ছিল আশ্রমের সামগ্রিক উন্নয়ন। ছাত্ররা তার সম্পাদক ও কার্যনির্বাহক সমিতির সভ্য নির্বাচিত হতেন। সভার অধিবেশনে শিক্ষকরাও উপস্থিত থাকতেন। আশ্রমে উপস্থিত থাকলে রবীন্দ্রনাথ সভাপতিত্ব করতেন। ছাত্ররা স্বাধীনভাবে তাঁদের মত জানাতেন। আশ্রমপরিচালনার যে-কোনো বিষয়ে সভার সিদ্ধান্ত লিখিতভাবে জানানো হত সর্বাধ্যক্ষ মহাশয়কে। আশ্রমসম্মিলনীর আরও নানা বিভাগ ছিল, সেগুলির দায়িত্বে অধ্যাপকরাও থাকতেন। এইটুকু বিবরণ দিলেই যে সেকালের শান্তিনিকেতনের আশ্রমবিদ্যালয় পরিচালনার সবটা বোঝানো গেল তা অবশ্য নয়। তবু ক্ষিতিমোহন এখানে এসে যে পরিচালনব্যবস্থা পেলেন এবং তিনি আসবার পরেও যে-সব নতুন ব্যবস্থার প্রবর্তন হতে লাগল তার একটু আভাস দিলাম।

তখন সেই প্রাক্-বিশ্বভারতী পর্বে এই আশ্রমবিদ্যালয়কে গড়ে তোলবার জন্য নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছিল। নিয়মকানুনও কেবলই পালটাত, নতুন নতুন শিক্ষকনিয়োগ এবং শিক্ষকপরিবর্তনও যথেষ্ট হত। বাস্তবের সমস্যাও ছিল নানামুখী। আশ্রম যত বড়ো হয়েছে তার কাজও তত বেড়েছে, অর্থসমাগম অর্থের অনটন কোনোদিন মেটাতে পেরেছে এমন নয়।

দশটা-চারটের নিয়মে বাঁধা ইশকুল গড়তে চাননি রবীন্দ্রনাথ। যে ভাবকে তিনি শান্তিনিকেতনে রূপ দিতে চাইছিলেন, সেই ভাবের বাহক ও রূপকার হওয়ার জন্য যাঁদের সহায়তা তাঁর একান্ত আবশ্যক ছিল তাঁরা এখানকার কর্মী ও শিক্ষক। সবকিছুর কেন্দ্রে রবীন্দ্রনাথের নিজের অবস্থানবিন্দুটি অনিবার্য কারণেই অবিসংবাদী ছিল ঠিকই, আবার অন্যদিকে প্রথম থেকেই যে তিনি অধ্যাপকদের উপর সিদ্ধান্ত নেওয়ার দায়িত্ব দিয়েছেন, পরিচালনব্যাপারে ছাত্রদেরও সক্রিয় সহযোগের নীতি বারংবার চেষ্টায় প্রয়োগ করতে চেয়েছেন, এই বিদ্যালয়ের নিয়মাবলি সেই কথাই বলে। তিনি অধ্যাপকদের বন্ধু বলেই মানতেন, 'বিদ্যালয়ের কর্ম যেমন আমার তেমনই তাঁদেরও কর্ম—এ যদি না হয় তবে এ বিদ্যালয়ের বৃথা প্রতিষ্ঠা'—এ তাঁর কথা।

ক্ষিতিমোহনকে তিনি ভাবের দৃষ্টিতে যেমন করেই দেখে থাকুন, শান্তিনিকেতন-ভাবনার রূপায়ণের ক্ষেত্রে তাঁকে বন্ধু ও সহযোগীর ভূমিকায় সুযোগ্য ও কর্মঠ করে তুলতে রবীন্দ্রনাথের পথনির্দেশের প্রয়োজন সেদিন সামান্য ছিল না। ক্ষিতিমোহনকে লেখা তাঁর

অনেকগুলি চিঠিতে বিদ্যালয় পরিচালনা ও সংশ্লিষ্ট প্রসঙ্গ আছে। এখন আমরা তেমন কয়েকখানি চিঠি দেখব। ক্ষিতিমোহন আসবার পরেই আশ্রমবিদ্যালয় পরিচালনদায়িত্ব অনেকটা তাঁর উপর অর্পিত হয়েছিল বলেই হয়তো চিঠিগুলি বিশেষভাবে তাঁকে লেখা হয়েছে। তবে একই সময়ে অন্য শিক্ষকদের কাছেও বিদ্যালয়ের নানা প্রসঙ্গ নিয়ে লিখেছেন, বরাবরই এমন নীতি রবীন্দ্রনাথের ছিল। ১০ কার্তিক ১৩১৬ তারিখে লেখা একটি চিঠিতে পরিচালনব্যবস্থায় বেশ-কিছু পরিবর্তনের নির্দেশ দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ :

শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় সমীপে বোলপুর

সবিনয় নমস্কারপূর্ব্বক নিবেদন

বর্ত্তমান ছুটির পর হইতে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে ছাত্রচালনা প্রভৃতি কার্য্যে যে সমস্ত পরিবর্ত্তন আমি আবশ্যক বলিয়া জ্ঞান করিতেছি তাহা আপনাদের অবগতির জন্য লিপিবদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত করিলাম [হইলাম]। অহরহ অধ্যাপক ও ছাত্রদের একত্র-বাস কল্যাণকর নহে বলিয়া আমার মনে হয় এই দুই পক্ষের কিঞ্চিৎ দূরত্ব অত্যাবশ্যক। পরস্পর অত্যন্ত ঘেঁষাঘেঁষি হইলে অধ্যাপকদের প্রভাব খর্ব্ব হইবার কথা।

দ্বিতীয়তঃ অধ্যাপকদের নিজেদের মধ্যে মাঝে মাঝে নানা কারণে যে সকল বিরোধ জাগিয়া উঠে, সান্নিধ্যবশতঃ ছাত্রদের নিকটে তাহা সুগোচর হইয়া উঠে। ইহাতে বিশেষ অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে।

তৃতীয়তঃ সর্ব্বদা নিকটে থাকিলে পর্য্যবেক্ষণের শৈথিল্যই ঘটে, অসতর্কতা আসিয়া পড়ে এবং আমাদের নিজের ব্যবহারে যদি কোনো জড়ত্ব থাকে তাহা ছাত্রদের মধ্যে সংক্রামিত হয়।

চতুর্থতঃ অহোরাত্র অধ্যাপকদের চোখের উপরে থাকিলে নিজেদের ব্যবহার সম্বন্ধে ছাত্রদের স্বাধীন দায়িত্ববোধ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। এইসকল কারণে আমি ইচ্ছা করি দিনের বেলায় লেখাপড়া ও বিশ্রামের জন্য অধ্যাপকদের সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র গৃহ নির্দ্দিষ্ট করা হয়। ক্লাসের কাজের অবকাশে সেইখানে তাঁহারা সহযোগিদের সহিত একত্রে দিনযাপন করিবেন। অভিভাবক ও অতিথি যাঁহারা আসিবেন সেইখানেই তাঁহারা স্থানলাভ করিবেন।

তিনজন বিশেষ অধ্যাপকের উপর আপনি ভারার্পণ করিবেন তাঁহারা মাঝে মাঝে দেখিয়া আসিবেন, ছেলেরা সকলে স্ব স্ব স্থানে আছে এবং নিয়মপালন করিতেছে। কোনো প্রকার ব্যবস্থায় ত্রুটি দেখিলে প্রত্যেক কক্ষের নায়কছাত্রকে সেজন্য দায়ী করা হইবে। ছাত্র পরিচালনা ব্যবস্থাকে দুইভাগ করিতে হইবে। বড় ছেলেদের ও ছোট ছেলেদের অধিনায়ক স্বতন্ত্র হইবে।

ছাত্রদিগকে ধর্ম্মশিক্ষাদান সম্বন্ধে শান্তিনিকেতন ট্রাষ্ট-ডীডের বিধি-লঙ্ঘন করা চলিবে না। কোনো অধ্যাপক ছাত্রদিগকে বিশেষভাবে ধর্ম্মমত সম্বন্ধে কোনো সাম্প্রদায়িক পন্থায় চালনা করিবার চেষ্টামাত্র করিবেন না। ধর্ম্মালোচনার ভার আপনি স্বয়ং লইবেন এবং যাহাকে উপযুক্ত মনে করেন, অর্থাৎ এই আশ্রমের অসাম্প্রদায়িক উপনিষদমতে যাঁহাকে আস্থাবান মনে করেন তাঁহার প্রতি ভারার্পণ করিবেন।

প্রত্যহ সূর্য্যোদয়ে, মধ্যাহ্নে, সূর্য্যাস্তকালে ও শয়নের পূর্ব্বে উপনিষৎ ও বেদ হইতে বিশেষ নির্ব্বাচিত চারিটি কবিতা স্বরসংযোগে সুকণ্ঠ বালকদের দ্বারা গান করাইতে হইবে—সেই সময়ে সমস্ত ছাত্র সেখানে একত্র মিলিত হইবে।

বুদ্ধ খৃষ্ট মহম্মদ চৈতন্য নানক কবীর রামমোহন প্রভৃতি মহাপুরুষদের মৃত্যুদিনে উৎসব করিতে হইবে, সেই দিনটি তাঁহাদের জীবনী ও উপদেশ ব্যাখ্যা ও তাঁহাদের রচনা পাঠ বা গান করিবার দিন।

আশ্রমের পশুপক্ষী তরুলতার সহিত ছাত্রদের চিত্তের যোগ-সাধনের জন্য চেষ্টা করা আবশ্যক। ...বনের উৎসব, বর্ষায় সপ্তপর্ণ কুসুমোদ্‌গমের উৎসব, শরতে শেফালিতলের উৎসব, বসন্তে শালমঞ্জরীর উৎসব উপযুক্ত বেশ সঙ্গীত ও ভোজ্যের দ্বারা সমাধা করিতে হইবে।

বিদ্যালয় সন্নিহিত কাননভূমিকে কয়েক ভাগে বিভক্ত করিয়া এক এক দল ছাত্রের প্রতি তাহার পরিচর্য্যাভার অর্পণ করিতে হইবে। প্রতিদিন খেলায় যাইবার পূর্ব্বে তাহারা নিজ নিজ ভূখণ্ড পরিষ্কার করিয়া তবে খেলিতে যাইবে। ছাতিমতলের বেদীরক্ষার ভার বিশেষ কোনো অধ্যাপক ছাত্রসহ গ্রহণ করিলে ভাল হয়।

প্রত্যেক বালক একটি করিয়া বৃক্ষরোপণ করিবে এবং প্রত্যহ দুইবেলা তাহার তলা খুঁড়িয়া তাহাতে জলসেচ করিবে—গাছের গোড়ায় শুষ্কপত্রের সার দিয়া যাহাতে গাছগুলি বাড়িয়া ওঠে তাহার চেষ্টা করিবে। অধ্যাপকদের কেহ কেহ যদি যোগ দেন তবে ছাত্রেরা উৎসাহ বোধ করিবে।

আশ্রমের পাখী ও কাঠবিড়ালি প্রভৃতি জন্তুদিগকে বন্দী না করিয়া ছাত্রগণ আহারাদি দিয়া পোষ মানাইবার চেষ্টা করিবে। এই কার্য্যে যে ছেলে সর্ব্বাপেক্ষা কৃতকার্য্য হইবে তাহাকে বিশেষভাবে পুরস্কৃত করা হইবে।

এই প্রকৃতি পরিচর্য্যার কাজে চালনা করিবার ভার বিশেষ কোনো অধ্যাপকের প্রতি অর্পণ করা আবশ্যক হইবে। তিনি ছাত্রদিগকে এই সকল কাজে নিয়োগ করার সঙ্গে সঙ্গে কাব্য ও কথা শুনাইয়া গান করাইয়া প্রকৃতির প্রতি প্রেম বালকদের চিত্তে উদ্বোধিত করিয়া তুলিবেন।

আশ্রমভৃত্যদিগকে সেবার জন্য বিশেষ কয়েকটি দিন নির্দ্দিষ্ট হইবে। সেইদিন তাহাদিগকে পরিবেষণ করিয়া আহার করানো, আমোদ দেওয়া পুরাণ শোনানো প্রভৃতি করিতে হইবে। এককথায় আশ্রমের তরুলতা পশুপক্ষী ও ভৃত্যদের সহিত যাহাতে বালকদের হৃদয়ের যোগসাধন ঘটে তাহার জন্য বিশেষভাবে সচেষ্ট হওয়া আবশ্যক হইবে।
ইতি ১০ই কার্ত্তিক ১৩১৬

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর[৬৮]

শারদ অবকাশের মধ্যে শান্তিনিকেতন থেকে এই চিঠি লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। অধ্যাপকদের আচরণগত বিচ্যুতি-প্রসঙ্গে এই সময়ে লেখা আর-একটি চিঠিতে তাঁকে লিখতে দেখা যায় :

রথী একটা কথা লইয়া দুঃখপ্রকাশ করিলেন যে অধ্যাপকদের কেহ কেহ ছাত্রসমক্ষেই অন্য অধ্যাপক ও ছাত্রদের সম্বন্ধে বিরুদ্ধ সমালোচনা করেন—শুনিয়া আমিও ক্ষোভ অনুভব করিলাম। কে এরূপ করেন তাহা রথীকে জিজ্ঞাসা করিতেও সঙ্কোচ বোধ হইল। এ সম্বন্ধে অধ্যাপকদের সহিত নিভৃত আলোচনা করিবেন।[৬৯]

১০ কার্তিকের চিঠির ধর্মশিক্ষা-প্রসঙ্গ নিয়ে একটু বলি। রবীন্দ্রনাথ এই চিঠিতে মহাপুরুষদের স্মরণদিবস পালনের প্রস্তাব করেছেন। রবীন্দ্রজীবনী অনুসারে ১৯১০ সালের ২৫ ডিসেম্বর শান্তিনিকেতন মন্দিরে খ্রিষ্টোৎসব পালনের মধ্য দিয়ে একটি নতুন ধারা প্রবর্তিত হল, স্থির হল এখন থেকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষদের উপযুক্ত দিনে স্মরণ করা হবে। এই চিঠির ভিত্তিতে বলতে পারা যায় অন্তত আরও-এক বছর আগেই এ বিষয়ে

সিদ্ধান্ত পাকা হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় আরও লিখেছেন যে এতদিন শান্তিনিকেতন মন্দিরে আদি ব্রাহ্মসমাজ-মতে উপাসনা চলে এসেছে। ঔপনিষদিক ধর্ম ব্যতীত অন্য কোনো ধর্মের বিশেষ আলোচনা হয়নি। এবার ব্যতিক্রম ঘটল, 'বিশ্বমানবের বিচিত্র সাধনাকে' কবি সেখানে স্বীকার করে নিলেন। অন্যত্র তিনি বলেছেন ১৩১৮ সালের ফাল্গুন মাসে কবি মন্দিরে শ্রীচৈতন্যদেব সম্পর্কে ভাষণ দিলেন, ক্ষিতিমোহন সেন উপদেশ দিলেন বুদ্ধদেব সম্বন্ধে। আরও কিছুকাল পরে হজরত মহম্মদ ও ভারতীয় সন্তদের স্মরণদিন উদ্‌যাপনের ঐতিহ্য গড়ে ওঠে।[৭০] একটু দ্বিধা হয় এ কথা মানতে যে, সেকালের শান্তিনিকেতনে এতটা সময় লেগেছে রবীন্দ্রনাথের প্রস্তাব কার্যকর করতে। তা ছাড়া, রবীন্দ্রনাথ কিন্তু ১৯২৯ সালে লেখা তাঁর এই চিঠিতে স্পষ্টই বলছেন ছাত্রদের ধর্মশিক্ষাদান বিষয়ে শান্তিনিকেতন ট্রাস্ট ডিডের নিয়ম ভাঙা চলবে না। আমাদের মনে হয় না বুদ্ধদেব খ্রিষ্ট কবীর প্রভৃতি মহাত্মার স্মরণদিন পালনের প্রবর্তন করে রবীন্দ্রনাথ উপনিষদিক ধর্ম-উপাসনার রীতি থেকে সরে এসেছিলেন। এই-সব মহাত্মার দৃষ্টিভঙ্গির ঔদার্য ও সত্যসন্ধানী সাধনার সঙ্গে ঔপনিষদিক ধর্মের কোনো বিরোধ নেই, এঁরা সাম্প্রদায়িক নন।

যাই হোক, ক্ষিতিমোহনকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠির প্রসঙ্গে ফিরি। এগুলির কোনোটায় ছাত্রদের প্রসঙ্গ আছে, কোনোটায় বা মেয়েদের উল্লেখ, যা সেই সময়কার স্বল্পকালস্থায়ী বালিকাবিভাগের ইঙ্গিত দেয়। রবীন্দ্রনাথ কখনও খবর দিচ্ছেন, কখনও খবর নিচ্ছেন। 'অনেকগুলি নূতন ছাত্র ছুটির পরে বোলপুরে যোগ দিবে—ততদিনে ঘর তৈরি হইয়া গেলে নিশ্চিন্ত হইব—কিন্তু সে সম্বন্ধে সন্দেহ আছে।'[৭১] 'আপনার খবর কি—অর্থাৎ আপনার বালক ও বালিকা বিভাগে কোনো প্রকার বিঘ্ন আছে কিনা জানাইবেন। ...আমাদের সেই ক্লাসটি কিরূপ চলিতেছে? যথানিয়মে বুধবার পালন করা হইতেছে কিনা? মেয়েদের পড়া ও কাজের কিরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে? নূতন ঘর কতদূর অগ্রসর হইল? শিশুবিভাগের কিরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে ইত্যাদি সংবাদ জানাইবেন'—এই পর্যন্ত লিখে আবার যোগ করলেন : 'না যদি জানাইতে চান তাহাতেও আমার আপত্তি নাই—কারণ আপনার উপর যখন ভার আছে—তখন চিন্তাভার আমার নিজের উপর লইব না।'[৭২] তিনি কখনও বা লেখেন : 'ধীরেনের অভিভাবককে অদ্যই পত্র লিখে দিচ্চি', আর কখনও চিঠির শেষে যোগ করেন : 'আমার বাংলা ক্লাসের বালকগুলি আসন হস্তে উপস্থিত হইয়াছে। অতএব বিদায় হই।'[৭৩]

একবার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের ইংরেজি শিক্ষা বইখানি শান্তিনিকেতনে ক্ষিতিমোহনকে পাঠিয়ে দিয়ে লিখেছিলেন :

> যদি উপযুক্ত বোধ করেন তবে বিদ্যালয়ে ধরাইবেন। অজিত যেন এ বইয়ের প্রতি অবজ্ঞা না করেন বা মনে কোনো বিরুদ্ধতা না রাখেন। সুবিচার করিয়া যেটি ভাল বোধ করেন তাহাই করিবেন—সত্যেশ্বরকেও দেখাইবেন। হয়ত ইংরাজি সোপানের চেয়ে ইহা কাজের হইতে পারে।[৭৪]

পাঠ্যবই নির্বাচন প্রসঙ্গে ক্ষিতিমোহনকে লেখা রবীন্দ্রনাথের আর-একটি চিঠি সম্পূর্ণ তুলে দিচ্ছি, এটিতে কোনো তারিখ নেই।

প্রীতিনমস্কারপূর্ব্বক নিবেদন

পদ্যপাঠ তৃতীয় ভাগ আনিয়া দেখিলাম। বুঝিলাম নগেন আইচের পরামর্শে আপনারা এ বইখানা বাছিয়াছেন। ছেলেবেলায় ছাত্রবৃত্তির নীচের ক্লাসে আমরা এখানি পড়িয়াছিলাম। আপনি বোধ হয় পড়েন নাই—পড়িলে ছাত্রগণকে বিনাদোষে এত বড় শাস্তি দিতেন না। যেদিন ওঝাকে দিয়া রোগীর রোগ ঝাড়ানো যেদিন সূতিকাগৃহকে প্রসূতির জন্য নরককুণ্ড করা হইত সেই সাবেক কালে এই বইখানি ইস্কুলে চলিত—সেই সময়টাতে শিশুরূপে আমাদের আবির্ভাব ছিল অতএব অসময়ে জন্মিবার দণ্ড আমরা ভোগ করিয়াছিলাম। কিন্তু পাপের এত দীর্ঘ পরমায়ু তা জানিতাম না। ছেলেদের পরম শত্রু আছে টেক্‌সট্ বুক কমিটি সেই ত এই সব শয়তানকে শিশুরক্তে রাঙাইয়া রাখিয়াছে কিন্তু উক্ত কমিটির দলে ত আমরা নই। আর একবার এই বইটাকে ভাল করিয়া পড়িয়া দেখিবেন নিজেকে শিশু মনে করিয়া। নগেন আইচকে মন থেকে বিদায় করিয়া দিয়া তাহার জায়গায় রসের কাঙাল মিষ্টলোভে লালাইত কচি ছেলেগুলিকে মনে আনিবেন তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমাদের শান্তিনিকেতন হইতে এই প্রকার শিশুপীড়নকে খেদাইয়া দিতে আপনারা দ্বিধা করিবেন না।

আপনাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর[৭৫]

ছাত্রভরতি প্রসঙ্গে লেখা রবীন্দ্রনাথের আর-একটি চিঠি এবার সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করে দিতে চাই। আমরা দেখেছি কর্তব্য-অকর্তব্য স্থির করার ভার শিক্ষকদের উপরে দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তবু অনেকসময় তিনি এ কথাটা মনে করিয়ে দেওয়াও কর্তব্য মনে করেছেন যে, নির্ধারিত নিয়ম অনুসরণের অনড় পথটাই সবসময়ে সবচেয়ে কাম্য পথ নয়। এই এক বছরের আলাপে ক্ষিতিমোহনের স্বভাবের এই দিকটাও তাঁর নজর এড়িয়ে যায়নি যে ধনবানের প্রতি তাঁব অন্তরে একটা বিমুখতা আছে। 'মানুষকে মানুষ বলিয়া বেদনাবোধ করিতে হইবে—সে ধনীর ঘরে জন্মগ্রহণ করিলেও'—এ কথায় তিনি হয়তো বা ক্ষিতিমোহনকে উপলক্ষ করে সব শিক্ষকেরই মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাইছিলেন শান্তিনিকেতনের মূল আদর্শ ও লক্ষ্যের দিকে। চিঠিটি দেখা যাক, এটিও তারিখহীন :

প্রীতিনমস্কার নিবেদন

সেই ছেলেটির জন্য ব্রজেন্দ্রবাবুও বিশেষ অনুরোধ করিয়া পত্র লিখিয়াছেন। তাহার একজন অভিভাবক বিশেষভাবে আমাকে ধরিয়া পড়িয়াছেন—আমাদের অসম্মতি মানিতেছেন না—আমি আপনাদিগকে সম্মত করাইবার জন্য তাঁহাকে চেষ্টা করিতে বলিলাম। তাঁহার সহিত আলোচনা করিয়া যাহা উচিত বিবেচনা করেন করিবেন। প্রিন্সিপ্‌ল নামক একটা আধুনিক জুজু আছে আমি তাহাকে খুব বেশি ভয় করি না—আমি নিয়ম একেবারে মানিনা তাহা নয় আবার তাহাকে অত্যন্ত বেশি সম্মান করাকেও আমি পৌত্তলিকতা বলিয়া মনে করি। কিন্তু আমার এ কথাটাকে খুব বড় করিয়া ধরিবেন না। দরিদ্রকে অনেক সময়ে আমরা

ফিরাইতে পারি না—যে বুদ্ধদ্বার নিয়মের অর্গলে বদ্ধ, করুণা তাহাকে বিচলিত করিতে পারে। ধনীর সন্তানকেও দয়া করিবেন। তাহারা নিজের দোষে ধনীর ঘরে জন্মায় নাই—তাহারা অনেক বিষয়ে দরিদ্রের চেয়ে অনেক বেশি হতভাগ্য—এজন্য তাহাদের প্রতি চিত্তকে বিমুখ করিবেন না। ধনের দৌর্ভাগ্যের প্রতি আপনার কঠোরতা আছে বলিয়াই এটুকু বলিলাম। রসিকবাবু যখন তাঁহার পুত্রকে অল্প বেতনে দিতে চাহিলেন তখন ক্ষতির কথাটাকে বড় করিয়া তুলিতে পারি নাই—ইঁহারাও যেরূপ ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতেছেন তাহাতে ইঁহাদিগকে সম্পূর্ণ বিমুখ করিতে কষ্ট বোধ করিতেছি। কিন্তু আমার এ দয়া সম্ভবত দুর্ব্বলতা—সেইজন্যই কর্ত্তব্যতার মীমাংসাভারও আপনাদের প্রতি দিলাম। আপনারা যেরূপ স্থির করিবেন তাহাই চরম হইবে। অবশ্য অর্থলাভের কথা চিন্তনীয় নহে—কিন্তু মানুষকে মানুষ বলিয়া বেদনা বোধ করিতে হইবে—সে ধনীর ঘরে জন্মগ্রহণ করিলেও।

আপনাদের

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর[৭৬]

এই সময়কার কয়েকটি চিঠিতে মীরা দেবীর পড়াশুনার কথা আছে। কখনও কখনও তাঁর সঙ্গে সুশীলা দেবীরও উল্লেখ পাওয়া যায়।[৭৭] একটি চিঠির প্রসঙ্গ ধরে বোঝা যাচ্ছে অজিতকুমার চক্রবর্তীর উপরে এই সময়ে মীরা দেবীকে পড়ানোর ভার ছিল, তিনি অসুস্থ হয়ে শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথের কাছে চলে যাওয়ায় রবীন্দ্রনাথ চিন্তিত হয়েছেন কন্যার জন্য। তাই ক্ষিতিমোহনকে লিখেছেন :

মীরারও শরীর অসুস্থ শুনিয়াছি। তাহার অধ্যয়নও তো শিক্ষকের অভাবে বন্ধ। তাহাকে কি কোনো কাজে লাগাইতে পারিয়াছেন? যে পর্যন্ত অজিত অনুপস্থিত থাকিবেন সে পর্যান্ত মীরার পড়াশুনার বোধ করি কোনো উপায় হইবে না।[৭৮]

এর পরে তিনি আবার তাঁকে ৭ শ্রাবণ ১৩১৬ লিখলেন :

মীরাকে বোলপুরেই রেখে তার শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখবেন। মোহিতবাবুর স্ত্রীর সম্বন্ধে যেরূপ ব্যবস্থা বিহিত নিশ্চয়ই আপনি তাহার ত্রুটি করিবেন না। তাঁহার জন্য আমি উদ্বিগ্ন আছি।[৭৯]

ক্ষিতিমোহন নিশ্চয় মীরা দেবীকে সংস্কৃত পড়াবার প্রস্তাব করেছিলেন, কেননা উত্তরে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে লিখলেন :

মীরাকে অল্প কয়েকদিনের জন্য সংস্কৃত পড়াইয়া কোনো লাভ আছে কি? সে ত বেশিদূর অগ্রসর হইবার অবকাশ পাইবে না। এক্ষণে প্রধানত তাহার চিন্তার বিকাশই আমি কামনা করি। ব্যাকরণের মধ্যে তাহার শক্তিকে বিক্ষিপ্ত করিয়া কোনো ফল হইবে না। তাহাকে এমন কোনো একটি বই যদি পড়াইয়া যান যাহাতে তাহার মননশক্তির উপযুক্ত চর্চ্চা হয় তবেই আমি আনন্দিত হই। উচ্চ বিষয়ে মনকে নিবিষ্ট করিবার অভ্যাস যাহাতে হয় তাহাই মীরার পক্ষে আমি শ্রেয় বলিয়া জ্ঞান করি। কারণ আর সমস্তই নিজের অনুরাগে মানুষ আয়ত্ত করিতে পারে কিন্তু মহৎ চিন্তায় চিত্তনিবেশের অভ্যাসই মানুষের সাধনার সামগ্রী। এখন অল্প বয়সে এই

সাধনায় যদি সে আপনাদের নিকট হইতে সাহায্য পায় তবে তাহার জীবনপথের দুর্লভ পাথেয় লাভ করিয়া সে কৃতার্থ হইবে। সে যে নানা বিদ্যায় বিদুষী হইয়া উঠিবে আমার সেরূপ আকাঙ্ক্ষা নহে—কিন্তু তাহার মন মহৎ ভাবের সহিত পরিচিত হইয়া সহজেই জীবনের ক্ষুদ্রতাজাল হইতে নিষ্কৃতি লাভ করে—তাহার রুচি পবিত্র হয়, লক্ষ্য মহৎ হয়, হৃদয় উদার হয় ইহাই আমি চাই। আমি তাহাকে বিশেষভাবে সাহিত্য পড়াই নাই—যতদিন আমি তাহাকে পড়াইয়াছি বড বড় বিষয় তাহার মনের সম্মুখে ধরিবার চেষ্টা করিয়াছি। তাহার কতক সে বুঝিয়াছে কতক বুঝে নাই—তথাপি তাহাতে সে উপকার পাইয়াছে। আমার নিজের বিশ্বাস এই কঠোর পথ দিয়া শিক্ষা অগ্রসর হইলে তবেই মানুষ এক সময়ে সৌন্দর্য্য যথার্থভাবে ভোগ করিবার অধিকারী হয়।

এই চিঠির পুনশ্চ অংশে ক্ষিতিমোহনের প্রস্তাব মনে রেখে যোগ করলেন :

মীরাকে যদি সংস্কৃত ভাষার ভিতর দিয়াই শিক্ষা দিতে চান তবে আমি বোধ করি তাহাকে গীতা ব্যাখ্যা করিয়া উপদেশ দিয়া গেলে তাহার উপকার হইতে পারিবে। মোহিতবাবুর স্ত্রীও তাহাতে যোগ দিতে পারেন।[৮০]

ক্ষিতিমোহনের শান্তিনিকেতনিক জীবনের প্রথম দু-তিন বছরে রবীন্দ্রনাথের লেখা এই-সব চিঠি নিঃসন্দেহে তাঁর শিক্ষাচিন্তাকে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছে। ছাত্রকে কী পড়াবেন, কেন পড়াবেন, মীরা দেবী বা সুশীলা দেবীর মতো ছাত্রীর ক্ষেত্রে—যেখানে শান্তিনিকেতনের নির্ধারিত শিক্ষাবিধি প্রয়োগ করা যাচ্ছে না, সেখানে কী পড়ালে ভালো হয়, কেন ভালো হয়, ক্রমে ক্রমে রবীন্দ্রভাবনার সঙ্গে নিজের ভাবনা মিলে সে-সবের ধারণা মনের মধ্যে স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে।

এই সময়কার কয়েকখানি চিঠিতে আশ্রমের কোনো কর্মী বা শিক্ষকের নিয়োগ অথবা অপসারণের প্রসঙ্গ এসেছে। একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :

সাংখ্যতীর্থ মহাশয়ের সুস্থ হইয়া বিদ্যালয়ে যোগ দিতে নিশ্চয় এখনো বিলম্ব আছে অতএব দ্বিতীয় সেশনের পূর্ব্বে বিদ্যালয়ে তাহাকে নিযুক্ত করা কেবল ক্ষতি মাত্র। সেই কথা চিন্তা করিয়া তাঁহার কর্ম্মের সময় নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন।[৮১]

আবার কোনো কোনো চিঠিতে বেতন বা অন্য খরচেব আলোচনা পাই। একটি চিঠিতে রাজ তহবিল গড়ার প্রস্তাব দিচ্ছেন, যার দায়িত্ব থাকবে ক্ষিতিমোহনের উপরে।

আমি আপনার রাজ তহবিলে সর্ব্বদা ৫০ টাকা মজুত রাখতে চাই, অর্থাৎ যেমন খরচ হতে থাকবে অমনি পূরণ হতেও চলবে। টাকাটা আপনি আমার কাছ থেকেই পাবেন এবং হিসাবও আপনি আমার কাছেই দাখিল করবেন। হাসপাতাল, এমনকি বিদ্যালয় সম্বন্ধীয় অত্যাবশ্যক খুচরা জিনিষপত্র আনাইয়া লওয়া সম্বন্ধে যাহাতে আপনাকে পরমুখাপেক্ষী হয়ে না থাকতে হয় এই আমার অভিপ্রায়। এখান থেকে অনঙ্গকে আপনার হাসপাতালেব সহকারী রূপে পাঠাব—তার মাসিক দশটাকা বেতন আপনি এই তহবিল থেকেই দেবেন। অনঙ্গ সেবাপরায়ণ বলেই এখানে প্রসিদ্ধ। সে ব্রাহ্মণ সুতরাং বিশেষ প্রয়োজন হলে রোগীদের

রেঁধেও খাওয়াতে পারবে। দরকার হলে বোলপুর থেকে জিনিষ কিনেও আনবে। অর্থাৎ বিশেষভাবে তাকে আপনি ও অন্নদা স্বেচ্ছামত কাজে লাগাতে পারবেন—সে আর কারো কাছেই দায়ী থাকবে না। এই টাকাটা মনে করচি আজকালের মধ্যেই মানি অর্ডার যোগে আপনাকে পাঠাব—এরপরে কখন অচিরে আমার দুঃসময় উপস্থিত হবে তখন আবার বিঘ্ন ঘটতে পারে। সম্পূর্ণ পঞ্চাশ টাকা শেষ হবার পূর্ব্বেই আমার কাছ থেকে পূরণ করে নেবেন—কারণ একেবারে ৫০ টাকা দেওয়া অনেক সময়েই হয়ত আমার পক্ষে ক্লেশসাধ্য হতে পারে।[৮২]

ক্ষিতিমোহনকে লেখা রবীন্দ্রনাথের একাধিক চিঠিতে অন্নদা ও অনঙ্গের প্রসঙ্গ আছে। একটি চিঠিতে লিখেছেন :

অনঙ্গ আমাদের পত্রবাহক হইয়া চলিয়াছে—তাহাকে যথোপযুক্ত কাজে নিযুক্ত করিবেন। আপনাদের হাসপাতাল-লোকে অন্নদা রাজা তস্য মন্ত্রী অনঙ্গের অভ্যুদয় হউক। আমার বিশ্বাস এই যুবকটিকে বশ করিয়া লইতে আপনার বিশেষ বিলম্ব হইবে না। . .ইহাকে বিশেষভাবে আপনারই পারিষদ করিয়া লইবেন—সুতরাং ইহার বেতন আপনারই রাজকোষ হইতে দিলে ভাল হইবে। জিনিষপত্র কেনা হিসাব রাখা প্রভৃতি বাজে কাজে ইহাকে খাটাইতে পারিবেন—রাস্তাখনন বৃক্ষরোপণ প্রভৃতি পূর্ত্তকার্য্যেও এ ব্যক্তি সাহায্য করিতে পারিবে—এখানে কৃষিবিভাগ ইহার অধীনে ছিল। গ্রামের বালকদিগকে যদি পড়াইতে দেন তবে সে কাজও ইহার অভ্যস্ত হইয়াছে।[৮৩]

কখনও দেখতে পাই কোনো নতুন খরচের প্রশ্নে রবীন্দ্রনাথ কুণ্ঠিত হচ্ছেন : 'এখন ইস্কুলের তহবিল হইতে কোনো নূতন ব্যয়ের কথা দিনুকে বলিতে আমি কুণ্ঠিত হইতেছি। যাহার হাতে ক্যাশ থাকে তাহাকে খরচের কথা বলা দুঃসাহসের কাজ—এইজন্য আমাদের ক্যাশিয়ার যদুর কাছে আমাকে সর্ব্বদাই সঙ্কুচিত হইয়া থাকিতে হয়।'[৮৪] আবার এর পাশাপাশি এই চিঠিতেই লিখছেন : 'লাবণ্য যাইতেছে। সে বিদ্যালয়কে কিছু দান করিতে ইচ্ছা করিয়াছে। এই টাকাটা আপনি হাসপাতালের জন্য লইবেন এবং ইহা হইতে অন্নদার প্রয়োজন মত টাকা দিবেন।' কখনও বা শিক্ষকের মতো চিকিৎসক নিয়োগের দরকার ঘটেছে। রবীন্দ্রনাথ কোনো প্রস্তাবের উত্তরে নিজের মত জানিয়েছেন : 'কিরণ সিংহকে ডাক্তার নিযুক্ত করা সম্বন্ধে আমি ত উৎসাহবোধ করি নে। প্রথমত তাকে চিনি নে—দ্বিতীয়ত সেবকাম্নে পুরাতনং।'[৮৫]

অন্য কোনো চিঠিতেও ডাক্তারের প্রসঙ্গ এসেছে, রবীন্দ্রনাথ তাগিদ দিয়ে লিখছেন : 'ডাক্তারের কথাটা কোনোমতেই ভুলবেন না। ক্রমেই দেখতে দেখতে ছুটির সময় উত্তীর্ণ হয়ে যাচ্চে।'[৮৬] তাগিদ আছে নানা প্রসঙ্গেই। কখনও বা হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিকল্প-শিক্ষক খোঁজা আবশ্যক হয়ে পড়ে : 'হরিচরণের চিঠিখানা পাঠালুম—সত্বর উপায় করা আবশ্যক। ভাল লোকের সন্ধান করুন।'[৮৭] আবার কখনও লালগোলার রাজা যোগীন্দ্রনাথ রায়ের চিঠির উত্তর দেওয়ার জন্য তাগিদ যায় : 'লালগোলার পত্র পাঠাই। যদি তাঁহার সহিত সাক্ষাতের সুযোগ না ঘটে তবে পত্র দ্বারা তাঁহাকে আমাদের শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাইবেন।'[৮৮]

নানা দায়িত্বের পরিবেশে। অন্তরের গভীরে

এমনই করে ক্ষিতিমোহনের উপরে নানা দায়িত্ব এসে পড়ছিল, প্রথম থেকেই শান্তিনিকেতনের বিচিত্র কর্মজালের বাঁধনে বাঁধা পড়ছিলেন। সন্দেহ নেই, রবীন্দ্রনাথের চিঠির এই-সব নির্দেশ, খুঁটিনাটি নানা বিষয়ের বিচার-বিশ্লেষণ, কখনও বা অভিযোগ, কখনও বা ত্রুটি কিংবা ভুল শুধরে নেওয়ার আহ্বান তাঁকে বিদ্যালয়পরিচালনায় প্রতিদিন অভিজ্ঞ ও পারদর্শী করে তুলছিল। তিনি যেমন একদিকে এক অলোকসামান্য কবিমনীষীর সাহচর্য পাচ্ছিলেন, অন্যদিকে তেমনই সাহচর্য পাচ্ছিলেন এক বাস্তববোধসম্পন্ন সংগঠকের। তাঁকে রবীন্দ্রনাথ যখন শান্তিনিকেতনের কাজে আহ্বান করেছিলেন, তাঁর চিঠির ভাবে মনে হয় যেন তিনি এমন একজন ব্যক্তিকে অন্বেষণ করছেন যিনি তাঁর বিদ্যালয়ের সব ভার নেবেন—একে নিজের করে নেবেন। ক্ষিতিমোহনের সঙ্গে পরিচয় না-থাকলেও আশা হচ্ছিল তিনিই সেই লোক। রবীন্দ্রনাথ যে কথা ভেবেই এ-সব কথা লিখে থাকুন, ক্ষিতিমোহনের উপরে কোনো সময়ই বিদ্যালয়ের সম্পূর্ণ ভার এসে পড়েনি। শান্তিনিকেতনিক জীবনের শুরু থেকেই তিনি এর বিবিধ দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন সেখানকার আরও কোনো কোনো শিক্ষকের মতো। অধ্যক্ষতার দায়িত্ব কখনও তাঁর উপরে বর্তেছে, কখনও আর কারও উপরে। কয়েক বছর পরে আশ্রমপরিচালনার দায়িত্ব রথীন্দ্রনাথ অনেকাংশে গ্রহণ করেছেন, তখন থেকে আর প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করতে হয়নি। তবে অধ্যাপকমণ্ডলীতে যেমন বরাবর থেকেছেন, তেমনই বিশ্বভারতীর কার্যনির্বাহী সভায় স্থানলাভ করেছেন। তা ছাড়া বিদ্যাভবনের সম্পূর্ণ দায়িত্বেও কম দিন থাকেননি। অবশেষে শেষজীবনে অবসর নেওয়ারও পরে তাঁকে বিশ্বভারতীর অন্তর্বর্তীকালীন উপাচার্যের পদও গ্রহণ করতে হয়েছিল কিছুদিনের জন্য। পরিস্থিতিতে তখন জটিলতা এসেছে, প্রথম যুগ তার তুলনায় অনেক সরল ছিল। কিন্তু সেই প্রথম কাল থেকে ক্রমিক অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়েই সেই উপাচার্যের আসনে পৌঁছেছিলেন ক্ষিতিমোহন। তিনি যে আনাড়ি বা বহিরাগত ছিলেন না, তাঁর মন এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিল তাঁর যৌবনকাল থেকে, এটুকু ধারণা করতে পারি দ্বিধাহীন চিত্তে। শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের বা বিশ্বভারতীর যে আসনেই তিনি বসে থাকুন, যে দায়িত্বই তিনি পালন করে থাকুন, তার মূলে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, যিনি তাঁকে তাঁর আশ্রমিক কর্মজীবনের প্রথম বছরগুলিতে বিবিধ কর্মের দায়িত্বে পরিণত ও দক্ষ করে তুলছিলেন। এতেও অবশ্য সন্দেহ নেই যে এই নবীন অধ্যাপকের মধ্যে একটি যোগ্য আধার এবং সম্ভাবনা দেখেছিলেন বলেই তিনি এতটা প্রত্যাশা ও দাবি করেছিলেন।

জ্ঞানে কর্মে ভাবে এক পরিপূর্ণ জীবনবোধের অভীপ্সা আবাল্য মুকুলিত হয়েছে সেই মানুষটির অন্তরে। শান্তিনিকেতন তাঁর সেই অভীপ্সা পূরণের আনুকূল্য করেছে চিরদিন। স্ত্রী কিরণবালাকে লেখা চিঠিতে তাঁর এই সময়কার ভাবজগতের খবর পাই। তাঁর উপরে তাঁর

দীক্ষাগুরু সাধক ঈশানচন্দ্র বিদ্যারত্ন ও ফকির সাহেব এবং তাঁর বাউল-বন্ধু নিতাই-এর প্রভাবটুকু গোপন থাকে না। ক্ষিতিমোহন লেখেন :

> হে সখি, আমার চরম অর্ঘ্যখানি তাহারই জন্য রাখিয়াছি যিনি আমার পরম অন্তরের ধন। আমার অর্ঘ্যপাত্র আমি পুষ্পে সাজাইয়া চলিয়াছি—পথিমধ্যে যাহার যে কার্য্যে হউক সেই পাত্র হইতে পুষ্প তুলিয়া লইতেছে। তা লউক—সকলকে দিয়া যদি আমার পাত্র শূন্যও হইয়া যায় তবুও যাঁহার উদ্দেশ্যে এই পাত্র রচিত তিনি তাহা পূর্ণভাবে দেখিতে পারিবেন। পথে যে যে লইয়াছে—সব লওয়ার আনন্দ তিনি আপনার প্রাণে অনুভব করিবেন—কোনো দানই তাঁহার কাছে ব্যর্থ হইবে না।[৮৯]

কাজে যোগ দেওয়ার জন্য রবীন্দ্রনাথের অনুরোধে সাড়া দেওয়ার পরে ক্ষিতিমোহন তাঁকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন যে নদীর সঙ্গে তাঁর তুলনা দেওয়া চলে না। পাহাড় থেকে সমতলে নেমে এসে বহতা নদীধারা সেবাধর্মে আত্মনিয়োগ করে ক্রমশ মলিন হয়ে যায়, আর ক্ষিতিমোহন আসছেন পবিত্র হতে। সেই নদীর উপমাটাই আবার মনে এল :

> নদী চলিয়াছে—সমুদ্রের দিকে। পথে অসংখ্য দেশ গ্রাম জনপদ। সেই সব তৃষ্ণার্ত্ত ভূমিকে তৃপ্ত করিয়া শুষ্ককে সরস করিয়া, সকলকে সফল সিক্ত করিয়া যাহা সকল পথের ব্যবহারের অবশিষ্ট তাহাই সমুদ্রের কাছে আসিয়া ঢালিয়া দিতেছে। তাই তো সমুদ্র এত তরঙ্গের উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বাসে নিবিড় আনন্দে তাঁহার গভীর বক্ষে তাহাকে গ্রহণ করিয়াছেন। ভক্ত যখন তাহার ভজনীয়ের দিকে চলিয়াছে—তখন পথে সে কাহাকেও বঞ্চিত করে নাই—তাই তো সে পথের অসংখ্য সেবার দ্বারা, কৃপ[ণ]অসংখ্য দানের দ্বারা, দীন অসংখ্য প্রয়াসের দ্বারা প্রাপ্ত হইয়া তাহার দেবতার উৎসবে গিয়া উপস্থিত হয়।[৯০]

মনে হচ্ছে ক্ষিতিমোহন যেন আশ্রমদেবতার চরণে নিজের কর্মের অর্ঘ্য নিবেদন করে দিচ্ছিলেন, আর তারই সঙ্গে মিলিয়ে নিচ্ছিলেন তাঁর নিভৃত প্রাণের দেবতার অনুভবকে। স্ত্রীকে লেখা এই চিঠিতে এমন একটি চরমতম মিলনের নিবিড়তম অনুভব ব্যক্ত হল যা সব লৌকিক প্রেমের সীমাবদ্ধতাকে বহু দূর অতিক্রম করে যায় :

> প্রিয়তমে,
>
> কয়েকদিন হয় উপরি ২ তোমার ২ খানি পত্র পাইয়াছি—অথচ উত্তর দেই নাই। এই কয়দিন অনেকগুলি পত্র জমিয়াছিল—সবগুলিরই উত্তর দিয়াছি উত্তর দেই নাই কেবল তোমার পত্রগুলির। কথাটা শুনিয়া হয়তো অভিমান করিবে—কিন্তু ইহাই স্বাভাবিক। সকলের যেখানে লোকারণ্য সেখানে তোমায় আমায় নিবিড় মিলনটি হইবার নহে। আমার যিনি মন্দিরের দেবতা তাঁহার মন্দিরে যখন আমি উপস্থিত তখন যে যে সেখানে যে কোনো কাজেই আসুক না কেন, আমি কাহাকেও আর তাড়াইব না—সকলে যখন আপনা আপনি প্রসন্ন চিত্তে বিদায় লইবেন—তখন আমি একান্ত প্রসন্ন মনে সেই নির্জ্জন শুদ্ধ মন্দিরের আমার এক শুদ্ধ দেবতার ব্যাকুল অন্তরের মধ্যে নিজেকে ঢালিয়া দিব। সেখানে জানি আমি ভাষা নাই—তথাপি যে নিবিড় জীবন আছে আমার হৃদয় দিয়া তাহা ভোগ করিব। ... আমি যখন তোমার পত্রখানি সকল পত্রের পরের জন্য রাখিয়া দিয়াছিলাম তখন আমি তোমার ও আমার মিলনমন্দির মধ্যবর্ত্তী সকলের অপসারণ অপেক্ষা করিতেছিলাম। কাহাকেও ব্যথা দিয়া সরিবার আদেশ

দেই নাই। তাই এখন এই স্তিমিত ঘন গভীর নিৰ্জ্জন রাত্রিতে তোমাতে ও আমাকে [তে] এই জনহীন মন্দির কক্ষে চমৎকার হৃদয়ে হৃদয়ে দেখা। আমার সকলকে দিয়া রিক্ত অর্ঘ্যপাত্রখানি মনে মনে পূর্ণ করিয়া তুমিই গ্রহণ কর—সকল জনপদসেবক মালিন্যবাহক এই শেষ জলধারা তুমি তুমি তুমি তোমার গভীর নির্ব্বাক অন্তরে গ্রহণ কর। এখানে কোনো চপলতা নাই চঞ্চলতা নাই—কেবল ধীর ভাবে শেষ পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা আছে—কারণ আমি অভয়, তোমার প্রাণকে আমার প্রাণ আজ নিঃসংশয়ে ধ্রুবলোকে বরণ করিয়া লইয়া যাক—এ বিষয়ে আর প্রকাশ কবিবার শক্তি নাই—ভাষা দ্বারা মনটাকে আর ব্যাকুল করিব না।

ছুটিতে ছুটিতে। বালিকা বিভাগ

সে বছর অর্থাৎ ১৯০৯ সালের শারদীয় অবকাশে ক্ষিতিমোহন বর্মায় যাওয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন, কিন্তু কিরণবালা যেতে পারবেন না বলে সে বাসনা পরিত্যাগ করলেন। কিরণবালাকে লিখলেন :

তোমাকে ছাড়িয়া গিয়া আমার সুখ নাই। আমার মনে হইতেছে আমার একার দেখা যেন খণ্ডিত দেখা—মিথ্যা দেখা। তোমার চক্ষুর মধ্য দিয়া আমি পূর্ণ করিয়া দেখিতে চাই—ঐ একটি দৃষ্টি আমার সকল দেখাকে পূর্ণ করিয়া দিউক—আমার সকল মিথ্যা সত্য হইয়া উঠুক।[৯১]

প্রত্যেক ছুটিতে বেরিয়ে পড়তেন ক্ষিতিমোহন। স্ত্রী ছেলেমেয়ে ছাড়া অন্য আত্মীয়রাও থাকতেন সঙ্গে—ভাইপোরা, কিরণবালার ভাইরা। শান্তিনিকেতন থেকে সহকর্মীরা এবং ছাত্ররাও কেউ কেউ সঙ্গী হতে লাগলেন। এবারেও কথা ছিল অজিতকুমার সঙ্গে যাবেন, আরও কেউ কেউ হয়তো বর্মাভ্রমণের সঙ্গী হতেন। কেননা কিরণবালাকে লেখা চিঠি থেকে জানা যাচ্ছে ছুটিতে তাঁরা দশজন নবদ্বীপ ঘুরে সপ্তমী বা অষ্টমীর দিনে বাড়িতে পৌঁছবেন। অজিতকুমারকে উদ্ধৃত করে ক্ষিতিমোহন লিখলেন : 'অজিত বলিতেছে ঠানদির ধন ঠানদিকে দিয়া তাঁহার আশিস ভিক্ষা করিতেছি।'[৯২] অমিতা সেন বলেছেন :

যেদিন ছুটি হত সেইদিনই বেরিয়ে পড়তেন, ফিরতেন ছুটি-শেষের দিনে। বরাবর এই রকম। কখনও কখনও ছুটিতেও হয়তো আশ্রমে থাকলে ভালো হত এমন পরিস্থিতি হত। মা কত সময় রাগ করতেন—ছুটি হলেই চলে যাও কেন—গুরুদেব এখন আছেন আশ্রমে। বাবা চুপ করে থাকতেন। কিন্তু কী নেশায় যে তাঁকে টেনে বার করত কে জানে। এতে হয়তো কখনও শান্তিনিকেতনের প্রতি নিঃসর্ত আনুগত্যে ব্যাঘাত ঘটেছে একটু-আধটু, কিন্তু এই ভাবে না বেবোলে কি এত সংগ্রহ বাবা করতে পারতেন।[৯৩]

এ-সব অবশ্য আরও পরের কথা, যখন ক্ষিতিমোহন বয়সে বেশ পরিণত, বিশ্বভারতীর কাজকর্ম চলছে, দেশ-বিদেশ থেকে অতিথি-অভ্যাগত সবসময়েই আসছেন শান্তিনিকেতনে। তবে রবীন্দ্রনাথের অবিদিত ছিল না ক্ষিতিমোহনের এই পথের টানের কথা। প্রথম 'শারদোৎসব' নাটক অভিনয়ের পরে 'সন্ন্যাসীঠাকুর'-কে তিনি যে চিঠি লিখেছিলেন সে

তো আমরা দেখেছি। তেমনই অন্য সময় কখনও ক্ষিতিমোহনকে লিখেছেন : 'আপনার পথের সঙ্গী সঙ্গিনীরা বোধ হয় যে যাহার ঘরে গিয়াছেন।'[৯৪] একবার লিখেছিলেন :

> আপনি কিন্তু সুস্থ শরীর লইয়া আশ্রমে আসিবেন। অতিরিক্ত মাত্রায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেহযন্ত্রটাকে ক্লিষ্ট করিবেন না। শরীর মনের শক্তি যখন আশ্রমকে উৎসর্গ করিয়াছেন তখন অসাক্ষাতে তাহার অপব্যয় করিলে অন্যায় হইবে।[৯৫]

১৯০৮ সালের শেষের দিকে শান্তিনিকেতনে বালিকা বিভাগের একটি ছোট্ট চারা আপনি গজিয়ে ওঠে। মীরা দেবী, লাবণ্যলেখা দেবী প্রভৃতির জন্য পড়াশুনার একটু ব্যবস্থা করার কথা রবীন্দ্রনাথকে ভাবতেই হচ্ছিল। অঙ্কুরোদ্‌গমের উপলক্ষ হয়তো সেটাই। তার পরে ক্ষিতিমোহনের চেষ্টায় মধুসূদন সেন তাঁর কন্যা হেমলতা (টুলু)-কে পাঠান, ক্ষিতিমোহনের আর-এক আত্মীয় প্রসন্নকুমার সেন পাঠান তাঁর দুই কন্য হিরণবালা ও ইন্দুবালাকে। এ ছাড়া এসেছিলেন তারকনাথ রায়ের কন্যা প্রতিভা ও তাঁর ভাই শ্রীশচন্দ্র রায়ের কন্যা সুধা। অরুণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা সাগরিকাও ছাত্রী হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের ২৮ এপ্রিল ১৯০৯-এ লেখা চিঠি থেকে জানা যায় শান্তিনিকেতনে একটি ছোটোখাটো বালিকাবিদ্যালয়ও জমে উঠেছে : 'এখন ৬টি মেয়ে পড়ে—ছুটির পরে আষাঢ় মাসে আরো কয়েকটি আসিবে কথা আছে।' ছুটির পরে মোহিতচন্দ্র সেনের স্ত্রী সুশীলা দেবী দুটি বালিকা কন্যাকে নিয়ে শান্তিনিকেতনে এলে ছাত্রীসংখ্যা বাড়ল। প্রথম থেকেই রবীন্দ্রনাথের এই বালিকাবিভাগটিকে সযত্নে গড়ে তোলবার ইচ্ছা ছিল। যাঁদের কাছে লেখা চিঠিতে এই বিভাগ সম্পর্কে করণীয় নিয়ে তিনি আলোচনা করেছেন, তাঁদের মধ্যে ক্ষিতিমোহন অন্যতম। যদিও মনে হয়েছিল দেখতে দেখতে এই বিভাগ বেড়ে উঠবে, কিন্তু সূচনা থেকেই নানা অসুবিধা সৃষ্টি হয়। সম্ভবত কিছু বাধা শান্তিনিকেতন ট্রাস্টের পক্ষ থেকে ঘটেছিল। একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ ক্ষিতিমোহনকে লিখেছিলেন :

> দিনু বালিকা বিভাগ সম্বন্ধে নানা কথা লিখেছে—তৎসম্বন্ধে আমার যা বক্তব্য তাকে বলে দিয়েছি। কেবল একটি অংশ উদ্ধৃত করে দিই—"হিরণ সকাল থেকে রাত্রি পর্য্যন্ত একলা যে রকম পরিশ্রম করচে তুমি থাকলে হত কিনা বলতে পারি নে।" এ কথাটা যদি সমূলক হয় তাহলে এর মূলোচ্ছেদন করতে তো বেশি সময় লাগা উচিত নয়।

এই অংশ উদ্ধৃত করে ড. প্রশান্তকুমার পাল লিখেছেন : 'ছাত্রীসংখ্যার তুলনায় ব্যয়াধিক্যও অন্যতম প্রধান সমস্যা ছিল।' তবে রবীন্দ্রনাথের উদ্ধৃত দিনেন্দ্রনাথের চিঠির একটু অংশ থেকে তার সঠিক মর্মার্থ ভিতরের কথা না জানলে বোঝা মুশকিল। কিন্তু ড. পালের আর-একটি মন্তব্য উল্লেখযোগ্য। এই সময়ে অজিতকুমার-লাবণ্যলেখার প্রণয় ও বিবাহ সমস্যা বাড়িয়েছিল, যার জন্য রবীন্দ্রনাথ পুরুষসংস্রববর্জিত শিলাইদহে বালিকা বিভাগ নিয়ে যাওয়ার কথা ভেবেছিলেন। যে কারণেই হোক বালিকা বিভাগ বন্ধ করে দিতে হল। ১৩১৭ সালের পুজোর ছুটির আগে পর্যন্ত চলেছিল এই বিভাগ। ক্ষিতিমোহনকে ২২ কার্তিক ১৩১৭-এ লেখা চিঠি থেকে জানা যায় যে বালিকা বিভাগ

শিলাইদহে স্থানান্তরিত করার কথা নিয়ে তাঁরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :

> এখানে কন্যাবিদ্যালয় খুলিবার জন্য রথীর সঙ্গে কথা চলিতেছে। স্থানাভাব আছে—একটা কাছারির ঘর প্রস্তুতের ব্যবস্থা হইতেছে, সেইটি হইলে তবে এখানে জায়গা হইবে। ইতিমধ্যে ইংরেজ শিক্ষয়িত্রী আসিয়া পৌঁছিবেন। তিনি আমেরিকা ছাড়িয়াছেন—যাহা হউক আপনার সঙ্গে আর একবার পরামর্শ করিতে হইবে—অনেক আলোচ্য বিষয় আছে। শিক্ষক জোটানোর একটা সঙ্কট আছে।[৯৬]

শেষপর্যন্ত অবশ্য শিলাইদহে বালিকা বিদ্যালয় নিয়ে যাওয়া হয়নি। শিক্ষক জোটানোর সংকট-সমেত বাধা তো নানা ধরনেরই ছিল বোঝা যায়। অন্য এক দ্বিধাও যে রবীন্দ্রনাথের মনে ছিল অন্তরঙ্গারা তারও আভাস পাচ্ছিলেন।[৯৭]

এ-সব সত্ত্বেও শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় আর কেবলমাত্র বালক-বিদ্যালয় রইল না, কিছুদিনের মধ্যেই বিভিন্ন ক্লাসে একটি-দুটি করে ছাত্রীর প্রবেশ ঘটতে লাগল। সুন্তোষচন্দ্র মজুমদারের বোনেরা, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা, ক্ষিতিমোহন সেনের কন্যারা, ভাগিনী ও অন্যান্যরা, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের দুই বোন, সুধাকান্ত রায়চৌধুরীর বোন প্রভৃতি শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের প্রথম দিককার ছাত্রী।[৯৮]

জ্ঞান ও কর্মের নানা উদ্যোগে

পর্জন্য উৎসবের সময় যে বৈদিক রীতির প্রয়োগ ঘটেছিল, শান্তিনিকেতনের উৎসব-অনুষ্ঠানে তার একটি স্থায়ী প্রভাব পড়ল। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন : 'এইবারকার বর্ষা-উৎসবের সময় হইতে আশ্রমের উৎসবাদির মধ্যে বৈদিক মন্ত্রাদি প্রচলনের সূত্রপাত হইল। ...শান্তিনিকেতনের উৎসবাদির ক্ষেত্রে সেই বৈদিকতা নূতন রূপে প্রবেশ করিল—তার প্রবেশ হইল আর্টরূপে।'[৯৯] শান্তিনিকেতনের উৎসব-অনুষ্ঠানে বৈদিক মন্ত্র আলপনা ও মাঙ্গল্যদ্রব্যের ব্যবহাররীতির প্রবর্তক ক্ষিতিমোহন সেন, এ কথার সুস্পষ্ট স্বীকৃতি পেলাম প্রমদারঞ্জন ঘোষের লেখায়। তিনি লিখেছেন : '...বিদেশী কায়দায় টেবিল চেয়ার দিয়ে সভাসমিতির অনুষ্ঠান শান্তিনিকেতনে অপ্রচলিত। আজ দেশের প্রায় সর্বত্রই সভাসমিতিতে এই প্রথা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। দেশ এজন্য প্রধানত ক্ষিতিবাবুর নিকট ঋণী,...।'[১০০] ক্ষিতিমোহন শান্তিনিকেতনে এসে দেখেছিলেন এখানেও সভা সাজানো হয় অন্য জায়গার মতোই বিজাতীয় প্রথায় চেয়ার-টেবিল পেতে। তিনি কাশীতে দেখতেন পুরাণকথকদের জন্য থাকে সুসজ্জিত ব্যাসবেদি বা ব্যাসাসন, মাল্যচন্দনে অর্চনা করতে হয় তাঁদের। শান্তিনিকেতনে এই রীতির প্রচলন করতেই সভার রূপ একেবারে বদল হয়ে গেল, প্রাচীন যুগের ঐশ্বর্যের আভাস ফুটল তাতে। সাজানো ব্যাসবেদি, সভাপ্রধান যেখানে বসবেন, তার সামনে আলপনা, পাশে ধূপ-দীপ-গন্ধ পুষ্পের অর্ঘ্য, মালাচন্দনে সভাপতি ও অন্যান্য প্রধান ব্যক্তিদের বরণ পুরাণকথক-অর্চনার ধারা অনুসরণ করে। ক্রমশ

অনুষ্ঠানগুলিতে বৈদিক মন্ত্রের প্রয়োগ ঘটতে লাগল। ক্ষিতিমোহন প্রাচীন শাস্ত্রবিধি অনুসারে আশ্রমের ছেলেদের দিয়ে আলপনা করাতেন। তাঁর লেখায় পাই :

> পঞ্চগুড়িকায় ও নানা রেখায় আলপনারও একটা নিজস্ব ভাষা একদিন ছিল। দুঃখের বিষয় তা আমরা ভুলে গেছি। বৈদিক যজ্ঞে ইষ্টকা সাজাবারও একটা ভাষা ছিল, তারও অর্থ আমরা ভুলে গেছি।

বৈদিক সভ্যতা-সংস্কৃতির নানা ধরনের রীতি ও প্রথা, বা আর কোনো ধারা যা বর্তমানে তার অর্থ হারিয়ে ফেলেছে, হারিয়েছে তার উদ্দেশ্য, সে-সব বিষয় নিয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁদের আলোচনা হত, এই সব হারিয়ে-যাওয়া অর্থসম্পদের জন্য রবীন্দ্রনাথ বেদনাবোধ করতেন।

আলপনা প্রসঙ্গে ক্ষিতিমোহন লিখেছেন : 'তখন কলাভবন হয় নি, এখন এই সব কাজ কলাভবনেরই নিজস্ব কর্তব্য হয়েছে।'[১০১] সেই একেবারে গোড়ার দিনগুলিতে যাঁদের দিয়ে ক্ষিতিমোহন আলপনা আঁকার কাজ করাতেন রীতি-অনুসারী শিল্পশিক্ষা ছিল না তাঁদের। কলাভবনের প্রাণপুরুষ নন্দলাল বসু বিশ্বভারতীর সূচনায় শান্তিনিকেতনে আসেন। শান্তিনিকেতনের উৎসব-অনুষ্ঠানের সাজসজ্জায় ক্ষিতিমোহনের অভিজ্ঞতা ও পরামর্শ তাঁর কাছে কতটা যে মূল্যবান ছিল তার একটু আভাস পাওয়া যায় পূর্বসূরির মৃত্যু-পরবর্তী তাঁর একটি মন্তব্যে :

> এতকাল শান্তিনিকেতনের জীবনযাত্রায় বিভিন্ন উৎসবে অনুষ্ঠানে তিনি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ছিলেন। আজ এইখানকার উৎসব অনুষ্ঠানের যে পরিপূর্ণ রূপ দেখতে পাই তাহার পিছনে ক্ষিতিমোহনবাবুর দান অপরিসীম।[১০২]

অমিতা সেন তাঁর 'আনন্দ সর্ব কাজে' গ্রন্থে শ্রীনিকেতনের হলকর্ষণ উৎসবের বর্ণনায় লিখেছেন :

> হালচালনা করবার লম্বা রেখাটির দুই পাশ দিয়ে অপরূপ রঙিন আলপনার নক্‌শা। উৎসবের আগে শিল্পী নন্দলাল এসেছিলেন পন্ডিত ক্ষিতিমোহনের কাছে। পুরাকালে হলকর্ষণের উপযোগী উৎসবসজ্জার বিবরণ সহ মাঙ্গলিক শ্লোক পাঠ করে শোনালেন ক্ষিতিমোহন, আর নন্দলাল কাগজে তা লিখে নিলেন। সেই অনুসাবে উৎসব-অঙ্গন সাজালেন তিনি। শান্তিনিকেতনের নানা উৎসব উপলক্ষে এমনিভাবেই নন্দলাল আসতেন ক্ষিতিমোহনের কাছে, এক এক উৎসবে এক এক দ্রব্যে এক এক ভাবে সাজানো পুরাকালের রীতির কথা জেনে নিতেন তিনি।[১০৩]

শান্তিনিকেতনে এসে ক্ষিতিমোহন আর-একটি কাজও বলতে গেলে একেবারে প্রথম দিকেই করেছিলেন, সে প্রসঙ্গ এইখানেই উত্থাপন করা যাক। ১৯৪৩ সালে লেখা তাঁর দুটি প্রবন্ধ আছে—'বেদমন্ত্ররসিক রবীন্দ্রনাথ' ও 'রবীন্দ্রনাথের বেদমন্ত্রানুবাদ'।[১০৪] বর্তমানে 'রূপান্তর' গ্রন্থে রবীন্দ্রকৃত বেদ ও উপনিষদের যে মন্ত্র-অনুবাদগুলি আছে তার প্রথম এগারোটির অনুবাদ-প্রসঙ্গ তাঁর এই প্রবন্ধেই প্রথম স্থান পায়। জানা যায় ১৯০৯ সালে, অগ্রহায়ণ ১৩১৬-য় ক্ষিতিমোহন রবীন্দ্রনাথকে কয়েকটি বেদবাণী অনুবাদ করতে অনুরোধ

করেন। 'বেদমন্ত্ররসিক রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধে ক্ষিতিমোহন এই তারিখ ১৬ অগ্রহায়ণ বলে উল্লেখ করলেও ড. প্রশান্তকুমার পালের মতে এই তারিখ ভুল, কারণ এ সময় রবীন্দ্রনাথ ছিলেন না শান্তিনিকেতনে। কথাটা হচ্ছে, এই ঘটনার স্মৃতিও ক্ষিতিমোহনের মনের মধ্যে নিজের জন্মদিনের অনুষঙ্গে জড়িয়ে ছিল। যাই হোক, এর পরে রবীন্দ্রনাথ ২২ অগ্রহায়ণ থেকে সপ্তাহখানেকের মধ্যে তাঁর প্রিয় কয়েকটি বেদমন্ত্র অনুবাদ করেন। 'গীতাঞ্জলি'-র কবিতা-লেখা একটি খাতার কয়েক পাতায় এই অনুবাদগুলি করা হয়। দুটি মন্ত্রের অনুবাদে তখনই সুর দিলেন—'তুমি আমাদের পিতা' ও 'যদি ঝড়ের মেঘের মতো আমি ধাই'। অন্যগুলিতেও সুর দেওয়ার ইচ্ছা ছিল তাঁর, কিন্তু মনের মতো সরল অথচ গম্ভীর বেদোচিত সুর দিতে না-পারায় সে সুর আর কোনোদিনই দেওয়া হয়নি। এই মন্ত্রানুবাদগুলি ক্ষিতিমোহনের কাছেই রাখা ছিল।[১০৫] ক্ষিতিমোহন লিখেছেন :

> ...১৯০৯ সালে করা তাঁহার কয়েকটি বৈদিক মন্ত্রের অনুবাদ আমি সযত্নে রক্ষা করিয়াছি। ...প্রায়ই এইগুলি আমি তাঁহার কাছে উপস্থিত করিয়া সুর বাহির করিবার জন্য তাগিদ দিতাম। ...প্রতিবারই তাঁর সঙ্গে এই বিষয়ে কথা হইত। দেখিতাম সুর ছাড়া এইগুলি প্রকাশিত করিতে তিনি অনিচ্ছুক। তাই এগুলি এতদিন আমার কাছেই প্রতীক্ষা করিতেছিল।[১০৬]

পরেও একবার রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে কতকগুলি বেদমন্ত্রের অনুবাদ করাবার চেষ্টা করেছিলেন ক্ষিতিমোহন, সেটা ১৯১০ সালের পরের ঘটনা বলে তিনি উল্লেখ করেছেন। সেগুলি গান নয় বলে সুরারোপের প্রয়োজন ছিল না। ঋগ্‌বেদের উষা, পর্জন্য প্রভৃতির স্তুতি ও বশিষ্ঠের মন্ত্র ছিল তার মধ্যে; আর ছিল অথর্ববেদের কতকগুলি মন্ত্র। অথর্বের নৃসূক্ত, স্কম্ভসূক্ত, মহীসূক্ত, ব্রাত্যসূক্ত, বিরাটস্তুতি, উচ্ছিষ্টস্তুতি, শান্তিমন্ত্র প্রভৃতি রবীন্দ্রনাথকে এমন আকৃষ্ট করেছিল যে অনুবাদ না-করে তিনি পারেননি। কিন্তু যেমন ১৯০৯ সালের আগে তাঁর করা কতকগুলি বেদমন্ত্রানুবাদ হারিয়ে গিয়েছিল, এই ১৯১০ সালের পরে করা মন্ত্রানুবাদের খাতাও তিনি কাকে দেখতে দিয়ে আর ফেরত পাননি বলে ক্ষিতিমোহন জানিয়েছেন।[১০৭] তাঁর লেখা অন্যত্র পাই :

> ...আমি তাঁহাকে দিয়া ১৯১০ সালের পরে ঋগ্বেদের আরও কয়েকটি মন্ত্রের অনুবাদ করাইয়াছিলাম। তাহার মধ্যে উষার বর্ণনামন্ত্র, পর্জন্যের স্তবমন্ত্র, বসিষ্টের আরও দুই একটি মন্ত্র আছে। অথর্ববেদটি আমার নিজের অতিশয় প্রিয়। অথর্বের কয়েকটি স্তব আমি তাঁহার কাছে উপস্থিত করাতে তিনিও তাহার অতিশয় প্রশংসা করেন। অথর্ববেদের ২,১; ৩,৩০; অষ্টমকাণ্ডের বিরাটস্তুতি, নবম কাণ্ডের হেঁয়ালিগুলি, দশম কাণ্ডের নৃসূক্ত এবং স্কম্ভসূক্ত, একাদশ কাণ্ডের উচ্ছিষ্টস্তব এবং মানবদেহের মাহাত্ম্য, দ্বাদশ কাণ্ডের মহীসূক্ত, পঞ্চদশ কাণ্ডের ব্রাত্যসূক্ত তাঁহার খুবই ভাল লাগিয়াছিল। ইহার মধ্যে কতকগুলি মন্ত্রের তিনি অনুবাদও করেন।[১০৮]

'রূপান্তর'-এ বলা হয়েছে এই অনুবাদগুলি এখনও আবিষ্কৃত হয়নি।

ক্ষিতিমোহন তাঁর প্রবন্ধে লিখেছিলেন : '১৯০৯ সালের পূর্বে এবং ১৯১০ সালের পরে তাঁহার রচিত সবগুলি মন্ত্রানুবাদ একত্রে প্রকাশিত হইলে বাংলা ভাষায় একটি পরম

সম্পদ পাওয়া যাইবে।' এর বাইশ বছর পরে বিশ্বভারতী 'রূপান্তর' প্রকাশ করেন। ক্ষিতিমোহনের প্রবন্ধ থেকে এ সংবাদও পাওয়া যায় যে রবীন্দ্রনাথ ধম্মপদের অনুবাদও করেছিলেন, সেগুলিও পাওয়া যায়নি।[১০৯] আমরা আরও জানতে পারি যে অথর্ববেদের ঊনবিংশ কাণ্ডের অভয়মন্ত্র রবীন্দ্রনাথ আগেই অনুবাদ করেন, সেও ক্ষিতিমোহনের কাছে ছিল। তা ছাড়া অথর্ববেদের 'পরিদ্যাবা পৃথিবী সদ্য আয়মুপাতিষ্ঠে প্রথমজমৃতস্য' (২, ১, ৪) মন্ত্রটিও ভালো লাগে রবীন্দ্রনাথের, সেটি অনুবাদ করে তিনি 'শেষ সপ্তক'-এর চল্লিশ-সংখ্যক কবিতার প্রারম্ভে ব্যবহার করেন। 'এইসব মন্ত্রের সবটা তিনি অনুবাদ করেন নাই। তবে মাঝে মাঝে বাছিয়া বাছিয়া যাহা অনুবাদ করেন তাহার পরিমাণও নিতান্ত কম নহে।'—লিখেছেন ক্ষিতিমোহন।[১১০]

আরও বহুসময় বহুবার যে ক্ষিতিমোহনের সঙ্গো রবীন্দ্রনাথের বেদমন্ত্র নিয়ে আলাপ-আলোচনা হয়েছে তার একটি নিদর্শন রয়ে গেছে ক্ষিতিমোহনের লেখা একটি চিঠিতে :

> শ্রীচরণেষু ২৮/৪/৩৫
>
> ঊষার স্তবের মধ্যে এই চারিটিই পছন্দ করিয়া ঠিক মূল মত যাহা হইতে পারে এবং সায়ন যাস্ক প্রভৃতি আচার্য্যগণ ভিন্ন ভিন্ন যেরূপ অর্থ করিয়াছেন তাহা বন্ধনীর মধ্যে দিয়া পাঠাইলাম।
>
> সপ্তমটা "বুধ্যে ইষণ্যন্" [...] কিছু নয়। আমি "আ-মিষন্" শুনিয়াছিলাম। ইষণ্যং হওয়ায় তাহা আর রহিল না।
>
> কাজেই এই চারিটিই ভাল। গানের যোগ্য। "সুনৃত" কেহ "সু-ঋত" কেহ "সু-নৃত" ধরেন। প্রণত
>
> শ্রীক্ষিতিমোহন সেন

চিঠিটি সম্ভবত ২৮ শ্রাবণ ১৩৩৫-এ লেখা, অর্থাৎ ১৯২৮ সালে। ঊষার স্তব-মন্ত্রগুলি এই সঙ্গো রবীন্দ্রনাথকে পাঠানো হয়ে থাকবে। রবীন্দ্রভবনসংগ্রহে এগুলি রক্ষিত আছে। এ ছাড়া আরও কয়েকটি কাগজে যজুর্বেদের শরৎবর্ণনা যেটি 'শারদোৎসব'-নাটকে ব্যবহৃত হয়েছে অথর্ববেদের পৃথিবীর স্তব, ঋগ্‌বেদের ঊষাস্তব ক্ষিতিমোহন-হস্তাক্ষরে দেখতে পাওয়া যায়।[১১১]

এই প্রসঙ্গো উল্লেখ্য, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ফাল্গুন ১৮৯৪ সংখ্যায় 'য আত্মদা বলদা' মন্ত্রের রবীন্দ্রনাথকৃত অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল, সে কথা তাঁর বোধ হয় মনে ছিল না। ক্ষিতিমোহন তাঁকে বেদমন্ত্র অনুবাদের অনুরোধ করলে তিনি বরং তাঁর পুরানো অনুবাদ-খাতাখানির খোঁজ করেছিলেন, সে খাতা পাওয়া যায়নি। তারপর ১৯৪৩ সালের গোড়ার দিকে প্রবাসী চৈত্র ১৩৪৯ সংখ্যায় বিশ্বভারতীর অধ্যাপক নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা থেকে 'য আত্মদা বলদা' মন্ত্রটির কবির-করা অনুবাদ তিনি এই প্রবন্ধে প্রকাশ করেছিলেন। এই প্রবন্ধ ক্ষিতিমোহনের রবীন্দ্রনাথের বেদমন্ত্রানুবাদ-বিষয়ক দুটি প্রবন্ধের পূর্বসূরি। এমন হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে নির্মলচন্দ্রের প্রবন্ধ পড়েই এই দুটি প্রবন্ধ লেখবার কথা ক্ষিতিমোহনের মনে আসে।

আগেই বলেছি সন্ধ্যার পরে আলো জ্বেলে পড়াশুনা করবার অভ্যাস ক্ষিতিমোহনের ছিল না। শান্তিনিকেতনে এসে দেখলেন এখানেও সূর্যাস্তের পরে অনধ্যায়। দু-একজন অধ্যাপক কেবল বাতি জ্বেলে লেখাপড়া করতেন, না-হলে সে-সময় কেউই লেখাপড়া করতেন না, রবীন্দ্রনাথও না। এই সান্ধ্য অবকাশে ছেলেরাও যেমন রবীন্দ্রনাথের সাহচর্য পেত, অধ্যাপকরাও তেমন পেতেন। রবীন্দ্রনাথ নিজেই এই ব্যাপারে অত্যন্ত উৎসাহী ছিলেন। পরস্পরের ভাববিনিময় ও মতবিনিময়ের পরিবেশ শান্তিনিকেতনে প্রথম থেকেই ছিল। একটি স্মৃতিকথায় ছবি পাই, ক্ষিতিমোহন শান্তিনিকেতনে আসবার ঠিক আগের বছর একদিন সন্ধ্যায় রবীন্দ্রনাথ পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রীর সঙ্গে সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্র আলোচনা করছেন।[১১২]

ক্ষিতিমোহন শান্তিনিকেতনে এসে এই নিয়ত বিদ্যাচর্চা ও সাহিত্য আলোচনার পরিবেশ পেয়ে যে পরম আগ্রহে তার অঙ্গীভূত হয়েছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। এই সান্ধ্য বৈঠকে নানা বিষয়ে আলোচনা হত। প্রমদারঞ্জন ঘোষ অবশ্য আরও কয়েক বছর পরে এসেছিলেন এখানে শিক্ষকতা করতে, তবু তাঁর স্মৃতিকথায় এই-সব অনানুষ্ঠানিক আলোচনাসভায় ক্ষিতিমোহন নিজে কী ভূমিকা পালন করতেন তার যে বিবরণ আছে, তা এখানে উদ্ধার করে দিলে খুব অপ্রাসঙ্গিক হবে না :

> রবীন্দ্রনাথের সমক্ষে যখন সাহিত্যবিষয়ক কোন গভীর আলোচনা হত তখন ক্ষিতিবাবুর জ্ঞানের গভীরতা ও সাহিত্য রসবোধ আমাদের মুগ্ধ করত। সেই আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ ও ক্ষিতিবাবুর ভূমিকাই হত মুখ্য, আমরা হতাম শুধু নীরব শ্রোতা। রবীন্দ্র-প্রতিভার সমক্ষে আমাদের বুদ্ধির দীনতা তখন খুবই স্পষ্ট হত; এবং এ কথাও মনে হত ঐ আলোচনায় রবীন্দ্রনাথের সমকক্ষ হবার যোগ্যতা যদি কারো থাকত তা ছিল ক্ষিতিবাবুর। অধ্যাপকদের অপর কেউ ক্ষিতিবাবুর ন্যায় এ ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের 'সহযোগী' ছিলেন না। রবীন্দ্রনাথের লেখায় স্থানে স্থানে তাঁর 'বন্ধু' ক্ষিতিমোহনবাবুর অপূর্ব সংগ্রহের ভাণ্ডারের কথা পাওয়া যায় এবং ক্ষিতিবাবুর সংগৃহীত মধ্যযুগের সন্তসাহিত্য ও বাংলার বাউলগানের ভাণ্ডার থেকে কিছু কিছু রত্ন চয়ন করে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্যে স্থান দিয়েছেন।[১১৩]

এই অবসরক্ষণের আলোচনার সময়ই রবীন্দ্রনাথ এই সংগ্রহভাণ্ডারের ভাণ্ডারীটিকে আবিষ্কার করলেন, যিনি কিশোর বয়স থেকে মধ্যযুগীয় সন্তদের সাধনা ও বাণীর চর্চা করে আসছেন, যিনি বাউলসাধনা ও গানের বিস্তর খোঁজখবর রাখেন, যিনি তাঁর মনের মধ্যে ভারতীয় শাস্ত্রজ্ঞান ও এই-সব ব্রাত্য সাধনাকে বেশ স্বচ্ছন্দে সমন্বিত করতে পেরেছেন। এদিকে ক্ষিতিমোহন মধ্যযুগের সাধকদের বাণীর ভক্ত হলেও এগুলি নিয়ে সেই গোষ্ঠীর বাইরে কারও সঙ্গে আলোচনায় আগ্রহী ছিলেন না। এসব বাণী সবার কাছে প্রকাশে তাঁর মনে বাধা ছিল, চেষ্টা ছিল গোপনীয়তা রক্ষার। 'তবু এক একদিন অনবধানতায় আলোচনার উৎসাহে আমার মুখ হইতে কবীর রবিদাস দাদূ রজ্জব মীরা প্রভৃতির বাণী ও বাউলগানের কোনো কোনো অংশ বাহির হইয়া পড়িত।'[১১৪] ক্রমশ রবীন্দ্রনাথের সামনে তাঁর এক নতুন পরিচয় উদ্‌ঘাটিত হতে লাগল, এ পরিচয় যে তিনি পাবেন তাঁকে শান্তিনিকেতনে আহ্বান জানানোর সময় তা তাঁর প্রত্যাশার মধ্যে ছিল না। শাস্ত্রীয় পণ্ডিত হয়েও ক্ষিতিমোহন

কালীমোহন ঘোষের সঙ্গো গ্রামে গ্রামে ঘুরেছেন এবং দেশহিতব্রতে আগ্রহ বোধ করেছেন—এ খবর পেয়ে তাঁর মধ্যে লোকপ্রেমের নিদর্শন দেখতে পেয়েছিলেন। এখন দেখতে পেলেন মানুষটি যথার্থই লোকপ্রেমিক বটে, দেশের মাটির সঙ্গো যেন তাঁর জন্মজন্মান্তরের যোগ। লোকধর্ম-সংস্কৃতির গভীরে তাঁর মন বাঁধা পড়েছে। প্রথম প্রতিক্রিয়ায় রবীন্দ্রনাথ এগুলি বই-আকারে প্রকাশের জন্য ব্যগ্র হলেন। পুরোনো কালের এই-সব সন্ত ও বাউলদের সাধনসংগীত তখনও পর্যন্ত সাধক ও ভক্তমণ্ডলীর নিজেদের বৃত্তে আবদ্ধ ছিল, ভারতের কোনো অঞ্চলেই তা পণ্ডিত বা বিদ্বজ্জনসম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি। প্রকাশার্থে এই-সব সন্তবাণীগুলি সংকলিত করতে রবীন্দ্রনাথ তাগিদ দিলেন ক্ষিতিমোহনকে। এই আদেশ পালন করতে গিয়েই ক্ষিতিমোহন প্রথম দেশের লোকসাধনা ও দর্শনের সম্পদ সংকলনে ও এই বিষয়ে গবেষণায় অভিনিবেশ স্থাপন করলেন। এই হতেই তাঁর লেখকজীবনের সূচনা। তাঁর প্রথম সংকলনগ্রন্থ 'কবীর'।

শান্তিনিকেতনে আসবার বছর কুড়ি পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে ক্ষিতিমোহন ভারতীয় মধ্যযুগের সাধনার ধারা সম্পর্কে বক্তৃতা দেন। এই বক্তৃতা যখন বই হয়ে বেরোল, তার ভূমিকায় তিনি লিখেছিলেন :

> ১৯০৮ সালে শান্তিনিকেতনে আসিয়াও আমি আমার প্রত্যেকটি ছুটি ও সর্বপ্রকারের অবসরকাল এই সব সন্ধানেই কাটাইয়াছি। দীর্ঘকাল আমার বাতিকের খবর সেখানে মুখ খুলিয়া কাহাকেও জানাই নাই। ...তারপর কি জানি কেমন করিয়া কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ সন্ধান পাইলেন। তখন তিনি ক্রমাগত আমাকে এই সব বিষয়ে লিখিবার জন্য তাগিদ দিতে লাগিলেন।[১১৫]

তাগিদের কথাটা খুবই সত্য, কিন্তু ক্ষিতিমোহন সম্ভবত দীর্ঘকাল তাঁর সন্তবাণী সংগ্রহের খবর রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে গোপন করে রাখতে পারেননি। মনে হয়, ১৯৩০ সালের গোড়ায় যখন তিনি এ বইয়ের ভূমিকা লিখছেন, তাঁর শান্তিনিকেতন-জীবনের সেই একেবারে প্রথম দিককার সান্ধ্য সভাগুলির স্মৃতি তাঁর মনে পড়েনি। না-হলে আমরা তো তাঁরই লেখা থেকে এ খবর পাচ্ছি যে আলোচনার উৎসাহে অনবধানতায় তিনি দু-চারটি সন্তবাণী বা বাউলগানের প্রসঙ্গ টেনে আনতেন। ১৯৪৪ সালে লেখা প্রবন্ধ থেকে তাঁর একটি বক্তব্য অনতিপূর্বে উদ্ধৃত করা হয়েছে।

১৯১০ সালে তাঁর 'কবীর' প্রকাশিত হল চার খণ্ডে। ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস প্রকাশ করলেন, রবীন্দ্রনাথ ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। ক্ষিতিমোহন কিশোর বয়স থেকে কবীরপন্থী। ঈশানচন্দ্র বিদ্যারত্ন ও পানদরিয়ার ফকিরসাহেব—যাঁদের কাছে নাবালক বয়সেই তাঁর দীক্ষা সন্তমতে, এঁরা এবং অধ্যাপক সুধাকর দ্বিবেদী তাঁকে সন্তপন্থায় প্রবেশের পথ দেখিয়েছিলেন। অবশ্য তিনি নিজের ঔৎসুক্যেই বাল্যকাল থেকে সন্ন্যাসী-ফকিরের সঙ্গ করতেন। কবীরসাহেব যে সেই সময় থেকেই তাঁকে পিপাসার জল জুগিয়েছেন তাতে সন্দেহ নেই। আরও কত-না উৎসের কাছে তিনি অঞ্জলি পেতেছেন। তাঁর 'কবীর' প্রথম খণ্ডের উৎসর্গপত্র থেকে এটাও জানা যাচ্ছে যে তাঁর অগ্রজ অবনীমোহন সেন তাঁকে হিন্দুস্থান ও পারস্যের ভক্তদের বাণী আস্বাদন করতে শিখিয়েছিলেন। তবু কবীর

ক্ষিতিমোহনের প্রথম প্রেম। কবীরসাহেব ও অন্যান্য সন্তদের বাণী এবং বাংলার বাউলদের গান তাঁর আপন নিভৃত মনের নিত্যসঙ্গী ছিল। এঁদের জীবন ও সাধনধারা নিয়েও পড়াশুনা করতেন, তাঁদের সম্প্রদায়ের আখড়ায়-মঠে যাওয়া-আসা করতেন। কিন্তু এই-সব সন্তদোঁহা প্রকাশের কথা তিনি ভাবেননি। রবীন্দ্রনাথের আন্তরিক ইচ্ছায় তিনি এগুলি সংকলন ও প্রকাশের কাজে প্রবৃত্ত হলেন, 'কবীর' তার প্রথম ফসল।

ভারতীয় মধ্যযুগের সন্তসাধনাকে অবলম্বন করে যে আশ্চর্য গভীর ও ঐশ্বর্যময় ভাবসম্পদ সৃষ্টি হয়েছিল, ক্ষিতিমোহনের সংগ্রহ ও চর্চার ভিতর দিয়ে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ সে সম্পর্কে আগের তুলনায় বেশি অবহিত ও আগ্রহী হয়ে উঠলেন। 'কবীর' প্রকাশিত হওয়ার আগে থেকেই ক্ষিতিমোহনের বন্ধু ও সহকর্মীরাও কেউ কেউ রীতিমতো কৌতূহলী হয়ে উঠেছিলেন। কবীরচর্চার রস পেয়ে যিনি তাঁর প্রতি অত্যন্ত বেশি আকৃষ্ট হয়েছিলেন, তিনি অজিতকুমার চক্রবর্তী। ১৭ আশ্বিন ১৩১৬ তাবিখে স্ত্রীকে লেখা চিঠিতে ক্ষিতিমোহন তাঁর প্রতি অজিতকুমারের আকর্ষণের একটু উল্লেখ করেছেন :

> অজিত এখন দিবারাত্রি আমাকে গভীব প্রেমে সিক্ত রাখিতেছে। সে বড়ই নম্র মধুব হইয়া গিযাছে—দিবাবাত্রি আমার সঙ্গ চায়, আমি তাহা কি দিব—শুধু আমার নীবব একটি গভীব লোকেব স্পর্শ দ্বাবা তাহাকে সিক্ত করিযা দেই।[১১৬]

আর কিছুদিন পরে যখন পিয়র্সন প্রথমবার শান্তিনিকেতনে আসবেন, তাঁর চিঠিতে খবর পাওয়া যাবে যে বাত্রে তাঁরা কয়েকজনে একসঙ্গে বসে 'ঠাকুরদাদা'-র কাছে কবীরের দোঁহা শুনছেন।[১১৭]

এক সময় এই কবীররসের টানে অজিতকুমার নিজের তাগিদেই এই মহাসাধকের সৃষ্ট দোঁহাগুলির ইংরেজি অনুবাদ করতে আরম্ভ করেন। কিছুকাল পরে রবীন্দ্রনাথ যখন কবীববাণীর ইংবেজি অনুবাদসংকলন প্রকাশের সংকল্প করেন, তখন অজিতকুমারের সেই অনুবাদখসড়াগুলি তাঁর খানিকটা কাজে লেগেছিল।

কবীরদোঁহা সংকলনেব দ্বারা ক্ষিতিমোহন মানুষের কাছে এক রত্নভাণ্ডারের দ্বার যেন খুলে দিলেন। সেই মধ্যযুগ থেকে উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারতে যে এমন ঐতিহ্যবাহী সনাতন ধর্মের পথ থেকে সরে-আসা নিরাকার সাধনার ধারা নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহে বয়ে চলেছে, সে সম্পর্কে বলতে গেলে প্রায় অজ্ঞই ছিল এ দেশের পূর্বাঞ্চলের মানুষ, কবীরের মতো দু-একজন সুপ্রসিদ্ধ সাধকের নামটুকুই হয়তো বা জানা ছিল অনেকের। হিন্দিবলয়েই কি এই লোকধর্ম ও তার সাধকরা কোনো স্বীকৃতি বা কোনো মর্যাদা সেকালে লাভ করেছিলেন?

এইখানে রবীন্দ্রনাথের ক্ষিতিমোহনকে তাঁর 'গীতাঞ্জলি'-পাণ্ডুলিপি উপহার দেওয়ার প্রসঙ্গ একটু বলি। রবীন্দ্রনাথ 'গীতাঞ্জলি'-র ভূমিকা লেখেন ৩১ শ্রাবণ ১৩১৭, সম্ভবত তার কয়েক দিন আগেই তিনি এই গ্রন্থের প্রেসকপি চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে তুলে দেন। এই প্রেসকপি পরে রবীন্দ্রভবনে উপহৃত হয়েছে। আর-একটি গীতাঞ্জলি-পাণ্ডুলিপিও সেখানে এসেছে ক্ষিতিমোহন সেনের সংগ্রহ থেকে। রবীন্দ্রনাথ একটি নতুন

খাতায় ১০ ভাদ্র ১৩১৬ থেকে অল্প কয়েক দিনের মধ্যে অনেকগুলি গান রচনা করেছিলেন। এই নতুন খাতাটি ক্ষিতিমোহনেরই সন্তবাণী-লেখা একটি খাতা বলে ধারণা করেছেন ড. প্রশান্তকুমার পাল। খাতার বাইরের চেহারার বর্ণনা দিয়ে তিনি বলেছেন, প্রথমে এই খাতায় আর কেউ কালি দিয়ে এক পৃষ্ঠা বাদ দিয়ে এক পৃষ্ঠায় একটি করে সবসুদ্ধ আঠারোটি হিন্দি দোঁহা লিখেছিলেন। তাঁর ধারণা রবীন্দ্রনাথ, এর আগে এবং পরে, কয়েকবারই অন্যের খাতা হাতের কাছে পেয়ে তা ব্যবহার করেছেন এবং সম্ভবত এ খাতা ক্ষিতিমোহনের বলেই এই পাণ্ডুলিপি তাঁকেই তিনি দিয়েছিলেন। এই খাতাই 'গীতাঞ্জলি'-র মূল পাণ্ডুলিপি, তবে তার সব রচনা এতে নেই, এই খাতার প্রথম গান 'জানি জানি কোন আদিকাল হতে'।[১১৮]

ইতিমধ্যে দেখা দিয়েছে নতুন বছর, ১৯১১ সাল। এবার ২৫ বৈশাখে রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশ বছরের জন্মদিনের উৎসব পালনে শান্তিনিকেতনের শিক্ষক-কর্মী-ছাত্ররা বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছিলেন। তাই গরমের ছুটি পিছিয়ে গেল। এই উপলক্ষে কবিকে সংবর্ধিত করবার জন্য বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের উদ্যোগের বিরুদ্ধে কলকাতায় একটা প্রবল বিরোধীগোষ্ঠী ক্রমাগত আক্রমণ শানাচ্ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ আগেই যদুনাথ সরকারকে লিখেছিলেন ৭ বৈশাখ ১৩১৮ তারিখে : 'আমার ২৫শে বৈশাখের জন্মোৎসব এখানকার ছেলেরা করিবে। সে সময়ে কলিকাতায় যাইতে পারিব না।' পরে বিরোধীদের বর্বর আক্রমণের অভিঘাতে ক্ষুব্ধ মনে ২১ বৈশাখ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীকে তিনি যে চিঠি লিখলেন তাতে এই কথাটা ছিল : 'এখানে ইঁহারা আমাকে যে মালা দিয়া সাজাইবেন তাহা ফুলের মালা, তাহা বহিতে পারিব।'[১১৯]

রবীন্দ্রনাথের এই পঞ্চাশ বছরের জন্মদিন পালনের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে ক্ষিতিমোহন বলেছেন অর্থবলে যদিও তাঁরা সকলেই দুর্বল ছিলেন, তবুও সমবেত চেষ্টা, প্রবল উৎসাহ, প্রভূত পরিশ্রম এবং প্রাচীন যুগের উপকরণ ও রীতি প্রয়োগে অসাধ্যসাধন করতে পেরেছিলেন। ২৫ বৈশাখ সকালবেলায় আম্রকুঞ্জে উৎসবের আয়োজন। কাশীর ব্যাসবেদির অনুকরণে বেদিনির্মাণ করে আলপনা ধূপ-দীপ-গন্ধপুষ্পে তা সাজানো হয়েছে। সকলে স্নান করে সমবেত হলেন উৎসবক্ষেত্রে। আচার্যের আসনে বসলেন বিধুশেখর ভট্টাচার্য, ক্ষিতিমোহন সেন ও নেপালচন্দ্র রায়। তৈত্তিরীয় আরণ্যক, বাজসনেয়ী সংহিতা, ঋগ্‌বেদ, শতপথ ব্রাহ্মণ ও অথর্ববেদ থেকে সংকলিত মন্ত্রগুলি বাংলা অনুবাদ সহ উচ্চারিত হল। পণ্ডিত বিধুশেখর পাঠ করলেন অভিনন্দনপত্রটি, নেপালচন্দ্র রায় ছাত্রদের উপদেশ দিলেন। দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাদের নিয়ে গান করলেন। কবিকে অসংখ্য ফুলের মালায় ভূষিত করা হয়েছিল। তিনি ধন্যবাদ দিয়ে কিছু বললেন।[১২০]

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত সুকুমার রায় প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ প্রমুখ কয়েকজন তরুণ এই সময় বেশ কয়েকদিন আগে থেকে শান্তিনিকেতনে ছিলেন। তাঁরা শান্তিনিকেতনের উৎসাহী শিক্ষকদের সঙ্গে মিলে রবীন্দ্রনাথকে তাঁর কাব্যগ্রন্থগুলির মর্মকথা ব্যাখ্যা করবার জন্য অনুরোধ করেন। ক্ষিতিমোহনের লেখা থেকে জানা যায়

রবীন্দ্রনাথ যে আপত্তি করেননি তা নয়, কিন্তু সে আপত্তি কেউ মানলেন না। ১২ বৈশাখ সকালবেলা আর্জি জানাবার পরে দুপুরে সদলে তাঁরা শান্তিনিকেতন বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হলেন, কবিকে বাধ্য হয়ে তাঁর কাব্যের আলোচনা আরম্ভ করতে হল। ২১ বৈশাখের মধ্যে প্রতিদিনের আলোচনায় তিনি তাঁর রচনার একটি সাধারণ ভূমিকা করে ধারাবাহিকভাবে বাল্যরচনা থেকে 'মালিনী' পর্যন্ত শেষ করে ' চৈতালি'-তে এসে পৌঁছেছিলেন। সাহিত্য আলোচনার পরে কথাপ্রসঙ্গো শান্তিনিকেতনের আদর্শ ও কাজের ধারা নিয়েও কথা হত। কিন্তু এর পরে শ্রোতারা জন্মোৎসবের কাজ নিয়ে এত ব্যস্ত হয়ে পড়লেন যে আলোচনায় ছেদ পড়ল। পরেও কলকাতা ও শান্তিনিকেতনের এই রবীন্দ্র-সাহিত্যরসিকমণ্ডলী ঠিক এমন করে আর কবিকে ঘিরে একটানা বসতে পারেননি। সুযোগমতো অবশ্য মাঝে মাঝে আলোচনা হয়েছে, তবে সবসময় সকলেই যে যোগ দিতে পেরেছেন তা নয়। ক্ষিতিমোহনও কখনও কখনও অনুপস্থিত থেকেছেন, যদিও তাঁর সদা-উৎসুক-চিত্ত রবীন্দ্রনাথের স্বকণ্ঠে তাঁর নিজের লেখারই হোক বা অন্য কোনো বিষয়েরই হোক আলোচনা শোনবার যথাসাধ্য সুযোগ সর্বদাই করে নিয়েছে, যতদিন সে সুযোগ পাওয়ার পথ খোলা ছিল ততদিনই।[১২১] তাঁর অভ্যাসমতো প্রতিদিন লিখেও রাখতেন সে আলোচনা। পরে রবীন্দ্রনাথ 'বলাকা' কাব্যের যে ধারাবাহিক আলোচনা করেন, তার অনুলেখন অবলম্বনে ক্ষিতিমোহন 'বলাকা কাব্য-পরিক্রমা' রচনা করেন। এইখানে উল্লেখ করি যে এই সময়ে (১৯১১) তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা বৈশাখ সংখ্যা থেকে তাঁর দাদূসাহেবের দোঁহাসংকলন ধারাবাহিকভাবে বাংলা অনুবাদ সহ প্রকাশিত হতে লাগল।[১২২]

পত্রিকা-সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ অনুবাদের বিশিষ্টতা সম্পর্কে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে পাদটীকায় লেখেন : অনুবাদক মহাশয় যথাসাধ্য মূলের অনুগত অনুবাদ করিয়াছেন। এমনকী, কথ্যভাষার প্রণালির অনুসরণ করিয়া গদ্যরীতিকে অনেক স্থলে পরিহার করিয়াছেন। ইহার দ্বারা মূলের রসটুকু অনুবাদে অনেক পরিমাণে রক্ষিত হইয়াছে। মূলে যেখানে ভাবের গভীরতাবশত অর্থের অস্পষ্টতা আছে সেখানে অনুবাদে স্পষ্ট করিবার চেষ্টা না করা উচিত। কারণ কবি কী বলিয়াছেন তাহাই আমরা চাই, অনুবাদক কী বুঝিয়াছেন তাহার গুরুত্ব তত বেশি নহে। কারণ অনুবাদক ভুল বুঝিতেও পারেন। তা ছাড়া গভীর তত্ত্বমূলক কবিতা ভিন্ন পাঠকে ভিন্ন রূপেই বুঝিবেন ইহাই স্বাভাবিক। তাহার পথরোধ করিয়া দেওয়া কর্তব্য নহে। যে যে স্থলে বিশেষভাবে বিশদ করিয়া দেওয়া আবশ্যক, সেখানে অনুবাদক স্বতন্ত্র ব্যাখ্যা যোজনা করিয়া দিয়াছেন।[১২৩]

শিলাইদহ। যখন অন্তর্মুখ

শান্তিনিকেতনে জন্মদিনের উৎসব হয়ে যাওয়ার পর রবীন্দ্রনাথ কলকাতা হয়ে শিলাইদহ যান। সেখানে তখন কাজের প্রয়োজনে রথীন্দ্রনাথ সস্ত্রীক বাস করতে শুরু করেছেন, তাঁর পিতাবই প্রেরণা ও উৎসাহ ছিল তার পিছনে। সপরিবারে সেখানে যাওয়ার জন্য

ক্ষিতিমোহনের আমন্ত্রণ ছিল বলেই হয়তো এই সময়ে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা পর পর দুটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ তাঁর খোঁজ করেছেন। লিখেছেন : 'ক্ষিতিমোহনবাবু সপরিজনে এখানে আসবেন কথা ছিল—কিন্তু এ পর্যন্ত তাঁর কোনো সাড়াশব্দ পাইনি। তুমি তাঁর কোনো সংবাদ রাখ কি?' আবার লিখলেন : 'ক্ষিতিমোহনবাবুর গতিবিধি তুমি কিছু লক্ষ্য করতে পেরেছ? শিলাইদহে আমি আসা অবধি তিনি আমার কক্ষ ছাড়িয়ে গিয়েছেন। কিন্তু তাঁকে আমি হাতছাড়া করতে চাইনে।'[১২৪] ছুটিতে সম্ভবত ক্ষিতিমোহন দেশে গিয়েছিলেন, শিলাইদহেও আসেন কিরণবালা, রেণুকা ও কঙ্করকে নিয়ে। কিরণবালার রচনায় তাঁদের এই শিলাইদহভ্রমণের এক টুকরো ছবি পাই। সেখানে তিনি প্রতিমা দেবীর আন্তরিকতা ও যত্নের কথা বলেছেন আর বলেছেন রবীন্দ্রনাথের সেই সময়ে লেখা 'অচলায়তন' নাটক শোনানো কথা।[১২৫]

এই নাটক শিলাইদহে লেখা হয়, গ্রন্থ উৎসর্গ করেন যদুনাথ সরকারকে, উৎসর্গপত্রে তারিখ আছে ১৫ আষাঢ় ১৩১৮। ১৪ আষাঢ় ১৩১৮ শিলাইদহ থেকে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে রবীন্দ্রনাথ লেখেন শুক্রবার কলকাতায় ফিরবেন এবং তাঁরা চাইলে শনিবার দুপুরে বা বিকেলে নাটকটি সকলকে পড়ে শোনাবেন। রবিবারে তাঁকে বোলপুরে ফিরতেই হবে।[১২৬] রবীন্দ্রজীবনী অনুসারে কলকাতায় এসে তিনি কর্নওয়ালিস স্ট্রিটে প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের বাড়িতে প্রথম পড়ে শুনিয়েছিলেন 'অচলায়তন'। কিন্তু কিরণবালার স্মৃতিকথা বলছে তাঁরা শিলাইদহে থাকতেই নাটক লেখা শেষ হয়েছিল, রবীন্দ্রনাথ কুঠিবাড়ির ছাদের ছোটো ঘরে তাঁদের সকলকে ডেকে সেটি পড়ে শুনিয়েছিলেন। সুতরাং আমাদের মনে হয়েছে এ নাটক তিনি কলকাতায় প্রথমবার পড়ে শোনাননি, শুনিয়েছিলেন শিলাইদহে।[১২৭]

ছুটির পরে শান্তিনিকেতনে ফিরেছেন ক্ষিতিমোহন, ১০ আষাঢ় বিদ্যালয় খুলেছে। ভাদ্র মাসের গোড়ার দিকে কিরণবালাকে লেখা তাঁর একটি চিঠি প্রায় সবটাই এখানে উদ্ধৃত করব, অবশ্য জীর্ণতাবশত চিঠিটার কোথাও কোথাও পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। তখন শান্তিনিকেতনে ঘোর বর্ষা নেমেছে। ক্ষিতিমোহনের প্রকৃতির রূপমুগ্ধ আবেগবিহ্বল মন নিজেকে সম্পূর্ণ মেলে ধরেছে যেন, এখানেও সেই একই রকমের আত্মগত ভাব, যেমন আমরা আগে দেখেছি :

> অসংখ্য সাধাসিধা দিনের পর এক একটা দিন আসে যেটা আমাদের মনের গভীরতম ভাবকে মনের কোন অতল গহ্বর হইতে টানিয়া তোলে। আজ দিনটি সেই ধরনের। কয়দিন হইতে আকাশ ঘোর ঘনঘটা ও ক্রমাগত বৃষ্টি হইতেছে। এই মুক্ত প্রান্তরে নীল মেঘের ঘন জটায় ও নীল বনরাজির উপর স্তূপীকৃত তিমিররাশির ও উদ্দাম পবনস্বননের লীলায় একেবারে যেন প্রাণমন মোহিয়া আছে। কিন্তু কোনওদিনই যেন আজিকার দিনের মত গভীর নহে। আজ কি হইয়াছে—আজ তো লিখিয়া বুঝাইবার মত কোন সম্বাদ আমার ভাষাতে নাই। সমস্ত তালীপুঞ্জের উপরে যে ঘন বর্ষণ ঝর ঝর সুরে কাঁদিতেছে—আমার মনও ঠিক তেমনি একটি নিবিড় বেদনায় ভরিয়া উঠিতেছে—এক এক বার বিদ্যুৎকর্ষণায় মনটা যে তীব্র একটা [...] চাহিতেছে। আজ কি যেন এক রকমের দিন। কি যেন আজ প্রাণ চায়! কিসের এ ব্যাকুলতা?

কোথায় আজ ভূমির শেষ ও আকাশের আবম্ভ কিছুই যায় না দেখা, কি নিবিড়-ঘন কাজল-ঘন-শ্যামল তিথি। কোথায় যে আজ দিনের শেষ ও রাত্রির আরম্ভ কিছুই যায় না বুঝা, কেবল মালতীপুষ্পবিকাশগন্ধে মনে হয় তার এই যে অন্ধকার এ বুঝি রাত্রিরই অন্ধকার। আমাব মনে কোথায় যে আজ ব্যথাব শেষ ও আনন্দেব আবম্ভ তাহা তো আজ যায় না বুঝা। কোথায় যে আজ সীমাব শেষ ও অসীমের আবম্ভ এবং অসীমের শেষ সীমার আরম্ভ তাহা কে আজ কবিবে [ ] কি এক কদম্বপুলকিত কেতকীবাসিত বর্ষণবাদিত নিবিড়তায় সব আরম্ভ ও অবসানই হইয়া গিয়াছে এক। কোন্ সে সুন্দরী তাঁব অলক্তাক্ত চরণের উপর পাণি দুটি [?] বিন্যস্ত করিয়া তাঁর মস্তকটি তদুপরি রাখিয়া সর্ব্বাঙ্গোপরি তাঁর সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদন করা কেশকলাপ দিয়াছেন ছড়াইয়া। কেশান্তরাল হইতে মাঝে মাঝে তার চরণযুগল রক্তিমরাগ বুঝি যায় দেখা। পশ্চিম আকাশের শ্যামঘনঘটার অন্তবালে কি জানি রক্তিম আভা ক্বচিৎ দুই একবাব দেয় উঁকি হৃদয়েব ঘনঘটাব মাঝে মাঝে দুই একটি [...] কি যেন রক্তবাগ ক্বচিৎ ক্বচিৎ দিতেছে দেখা। আব আমাব মন? তার যে কত ঘনঘটাব মাঝে মাঝে কি যে আগুন মাঝে মাঝে ঝলক দিয়া কি তীব্র একটা আভা দিতেছে—তাহা আমিই জানি আর আমার মনই জানে।

শালেব বনেই বা কি ভীষণ মাতামাতি—দূরেব ধানের ক্ষেত্রেব উপব সবুজের [..] বিক্ষুব্ধকাবীবা সমস্ত তালীবনকে মুখরিত কবিয়া সকল বৃক্ষপাদপকে মাতালের মত টলাইয়া আজ শালপাদপগুলিব উপর কি হুড়াহুড়িই চলিয়াছে। সে যে আপন ইচ্ছায় তো কিছু কবে নাই। পবন কি জানি কি ব্যথায় একেবারে হইয়া গিয়াছে ক্ষিপ্ত—সমস্ত প্রান্তব সে আজ হা হা কবিযা ধাবমান—আছড়াইয়া পড়িতেছে সে হতভাগ্য সকল পাদপরাজীর উপব। আমার [.] হৃদয় এই নির্জ্জন সিক্ত পবনধ্বনিত প্রান্তরখানিব উপব কি যে হা হা করিয়া ধাইয়া বেড়াইতেছে তাহা [ ] কবিয়া আজ বলি। পবন বুঝি গো গৃহহীন তাই এমন [...] শ্যামলঘন বর্ষার দিনে সে চারিদিকে খুঁজিতেছে আশ্রয় এবং তা না পাইযা সকল দিকে মরিতেছে হা হা করিয়া। আমাব প্রাণ মন আজ বড়ই আশ্রয়ভিখাবী। বড়ই সে আজ ব্যথিত উদ্‌ভ্রান্ত—বল, কোথায় আজ [ ] স্থিব। কি দিন। আজ আকাশে [...] হৃদয় অন্ধকাব—তেমনি মাঝে মাঝে তীব্র [.] অগ্নিঝলক—তেমনি আমাব মন ঝর্ঝব শব্দে গাহিতে চায় আপন বিষাদ অন্ধ[কারের গান] তেমনি কবে আজ হাহাকাব—তেমনি যে তাহার গৃহহীন নিরাশ্রয় ব্যাকুলতা। কত আব বলিব—জান না কি আমার মন আজ যাইতে চায় কোথায় এবং চায় কাহাকে এবং কিসের এ ব্যাকুলতা।[১২৮]

কাজে ও উৎসবে। 'পেয়েছি ছুটি বিদায় দেহো ভাই'

সাথিহারার এ গোপন ব্যথা প্রতিদিনকার কাজকর্মের ভিতর দিয়েই নিশ্চয় কিছুটা বা ভোলেন। সেখানে এমনও কিছু আছে যা প্রাত্যহিকতাব একঘেয়েমি জমতে দেয় না ভিতরে, প্রাপ্তিরও আশ্বাস বহন কবে আনে। সে বছব পৌষ উৎসবেব সময়ে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে অনুপস্থিত। ৭ পৌষ মন্দিরে উপাসনা করলেন বিধুশেখর শাস্ত্রী ও অজিতকুমার চক্রবর্তী। পরদিন ৮ পৌষ বিদ্যালয়ের বার্ষিক উৎসবে সকালবেলা সপ্তপর্ণী বৃক্ষের তলায় পুরাতন ছাত্র কর্মী অধ্যাপকরা বর্তমান ছাত্র ও আর-সকলের সঙ্গো মিলিত হওয়ার জন্য আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। এইবারই প্রথম ৮ পৌষের দিনটি এইভাবে পালিত হল। অনুষ্ঠানসভায় সমবেত বেদগানের পরে অধ্যাপক ক্ষিতিমোহন

সেনের প্রার্থনা ছিল। এক মাস পরে ৬ মাঘ মহর্ষি-স্মরণদিবসে তিনি মন্দিরে উপাসনা করলেন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় লেখা হয়েছিল তাঁর হৃদয়গ্রাহী সুন্দর উপদেশে পরিতৃপ্ত হয়েছেন সকলে। ভাষণের সারমর্ম প্রকাশিত হল আশ্রমের 'বাগান' পত্রিকার বৈশাখ ১৩১৯ সংখ্যায়।[১২৯]

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে ১৪ মাঘ ১৩১৮ কলকাতায় টাউন হলে রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে তাঁর সংবর্ধনা হল। এই-সব নানা কাজ, সভা, বক্তৃতার দাবিতে তাঁকে কলকাতায় আটকে পড়তে হয়, জমিদারির কাজকর্মের প্রয়োজনে এবং নিজের লেখার তাগিদে কিছুদিন পতিসরেও চলে গিয়েছিলেন। এটা জানা যাচ্ছে যে অন্তত ২৩ মাঘ পর্যন্ত তিনি শান্তিনিকেতনে ফিরতে পারেননি। ক্ষিতিমোহনকে লেখা তাঁর একখানি তারিখহীন চিঠি এই সময়ে কলকাতা থেকে লেখা বলেই মনে হয় এবং এতে ১৩ মাঘ সত্যজ্ঞানবাবু শান্তিনিকেতনে যাবেন এই প্রসঙ্গ আছে, সুতরাং সেই তারিখের দু-এক দিন আগেই সেটা লেখা নিশ্চয়। ড. প্রশান্তকুমার পাল এ চিঠি ১০ মাঘ লেখা বলে অনুমান করেছেন।[১৩০] সত্যজ্ঞানবাবু বিধুশেখর শাস্ত্রীর বিকল্পরূপে আশ্রমবিদ্যালয়ে যোগ দেন। এর আগে ক্ষিতিমোহনকে লেখা বেশ কয়েকটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথকে বিদ্যালয় প্রসঙ্গ আলোচনা করতে দেখেছি, এই চিঠিতেও দুটি প্রসঙ্গ তারই সগোত্রীয়। শিক্ষক-পরিবর্তন এবং আগামী গ্রীষ্মাবকাশ পর্যন্ত অধ্যাপনার দায়িত্ববণ্টন ইত্যাদি বিষয়ে নিজের কয়েকটা ভাবনার কথা এতেও ছিল :

> সত্যজ্ঞানবাবু শাস্ত্রীমহাশয়ের স্থানে সংস্কৃত অধ্যাপনার ভার লইতে প্রস্তুত। তাঁহার কথায়বার্ত্তায় বোধ হইল বালকদিগকে কেমন করিয়া শিক্ষা দিতে হয় সে সম্বন্ধে নিজের প্রতি তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস আছে। সেটা থাকা ভাল। ইঁহার কাছ হইতে কিছু পরিমাণে ইংরেজি আদায় করিতে পারিবেন এবং সন্তোষের প্রাতঃকালের অবসর হইতেও কিছু কাটিয়া লইয়া যদি আগামী গ্রীষ্মাবকাশ পর্য্যন্ত চালাইয়া দিতে পারেন তবে যতীনকে ও জীবনকে পাইলে আপনাদের অন্য শিক্ষকের প্রয়োজন হইবে না এবং আমার বিশ্বাস আগামী ছুটির পরে অথবা তাহার পূর্ব্বেই দিনুকে পুনরায় বিদ্যালয়ে ফিরিতে হইবে। সুতরাং ইতিমধ্যে নূতন লোক রাখিলে তাহাকে লইয়া মুস্কিলে পড়িবেন। তবে যদি বাংলা শিক্ষক ভাল কোথাও পান তবে চেষ্টা দেখিবেন।[১৩১]

এ চিঠির আর-এক প্রসঙ্গ আশ্রমপরিচালনায় ছাত্রদের অংশগ্রহণ সম্ভব করে তুলতে শিক্ষকদের তৎপরতা কামনা। রবীন্দ্রনাথ অজিতকুমার চক্রবর্তীকে লিখেছিলেন : 'ছাত্রদের যথাসাধ্য কর্তৃত্ব দিয়ো — বিদ্যালয়ের সঙ্গে তাদের সমস্ত সম্বন্ধ ভিতরকার সম্বন্ধ যেন হয়ে ওঠে, ...ছাত্রদের কাজেকর্মে শয়নে জাগরণে চালনাটাই যেন বড় হয়ে না ওঠে, সাধনাটাই বড় হয়; হয়ে ওঠবার জন্যেই যেন তাগিদ থাকে, করে তোলবার জন্যে নয়।'[১৩২] তার মাসখানেক আগে ক্ষিতিমোহনকে তিনি এই প্রসঙ্গে লেখেন :

> সেদিন যে প্রস্তাব করিয়া আসিয়াছি আপনারা সেটা ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিবেন। আশ্রমের ভিতরকার সত্যটিকে ছেলেদের মনে স্পষ্টরূপে জাগাইবার জন্য ইতিপূর্ব্বে অল্প স্বল্প যেটুকু

চেষ্টা করা হইয়াছে তাহার উৎসাহ অধিক দিন টেঁকে নাই—কেননা সেটা আমরা বাহির হইতে করিয়াছি এবং আমাদের নিজেদের দিকে আইডিয়া যেমন সুলভ নিষ্ঠা তেমন নহে। এবারে বালকদিগকেই আহ্বান করিয়া দেখুন। তাহারাই তাহাদের ইচ্ছার দ্বারা প্রশ্নের দ্বারা আমাদের চিত্তকে হয়ত সচেতন রাখিতে পারিবে। সমস্ত আশ্রমের একটি প্রাণের কেন্দ্র যদি গড়িয়া উঠে তবে সেইখানে অতি সহজে আশ্রমেব সুধারসটুকু সঞ্চিত হইতে থাকিবে।[১৩৩]

৪ ফাল্গুন রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিদেশযাত্রা উপলক্ষে শান্তিনিকেতন থেকে বিদায় নিয়ে এলেন। আসবার আগে অধ্যাপক-ছাত্র সহযোগবৃদ্ধিকল্পে গড়ে দিয়ে এলেন আশ্রমসম্মিলনী। এই মাসে ভগবান বুদ্ধ ও শ্রীচৈতন্য স্মরণে যে দুটি অনুষ্ঠান হয়, ক্ষিতিমোহন তাতে বুদ্ধদেব সম্পর্কে বলেন। সে ভাষণ 'বুদ্ধদেবের মৃত্যু উপলক্ষে ক্ষিতিমোহনবাবুর ভাষণ' নামে আশ্রমপত্রিকা 'বাগান'-এর বৈশাখ ১৩১৯ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।[১৩৪] তখনও পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের ইংল্যান্ড যাত্রার দিন স্থির ছিল ৬ চৈত্র (১৯ মার্চ ১৯১২)। আসন্ন বিদেশযাত্রার মুখে অনেক কথা ভাবছিলেন, এই সময়ে বিভিন্ন মানুষকে লেখা তাঁর চিঠিগুলি তাঁর সমকালীন মানসিকতার সাক্ষ্য বহন করছে। তবুও ক্ষিতিমোহনকে লেখা তাঁর যে চিঠি থেকে এইমাত্র একাধিক উদ্ধৃতি দিয়েছি, তার এক অংশে যে কথাগুলি লিখেছেন তিনি, তা আমাদের বেশ একটু বিস্মিত করে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :

আমি অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য দূরে যাইতে প্রস্তুত হইতেছি। এই সময়ে আমি আপনাদের সকলেব কাছ হইতে অন্তবের সহিত ক্ষমা প্রার্থনা করিতে ইচ্ছা করি। অনেক সময়ে অবিবেচনা করিয়া আপনাদের কাছে অনেক অপরাধ করিয়াছি; অবিচারে অনেক বেদনার কারণ ঘটাইয়াছি; আপনাদের পরস্পরের মধ্যে যে সকল ঈর্ষাবিদ্বেষের তরঙ্গ মাঝে মাঝে দুর্নিবার হইয়া উঠিয়াছে আমি তাহাকে শান্ত না করিয়া অনেক সময়ে ক্ষোভের উপরে ক্ষোভ বাড়াইযাছি আজ বিদায়গ্রহণের সময় আমার সেই সমস্ত ও অন্যান্য নানা গোচর ও অগোচর পাপ মার্জ্জনা করিবেন। আমি প্রথম হইতেই ইহা নিশ্চয় জানি মানুষকে চালনা করিবার শক্তি আমার নাই; সকলের হৃদযকে সম্মিলিত করিতে আমি পারি নাই, আমার আহ্বানেব মধ্যে সত্যের পূর্ণ তেজ নাই—আমি কবি মাত্র। কবির সমস্ত দুর্ব্বলতা অসম্পূর্ণতা আমার আছে। এবং আপনাবা জানেন কবির দ্বাবা ইতিহাসে কখনো কোনো কাজের মত কাজ সৃষ্টি হয় নাই—বস্তুত বিদ্যালয়েব সৃষ্টিকার্য্যে বিধাতা আমাকে নিতান্তই একটি উপলক্ষ্য করিয়া বসাইয়া রাখিযাছেন—এখানে আপনাদের যাহাব যে শক্তি আছে তাহাই মিলাইয়া তুলিয়া যথার্থভাবে ইহাব সৃষ্টির ভার আপনাবা গ্রহণ করুন—আমার দ্বারা ইহার মধ্যে যাহাতে কোনো বিক্ষেপ উপস্থিত না হয় আমি সেজন্য সতর্ক থাকিব।[১৩৫]

বেশ কিছুদিন থেকে রবীন্দ্রনাথের শরীর রুগ্ণ হয়ে পড়েছিল, এই সময় চিকিৎসার প্রয়োজনেই তাঁর লন্ডনে যাওয়ার কথা হয়। কিন্তু যাওয়ার ঠিক আগে বেশি অসুস্থ হয়ে পড়ে নির্দিষ্ট দিনে তাঁর যাওয়া হল না, বিশ্রামের জন্য তিনি শিলাইদহে চলে গেলেন। স্বভাবতই আশ্রমে তাঁর জন্য উৎকণ্ঠা ছিল। এদিকে বছরটা শেষ হয়ে আসছিল। রবীন্দ্রনাথ নিজেও ভাবছিলেন যে নতুন বছরের আরম্ভে শান্তিনিকেতনে সকলের সঙ্গে তিনি মিলিত হতে পারবেন না, আশ্রমে কাউকে কাউকে সে কথা তিনি চিঠিতে লিখেছিলেনও। তাই হঠাৎ তিনি যখন বর্ষশেষদিনে আশ্রমে ফিরলেন. ট্রেন থেকে নেমে সোজা বোলপুর-

গোয়ালপাড়ার রাস্তা দিয়ে পায়ে হেঁটে একলা এসে পৌঁছলেন, সকলেই খুশি হয়েছিলেন। পরদিন নববর্ষের প্রথম দিনে মন্দিরে উপাসনা করলেন। সেবার ১৩ বৈশাখ গরমের ছুটি পড়বে, তার আগে ১০ বৈশাখ 'রাজা ও রানী' অভিনয় হল। ক্ষিতিমোহনের ছিল দেবদত্তের ভূমিকা। তিনি লিখেছেন : 'রবীন্দ্রনাথ অবতীর্ণ হন নাই বটে, কিন্তু স্টেজের একপ্রান্তে বসিয়া নির্দেশ দিতেছিলেন, তাহা আমি দেখিয়াছি।'[১৩৬] অভিনয়ের পরদিনের একটি ঘটনার স্মৃতি ক্ষিতিমোহন কোনোদিন ভোলেননি।

> সেদিন ছিল বুধবার বিদ্যালয়ের অনধ্যায়। ভোরে আলো-অন্ধকারে গুরুদেবের কণ্ঠধ্বনি ভাসিয়া আসিতেছে। জাগিয়াছি, কিন্তু তখনও শয্যাত্যাগ করি নাই। আমি গৃহাধ্যক্ষ, ছাত্রদিগকে লইয়া থাকি বীথিকায়। তিনি গাহিতে গাহিতে শালতলা দিয়া আমাদেরই ঘরের দিকে আসিতেছেন। শেষে ছাত্রাবাসের একেবারে সম্মুখে। দরজা খোলাই ছিল।

যে গান গাইতে গাইতে রবীন্দ্রনাথ শালবীথি দিয়ে এসে দাঁড়িয়েছিলেন বীথিকা ছাত্রাবাসের খোলা দরজার সামনে, সে গানটা ছিল 'পেয়েছি ছুটি বিদায় দেহো ভাই'। একে তো সে-সময় তিনি ভগ্নস্বাস্থ্য, তার উপরে দূর বিদেশে তিনি চলে যাবেন দীর্ঘদিনের জন্য, সেই আসন্ন বিচ্ছেদের পটভূমিতে এ গানের কথাগুলি যে ভীষণ নাড়া দিয়েছিল ক্ষিতিমোহনকে এটা অনুভব করা কঠিন নয়। তবে তাঁর লেখা থেকে মনে হয় গানটি রবীন্দ্রনাথ বুঝি রচনা করেন ১০ বৈশাখ 'রাজা ও রানী' অভিনয়ের দিনে, পরদিন বুধবারের মন্দির উপাসনায় তিনি সেটা গেয়েছিলেন। আসলে এ গান রচিত হয় আরও একদিন আগে— ৯ বৈশাখ।[১৩৭]

বিদেশ থেকে লেখা কবির চিঠি। ক্ষিতিমোহনের জিজ্ঞাসা

রবীন্দ্রনাথ কলকাতা ছাড়লেন ২৪ মে এবং ২৭ মে ১৯১২ বোম্বাই থেকে ইংল্যান্ডের পথে তাঁদের যাত্রা শুরু হল। আশ্রমে ক্ষিতিমোহনদের মনে যথেষ্ট উদ্‌বেগ ছিল সমুদ্রপথের ধকল গুরুদেবের দুর্বল শরীর সহ্য করতে পারবে কি না। তাই আশ্রম থেকে যখন তিনি বিদায় নিলেন, তাঁরা সকলেই পৌঁছোনো-সংবাদ পাওয়ার জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করেছিলেন। তাঁরা চিন্তিত ছিলেন তাঁর রোগমুক্তির কথা ভেবে এবং এই অনুরোধটার উপরই জোর পড়েছিল যে গুরুদেব যেন তাঁদের চিঠি দিতে না ভোলেন। সে দেশে 'গীতাঞ্জলি'-র ইংরেজি অনুবাদ কেমন সমাদৃত হবে না-হবে তা নিয়ে কোনো ভাবনাই তখন তাঁদের মনে স্থান পায়নি।[১৩৮]

গরমের ছুটির পরে বিদ্যালয়ের কাজ আরম্ভ হয়েছিল, সাধারণত ১ আষাঢ় বিদ্যালয় খুলত। ক্ষিতিমোহনের তারিখহীন একটি ছোটো চিঠি পাচ্ছি, সম্ভবত শ্রাবণ মাসের শেষের দিকে অষ্টমবর্ষীয়া জ্যেষ্ঠা কন্যাকে লেখা। শান্তিনিকেতনের এক টুকরো ছবি আছে সেখানে, আর আছে তাঁর পারিবারিক জীবনেরও একটুখানি স্পর্শ। অল্পদিন আগে ১ শ্রাবণ তাঁর

ছোটো মেয়েটির জন্ম হয়েছিল, চিঠিতে নবজাতা 'খুকী'-র প্রসঙ্গ থেকে এ চিঠি এই সময়ে লেখা বলেই মনে হয়। ক্ষিতিমোহন লিখেছেন :

> রেণু,
> কল্যাণীয়াসু, তোমার পত্র পাইলাম। কঙ্করের পত্রের উত্তর দিয়াছি—পোষ্টকার্ডে। এখন তোমার পত্রের উত্তর দিতেছি। তোমার এখন কঙ্কর ও লাবুর যত্ন করা উচিত। তোমার মার শরীব দুর্ব্বল। লাবু কি খুকীকে হিংসা করে? তুমি যত্ন করিয়া সত্য ও কঙ্করকে পড়াইও। এখানে এখন চমৎকার বর্ষা। সব গাছপালা চমৎকার সতেজ হইয়াছে। জগদানন্দবাবুর বাড়ীর কাছে যে লতার একটি গেট আছে তাহা মালতী ফুলে ভরিয়া গিয়াছে। এখানে একটি নতুন ময়ূব আসিয়াছে। তাহার বাসা ছেলেরা নিজেরা মহাযত্নে তৈয়ার করিতেছে। এখানে বর্ষার সময় খুব দেখিতে সুন্দর। তোমাদের ওখানে বর্ষা কেমন? আমাদের বাগান কেমন হইয়াছে? কুমড়া গাছ বেশ বড় হইয়াছে শুনিয়া খুসি হইলাম। ভালো আছি। তোমাদের কুশল চাই।
>
> ইতি
> তোমার বাবা[১৩৯]

অনেক সময় কিরণবালাকে লেখা ক্ষিতিমোহনের চিঠিতে ছেলেমেয়ে বা বাড়ির অন্য ছোটোদের প্রসঙ্গ দেখতে পাই। কখনও ১১ মাঘের উপাসনায় কিরণবালা রেণুকা ও কঙ্করকে নিয়ে গিয়েছিলেন জেনে খুশি হচ্ছেন, কখনও ভাবছেন নেড়ী অর্থাৎ রেণুকা যদি কলকাতা বা ময়মনসিংহে থেকে পড়াশুনা করে তা হলে ভালো হয়। কিরণবালার ছোটো বোনেরা কেউ অসুস্থ খবর পেয়ে ওষুধ কী খাওয়াতে হবে লেখেন, ভাইয়ের কুশলসংবাদ দেন, আলোচ্য সময়ে কিরণবালার ভাই প্রফুল্লচন্দ্র সেন শান্তিনিকেতনে পড়েন। কয়েক মাস পরে ১৯ অগ্রহায়ণ ১৩১৯ তারিখে লেখা একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথকে নিজের এই দুই শিশুকন্যালাভের ও তাদের মমতা ও অমিতা নামকরণের খবর জানিয়ে আশীর্বাদ প্রার্থনা করলেন, জানালেন সন্তোষচন্দ্র মজুমদারের প্রথম সন্তানলাভের খবরও।[১৪০]

জাহাজ যেদিন পোর্ট সৈয়দে পৌঁছোল সেদিন ২৬ জ্যেষ্ঠ, জুন মাসের ৯ তারিখ। সেইদিনই প্রথম চিঠিপত্র ডাকে দেওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। অজিতকুমার চক্রবর্তীকে লেখা তাঁর একটি চিঠি থেকে জানা যাচ্ছে এই দিন তিনি তাঁদের ছ-জনকে চিঠি পাঠিয়েছিলেন—নেপালবাবু, জগদানন্দ, বৌমা, সন্তোষ, ক্ষিতিমোহনবাবু এবং তুমি'। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন : তোমাদের যাঁদের যাঁদের চিঠি লিখলুম তাঁরা যদি কেউ অনুপস্থিত থাকেন তোমরা সে চিঠি খুলো। কারণ তোমাদের সব চিঠিগুলিই সকলের।'[১৪১] ক্ষিতিমোহনকে লেখা তাঁর এই চিঠির সন্ধান নেই, তাঁকে লেখা তাঁর যে কযটি চিঠি পাচ্ছি, তার প্রথম দুটি বিদেশবাসের একেবারে গোড়ার দিককার। রবীন্দ্রনাথ লন্ডনে পৌঁছলেন ১৬ জুন, আর তাঁর ক্ষিতিমোহনকে লেখা প্রথম চিঠির তারিখ ২০ জুন, দ্বিতীয় চিঠির ২৮ জুন (১৪ আষাঢ় ১৩১৯)। প্রথম চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন :

> সবিনয় নমস্কারপূর্ব্বক নিবেদন
> ক্ষিতিমোহনবাবু, এতদিন লন্ডনের হোটেলে ছিলুম এখন মানুষের মাঝখানে এসে পড়েছি। সকলের চেয়ে আমার এইটে আশ্চর্য্য বোধ হচ্ছে আমি এদের থেকে দূরে না—এবং

আমার জীবন এদের পক্ষেও অনাবশ্যক নয়। মিসরে নীল নদীর উপরকার আকাশে ধীরে ধীরে যে মেঘ জমছিল সেই মেঘ সুদূর বাংলাদেশের ধানের ক্ষেতেও গিয়ে বৃষ্টি দিয়ে আসে আমাদের মনের আকাশেও বর্ষণের লীলা সেই রকম। কোন্ পদ্মার ধারে জনশূন্য বালুচরের আলোকে ও অন্ধকারে কত কর্ম্মহীন দিনে ও রাত্রে বাঙালী যুবকের মনে যে আনন্দসঞ্চয় ঘনীভূত হয়ে উঠেছিলো এখানকার সমুদ্রপারেও তার কোনো প্রয়োজন আছে এ কথা আমি এমন স্পষ্ট করে মনে করতে পারতুম না। মানুষ বাইরের দিকে এতই দূরে ছড়িয়ে আছে অথচ ভিতরের দিকে এতই নিবিড়ভাবে পরস্পর নিকটে আকৃষ্ট — সেখানে সেই সনাতন মনুষ্যত্বের ক্ষেত্রে জাতি বর্ণ ভাষার ব্যবধান এমনি তুচ্ছ হয়ে যায় যে কেবল সেই অনুভূতিটি লাভ করবার জন্যে বহু কষ্টে বহু দূরে আসাও সার্থক। মানুষের আনন্দযজ্ঞে বিচ্ছেদের পাত্রেই মিলনসুধা পান করবার ব্যবস্থা ভগবান করে দিয়েছেন। তিনি নিকট থেকে দূরে নিয়ে গিয়ে আমাদের দর্শন দেন আবার দূর থেকে নিকটে ফিরিয়ে এনে আমাদের ধরা দেন এমনি করে বিচ্ছেদ মিলনের তালে তালে সমে ও ফাঁকে তাঁর আনন্দসঙ্গীত চলচে। পরিচিত অবস্থার মধ্যে গভীরভাবে এবং অপরিচিত অবস্থার মধ্যে প্রবলভাবে যেন সেই আনন্দের বিচিত্রতা গ্রহণ করতে পারি আমি তাঁর কাছে এই প্রার্থনা করে বেরিয়েছি। বোলপুরের প্রান্তর এবং এই লণ্ডনের জনতাকে তিনি আমার চিত্তের মধ্যে অবিচ্ছিন্ন করে মিলিয়ে দিন এই আমার কামনা। ইতি ২০ জুন ১৯১২

আপনাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর[১৪২]

পরের চিঠিতে আরও স্পষ্ট করে লন্ডনে রবীন্দ্রনাথের কবিতার অভাবিত স্বীকৃতি ও সমাদরের প্রসঙ্গ আছে, আছে কবির নিজের প্রতিক্রিয়া ও ভাবনার কথা।

ওঁ

প্রীতিনমস্কার নিবেদন

ক্ষিতিমোহনবাবু, কাল রাত্রে এখানকাব কবি Yeats-এর সঙ্গে একত্রে আহার করেছি। তিনি আমার কবিতার কতকগুলি গদ্য তর্জ্জমা কাল পড়লেন। খুব সুন্দব করে সুর করে তিনি পড়লেন। আমার নিজের ইংরেজির উপর আমার কিছুমাত্র ভরসা ছিল না—তিনি বল্লেন, যদি কেউ বলে এ লেখাকে কেউ আরো improve করতে পারে তাহলে সে সাহিত্যের কিছুই জানে না। এঁদের এগুলো এত অতিশয় মাত্রায় ভালো লেগেছে যে, আমি সেটাকে ঠিকমত গ্রহণ করতে পারচিনে। আমার মনে হচ্চে যেখান থেকে কিছু প্রত্যাশা করা যায় না সেখান থেকে সামান্য কিছু পেলেই সেটাকে অত্যন্ত আশ্চর্য্য বলে বোধ হয় এঁদের সেই দশা হয়েছে। যাইহোক আমার এই গদ্য তর্জ্জমাগুলো Yeats নিজে edit করে একটা introduction লিখে ছাপাবার ব্যবস্থা করবেন। আমার চিরকেলে স্বভাব অনুসারে এতে আমি খুসিও হচ্চি আবার অবসাদও অনুভব করচি। এখানে এসে আমার আবার এই নিজের দিকে তাকানো, নিজের জিনিষ নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করা আমার এক একসময় এত অরুচিকর ঠেকচে যে আমার জর্ম্মনিতে পালাতে ইচ্ছা করচে। আবার এক একবার ভাবচি আমার অন্তর্যামী হয়ত এই জন্যেই এই বয়সে আমাকে এই দেশে টেনে এনেছেন — এই সমস্ত সাহিত্য এবং শিল্পই এক দেশের সঙ্গে অন্য দেশের মিলনের যথার্থ সেতু — এর মধ্যে থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে আমার রচনার মধ্যে যেটা যথার্থ ভাল সেটাকে অসঙ্কোচে স্বীকার করাই যথার্থ নম্রতা— যা তাঁর ভাল লেগেছে তা তিনি সকলকে ভাল লাগাবেন—এই জন্যই তিনি তাঁর পূজার পদ্মের দ্বারা সকল মানুষের মন হরণ করেন। আমার মনে হচ্চে এরা যে আমাকে প্রশংসা করচে এতে

তিনিই আপনার খুসি প্রকাশ করচেন—তিনি যে কিভাবে খুসি হয়েছেন সেই কথাটিই আমাকে জানাবার জন্যে তিনি পূর্ব্ব দেশ থেকে আমাকে পশ্চিমে এনে ফেলেচেন। তাঁর প্রসাদকে ত প্রমত্ত হয়ে গ্রহণ করা চলে না, সেইজন্যে মাথা ধূলায় নত করে পুরস্কার শিরোধার্য্য করবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত আছি। ইতি ১৪ই আষাঢ় ১৩১৯

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর[১৪৩]

এ চিঠিটা রবীন্দ্রজীবনের ইতিহাসগত তথ্যের দিক থেকেও খুব মূল্যবান। তবে এ চিঠিগুলিতে রবীন্দ্রনাথ নিজের স্বাস্থ্যের খবর কিছুই দেননি ক্ষিতিমোহনদের উদ্‌বেগ দূর করতে। হয়তো আগে একটু লিখেছিলেন, সে-সব চিঠি হারিয়ে গেছে। অবশ্য অস্ত্রোপচার না-হওয়া পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের অসুস্থতা তাঁর সঙ্গ ছাড়েনি।

'গীতাঞ্জলি'-র ইংরেজি অনুবাদসংকলনের ইন্ডিয়া সোসাইটি সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১ নভেম্বর ১৯১২ (১৬ কার্তিক ১৩১৯)। বইটির প্রাপ্তিস্বীকার করে ক্ষিতিমোহন তাঁকে লিখেছেন :

আপনার প্রেরিত ইংরাজীতে অনুবাদিত গ্রন্থখানি পাইয়া পরম আনন্দ লাভ করিলাম। বহুদিন যাবৎ ইচ্ছা হইতেছিল আপনাকে পত্র লিখি। যদিচ সর্ব্বদা যে কিছু লেখে না হঠাৎ সে পত্র লেখার একটা সঙ্কোচ বোধ করে। আপনার পুস্তকখানি এইরূপ সময়ে আসিয়া বড় উপকার করিয়াছে।

সমস্ত প্রতীচ্য সমাজ আপনার প্রতি যে গভীর শ্রদ্ধা জানাইতেছে তাহা সর্ব্বদাই নানা সম্বাদপত্রযোগে পাইতেছি। এই গ্রন্থখানিতে Yeats লিখিত ভূমিকাতে খুব চুলচেরা সমালোচনা না থাকিলেও কি চমৎকার একটি শ্রদ্ধা ফুটিয়া উঠিয়াছে। আর ইংরাজী ভাষাতে অনুবাদ হওয়াতে কত কবিতার আর একটি বিশেষ সুষমা ফুটিয়া উঠিয়াছে। পুত্র যেদিন বিবাহবেশে বাহির হয় মা যেমন সেই নূতন সজ্জায় ঠিক পুত্রকে দেখিয়া এক অতি অপূর্ব্ব অপরিচিত মাধুর্য্যের আস্বাদ পান আমরাও তেমনি এই নববেশে সজ্জিত গীতাবলীর মধ্যে মাঝে মাঝে বেশ এমন একটু মাধুর্য্য মাঝে অনুভব করিয়াছি যাহা পূর্ব্বে পরিচিত বেশে চোখে পড়ে নাই।

ভারতবর্ষের বিশেষ সৌন্দর্য্যে যে ভারতের ব্রহ্মাকে আপনি চমৎকার অঞ্জলি দিতে পারিয়াছেন তাহাতেই সমস্ত প্রতীচ্য আপনাকে প্রতিদিন অঞ্জলি দিতেছে। বিশ্বজনীন শ্রদ্ধা ভারতের প্রণামে বিশেষ একটি রূপ পাইয়াছে বলিয়াই সকল ভক্তজনসভাতে তাহা দুর্লভ প্রসাদরূপে গৃহীত হইতেছে। আপনার এই প্রণামটিকে সকলে এইভাবে গ্রহণ না করিলেও আপনার সাধনা চরিতার্থ হইত কিন্তু গৃহীত হইয়াছে [,] আমাদের দেশের কলা (?) ও আমাদের গুণিজনসমাজ কৃতার্থ হইয়াছে। এই সম্মানে প্রতিদিন আমরা নিজেকে ও দেশকে কৃতার্থ বোধ করিতেছি।[১৪৪]

সুপরিচিত 'গীতাঞ্জলি'-কে ইংরেজি ভাষার নববেশে দেখার সবিস্ময় আনন্দ বোঝাতে মায়ের চোখে বরবেশী পুত্রের উপমা যে এল, এ উপমা ক্ষিতিমোহনের বিশেষ প্রিয়। 'বলাকা কাব্য পরিক্রমা'-র ভূমিকাতে তিনি বলেছেন কবি তাঁর নিজের সৃষ্টিতে নিজেই বিস্মিত হন—স্ব-সৃষ্টৌ অপি বিস্মিতঃ। প্রসঙ্গত এই উপমাটারই পুনঃপ্রয়োগ ঘটল সেখানে :

কাব্যসাহিত্যরহস্যের এই কথা বুঝাইতে গিয়া প্রাচীন গুরুবা একটি চমৎকার উপমা দিয়াছেন—অনেক সময় পিতামাতা নিজেরাও আপন সন্তানেরই পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিতে পারেন

> না। বিবাহ বা তেমন কোনো উৎসব দিনে অন্যেরা তাঁহাদেরই পুত্রকন্যাকে যথোপযুক্তরূপে সাজাইয়া দিলে, তাহার পরে তাহাদের প্রাত্যহিকতার তুচ্ছতায় চাপা দেওয়া আচ্ছাদিত রূপটি যখন ফুটিয়া ওঠে তখন তাঁহারা নিজেরাই আপন সন্তানের মহনীয় রূপটি দেখিয়া বিস্মিত হন।[১৪৫]

যে প্রসঙ্গ হচ্ছিল, সেখানে ফিরি। রবীন্দ্রনাথ ক্ষিতিমোহনের চিঠি যখন পেলেন তখন তিনি আমেরিকায়। এক মাস পরে আর্বানা থেকে তিনি উত্তরে লিখেছিলেন :

> আপনাদেব চিঠি আমি প্রত্যেকবারেই পাই বলে মনে করি অতএব চিঠি লিখতে পারেন নি বলে কিছুমাত্র সঙ্কোচ করবেন না। কিছুদিন থেকে আমিই কেবল এই দুঃখ পাচ্চি যে আপনাদের প্রতি আমার যা দেয় তা পূর্ণ পরিমাণে জুগিয়ে উঠতে পারচিনে। সমুদ্রের দুই তীবেব দাবী সমান রক্ষা করতে পারি এমন সব্যসাচী আমি নই। তা ছাড়া এক একসময় মনের ভিতরটাতে ক্লান্তি আসে— মনকে তখন বুঝিয়ে ওঠা দায় হয়— খ্যাতি প্রতিপত্তি দেশহিত লোকহিত যা কিছু তার কাছে ধরি না কেন সমস্তই সে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিতে চায়। Times-এর সমালোচনা, Yeats-এর ভূমিকা, সভা-সমিতিতে সংবর্দ্ধনা যে আমার ভাল লাগে নি এ কথা বলা মিথ্যা— অথচ তারই ভিতরের থেকে বিষম একটা বেদনা হৃৎপিণ্ডটাকে চেপে চেপে ধরে— তাকে আজ পর্য্যন্ত তাড়াতে পারচি নে। সে একটা রিক্ততার প্রার্থনা— একেবারে ফাঁকা, একেবারে অকিঞ্চনতা, একেবারে সমস্ত তুড়ি মেরে বেরিয়ে চলে আসা, একেবারে শেষ তলায় গিয়ে তলিয়ে যাওয়া—এ না হলে যেন আমার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবে এমনি আমার মনে হয়।[১৪৬]

অন্য প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে একটি চিঠির সময়কাল নিয়ে একটু আলোচনা করে নিতে চাই। দেশ পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ-ক্ষিতিমোহন পত্রাবলীতে চিঠিটি ১৯২১ সালে লেখা বলে অনুমান করা হয়েছে, সেটা স্পষ্টতই ভুল। এ চিঠি রবীন্দ্রনাথ ১৯১৩ সালে Felton Hall* Cambridge mass. Boston থেকে লিখেছিলেন। ১৩ ফেব্রুয়ারি থেকে ২১ ফেব্রুয়ারি শিকাগো ফিরে যাওয়া পর্যন্ত এটাই তাঁর বস্টনের ঠিকানা ছিল। এখান থেকে তিনি নিকটবর্তী কেমব্রিজ শহরের হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগে বক্তৃতা করতে যান। তা ছাড়াও Philosophical Club ও Andover Divinity Club-এ তাঁর বক্তৃতা ছিল। ক্ষিতিমোহনকে যখন এ চিঠি তিনি লিখেছেন তখন হার্ভার্ডে তাঁর চারটি বক্তৃতা পাঠ করা হয়ে গেছে এবং সেখানে এ খবরটাও পাওয়া যাচ্ছে যে পরের দিন সকালে তাঁরা শিকাগো ফিরে যাবেন। সেজন্য অনুমান হয় চিঠিটা ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯১৩ সালে লেখা। তিনি জানিয়েছেন যে তিনি উপনিষদ অবলম্বনে এই বক্তৃতাগুলিতে তাঁর মনের কথা বলেছেন, সেই যুক্তিতেও এই বক্তৃতাগুলি Sadhana-র, ১৯২১ সালে দেওয়া Creative Unity-র বক্তৃতা নয়। আর-এক অতি সহজবোধ্য কারণে এ চিঠি ১৯২১ সালে লেখা হতে পারে না। আমেরিকায় গিয়ে ক্ষিতিমোহনের সেখানে কাজ করবার এক বৃহৎ সম্ভাবনা আছে এ-কথা জানানোর সঙ্গেই রবীন্দ্রনাথ এ কথাও লিখেছিলেন : 'আমার খুব ইচ্ছা ছিল এই সঙ্গে অজিতকেও এখানে টেনে নিই— তাহলে আপনারা দুজনে মিলে এখানে অনেক

* দেশ পত্রিকায় ভুল করে ছাপা হয়েছে Telton Hall। দেশ, ২৭ ডিসেম্বর ১৯৮৬, পত্র সংখ্যা ৫০।

কাজ করতে পারতেন — কাজ করবার দরকার আছে এবং ক্ষেত্রও আছে। ... কিন্তু অজিতের জন্য এখনো সুযোগ ঘটাতে পারিনি—চেষ্টা করব। যদি আপাতত নাও পারি ভবিষ্যতের আশা রইল।'

অজিতকুমার চক্রবর্তীর অকালমৃত্যু ১৯১৮ সালের ডিসেম্বরে, সুতরাং ১৯২১ সালে লেখা চিঠিতে তাঁর প্রসঙ্গ তো আসতেই পারে না।

Dr. Woods-এর প্রসঙ্গও এ চিঠি ১৯২১ সালে লিখিত হওয়ার যুক্তি বাতিল করে। হার্ভার্ডের বিশ্ববিদ্যালয়ে সেখানকার ভারতীয় দর্শনের অধ্যাপক James Houghton Woods-এর আগ্রহে ১৯১৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতাগুলির আয়োজন হয়েছিল। সে সময় এই অধ্যাপকের সঙ্গে ভারতীয় দর্শন-বিষয়ে নিশ্চয় তাঁর অনেক আলোচনা হয়েছিল। যে চিঠির তারিখ নির্ণয় প্রসঙ্গে এত কথা বললাম, যে চিঠি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতাগুলি দেওয়ার পরেই ক্ষিতিমোহনকে লেখা হয়েছিল, সে চিঠিতে সেই আলোচনার কিছু প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত হয়েছে যা ক্ষিতিমোহনকে রবীন্দ্রনাথের আমেরিকায় নিয়ে যেতে চাওয়ার পরিকল্পনার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী যুক্ত। সে প্রসঙ্গে পরে আসব। তার আগে বলি রবীন্দ্রনাথের এই সময়কার ইংরেজি বক্তৃতাগুলির সংকলন Sadhana লন্ডন থেকে ম্যাক্‌মিলান কোম্পানি প্রকাশ করেন অক্টোবর ১৯১৩ সালে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে ক্ষিতিমোহনকে লেখা এই চিঠিতে তিনি জানিয়েছিলেন যে অধ্যাপক উডস এই প্রবন্ধগুলির সংকলন প্রকাশ করতে খুব আগ্রহী এবং তিনি এই বইয়ের ভূমিকা লিখতে চান। তার জন্য উডসকে ভারতীয় দর্শনের প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে দিতে হবে। তাই রবীন্দ্রনাথ ক্ষিতিমোহনকে লিখলেন :

> আমার বক্তৃতাগুলি অধ্যাপক Woods গ্রন্থাকারে ছাপবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহ করচেন। তাঁর ইচ্ছা তিনিই এর একটা ভূমিকা লেখেন। তিনি রামানুজের প্রভাব অর্থাৎ বেদান্তের ভক্তিবাদের ধারা ভারতবর্ষে কোন সময় কি রকম ব্যাপ্ত হয়েছিল তার একটু সংক্ষিপ্ত notes চান— আপনি যদি গোটাকতক মোটা কথা লিখে পাঠাতে পারেন তাহলে তিনি খুব খুশি হবেন। অর্থাৎ মধ্যযুগে শঙ্করাচার্যের বিরুদ্ধে যে একটা ধর্মতত্ত্বের অভ্যুদয় হয়েছিল, যেটা আজও ভারতবর্ষের ধর্মজীবনকে অধিকার করে রয়েছে সেইটের বিষয়ে কিছু লিখে পাঠাবেন— কবির দাদু রুইদাস প্রভৃতির ভিতর দিয়ে তার যে বিকাশ ভারতবর্ষে ছড়িয়েছে তার একটু বিবরণ চাই।[১৪৭]

বলা বাহুল্য ড. উডসের রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি প্রবন্ধসংকলনের প্রস্তাবিত ভূমিকা লেখা হয়নি, আমেরিকা থেকে সে বই প্রকাশিতও হয়নি। সুতরাং এ প্রসঙ্গ এইখানেই থেমে গিয়েছিল মনে হয়।

আশ্রমে বসে ক্ষিতিমোহনরা খবর পাচ্ছিলেন যে আমেরিকায় রবীন্দ্রনাথ এক বছর থাকবেন। খবরটার সত্যতা যাচাই করতে এর আগেই তিনি রবীন্দ্রনাথকে লেখা চিঠিতে প্রশ্ন করেছিলেন এবং সেইসঙ্গে লিখেছিলেন :

> সেখানে [আমেরিকায়] হোমিওপ্যাথী ভালরূপে অথচ সুলভে কোথায় পড়া যায়? কতদিন লাগে? ভারতের আয়ুর্বেদীয় ঔষধগুলি—ভেষজ আমার হোমিওপ্যাথীভাবে proving করার ইচ্ছা আছে। ইহাতে খুব একটা ভেষজের প্রসার হইবে। ভাল Pharmacy শিক্ষা করা দরকার।

> হোমিওপ্যাথী পড়িতে পূর্ণ course কতদিন সময় লাগিবে? কোথায় কি প্রকার সময় লাগে? কোথায় কোথায় সুবিধা আছে? সেখানে কোনো আত্মচেষ্টামধ্যে সংস্থা[ন] হইতে পারে কি? সংস্কৃত পড়ানো আমার সহজ পন্থা তার কি কোনো ক্ষেত্র আছে? এই সব খবর কি আমাকে বিশদভাবে জানাইতে পারেন, স্বতন্ত্রভাবে লিখিবেন।[১৪৮]

ক্ষিতিমোহন আয়ুর্বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন, সুযোগমতো তার চর্চা করতেন, চর্চা করতেন হোমিয়োপ্যাথিরও। দেখছি, এই সময়ে তিনি আমেরিকায় গিয়ে হোমিয়োপ্যাথি চিকিৎসাশাস্ত্র পড়তে চাইছেন, আবার সেইসঙ্গে হোমিয়োপ্যাথি চিকিৎসায় আয়ুর্বেদিক ওষুধ প্রয়োগের পথ খুঁজতে ওষুধ তৈরির প্রণালি শিখতেও তাঁর ইচ্ছা। সে কথা জেনে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে আমেরিকায় হোমিয়োপ্যাথি পড়ার ব্যাপারে খবরাখবর কিছু দিলেন। আমরা দেখব ক্ষিতিমোহনের বিদেশ যাওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে বেশ কয়েকটি চিঠিতে তিনি কথা বলবেন। প্রথমে ক্ষিতিমোহনের জিজ্ঞাসার উত্তর দিলেন :

> এখানে হোমিওপ্যাথি শিক্ষা সম্বন্ধে আপনি যা কিছু জানতে চেয়েছেন তা আমি শিকাগোতে গিয়ে খবর নিয়ে আপনাকে জানাব। আমার বিশ্বাস এখানে জীবিকাব সংস্থান করে অধ্যয়ন করা আপনার পক্ষে কঠিন হবে না। শিকাগোর হোমিওপ্যাথি বিদ্যালয়ই বোধ হয় এখানকার মধ্যে শ্রেষ্ঠ। শিকাগোতে আমার নিমন্ত্রণ আছে। সেখানকার অনেক কৃতী ও যশস্বী লোকের সঙ্গে আমার পরিচয়ের সম্ভাবনা আছে হয়ত আপনার পথ কতকটা সহজ করে দিতে পারি এ সম্বন্ধে যথাসময়ে আপনাকে লিখব।[১৪৯]

যথাসময় আবার লিখলেন রবীন্দ্রনাথ। ক্ষিতিমোহন জানতে চেয়েছিলেন তাঁর পক্ষে আমেরিকায় সংস্কৃত পড়িয়ে নিজের খরচ চালানোর জন্য উপার্জন করা সম্ভব হবে কি না। এর উত্তরে রবীন্দ্রনাথ আগেই লিখেছিলেন জীবিকাসংস্থান করে অধ্যয়ন করতে ক্ষিতিমোহন পারবেন সে দেশে এবং এবার যখন তিনি এ ব্যাপারে আবার লিখলেন, দেখা গেল তাঁর চিন্তা এবং পরিকল্পনা আরও বহুদূর এগিয়ে গেছে। অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার অনুকূল পরিবেশ পেতে ক্ষিতিমোহনের কোনো অসুবিধা হবে না এ কথা যেমন তিনি লিখলেন, তেমনই এ কথাটাও জানালেন যে তাঁকে ভারতের চিত্তদূতরূপে আমেরিকায় নিয়ে যেতে উৎসুক তিনি। এ দেশের ধর্ম দর্শন ও সংস্কৃতি বিষয়ে পশ্চিমের মানুষকে অনেক কথা বলবার আছে।

কবির আহ্বান

আমেরিকায় গিয়ে রবীন্দ্রনাথ একটা কথা জেনে বিচলিত হয়েছিলেন। অনেকদিন আগেই স্বামী বিবেকানন্দ এসে এ দেশের হৃদয়হরণ করেছিলেন। পরেও কয়েকজন ভারতীয় পণ্ডিত ও বোদ্ধা ব্যক্তি এ দেশে এসেছেন। স্বামীজির মতো বিশিষ্ট মানুষরা ভারতবর্ষের প্রকৃত পরিচয় তুলে ধরতে পেরেছিলেন। কিন্তু তাঁদের সাফল্যে লুব্ধ হয়ে পরবর্তীকালে অনেক নিম্নাধিকারী মানুষ এসে ধর্মব্যবসায় ফেঁদে বসে দেশকে হেয় করছেন। এমনকী শিক্ষিতরাও এই সস্তায় খ্যাতি ও

ধনাগমের খোঁজে বেরিয়ে দেশের সর্বনাশ ঘটাচ্ছেন। এই সময়ে অজিতকুমার চক্রবর্তীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের একাধিক চিঠিতে এ প্রসঙ্গ আছে। ক্ষিতিমোহনকে লেখা চিঠি উদ্ধৃত করলে বোঝা যাবে কেন তাঁকে ডাক পাঠালেন রবীন্দ্রনাথ। এতে স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে যে মন্তব্য আছে তারও পটভূমি এটাই। রবীন্দ্রনাথ লিখলেন :

> প্রীতিনমস্কার নিবেদন
>
> ক্ষিতিবাবু, আপনি এখানে কোনো একটা জীবিকার উপায় করে ভেষজশাস্ত্র অধ্যয়ন করতে ইচ্ছা করেছিলেন। আমাদের বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কোনো উপলক্ষ্যে একবার পশ্চিমসাগরকূল ঘুরিয়ে নিয়ে যাবার ইচ্ছা আমার মনে জাগ্রত আছে। সেইজন্যে আর্বানা থেকে বেরিয়ে অবধি এই চেষ্টা করচি কিন্তু এ পর্য্যন্ত যাঁকেই বলেছি কেউ কর্ণপাত করেন নি। তার প্রধান কারণ এই বুঝেচি যে বিবেকানন্দের চেলারা এ দেশে বেদান্ত প্রভৃতি সম্বন্ধে বক্তৃতা করে বেদান্ত এবং ভারতবর্ষের বিদ্যাবুদ্ধির উপর এদের শ্রদ্ধা একেবারে ঘুচিয়ে দিয়েছে।[১৫০] অবশেষে আমি আশা ছেড়ে দিয়েছিলুম। তারপরে আমি হার্ভার্ডে চারটে বক্তৃতা করবার সুযোগ পেয়েছিলুম। তাতে উপনিষৎ অবলম্বন করে আমার মনের কথা কিছু কিছু ব্যক্ত করেছি। আমার বক্তৃতা নিষ্ফল হয় নি। এখানকার অনেকেই এখন বলছেন আমরা কি করলে উপনিষদের তাৎপর্য গ্রহণ করতে পারবো। আমি তাঁদের বলেছি তোমাদের যাঁরা উপনিষৎ অনুবাদ করেছেন তাঁরা পণ্ডিতমাত্র, তাঁরা কথার মানে দিতে পারেন— কিন্তু উপনিষৎ ভারতবর্ষীয়ের জীবনের মধ্যে থেকে আপনার যে সত্যরূপ প্রতিফলিত করচে সেটা না জানলে কিছুই জানা হয় না। অতএব তোমাদের উচিত কোনো একজন ভারতবর্ষীয়কে অবলম্বন করে তাঁর মুখ থেকে ভারতবর্ষের বাণীকে গ্রহণ করা। শুনে এঁরা এখন খুব উৎসাহিত হয়ে উঠেছেন। এখানকার ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক Dr. Woods প্রথমে এ প্রস্তাব উড়িয়ে দিয়েছিলেন এখন তিনি আমাকে ধরে পড়েছেন এমন একজন অধ্যাপক আনিয়ে দিতে যাঁর কাছ থেকে তিনি সংস্কৃত ও হিন্দি শিখতে পারেন এবং যাঁকে সঙ্গে নিয়ে তিনি সংস্কৃত শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করতে পারেন। আমি আপনার নাম করেছি। তিনি খুব রাজি। আপনার পথখরচা ত দেবেনই তা ছাড়া তিনি বল্লেন আমি বছরে ৫০০ ডলার দেব। অবশ্য ৫০০ ডলার অর্থাৎ ১৫০০ টাকায় আপনার সব খরচ চলবে না। কিন্তু এখানে আরো কেউ কেউ যোগ দেবেন। অতএব যাতে আপনি মাসে অন্তত ৭০ ডলার পেতে পারেন সে রকম বন্দোবস্ত হতে পারবে। তাহলে আপনার সমস্ত খরচ-খরচা বাদেও হাতে গোটা ৫০ টাকা বাঁচবে। ..আমরা ভারতবর্ষের বাইরে থেকেই ভারতবর্ষের যথার্থ উপকার করতে পারি। আমি এই মাসখানেক মাত্র আমার কোণ থেকে বেরিয়ে এসে ভারতবর্ষের প্রতি এঁদের চিত্তকে আকর্ষণ করতে পেরেছি। এদের চিত্তকে পেলেই এদের সমস্তকে পাওয়া হয়। আপনারা যদি কিছুকাল স্থির হয়ে-বসে এখানে একটা সত্যকার ভারতবর্ষের হাওয়া বইয়ে দিতে পারেন তাহলে বিস্তর উপকার হবে। এরা একেবারেই আমাদের কিছুই জানে না। যারা সংস্কৃত শাস্ত্রের অধ্যাপক তাদের বিদ্যা যে কতই অগভীর তা দেখলে আশ্চর্য্য হতে হয়। ভেবে দেখুন না আমার মত লোকও এখানে কৃষ্ণ বিষ্ণুর পদ পেতে পেরেছি। সংস্কৃত ভাষাতেও যে এদের বিশেষ দখল আছে তা নয়। ইতিমধ্যে আপনাকে একটা কাজ করতে হবে— Deussen প্রভৃতির ইংরেজী বইগুলো পড়ে রাখবেন— প্রথমত তাতে ইংরেজী পরিভাষা সম্বন্ধে সাহায্য পাবেন তা ছাড়া ঐ বইগুলো পড়েই এঁদের বিদ্যা সুতরাং এঁদের সঙ্গে ব্যবহার করতে হলে এগুলো একবার দেখে রাখা ভাল। বেদান্তের দ্বৈতমতের ভাষ্য প্রভৃতি সম্বন্ধে এঁদের কৌতূহল জাগ্রত হয়েছে অতএব এইসকল গ্রন্থ সংগ্রহ করে আনবেন এবং হিন্দি ভাষা শিক্ষা দেবার উপযুক্ত ব্যাকরণ ও Reader কিছু আনতে ভুলবেন না।[১৫১]

ব্যাপারটা যেরকম দাঁড়াল তাতে আর মাত্র কয়েক মাস পরেই ক্ষিতিমোহনকে আমেরিকা যেতে হবে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন :

> অধ্যাপক Woods বলছিলেন যে কথা পাকা হলে আপনাকে এই গ্রীষ্মঋতুতেই আসতে বলবেন—তাঁর মতে এই সময়েই সব চেয়ে সুবিধা—তিনি বলছিলেন শরতে ভারতবর্ষীয়েরা প্রায় আসে কিন্তু এতে অনেক সময় নষ্ট হয়। যাইহোক কথা ঠিক হলেই আপনাকে টাকা পাঠিয়ে দেওয়া হবে এবং দ্বিধা ও বিলম্ব না করে চলে আসবেন। আপনার দিক থেকে আমাদের দেশের দিক থেকে এবং এদের দেশের দিক থেকে আমিই এই তাগিদ দিচ্চি।[১৫২]

এই চিঠিতে ক্ষিতিমোহনের হোমিয়োপ্যাথি পড়ার ব্যবস্থার কথাও ছিল। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন :

> বস্টনে হোমিওপ্যাথি কলেজ আছে তা ছাড়া সকল রকম চিকিৎসা শেখানোরই আয়োজন আছে। যাতে সেই অধ্যয়নের যথেষ্ট সময় পান এঁরা সেদিকে দৃষ্টি রাখতে প্রতিশ্রুত আছেন। এখানকার ভারতীয় ছাত্রদের কাছ থেকে যথেষ্ট সাহায্য পাবেন এবং যাঁরা আমাকে স্নেহ করেন তাঁরা আপনাকেও আদরের সঙ্গে গ্রহণ করবেন।
>
> ... ...
>
> এ চিঠি মার্চ্চের মাঝামাঝি পাবেন— তৎক্ষণাৎ জবাব দেবেন কারণ হয়ত বা এপ্রিলের শেষাশেষি আমি ইংলণ্ডে যাত্রা করব।* আমি এদেশে থাকতে থাকতে আপনার জন্যে সমস্ত বন্দোবস্ত পাকা করে দিতে চাই।[১৫৩]

মাসখানেক পরে অজিতকুমার চক্রবর্তীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠিতে আবার ক্ষিতিমোহনের আমেরিকা যাওয়ার প্রসঙ্গ এসেছে। ইতিমধ্যে রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছে তিনি নিজে শান্তিনিকেতনে ফিরে যাওয়ার আগে ক্ষিতিমোহনকে সেখান থেকে সরিয়ে আনা উচিত হবে না। তিনি লিখলেন :

> ক্ষিতিমোহনবাবুকে এখানে আনাবার প্রস্তাব অনেক দিন পূর্ব্বে তোমাদের লিখেছিলুম তারপরে চুপচাপ আছি দেখে তোমরা কি ভাবচ জানি নে। আসল কথা ইতিমধ্যে এ সম্বন্ধে অনেক চিন্তা করেছি। আমার মনে হয়েছে আমি যতদিন না ফিরে যাই ততদিন তোমাদের কাউকে ওখান থেকে অল্পকালের জন্যও অবসর দেওয়া উচিত হবে না। এখানে সমস্তই প্রস্তুত করে রেখে দিলুম, আমি ফিরে গিয়েই অনায়াসে ক্ষিতিমোহনবাবুকে পাঠাতে পারব—তার কোনো বাধা হবে না। ইতিমধ্যে তিনি এখানকার কাজের জন্যে যদি বিশেষভাবে প্রস্তুত হতে পারেন ত ভালো হয়। এদের কিছু দিতে হবে— কিছু হাতে করে আনা চাই। ভারতবর্ষ থেকে কিছু পাওয়া যেতে পারে এই রকমের একটা বিশ্বাস এককালে এদের মনে প্রবল হয়ে উঠেছিল মাঝে তার বিঘ্ন ঘটেছে। কিন্তু আবার তাকে জাগরুক করে তুলতে হবে। ...ক্ষিতিমোহনবাবুকে বোলো আমার দেশে ফিরতে খুব বেশি দেরী হবে না—তখন তিনি এদেশে আসবার সুযোগ পাবেন।[১৫৪]

কয়েক দিন পরে আর-এক চিঠিতে প্রায় একই কথা লিখছেন :

> ক্ষিতিমোহনবাবুকে এখানে যথাসময়ে যাতে আনাতে পারি আমি তার ব্যবস্থা করেছি। Dr. Woodsএর সঙ্গে কথা স্থির হয়ে গেছে—এ বৎসরটি বাদ দিতে হবে—আগামী বৎসরের জন্যে তিনি যেন প্রস্তুত হন।[১৫৫]

*রবীন্দ্রনাথ ১২ এপ্রিল আমেরিকা থেকে ইংল্যান্ডের পথে যাত্রা করেন।

মে মাসের প্রথম দিকে সন্তোষচন্দ্র মজুমদারকেও এই প্রসঙ্গে লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তখন তিনি ইংল্যান্ডে ফিরে গেছেন।

> ক্ষিতিমোহনবাবুকে এদেশে আনবার আয়োজন আমি ঠিক করেই রেখেছি। আর একটু হলেই এই গরমের ছুটির পরেই তাঁকে আনবার ব্যবস্থা করেছিলুম। কিন্তু আমার হঠাৎ এই সুবুদ্ধি এল যে আমি ফিরে যাওয়ার পূর্ব্বে তাঁকে বিদ্যালয় থেকে তুলে আনা উচিত হবে না। তোমাদের ওখান থেকে এখন অনেক পুরাতন শিক্ষক চলে এসেছেন, অনেক নূতন লোক নিযুক্ত হয়েছেন। এই নূতন আগত ও আগন্তুকদের আমাদের আশ্রমের সঙ্গে ভালো করে মিশিয়ে নেবার জন্যে পুরাতন ধারাটিকে প্রবল রাখা দরকার। নইলে ইস্কুলের ভাবটিই আশ্রমের ভাবটিকে ছাড়িয়ে বড় হয়ে উঠতে চাইবে। ইস্কুলে যাঁরা পড়াচ্ছেন তাঁদের প্রয়োজন আছে বটে, কিন্তু আশ্রমে যাঁরা সাধনা করচেন তাঁদের প্রয়োজন আরো অনেক বেশি। ...যখন ক্ষিতিমোহনবাবুকে বিদ্যালয় থেকে কিছুকালের জন্যও চলে আসতে হবে তখন শাস্ত্রীমশায়কে ফিরে পেতে পারলে আমাদের উপকার হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই, হয়তো আগামী পুজোর ছুটির পরে তাঁকে দরকার হবে।[১৫৬]

রবীন্দ্রনাথ আবার ২৪ বৈশাখ ১৩২০-তে যে চিঠি সরাসরি ক্ষিতিমোহনকে লিখলেন, তাতে পাই : 'অনেকদিন থেকে আপনার চিঠির প্রত্যাশা করছিলুম—পেয়ে আনন্দিত হলুম।' দেখা যাচ্ছে, রবীন্দ্রনাথ যে তাঁকে লিখেছিলেন চিঠি পাওয়ামাত্র উত্তর দিতে, তা বোধ হয় ঘটে ওঠেনি, ক্ষিতিমোহনের বেশ-একটু দেরিই হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের প্রস্তাবের উত্তরে তাঁর সম্মতি জানিয়ে চিঠি দিতে। ইতিমধ্যে অন্যদের কাছে লেখা চিঠির মাধ্যমে আগেই ক্ষিতিমোহন জেনেছেন যে তাঁর জন্য আমেরিকায় রবীন্দ্রনাথ আসন প্রস্তুত করে রেখেছেন এবং রবীন্দ্রনাথের কাছেও এ খবরটা পৌঁছেছে যে ক্ষিতিমোহনের আগ্রহ আছে আমেরিকায় যেতে। আবার তাঁকেও লিখলেন যে মনে হচ্ছে আগামী পুজোর ছুটির সময়ে তাঁকে আমেরিকার উদ্দেশে যাত্রা করে বেরোতে হবে, আমেরিকায় তাঁর জন্য আসন প্রস্তুত হয়ে আছে। এও জানালেন বোস্টন ও শিকাগো দু-জায়গাতেই ভেষজশাস্ত্র অধ্যয়নের চমৎকার ব্যবস্থা আছে এবং আশ্বাস দিলেন যে ক্ষিতিমোহন গেলে ড. উডস এবং মিসেস মুডি দুজনেই তাঁকে অভ্যর্থনা করে নেবেন, তাঁর অধ্যয়নের ব্যবস্থা করতে সহায়তা করবেন।[১৫৭] অধ্যাপক উডস যে তাঁর সম্পর্কে অন্য আগ্রহও বোধ করছেন সে কথাও জানালেন রবীন্দ্রনাথ :

> ডাক্তার Woods বলছিলেন তিনি হয়ত আপনাকে সঙ্গে করে য়ুরোপে ইটালি প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ করবেন এ রকম অসম্ভব নয়। আমি তাঁকে আশ্বাস দিয়েছি সেটা আপনার পক্ষে অপ্রীতিকর হবে না।[১৫৮]

মিসেস মুডির বাড়িতেই ক্ষিতিমোহনের থাকার ব্যবস্থা করেছিলেন, তাই লিখেছিলেন : 'Mrs. Moody-র সঙ্গে যখন থাকবেন তখনও হয়ত নানা দেশে ভ্রমণ আপনার ঘটবে।' বইপত্র যা আনতে হবে, ইত্যবসরে নিজেকে যেটুকু প্রস্তুত করে নিতে হবে সে-সবের কথা এ চিঠিতেও রইল। বললেন :

ইতিমধ্যে আপনি কতকটা প্রস্তুত হয়ে নিতে পারবেন। পুঁথিপত্র যা পাবেন সঙ্গে আনবার চেষ্টা করবেন। পাণিনি ব্যাকরণ শিক্ষার কিছু আয়োজন যদি সংগ্রহ করে আনেন সেটা কাজে লাগবে। এদের কাছে বেদান্ত শাস্ত্রের ভক্তিতত্ত্বসম্মত ব্যাখ্যা উপস্থিত করা খুব দরকার হবে। মোটকথা ভারতবর্ষকে যে এবা অত্যন্ত অসম্পূর্ণভাবে জানে সেইটেকে কাটিয়ে দেবার ব্যবস্থা করা চাই।[১৫৯]

এ ছাড়া ফেব্রুয়ারি মাসে লেখা চিঠির প্রসঙ্গ অনুসরণ করে এ কথা লিখলেন :

এদেশের প্রাচ্যতত্ত্ববিৎরা যে সংস্কৃত ভাষা ও শাস্ত্র খুব তলিয়ে জেনেছেন তা নয়। তাঁরা বিদ্যাটাকে ব্যবহার করবার কতকগুলো কল বানিয়ে রেখেছেন— সেই কলের থেকে তাঁরা মাল তৈরি করেন। এইজন্যে আপনাদের কাছ থেকে তাঁরা যে প্রাণের জিনিষ পাবেন সে তাঁরা কোনো শব্দকোষ এবং ব্যাকরণ থেকে পাবেন না এ কথা আমি অধ্যাপককে বলে রেখেছি। তিনি সেই জিনিষটাকেই চান এবং আপনার সঙ্গে যোগে সেই জিনিষটার তিনি সদ্ব্যবহার করতেও পারবেন। এখানকার যাঁরা শাস্ত্রজ্ঞ তাঁরা সাধক নন, সেইটেতে যে অভাব ঘটে সেই অভাব আপনি পূরণ করে দেবেন। এই কথা চিন্তা করে দেখবেন আমার মত লোকও উপনিষদের দুই চারটে শ্লোক অবলম্বন করে আপন মনের মত যে ব্যাখ্যা করেছে সেও এই ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র অধ্যাপকের কাছে অত্যন্ত হৃদ্য বলে প্রতিভাত হয়েছে। অথচ উপনিষদের অমৃতভাণ্ডারের বাইবে দাঁড়িয়ে মহাজনের চলাচলের রাস্তা থেকে কুড়িয়ে বাড়িয়ে টুক্‌রো টাক্‌রা যা পেয়েছি তাই নিয়েই আমার কারবার।[১৬০]

এই সঙ্গেই আবার যোগ করলেন :

ভারতবর্ষের মুখ থেকে এরা কিছু জ্ঞানের কথা শুনেছে কিন্তু রসের কথা একেবারেই শোনে নি সেইটে এদের যতটা সম্ভব দান করে যাবেন। সে জন্য সময় অনেকটা অনুকূল হয়েছে— রসধারাবর্ষণের জন্য এরা যেন আজকাল আকাশের দিকে চঞ্চু বিস্তার করবার উপক্রম করচে এই সময়ে ভাবের আসর জমানো আপনার পক্ষে শক্ত হবে না।[১৬১]

সেই সময় যে-সব ভারতচর্চায় আগ্রহী পণ্ডিতের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় হয়েছিল, কোথায় যে তাঁদের জ্ঞানের অসম্পূর্ণতা তার ঠিক সন্ধানটি পেতে তাঁর বিলম্ব হয়নি। তিনি অনুভব করতে পারছিলেন যে এঁদের ভারতীয় শাস্ত্রজ্ঞানকে এঁরা জীবনচর্যায় সমন্বিত করে নেওয়ার পথ দেখতে পাননি। আলাপ-আলোচনায় এটাও বোঝা যাচ্ছিল যে পথ দেখতে পাওয়ার জন্য নতুন একটা ঔৎসুক্যের সঞ্চার ঘটেছে, তার পিছনে তাঁর নিজের সে-সময়কার বক্তৃতাগুলিরও একটা ভূমিকা ছিল। আমরা দেখছি এর পরে আমেরিকায় তাঁর সদ্যপরিচিত বিদগ্ধসমাজের এই ঔৎসুক্যের দাবি মেটাতে তাঁর মনে হয়েছে ক্ষিতিমোহনের কথা, যিনি প্রাচীন ভারতীয় ধর্ম-সংস্কৃতির অগাধ রসসম্পদের যথার্থ পরিচয়টি উদ্‌ঘাটিত করে দেখাবার যোগ্যতা রাখেন। তাঁকে লেখা এই দু-তিনখানি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথের যে ভাবনা প্রকাশ পেয়েছে, জানি না রবীন্দ্র-চিন্তার আলোয়-দেখা পাশ্চাত্য-বিশ্বের আলোচনায় তার যথাযোগ্য ব্যবহার কোথাও হয়েছে কি না।

প্রত্যাশার অবসান

আমেরিকার নতুন বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় এবং শান্তিনিকেতন আশ্রমে লেখা চিঠিপত্রে যে ইচ্ছাতরুটি দিনে দিনে বেড়ে উঠছিল সেটি কিন্তু অচিরেই শুকিয়ে গেল। ফেব্রুয়ারিতেও লিখেছিলেন : 'কিন্তু আপনার এটা ঠিক হয়ে গেছে বলেই মনে রাখবেন।'[১৬২] ২৪ বৈশাখ যখন চিঠি লিখেছেন তখনও রবীন্দ্রনাথের ধারণা আমেরিকায় ক্ষিতিমোহনের জন্য যে ব্যবস্থা তিনি প্রায় পাকা করে ফেলেছেন, সে সুযোগ ইংল্যান্ডে ঘটিয়ে তোলা দুঃসাধ্য। সেখানে হয়তো ভবিষ্যতে তা করা যেতে পারবে এমন আশা মনে ছিল। ইতিমধ্যে ফিরে এসেছেন ইংল্যান্ডে, আমেরিকা সম্পর্কে যেন মোহভঙ্গ হয়েছে। একটি চিঠিতে লিখছেন :

> আমেরিকায় আপনার পথ করবার চেষ্টা করেছিলুম এবং সে চেষ্টা ব্যর্থ হয় নি। কিন্তু আমি আমেরিকার যে পরিচয় পেয়েছি তাতে সেখানে আপনাকে পাঠাতে আমার উৎসাহ হয় না। তাই এখানেও চেষ্টা করতে প্রবৃত্ত হয়েছি।[১৬৩]

আবার লিখলেন যে কাজের জন্য ক্ষিতিমোহনকে আনবার তাগিদ বোধ করছেন আমেরিকায় গেলে সে কাজ হবে না — 'কেননা আমেরিকার কোনো উদ্যোগকে য়ুরোপ তেমন খাতির করে না।' এর মধ্যে রোটেনস্টাইনের সঙ্গে তাঁর আলোচনা হয়েছে : 'তিনি বলেছেন ইংলণ্ডে আপনাকে আনাবার জন্যে তাঁরা উদ্যোগ করবেন এবং তাঁর বিশ্বাস কাজটা কঠিন হবে না।' রবীন্দ্রনাথ লিখলেন : 'বোধকরি আমি এখানে থাকতে থাকতেই আপনাকে আনাতে পারব।' লক্ষণীয় হল, এবার আর উপনিষদ বেদান্তভাষ্য পাণিনি ব্যাকরণ পড়ানোর কথা বলছেন না রবীন্দ্রনাথ এবার বলছেন ভারতীয় মধ্যযুগের সাধকদের রচনা, বাউলগান, বৈষ্ণব কাব্য, চৈতন্যজীবনী সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে। ভারতের ভক্তি-আন্দোলনের বিচিত্র ধারার পরিচয় যাতে ইংল্যান্ডের ভাবুকসমাজের সামনে উন্মোচিত হয় এই তাঁর অভিপ্রায়। তিনি লিখলেন :

> মধ্যযুগের ভারতীয় mysticদের সম্বন্ধে যা কিছু জ্ঞাতব্য আছে সমস্ত আপনাকে সংগ্রহ করে আনতে হবে। দাদু কবীর মীরাবাই প্রভৃতি সাধকদের রচনাবলী যথাসম্ভব সংগ্রহ করবেন। এছাড়া আমাদের বাংলা বাউলদের গানও যতটা পারেন কুড়িয়ে নিয়ে আসবেন। ভারতবর্ষের হৃদয়ের পরিচয়টা এদের পক্ষে দরকার। ...আমি যে কেবল ইংরেজের উপকার করবার জন্যেই এ প্রস্তাব করচি তা নয়— এখানকার সদর দরজার ভিতর দিয়ে না গেলে আমাদের দেশের পরিচয় আমাদের দেশে প্রবেশ করতে পারবে না। আমাদের দেশ আমাদের লোকের কাছে অনাদৃত হয়ে আছে সেইটেই আমাদের সকলের চেয়ে অকল্যাণ। এই জন্যেই আমি আপনাকে ইংলণ্ডে আনাতে চাই।[১৬৪]

আর-একটা চিঠিরও উল্লেখ করতে চাই প্রাসঙ্গিক তথ্যের কারণে। খণ্ডিত আকারে হাতে আসায় কার লেখা স্পষ্ট নয়, অনুমান করি কালীমোহন ঘোষের। তিনি তখন ইংল্যান্ডে রয়েছেন এবং এ চিঠির মডার্ন রিভিয়ু পত্রিকায় প্রকাশিত এজরা পাউন্ডের অনুবাদ-করা কয়েকটি কবীর-পদের প্রসঙ্গ থেকে অনেকটা নিশ্চিত হয়েই বলা যায় পত্রলেখক তিনিই।

২৭ জুন ১৯১৩ তারিখে কালীমোহন ক্ষিতিমোহনকে 'শ্রীচরণেষু ক্ষিতীবাবু' সম্বোধনে লিখছেন, ছুটির মধ্যে সোনারঙ্গোর ঠিকানায় লেখা পূর্বচিঠিতে তিনি জানিয়েছিলেন যে কবি ইংল্যান্ডে থাকতে থাকতেই ক্ষিতিমোহনের সেখানে যাওয়া হবে। কিন্তু এবারের খবর মিসেস মুডি আসবার পরে আবার মত বদলেছে। মিসেস মুডি অক্টোবর মাসে ভারতে যাবেন, সেজন্য রবীন্দ্রনাথ ভাবছেন ক্ষিতিমোহন তার পরে ইংলন্ডে যেতে পারবেন। এ বক্তব্যের তাৎপর্য সম্ভবত এই যে, এই বিদেশিনী অতিথির কারণেই তাঁর আশ্রমে উপস্থিতিটা জরুরি। কালীমোহন অবশ্য এই মতপরিবর্তনে খুব নিরাশ হয়েছেন তবে ইতিমধ্যে তাঁরও কথা হয়েছে রোটেনস্টাইনের সঙ্গে । রোটেনস্টাইন বলেছেন তিনি চেষ্টা করবেন যাতে ক্ষিতিমোহন ইংলন্ডে এক বছর থেকে কবীর-দাদূ সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে পারেন, তিনি তাঁর জন্য মাসে দেড়শ টাকা চাঁদা তুলবেন ভাবছেন, আর ভাবছেন ইন্ডিয়া সোসাইটি থেকে বক্তৃতা দেওয়ানোর কথা। যদিও কালীমোহন আশা করছিলেন যে ক্ষিতিমোহন ইংলন্ডে এক বছর কাজ করে তারপরে আমেরিকা যেতে পারবেন এবং লিখেছিলেন : 'Rothenstein ইচ্ছা করিলে India Office হতেও আপনার এক বৎসরের খরচ আদায় করিয়া দিতে পারেন। আপনাকে এ বিষয়ে ক্রমে আরও লিখিব', তবে এ কথাটাও তাঁর চিঠিতে ছিল যে রোটেনস্টাইন উৎসাহ দেখালেও তাঁর আস্থা কম, কেন না কবি এবং রোটেনস্টাইন দুজনেরই বাস্তববোধের অভাব আছে।[১৬৫]

শেষের কথাটা এই যে, ক্ষিতিমোহনের বিদেশ যাওয়া নিয়ে সব জল্পনা-কল্পনা বৃথাই। তাঁরও নিশ্চয় আশার পাল্লাটা ক্রমেই ভারী হচ্ছিল, রবীন্দ্রনাথের কথামতো নিজেকে হয়তো প্রস্তুত করছিলেন, কিন্তু তাঁর যাওয়া হয়নি। রবীন্দ্রনাথ সেখানে থাকতেও না, পরেও না, আমেরিকাতেও না, ইংলন্ডেও না। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য নিজেই পরে আমেরিকার প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলেছিলেন এবং তার বদলে ক্ষিতিমোহনকে ইংল্যান্ডেই নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। হয়তো রোটেনস্টাইন প্রাথমিক যে আশ্বাস দিয়েছিলেন সেইমতো বিষয়টার পরিণতি ঘটাতে পারেননি এবং সম্ভবত কালীমোহন ঘোষের আশঙ্কাটা অমূলক ছিল না। এমনও হতে পারে যে রবীন্দ্রনাথ আমেরিকা থেকে ফিরে এসে খ্যাতি এবং কাজের নিরন্তর ব্যস্ততায় দিন কাটিয়েছেন, তাঁর অস্ত্রোপচারও হয়েছে এই সময়ে, তাঁর পক্ষে আর এই প্রস্তাব কার্যকর করার দিকে নজর দেওয়া সম্ভব হয়নি।

অথচ ঠিক তাও নয়। রবীন্দ্রনাথের অপারেশন হয় জুলাই মাসে, সেই সময়ে নার্সিংহোম থেকেও তিনি একটি চিঠিতে লেখেন :

> ক্ষিতিমোহনবাবুকে ইংলন্ডে আনাবার ব্যবস্থা অগ্রসর হচ্চে। যাঁরা এ সব বিষয়ে রসজ্ঞ তাঁরা আগ্রহান্বিত হয়েছেন। আমাদের দেশের যথার্থ সম্পদ এদের কাছে উপস্থিত করবার সময় এসেছে। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের যারা শিক্ষিত লোক তারা আমাদের শিক্ষায় শিক্ষিত নয় সুতরাং তারা কেবল দরখাস্তের তাড়া এবং ভিক্ষার ঝুলি হাতে করে এদের কাছে আসে—তারা কেবল এটুকু প্রমাণ করে যায় যে তারা ভাল ইংরাজি বলতে শিখেছে তাদের ব্যাকরণের ভুল হয় না। তারা ইংরেজের ছাত্র, ইংরেজকে কি দিতে পারে। চাঁদ সূর্য্যকে যদি আলো দিতে যায় সে আলোতে তার লাভ কি? আমরা যে জানিইনে আমাদের কি আছে এবং তার মূল্য কত। সেইজন্যে আমাদের পথেঘাটে যা ছড়াছড়ি যাচ্ছে তাই আমি এদের কাছে ধরতে চাই।

ক্ষিতিমোহনবাবু ছাড়া আর কারো দ্বারা এ কাজ হবে না সেইজন্যে আমি তাঁর জন্যে এখানে দৌত্য করচি। তিনি মনে স্থির জানবেন কাজ সিদ্ধ না করে আমি কিছুতেই ছাড়চি নে। তিনি তাঁর ভেষজ শাস্ত্র অধ্যয়ন করুন না করুন সেজন্যে আমি বিশেষ উৎকণ্ঠিত নই কিন্তু তাঁর দেশেব সেবা কববার জন্যে তাঁকে সমুদ্রপারে আসতে হবে। সমস্ত উপকরণ যেন সংগ্রহ করে নিয়ে আসেন। হিন্দুস্থানের সাধকদের সাধনসামগ্রী অনেক তাঁর সংগ্রহ আছে—কিছু মারাঠা থেকেও আনবেন, যেমন তুকারাম, তুকারামের দোঁহার অনেক তর্জ্জমা মেজদাদার বম্বাইচিত্রে আছে, কিছু যোগীন বোস করেছেন—সেই সঙ্গে তিনি ওরিজিনাল বইটাও যেন নিয়ে আসেন। রামপ্রসাদের পদাবলী এবং চৈতন্যচরিতও দরকার হবে। দক্ষিণের দ্রাবিড় ভক্তদের যে সব জীবনী নাটেসান প্রভৃতিরা বের করেছে সেগুলো নিতান্ত অযোগ্য হলেও নিয়ে আসেন যেন। আমি তাঁকে কতকগুলো আনিয়ে দিয়েছিলুম।[১৬৬]

এমনকী জগদানন্দ রায়কে লেখা একটি চিঠিতে দেখা যায় ক্ষিতিমোহনকে ইংল্যান্ডে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থার আর্থিক দিকটা দুর্বল মনে হওয়ায় রবীন্দ্রনাথ ফিরে আবার আমেরিকার কথা ভেবেছিলেন। মিসেস মুডি ভরসা দিয়েছিলেন তাঁকে। ড. উডসেরও আগ্রহ ছিল।

ক্ষিতিমোহনবাবুকে এখানে আনবার জন্যে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করচি। ইন্ডিয়া সোসাইটি থেকে ওঁকে আনাবার প্রস্তাব প্রায় স্থিব হয়েছিল কিন্তু আমি যখন শুনলুম তারা ২৫/৩০ জনে মিলে চাঁদা করে ওঁকে আনাবাব উদ্যোগ করচে তখন আমি দেখলুম এটাতে অবশেষে গ্লানির কারণ ঘটতে পারে। কেননা এত লোকের দাবি মেটানো সহজ নয়— হয়তো ওদের মধ্যে কেউ কেউ একদিন ভাবতে পারে যে এই অর্থব্যয় অনাবশ্যক হয়েছে সেইজন্যে আমি তৎক্ষণাৎ তাদেব নিবাবণ করে দিয়েছি। Mrs. Moody বলেছেন তিনি দেশে ফিরে গিয়ে স্বয়ং এর বাবস্থা কববেন। তিনি বড় সবল-হৃদয়া এবং শ্রদ্ধামতী—তাঁর কাছে ক্ষিতিমোহনবাবু ঘরের লোকেব মত থাকতে পারেন। বস্টনে Dr Woods ওঁকে আনাবার জন্য উৎসুক আছেন। সম্প্রতি তাঁর সঙ্গে একজন মারাঠি যুবক কাজ করচে—বোধ করচি আগামী শীতে তাকে অবসব দেবাব সময হবে— সে চলে গেলেই তাঁব সুযোগ হবে। রোটেনস্টাইন লণ্ডনের বাইরে গেছেন তিনি এলে তাঁর সঙ্গে পবামর্শ হতে পারবে।[১৬৭]

এত-সব ভাবনাচিন্তা ও সংকল্প সত্ত্বেও ক্ষিতিমোহনের বিদেশগমন প্রস্তাবটি মরুপথে নদীধারার মতোই হারিয়ে গেল। তার কারণ কি এই যে, দেশে ফেরার অতি অল্পদিনের মধ্যেই নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্তিজনিত বিশ্বখ্যাতির আলোড়নে এবং অন্যান্য কাজের চাপে এ প্রস্তাবের প্রতি আর রবীন্দ্রনাথ মনোযোগ দিতে পারেননি? হয়তো তাই। শুধু রবীন্দ্রনাথের সংকল্প ও আগ্রহের এক টুকরো প্রমাণ রয়ে গেছে তাঁর One Hundred Poems of Kabir বইটায়, আব তাঁব অনুবাদ-কবা জ্ঞানদাস প্রমুখ সন্তদের গুটিকতক পদে। পরে আসবে সে কথা।

আশ্রম সংবাদ

একটু পিছিয়ে যাই এবারে। রবীন্দ্রনাথের অনুপস্থিতকালে আশ্রমজীবনটা ভালোয়-মন্দয় চলছিল একরকম। ১১ আশ্বিন (২৭ সেপ্টেম্বর ১৯১২) রামমোহন রায়ের মৃত্যুদিন পালন

করা হল। বিকেলে একটি সভা, পরে সন্ধ্যাবেলা মন্দির। নেপালচন্দ্র রায়ের সঙ্গে যুগ্মভাবে আচার্যের কাজ করলেন ক্ষিতিমোহন, তাঁর একটি ভাষণও ছিল।[১৬৮] পূজাবকাশের পরে আশ্রমে এলেন এক বিদেশি, পৌষ উৎসবের ঠিক আগেটাতেই। তাঁর নাম উইলিয়ম পিয়র্সন। লন্ডনে অ্যান্ডরুজ এবং পিয়র্সনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় হয়েছে কয়েক মাস আগে। তাঁর মুখে শান্তিনিকেতন আশ্রমের কথা শুনে তাঁরা দুজনেই উৎসুক হয়েছিলেন। ভারতে ফিরে পিয়র্সনই প্রথম দেখতে এলেন এই আশ্রম, সেদিন ১৩ ডিসেম্বর ১৯১২। তখন তাঁর কর্মস্থল ছিল দিল্লি। ফিরে গিয়ে রবীন্দ্রনাথকে প্রথম-দেখা শান্তিনিকেতনের বর্ণনা দিয়ে তিনি যে চিঠি লিখেছিলেন, তাতে আরও অনেকের সঙ্গে ক্ষিতিমোহনেরও কথা ছিল। সেটুকু উপস্থাপন করা গেল, যাতে বিদেশি অতিথির অভ্যর্থনায় আশ্রমের ঠাকুরদার স্বতঃস্ফূর্ত ভূমিকাটির আভাস পাওয়া যায়। এই তো সবে শুরু। সারা জীবন ধরে কত বিচিত্র বিদেশি অতিথির আগমন হল আশ্রমে, কতজনকে স্বাগত জানালেন ক্ষিতিমোহন, জানালেন বিদায়সম্ভাষণ তার কি আর লেখাজোখা আছে। আর পিয়র্সনসাহেবের প্রথম শান্তিনিকেতন দর্শনের বর্ণনাসংবলিত বিশদ চিঠির মতো এমন জীবন্ত ছবি সহজলভ্যও নয়।

যে দিন সন্ধ্যাবেলা এলেন পিয়র্সন, তার পরদিন সকালে মন্দিরে উপাসনার পরে তিনি যখন দু-একটি ছাত্রাবাস ঘুরে দেখছেন, সেই সময় ক্ষিতিমোহনের সঙ্গে তাঁর প্রথম দেখা, 'who cheered me with his joyous presence'। বিকেলবেলা ক্ষিতিমোহন প্রায় যাটজন ছাত্রের সঙ্গে পিয়র্সনকে নিয়ে পারুলবনে বেড়াতে গেলেন।* সেখানে খানিকক্ষণ মাঠে বসে গান হল। ফিরে এসে রবীন্দ্রনাথের ঘরে তাঁরা খোলা বারান্দার সামনে বসলেন, অন্যরাও ছিলেন। গান হল, পিয়র্সন লন্ডনে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা হওয়ার অভিজ্ঞতা শোনালেন, বললেন এই বোলপুর আশ্রম সম্বন্ধে কী কথা হয়েছে তাঁদের মধ্যে। পরের দিন বিকেলে আবার পারুলবন, সারা আশ্রম চলল পিয়র্সনের সঙ্গী হয়ে। সেখানে বৃত্তাকারে সকলে মিলে বসে গান হল, সংস্কৃত মন্ত্রপাঠ হল, সবশেষে হল 'আমাদের শান্তিনিকেতন' গান। সেই খোলা মাঠে চাঁদের আলোয় বসে পিয়র্সন ভাবছেন দৃশ্যটা সরোবরের শান্ত জলের উপরে ফোটা একটি পদ্মফুলের সঙ্গে তুলনীয় হয়ে উঠেছে যেন। তাই বললেন : 'আমার মনে হচ্ছে বাংলাদেশ যেন এক সরোবর, মানুষ সেখান থেকে জল নিতে এসে এই বোলপুর বিদ্যালয়রূপী পদ্মফুলের সৌরভ ও সৌন্দর্য উপভোগ করছে।' উপমার জগৎটা তো ক্ষিতিমোহনের একান্ত ভালোলাগার জগৎ, সুতরাং বঙ্গদেশ এবং শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের প্রতি পিয়র্সনের এই সপ্রশংস উপমাভিনন্দন নিষ্ফল হল না। প্রত্যুত্তরে ক্ষিতিমোহনও তাঁকে উপমিত করলেন মধুসন্ধানী ভ্রমরের সঙ্গে, সেই প্রস্ফুটিত পদ্মফুলটির মাঝখানে যে এসে বসেছে। সেদিন রাত্রে খাওয়াদাওয়ার পরে পিয়র্সন প্রভাতকুমার অজিতকুমার সন্তোষচন্দ্র সুজিতকুমার একসঙ্গে জড়ো হয়েছেন, সেখানে

---

* এখন যেখানে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের বাসগৃহ, সেইখানে ছিল রেলসেতু। সেই সেতু পেরিয়ে পারুলবন।

'ঠাকুরদাদা' কবীরের কয়েকটি দোঁহা শুনিয়ে ব্যাখ্যা করলেন। ব্যাখ্যাকারের কবীরপ্রেমে বিহ্বল উৎসুক মুখের দিকে চেয়ে পিয়র্সনও অনুপ্রাণিত হচ্ছিলেন, অপরিচিত হিন্দি দোঁহাগুলির ছন্দ তাঁর কানে শোনাচ্ছিল যেন গম্ভীর ঘণ্টাধ্বনির মতো।[১৬৯]

পরদিন সকালেই চলে যাবেন পিয়র্সন। মন্দিরের সামনে সমবেত হয়েছে সারা আশ্রম। বিদায় অনুষ্ঠান হল। শকুন্তলা আশ্রম থেকে বিদায় নিয়ে যাওয়ার সময় কণ্বমুনি যে প্রার্থনা উচ্চারণ করেছিলেন, —আশ্রম থেকে যাওয়ার সময় আশ্রমের আনন্দ ও শান্তি শকুন্তলা যেন সঙ্গে নিয়ে যান, সেই শ্লোক আবৃত্তি করে পিয়র্সনের জন্য ক্ষিতিমোহন সেই প্রার্থনাই জানালেন। তাঁর হাতে দিলেন শান্তি ও প্রাচুর্যের প্রতীক ধান ও দূর্বা। এ ঘটনা যে পিয়র্সনকে কী পরিমাণ নাড়া দিয়েছিল, রবীন্দ্রনাথকে লেখা তাঁর চিঠির বিবরণ থেকে তা ঠিক বোঝা যাবে না। এ কথা জেনে বিস্মিত না-হয়ে পারা যায় না যে তাঁর কল্যাণকামনা করে আশ্রমের দেওয়া সেই-কটি ধানদূর্বা দীর্ঘদিন তিনি সযত্নে রেখে দিয়েছিলেন।[১৭০]

তাঁর বিদায়কালে আর-একটি কথাও বলেছিলেন ক্ষিতিমোহন। প্রবাদ আছে আগেকার কালে এই জনশূন্য মাঠে ডাকাতদের আড্ডা ছিল, তারা অসহায় পথিকের যথাসর্বস্ব কেড়ে নিত। এখনও উত্তরাধিকারসূত্রে সেই ডাকাতে-গুণটা এখানকার জলহাওয়ার মধ্যে থেকে গেছে। যে পথিক আসেন এখানে, এই ক্ষুদ্র আশ্রম তাঁর হৃদয়হরণ করে নেয়।[১৭১] এর পরে যখন ফেব্রুয়াবি ১৯১৩-য় অ্যান্ডরুজ এলেন আশ্রম দেখতে, তাঁর সঙ্গেও সকলের পরিচয় হল। যে সভায় অ্যান্ডরুজ ছাত্রদের উদ্দেশে কিছু বললেন, সে সভায় ক্ষিতিমোহনও তাঁকে স্বাগত জানিয়ে বলেছিলেন বাংলায়। বুধবারে সকালে মন্দির-উপাসনার পরে সকলে সমবেত হয়ে চন্দনের ফোঁটা ও সাদা ফুলের মালায় বিদায়ী অতিথিকে যখন বরণ করলেন, উচ্চারণ করলেন অনুষ্ঠান-উপযোগী মন্ত্র, মনে তো হয় তখনও তাঁর কিছু ভূমিকা ছিল।[১৭২]

কিছুদিন আগে আসন্ন পৌষ উৎসবের কথা স্মরণ করে রবীন্দ্রনাথকে ক্ষিতিমোহন লিখেছিলেন :

> আমাদের আশ্রমে প্রতিদিনই আপনাকে নানাভাবেই স্মরণ করি। বিশেষভাবে এই যে পৌষ উৎসব আসিতেছে ইহাতে আপনার সঙ্গ খুব বেশী করিয়া সকলে চাহিতেছি। দূর হইতে আশীর্ব্বাদ করিলেও আমরা ধন্য হইব। আশীর্ব্বাদ করিবেন যেন আমরা আশ্রমের দেবতাকে সত্য প্রণামে প্রণতি করিতে পারি। সেবায় কর্ম্মে ধ্যানে চরিত্রে যেন সেই প্রণাম সত্য হইয়া ওঠে।[১৭৩]

সেবার ৭ পৌষ রবীন্দ্রনাথের পরিবর্তে তাঁরা পেয়েছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে, তিনিই প্রাতঃকালীন উপাসনা করলেন। আরও পরবর্তীকালে সাধক দ্বিজেন্দ্রনাথ সম্পর্কে একটি আশ্চর্য অভিজ্ঞতা হয়েছিল। একবার মাঘোৎসবে তাঁদের আগ্রহে তিনি মন্দিরে উপাসনা করতে এসে যথানিয়মে তা করতে পারলেন না, স্তব্ধ হয়ে রইলেন। সে কথা স্মরণ করে ক্ষিতিমোহন লিখেছেন :

শান্তিনিকেতনে থাকিয়া দেখিয়াছি জীবনের শেষভাগে মন্দিরে বসিয়া তিনি ধর্ম্ম উপদেশ দিতে একেবারেই পারিতেন না। সেখানে ভগবানের নাম লইতে গেলেই তিনি স্তব্ধ হইয়া যাইতেন। একবার আমাদের সকলের আগ্রহে তিনি বাধ্য হইয়া মাঘোৎসবে মন্দিরে উপাসনা করিতে বসিলেন। কিন্তু তাঁহার উপাসনা হইল আত্মসমাহিত যোগভাব, কাজেই এইরূপ উপাসনা করিতে গিয়া তিনি কিছুই বলিতে পারিলেন না, কেবল দেখিলাম, তাঁহার সমস্ত শরীর কদম্ব-কোরকের মত বিকশিত ও নির্ধূম দীপের মত উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। খানিকক্ষণ বসিয়া তিনি উঠিয়া আসিলেন। আমরা সেদিন এমন একটি চিন্ময় পূর্ণতার ছবি প্রত্যক্ষ করিলাম যে কেহই আর বাঙ্‌ময় উপদেশের কোনো অভাব অনুভব করিলাম না।[১৭৪]

দ্বিজেন্দ্রনাথের প্রসঙ্গ ধরে এ কথাটা এসে পড়ল, হচ্ছিল পৌষ উৎসবের কথা। ৮ পৌষ ছাতিমতলায় ব্রহ্মবিদ্যালয়ের বার্ষিক উৎসব। সভাপতির আসনে ছিলেন অধ্যাপক যদুনাথ সরকার, বেদগানের পরে উপাসনা করলেন ক্ষিতিমোহন। ৯ পৌষ আশ্রমের পরলোকগত অধ্যাপক ও ছাত্রদের স্মরণসভায় আচার্যের কাজ করেন তিনি। উপাসনার পরে মৃত্যু সম্বন্ধে বৈদিক ঋষিদের কয়েকটি মন্ত্র উচ্চারণ করে তার ব্যাখ্যা করেন। 'জীবন ঈশ্বরের পিতৃরূপ এবং মৃত্যু তাঁহার মাতৃরূপ ;...তাঁহারি অনন্ত প্রাণসমুদ্রের মধ্যে যে এই দুই রূপের আবির্ভাব-তিরোভাব ঘটিতেছে—জীবনে ও মৃত্যুতে প্রাণের যে কোথাও ছেদ নাই—এইরূপ ভাবের অনেক আশ্চর্য মন্ত্র তিনি সংগ্রহ করিয়া শ্রাদ্ধক্রিয়ার ভিতরকার তাৎপর্য্য আমাদের কাছে সুন্দররূপে উদ্ঘাটিত করিয়াছিলেন...' লেখা হয়েছিল তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা-র 'আশ্রমকথা'-য়।[১৭৫] পৌষসংক্রান্তির দিনে কেন্দুলির জয়দেবের মেলায় গিয়ে ভরা-মনে ফিরলেন, বাউল এবং বাউলগানেব প্রবল আকর্ষণে এমন কতবারই গেছেন। নিতান্ত অল্প বয়সেই তিনি এ মেলায় আসতেন নিতাই বাউলের সঙ্গে, তখন শান্তিনিকেতনের সঙ্গে কোনো সম্পর্কই ছিল না। এখানে এসেও প্রথম প্রথম কাউকে না জানিয়ে একা চলে যেতেন। তারপর জানাজানি হল, বন্ধু-সহকর্মীরা সঙ্গী হতে লাগলেন। তাঁর ভয় ছিল পাছে কেউ বাউলদের প্রশ্ন করে বিরক্ত করেন। এ বছর ঘুরে এসে কিরণবালাকে একটা চিঠিতে লিখেছিলেন :

গত ২৯শে পৌষ জয়দেবের জন্মভূমি কেন্দুবিল্ব গ্রামে বৈষ্ণব মহোৎসবে জয়দেবের তিরোধানের দিবসে গিয়াছিলাম। কি দেখিলাম, কি চমৎকার! অজয় নদের তীরে শালবনের ধারে বাইশ মাইল দূরে সেই পবিত্র তীর্থ। আগামী পত্রে তার বিস্তৃত বিবরণ [দিব] এখন সময় নাই।[১৭৬]

চিঠি যেদিন লিখেছেন তার আগের দিনই মহর্ষিদেবের তিরোধানদিবস গেছে, মন্দিরে উপাসনার দায়িত্ব তাঁর উপরে ছিল। কিরণবালাকে লিখলেন :

তারপর ৬ই মাঘ মহর্ষির পরলোকগমন তিথি গেল। সেইদিন আমি মন্দিরের কাজ করিয়াছিলাম। সেই দিনটি আমরা গান ধ্যান সাধুসঙ্গ সৎপ্রসঙ্গ আলোচনাতে কাটাইয়াছি। বড় চমৎকার দিনটি গিয়াছে। তাঁর এই প্রণাম করিবার স্থান—এইখানেই তো বিধাতার চরণে তিনি নিত্য প্রণত হইতেন, সেই প্রণামের সঙ্গে আমাদের প্রণতি মিশাইয়াছি।[১৭৭]

এই-সব কারণে বেশ একটু ব্যস্ততায় দিন কাটছিল। ৭ মাঘ কিরণবালাকে লিখছেন সেইদিনই বিকেলে তাঁরা মাঘোৎসব উপলক্ষে চার-পাঁচ দিনের জন্য কলকাতায় যাবেন।

যাওয়ার আগে কোনোমতে একটুখানি সময় পেয়ে যে চিঠি লিখলেন তার অনেকটাই জুড়ে আছে আসন্ন মাঘোৎসবকে ঘিরে তাঁর আশা-আকাঙ্ক্ষা ও অনুভবের কথা।

মনের কথা

কলকাতায় এসে ব্রাহ্মসমাজের এগারোই মাঘের উৎসবে যোগ দেওয়ার সম্ভাবনায় ক্ষিতিমোহন কীরকম উদ্‌বেলিত হয়ে উঠতেন, সে আমরা আগেও দেখেছি। কী এক পরম প্রাপ্তির প্রত্যাশায় তাঁর হৃদয়-মন যেন ছলছল করত। এবারেও এই বিশেষ দিনটিতে পরমেশ্বরের চরণে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে নিবেদন করে দেওয়ার জন্য মন আকুল। প্রাণ চায় এই দিনে সব প্রিয়জনকে সঙ্গে নিয়ে উপাসনা করতে। কিরণবালাকে পাশে পাবেন না জেনে তাই একটু বিমর্ষ বোধ করছেন। তাঁকে লিখছেন :

> উৎসব আগতপ্রায়—এই সময় প্রতি বৎসর আমি তোমার অভাব বিশেষভাবে অনুভব করি। এবারও করিতেছি। সমস্ত বৎসর আমি নানা কাজে কর্ম্মে ঝঞ্ঝাটে কাটাই—কিন্তু এই যে তাঁর চরণে মিলিবার দিন—এই দিনে হৃদয়ের সকলকে লইয়া বসিতে ইচ্ছা হয়। তাঁর পদপ্রান্তে একা যাইতে ইচ্ছা হয় না। তাই তো কলিকাতাতে নানা স্থান হইতে বন্ধুবান্ধব আসিয়া সকলে একত্র মিলিয়া সেই দেবতার উপাসনা করি যিনি তাঁহার প্রেমে সমস্ত বিশ্বজগতের সকল অণু-পরমাণুকে সংহত করিয়া রাখিয়াছেন। সকল বৎসরের পিপাসিত যখন সেই অমৃতময়ের চরণতলে বসিল তখনও কি বিচ্ছিন্ন হইয়াই যাইতে হইবে? ...তাঁর চরণধূলার তলে প্রতিদিন আমাদের মস্তক লুটাইতে হইবে—এইজন্যই তো এই জগতে আসিলাম। ধনের ভোগে ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিকে [তে], বৈভবের গর্ব্বে দিন তো গেল—হায় এইজন্যই কি আসিয়াছিলাম। এমন মানবজন্ম! কি অসাধারণ জ্ঞানে প্রেমে কর্ম্মে উজ্জ্বল মানবজীবন! সে কি তুচ্ছ সম্ভোগে নষ্ট হইয়া গেল! নষ্ট কি হইতে দেওয়া যায়! না, না, প্রতিদিন যদি স্খলন হইয়া থাকে—অন্ততঃ আজ একবার বসিয়া বিধাতার চরণে মাথাটা লুটাইয়া সব গর্ব্ব সব অভিমান চূর্ণ করিয়া লইব—প্রেমে ও প্রণামের আনন্দে হৃদয় মন প্রাণ ভরিয়া লই। এই একটি দিন যেন কিছুতেই ফাঁকী না দিয়া যায়।[১৭]

সেই ব্যাকুলতায় আবার সংযোগ করলেন :

> অতএব যদি আমাদের এই সময়ে দেখা হইল না, উপাসনায় প্রত্যূষে এবং রাত্রিতে তুমি নিশ্চয় আমার সহিত মিলিত হইয়া বিধাতার চরণে একবার আত্মনিবেদন করিবে। সেই বিধাতার চরণে আপনাকে নিবেদন করিবে যিনি সকল দুঃখ সম্ভোগ তাঁর পবিত্র অমৃতস্পর্শে জুড়াইয়া দেন—যিনি বৈভবের গুণের দম্ভ তাঁর করুণাময় পরশে [..] করিয়া দেন। ...১০ই রাত্রিতে উদ্বোধন করিবে হৃদয়কে উদ্‌বোধিত। তারপর ১১ই সকল দিন নানা কর্ম্মের মধ্যে তোমার একাগ্র জপ ও ধ্যান যেন চলিতে থাকে। ১২ই প্রাতে ও সন্ধ্যায় উৎসব।[১৮]

চিঠিটায় ঘরসংসারের কথাও যে নেই তা নয়। দুই শিশুকন্যার জ্বর ইত্যাদি নানা প্রসঙ্গ আছে। হয়তো বাড়িতে সকলের অসুখ-বিসুখের জন্যই সেবার কিরণবালা

মাঘোৎসবের সময় কলকাতায় আসতে পারেননি, কেননা চিঠিতে ক্ষিতিমোহন লিখছেন : 'সকলের অসুখ। অসুখ সারিলেই না হয় আবার চেষ্টা করিবে। না হয় না হইবে। হাতের কাছে যা আসে তাই প্রসন্ন মনে করিবে—ভাবিবে ইহাই জগদীশ্বরের তপস্যা।' এ কথাটাও জানিয়েছিলেন : '১৩ই মধ্যাহ্নের পর আমি হয়তো উপাসনা করিব।' ব্রাহ্মসমাজে তিনি সেবার মাঘোৎসবের দিন সন্ধ্যায় 'উদ্বোধন' নামে একটি লিখিত ভাষণ পাঠ করেন। ভাষণটি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ফাল্গুন ১৮৩৫ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। যাই হোক এর পর আবার তিনি এ চিঠিতে যোগ করেছিলেন :

> যাক এবার উৎসবের জন্য প্রস্তুত হও। উষালোক যেমন পরম সুন্দর হইয়া দিবসের জন্য প্রস্তুত হয় তেমনি তোমার দিন পরম সুন্দর হইয়া উৎসবতিথির প্রেমানন্দলীলার জন্য প্রস্তুত হউক।

এর অল্পদিন পরেই কিরণবালাকে লেখা আর-একখানি চিঠিও কালগ্রাস এড়িয়ে রক্ষা পেয়েছে। এগারোই মাঘের ব্রহ্মোপাসনায় কিরণবালা কাছে থাকবেন না বলে যে দুঃখ পাচ্ছিলেন, এই চিঠিরও অনেকটা অংশ জুড়ে আছে সে দুঃখ! হয়তো বা একেবারেই ব্যক্তিগত কারণে মন অত্যন্ত আলোড়িত, বিচ্ছেদবেদনায় কাতর হয়ে এক-এক সময় ইচ্ছা করছে কাজকর্ম সব ফেলে ছুটে চলে যেতে।

> এই কয়দিন কৃষ্ণপক্ষের শেষরাত্রির চন্দ্রোদয় কি অপূর্ব্ব ছিল, কাল হইতে আবার উদয় কি চমৎকার হইবে। পশ্চিমাকাশের সন্ধ্যান্ধকারে সেই ক্ষীণ বাসন্তী চন্দ্রের উজ্জ্বল রেখাটি [..] বাণী আমার কাছে বহন করিয়া আনিবে। এখন আকাশ আলোকে তাপে পরিপূর্ণ, বায়ু গন্ধে ও পিক ঝঙ্কারে পূর্ণ, বন পুষ্প কিশলয়ে পূর্ণ, বৃক্ষ গুল্ম সজীবতায় পূর্ণ ও শাখা লতা নানা লীলায় হিল্লোলে পূর্ণ আর মন সর্ব্বোপরি আনন্দে ব্যথায় পূর্ণ। এমন দিনে কোথায় তুমি আর কোথায় আমি। যাঁর প্রসাদে, যাঁব [...] শ্বাস লই, যাঁর লীলার চরণামৃতের পরশে সকল প্রকৃতি একেবারে প্রাণের ভার ধারণ করিতে অক্ষম, তাঁহাকে যদি একসঙ্গে প্রণাম করিতে পারিতাম! সত্যই আমার এক একদিন ছুটিয়া চলিয়া যাইতে ইচ্ছা হয়। কষ্টে সম্বরণ করি। এবং একদিন সমস্ত হিসাব নিকাশ ভুলিয়া হঠাৎ উপস্থিত হওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নয়।[১৮০]

চিঠিটা শুরু হয়েছিল সময়াভাবের কথায় :

> প্রত্যেকবার যাহা হয় এবারও তাহা হইয়াছে। আমি একটু অবসর পাইলে ভাল করিয়া চিঠি লিখিব এই দুরাশা মনকে অধিকার করিয়াছিল। [...] সেই নবাবী আশা পূর্ণ হইবার নহে। অতএব মনকে বলিলাম "যেমনি আছ তেমনি এস আব কোরো না দেরী।"* মনকে তাই আজ নানা কষ্টসঙ্কুল নানা উদ্বেগ-উদ্বেলিত মুহূর্তে তোমার নিকট প্রেরণ করিতেছি।'

শান্তিনিকেতনে তখন বসন্তের অগ্রদূতরূপে শীত ঋতুর আধিপত্য চলছে। সময়াভাবের কথা লেখবার পরেই ক্ষিতিমোহন তার বেশ নাতিদীর্ঘ বর্ণনা দিয়েছেন, তাঁর ব্যথিত উদ্‌বিগ্ন মনের কালিমা তাকে ম্লান করেনি।

এ তো মনে হয় 'ক্ষণিকা'-র 'চিরায়মানা' কবিতার 'যেমন আছ তেমনি এসো / আরা কোরো না সাজ'-এর স্বেচ্ছাপ্রয়োগ।

হ্যাঁ একটা কথা, আমার নিজের কাজ যতই থাক, বসন্তের নবপ্রভাত [...] প্রতিদিন এই প্রান্তরকে নানাবি ' নব নব জীবনলীলায় পূর্ণ করিয়া দিতেছে। আম্রমুকুলের গন্ধে সমস্ত আশ্রম একেবারে মাতাল হইয়া উঠিয়াছে। বাতাস আম্রমুকুলেব মদির গন্ধভারে একেবারে যেন প্রতি শ্বাসে শ্বাসে [বসিয়া বসিয়া] পড়িতেছে—আর যেন চলিতে পারে [না] গন্ধভারে এমনি গুরু হইয়া উঠিযাছে। আর শাল পুষ্পের আগমন হইবে হইবে বলিয়া সকল শাখাতে একেবারে মুকুলে মুকুলে ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে। হঠাৎ জানি কোনদিন দেখিব একেবারে সকল শালবীথি পুষ্পবিকাশের গন্ধে বর্ণে যেন একেবারে খান খান হইয়া উঠিয়াছে। পুরাতন সব পত্র ঝরিয়া ঝরিযা পড়িতেছে— আর নবপত্রের নবারুণ রাগে মনে হইতেছে যেন একটা নব জাগরমান বসন্তের প্রচ্ছন্ন নব স্বর্ণকিবণপুঞ্জবহুল একটি গভীর প্রাণ-অরুণের আভা সকল নবকিশলয়কে আশ্রয় কবিযা দিবাবাত্রি জ্বল্ জ্বল্ করিয়া দীপ্ত হইয়া উঠিতেছে। কণ্টকবনে যে নবপত্রাবলীর সঞ্চার তার শোভা [...] বর্ণনা করা যায় না। তাহাতে পুষ্প [...] সুরভি নাই, মধু নাই, ভ্রমর নাই। কিন্তু তার কণ্টকিত শাখাদণ্ডের আগাগোড়া সতেজ হরিৎ, সরস অরুণাভ, নবজাত রক্তবর্ণ কচি কচি কিশলয়াবলীতে একেবারে নিশ্ছিদ্রভাবে আচ্ছন্ন হইয়া হইয়া উঠিয়াছে।

প্রভাতে একটু শীতেব তীব্রতা, মধ্যাহ্নে একটু তাপ, সন্ধ্যায় কি গভীর প্রশান্ত জুড়ানো ভাব সমস্ত দিগ্‌দেশকে পূর্ণ করিয়া দিতেছে।[১৮১]

স্বামীর সঙ্গে যুগ্মভাবে না-হলেও কিরণবালা জ্যেষ্ঠ দুই সন্তানকে নিয়ে মাঘোৎসবের উপাসনায় যোগ দিয়েছিলেন। ক্ষিতিমোহনের ৭ মাঘের চিঠিতে নির্দেশ ছিল এগারোই মাঘ দিনটি কীভাবে যাপন করতে হবে, লিখেছিলেন : 'এই উৎসবে নেড়ী-কঙ্করকে একটু একটু বসাইও।' পরে কিরণবালার চিঠিতে তাঁদের মাঘোৎসব পালনের বর্ণনা পড়ে হৃষ্টচিত্তে লিখলেন :

এবার মাঘোৎসবে যে খুব ভালোভাবে যোগ দিতে পারিয়াছ তাহাতে বড় আনন্দলাভ করিয়াছি। আর সর্ব্বাপেক্ষা আনন্দেব বিষয় যে কঙ্কর ও নেড়ী ইহাতে যোগ দিতে পারিয়াছে। এই যে দুইটি তীর্থযাত্রী আমাদের ঘরে আসিয়া বিশ্রাম লইয়াছে—ইহারা [...] ক্রমে ক্রমে তাহাদেব উদ্দিষ্ট দেবতার চরণে প্রণত হইতে শেখে তবে আর [...][১৮২]

জীর্ণপত্রের বাকি কথা উদ্ধার করা যায়নি, কিন্তু ক্ষিতিমোহন যা বলতে চেয়েছেন তা অস্পষ্ট নয়। পুত্রকন্যার মানসিক বিকাশের জন্য যা তিনি ইচ্ছা করেন তার মূল আছে সন্ত কবীরের মতো মরমিয়া সাধকদের ভাবনায়, বাউলদের দৃষ্টিভঙ্গিতে, যাঁদের জীবনদর্শনের প্রভাব তাঁর উপরে সুগভীর। তিনি স্বদেশের মধ্যযুগীয় লোকধর্মের বৌদ্ধিক চর্চামাত্র করেননি। এই ধর্ম ও দর্শনের আলোকে তিনি নিজের জীবনের চলবার পথটি দেখতে পেতেন।

নানা প্রসঙ্গেই ক্ষিতিমোহনের প্রবন্ধে ও ভাষণে সাধক কবীরের জীবন ও বাণীর উচ্চারণ মর্যাদা পেয়েছে। এ কথাটা বলতে ভালোবাসতেন যে জোলা কবীর হাট থেকে সুতো কিনে ফেরবার পথে সন্তানলাভের সংবাদ শুনে মাথা থেকে সুতোর বোঝা নামিয়ে যে পুত্রকে তখনও দেখেননি তার অন্তঃস্থিত পরমাত্মার উদ্দেশে প্রণাম করে বলেছিলেন 'অহদ কা মুসাফির'।* বাউল নিতাইয়ের কথাও যখন-তখন এসে পড়ত ক্ষিতিমোহনের

* অহদ কা মুসাফির—ব্রতধারী পথিক।

ভাষণে, প্রবন্ধেও কখনও বা। নিতাই তাঁকে বলেছিলেন বিবাহিত জীবনে ঘরে যে সন্তান আসে, আমার সাধনা নেই বলে তাকে যদি জীবনের যথার্থ পথটি না দেখাতে পারি, তবে তো পিতৃগৃহ কারাগার হবে তার। যখন চিঠিতে কিরণবালাকে এ কথা লিখেছেন ক্ষিতিমোহন, তারই কাছাকাছি সময়ে 'তীর্থযাত্রা' প্রবন্ধে লিখেছিলেন এই যে পৃথিবী—এ এক তীর্থ। মানুষের জন্মমৃত্যুও এক বিপুল তীর্থযাত্রা। এই পার্থিবলোকে রূপে রসে গন্ধে শব্দে স্পর্শে যে পরমদেবতার নিরন্তর প্রকাশ, সারা জীবনের ধ্যানে বচনে সেবায় তাঁকে একটি পরিপূর্ণ প্রণাম নিবেদন করে ভুবনতীর্থের অমৃতবারি গ্রহণ করতে হবে।

ছাতিমতলার হাতছানি

যন্ত্রটাকে সুরে বেঁধে নেওয়ার জন্য এত যে আয়োজন, তবু কখন কী দুর্বলতায় বেসুরটারই জোর বেড়ে ওঠে। আশ্রমগুরুর অনুপস্থিতিতে হয়তো মনের মধ্যে বৃহৎ শান্তিনিকেতনের ভাবরূপ ঝাপসা হয়ে আসে, প্রাত্যহিকতার গ্লানি আর অভাবটাই ছায়া বিস্তার করে। কিরণবালাকে লেখা যে চিঠিগুলি আমরা দেখেছি তা থেকে তাঁর মনঃক্ষোভের অস্পষ্ট একটু আভাস পাওয়া যায়। অন্যদিকে বিদেশ থেকে লেখা রবীন্দ্রনাথের অনেক চিঠিতেই শান্তিনিকেতনের ভাবরূপটি ফুটেছে। বিদ্যালয় প্রসঙ্গে দূরে বসেও নানা কথা লিখেছেন, প্রয়োজনীয় নির্দেশ পাঠিয়েছেন। ক্ষিতিমোহনকে একটি চিঠিতে লিখতে দেখি :

> আমাদের বিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রণালী ছাত্রচালনা প্রভৃতি অনেক কথাই মনে উদয় হয়—সকলের চেয়ে এই কথাটাই বার বার মনে লাগে যে ছেলেরা যেন বিদ্যা পায় না, জীবন পায় অর্থাৎ তারা যেন আপনার সমগ্রতার দ্বারা বিশ্বকে আপনরূপে অধিকার করবার পথে অগ্রসর হয়—এ দেশের সঙ্গে আমাদের ঐখানে তফাৎ আছে—এরা অখণ্ডতা জিনিষটাকে সহজে বুঝতেই পারে না— সমস্তের মধ্যে নিজের ধারণা এবং নিজের মধ্যে সমস্তের ধারণা এইটে আমাদের একটা সম্পদ। এই সম্পদ আমাদের দেশের প্রত্যেক ছেলেই যেন নিজের মধ্যে সর্বতোভাবে উপলব্ধি করবার সাধনা করে—কেননা আমাদের হাত দিয়ে এই জিনিষটাই ভারতবর্ষ পৃথিবীতে দান করবার সংকল্প করেছে—সেইজন্যে আমাদের দানসামগ্রী বিদ্যার চেয়েও বড় এবং আমাদের যজ্ঞক্ষেত্র কলেজের চেয়েও প্রশস্ত-- এইজন্যে আমি ইস্কুল মাস্টারকে ছুটি দিতে চাই।[১৮৩]

খুব বেশিদিনের কথা নয় যখন শান্তিনিকেতনের ছাত্রদের উচ্চশিক্ষার জন্য একটি কলেজ স্থাপনের ইচ্ছা নিয়ে কথাবার্তা শুরু করে খরচের হিসাব জানার পরে বিফলমনোরথ হয়ে পিছিয়ে আসতে হয়েছিল রবীন্দ্রনাথকে। তাঁর এই ব্যর্থ চেষ্টার সঙ্গে ক্ষিতিমোহনদের ও অনেকের নৈরাশ্য হয়তো জড়িয়ে ছিল। উদ্ধৃত চিঠির অংশে কলেজের উল্লেখ কি তারই ইঙ্গিতবাহী? এ কথাটাও সবার জানা যে রবীন্দ্রনাথ বিদেশে যাওয়ার পর থেকে সেকালের শান্তিনিকেতনের চিরসঙ্গী দারিদ্র্য হঠাৎ মাত্রাছাড়া হয়ে তার আকাশটাকে ম্লান করে তুলেছিল। ইংল্যান্ডের সুধীসমাজে রবীন্দ্রনাথ অভাবনীয় স্বীকৃতি পাচ্ছিলেন কবিরূপে। আমেরিকায় গিয়ে তাঁর সমস্ত দিন কাটছিল আরও কবিতা তরজমায়, বক্তৃতা-প্রবন্ধ তৈরি করতে। সেই-সব বক্তৃতায় তাঁর প্রাচ্যমানসে প্রতিবিম্বিত

মানবজিজ্ঞাসার বহুকৌণিক বিশ্লেষণ পাশ্চাত্যের মানুষকে মুগ্ধ করল। কিন্তু এ-সব কোনো কিছুই তাঁর মন থেকে শান্তিনিকেতনের ভাবনা সরিয়ে রাখেনি। দূরে থেকেও এখানকার সব খবরই পেতেন। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে বস্টন থেকে লেখা চিঠিতে বিদ্যালয়ের জন্য দশজনের কাছে প্রচার ও অর্থভিক্ষা তাঁর পক্ষে দুঃসাধ্য সে কথা জানিয়ে শেষে ঈষৎ কৌতুকে লিখেছিলেন যে তিনি তাঁর 'পুরস্কার' কবিতার কবির মতো শুধু বোধ হয় মালা হাতে করেই ফিরবেন—'যদিও নেপালবাবু আমার স্কন্ধে মোহরের থলি দেখিবার জন্য পথ তাকাইয়া বসিয়া আছেন।'[১৮৪]

রবীন্দ্রনাথ যে তাঁর হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতাগুলি এবং 'শিশু' ও নাটকগুলির ইংরেজি অনুবাদ সেখান থেকেই গ্রন্থাকারে প্রকাশের প্রস্তাবে প্রথমটায় আগ্রহী হয়েছিলেন, তার পিছনে এই বাবত অগ্রিম অর্থ পেয়ে তা শান্তিনিকেতনের জন্য পাঠাবার ইচ্ছার জোর সামান্য ছিল না।[১৮৫]

এর পর তিনি প্রথম সুযোগেই টাকা পাঠিয়ে শান্তিনিকেতনের আর্থিক সংকট কিছুটা নিরসনে তৎপর হয়েছেন। এটা বাইরের তথ্য। মনে মনে তিনি কী ভাবছিলেন, এই সময়কার কোনো কোনো চিঠিতে তা ব্যক্ত হয়েছে।[১৮৬] এ ব্যাপারে সবচেয়ে মূল্যবান ও উল্লেখযোগ্য হল এই সময়ে তাঁর শান্তিনিকেতনের সেই সময়কার শিক্ষকদের কাছে লেখা চিঠিগুলি। অর্থসমস্যায় বিচলিত সাময়িকভাবে আত্মবিস্মৃত আশ্রম-সেবকদের সংবিৎ ফেরাতে বিদেশ থেকে তিনি যে ধন পাঠাচ্ছিলেন, তার নমুনা আছে সন্তোষচন্দ্র মজুমদারকে লেখা চিঠিতে। দারিদ্র্যমোচনের আসল মন্ত্রটা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ, বলছেন টাকার যোগে নয়, বিদ্যালয়কে ভরে তুলতে হবে গরিবের ধন সেই সহজ আনন্দের পুষ্পমধুতে। আসবাব-আয়োজনের ভিড় ঠেলে আশ্রমদেবতা প্রবেশের পথ পাচ্ছেন না—'সেখানে তাঁর আসন বাধামুক্ত হোক—সেখানে তোমাদের ভক্তি তোমাদের নিষ্ঠা তোমাদের আনন্দ জয়যুক্ত হোক—মাটির ঘটে তোমাদের মঙ্গলঘট স্থাপন কর...।'[১৮৭] একই সময়ে এই আর্থিক অনটনের প্রেক্ষিতে তিনি যে কথা ক্ষিতিমোহনকে লিখলেন আশ্রমদেবতার দোহাই দিয়ে, ক্ষোভ বেদনা অনুনয় আশ্বাস সব মিশে ছিল তাতে। মনে হয় সে সময় ক্ষিতিমোহনদের সকলের স্বেচ্ছাগৃহীত সম্মিলিত নাম ছিল 'লক্ষ্মীছাড়ার দল', যারা ভবের পদ্মপত্রে জলের মতো সর্বদা টলমল করছে।* কেননা দেখছি রবীন্দ্রনাথ তাঁর চিঠিতে এই লক্ষ্মীছাড়ার দলেরও দোহাই দিচ্ছেন :

> কিন্তু আমার বিদ্যালয়ের কথা যখন স্মরণ করি তখন অত্যন্ত বেদনা বোধ করি। বিশেষত সম্প্রতি অর্থাভাবের আলোচনায় আপনাদের অনেকেরই মন দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে উঠেছে—এই সময়ে আপনাদের অল্প একটু নাড়া দিলেই হয়ত একেবারেই খসে যাবেন। কিন্তু দোহাই আশ্রমদেবতার এই টাকার দুশ্চিন্তার উপলক্ষে যদি আপনারা আশ্রমকে পরিত্যাগ করতে প্রবৃত্ত হন তাহলে সেটা অত্যন্ত ক্ষোভের বিষয় হবে—কারণ যথার্থই টাকার অভাব ঘটে নি—

---

* স্মরণীয় : 'আমরা লক্ষ্মীছাড়ার দল'। ২৯ আশ্বিন ১৩০২, গীতবিতান ৫৯৩, বিশ্বভারতী। 'হতভাগ্যের গান'। বড়ল নদী ৭ আশ্বিন ১৩০৪/পরিবর্ধন : নাগর নদী পতিসর ৭ আষাঢ় ১৩০৫ 'কল্পনা'। র-র ৭, ১৪৮-৫২, বিশ্বভারতী।

> অবশ্য বদান্যতার অভাব ঘটেছিল। আপনারা দেখতে পাবেন এখন থেকে আর টাকার কথা আশ্রমে উঠবে না। যা প্রয়োজন তার অভাব হবে না। এ কথা মনে রাখবেন আপনারা বিদ্যালয়কে ত্যাগ করা অন্যান্য সকল প্রকার অভাবের চেয়ে ঢের বেশি—লক্ষ্মী যদি আমাদের ছেড়ে যেতে ইচ্ছা করেন তাঁকে বাধা দেব না কিন্তু 'লক্ষ্মীছাড়ার দল'ও যদি বিদায় গ্রহণ করতে প্রবৃত্ত হন তাহলে চলবে না।[১৮৮]

বোঝাই যাচ্ছে যে, দারিদ্র্যের অভিঘাতে সেসময় আরও অনেকের মতো ক্ষিতিমোহনের মনের মধ্যে একখণ্ড দ্বিধার মেঘ ঘনিয়েছিল, শান্তিনিকেতনের আলোটুকু ঢাকা পড়তে চাইছিল তার তলায়। রবীন্দ্রনাথের এ আবেদন যে বৃথা হয়নি সে তো নিশ্চিত এবং ক্ষিতিমোহনের মানস তিনি যে বেশ ভালোই জানতেন তার প্রমাণ এ চিঠির পরের কয়েকটি পঙ্‌ক্তি। সেখানে যে কথা তিনি বললেন, বাহ্যিক নিরাসক্তি অতিক্রম করে সব দাবি সব অনুরোধের ঊর্ধ্বে তার আবেদন গিয়ে পৌঁছোল। রবীন্দ্রনাথ লিখলেন :

> কিন্তু আমার তরফ থেকে এ অনুনয় যদি বাহুল্য না হয় তাহলে এ অনুনয় অন্যায়। বাহিরের থেকে আশ্রমের নিষ্ক্রমণদ্বার রোধ করে দাঁড়ানো কিছুতেই শ্রেয় নয়। যখনই আপনারা অন্তরের থেকে একে পরিত্যাগ করবেন তখনই ব্যূহ ভেদ করতে লেশমাত্র যেন বাধা না পান। অতএব আমি এ সম্বন্ধে কোনো কথাই কহিব না— কেবল আমি এইটুকু জানিয়ে রাখছি যে আমার দীনতাবশত আপনারা আশ্রম ত্যাগ করে যাবেন শেষকালে এই দুঃখ যেন আমাকে দিয়ে যাবেন না। অপরাধ হয়ত করেছি—কিন্তু তার প্রতিকার করতে প্রস্তুত আছি অতএব আপনাদের কাছ থেকে ক্ষমা প্রত্যাশা করি।[১৮৯]

বিদ্যালয় সম্বন্ধে যথোচিত ব্যবস্থাপনার নির্দেশ জানিয়ে পত্র-শেষে পুনরপি রবীন্দ্রনাথ যোগ করেছেন :

> ...পুনরায় একদা আমরা সকলে মিলে সেখানকার ছাতিমগাছের পুণ্যছায়ায় সমবেত হয়ে বসব এ কথা মন থেকে বিদায় করে দেবেন না।

প্রাত্যহিক জীবনের স্বার্থগত বাধা এবারের মতো হয়তো আরও কখনও বা ক্ষিতিমোহনকে ক্ষণমাত্রের জন্য হলেও বিপরীত আকর্ষণে টেনেছে। তবে সেই বিপরীত টানের এতটা জোর ছিল না যে সূর্যাবর্তের পথ থেকে তাঁকে সত্যই বিচ্যুত করে। আর তাঁর কাছে ছাতিম গাছের পুণ্যছায়ায় আশ্রমগুরু-সন্নিধানে উপনিবিষ্ট হওয়ার অভিপ্রায়টকু যে কী মূল্য বহন করে তা রবীন্দ্রনাথের নিজেরও অবিদিত ছিল না। এ সত্য আমাদের ক্ষিতিমোহনের অন্তঃকরণ বুঝতে অনেকটাই সাহায্য করে।

রবীন্দ্রনাথ ফেরবার পরে

চিঠিতে লিখছিলেন রবীন্দ্রনাথ : 'ছুটির সময়ে আমার এ পত্র ভারতবর্ষে পৌঁছবে—তখন কি এ আপনার সন্ধান পাবে?'[১৯০] তিনি দেশে ফিরলেন যখন শান্তিনিকেতনে পুজোর ছুটি তখন আসন্ন।

২৯ সেপ্টেম্বর পৌঁছে হাওড়া স্টেশন থেকেই বোলপুর রওনা হয়ে যান। শিক্ষক-ছাত্র সকলের সঙ্গো তখনই দেখা হয়েছিল। তাঁর অভ্যর্থনা উপলক্ষে আশ্রমে 'বাল্মীকি প্রতিভা' অভিনয় হয়। ছুটিশেষে বিদ্যালয় খোলার কয়েকদিন পরে ১৫ নভেম্বর তাঁর নোবেল পুরস্কার পাওয়ার অভাবিত খবরে আশ্রমে আনন্দের হিল্লোল বয়ে গেল। প্রমথনাথ বিশী তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে লিখেছেন :

> সহসা অজিতকুমার চক্রবর্তী রান্নাঘরে ঢুকিয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন "গুরুদেব নোবেল প্রাইজ পেয়েচেন।" লক্ষ্য করিলাম, অজিতবাবুর চলাফেরা প্রায় নৃত্যেব তালে পরিণত হইয়াছে। ...তারপব ক্ষিতিমোহনবাবু প্রবেশ করিলেন। স্বভাবত তিনি গম্ভীর প্রকৃতির লোক, চলাফেরায় সংযত, কিন্তু তাঁহাকেও চঞ্চল দেখিলাম।[১৯১]

একদিনে পালটে গেল আশ্রমের চেহারা। বিদ্যালয়ের দৈনন্দিন বিধিনিয়মের কড়াকড়ি শিথিল, অধ্যাপকদের চালচলনের গাম্ভীর্যে ফাটল, পরের পর কয়েকটা দিন অনধ্যায়, অতিথি অভ্যাগতের ভিড়। ২৩ নভেম্বর (৭অগ্রহায়ণ) কলকাতা থেকে এক স্পেশাল ট্রেনে রবীন্দ্রানুরাগীর দল এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা একযোগে কবিকে সংবর্ধনা দেওয়ার জন্য এসে পৌঁছোলেন। এই উপলক্ষে সেদিন স্টেশন থেকে আশ্রম পর্যন্ত পথের দু-ধারে ও আশ্রম-প্রবেশমুখে যেভাবে মাঙ্গল্যদ্রব্য সমাবেশ করা হয়েছিল এবং সাজানো হয়েছিল আম্রকুঞ্জ, আয়োজন হয়েছিল অতিথি বরণের, সে পরিকল্পনা রচনায় ক্ষিতিমোহনের যে মুখ্যভূমিকা ছিল সে কথা নিশ্চিত। ছাত্র-শিক্ষকদের সমবেত চেষ্টায় বিশুদ্ধ বৈদিক প্রথায় সমগ্র আনন্দানুষ্ঠানটির আবহ রচিত হয়েছিল।* অতিথিবৃন্দকে অভ্যর্থনা জানিয়ে ক্ষিতিমোহন বেদমন্ত্র আবৃত্তি করলেন, ছাত্রদল সহ দিনেন্দ্রনাথ গান গাইলেন, শুরু হল সভার কাজ।

প্রথমে ধারণা হয়েছিল এই সংবর্ধনানুষ্ঠানের পরেই মায়ের অসুস্থতাব কারণে ক্ষিতিমোহনকে হয়তো সোনারঙ্গো চলে যেতে হয়েছিল। তাঁর মায়ের মৃত্যুর তারিখ ২৮ নভেম্বর ১৯১৩। নিজের মায়ের মৃত্যুতে অ্যান্ডরুজ তাঁকে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে যে চিঠি লিখেছিলেন, সেটি আমরা আগেই দেখেছি। তা থেকে জানা যায় ক্ষিতিমোহনের মাতৃবিয়োগে শান্তিনিকতনে মন্দির হয়েছিল। কিন্তু তিনি যে মায়ের মৃত্যুসংবাদ

---

* রবীন্দ্র-সংবর্ধনা উপলক্ষে আগত অধিকাংশ মানুষই হেঁটে আশ্রমে গিয়েছিলেন, প্রায় পাঁচশো লোকের জন্য গাড়ির ব্যবস্থা করা সম্ভব ছিল না। তাঁদের পুরোভাগে 'আমাদের শান্তিনিকেতন' গাইতে গাইতে চলেছিল আশ্রম বালকরা। পথের দু-পাশে বাঁশের উপরে সারি দিয়ে সাজানো হয়েচিল আম্রপল্লব, মালা, পদ্মফুলের পাপড়ি, কড়ি, ধানের শিষ, তামার মুদ্রা ইত্যাদি। আশ্রমের প্রবেশপথে লতাপাতা দিয়ে সাজানো তোরণ, ঘন ঘন শঙ্খধ্বনির মধ্যে অভ্যাগতদের অভ্যর্থনা করলেন অজিতকুমার ক্ষিতিমোহন রথীন্দ্রনাথ অ্যান্ডরুজ প্রভৃতি, চন্দনের ফোঁটা দেওয়া হল সবার কপালে। ঢোকবাব মুখে বাঁদিকে মাটির বেদি অর্ঘ্য বস্ত্র দীপ দর্পণ কাজল শঙ্খ প্রভৃতি মাঙ্গল্যদ্রব্যে সুসজ্জিত। ধূপ-ধূনা-পুষ্প-চন্দনের সুবাস বাতাসে ভাসছে। আম্রকুঞ্জে অনুষ্ঠানের আয়োজন। সেখানে চারপাশে সকলের বসবার জন্য প্রশস্ত ব্যবস্থা মাঝখানে বৈদিক বেদির মতো বিচিত্র নকশাকাটা একটি চতুষ্কোণ, নিকানো মাটিতে ফুল-চন্দন-ধূপ-দীপের অর্ঘ্য। কবির বসবার আসন পদ্মপাতায় ঢাকা। দ্র. রবিজীবনী, খণ্ড ৬১, পৃ. ৪৪৮, প্রশান্তকুমার পাল। বিশ্বপথিক রবীন্দ্রনাথ ৬১। কালিদাস নাগ।

শান্তিনিকেতনেই পেয়েছিলেন তা জানা গেল রবীন্দ্রনাথকে লেখা অ্যান্ডরুজের একটা চিঠি থেকে। চিঠিটা সদ্য মাতৃহীন অ্যান্ডরুজ লিখেছিলেন তাঁর মায়ের জন্মদিনের পরদিন। 'কালকের দিনটিতে আপনার সঙ্গ পাবার আকাঙ্ক্ষা মনে এসেছিল। ক্ষিতিমোহনের মায়ের মৃত্যুর পর সেই সন্ধ্যায় আপনি তাকে যে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন, বিয়োগব্যথার মাঝে অপূর্ব সেই আনন্দসন্ধ্যা— তার স্মৃতি কোনোদিন আমার মন থেকে মুছে যায় নি। গত জানুয়ারিতে আমার অন্তরের সেই সংগ্রামের ক্ষণে তার শক্তিতেই যুঝেছিলাম। গতকাল আমার সেদিনের কথা নতুন করে আবার স্মরণে এল।' —লিখেছিলেন অ্যান্ডরুজ। তিনি লিখেছিলেন :

> ক্ষিতিমোহনের যে চিঠিখানি আপনাকে দেখিয়েছিলাম সেখানি বার বার করে কাল পড়েছি। তিনি লিখেছিলেন, "আপনার মায়ের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে মনে হল আবার আমি সেই অন্ধকার বারান্দায় গুরুদেবের পাশে ভারাক্রান্ত মন নিয়ে বসেছি। আধ্যাত্মিক শান্তি ও প্রেমে বাতাস ভরপুর—আমার চিত্তও যেন জগজ্জননীর প্রসাদে শান্তিতে ভরে গিয়েছিল। বাগানের ফুল নিয়ে আমরা আরাধ্য দেবতার চরণে উৎসর্গ করি। তাঁর পায়ের স্পর্শ পেলে সে ফুল আর সামান্য ফুল থাকে না, তা হয় নির্মাল্য। সে ফুল তখন শুদ্ধভাবে গ্রহণ করতে হয়। ইহজগতে যিনি আমার মা ছিলেন, ঈশ্বর তাঁকে তুলে নিয়ে নিজের চরণে স্থান দিয়েছেন। তাই মা আমার আজ দেবতার নির্মাল্য।"

মাকে হারানোর বেদনায় ক্ষিতিমোহনের মন যা ভাবছিল, গুরুদেব বা বন্ধু অ্যান্ডরুজের সমবেদনায় যে-ভাবে আপনাকে ব্যক্ত করছিল তা জানা যায় বলে চিঠিটি মূল্যবান। অ্যান্ডরুজ তাঁর চিঠিতে পুনরপি যোগ করেছিলেন :

> ক্ষিতিমোহন আরো লিখেছেন, "তাঁকে আমি হারাতে পারি না। যদি আমার হৃদয় তেমন সুনির্মল না থাকে, তবে এবার ঈশ্বরের করুণাধারায় স্বচ্ছ হোক, সব বাধা ধুয়ে যাক। আমি আমার আত্মায় তাঁকে ফিরে পেতে চাই।"[১৯২]

কিছুদিন পরে পিয়র্সন লিখলেন—অ্যান্ডরুজের সঙ্গে তিনি তখন চলেছেন গান্ধীজির সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সহযোগী হতে দক্ষিণ আফ্রিকায়। ১৪ ডিসেম্বর ১৯১৩ পিয়র্সন লিখছেন ক্ষিতিমোহনকে : 'কলকাতা ছাড়বার পরে আপনাকে লিখব ভেবেছিলাম, কিন্তু আপনার ঠিকানা তো জানতাম না। আশা করছি ইতিমধ্যে আপনি ফিরে এসেছেন আশ্রমে।' প্রায় ছ-বছর আগে পিয়র্সনের পিতার মৃত্যু হয়, সেদিনের সেই অভিজ্ঞতার আলোয় তিনি দেখতে চাইছিলেন ক্ষিতিমোহনের মাতৃবিয়োগজনিত বিচ্ছেদবেদনা ও শূন্যতাবোধকে। মৃত্যু যে প্রিয়জনদের আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নেয় তাঁদের সে যে কী দেয় তা তো আর জানা যায় না, কিন্তু আমাদের জন্য যে দুঃখবোধ আর চোখের জল তার সাথি হয়ে আসে, তার দ্বারা আমাদের দৃষ্টি আরও পবিত্র ও খাঁটি হয়ে যায়, দৃষ্টির আবরণ সে ঘুচিয়ে দেয়—সেই চলে-যাওয়া মানুষটাকেও আরও স্পষ্ট করে জানি, আরও বেশি ভালোবাসি।[১৯৩]

বলতে গেলে এই সময়েই লেখা রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠি পাচ্ছি। ক্ষিতিমোহনের শিলাইদহ যাওয়ার কথা নিশ্চয় আগেই হয়ে থাকবে, রবীন্দ্রনাথ লিখছেন :

ওঁ

শিলাইদা

প্রীতিনমস্কারপূর্ব্বক নিবেদন

এখানে আপনার আসা কঠিন হইবে না। যদি দিনক্ষণের খবর যথাসময়ে পাই তবে কুষ্টিয়া হইতে আপনাকে গোরাই পার করিয়া একখানা টমটম রথে চড়াইয়া ঘণ্টাখানেকের মধ্যে শিলাইদহে উত্তীর্ণ করিয়া দিতে পারি। রথটা জীর্ণ এবং পথটাও কাঁচা—সুতরাং কিঞ্চিৎ দৈহিক আন্দোলনের আশঙ্কা আছে—তাহাতে যদি আপনার মন বিচলিত না হয় তবে এই উপায়ই প্রশস্ত। নতুবা কুষ্টিয়ার ঘাট হইতে এখানে বরাবর নৌকাযোগে আসিতে চার-পাঁচ ঘণ্টা লাগিতে পারে। আর যদি অশ্বারোহণে আপনার কোনো বাধা না থাকে তবে তাহার ব্যবস্থা করাও সহজ। ইতি ২৪ অগ্রহায়ণ ১৩২০

আপনাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

যদি আকস্মিক কোনো কারণে আমাকে ইতিপূর্ব্বেই কলিকাতায় যাইতে হয় তবে আপনি সংবাদ পাইবেন।[১৯৪]

রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণের সকৌতুক ভঙ্গিটুকু উপভোগ্য। অশ্বপৃষ্ঠেই হোক আর কাঁচা পথে জীর্ণ রথযোগেই হোক—ক্ষিতিমোহনেরও তো বিচলিত বোধ করবার নয়। তিনি তো বরাবর খালি পায়ে মেঠো পথে হাঁটু পর্যন্ত ধুলো মেখে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরে বেড়িয়েছেন। আর চম্বার জীবন তাঁকে ঘোড়ায় চড়ে পাহাড়ে রাস্তায় চলতে অভ্যস্ত করে তুলেছিল। কিন্তু এ-সব বাইরের বাধা কিছু না থাকলেও শিলাইদহে সেবারে যাওয়া হয়নি এই কারণে যে, যে আকস্মিক কারণের কথা রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, সেটাই সত্য হয়েছিল। তিনি কলকাতায় চলে আসায় ক্ষিতিমোহনের যাওয়ার সুযোগ হয়নি।[১৯৫]

তবে এগারোই মাঘের উৎসবে তিনি যথারীতি কলকাতায়। আদি ব্রাহ্মসমাজের সকালবেলার অনুষ্ঠানে এবারে তিনি স্বাধ্যায় করলেন, তার আগে রবীন্দ্রনাথ একক কণ্ঠে গাইলেন : 'ভোরের বেলায় কখন এসে'। ক্ষিতিমোহনের বেদপাঠের পরে কবি কিছু বললেন। সীতা দেবী লিখেছেন : 'এবার আচার্যের কাজ করিলেন রবীন্দ্রনাথ ও ক্ষিতিমোহনবাবু মিলিয়া।'[১৯৬] রবীন্দ্রনাথের ক্যাশবইতে ২৭ চৈত্র ১৩২০ তারিখের একটি হিসাবের বিবরণ অনুসারে ক্ষিতিমোহন সেনকে দেওয়ার জন্য ধুতিচাদর কেনা হয়েছিল।[১৯৭] কেন এই সম্মান জানানোর আয়োজন তার কোনো উল্লেখ নেই বটে, তবে 'আচার্য বরণ' বাবদ বরাবরই যে তিনি এইরকম ধুতিচাদর পেতেন এ কথা জানা যায় তাঁর কন্যার মুখে। সুতরাং এই প্রাপ্তি তারই সূত্রপাত বলে গণ্য করা চলে। সেবার মাঘোৎসবের দিন সন্ধ্যাবেলার উপাসনাতেও তিনি আদি ব্রাহ্মসমাজে একটি ভাষণ পাঠ করেন। 'উদ্বোধন' নামে সেটি প্রকাশিত হয়।[১৯৮]

এই সময় বন্ধুর অনুরোধে একটি বইয়ের ভূমিকা লিখতে হল তাঁকে, এ ধরনের কাজে এই প্রথম হাতেখড়ি বলতে পারা যায়। 'বুদ্ধের জীবন ও বাণী' বইটির নাম, তার লেখক শরৎকুমার রায় শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের শিক্ষক, ক্ষিতিমোহনের সহকর্মী। ভূমিকায় ক্ষিতিমোহন বলেছেন : 'গ্রন্থকার আমার বন্ধু ; একই কর্মে আমরা পরস্পরের সহযোগী' এবং প্রীতির শাসনে

তাঁকে এই ভূমিকা রচনার ভার নিতে হয়েছে। তাঁর এই ভূমিকায় ভূমিকা লেখার ভণিতা একটু দীর্ঘায়িত, বুদ্ধ খ্রিষ্ট মহম্মদ চৈতন্য প্রভৃতির মতো মহাপুরুষদের জন্মগ্রহণের তাৎপর্যব্যাখ্যা স্থান পেয়েছে প্রসঙ্গত। সবটা মিলিয়ে অনতিদীর্ঘ রচনাটি বেশ সুখপাঠ্য। লেখকের নিবেদন থেকে জানা যাচ্ছে : 'শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন ও ভক্তিভাজন পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় আমার রচিতগ্রন্থখানি আদ্যন্ত পাঠ ও সংশোধন করিয়া দিয়াছেন।' শরৎকুমার রায়ের ভূমিকার তারিখ ৯ বৈশাখ ১৩২১।

আগে কিছুদিন কিরণবালা রেণুকা-কঙ্করকে নিয়ে শান্তিনিকেতনে এসে ছিলেন, নিচু বাংলায় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পাশেই তাঁদের বাসা ছিল। তখনও কনিষ্ঠা দুই কন্যার জন্ম হয়নি। আশ্রমের নিয়ম অনুসারে ক্ষিতিমোহন সারাদিন ছাত্রদের সঙ্গে কাটাতেন। দুপুরবেলা ছাত্রাবাসে বসে ছেলেদের পড়াশোনা দেখতেন এবং তার ফাঁকে ফাঁকে নিজে পড়াশোনা করতেন। কিরণবালা ঘরসংসারের কাজকর্ম নিয়ে থাকতেন, বিকেল হলে আশ্রমবাসিনী মহিলাদের কারও কারও সঙ্গে বেড়িয়ে আসতেন কখনও খোয়াইয়ের দিকে, কখনও বা রেললাইনের ধারে। সন্ধ্যাবেলা বাড়ি ফিরে দু'টো লণ্ঠন জ্বালিয়ে বারান্দায় একটার উপরে আর-একটা রেখে অপেক্ষা করতেন। পরিকল্পনাটা ক্ষিতিমোহনেরই। দূর থেকে সেই আলোর সংকেত দেখে তিনি বাসায় ফিরতেন। নিয়মিত বাস না-করলেও সে সময় উৎসব-অনুষ্ঠানে যোগ দিতে কিরণবালা আসতেন।[১৯৯]

রবীন্দ্রনাথ লন্ডনে থাকতে সুরুলগ্রামে যে কুঠিবাড়ি কিনেছিলেন, তিনি ফেরবার পরে সেটি সংস্কার করে রথীন্দ্রনাথ-প্রতিমা দেবীর জন্য বাসোপযোগী করে তোলা হল। তখন ভাবা গিয়েছিল এইখানে রথীন্দ্রনাথের কর্মকেন্দ্র হবে। সে বাড়িতে গৃহপ্রবেশ অনুষ্ঠান হল ১ বৈশাখ ১৩২১। কিরণবালা সেন উপস্থিত ছিলেন সেই অনুষ্ঠানে, তাঁর লেখায় বেশ একটি বিবরণ আছে। তিনি লিখেছেন দক্ষিণের গোল বেদি সুন্দর করে ফুল দিয়ে সাজানো হয়েছিল, রথীন্দ্রনাথ-প্রতিমা দেবী নব বর-বধূর বেশে সেজে দুখানি আসনে বসেছিলেন, গুরুদেব ছিলেন পাশে। 'প্রথমে কয়েকটি গান হয়েছিল, তারপর মন্ত্রোচ্চারণ। আচার্যের আসনে ছিলেন আমার স্বামী। গুরুদেবের সস্নেহ দৃষ্টির মধ্যে ওঁরা স্বামীস্ত্রী তালা খুলে গৃহপ্রবেশ করলেন। অনুষ্ঠানের পর আমরা সকলে শান্তিনিকেতনে ফিরে এলাম। সেখানে থেকে গেলেন শুধু রথীন্দ্রনাথ আর প্রতিমা দেবী।'[২০০]

কয়েক মাস পরে স্ত্রীকে লেখা ক্ষিতিমোহনের একটা চিঠির একাংশ এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে। সেদিন ভাদ্র সংক্রান্তি, হয়তো ছুটি ছিল, জনা তিরিশ ছাত্র নিয়ে তাঁরা সুরুলে বনভোজন করতে এসেছিলেন, রবীন্দ্রনাথও ছিলেন সেই দলে। ক্ষিতিমোহন লিখছিলেন :

> প্রিয়তমে, এই মাত্র তোমার পত্র পাইলাম। পাইয়াই এই একটি গাছের ছায়ায় নিবিড় কোণে একটু কাগজ চাহিয়া চিন্তিয়া তোমার কাছে পত্র লিখিতে বসিলাম। আজ বনভোজনে সুরুলের জঙ্গলের মধ্যে আসিয়াছি। কবি আছেন, রথী, দীনু, তেজেশ, অন্নদাবাবু, Pearson সাহেব, ছাত্র প্রায় ৩০ জন বনভোজনে আসিয়াছি। খুব উৎসব পাশে গান হইতেছে—তারই মাঝে তোমাব

পত্রের উত্তর দিতে প্রবৃত্ত হইলাম। সুরলের বাগানের মধ্যে দেখিয়াছ যে একটি পুকুর আছে—তারই তীরে আমরা এখন বিহার করিতেছি। এই গৃহে এক সময় তোমার সঙ্গে আসিয়াছিলাম কিন্তু সেবার এত ভীড় ছিল যে এইসব স্থান দেখিতেই আসিতে পারি নাই। এখন সেই সব কথা মনে হইতেছে। তোমাদের ওখানে যেমন নিত্য বর্ষা হইতেছে—আমাদের এখানেও তেমনি প্রায়ই ঘন ঘটা করিয়া বৃষ্টি হইতেছে। সকল শালবনের মধ্যে বর্ষণেব পবনের ঘন গর্জনে, মালতীলতার কুঞ্জে ঘনগহন ছায়ায়, প্রান্তরের সর্পাকৃতি সব জলধারায়, শ্যামলক্ষেত্রের আন্দোলনে—মনটা কেন জানি সব দিতে উধাও হইয়া ঘুরিতে থাকে।[২০১]

কিরণবালা রাজশাহিতে বাবা-মার কাছে আছেন। এদিকে পুজোর ছুটি আসন্ন, ক্ষিতিমোহন আশায় আশায় লিখছেন : 'দেখা তো শীঘ্রই হইবে— আজ আর দুঃখের কথা বলিব না।' গৌহাটি যাওয়ার কথা আছে, ছাত্ররাও কেউ কেউ সঙ্গে যাবেন। যাত্রা-সম্পর্কিত খুঁটিনাটি দু-চারটি দরকারি কথাও সেরে নিচ্ছেন। ভাইপো বীরেন্দ্রমোহন একটি ছেলেকে নিয়ে আগেই রাজশাহি পৌঁছোবেন, লালগোলার স্টিমারে ৫ আশ্বিন তাঁরা পৌঁছোলে তাঁদের স্টিমারঘাট থেকে নিয়ে যাওয়ার জন্য কিরণবালা যেন কঙ্করকে কোনো লোক সঙ্গে দিয়ে পাঠান। রাজশাহির আবহাওয়া ভালো, স্বাস্থ্য ভালো থাকে—লিখেছিলেন কিরণবালা। সে কথা জেনে মনটা নিশ্চিন্ত, দু-একজন পরের ছেলে সঙ্গে থাকবে কিনা। আরও জানাচ্ছেন তিনি নিজে যাবেন তিন দিন পরে, পৌঁছোবেন ৮ আশ্বিন। কথার ভাবে বোধ হচ্ছে তিনি সোনারঙ্গা ঘুরে যাবেন রাজশাহিতে, হয়তো ছাত্ররাও কেউ কেউ সঙ্গে থাকবেন। কিরণবালা, বীরেন্দ্রমোহন, রেণুকাকে নিয়ে এবং দু-একজন ছাত্র সহ গৌহাটি যাওয়ার ব্যবস্থা আগে থেকে করা আছে বলেই বোধ হয় কিরণবালার অনুরোধের উত্তরে লিখছেন :

আমার পক্ষে আব বেশীদিন থাকা যদি সম্ভব হইত তবে কি আর একটু থাকিতাম না। তোমাদের বাড়ী যে আমার আপন বাড়ীর মত। আমার মা গিয়াছেন --এখন তোমার মার কাছেই তো আমার মাতৃস্নেহ পাইবার। এইখানে না থাকিব তো থাকিব কোথায়? কিন্তু সব ব্যবস্থা করিয়াছি, বদলানো [অসম্ভব][২০২]

এ চিঠির দিন পনেরো পরে ক্ষিতিমোহনকে লেখা রবীন্দ্রনাথের একটা চিঠি পাচ্ছি। পুজোর ছুটিব মধ্যে শান্তিনিকেতন থেকে লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। আগেও কোনো প্রসঙ্গে চিঠির দু-একটি পঙ্ক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে। এখানে সম্পূর্ণ চিঠিটি উদ্ধৃত করা গেল :

ওঁ

শান্তিনিকেতন

প্রীতিনমস্কারপূর্ব্বক নিবেদন .

আমার অন্তরের প্রীতি জানিবেন। আপনার প্রেম যে আমার কিরূপ পথ্য ও পাথেয়, তাহাও মনে রাখিবেন। আমার বিরহ মিলনের পালা চলিতেছে—এখন গান শেষ হইয়া গিয়া

একটা ভাল রকম বোঝাপড়া হইয়া গেলে নিষ্কৃতি পাই। মুখবন্ধ করিবার জন্য তাগিদ আসিতেছে। ইতি ১৫ই আশ্বিন ১৩২১

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর[২০৩]

এ বছরের গোড়া থেকেই লেখা শুরু হয়েছে 'বলাকা'-র কবিতাগুলি, সমান্তরালে চলেছে 'গীতালি' পর্বের গান। এ চিঠিতে সেই গান রচনার মেজাজটুকুর দিকেই ইঙ্গিত করতে চেয়েছেন মনে হয়, ভাদ্র-আশ্বিন জুড়ে গানেরই প্লাবন চলছিল। 'গীতালি' সংকলনের সবশেষ গানটি ৩ কার্তিক ১৩২১ রচিত, তখন কবি এলাহাবাদে। একই দিনে লিখলেন 'বলাকা'-র 'ছবি' কবিতা। গীতাখ্য তিন কাব্যের জগৎ তাঁকে দীর্ঘকাল বেঁধে রেখেছিল সুরের মায়াডোরে, কিন্তু 'গীতালি' পর্বের সৃষ্টিতে ক্রমশ পথে বেরোবার একটা ডাক যেন কবিকে 'আমি'-র বন্ধন থেকে মুক্তির দিকে নিয়ে যাচ্ছে। এবার 'মননে-অনুভবে, কল্পনায়-প্রতীকসৃজনে, ছন্দ ভাষা চিত্রকল্প -বৈভবে বলাকাকাব্য' এক যুগান্তরের আহ্বান নিয়ে এসেছে, সেই নবকাব্যলোকসৃষ্টির মুখবন্ধের কথাই বলছেন কবি। 'রবিজীবনী'-তে প্রশান্তকুমার পাল যে ৮ আশ্বিন তাঁর ড. দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্রকে লেখা ও ৪ অক্টোবর (১৭ আশ্বিন)অ্যান্ডরুজকে লেখা চিঠি উদ্ধৃত করেছেন সেগুলিও ক্ষিতিমোহনকে লেখা চিঠির সমানধর্মা। ১৫ আশ্বিন ক্ষিতিমোহনকে চিঠি লেখার পরদিন গানে কবিতায় মিলিয়ে রবীন্দ্রনাথের নতুন সৃষ্টির সংখ্যা নয়টি, তার মধ্যে 'আমার আর হবে না দেরী/আমি শুনেছি ওই বাজে তোমার ভেরি' বা 'তোমার দুয়ার খোলার ধ্বনি ওই গো বাজে হৃদয় মাঝে'-র মতো অনেক রচনাতেই অনায়াস স্পষ্টতায় আমাদের চোখে পড়ে যে কবি একটা মানসিক সংকটের যন্ত্রণা থেকে উত্তীর্ণ হয়ে মুক্তির পথ দেখতে পাচ্ছেন। মনে পড়ছে, আগেও কখনও কখনও ক্ষিতিমোহনকে লেখা চিঠিতে তিনি আপন সৃজন-নেপথ্যের দু-একটি ক্ষণের ইতিকথা অথবা পূর্বাভাস শুনিয়েছেন। একবার যেমন, সেটা ১৯০৯ সাল, বাংলা সন ১৩১৬। রবীন্দ্রনাথ ২২ আশ্বিন শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতায় ফিরে দু-দিন পরে শিলাইদহ যান বিশেষ কাজে। বৈষয়িক ব্যস্ততার মধ্যে দিন কাটছিল এ সময়।[২০৪] তারই মধ্যে একটি তারিখহীন চিঠিতে ক্ষিতিমোহনকে লেখেন :

যখন বোলপুর ছাড়িয়া আসিতেছিলাম তখন জানিতাম না কোথায় আসিতেছি। শারদলক্ষ্মী আমাকে ফাঁকি দিয়া এই নদীর নির্জ্জন তীরে টানিয়া আনিয়াছেন—আমাকে বঞ্চিত করেন নাই। যে গান লিখিয়াছি পাঠাইয়া দিই—

যে সদ্যরচিত গান এ চিঠিতে লিখে পাঠিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ, সেটি আশ্বিনের শারদশ্রীমন্ডিত অন্তরের আনন্দানুভব মাখা —'গায়ে আমার পুলক লাগে', রচনাকাল ২৫ আশ্বিন ১৩১৬।[২০৫] পরের বছর প্রায় সমসময়ে লেখা চিঠিতে 'রাজা' নাটক লিখতে শুরু করার আভাস আছে। এ চিঠিও লেখা হয়েছে শিলাইদহ থেকে।

> আমি এখানে দিগন্তপ্রসারিত সবুজের মধ্যে দুই চক্ষু ডুবাইয়া বসিয়া আছি। একটা ছোট নাটক লেখাতেও হাত দিয়াছি। মনে করিয়াছিলাম শিশিরোৎসব লিখিব—সময় এবং আমার বয়স অনুসারে সেইটেই সঙ্গত হইত কিন্তু বিধাতা পরিহাস করিয়া আমাকে বসন্তোৎসব লেখাইতেছেন— কেমন করিয়া এরূপ অপাত্রে অকালবসন্তের প্রাদুর্ভাব হইল তাহা বলিতে পারি না— ইহার মধ্যে ইন্দ্রের সহিত অন্য কোনো একজন দেবতার চক্রান্ত আছে এমন আশঙ্কা করিবেন না— নারদের কৌতুক থাকিতে পারে।[২০৬]

নাটক রচনায় নারদের কৌতুক থাকুক বা না-থাকুক, এ চিঠিতে কবির কৌতুক যে অনেকখানি মিশেছিল সে কথা বলবার অপেক্ষা রাখে না। সেইসঙ্গে কবির বিধাতাও বোধ করি কৌতুকের হাসি হাসছিলেন—কতবার যে ফিরে ফিরে কবিকে ঋতু-উৎসবের অর্ঘ্য সাজাতে হবে, বরণ করতে হবে ঋতুরাজ বসন্তকে, প্রবীণতার নির্মোক যে তাঁর খসে যাবে বারবার, সে তো এখন তাঁর কিছুই জানা নয়। 'শান্তিনিকেতনের অধ্যাপকেরা আমাকে একটা নূতন নাটক লেখবার জন্যে ধরেছেন'—জানা যাচ্ছে এই অনুরোধ রাখতেই একটু একটু করে সৃজিত হয়ে উঠছে 'রাজা' নাটক এবং এরই প্রেক্ষিতে ২২ কার্তিক ১৩১৭ ক্ষিতিমোহনকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি। এর তিন দিন পরে শেষ হয় 'রাজা'-র প্রাথমিক খসড়া, ২৫ কার্তিক ১৩১৭।[২০৭] আর-একখানি তারিখহীন চিঠি আছে। সম্ভবত কোনো নাটক রচনার সম্ভাবনা নিয়ে কবি কথা বলেছিলেন এবং পরে ছুটিতে লেখা ক্ষিতিমোহনের চিঠিতে তার অনুসন্ধান ছিল। উত্তরে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সৃষ্টির নেপথ্যভূমি নিয়ে দু-একটি কথা বললেন। নাটকটা 'রাজা' হতেও পারে, তবে নিশ্চিত করে বলা যায় না।

> বীজ কিছুকাল মাটিতে পুঁতে রেখে দিতে হয় তবে অঙ্কুর বেরোয়। আমার নাটকের বীজ এখন মনের তলাকার অন্ধকারে পোঁতা আছে—অঙ্কুর বেরলেই তার সঙ্গে লাগা যাবে—তার জন্যে উদ্বিগ্ন হবেন না।[২০৮]

নতুনবাড়ি

মোটামুটি ধারণা করা যাচ্ছে গুরুপল্লির বাড়িতে বাস করতে আরম্ভ করার আগে পর্যন্ত ক্ষিতিমোহন সপরিবারে নতুনবাড়িতে থেকেছেন। নিশ্চিত করে বলা যাবে না, কবে থেকে, তবে অনুমান করি ১৯১৫ সালের কোনো সময় থেকে। কিরণবালা লিখেছেন :

> স্থায়ীভাবে যখন এখানে বাস করতে এলাম তখন গুরুদেবের দেহলীর পাশে নতুন বাড়িতে এসে উঠলাম। ...গুরুদেব কখনও কখনও ঘরে তৈরি মিষ্টি রেকাবীতে সাজিয়ে নিজের হাতে নিয়ে এসে আমাদের সন্তানদের দিতেন। এই নতুন বাড়িতে থাকাকালীন তিনি "এই তো ভালো লেগেছিল" গানটি রচনা করেন। গানটি গেয়ে শোনাবার সময় আমায় হেসে বলেছিলেন—'তোমার অমিতা আমার বাড়ির সামনে কাঁকড়ের উপর পা ছড়িয়ে বসে একটি কৌটাতে কাঁকড় ভরছে আর নিজের মাথায় ঢালছে। তাই দেখেই আমি লিখলাম—"ছোটো মেয়ে ধুলায় বসে খেলার সাজি আপনি সাজায়"। আমার ছোটো মেয়ে অমিতার বয়স তখন আড়াই।[২০৯]

'এই তো ভালো লেগেছিল' গানের রচনাকাল ২৬ চৈত্র ১৩২২, অমিতা সেনের জন্মতারিখ ১ শ্রাবণ ১৩১৯ (১৯১২)। তাই মনে হয় তাঁরা বোধ হয় নতুন বাড়িতে সংসার পাতেন ১৯১৫ সালে বা তার কাছাকাছি সময়ে। অমিতা সেনের স্মৃতিকথা থেকে নতুন বাড়ির আর-একটু খবর পাই। সেই সময়কার ক্ষিতিমোহন-পরিবারের ছবিটাও একটু স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই বাড়িতেই প্রথমবার এসে ছিলেন গান্ধীজি-কস্তুরবা, অ্যান্ডরুজও এসে প্রথমে এখানেই ছিলেন। এ-সব কথা বলে অমিতা সেন লিখেছেন :

> আমাদের শৈশব কেটেছে দেহলীর পাশে লতা-ঘেরা বাড়িটিতে, যার নাম 'নতুন বাড়ি'। ...এই বাড়িটিতে আমরা চার পাঁচটি পরিবার একসঙ্গে বাস করতাম। এক একটি পরিবারে ছিল দুটি করে শোবার ঘর, পিছনে উঠোন পেরিয়ে সারবাঁধা কটি রান্নাঘর। যার যার রান্নাঘরে ভিন্ন ভাবে রান্না হলেও খাবার সময়ে বারান্দায় সকলের রান্না একসঙ্গে মিলিয়ে মিশিয়ে খাওয়া হত। শোবার ঘরের সামনে টানা বারান্দার কোনো ভাগাভাগির প্রশ্ন ছিল না। এই বারান্দাটি আমাদের সকলের বসবার পড়বার সব কিছু প্রয়োজন মেটাবার জন্য ব্যবহৃত হত।[২১০]

দেহলি আর নতুন বাড়ি পাশাপাশি ছিল বলে রবীন্দ্রনাথকে দেখা যেত তাঁর প্রতিদিনের জীবনযাত্রার মধ্যেই।

> ভোরে অন্ধকার থাকতে দেহলীর দোতলায় তিনি স্নান করতেন। স্নানের জলের ছপছপ শব্দের সঙ্গে তাঁর অপূর্ব কণ্ঠে 'শান্তং শিবম অদ্বৈতম্' মন্ত্রটি শুনতে পেতাম। ভোরের শান্ত পরিবেশে তাঁর মন্ত্র উচ্চারণের গম্ভীর সুরে আশ্রম ধ্বনিত হয়ে উঠত।

মা কিরণবালা সেনের লেখা থেকে এ উদ্ধৃতি দিয়েছেন অমিতা সেন, নিজেও স্মরণ করেছেন :

> দিনে রাত্রে যে কোনো সময়েই তিনি আমাদের সংসারযাত্রার মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছেন। মায়ের কাছে শুনেছি এমনও অনেকদিন হয়েছে, রাত্রে আমরা শিশুরা ঘুমিয়ে পড়েছি, ঘরজোড়া তক্তপোষে মশারী ফেলা, তিনি এসে দাঁড়িয়েছেন। বসবেন কোথায়? ব্যাকুল হাতে মায়েরা বিছানার একটি পাশ গুটিয়ে তাঁকে বসতে দিয়েছেন। বিছানা-গোটানো তক্তপোষের একধারে বসে রবীন্দ্রনাথ বাবা-মায়ের সঙ্গে কথাবার্তা বলে চলেছেন। উভয়পক্ষের কোনোদিকেই কোনো অস্বস্তির ভাব নেই। এতই ঘরের মানুষ ছিলেন তিনি।[২১১]

শান্তিনিকেতনে আসবার পরে ক্ষিতিমোহন-কিরণবালার জ্যেষ্ঠা কন্যা রেণুকা এখানকার বিদ্যালয়ে ভরতি হলেন। তাঁদের অন্য ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা এখানেই শুরু। তিন বছরের অমিতা তাঁর এগারো বছরের দিদির শাড়ির আঁচল ধরে ক্লাসে গিয়ে চুপ করে বসে থাকতেন। পিসতুতো দিদি শোভনাও তখন এখানে পড়তে শুরু করেছিলেন। শান্তিনিকেতনে সংসার পাতবার অনেক আগেই ক্ষিতিমোহন তাঁর দাদার দুই ছেলেকে এখানে নিয়ে এসেছিলেন পড়াশোনা করার জন্য। সেই অবধি তাঁদের জীবনও ক্ষিতিমোহনের সন্তানদের জীবনের মতোই শান্তিনিকেতনের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে যায়।[২১২]

কিরণবালা সেন লিখেছেন যে বুধবারের মন্দিরের পরে দেহলির দোতলায় জানালার ধারে বসে সেদিনের মন্দিরে যা বলেছেন অ্যান্ডরুজকে তা ইংরেজিতে বলতেন রবীন্দ্রনাথ,

নতুনবাড়ি থেকে সে কথা স্পষ্টই শোনা যেত। ক্ষিতিমোহনের লেখাতেও আছে তখন তাঁর অফুরন্ত সুযোগ হত রবীন্দ্রনাথকে প্রাত্যহিকতার মধ্যে দেখবার ও তাঁর কথাবার্তা শোনবার। সকাল-সন্ধ্যায় যখন-তখন যে-খুশি অবাধে দেখা করতেন, অনেক সময় শহর থেকে ছুটির দিনে অতিথিরা আসতেন সময় হাতে নিয়ে, তাঁদের কথা ফুরোতে চাইত না। গ্রামের মানুষ সামনে দিয়ে আনাগোনার পথে দেহলির বারান্দায় বিশ্রাম নিত, তাদের সঙ্গেও কথা হত কবির। দোতলার ছোটো ঘরে থাকতেন রবীন্দ্রনাথ, বিকেলবেলা পাশের ছাদে এসে জড়ো হতেন শিক্ষক ও কর্মীরা। প্রয়োজনীয় কথাও হত, আবার সাহিত্যপাঠসভাও বেশ জমত। কখনও ছেলেরাও সেখানে গুরুদেবকে নিজেদের মধ্যে পাওয়ার জন্য সাহিত্যসভা আহ্বান করত। অনেক রাতে ক্ষিতিমোহন দেখতে পেতেন সেই ছাদে রবীন্দ্রনাথ একা একা পায়চারি করছেন, বা কখনও নিশ্চল হয়ে বসে আছেন বা গান গাইছেন। সেই রাত্রির নিঃসঙ্গ প্রহরে গান রচনাও চলত। সেই সদ্যরচিত গানের সুর এসে পৌঁছোত নতুন বাড়ির এই উৎকর্ণ শ্রোতার কাছে। নিজের খেয়ালে সে গানের বাণী রচনার তারিখ সহ লিখে রাখতেন। তাঁর নিজেরও রাত্রির সেই শান্ত অবকাশেই কেবল সময় হত এমন করে সৃজ্যমান গানটি অনুসরণের। অন্ধকারে লিখতে গিয়ে গানের বাণীতে অসম্পূর্ণতা থেকে যেত, পরদিন সকালে মিলিয়ে নিতেন। গীতিকারও জানতেন এ খেয়ালের কথা, কখনও বা খাতাখানা চেয়েও নিতেন। এই প্রসঙ্গে ক্ষিতিমোহন তাঁকে লেখা একটি তারিখহীন চিঠির শেষ পঙ্ক্তি উদ্ধৃত করেছেন : 'এখানকার সুরের কিছু আমেজ মাঠ পার হয়ে ওদিকে পৌঁচচ্ছে ত?'[২১৩]

গান্ধীজির আগমন

এই শান্তিনিকেতনেই ক্ষিতিমোহনের প্রথম আলাপ গান্ধীজির সঙ্গে। ১৯১৪ সালের নভেম্বর মাসে গান্ধীজির ফিনিক্স বিদ্যালযের ছাত্র-শিক্ষকরা কিছুদিনের জন্য এখানে থাকতে এসেছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ফিরে গান্ধীজি ও কস্তুরবা এলেন ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯১৫। রবীন্দ্রনাথ আশ্রমে তখন ছিলেন না। তাঁদের জন্য অনাড়ম্বর পরিবেশে যে অভ্যর্থনার আয়োজন হয়েছিল, তাতে আন্তরিক প্রীতির স্পর্শ অনুভব করেছিলেন গান্ধীজি, সে কথা তিনি আত্মকথায় লিখেছেন।[২১৪]

সুধাকান্ত রায়চৌধুরীব আশ্রমে গান্ধী অভ্যর্থনার বিস্তৃত বিবরণটি তৎসমসাময়িক। তাঁরা প্রায় এক-মাস আগে থেকে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করেছিলেন এবং 'যাঁহার অদম্য শক্তি সমগ্র আফ্রিকা-প্রবাসী ভারতবাসীদিগকে অন্যায়ের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইবার জন্য প্রস্তুত করিল' সস্ত্রীক তাঁকে আশ্রমে ভারতীয় রীত্যনুসারে সুচারুরূপে বরণ করতে প্রস্তুত হয়েছিলেন। 'এই অভ্যর্থনার নায়কতার ভার, আশ্রমের সুযোগ্য অধ্যাপক, শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় গ্রহণ করিয়াছিলেন।' ১৭ ফেব্রুযারি সায়াহ্নে গান্ধীজি সপত্নী এসে পৌঁছোলে অভ্যর্থনার্থে প্রস্তুত বিভিন্ন কুট্টিমে পৃথক পৃথক মাঙ্গল্য উপচারে

মহিলারা তাঁদের বরণ করলেন। প্রতি তোরণে অতিথিদ্বয়ের প্রবেশকালে অধ্যাপক ক্ষিতিমোহন সেন বেদমন্ত্র পাঠ করে বাংলা অনুবাদ করেন, দুই মহারাষ্ট্রীয় অধ্যাপক যোগ দেন তাঁর সঙ্গো এবং গুজরাটি অনুবাদ উচ্চারণ করেন।[২১৫] এর পর দিনেন্দ্রনাথ দুই ছাত্রকে নিয়ে গান গাইলেন। প্রমদারঞ্জন ঘোষের স্মৃতিকথায় এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের বর্ণনা পড়েও আশ্রমে রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশ বছরের জন্মদিনের সভার পরিকল্পনা মনে পড়ে যায়। মুখ্যত ক্ষিতিমোহনের চেষ্টায় ইতিমধ্যে শান্তিনিকেতনে প্রাচীন ভারতীয় রীতিতে সভা-অনুষ্ঠান পরিচালন-ব্যবস্থার প্রচলন হয়েছিল। গান্ধী-সংবর্ধনা প্রসঙ্গো প্রমদারঞ্জন ঘোষ লিখেছেন :

> মনে পড়ে ১৯১৪ সালে গান্ধীজী যখন প্রথম সস্ত্রীক আশ্রমে আসেন তখন স্বর্গীয় শ্রদ্ধেয় ক্ষিতিমোহন সেন মশাইয়েব ব্যবস্থাপনায় আশ্রমের প্রবেশ দ্বার থেকে আমবাগানের সভাস্থল পর্যন্ত সমগ্র স্থানটির বিভিন্ন কেন্দ্রে আলপনা দেওয়া হয় ও মাঙ্গাল্য দ্রব্যাদি সজ্জিত করা হয়। প্রতি কেন্দ্রে যথাযুক্ত একটি সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানও হয়। আমবাগানে যে সভা হয় তা আলপনা ও মাঙ্গাল্যদ্রব্যের সমাবেশে শোভনরূপ ধারণ করেছিল। সমস্ত অনুষ্ঠানটি গান্ধীজিকে বিশেষ তৃপ্তি দেয়। সেদিনকার সম্বর্ধনার উত্তরে তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে গান্ধীজী সম্বর্ধনার ব্যবস্থাকে 'so successful' বলে উল্লেখ করেছিলেন।[২১৬]

গান্ধীজির সঙ্গো ক্ষিতিমোহনের যোগাযোগের এই সূত্রপাত। তখনও গান্ধীজি স্বল্পখ্যাত দূরের মানুষ। কিছুদিনের মধ্যে সারা দেশের জনমানসে অধিষ্ঠিত হলেন, অবিসংবাদিত নেতা হয়ে উঠলেন আসমুদ্রহিমাচল ভারতবর্ষের। ক্ষিতিমোহনও ব্যতিক্রম নন, তাঁরও দেশ-সম্পর্কিত আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গো অচিরেই জড়িয়ে গেল গান্ধীজির নাম। পরের যুগে শান্তিনিকেতনের কত সভায় তাঁর মনে পড়েছে গান্ধীজির সেই প্রথম শান্তিনিকেতনে আগমন প্রসঙ্গা। ১৯৪৭ সালে ২ অক্টোবর গান্ধীজয়ন্তীতে তিনি বলেছিলেন কী পরিস্থিতিতে গান্ধীজি প্রথম এখানে এলেন। সে সময় যদিও গুরুদেব সংবাদপত্রের মাধ্যমে দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীজির কাজ ও আন্দোলন সম্পর্কে অবহিত হয়ে উঠেছেন এবং আগ্রহ বোধ করছেন, তবু এই দুই মহাপ্রাণ যে কাছাকাছি এলেন তার পিছনে দীনবন্ধু অ্যান্ডরুজের ভূমিকাটি বড়ো সামান্য ছিল না। ভারতে চলে আসবার সময় গান্ধীজি অসুবিধায় পড়েছিলেন ফিনিক্স বিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষকদের নিয়ে। তাঁর উদ্‌বেগের কথা জেনে শান্তিনিকেতন আহ্বান করে নিল তাঁদের, 'বাগান বাড়ি'-তে তাঁদের থাকবার ব্যবস্থা হল। সেদিন ভাষণ দিতে দিতে ক্ষিতিমোহনের মনে পড়ছিল প্রথমবার এসে এই নতুন বাড়িতেই বসে গান্ধীজি গুরুদেবের একটা গান শুনে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন, সে গান 'অন্তর মম বিকশিত কর'। তাঁর অনুরোধে গানটা দেবনাগরী হরফে লিখে দেওয়া হল তাঁকে। ক্ষিতিমোহনের মনে হত গান্ধীজির উর্বর মানসভূমিতে অন্তর্বিকাশপ্রার্থনার এই গান একটি বীজের মতো উপ্ত হয়েছিল, যা সময়ে ফলবান বৃক্ষ হয়ে উঠেছে। গান্ধীজির রাজনৈতিক জীবনে প্রায়ই পরিবর্তন ঘটে, এই বিশিষ্টতা তাঁর ভিতরকার আধ্যাত্মিক ক্রমবিবর্তনেরই অঙ্গা, ক্ষিতিমোহন বলতেন।[২১৭]

ঘরে-বাইরে নানা কাজে

সে বছর ইস্টারের সময় রবীন্দ্রনাথের নতুন-লেখা নাটক অভিনয়ের তোড়জোড়, ৪ এপ্রিল, ১৯১৫ অভিনয় হল 'ফাল্গুনী'। ক্ষিতিমোহন চন্দ্রহাস।[২১৮] তিনি নিজে তো এই-সব নাটক-অভিনয়ের অভিজ্ঞতার কথা কিছু বলেননি, ব্যতিক্রম একমাত্র 'শারদোৎসব'। সেই প্রথম-করা নাটকটার প্রসঙ্গ এসেছে তাঁর লেখায়। সেখানেও তিনি শুধু বলেন কবি কি-রকম ভুল বুঝে তাঁকে ঠাকুরদার মতো সংগীতপ্রধান চরিত্রের পার্ট দিতে চেয়েছিলেন, সেই কথাটা। এই নতুন নাটক মহড়ার এক টুকরো ছবি পাচ্ছি অমিতা সেনের গ্রন্থে। অভিনয়ের মহড়া চলত 'শান্তিনিকেতন' বাড়ির দোতলায়। একদিন দূর থেকে ভেসে-আসা গানের সুরের টানে কিরণবালাদের মতো সেকালের কয়েকজন তরুণী আশ্রমবধূ চুপি চুপি সে বাড়ির দোতলায় উঠে গিয়ে অন্ধকারে বারান্দার কোণে দাঁড়িয়ে মুগ্ধবিস্ময়ে দেখেছিলেন ঘরের মধ্যে 'চলি গো চলি গো' গানটা গাইতে গাইতে নৃত্যছন্দে পা ফেলে ফেলে সার বেঁধে চলেছেন দিনেন্দ্রনাথ ক্ষিতিমোহন কালীমোহন সন্তোষ মজুমদার সন্তোষ মিত্র অসিত হালদার প্রমুখ কয়েকজন—'ফাল্গুনী'-র ঘরছাড়া নবযৌবনের দল, রবীন্দ্রনাথ আছেন পুরোভাগে। আবার দেখেছিলেন অন্ধ বাউলের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ একতারা বাজিয়ে 'ধীরে বন্ধু গো' গাইতে গাইতে সেই নবযৌবনের দলকে নিয়ে চলেছেন পথ দেখিয়ে। 'এ কাহিনী রূপকথার মতো আমরা শুনতাম মায়েদের মুখে'—লিখেছেন অমিতা সেন। সেদিনের স্মৃতিচিত্র আঁকতে গিয়ে ক্ষিতিমোহন-কন্যা ভারী মধুর ভঙ্গিতে বলেছেন :

> মায়ের মুখে এই গল্প শুনে মনে মনে সংকল্প করেছিলাম, শান্তিনিকেতনের নৃত্যের কথা যদি কখনও লিখি তবে তা শুরু করব গুরুগম্ভীর রাশভারী ও রবীন্দ্রনাথের শাস্ত্রভাণ্ডারী ক্ষিতিমোহনের নৃত্যের অবিশ্বাস্য কাহিনী দিয়ে।[২১৯]

পরে যখন বাঁকুড়া-দুর্ভিক্ষের সাহায্যকল্পে 'ফাল্গুনী' কলকাতায় জোড়াসাঁকো-বাড়িতে অভিনীত হল, তখনও ক্ষিতিমোহনের একই ভূমিকা ছিল।[২২০] বাস্তবজীবনে অবশ্য তাঁর ভূমিকা একটাই নয়, জীবনের দাবি অনেক, অনেক দাবি রবীন্দ্রনাথের।

আমরা দেখেছি, ক্ষিতিমোহন তরুণ বয়স থেকেই ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে যোগ দিতে কলকাতায় আসতেন। শান্তিনিকেতনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরেও সেখান থেকে এগারোই মাঘের উপাসনায় যোগ দেওয়ার অভ্যাস তাঁর বদলায়নি। পাঠকের হয়তো মনে আছে একবার সুপ্রবীণ আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রীর মাঘোৎসবের দিনের প্রভাতি উপাসনায় উদ্‌বুদ্ধ হয়ে তাঁর মনে হয়েছিল ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়ে 'পাবনী ব্রহ্মবাণী' প্রচারে যদি আত্মোৎসর্গ করতে পারতেন তা-হলে জীবন ধন্য হত। যে ইচ্ছা সেদিন পূর্ণ হওয়া অসম্ভব মনে হয়েছিল, আজ সেই ইচ্ছা ফলবতী হয়ে উঠতে শুরু করেছে। ১৯১৪ সালে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে আদি ব্রাহ্মসমাজের মাঘোৎসবে প্রভাত-অনুষ্ঠানে বেদপাঠ করতে আহ্বান জানালেন, আমরা দেখেছি। সেই শুরু, তারপর তিনি তাঁকে ক্রমশ আদি ব্রাহ্মসমাজে ওইদিনে আচার্যের দায়িত্ব পালনের ভার দিলেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজও তাঁকে আচার্যপদে বরণ করে নিলেন।

আদি ব্রাহ্মসমাজের উপাসনাবেদিতে কেবলমাত্র ব্রাহ্মণ আচার্যই বরাবর উপবেশনের অধিকার লাভ করতেন। আপন যোগ্যতাগুণে অব্রাহ্মণও এই আসনে বসবেন, এই ইচ্ছা রবীন্দ্রনাথের অনেকদিনের। 'জীবনস্মৃতি'-তে তিনি লিখেছেন যে আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক হয়ে তিনি পিতাকে এই ইচ্ছা জানালে তিনি বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ পারলে যেন এই পুরোনো নিয়মের প্রতিকার করেন। কিন্তু আদেশ পাওয়ার পরে রবীন্দ্রনাথ দেখলেন এ নিয়মের শিকড় এত গভীরে নেমেছে যে প্রতিবিধানের সাধ্য তাঁর নেই। তবুও চেষ্টাটা তাঁর ভিতর থেকে মরে যায়নি, যদিও সফল হতে সময় লেগেছিল অনেকদিন। ৪ জানুয়ারি ১৯১২ কৃষ্ণকুমার মিত্র আদি ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে সামাজিক উপাসনায় আচার্যের কাজ করেন। এর দ্বারা গোঁড়া ব্রাহ্মদের বিরাগভাজন হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সমকালে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় সমালোচকদের চিঠির উত্তরে একাধিকবার 'আদি ব্রাহ্মসমাজের বেদি' শিরোনামে তিনি বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে ড. প্রশান্তকুমার পাল 'রবিজীবনী'-তে বিস্তৃত তথ্য দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন কেশবচন্দ্র সেনের সমাজ ত্যাগের পরে ব্রাহ্মণ ব্যতীত কেউ সমাজের বেদিতে বসে উপাসনার অধিকার পাননি এবং রবীন্দ্রনাথ ক্রমিক পরিবর্তনের পক্ষপাতী ছিলেন বলে কৃষ্ণকুমার মিত্রকে যখন তিনি আহ্বান করে আনলেন সাপ্তাহিক বুধবারের নিয়মিত উপাসনায় তাঁকে না ডেকে প্রথম স্তরে তাঁর জন্য বৃহস্পতিবার বিশেষ উপাসনার আয়োজন করেছিলেন। আদি ব্রাহ্মসমাজে এ ঘটনা বিপ্লবাত্মক, কারণ এমনকী সমাজের সভাপতি রাজনারায়ণ বসুর মতো পরমশ্রদ্ধাভাজন প্রাজ্ঞ মানুষও কোনোদিন সমাজবেদিতে বসেননি।[২২১]

কৃষ্ণকুমার মিত্রের আচার্য-আসন গ্রহণের প্রতিক্রিয়া প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ কদিন পরেই নেপালচন্দ্র রায়কে লিখেছিলেন :

> আদি ব্রাহ্মসমাজে যিনি নিযুক্ত আচার্য্য ছিলেন তিনি আমাদের গতিক দেখিয়া পদত্যাগ করিয়াছেন। আপনারাও ইহার কার্য্যভার গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত। এক্ষণে কি করিব তাহা ভাবিয়া পাইতেছি না।[২২২]

'আপনারা' বহুবচন কি এই ইঙ্গিত দেয় যে সেইসময় বা তার কিছুদিন আগে থেকেই রবীন্দ্রনাথ নেপালচন্দ্র রায় প্রমুখ শান্তিনিকেতনের কোনো কোনো শিক্ষককে সমাজ-মন্দিরের আচার্যের বেদিগ্রহণে আহ্বান জানাবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছিলেন এবং ক্ষিতিমোহন ছিলেন তার মধ্যে? এ প্রস্তাবে হয়তো প্রথম প্রতিক্রিয়ায় তিনিও কুণ্ঠা প্রকাশ করেছিলেন। এমন হতে পাবে যে রবীন্দ্রনাথ বিদেশে চলে যাওয়ায় এ ব্যাপারে তখন আর কথা এগোয়নি।

তার পর এ কাজ ক্ষিতিমোহনের জীবনের একটা অবশ্যপালনীয় কর্তব্য হয়ে দাঁড়াল। ক্রমে ব্রাহ্ম পরিবারে ও ব্রাহ্মভাবাপন্ন পরিবারে বিবাহ শ্রাদ্ধ প্রভৃতি সামাজিক অনুষ্ঠানে আচার্যের দায়িত্ব গ্রহণের জন্য ডাক আসতে শুরু করেছে। বলা বাহুল্য এ ব্যাপারেও রবীন্দ্রনাথের অগ্রণী ভূমিকা ছিল, তিনিই এই-সব অনুষ্ঠানে ক্ষিতিমোহনকে আচার্যপদে নির্বাচন করতে আরম্ভ করেন। ক্ষিতিমোহনের নিজেরও পরিচয়ের গন্ডি বিস্তৃত থেকে

বিস্তৃততর হয়ে চলেছিল। শান্তিনিকেতনের ভিতরে ও বাইরে সারা জীবন তিনি কত গৃহে যে অন্নপ্রাশন, বিবাহ, গৃহপ্রবেশ, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি উপলক্ষে আচার্যের আসন গ্রহণ করলেন, কত প্রাতিষ্ঠানিক উৎসবসভায় পৌরোহিত্য করলেন, কত ধর্মীয় সভায় উপাসনা করলেন তার ইয়ত্তা নেই। কি জানি, তখন কোনোদিন তাঁর সেই প্রথম যৌবনের ব্যাকুল ইচ্ছার কথা মনে পড়ত কি না। তবে একটা কথা নিঃসংশয়ে বলতে পারি যে এ-সব কাজে তিনি যথেষ্ট আনন্দ পেতেন। তাঁর বন্ধু বিধুশেখর শাস্ত্রী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত বংশের সন্তান, তিনি একবার পরিহাস করে তাঁকে বলেছিলেন : 'আমি পুরোহিতের কাজ ছেড়ে দিয়েছি, আর তুমি মহাপুরোহিত হয়ে পড়েছ।'[২২৩] অমিতা সেনের মুখে শুনেছি যতদিন রবীন্দ্রনাথ ছিলেন, মাঘোৎসবের আগে ক্ষিতিমোহন তাঁর সঙ্গে আলোচনা করতেন সেবারকার উপাসনায় কী কী বলবেন সে বিষয়ে, তাঁর নির্দেশ নিতেন।[২২৪]

ক্ষিতিমোহনকে লেখা রবীন্দ্রনাথের দু-একখানা চিঠি আছে, যে চিঠিতে তিনি ক্ষিতিমোহন দূরস্থিত হলে তাঁকে আগামী কোনো অনুষ্ঠানের দায়িত্ব গ্রহণের জন্য অবহিত ও আমন্ত্রিত করছেন। যেমন বসুবিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে লেখা চিঠি :

ওঁ

সবিনয়নমস্কারপূর্ব্বক নিবেদন

জগদীশ তাঁর বিজ্ঞানমন্দির প্রতিষ্ঠার দিনে (৩০ নভেম্বর) বৈদিক অনুষ্ঠান করতে চান। আপনার উপর নির্ভর করে আছেন। কতকগুলি মন্ত্র ঠিক করে একবার যদি আসেন তবে ভালো হয়। তিনি এ সম্বন্ধে উৎকণ্ঠিত হয়ে আছেন। আপনি ছুটিতে ছিলেন বলে আপনাকে খবর দিতে পারি নি। গুরুগৃহে ব্রহ্মচারীদের আসবার সময় যে-সব মন্ত্র পড়া হয় সেগুলি মন্দ হবে না। যাইহোক তিনি আপনার প্রতি ভার দিয়েচেন।

এখানে education commission আগামী সন্ধ্যায় ভাল ভারতীয় সঙ্গীত শোনবার জন্য আসবেন। তার আয়োজন করতে হচ্চে। পণ্ডিতজীকে অন্তত রবিবারে এখানে পাঠাতে পারলে তাঁকে কাজে লাগানো যায়। আপনিও যত শীঘ্র পারেন এসে জগদীশের উদ্বেগ দূর করবেন।

ইতি শুক্রবার
আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর[২২৫]

৩০ নভেম্বর ১৯১৭ তারিখে বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্র বসু প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানমন্দির-এর উদ্‌বোধন হয়। সম্পূর্ণ ভারতীয় প্রথায় উদ্‌বোধন-অনুষ্ঠানটি পরিকল্পিত হয়েছিল। ক্ষিতিমোহন বৈদিক মন্ত্র আবৃত্তি করেন। রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত কলকাতা থেকে তাঁকে এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করবার জন্য শান্তিনিকেতনে চিঠি লিখে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। শারদ অবকাশের পরে তখন বিদ্যালয় খুলেছে এবং ক্ষিতিমোহন সেখানে ফিরেছেন। রবীন্দ্রনাথের চিঠির শেষাংশে সেই সময়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাসংস্কারের জন্য যে স্যাডলার কমিশন এসেছিল তার উল্লেখ আছে, তা থেকে চিঠির সময় নির্ধারণ করা যায়। কমিশনের সদস্যদের জন্য বিচিত্রায়

শাস্ত্রীয় সংগীতানুষ্ঠান হয়েছিল, চিঠিতে তার ইঙ্গিত আছে। তাতে যোগ দেওয়ার জন্য পণ্ডিত ভীমরাও শাস্ত্রীকে রবীন্দ্রনাথ পাঠিয়ে দিতে বলছেন। জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে কথাবার্তা বলবার জন্য যেতে বলেছেন ক্ষিতিমোহনকেও।

এই-সব নানা রকমের কাজকর্মের দায়িত্ব এবং রবীন্দ্রনাথের নানা দাবির সঙ্গে জড়িয়ে যাচ্ছিল ক্ষিতিমোহনের জীবন। এর সঙ্গে সঙ্গেই নিজের গৃহীজীবনের দায়িত্ব-কর্তব্যগুলোও স্বভাবতই তাঁর মনোযোগ দাবি করে। এবার নিজের ঘরেই কাজ। বড়ো মেয়ে রেণুকার বিয়ে দিলেন তাঁর কিশোরী বয়সে।

শান্তিনিকেতনেই বিয়ের আয়োজন নতুন বাড়ির যৌথ পরিবারে। বিয়ের কবিতা লিখেছিলেন আশ্রমের ছাত্র, সংশোধন করে দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং, সেই কবিতার কাগজ থেকে জানা যায় তারিখটা—২৬ শ্রাবণ ১৩২৫।[২২৬] জামাই হরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত সরকারি চাকুরে। কন্যাসম্প্রদান করেন ক্ষিতিমোহনের মেজদাদা ধরণীমোহন সেন। তিন কন্যার কাউকেই ক্ষিতিমোহন সম্প্রদান করেননি নিজে। বাড়িতে হিন্দুধর্মের প্রচলিত আচারবিধি অনুসৃত হত। কন্যাদেরও বিবাহ হয়েছে হিন্দু বিবাহবিধিমতে। ক্ষিতিমোহন বাধা দেননি, পুরোনো ধারা পরিবর্তন করে নতুন ধারার প্রবর্তন করেননি। শুধু নিজে যতটা সম্ভব সে-সব অনুষ্ঠান থেকে সরে থেকেছেন। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলেছেন, সেটা ক্ষিতিমোহনকে বুঝতে সাহায্য করে :

> ব্রাহ্ম না হয়েও তিনি [ক্ষিতিমোহন] ব্রহ্মবাদী ছিলেন এবং কখনো কোনো পৌত্তলিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতেন না, নিজের ছেলেমেয়েদের বিবাহের আচার-অনুষ্ঠান যতদূর অপৌত্তলিক তার সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল—তার বাইরে যেতে পারেন নি।[২২৭]

পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে দিয়ে বৈদিক বিবাহপদ্ধতি সংকলন করিয়েছিলেন, মন্ত্রগুলির বাংলা অনুবাদও যোগ করেছিলেন ক্ষিতিমোহন। প্রয়োজনে অল্পস্বল্প গ্রহণ-বর্জন করে আশ্রমে এবং আশ্রমের বাইরে এই বিবাহপদ্ধতি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। ক্ষিতিমোহন নিজেও বহু বিবাহ-অনুষ্ঠানের পৌরোহিত্য করেছেন এই পদ্ধতি অনুসরণে। অনেকদিন পরে তাঁর দৌহিত্রী সুপূর্ণার বিয়ে হয়েছিল বৈদিক রীতিতে, আচার্যের আসনে ছিলেন সুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়। সে বিয়েতে কনের বৃদ্ধ দাদামশায় সারাক্ষণ বসেছিলেন আচার্যের পাশে, মনের বাধায় তাঁকে সরে থাকতে হয়নি।

ছাত্রদের চোখে

দেখতে দেখতে শান্তিনিকেতনে দশটা বছর কেটে গেল ক্ষিতিমোহনের। গম্ভীর প্রকৃতি, রাশভারি মানুষ, ছাত্ররা সকলেই যথেষ্ট ভয় এবং সমীহ করে। 'আশ্রমে যখন আসিলেন তখন তাঁহার প্রচুর স্বাস্থ্য ও প্রচুরতর পাণ্ডিত্য।' কিংবদন্তি বলে প্রথম দিকে তাঁকে যাচাই করে নেওয়ার তাগিদে আশ্রমের নিয়ম-বেনিয়ম নিয়ে জ্ঞান দিতে গিয়ে এক ছাত্র যে শিক্ষা পেয়েছিল তাঁর কাছে তার পরে আর কেউ তাঁকে যাচানোর দুঃসাহস প্রকাশ করেনি। বরং

সেই একটি ঘটনাতেই ছাত্রমহলে তাঁর প্রতিষ্ঠা পাকা হয়ে গেল। লেখক অবশ্য এই সঙ্গেই যোগ করেছেন যে এটা তাঁর শোনা গল্প, বাস্তবের সঙ্গে হয়তো এর কোনো সম্পর্ক নেই।[২২৮] কিন্তু ছাত্রপরম্পরায় তাঁর সম্পর্কে সভয় সম্ভ্রমের ঐতিহ্য বরাবর চলেছে। প্রমথনাথ বিশী লিখেছেন : 'আমি যখন আশ্রমে গেলাম তখন ক্ষিতিমোহনবাবু সর্বাধ্যক্ষ।' মাঝে মাঝে তিনি নানা প্রয়োজনে ছেলেদের কাউকে ডেকে পাঠাতেন। কোনো ছেলের ডাক পড়লে সে নাকি মারের ভয়ে পুরু গরমজামা গায়ে দিয়ে যেত। 'গিরিরাজের মতো তাঁর দেহের বিপুলতা ইহার অন্যতম কারণ ছিল।' মনে তো হয় এ হেন প্রহারশঙ্কা ছাত্রমহলে তাদেরই দ্বারা তাদেরই ভয় দেখাতে একটা রটনা মাত্র। কারণ সে কালে এমন 'দেখ-মার' মাষ্টারমশাই রবীন্দ্রনাথের সদাজাগ্রত প্রহরাকে ফাঁকি দিয়ে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে ঢুকে পড়লেও টিকে থাকবার কথা নয়। লেখকের নিজের অভিজ্ঞতা অবশ্য এই প্রচলিত ধারণার ধারপাশ দিয়েও যায়নি সে কথা তিনি স্বীকার করেছেন। ক্ষিতিমোহন তাঁকে ডেকে পাঠিয়ে প্রয়োজনীয় দু-একটা কথা বলেছিলেন মাত্র।[২২৯] প্রমথনাথ এও বলেছেন যে ছাত্ররা ক্ষিতিমোহনকে ভয় করলেও তাঁর অধ্যাপনায় উপকৃত হননি এমন ছাত্র বিরল। 'দুরূহ ও নীরস বিষয়ের গোলকধাঁধার মধ্যে তিনি ছাত্রদের টানিয়া লইয়া ঢুকিয়া পড়িতেন, রসিকতার চকমকি-পাথর ঠুকিয়া পথ আলো করিতে করিতে চলিতেন, যাহারা তাঁহাকে অনুসরণ করিত পথ তাহাদের কাছে আর অন্ধকার থাকিত না।'[২৩০]

পড়াবার সময় ক্ষিতিমোহন নিজে খাটতেন এবং ছাত্রদের খাটিয়ে নিতেন। শান্তিনিকেতনে অধিকাংশ ছেলেই বাংলা ভালো শিখত। প্রমদারঞ্জন ঘোষ লিখেছেন : 'আর অজিতকুমার চক্রবর্তী ও ক্ষিতিমোহন সেন মশাইয়ের ন্যায় শিক্ষকদের কাছে ছেলেরা পড়তো ; তাই তাদের বাংলা জ্ঞানের মান উঁচু না হওয়াই তো বিস্ময়ের বিষয় হতো।' এই প্রসঙ্গে তিনি স্মরণ করেছেন দু-একবার অধ্যাপকদের সভায় আলোচনা হয়েছিল বার্ষিক পরীক্ষা তুলে দেওয়া যায় কি না। রবীন্দ্রনাথ তো পরীক্ষা তুলে দেওয়ার পক্ষে ছিলেন, আর : 'ক্ষিতিবাবু বলতেন ক্লাসের লেখা থেকেই ছেলেদেয় জ্ঞানের পরিমাপ সম্ভব। তাঁর ক্লাসে ছেলেদের যথেষ্ট লেখা দেওয়া হতো এবং শুদ্ধ করা হতো।' এই সহকর্মীর ভাষায় : 'ক্ষিতিবাবু ছিলেন অতি কড়া শিক্ষক ; তাঁর কাজ ফাঁকি দেবার জো ছিল না।' প্রমদারঞ্জন স্বীকার করেছেন যে ইংরেজির শিক্ষকরা জগদানন্দবাবু বা ক্ষিতিবাবুর মতো কাজ আদায় করতে পারতেন না। ছেলেরা অজুহাত দেখাত বাংলা ও অঙ্ক করে আর তাদের সময় থাকে না। একবার তাই ইংরেজির শিক্ষক প্রমদাবাবুরা ক্ষিতিমোহনকে কম হোমটাস্ক দেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছিলেন। 'ক্ষিতিবাবু সে কথায় কর্ণপাত করলেন না; এবং ছাত্রদের সম্বন্ধে তাঁর স্বভাব-সুলভ সরসতাব সঙ্গে যে মন্তব্য করেন তা মনে আছে। তিনি বললেন দ্রৌপদীর ছিল পঞ্চস্বামী ; তাই তাঁর পক্ষে অপর স্বামীদের প্রতি কর্তব্যের অজুহাতই কোনো এক স্বামীর প্রতি অবহেলার যথেষ্ট কৈফিয়ৎ হতে পারতো।'[২৩১]

সুধীরঞ্জন দাসের লেখার মধ্যে ছাত্রজীবনের অভিজ্ঞতা বর্ণনায় একটুখানি উল্লেখ আছে ক্ষিতিমোহনের পড়ানোর। তিনি লিখেছেন : 'তাঁর কাছে কিছুদিন ইতিহাস পড়েছিলাম।

ইতিহাস তিনি পড়াতেন খুব সরস গল্পের মতো করে। বাজীরাওকে জিলিপি খেতে দেখে কে নাকি বলেছিল দেখো দেখো জিলিপি জিলিপি খাচ্ছে—সে কথা এখনো মনে আছে, এবং বাজীরাও যে বেশ একজন প্যাঁচালো ডিপ্লোম্যাট ছিলেন তা বিশেষ করে বুঝে নিয়েছিলাম এই উপমাটুকু থেকে।'[২৩২] দৃষ্টান্তটার তেমন গুরুত্ব হয়তো নেই, তবু ক্ষিতিমোহন যে দুরূহ এবং নীরস বিষয়ের আলোচনা করতে করতে কখন অতর্কিতে হালকা হাওয়ার আমেজ আনতেন, এ থেকে তার একটু আভাস পাওয়া যায়। তাঁর অন্য এক ছাত্র সতীশচন্দ্র রায় শিক্ষক ক্ষিতিমোহনের বেশ খানিকটা পরিচয় দিয়েছেন :

> ক্ষিতিমোহনবাবুর কাছে প্রথম পড়ি সংস্কৃত, তারপরে ইতিহাস। পরে বাংলা পড়বার সৌভাগ্য হয়। সৌভাগ্য বললাম এইজন্যে যে বিষয়কে এমন সুন্দরভাবে গোড়া বেঁধে পড়াবার ক্ষমতা কজন অধ্যাপকেরই বা আছে? ...অত বড় পন্ডিত ছিলেন তবু আমাদের মতো অপোগণ্ডদের জ্ঞানদানে তাঁর যত্নের অবধি ছিল না। বেনাবনে মুক্তো ছড়িয়ে গেছেন তিনি। ছাত্রদের তিনি শ্রদ্ধা করতেন, সেইজন্যে তাঁর শ্রদ্ধার দাবী আমাদের কাছে সকলের চেয়ে বেশী। তিনি যেমন নিজে খেটে পড়াতেন, খাটিয়েও নিতেন খুব। ..ভালোবাসতুম আমি এই সদাহাস্যপরিহাসনিপুণ অধ্যাপকটিকে, কিন্তু ভয় করতুম বোধহয় তার চাইতে বেশী।[২৩৩]

ক্ষিতিমোহন যে কীরকম কড়া শিক্ষক ছিলেন তার বেশ বিস্তৃত বিবরণ নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখায় পাওয়া গেল। লেখক শিশুবিভাগে ভরতি হয়েছিলেন। তখন উত্তরবিভাগের অধ্যাপনা-গবেষণার কাজে ব্যস্ত ক্ষিতিমোহন আর পূর্ববিভাগের ক্লাস নিতে আসেন না।

> তাঁকে মাঝে মাঝে দেখি কাজের ঘরে, দূরের থেকে, অজস্র তাঁর বই-কাগজ-পুঁথিপত্তরের মধ্যে তাঁর বিপুল বলিষ্ঠ গৌরবর্ণ এবং প্রায়শঃ অনাবৃত দেহ নিয়ে সমাসীন—দরিদ্রের ফরাশঢাকা রাজতখতে যেন। হয়তো কিছু পড়ছেন এক মনে, অথবা লিখছেন। কখনো-বা প্রাতঃকালে দেখি পদব্রজে মন্থরগতিতে চলেছেন বিদ্যাভবনে অথবা বৈকালে ফিরছেন বাড়ি—হাতে একটি কাপড়ের ঝুলিতে বই-খাতাপত্তর।[২৩৪]

কয়েক বছর পরে সেবার বিদ্যালয়ে বাংলা ক্লাসে পড়াতে এলেন ক্ষিতিমোহন এবং পড়াবার জন্য একটি উপরের দিকের ক্লাস বেছে নিলেন, নির্মলচন্দ্র তখন সেই ক্লাসের ছাত্র। নির্মলচন্দ্র ১৯২৬ সালে বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করে শান্তিনিকেতন ছেড়ে যান, সুতরাং তার দু-এক বছর আগের ঘটনা হবে এটা। ক্ষিতিমোহন তাঁদের প্রথমে কিছুদিন নবনির্মিত সন্তোষালয়-এর উত্তরের বারান্দায় বসে 'চয়নিকা' 'গোরা' আর 'সমাজ' পড়ালেন। তারপর কয়েকজন ছাত্রকে আলাদা করে বেছে নিয়ে বীথিকা-র দক্ষিণে শালগাছের তলায় বাঁধানো বেদিতে বসে ক্লাস নিতে শুরু করলেন। এই বাছাই-দলভুক্ত হয়ে নির্মলচন্দ্রের সুযোগ হল তাঁকে শিক্ষক হিসাবে কাছে পাওয়ার। গুরু অচিরেই ছাত্রের নামকরণ করলেন : 'নিমফল',— 'সেই প্রথম এসে পড়লাম তাঁর অত্যন্ত কাছে পড়াশুনার মধ্য দিয়ে।'

প্রথমদিনেই কোনোপ্রকার গৌরচন্দ্রিকা না-করে সুস্পষ্ট ভাষায় তিনি জানিয়ে দিলেন যে কড়া 'টাস্ক মাস্টার' বলে তাঁর প্রসিদ্ধি আছে। লেখার কাজ দিয়ে কঠোর নিয়মে লেখার ভুলভ্রান্তি সংশোধন করিয়ে থাকেন, যাতে সেসব ভুল আর না হয়। সপ্তাহে যা পড়ান, সপ্তাহান্তে কাবুলিওয়ালার মতন সুদে-আসলে তা আদায় করে নেন, অর্থাৎ প্রত্যেক মঙ্গলবারে—শান্তিনিকেতনি শনিবারে—ছাত্রদের সাপ্তাহিক পরীক্ষা দিতে হয়।

> এই কঠোর নিয়মে তাঁর কাছে মাত্র এক বছর ক্লাস করার ফলে রবীন্দ্র সাহিত্যের ও বাংলা ভাষার যে বুনিয়াদ তিনি গড়ে দিয়েছিলেন, তার যথার্থ মূল্য বুঝতে পেরেছি আমাদের পরবর্তী ছাত্রজীবনভর। শুরু করলেন চয়নিকার 'কড়ি ও কোমল'-এর অন্তর্গত কড়াপাকের কবিতা 'চিরদিন' দিয়ে—সচরাচর যা ও-বয়সের ছেলেদের পড়ানো হয় না। কবিতাটির প্রতি তাঁর একটি স্মৃতিগত দুর্বলতা হয়তো ছিল...।* তারপর চয়নিকা থেকে একে একে পড়ালেন 'সমুদ্রের প্রতি' 'বসুন্ধরা' 'নিষ্ফল কামনা' 'পরশ পাথর' 'বধূ' 'সোনার তরী'—আরও অনেক নানা স্বাদের কঠিন সব কবিতা যা আমাদের কাব্যপাঠের আগ্রহ, আনন্দ ও রসবোধের পরিধির বিস্তার ঘটিয়েছিল নিশ্চয়ই, কিন্তু তার চেয়ে বড় কথা, কল্পনা ও ভাবের দুরূহ রাজ্যে আমাদের দুঃসাহসী করে তুলেছিল।[২৩৫]

সমাজ-এর 'পূর্বপশ্চিম' প্রবন্ধ পড়তে পড়তে 'মাস্টারমশায়ের বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যানের গুণে' সেই কিশোর বয়সে 'স্বামী বিবেকানন্দকে বিশ্বভারতীর আদর্শের প্রতিভূ, আমাদেরই একজন বিশিষ্ট আত্মীয় বলে' গ্রহণ করতে পেরেছিলেন, নির্মলচন্দ্র লিখেছেন। তিনি লিখেছেন 'বিলাসের ফাঁস', 'নকলের নাকাল', 'আচারের অত্যাচার' 'অযোগ্যভক্তি' প্রভৃতি প্রবন্ধগুলি ক্ষিতিমোহন তাঁদের নিছক ভাষা-সাহিত্য বলে পড়াননি, 'যদিও বাক্‌রীতি বা অন্বয়, সমাস বা শব্দার্থের কচকচি থেকে ষোল-আনা নিষ্কৃতি পাওয়াও তাঁর হাতে সম্ভব ছিল না।' প্রবন্ধগুলির পাঠ, আলোচনা ও নিজের ভাষায় নিয়মিত সপ্তাহান্তে ভাবার্থ লেখার প্রভাব সুদূরপ্রসারী হয়েছিল। 'অগোচরে তরুণ মনের কাঠামোটাই যেন ধীরে ধীরে পালটাতে লাগল। স্বাধীন চিন্তা ও তত্ত্ববিচারের প্রেরণা সচেতনভাবে শুরু, আমাদের অনেকেরই এই সময় থেকে।' একই সময়ে 'গোরা' উপন্যাস ক্লাসে একই শিক্ষকের কাছে পড়ার প্রসঙ্গ তুলে নির্মলচন্দ্র এই লেখাতেই যোগ করেছেন যে এর ফলে : 'আমাদের চিন্তার ধারা সদ্য অঙ্কুরিত এই নতুন পথের বিপরীতগামী হবার কোনো সুযোগই পায় নি।'

ক্ষিতিমোহনের আর-এক ছাত্রী রমা চক্রবর্তীর অভিজ্ঞতার কথাও জানতে পারছি, যিনি শিক্ষাভবনে পড়তে এসেছিলেন ১৯৩০ সালে। ক্ষিতিমোহনের অধ্যাপনা সম্পর্কে তিনি বলেছেন : 'নতুন ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লাসে তাঁর পড়াবার ধরন ছিল সহজ ও প্রাঞ্জল। সব কিছু খুঁটিয়ে বুঝিয়ে দিতেন। উচ্চারণ সম্বন্ধে তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। দন্ত্য স তালব্য শ মূর্ধন্য ষ—নিজে উচ্চারণ করে তাদের মধ্যে কি পার্থক্য ও কেন তা বিশদভাবে বুঝিয়ে দিতেন।' আবার বলেছেন : 'তিনি খুব রাশভারী ছিলেন। ছাত্রছাত্রীরা তাঁর কাছ থেকে দূরে থাকতে

* পাঠক নিশ্চয় ভুলে যাননি কিশোর বয়সে ক্ষিতিমোহন, জীবনে প্রথম যে রবীন্দ্র-কবিতা নিজে যেমন বুঝেছেন তার ব্যাখ্যা করেন, সেটা 'চিরদিন'।

চাইত। কিন্তু কাছে এলে বোঝা যেত যে তাঁর গাম্ভীর্যের আড়ালে স্নেহভরা মনটি সদা-জাগ্রত রয়েছে।' রমা দেবী একা 'ক্লাসিক্যাল বেঙ্গালি'-র ছাত্রী ছিলেন বলে গুরুপল্লিতে ক্ষিতিমোহনের বাড়ি তিনিই পড়তে যেতেন। দাওয়ায় বসে পড়াতে পড়াতে সংশ্লিষ্ট নানা বিষয়ের অবতারণা করতেন ক্ষিতিমোহন : 'কত ধ্যানধারণার কথা বলতেন, তখন সত্যিই মনে হত চতুর্দশ ভুবনের দুয়ার খুলে দিলেন।' যা পড়াতেন তার ভাবার্থ লিখে আনতে বলতেন, সে আদেশ পালন না করে উপায় ছিল না।[২৩৬]

রমা চক্রবর্তী বিশ্বভারতীর কলেজ বিভাগেই প্রথম ছাত্রী হয়েছিলেন, আর সুজিতকুমার মুখোপাধ্যায় ব্রহ্মচর্যাশ্রম থেকে বিশ্বভারতী পর্যন্ত আগাগোড়াই ক্ষিতিমোহনের ছাত্র ছিলেন। আবার বিশ্বভারতীর অধ্যাপক হয়ে কর্মজীবনেও তাঁর সান্নিধ্যে বাস করেছেন। তিনি তাঁর এই শিক্ষক সম্পর্কে নিজের অভিজ্ঞতা অল্প কয়েকটি পঙ্‌ক্তিতে ব্যক্ত করেছেন, কিন্তু তারই মধ্যে তাঁর সুদীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা প্রকাশিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছে।

> বাল্যকালে ব্রহ্মচর্যাশ্রমে অতি নিম্নশ্রেণী হতে তাঁর কাছে শিক্ষা শুরু করি। বিশ্বভারতীর সর্বোচ্চ শ্রেণীতে বিদ্যাভবনেও তাঁর কাছে অধ্যয়ন করি। বাল্যকালে তাঁর শিক্ষা আমার কাছে যেমন সরস ও চিত্তাকর্ষক ছিল, যৌবনেও তাঁর অধ্যাপনা তেমনি সরস ও আনন্দদায়ক হয়েছিল। পঞ্চাশের ঊর্ধ্বে পঞ্চান্নের নিকটবর্তী হয়ে আজও আমি তাঁর অন্তেবাসী। এই বয়সেও তাঁর শিক্ষা তেমনি সরস, তেমনি চিত্তাকর্ষক, তেমনি আনন্দদায়ক।[২৩৭]

নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও বিশ্বভারতীতে শিক্ষকতাকর্মে যোগ দিয়েছিলেন। কর্মজীবনে প্রবীণ শিক্ষক-সহকর্মী ক্ষিতিমোহনের কাছ থেকে পাওয়া যে পরামর্শ ও সহায়তার তিনি উল্লেখ করেছেন তা হল :

> কত বিচিত্র কাজে তাঁর সহযোগ এবং পাকা-মাথার পরামর্শ দরকার হয়েছে, বিশেষতঃ কয়েক বছর যখন 'কর্মীমণ্ডলী'-র সম্পাদক ছিলাম। তখনো পুরোপুরি কলহের মণ্ডলী হয়ে ওঠে নি প্রতিষ্ঠানটি, যদিও প্রবীণ ও নবীনদের আদর্শগত বিভেদ মাথা চাড়া দিতে শুরু করেছে। ক্ষিতিবাবুর নিপুণ মধ্যস্থতা ও সময়োচিত নাতিদীর্ঘ রহস্যালাপ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিপত্তির মূলোৎপাটনের সহায়ক হয়েছে মনে পড়ে।[২৩৮]

অসিতকুমার হালদার শিল্পী, ক্ষিতিমোহনের অধ্যাপনা তাঁকে যা দিয়েছিল, তাকে তাঁর শিল্পীমানস রূপদান করেছিল রঙে ও রেখায়। সেকালের এই কলাভবনের অধ্যাপকের মুখে আমরা শুনতে পাই :

> ক্ষিতিমোহনবাবু যখন বিশ্বভারতীর সংস্কৃতের ক্লাস নিতেন তখন আমাদের মতো অনেক অধ্যাপক যেতেন নিয়মিত শুনতে। তিনি কাদম্বরী, মৃচ্ছকটিক, শকুন্তলা, রঘুবংশ, মেঘদূত প্রভৃতি এমন চমৎকার বুঝিয়ে দিতেন পড়াবার সময় যে মনে তা গ্রথিত হয়ে যেত, ছবি ফুটে উঠত। শিব-পার্বতীর 'ন যযৌ ন তস্থৌ' শান্তিনিকেতনে এঁকেছিলুম এরই ফলে।[২৩৯]

অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ দত্ত রবীন্দ্রোত্তর পর্বে আসেন বিশ্বভারতীতে, তিনি কোনোদিন ক্ষিতিমোহনের ছাত্র ছিলেন না। পুরোনো ছাত্রদের মুখে তাঁর অধ্যাপনানৈপুণ্যের বিবরণ যা

শুনেছিলেন, তাতে বিস্মিত হয়েছিলেন। আর নিজে ক্ষিতিমোহনের 'পূরবী' ব্যাখ্যানের কয়েকটি ক্লাস করেছিলেন বলে বুঝতে অসুবিধা হয়নি যে পুরোনো ছাত্ররা অত্যুক্তি করেননি। তিনি বলেছেন :

> প্রচুর পান্ডিত্যও যে কত সহজে বহন করা যায় সে আমি ক্ষিতিমোহনবাবুর কথা শুনে তাঁর মুখে নানা বিষয়ের আলোচনা শুনে বুঝেছি। এমন সবস পান্ডিত্য সচরাচর দেখা যায় না। বিদ্যা যদি মনে মজ্জায় মিশে যায় তবেই সে সহজ হয়ে দেখা দেয় ; আর যদি পুঁথি-পড়া মুখস্থ বুলি হয় তা হলেই তার বিরস বিবর্ণ মূর্তিটি বেরিয়ে পড়ে।[২৪০]

ক্ষিতিমোহনের কাছে বিদ্যাশিক্ষার সৌভাগ্য হয়নি তাঁর। 'কিন্তু প্রচলিত অর্থে তাঁর ছাত্র না হয়েও এখানকার উৎসবে অনুষ্ঠানে মন্দিরের ভাষণে প্রতিনিয়তই আমরা তাঁর কাছে শিক্ষা লাভ করেছি। সেদিক থেকে শান্তিনিকেতনের সকল কর্মী অধ্যাপকই তাঁর ছাত্র।'—এ কথা যেমন বলেছেন হীরেন্দ্রনাথ, তেমনই উল্লেখ করেছেন :

> বাক্‌দেবী তাঁকে অসাধারণ বাক্‌নৈপুণ্য দিয়েছিলেন। কঠিনতম জিনিসকেও যে তিনি কতখানি হৃদয়গ্রাহী করে তুলতে পারতেন—যাঁরা কোনো প্রশ্ন নিয়ে কখনো তাঁর কাছে গিয়েছেন তাঁরাই তার সাক্ষ্য দেবেন।[২৪১]

রবীন্দ্রোত্তর কালের শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন অমিতাভ চৌধুরীও, পড়াতে নয়, পড়তে। তিনি যে-ভাবে এই আজীবন বিদ্যাব্রতী মানুষটি সম্পর্কে তাঁর মনের কথাটা ব্যক্ত করেছেন, তাও উল্লেখ্য :

> জীবিকায় তিনি ছিলেন শিক্ষক। শান্তিনিকেতন নামক ক্ষুদ্র বিদ্যালয়টি বিশ্বখ্যাত শান্তিনিকেতন হত না, তাঁর মতো গুণী শিক্ষকের সমাবেশ না ঘটলে। এই শিক্ষকতা শুধু ক্লাসে নয়, ক্লাসের বাইরে, শান্তিনিকেতনে দৈনন্দিন জীবনেও স্পষ্ট ছিল। তাঁর সঙ্গে দুদণ্ডের আলাপই ছিল শিক্ষা। প্রাচীন ভারতবর্ষের মুনিঋষিদের আমি দেখি নি, দেখিনি তপোবনকে, কিন্তু আজ থেকে প্রায় চল্লিশ বছর আগে শান্তিনিকেতনে গিয়েই ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়কে দেখে আভাস পেয়েছি সেই তপোবনের ঋষির স্বরূপ।[২৪২]

অমিতাভ চৌধুরী যে সময়ের কথা বলছেন সেটা ১৯৪০-এর কাছাকাছি। ততদিনে শান্তিনিকেতনে ক্ষিতিমোহনের আটতিরিশ বছর কেটে গেছে। সুদীর্ঘকালের শিক্ষকজীবনে কত ছাত্র এল, অধ্যয়নপর্ব শেষ করে বিদায় নিয়ে গেল কতজন। আবাসিক এই বিদ্যালয়ে শুধু পড়ানো নয়, অনেক রকমের দায়িত্ব থাকত। বিশেষ করে প্রথমদিকের বছরগুলোয় কতবার নতুন ছাত্র প্রথম এলে তার জিনিসপত্র যথাস্থানে নিয়ে যাওয়ার জন্য অন্য ছাত্রদের নির্দেশ দিয়ে নবাগত ছাত্রকে উপদেশ দিলেন : 'পুরোনো হলে তুমিও আবার এমনি করে নতুনদের অভ্যর্থনা করবে।' আবার যখন সে পাস করে আশ্রম ছেড়ে চলে যাওয়ার সময় প্রণাম করতে এসেছে, আশীর্বাদ করে বলেছেন : 'আশ্রমজননী তোমার মঙ্গল করুন'।[২৪৩]

ছাত্রদের প্রতি স্নেহ অন্তঃশীলা ফল্গুনদীর মতো ভিতরে বইত, বাইরেটায় সাধারণতই কাঠিন্যের আবরণী, আর সুযোগ পেলেই ঈষৎ ব্যঙ্গ-পরিহাসের অব্যর্থ শেলক্ষেপণ—এ

তাঁর স্বভাবে একেবারে মজ্জাগত ছিল। কখনও ছাত্রের নতুন নামকরণ করতেন— বিশুর ভাই হতেন 'শিশু', নির্মল হতেন 'নিমফল'। কখনও আবার আসল নামটারই নতুন ব্যাখ্যা বেরোত, মুকুল নামের মূলের মধ্যেকার 'কু'টুকু বার করে আনতেন।[২৪৪] সুধীরঞ্জন দাস লিখেছেন : 'ক্ষিতিবাবুর হাস্যপরিহাস ছোটো-বড়ো সবাইকে নিয়েই হত। সর্বদা সাবধানে থাকতাম পাছে বেফাঁস কিছু বলে ফেলি কী করে ফেলি তাঁর সামনে—কেননা, ভুল করলে তক্ষুনি একটা পরিহাসের তীক্ষ্ণ বাণ বুকে এসে লাগবার নিত্য সম্ভাবনা ছিল।' যেমন ঘটেছিল একবার— শান্তিনিকেতনে-পড়া একটি ছেলে বেঙ্গল ভেটারেনারি কলেজ থেকে পাশ করেছিলেন, পুরোনো ছাত্রদের মধ্যে হয়তো বা সেই প্রসঙ্গে কথা হচ্ছিল, সেই সময় "...ক্ষিতিবাবুর সামনেই সোমেন্দ্র বলে বসলেন, 'যাক্, আমাদের একজন ডাক্তার হল।' আর যাবে কোথায়—তীরের মতো জবাব এল ক্ষিতিবাবুর —'হ্যাঁ, তোমাদের চিকিৎসাটা ভালো রকমেই হবে'।"[২৪৫]

সুধীরঞ্জন দাস, সোমেন্দ্রচন্দ্র দেববর্মণরা ক্ষিতিমোহনের শান্তিনিকেতন-জীবনের একেবারে গোড়ার দিককার ছাত্র। অন্য আর-একটি ঘটনার কথা বলি, অনেকদিন পরের কথা, সম্ভবত ১৯৪১ সালের প্রথমদিক। শিক্ষাভবনের জনাকতক ছেলে আসন্ন পরীক্ষার তাড়নায় কদিন থেকে ভোর না-হতেই উঠে পড়তে বসছেন। সারা বছরের ফাঁকি পূরণ করতে হবে, দিশা পাওয়া ভার। একদিন ভোরবেলা সেই কথাই হচ্ছিল দুই বন্ধুতে—সবই তো বাকি, কোন্‌টা ছেড়ে কোন্‌টা বা ধরবেন! এমন সময় জানলা দিয়ে ভেসে এল কৌতুক-মেশানো গম্ভীর কণ্ঠের মন্তব্য : 'ওরে ভানু, তেড়ি কাটবি কোন দিকে— সব দিকেই তো চুল।' চকিতে জানলার বাইরে তাকিয়ে চোখে পড়ল ক্ষিতিমোহন শাস্ত্রী ও হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়েছেন। ছাত্রাবাসের পাশ দিয়ে যেতে যেতে ওই দুজনের আলোচনা শুনতে পেয়ে ক্ষিতিমোহন অব্যর্থ টিপ্পনীর তিরটা ছুঁড়ে দিয়ে গেলেন।[২৪৬]

এ-সব অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও ছাত্ররা যে ক্ষিতিমোহনবাবুকে ভয় এবং সমীহ করত, সে কথা অব্যতিক্রমে লিখেছেন সকলেই। কেবল একটি লেখা থেকে জানা গেল তাঁর মতো রাশভারি শিক্ষককেও ভয় দেখিয়ে মজা কববার দুষ্টবুদ্ধিরও অভাব ছিল না তাদের। সময়ে-সময়ে মাস্টারমশায়দের নিয়ে মজা করা শান্তিনিকেতনের বেশ পুরোনো ঐতিহ্য। রথীন্দ্রনাথরাও যখন ছাত্র ছিলেন দোলের দিন বিশ্রামরত জগদানন্দ রায়কে তাঁর খাটিয়াসুদ্ধ তুলে বাঁধের ধারে নিয়ে গিয়ে হাজির করেছিলেন। তিনিও তো কম কড়া শিক্ষক ছিলেন না। যাই হোক, ক্ষিতিমোহনকে ভয় দেখানোর গল্পটা বলি। একদিন তিনি রামপুরহাট লোকালে বেশি রাতে বোলপুর স্টেশনে এসে পৌঁছেছেন, গাড়ি লেটও ছিল। চিরকাল হেঁটেই যাতায়াত করেন বোলপুর-শান্তিনিকেতন। সে-রাতেও অভ্যাসমতো নির্জন অন্ধকার পথ ধরে আপনমনে হাঁটতে হাঁটতে আসছেন, ভুবনডাঙার গোরস্থানের কাছাকাছি আসতে হঠাৎ একটা 'হা রে রে রে' চিৎকার শুনে থমকে দাঁড়ালেন। এদিক-ওদিক থেকে অনেকগুলো কালো কালো মূর্তি ছুটে এসে ঘিরে ধরল তাঁকে। অন্ধকারে কিছু বোঝা যাচ্ছে

না— ক্ষিতিমোহন হাতের লাঠিটা বাগিয়ে ধরে জোর গলায় হাঁকলেন—'কে তোরা, কী চাস!' এ অঞ্চলে ডাকাতদের উপদ্রবের কুখ্যাতি বহুকালের, কিন্তু সাজা-ডাকাতদের মুখের ভাষা শুনেই ছলনাটা ধরে ফেলা গেল মুহূর্তেই। তাঁকে ভয় দেখাতে যেই তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করেছে— 'কেড়ে নে লাঠিটা, মাথা ফাটিয়ে লাশটা পুঁতে দে বাঁধের পাড়ে'— অমনি হো হো করে হেসে উঠেছেন ক্ষিতিমোহন। ডাকাতরা তো এমন ভদ্র ভাষায় কথা বলবে না। বীরভূমের লোকমুখের ভাষায় বাঁধকে বলে 'বান্ধ', পাড়কে বলে 'গাবা', আর 'টা' প্রত্যয় হয়ে যায় টো-- 'লাঠিটো' 'লাশটো'। কথায় সেইসঙ্গে একটা আঞ্চলিক বিশেষ টান যোগ হয়— ক্ষিতিমোহন সেই টানটি যোগ করে শোনালেন ডাকাতদের মুখের কথাটা কেমন হওয়া উচিত ছিল। ফিরতে অনেক রাত হয়ে যাবে জেনে ছেলেরা তাঁকে নিতে এসেছিল, আসবার পথে ভয় দেখাবার পরামর্শ হয়, কিন্তু ভয় দেখাবে কাকে![২৪৭]

একটা কথা বুঝতে পারি। সেকালে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের ছাত্ররা যে শিক্ষকদের লেখাপড়ার সময়ে বা আশ্রমজীবনের শৃঙ্খলারক্ষার ব্যাপারে বজ্রসম কঠোর মূর্তি দেখতে অভ্যস্ত ছিল, তাঁদেরই বন্ধুসম সরস সহাস্য বা সহানুভূতিতে আর্দ্র মূর্তিও তাদের অপরিচিত ছিল না। শিক্ষকরা ছিলেন তাদের যথার্থই আপনজন। ক্লাসের বাইরেও ছাত্ররা তাঁদের নিত্যসঙ্গ পেত। তা ছাড়া ছোটোবেলায় তাঁদের সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়ে বা বিনোদন পর্বে তাঁদের কাছে গল্প শুনতে শুনতে এই সম্পর্ক আরও নিবিড় এবং নিঃসংকোচ হয়ে উঠবার সুযোগ পেত।

শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের কাজে তো লঘুতে-গুরুতে মেশানো নানান বৈচিত্র্য। সেখানে শিক্ষক ছাত্ররা দল বেঁধে বেড়াতে যায়। ক্ষিতিমোহনও নিয়ে যেতেন ছেলেদের। এ তাঁর কর্মেরই অঙ্গ, আবার তাঁর মতো পথের নেশায় পাগল মানুষের প্রাণের টানটাও মিলে যায় তার সঙ্গে। ছুটিতে নিজে যখন ভ্রমণে বেরোতেন, জনকতক প্রিয় ছাত্র সঙ্গে থাকত, সেকালে তাই অনেক ছাত্র সোনারঙ্গে তাঁর গ্রামের বাড়িতে গেছেন। গুজরাতের ছাত্র মোহনদাস পটেলের এখনও ছবির মতো মনে পড়ে ক্ষিতিমোহনদের সেই টিনের চাল দেওয়া মাটির বাড়ি, মনে পড়ে স্টিমারে যেতে দেখেছিলেন টুকরো বাঁশের মাথায় পাতার ঠোঙায় রসগোল্লা নিয়ে মিষ্টান্ন-বিক্রেতারা সাঁতার দিয়ে কাছে আসত[২৪৮] ছোটো ছোটো ছুটির অবকাশে ছাত্রদের দল নিয়ে শিক্ষামূলক ভ্রমণে কত বেরিয়েছেন ক্ষিতিমোহন তার তো হিসাবই নেই। দু-একটি বেড়ানোর স্মৃতিচারণা আমাদের চোখে পড়েছে পুরোনো ছাত্রদের লেখায়। ১৯১০ সালে একবার কয়েকদিনের ছুটিতে বড়ো ছাত্রদের বেশ বড়ো দল নিয়ে সত্যেশ্বর নাগ, বঙ্কিমচন্দ্র সেন আর ক্ষিতিমোহন মুর্শিদাবাদ-বহরমপুর অঞ্চলে গিয়েছিলেন। ট্রেন-স্টিমারের গন্তব্যটুকু বাদ দিলে বেড়ানোটা মূলত ছিল পায়ে হেঁটেই। যার যার নিজের সঙ্গে কম্বলে-জড়ানো সামান্য দু-একটা কাপড়-জামা, স্টেশনেই সেই কম্বল পেতে ঘুমিয়ে রাত কাটানো কখনও বা, কখনও বা ভাগ্যগুণে রাজ-আতিথ্য লাভ। এইবারেই তো আলিবর্দি খাঁ-সিরাজদৌল্লার সমাধি-ফলকের ফারসি লেখা পড়ে চিনিয়ে

দিতে পেরেছিলেন কোন্‌টা কার সমাধি। এই ধরনের বেড়ানোটা যেমন একদিকে তখনকার শান্তিনিকেতনের নিজস্ব ঢঙে বেড়ানো, তেমনই অন্যদিকে আবার অনেকটাই ক্ষিতিমোহনেরও বহুকাল-থেকে-অভ্যস্ত নিজের ধরনে বেড়ানো। এ ছাড়া তো ছোটোখাটো বেড়ানো লেগেই ছিল। 'মনে আছে, একবার সকালে রাখীবন্ধন উৎসব শেষ করিয়া আমরা চলিলাম অজয়ভ্রমণে—দলপতি হইলেন ক্ষিতিমোহনবাবু। জল-খাওয়ার আয়োজন লইলাম, চিঁড়া ও নারিকেল। সকলেরই ইচ্ছা খাবার খাইবে অজয় নদীর বুকে বসিয়া। নদী তখন প্রায় শুষ্ক, কেবল একদিকে তার ক্ষীণ প্রবাহ। সন্ধ্যা হইবার পূর্ব্বে গিয়া নদীতে পৌঁছিলাম। নদীব মাঝখানে একটা বালুচরে বসিয়া আমরা নারিকেল-চিঁড়া খাইলাম। কেহ বালুর উপর শুইয়া পড়িল, কেহ বালু খুঁড়িতে লাগিল। জনকয়েক ক্ষিতিমোহনবাবুকে ঘিরিয়া বসিয়া গল্প শুনিতে ব্যস্ত। তিনি যখনই যাহা বলিতেন, শুনিতে যে কী সুন্দর লাগিত।' এদিকে যখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, 'গৌরদা'—অর্থাৎ গৌরগোপাল ঘোষ—কাশবনের ভিতর দিয়ে তীরে উঠবার পথ খুঁজতে গিয়ে পথ হারালে একটু উদ্‌বেগের সৃষ্টি হল। তবু তারও মধ্যে স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে ক্ষিতিমোহন বলছেন : 'এ যে নবকুমারের অবস্থা দেখছি।' ব্যাপারটা মিটে যেতে ফেরবার পথে একজনের প্রশ্নের উত্তরে দলপতির ভিতরকার উদ্‌বেগ-আশঙ্কাটা ধরা পড়ল, পরিহাসের সুরটা আর নেই তখন : 'আরে বাঘের নয় রে, ভয় করেছিলুম সাপের। এখানকার সাপ কেমন বিষাক্ত, তা জানিস নে।' সেদিন সকলে ভিজে কাপড়ে রাত্রি প্রায় নটার সময়ে আশ্রমে ফিরে এলেন।[২৪৯]

সেকালের শান্তিনিকেতনের বিনোদন পর্বে যে-সব মাস্টারমশায়রা ছেলেদের কাছে খুব ভালো গল্প বলার জন্য জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন তার মধ্যে অন্যতম ছিলেন ক্ষিতিমোহন। পুরোনো ছাত্র গিরিজানাথ চক্রবর্তী লিখেছেন : 'সন্ধ্যার পর বসিত গানের ক্লাস। যাহারা গানের ক্লাসে যোগ দিত না তাহাদের জন্য গল্পের ক্লাস। গল্প করিতেন ক্ষিতিমোহনবাবু, জগদানন্দবাবু, অজিতবাবু, আরও অনেকে। ক্ষিতিমোহনবাবু বলিতেন বৌদ্ধযুগের কথা, আর ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের কথা।'[২৫০] গল্প বলায় ক্ষিতিমোহনের যে হাস্যরস সৃজনের ক্ষমতা দেখেছিলেন আর-এক ছাত্র প্রমথনাথ বিশী, তাঁর স্মৃতিচারণে সেই কথাটাই প্রাধান্য পেয়েছে। তিনি বলেছেন : 'ক্ষিতিমোহনবাবুরও গল্প বলিবার অসামান্যতা ছিল। তিনি নিপুণ হাস্যরসিক; শব্দকে মোচড় দিয়া অপ্রত্যাশিত রস বাহির করিবার তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা। ছেলে বুড়া সকলেই সমান ভাবে তাঁহার গল্পে আনন্দ পাইত।'[২৫১] এঁদের তুলনায় নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অনেকটা পরের যুগের ছাত্র, তিনি বালক বয়সে ক্ষিতিমোহনের কাছে গল্প শুনেছেন বিশের দশকে। তিনি লিখেছেন বালকদের মধ্যে ঠাকুরদার মতন বসে জমিয়ে গল্প বলতে মাস্টারমশায় ক্ষিতিমোহন অদ্বিতীয় ছিলেন। প্রতি মঙ্গলবার সন্ধ্যাবেলা সেসময় বিনোদন পর্ব হত। রবীন্দ্রনাথ আশ্রমে থাকলে হয়তো গান বা নাটকের মহড়া হত, বা তিনি সদ্যরচিত কিছু শোনাতেন। কখনও বা ছাত্রদের সাহিত্যসভা হত। কোনো দিন বা মাস্টারমশায়রা পালা করে গল্প বলতেন। 'ক্ষিতিমোহনবাবু কিন্তু যে-কটি গল্প বলেছিলেন সব কয়টিই তাঁর নিজস্ব কল্পনাপ্রসূত

মৌলিক তথা মৌখিক রচনা। তান্ত্রিক যুগের রোমহর্ষ উদ্রেক-করা রহস্যের আমেজ থাকত তাতে, এবং তাঁর কথনের অসাধারণ নৈপুণ্যে, আজও মনে পড়ে, ভীতি-মিশ্রিত আনন্দ ও আগ্রহে আমরা কী পরিমাণই না অভিভূত হতাম। একটি দীর্ঘতর গল্প চলেছিল দুই তিন দিন ধরে। . .কানে এখনো যেন বাজছে তাঁর কণ্ঠস্বর,—একদিন গল্পের মাঝখানে লঘু-গুরু উচ্চারণে সংস্কৃত ঢঙে হঠাৎ তিনি আবৃত্তি করে উঠলেন — 'হবর্তাবা/কহিপ্তাসা/টজেগেন /শকেড়ুএ' মন্ত্রোচ্চারণরীতিতে যা বলা হল তা হচ্ছে সাপ্তাহিক বার্তাবহ ও এডুকেশন গেজেট শব্দ দুটির উলটানো আকার। গল্পে এক দেশের পন্ডিত-পুরোহিতরা কী উপলক্ষে যেন এমন উলটো-পালটা মন্ত্র বলতে লাগল যে সেখানে তার ফলে নানা রকম উলটো-পালটা অভাবনীয় কান্ড ঘটতে লাগল। এমন অদ্ভুত সব বিপরীত মন্ত্র আবৃত্তির আরও নানা নিদর্শন তিনি মুখে মুখে তৈরি করে ছেলেদের সামনে হাজির করেছিলেন। নির্মলচন্দ্র আপশোশ করেছেন সে-সব গল্প শ্রোতারা যাঁরা বয়সে বড়ো ছিলেন তাঁরা কেউ লিখে রাখার কথা ভাবেননি, কেবল অধ্যাপক বিভূতিভূষণ গুপ্তের চেষ্টায় একটি গল্প 'মৌচাক' পত্রিকায় বেরিয়েছিল।[২৫২]

বিশ্বভারতীর সূচনা

২৪ ডিসেম্বর ১৯১৮, পৌষ উৎসবের পরদিন যথাবিহিত মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বিশ্বভারতীর ভিত্তি স্থাপন হল। ভাবের বীজটি অনেকদিন ধরেই লালিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের মনের মধ্যে, এবার তার রূপায়ণের উপযুক্ত সময় এল। ক্রমশ দেশ জুড়ে ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনের স্রোত উত্তাল হয়ে উঠছে, অথচ সেই রাজনৈতিক মুক্তিপ্রয়াসের বৃত্তটার বাইরে ভারতবর্ষ শতধাবিচ্ছিন্ন, তার মন হিন্দু বৌদ্ধ জৈন শিখ মুসলমান খ্রিষ্টানের মধ্যে বিভক্ত। ওদিকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ অবসানে সমস্ত ইউরোপ শ্রান্ত ক্ষতবিক্ষত বিপর্যস্ত। তবুও নেভে না লোভ-ক্রোধ-ঈর্ষা আর স্বার্থপরতার আগুন। এরই মাঝখানে দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথ বোলপুরের নির্জন প্রান্তরে এক নতুন ধরনের বিশ্ববিদ্যালয় গড়তে চাইছিলেন। নিশ্চিত বিশ্বাসে উচ্চারণ করছিলেন :

> বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখ্য কাজ বিদ্যার উৎপাদন, তাহার গৌণ কাজ সেই বিদ্যাকে দান করা। বিদ্যার ক্ষেত্রে সেই সকল মনীষীদিগকে আহ্বান করিতে হইবে যাঁহারা নিজের শক্তি ও সাধনা-দ্বারা অনুসন্ধান আবিষ্কার ও সৃষ্টির কার্যে নিবিষ্ট আছেন। তাঁহারা যেখানেই নিজের কাজে একত্র মিলিত হইবেন সেইখানে স্বভাবতই জ্ঞানের উৎস উৎসারিত হইবে, সেই উৎসধারার নির্ঝরিণীতটেই দেশের সত্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হইবে।[২৫৩]

এর অনেকদিন আগে থেকেই তিনি যোগ্য আধার পেলে এই বিদ্যা উৎপাদনের কাজে যথাসাধ্য সহায়তা করে আসছেন। এখন যখন তার ক্ষেত্র সম্প্রসারণের সম্ভাবনা দেখা দিল, তিনি ভাবছিলেন :

> দশ আঙুলকে যুক্ত করিয়া অঞ্জলি বাঁধিতে হয়—নেবার বেলাও তাহার প্রয়োজন, দেবাব বেলাও। অতএব ভারতবর্ষের শিক্ষাব্যবস্থায় বৈদিক পৌরাণিক বৌদ্ধ জৈন মুসলমান প্রভৃতি সমস্ত চিত্তকে সম্মিলিত ও চিত্তসম্পদকে সংগৃহীত করিতে হইবে; এই নানা ধারা দিয়া ভারতবর্ষের মন কেমন করিয়া প্রবাহিত হইয়াছে তাহা জানিতে হইবে।[২৫৪]

রবীন্দ্রনাথ অনেকবার বিশ্বভারতী-প্রতিষ্ঠাদিবসের ভাষণে বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার নেপথ্য ঘটনাটির উল্লেখ করেছেন। পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রীর মনে হয়েছিল টোল-চতুষ্পাঠীকে দেশের শিক্ষার মূল আশ্রয় করে যদি তার উপর অন্য সব শিক্ষার পত্তন করা যায় তবেই শিক্ষা সত্য ও সম্পূর্ণ হবে। ভাবনাটা এই রকম যে জ্ঞানের আধারটাকে নিজের করে তার উপকরণ পৃথিবীর সর্বত্র থেকে সংগ্রহ ও সঞ্চয় করতে হবে। এই সংকল্প মনে নিয়ে তিনি স্বগ্রামে চলে যান। কিন্তু নানা বাধায় তিনি পারেননি চতুষ্পাঠী স্থাপন করতে। তখন রবীন্দ্রনাথ তাঁকে শান্তিনিকেতনে ডেকে নিয়ে তাঁর অভিপ্রায়কে নতুনভাবে রূপ দিতে উদ্যোগী হলেন, বিশ্বভারতীর বীজ উপ্ত হল।

বিশ্বভারতীর কাজ শুরু হল পরের বছর, ৩ জুলাই ১৯১৯ (১৮ আষাঢ় ১৩২৬)। আরম্ভটা অকিঞ্চিৎকর ছিল। সেদিনের ভাষণে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন :

> বিশ্বভারতী একটা মস্ত ভাব, কিন্তু সে অতি ছোটো দেহ নিয়ে আমাদেব আশ্রমে উপস্থিত হয়েছে। কিন্তু ছোটোব ছদ্মবেশে বড়োব আগমন পৃথিবীতে প্রতিদিনই ঘটে, অতএব আনন্দ করা যাক, মঙ্গলশঙ্খ বেজে উঠুক।[২৫৫]

প্রথমটায় পুরোনো অধ্যাপকরাই দায়িত্ব নিয়েছিলেন। গভীর প্রত্যাশায় ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করে কর্মারম্ভের দিনে রবীন্দ্রনাথ সদ্যঅঙ্কুরিত বিশ্বভারতীর আয়োজন সম্পর্কে সকলকে অবহিত করলেন। বললেন :

> আমাদের আসনগুলি ভরে উঠেছে। সংস্কৃত পালি প্রাকৃত ভাষা ও শাস্ত্র অধ্যাপনার জন্য বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় একটিতে বসেছেন, আর একটিতে আছেন সিংহলের মহাস্থবির; ক্ষিতিমোহনবাবু সমাগত; আব আছেন ভীম শাস্ত্রী মহাশয়। ওদিকে এণ্ড্রুজের চারিদিকে ইংরেজি-সাহিত্যপিপাসুরা সমবেত। ভীম শাস্ত্রী এবং দিনেন্দ্রনাথ সংগীতের অধ্যাপনার ভার নিয়েছেন, আর বিষ্ণুপুরের নকুলেশ্বর গোস্বামী তাঁর সুরবাহার নিয়ে এদের সঙ্গে যোগ দিতে আসছেন। শ্রীমান নন্দলাল বসু ও সুরেন্দ্রনাথ কর চিত্রবিদ্যা-শিক্ষা দিতে প্রস্তুত হয়েছেন। ...তাছাড়া আমাদের যার যতটুকু সাধ্য আছে কিছু কিছু কাজ করতে প্রবৃত্ত হব। আমাদের একজন বিহারী বন্ধু সত্বর আসছেন। তিনি পারাস ও উর্দু শিক্ষা দেবেন, ও ক্ষিতিমোহনবাবুর সহায়তায় প্রাচীন হিন্দি সাহিত্যের চর্চা করবেন। মাঝে মাঝে অন্যত্র হতে অধ্যাপক এসে আমাদের উপদেশ দিয়ে যাবেন এমনও আশা আছে।[২৫৬]

স্বদেশের চিত্তসম্পদ বিশ্বের গোচরে আনতে হবে, সমগ্র এশিয়া মহাদেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতিগুলির সম্যক পরিচয় জানতে হবে এবং এগুলিকে মিলিত করে পৃথিবীর সামনে সংহতভাবে উপস্থিত করতে হবে। পশ্চিম মহাদেশের জ্ঞানভাণ্ডারে প্রবেশের চাবিটাও পেতে হবে হাতে, উদাসীন থাকলে চলবে না। পূর্ব ও পশ্চিম গোলার্ধের মানুষ জ্ঞানচর্চা ও কর্মের ক্ষেত্রে পরস্পরের দিকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবে—এই আশা ও

অভীপ্সা নিয়ে যাত্রা শুরু বিশ্বভারতীর। রবীন্দ্রনাথ বললেন : '...আত্মার মুক্তি এমন একটা মুক্তি যেটা লাভ করলে সমস্ত বন্ধন তুচ্ছ হয়ে যায়। সেই মুক্তিটাই, সেই স্বার্থের বন্ধন রিপুর বন্ধন থেকে মুক্তিটাই, আমাদের লক্ষ্য'— বিশ্বভারতী হবে এই কথাটি কান দিয়ে শোনা ও সত্য বলে জানার স্থান। পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী সন্নিভ সংকল্পবাক্য চয়ন করলেন—'যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্'। তিনি বিশ্বভারতীর অধ্যক্ষ, রবীন্দ্রনাথ তাঁকে ক্লাসে পড়ানোর দায়িত্ব থেকে নিষ্কৃতি দিলেন, ভাষাতত্ত্বের চর্চায় প্রবৃত্ত হলেন তিনি।

বিশ্বভারতীর সূচনাপর্বের ভাষণে রবীন্দ্রনাথ যদিও ক্ষিতিমোহনের নামের উল্লেখ করেছিলেন, তা হলেও ১৯১৯-২০ সালে তিনি বিশ্বভারতীর কর্মোদ্যোগের সঙ্গো যুক্ত ছিলেন না বলেই মনে হয়। তিনি আশ্রমবিদ্যালয়ের পঠন-পাঠন এবং প্রশাসনিক কাজ নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন। একটু পরে ১৯২০ সালের আগস্ট মাসে তাঁকে লেখা একটা চিঠি দেখব, তাঁর বন্ধু বিধুশেখর ভট্টাচার্যের লেখা। আপাতত শুধু এইটুকু বলি যে এই চিঠি থেকে জানা যায়, বিদ্যালয়ের কাজকর্মের ভিড়ে ক্ষিতিমোহনের পক্ষে পড়াশোনার সময় পাওয়া অসাধ্য হয়েছে। বিধুশেখর এ কথাও লিখেছেন : 'তোমার অনেক কথা শুনিয়াছি। তোমার প্রতি নানা দিকে অবিচার করা হইয়াছে তাহাও জানি। ইহার কি প্রতিকার হয় না?' বিধুশেখর তো কয়েক বছর শান্তিনিকেতনে ছিলেন না, ক্ষিতিমোহনের সঙ্গো বোধ করি তেমন যোগাযোগও তাই ছিল না, 'তোমার কথা অনেক শুনিয়াছি' লেখবার তাৎপর্য এই-রকম মনে হল আমাদের। পরে তিনি কিছু ব্যাপার জেনে হয়তো বিচলিত হয়েছিলেন এবং সম্ভবত বিধুশেখব ও অ্যান্ডরুজ পরামর্শ করেই প্রতিকার করেন, সর্বোপরি রবীন্দ্রনাথ ছিলেন। ১৯২১ সাল থেকে বিশ্বভারতীর নিয়মিত কাজ শুরু হয়, মনে হয় ক্ষিতিমোহনও সেই সময় থেকে তার কাজে নিয়োজিত হয়েছিলেন।[২৫৭] শাস্ত্রজ্ঞ হয়েও শাস্ত্রের পথ তাঁর জন্য নয়। তাঁর সেই অবিস্মরণীয় স্বীকারোক্তির অনুসরণে বলতে হয় বিদ্যা ও পুথির সুসজ্জিত মন্দির ছেড়ে তিনি পথে বেরিয়েছিলেন। বিশ্বভারতীর আহ্বানে এবার দিন এল পথের সম্পদ পথের পাশে সঞ্চয় করবার। সে কাজ শুরুর মুহূর্তটিকে আমরা লক্ষ করেছি বিশ্বভারতীর জন্মের অনেকদিন আগেই,— যখন তিনি কবীরদোঁহা সংকলন করেছিলেন। বাকি জীবনটা তাঁর এই আহরণ-সংকলন-সম্পাদনা-গ্রন্থরচনার কাজেই কাটবে। শাস্ত্রের পথ ধরেও তাঁকে চলতে হয়েছে, সে কেবল লোকায়ত মতের সঙ্গো তার মিল-অমিল দেখাবার জন্য। আশা করি তার ক্রমিক পরিচয় পেতে আমাদের বাধা হবে না।

এ-সব অবশ্য আরও কিছুদিন পরের কথা। আপাতত উল্লেখ করি ১৯১৯ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর বিদ্যালয়ের ছুটি হতে ক্ষিতিমোহন সপরিবারে দেশের বাড়িতে গিয়েছিলেন। সেবার রবীন্দ্রনাথ ছুটিতে শিলঙে যান, ১১-৩১ অক্টোবর তিনি যখন সেখানে থাকবেন, কথা ছিল ক্ষিতিমোহন তখন যাবেন। কিন্তু পূর্ববঙ্গো এমন এক বিধ্বংসী ঝড় হল যে ক্ষিতিমোহনের যাওয়া হল না। রবীন্দ্রনাথের একটা চিঠি পাচ্ছি তাঁকে লেখা, তাতে এ প্রসঙ্গা আছে :

ওঁ

Brookside
Shillong

সবিনয় নমস্কারপূর্ব্বক নিবেদন

এখানে আমরা আপনার অপেক্ষা করছিলুম। কিন্তু আপনি কেন আসতে পারলেন না তা বুঝতে পেরে ব্যথিত হলুম। পূর্ব্ববঙ্গের উপর রুদ্রহস্তের এত বড় প্রচণ্ড আঘাত লেগেচে, কবে যে আবার সে সুস্থ হয়ে উঠতে পারবে তা ত ভেবে পাই নে। প্রকৃতির কোলে মানুষ এমন একান্ত বিশ্বাসে নিশ্চিন্ত হয়ে বাস করচে—এক মুহূর্ত্তে যখন সে বিশ্বাস ভেঙে যায় তখন কোনো তরফ থেকে তার কৈফিয়ৎ খুঁজে পাওয়া যায় না। শিলঙ জায়গাটি আমার বেশ ভাল লেগেচে। কিন্তু তবু শান্তিনিকেতনের জন্যে আমার মনটা ক্ষণে ক্ষণে চঞ্চল হয়ে উঠ্‌চে— মনে হচ্চে ছুটি ব'টে কিন্তু তবু সেখানে যেন আমার কাজ আছে। এই ইচ্ছার তাগিদ মনের উপর আঘাত করতে করতে একদিন হঠাৎ কখন বেরিয়ে পড়ব। ছুটিরও ত প্রায় অর্দ্ধেক মেয়াদ ফুরিয়ে গেল — গুরুমহাশয়ের চেহারা অনতিদূরে দেখা যাচ্চে। ইতি ৩রা কার্ত্তিক ১৩২৬

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর[২৫৮]

সেবার যাওয়া হয়নি বটে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে, কিন্তু শিলঙে ক্ষিতিমোহন অনেকবার গেছেন, সেখানে অনেক মানুষের সঙ্গে তাঁর আলাপ-পরিচয় ছিল। পরিচিত এবং বন্ধু আরও অনেক জায়গাতেই ছিলেন। কখনও কখনও তাঁর চিঠিপত্রে একটু-আধটু আভাস পাই তার। আর তিনি বেশ কয়েকবার গেছেন দার্জিলিঙ-কার্শিয়াঙে। তাঁর বড়ো জামাই হরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত সরকারি চাকরি করতেন, তাঁদের দপ্তর গরমের সময় চলে যেত দার্জিলিঙে, সেসময় সরকারি বাসায় তাঁর পরিবার গৃহস্থালি পেতে বসতেন। কন্যাগৃহে ক্ষিতিমোহনেরও আমন্ত্রণ থাকত সপরিবারে। তাঁরা যেতেনও। প্রতিভা বসুর স্মৃতিকথায় দার্জিলিঙে ক্ষিতিমোহন সেনের নিকট-সান্নিধ্য পাওয়ার সুন্দর বিবরণ আছে। তিনি লিখেছেন :

দার্জিলিংয়ে আমরা পুরো এক বছর ছিলাম। এর মধ্যে মনে রাখবার মতো অনেকগুলো ঘটনাই ঘটলো। প্রথম ঘটনা শ্রদ্ধেয় ক্ষিতিমোহন সেনের সঙ্গে দেখা। এরকম একজন সুরসিক পণ্ডিত এবং সদাহাস্যময় ব্যক্তি আর দেখিনি। দাদা পচাদা আমি সারাদিন তাঁকে ঘিরে থাকতাম। কোথায় উঠেছিলেন মনে নেই, প্রতিদিন সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত তাঁর সঙ্গ অন্তত একবার আমাদের পাওয়া চাই। যে ক'রে হোক দাদা পচাদা গিয়ে তাঁকে ঠিক ধরে আনবে বাড়িতে। তারপর সব গোল হয়ে বসবো। তিনি এমন সব গল্প বলবেন, এমন সব রসিকতা করবেন যে হাসতে হাসতে মরে যাবো। সত্যিই সদানন্দ পুরুষ। মহাপুরুষ।[২৫৯]

গুরুমশায়ের চেহারা অনতিদূরে দেখা যাচ্ছে— লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, দেখতে দেখতে ফুরিয়েছিল ছুটি। যথাবিধি কাজকর্ম শুরু আবার। খবর পাচ্ছি আগামী শিক্ষাবর্ষেও ক্ষিতিমোহন সর্বাধ্যক্ষ নির্বাচিত হয়েছেন।[২৬০] তখনও পুরোনো ধারাই বলবৎ আছে, মাস্টারমশায়দের মধ্যে এক-একজন এক-একবার সর্বাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন, তার মধ্যে কোনো

ছোটো-বড়ো নেই, বেতনহারের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই।[২৬১] অধ্যাপকসভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সর্বাধ্যক্ষ ছাড়াও তিনটি বিভাগীয় প্রধানের পদে নির্বাচন হয়ে আসছিল কয়েক বছর থেকে। প্রয়োজনে প্রশাসনিক কর্মব্যবস্থায় নানা রদবদল নানা সময়ে হয়েছে। বিশ্বভারতীর সূচনাপর্ব থেকে শিক্ষা, ছাত্রপরিচালনা, আয়-ব্যয়, প্রেস আর পূর্তবিভাগের জন্য কর্মসমিতিতে পৃথক পৃথক সদস্য নেওয়া স্থির হল। তখনও বিশ্বভারতী বলতে উচ্চতর শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চা এবং গবেষণাকেন্দ্র বোঝায়, তখনও ভাবনাটা এইরকম যে আশ্রমবিদ্যালয়ের কার্যনির্বাহী সমিতিতে বিশ্বভারতীর প্রতিনিধি থাকবেন। তবে প্রশাসনে যে একটা সার্বিক পরিবর্তনের সম্ভাবনা আসন্ন আগামী বছর দুয়েকের মধ্যে তার প্রমাণ পাওয়া যাবে। শান্তিনিকেতন বিদ্যায়তনের সম্পূর্ণ দায়িত্ব অর্পিত হবে বিশ্বভারতী সংসদের উপর। পুরোনো ধারার আশ্রমপরিচালনব্যবস্থা আর থাকবে না।

এইখানে আর-একটি কথাও উল্লেখ করি। বিশ্বভারতীর জন্য প্রথম যে কর্মসমিতি গঠিত হল, তার সদস্যপদে ক্ষিতিমোহন ছিলেন।[২৬২] আমরা এর পরে দেখব, সর্বাধ্যক্ষের দায়িত্ব নিয়ে কাজ শুরু করলেও তিনি শারীরিক অসুস্থতার কারণে কার্যকাল শেষ হওয়ার আগেই পদত্যাগ করেন। অসুস্থ হয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু আরও কিছু যেন তিনি সেই সময় ভাবছিলেন। সে প্রসঙ্গ যথাকালে আসবে, কিন্তু ইতিমধ্যে তাঁর বাসাবদলের একটা নিশ্চিত সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। সেই কথাটাই আগে বলি। অমিতা সেন লিখেছেন :

> আমার বয়স যখন ছয় শুনলাম আশ্রমের দক্ষিণের মাঠ পেরিয়ে অধ্যাপকদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন বাড়ির পরিকল্পনা হচ্ছে। আমাদের সবার আলাদা বাড়ি হবে, সে বাড়িতে নাকি তিনটে করে শোবার ঘর, রান্নার ঘর, স্নানের ঘর—বারান্দাও থাকবে। আবার সামনে পিছনে থাকবে বাগান করবার জায়গা। ...আশ্রমেব দক্ষিণ দিকের মাঠের শরঝোপ কাঁটাঝোপ কেটে পরিষ্কার হল, বাড়ির ভিৎ কাটা শুরু হল।[২৬৩]

সেটা ১৯১৯ সাল, আশ্রমের দক্ষিণে শিক্ষকদের জন্য গৃহনির্মাণের সিদ্ধান্ত হয়েছিল। প্রথমে কথা হয় শিক্ষকরা বাড়িভাড়ার সঙ্গে মাসে মাসে কিছু কিছু করে টাকা দিয়ে অবশেষে বাড়ির মালিক হবেন, অবসর নেওয়ার পরে সেই বাড়িতেই থাকতে পারবেন। কিন্তু পরে স্থির হয় মালিকানাপ্রাপ্তি নয়, অধ্যাপকরা ভাড়ার বিনিময়েই এই কুটিরগুলিতে বাস করতে পারবেন সপরিবারে। মাসিক ভাড়া হল পাঁচ টাকা, একে একে নটি মাটির বাড়ির গাঁথনি শেষ হল, খড় ছাওয়া হল চালে। কাজ শেষ হতে জোটবাঁধা সংসার ছেড়ে শিক্ষক-পরিবারগুলি নিজের নিজের বাড়িতে এসে উঠল।[২৬৪] ছায়া-ঢাকা আশ্রমের দিক থেকে দেখা যেত বিরাট এক মাঠের অপর দিকে ঘেঁষাঘেঁষি কয়েকটি খড়ের চালের মাটির কুটির। গুরুপল্লি। এই কুটিরগুলিতে হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, নিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী, নন্দলাল বসু, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রমুখ অনেক শিক্ষক কমবেশি দিন থেকেছেন। ক্ষিতিমোহনও একটানা সপরিবারে ছিলেন প্রায় বাইশ-তেইশ বছর। তারপর শ্রীপল্লিতে নিজের বাড়ি যখন তৈরি হচ্ছে, কিছুদিন পাশেই ছোটো মেয়ে অমিতার বাড়িতে থাকেন। চল্লিশের দশকে স্বগৃহে প্রবেশ, সেইখানেই জীবনের শেষ প্রায় সতেরো বছর কাটে।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গো গুজরাতে

শান্তিনিকেতনে ছুটিরও নানা পরীক্ষা হয়েছে। তার মধ্যে একবার গরমের সময় সারা বছরের ছুটি একসঙ্গো একটানা দেওয়া হয়েছিল। সেটা ১৯২০ সাল, ১২ চৈত্র ১৩২৬ থেকে ১১ আষাঢ় ১৩২৭—এই তিন মাস ছুটি থাকবে কথা হয়েছিল। কোনো কারণে ক্ষিতিমোহন সম্ভবত ফেব্রুয়ারি মাসে দেশে গিয়েছিলেন এবং সেখানে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। বেশ অসুস্থ শরীরেই সেখান থেকে চলেও আসেন, কিরণবালা সোনারঙে ছিলেন। ক্ষিতিমোহন মনে হয় শান্তিনিকেতনেই ফিরেছিলেন, তখনও বিদ্যালয় বন্ধ হতে দেরি ছিল। ৫ মার্চ ১৯২০ উদ্‌বিগ্ন মনে কিরণবালা যে চিঠি লেখেন, ক্ষিতিমোহনের অসুস্থতার কথা তা থেকে জানা যায়। কিরণবালা লিখেছিলেন :

> নেড়ীর কাছে আজ যে চিঠী লিখিয়াছ তাহা দেখিয়া অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলাম। যে অসুস্থ শরীর লইয়া গিয়াছ। এইরকম শরীর লইয়া দূরে গেলে মনটা যে কি খারাপ হইয়া থাকে তাহা বলিতে পারি না। কেবলই মনে হয় হয়তো এখন কষ্ট পাইতেছে, এখন বেদনা উঠিয়াছে। এই দুদিন আমার আর সুস্থির ভাব ছিল না। কাছে থাকিতে অবশ্য কোন আরাম দিতে পারি নাই বরং অনেক ত্রুটিতে কষ্টই পাইয়াছ। তবুও দূরে গেলে ভাল লাগে না। সম্পূর্ণ সুস্থ না হওয়া পর্য্যন্ত ২/১ দিন অন্তর একটু একটু সংবাদ দিও। এবং ইহার একটু ভালরকম চিকিৎসা করিও।[২৬৫]

মনে হয় ক্ষিতিমোহনের সুস্থ হয়ে উঠতে খুব বিলম্ব হয়নি। মার্চ মাসের শেষে সুযোগ হল তাঁর রবীন্দ্রনাথের সঙ্গো পশ্চিম ভারতে যাওয়ার। কয়েক মাস আগে গান্ধীজি রবীন্দ্রনাথকে আমেদাবাদে গুজরাত সাহিত্যসম্মেলনে সভাপতিত্ব করার জন্য অনুরোধ করে চিঠি দেন। ১৯১৯-এর ডিসেম্বরে সম্মেলন হওয়ার কথা ছিল। নানা কারণে দিন পিছিয়ে গিয়ে এ বছরের ইস্টারের ছুটিতে সম্মেলন হবে স্থির হয়। ১৪ জানুয়ারি ১৯২০ গান্ধীজি আবার লিখলেন এবং রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করলেন আমন্ত্রণ। ২৯ মার্চ বোম্বাই যাত্রা করলেন তিনি, সঙ্গো অ্যান্ডরুজ, ক্ষিতিমোহন, সন্তোষচন্দ্র মজুমদার ও বিশ্বভারতীর তরুণ ছাত্র প্রমথনাথ বিশী।[২৬৬] বোম্বাই থেকে সেইদিনই রাতের ট্রেনে তাঁরা গেলেন আমেদাবাদ। ২ এপ্রিল সাহিত্যসম্মেলন, ইস্টার ফ্রাইডের দিন। ক্ষিতিমোহন লিখেছেন :

> তখনও নন-কোঅপরেশন আন্দোলন আরম্ভ হয় নাই কিন্তু সূর্য উদয়ের পূর্বকালীন আকাশের মত সমস্ত গুজরাতের চিত্তাকাশ এই আন্দোলনের উৎসাহে ও উদ্দীপনায় ভরপুর। ...আমরা গিয়া দেখিলাম সাহিত্যের নামে ডাক আসিলেও গুজরাতের সমস্ত চিত্ত তখন রাজনীতির উত্তেজনাতেই উদ্দীপ্ত।[২৬৭]

কেউ কেউ মনে করছিলেন এই আন্দোলন রবীন্দ্রনাথ সমর্থন করেন কি না তা জানাও গান্ধীজির উদ্দেশ্য ছিল— লিখেছেন ক্ষিতিমোহন।

> আমেদাবাদে রবীন্দ্রনাথের আদর-অভ্যর্থনা যথেষ্ট হইল, সাহিত্য সম্মেলনেও তাঁহার অভিভাষণ অতিশয় আদরের সহিত গৃহীত হইল। নানা রাজনীতিগত আলাপ-আলোচনা লইয়াও লোকের পর লোক তাঁহার কাছে আসিতে লাগিলেন।[২৬৮]

রবীন্দ্রনাথের ভাষণের শিরনামা ছিল Construction Versus Creation।

অম্বালাল সারাভাইয়ের অতিথি হয়ে তাঁর গৃহে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সেখানে পণ্ডিত করুণাশংকর কুবেরজির সঙ্গে আলাপ হতে ক্ষিতিমোহন এই মানুষটির সঙ্গে চিরকালের মতো বন্ধুত্বের বাঁধনে বাঁধা পড়ে গেলেন।[২৬৯] সম্মেলনের পরে রবীন্দ্রনাথ এলেন গান্ধীজির সাবরমতী আশ্রমে, ক্ষিতিমোহনরা তার আগেই এসেছিলেন। কস্তুরবা স্বয়ং নিয়েছিলেন আতিথ্যের ভার, কবি ছিলেন হৃদয়কুঞ্জে।[২৭০] সাবরমতী নদীর অপর পারে আশ্রম, রবীন্দ্রনাথ প্রথমবার ইংল্যান্ড যাওয়ার আগে শাহিবাগের যে নবাবি আমলের বাড়িতে ছিলেন, সে বাড়ি সেখান থেকে অল্প দূরে। আসবার পরদিন আশ্রমের প্রাত্যহিক প্রভাতি উপাসনায় আচার্যের কাজ করলেন রবীন্দ্রনাথ আর সেদিন বিকেলে তাঁর তরুণ বয়সের স্মৃতিজড়ানো শাহিবাগ দেখতে গেলেন ক্ষিতিমোহন সন্তোষচন্দ্রদের নিয়ে, আরও কেউ কেউ সঙ্গী হলেন। সেসময় সেই বাড়ি যেমন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সরকারি আবাস ছিল, এখনও এই বিয়াল্লিশ বছর পরেও তা এক সাহেব বিচারকের বাসগৃহ। সঙ্গীদের নিয়ে সেই চিলেকোঠার ঘরখানায় গিয়ে দাঁড়ালেন রবীন্দ্রনাথ, যে ঘরে তিনি ছিলেন তাঁর সতেরো বছর বয়সে। বোলতাচাকের বোলতাদের সঙ্গে একত্রবাসের স্মৃতি নিয়ে, সত্যেন্দ্রনাথের গ্রন্থাগারে একা একা আধো-বোঝা আধো-না-বোঝার রহস্যালোকে দুপুর-কাটানোর স্মৃতি নিয়ে বেশ একটু নাড়াচাড়া হল, নাড়াচাড়া হল সেই সময়কার ধ্বনিলালিত্যের আকর্ষণে পড়া অমরুশতক-গীতগোবিন্দের স্মৃতি নিয়ে। সেদিনের কথাপ্রসঙ্গে ক্ষিতিমোহন স্মরণ করেছেন করুণাশংকরজির অনুরোধে অমরুশতকের দু-একটি শ্লোকের পঙ্‌ক্তি স্মরণ করছিলেন রবীন্দ্রনাথ আর পরমোৎসাহে সেগুলির পাদপূরণ করছিলেন ক্ষিতিমোহন-করুণাশংকর। এই-সব শ্লোকের ছন্দসম্পদ নিয়ে তখন-তখনই কী চমৎকার আলোচনা করছিলেন রবীন্দ্রনাথ, সে কথা তিনি ভোলেননি।[২৭১]

সাবরমতী আশ্রমে বসে রবীন্দ্রনাথ-গান্ধীজির মধ্যে যে-সব কথার আলোচনা হত, আগ্রহভরে শুনতেন ক্ষিতিমোহন। একটা প্রসঙ্গ খুব টেনেছিল মনকে। আত্মপ্রসারণচেষ্টাই কেবল একটা জাতিকে প্রাদেশিক সংকীর্ণতা থেকে উদ্ধার করতে পারে— এ আলোচনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বঙ্গদেশের দৃষ্টান্ত দিয়েছিলেন। পূর্বকালে যখন তার ধর্ম-শিক্ষা-সংস্কৃতির আলো ছড়িয়ে পড়েছিল দূরে-দূরান্তে, সে এক গৌরবময় যুগ। কোনো ক্ষুদ্রতার বেড়া তখন তাকে বাঁধেনি। সেই থেকে ক্ষিতিমোহন ভেবেছেন বঙ্গের গৌরবময় যুগ নিয়ে, সময় পেলেই অল্প অল্প করে পড়াশোনা করেছেন, তথ্য সংগ্রহের দিকে মনোযোগ রেখেছেন। সেই প্রেরণারই ফসল তাঁর 'চিন্ময়বঙ্গ' (১৯৫৭)।[২৭২]

মেয়েদের একটি প্রতিষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। ক্ষিতিমোহন বেশ বিস্তৃত করে লিখেছেন সেই প্রসঙ্গ।

> সাহিত্য সম্মেলনের কাজটুকু চুকিলেই আমেদাবাদের মেয়েরা আসিয়া তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিলেন। সেখানকার বনিতাবিশ্রাম মেয়েদের একটি বড় প্রতিষ্ঠান, সেখানে যাইয়া মেয়েদের আদর্শ ও সাধনার বিষয়ে কিছু বলিবার জন্য কবির কাছে তাগিদ আসিল। তিনিও রাজি হইলেন। তখন সারা

গুজরাতের চিত্ত রাজনীতির উত্তেজনায় ভরপুর। সেখানকার মেয়েরাও সেই উত্তেজনার স্রোতে ডুবিয়া আছেন, এমন সময় তাঁহার কথা মেয়েরা কিভাবে গ্রহণ করিবেন তাহাও ভাবিবার বিষয়। তাহার পর তাঁহার একটি সমস্যা হইল ভাষা, তখন সেখানে অধিকাংশ মেয়েই ইংরেজী জানিতেন না। তবে প্রধান উদ্যোগী শ্রীমতী বিদ্যা গৌরী ও শ্রীমতী মাগঙ্গা গৌরী এই দুইজনই ছিলেন গ্রাজুয়েট। যাহা হউক কথা হইল গুরুদেব বলিবেন বাংলায় — আমি তাহা দিব অনুবাদ করিয়া।[২৭৩]

রবীন্দ্রনাথ যে এদের কাছে বলেছিলেন পুরুষের অনুকরণে সমসাময়িক রাজনীতির উত্তেজনায় ভেসে না-গিয়ে নারীকে সত্যসাধনায় ব্রতী হতে হবে, প্রত্যেক নারীর মধ্যে সুপ্ত আছেন তপস্বিনী গৌরী, যাঁর সাধনায় শিব জাগ্রত হন,— তাঁকে জাগাও তোমরা,[২৭৪] বোঝা যায় এই দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থক ক্ষিতিমোহন নিজেও।

এর পর কাঠিয়াওয়াড়, দেশীয় রাজ্য ভাবনগরে নিমন্ত্রণ কবির। এপ্রিল মাসের দিনের-বেলার দারুণ গরম উপেক্ষা করে স্টেশনে স্টেশনে নারীরা দলবদ্ধ হয়ে ধূপ-দীপ-নারিকেল ফুলের মালা নিয়ে তাঁকে সংবর্ধনা জানাচ্ছেন আর গুরুদেব তাঁদের আশীর্বাদ করছেন— দেশের দুর্গতি দূর করতে নিজেকে সত্য তপস্যায় দীক্ষিত কর, মুক্ত হও মিথ্যা ও কৃত্রিমতা থেকে, ক্ষিতিমোহন স্মরণ করেন সে-সব অভিজ্ঞতা। করুণাশংকরজি আমেদাবাদ থেকে সঙ্গী হয়েছেন, অনেকে নিতে এসেছেন ভাবনগর থেকেও। বৃদ্ধ মনিশংকর মেহতাজি সর্বদা যত্ন করছেন তাঁদের। ভক্তবৃদ্ধ প্রাণজীবন উদ্ধবদাম ঠাকুর সবচেয়ে বিস্মিত করেছেন—অভিজাত পবিবারের এই মানুষটি বৈষ্ণব ভাবে পূর্ণ হয়ে তাঁদের সেবায় প্রবৃত্ত আছেন। প্রধানমন্ত্রী স্যার প্রভাশংকর পট্টানির তত্ত্বাবধানে কবির সম্মানে যথেষ্ট জমকালো সংবর্ধনাসভা হল। তার পর রবীন্দ্রনাথ যখন জানতে চাইলেন ভাবনগরে যথার্থ দ্রষ্টব্য বস্তু কী আছে, তখন ক্ষিতিমোহন সন্ধান দিলেন এখানকার ভক্তদের মন্দিরা বাজিয়ে ভজনগান অসামান্য। বলবন্ত ঠাকুরের বাড়িতে আয়োজন হল সেই ভজনগানের।

সেখানে ভক্ত নারীদেব মন্দিরায় অপূর্ব ছন্দে ভজন এবং তাহার সঙ্গো সর্বদেহের ছন্দে প্রণিপাত দেখিয়া কবিগুরু একেবারে মুগ্ধ হইলেন। ভক্তেরা মীরার কয়েকটি গান করিলেন আব গাহিলেন ভাণভগত, রবিসাহেব জীবনসাহেব প্রভৃতির সব ভজন।[২৭৫]

এ-সব তো তাঁর প্রাণের জিনিস। 'দাদূ' গ্রন্থে সেই গান শোনার অভিজ্ঞতা স্মরণ করেছেন ক্ষিতিমোহন :

গুজরাতে কাঠিয়াওয়াড়ে ভজনী সাধুদের মধ্যে এইরূপ মন্দিরার তালে অতি মনোহর নৃত্য ও মন্দিরার বাদনকলা আছে। না দেখিলে তার চমৎকারিত্ব বুঝান অসম্ভব।[২৭৬]

কথাটা বলতে গিয়ে মনে পড়ে যায় সেই সাখী যেটি একবার দাদূ গুজরাতের এক শিষ্য সাধুকে লিখে পাঠান, মন্দিরা পাঠাবার ইঙ্গিত ছিল তাতে :

দাদূ বাংধে সুর নরায়ে বাজেঁ এহ্বা সোধি মু লীজ্যো।
রাম সনেহী সাধু হাথে, বেগা মোকলি দীজ্যো॥ (পারিখ অংগ ২৩)

ভগবদ্‌ভক্ত সাধুর হাতে সুরকে বাঁধিয়া উত্তম বাজে এমন যে বস্তু তাহা খুঁজিয়া লইও, ও শীঘ্র এখানে পাঠাইয়া দিও।

পাশাপাশি অন্য একটা সাখীও মনে আসে যাতে এই মন্দিরা আনানোর বিবরণটা আছে :

গুর দাদূ গুজরাত থৈঁ মঁগ্‌বায়ে মংজীর
তব য়হ সাখী লিখ দঈ, সুনি লায়ে শিখ ধীর॥

গুরু দাদূ গুজরাত হইতে মন্দিরা আনাইলেন। তখন এই সাখীটি লিখিয়া দিয়াছিলেন, শুনিয়া ধীর শিষ্য তাহা আনিয়াছিলেন।[২৭৭]

কাঠিয়াওয়াড়ে এক বৃদ্ধা তাপসীমাতাকে ক্ষিতিমোহন জানতেন, তাঁর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় করিয়ে দিলেন। পূর্বাশ্রমে অভিজাতবংশীয়া ছিলেন এই নারী, রবীন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করলেন : 'আপনি যখন এই দুঃখের পথে নামলেন তখন আত্মীয়স্বজনেরা বাধা দেন নি?' তিনি বললেন 'যাঁরা স্নেহ করেন তাঁরা তো বাধা দেবেনই, তাঁরা বলেছিলেন নারী তো কখনও এমন তপস্যা করেনি।' তখন দাদূ দুহিতা নানিমাতা যা বলেছিলেন তাই পুনরুচ্চারণ করে এই তাপসীমা তাঁদের কথার উত্তর দিয়েছিলেন :

নার নে নহিঁ হোয় কচ্ছ?
কহাঁ হৈ অস দাবা?

কেন মনে করিতেছ দুষ্কর তপস্যা নারীর অসাধ্য? নারীর কাছে কি এত বড় দাবী পূর্বে কখনও করা হইয়াছে?

এমন একটি নারীর দর্শন পেয়ে রবীন্দ্রনাথ গভীর আনন্দ পেয়েছিলেন। যখন মেয়েদের মুখে কেবলই পুরুষের কথার প্রতিধ্বনি শুনতে হচ্ছে, তখন এঁর কাছে শুনতে পেলেন : 'নারী কোমল এই জন্য যদি বল মুক্তির তপস্যায় সে অযোগ্য তবে বলিব অঙ্কুরও তো কোমল, তবু পাষাণবৎ কঠিন সব বাধা সে মুক্ত করিতে পারে। জীবন চিরদিনই কোমল ও সুকুমার অথচ তাহার মত দুর্জ্জয় শক্তি আছে কোথায়?'[২৭৮]

কাঠিয়াওয়াড় থেকে আর-এক দেশীয় রাজ্য লিম্‌ডি। সেখানে ৬ এপ্রিল কবি হিন্দিতে যে ভাষণ দিলেন সে ভাষণ ক্ষিতিমোহনের লেখা। লিম্‌ডি থেকে আমেদাবাদে ফিরে একদিন তিনি নাড়িয়াদে গেলেন, ৯ এপ্রিল সেখানে তাঁর বক্তৃতা হল।[২৭৯] ক্ষিতিমোহন লিখেছেন গুজরাত প্রদেশে রামচরণ সম্প্রদায়ের অনেক মঠ আছে,

১৯২০ সালে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ইঁহাদের নাড়িয়াদস্থিত মঠের সাধকদের সঙ্গে আলাপ করেন। গীতাঞ্জলির গান শুনিয়া তাঁহারাও মুগ্ধ হন। কবিগুরুও ইঁহাদের ভজন শুনিয়া বলেন ইঁহারা তো আমাদেরই লোক।[২৮০]

১৬ এপ্রিল বরোদা পৌঁছোলেন ক্ষিতিমোহন। উঠলেন আইনব্যবসায়ী বন্ধু ভাহ্যাভাই পুরোহিতের বাড়িতে। তাঁর স্ত্রী রেবা বেনের আতিথেয়তার খ্যাতি ছিল সারা গুজরাতে।

১৭ই গুরুদেব বরোদায় আসিয়া রাজঅতিথি হইয়া রাজকীয় গেষ্ট হাউসে উঠিলেন। সেখানে সব চাকরবাকর-পাচকের দল সোনালী রূপালী তকমায় ভূষিত। আমাকে গুরুদেব জিজ্ঞাসা করিলেন,

"আপনি এই গেষ্ট হাউসে উঠেন নাই কেন?" আমি আমার বন্ধু পুরোহিত মহাশয়ের পত্নীকে দেখাইয়া বলিলাম, "আমি ইঁহার আতিথ্য লইয়াছি।" তখন গুরুদেব বলিলেন, "আপনি বেশ ভাগ্যবান, যথার্থ অন্নপূর্ণার সেবাযত্নই আপনি লাভ করিয়াছেন, আমার ভাগ্যে জুটিয়াছে সব দাড়িওয়ালা অন্নপূর্ণা।" এই কথা শুনিয়া শ্রীমতী রেবা বেন (শ্রীমতী পুরোহিত) গুরুদেবের সেবায় ও অনেক কাজে সাহায্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।[২৮১]

১৯ এপ্রিল সকালে রবীন্দ্রনাথকে নৃসিংহাচার্য প্রবর্তিত সম্প্রদায়ের নারীরা সহচরী সম্মেলনে নিমন্ত্রণ করেন। আর বিকেলে তাঁকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন মহিলাসমাজ। সেখানে কবি নারীর দুটি স্বরূপের ব্যাখ্যা করেন : 'একটি হইল কলা ও সৌন্দর্যের প্রতিমা, আর একটি স্বরূপ হইল তপস্বিনীর।' এ কথা লিখতে গিয়ে ক্ষিতিমোহন স্মরণ করেছেন 'বলাকা'-র 'দুই নারী' ও কবির যৌবনে রচিত 'রাত্রে ও প্রভাতে' কবিতাদ্বয়।[২৮২] এই বক্তৃতার আগে সেইদিন দুপুরবেলা আব্বাস তায়েবজির বাড়ির মেয়েরা কবির সঙ্গে নানা বিষয়ে আলোচনা করেছিলেন। গৃহকর্তার সুশিক্ষিতা কন্যার প্রশ্নের উত্তরে তিনি যা বলেছিলেন, ক্ষিতিমোহনের লেখায় তার স্বচ্ছন্দ বিবরণ আছে। সেদিনই আবার রাত্রে বরোদার দেওয়ান স্যার মনুভাইয়ের বাড়িতে 'চিত্রা' অভিনয় হল, চরিত্রলিপির উল্লেখ আছে।[২৮৩]

এ-সব ছাড়া বরোদায় একটি অন্ত্যজ সমাজ আয়োজিত রবীন্দ্র-সংবর্ধনাসভা হয়েছিল, ওই একই দিনে সন্ধ্যাবেলা তারও অনুষ্ঠান হয়, 'চিত্রা' অভিনয়ের আগে। ক্ষিতিমোহন লিখেছেন :

ঠিক ২২ বৎসর পূর্বে যখন কবি গুজরাটের নিমন্ত্রণে সেই প্রদেশে যান তখন গিয়া দেখেন সেই সব দেশে অস্পৃশ্যতার দুর্গতি বাঙলা দেশ হইতে অনেক বেশী। তখনও মহাত্মা গান্ধীর অস্পৃশ্যতাবিরোধী আন্দোলন আরম্ভ হয় নাই। তখন বরোদাতে গিয়া দেখেন বরোদার গায়কওয়াড়ের প্রতিষ্ঠিত ও আত্মানন্দজীর প্রবর্তিত অন্ত্যজ আশ্রমে এই দুর্গতির প্রতিকারকল্পে কিছু কাজ আরম্ভ হইয়াছে। সেখানে ১৯২০ সালের ১৯শে এপ্রিল সন্ধ্যাকালে অন্ত্যজ আশ্রমবাসীরা কবিকে নিমন্ত্রণ করেন। সেখানে তিনি কি অপূর্ব কথাগুলি বলিয়াছিলেন তাহা কোথাও প্রকাশিত হয় নাই।[২৮৪]

ক্ষিতিমোহনের প্রবন্ধে এই ভাষণের বিস্তৃত পরিচয় আছে। অনেক দিন পরে শান্তিনিকেতনে এক মন্দির-ভাষণে বরোদার এই সভার কথা ক্ষিতিমোহন বলেছিলেন। সামাজিক ঘৃণার শিকার এই মানুষগুলি রবীন্দ্রনাথের সাহায্য ও পরামর্শ চাইলে তিনি তাঁদের বলেন : 'আপনারা আমার সাহায্য চাইছেন। তার চেয়ে বরং আপনারাই এই হীনমন্যতা ঝেড়ে ফেলে আমরা যারা এই অন্যায়ের ভারে সর্বনাশের অতলে তলিয়ে যাচ্ছি তাদের রক্ষা করুন।' রবীন্দ্রনাথ খুব উত্তেজিত হয়ে গিয়েছিলেন। এরপর পুনায় গিয়ে তিনি লোকমান্য তিলকের সঙ্গে দেখা করেন এবং অস্পৃশ্যদের উদ্ধারের দায়িত্ব গ্রহণের অনুরোধ জানান। তিলকের অশেষ সহানুভূতি ছিল কিন্তু আর সময় ছিল না। জীবনের অবসানবেলা তখন আসন্ন। শান্তিনিকেতনে ফিরে এসে রবীন্দ্রনাথ এই কাজের দায়িত্ব নেওয়ার অনুরোধ জানিয়ে গান্ধীজিকে চিঠি দিলেন। তিনিও প্রথমটায় অসহযোগ

আন্দোলনের কাজের চাপে মন দিতে পারেননি, যদিও অস্পৃশ্যতা-সমস্যা নিয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর কয়েকটি পত্রবিনিময় হয়েছিল। তবে কাজের চাপে এ ব্যাপারে যথাযথ মনোযোগ দিতে তাঁর সময় লেগেছিল।[২৮৫]

ইতিমধ্যে বরোদা থেকে তাঁরা গিয়ে পৌঁছেছেন সুরাতে, স্থিতিকাল ২১-২৩ এপ্রিল। রবীন্দ্রনাথের থাকবার ব্যবস্থা হয়েছিল নগরের বাইরে নগিনদাসের বাগানে। ডাক্তার বায়জি ডাক্তার হোরা প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বাড়ির মেয়েরা আতিথ্যভার নিয়েছিলেন, সমস্ত পরিবেশটি সহজ ও মনোমতো হয়ে উঠেছিল। হয়তো বা বরোদার 'দাড়িওয়ালা অন্নপূর্ণা'-র খবরটা গোপন থাকেনি। ২২ এপ্রিল সেখানকার মহিলা আশ্রমের সমাবেশে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভাষণে বলেছিলেন যে গুজরাতে তিনি যদি শুধু পুরুষের হাত থেকে সম্মানিত আতিথ্য পেয়ে বিদায় নিয়ে যেতেন তা হলে যাওয়ার সময় রেখে যেতেন শুকনো ফুলের রাশি আর নিভে-যাওয়া মাটির প্রদীপ, এখন মেয়েদের হাত থেকে এই অভ্যর্থনা পেয়ে মনে হচ্ছে গুর্জরজননী তাঁকে যেন আজ তাঁর অন্তরে ডেকে নিলেন। ক্ষিতিমোহন বেশ বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন এই ভাষণেরও। সেদিন সন্ধ্যার পরে তাঁরা শহর থেকে একটু দূরে সমুদ্রধারে ডুমাস বলে একটা জায়গায় যান, সেখানেও কবির কথা হয়েছিল মেয়েদের সঙ্গে। কবিকে নানা জায়গায় শিক্ষিতা গুর্জরকন্যারা মেয়েদের সম্পর্কে নানা প্রশ্ন করেছিলেন, উত্তর দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের নারী-সম্পর্কিত যে ভাবনা ব্যক্ত হয়েছিল, ক্ষিতিমোহনের লেখায় তার বেশ খানিকটা ধরা আছে। এ-সব কথা লিখতে গিয়ে লেখকের মনও উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে আর বারবার তাঁর মনে পড়ে যায় সমান্তরাল রবীন্দ্র-কবিতাগুলি।[২৮৬] ২৩ তারিখে সুরাতে কবির পৌরসংবর্ধনার আয়োজন। আগেই প্রচারিত হয়েছিল সংবর্ধনার উত্তরে কবি বাংলায় ভাষণ দেবেন। সঙ্গী ক্ষিতিমোহন স্মৃতিচারণ করেন, সেদিন সকালে চায়ের টেবিলে বসে ভাষণ লেখা শেষ করে কবির মনে হল শ্রোতারা তো সকলেই গুজরাতি, তাঁর বক্তব্য যাতে তাঁদের পক্ষে সহজবোধ্য হয় সে চেষ্টা করা উচিত। রবীন্দ্রনাথের এই লিখিত ভাষণ ক্ষিতিমোহন সেনের কাগজপত্রের মধ্যে দেখেছি। রবীন্দ্রনাথের হাতে পেনসিলে লেখা মূল ভাষণের কোনো কোনো শব্দের মাথায় গুজরাতি প্রতিশব্দ লেখা আছে কালিতে, খুব ছোটো ছোটো হরফে। সেগুলি এবং দু-একটি শ্লোক ও শ্লোকাংশ ক্ষিতিমোহনের হাতে লেখা। তাই অনুবাদের প্রয়োজন হয়নি, রবীন্দ্রনাথ নিজেই তাঁর ভাষণ শ্রোতাদের কাছে গ্রহণযোগ্য করতে ভাষণ-লেখা কাগজে শব্দের মাথায় লিখে-রাখা শব্দ-কটির সদ্‌ব্যবহার করতে পেরেছিলেন।[২৮৭] ফেরার পথে ২৭ এপ্রিল রবীন্দ্রনাথ হঠাৎ মনস্থির করে পুনায় মহামতি তিলকের সঙ্গে দেখা করতে যান। এ প্রসঙ্গ একটু আগেই উল্লেখ করেছি, ক্ষিতিমোহন তাঁর এক গান্ধীজয়ন্তীর ভাষণেও এ ঘটনার আলোচনা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ যখন পুনায় যাওয়া স্থির করলেন, বোম্বাইতে তখন সম্ভ্রান্ত সব ব্যক্তিরা তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের অপেক্ষায় রয়েছেন, অপেক্ষায় রয়েছে অনেক প্রতিষ্ঠানও। 'বোম্বাইতে তখন তাঁহার অনেক কাজ। সে-সব তিনি আমাদের উপর চাপাইয়া দিয়া পুণা চলিয়া গেলেন।' —ক্ষিতিমোহন লিখেছেন। শান্তিনিকেতন ও নবপ্রতিষ্ঠিত

বিশ্বভারতীর আদর্শ ব্যাখ্যা করার দায়িত্ব এসে পড়ল এবার তাঁর উপর। এ জন্য তাঁকে পরিচয়জ্ঞাপক একটি চিঠি লিখে দিয়ে গেলেন রবীন্দ্রনাথ :

> My friend Mr. Kshitimohan Sen is the Principal of Santiniketan Institution. I have full trust in him and know that he will be able to explain the ideals of our Ashram to those who wish to know.
>
> Bombay
> April 28, 1920
>
> Rabindranath Tagore[২৮৮]

পুনা থেকে ফিরে রবীন্দ্রনাথ কলকাতার ট্রেন ধরলেন, কয়েক দিন পরেই তাঁকে ইউরোপ যাত্রা করতে হবে। বোম্বাইতে তাঁর অসমাপ্ত কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য রইলেন ক্ষিতিমোহন, তাঁকে পুনায় গিয়ে তিলক মহারাজের সঙ্গে দেখা করতেও বলে গেছেন তিনি। চলে যাওয়ার আগে এক সন্ধ্যায় তরুণ প্রজন্মের মহারাষ্ট্রীয় ছেলেমেয়েরা তাঁর কাছে শ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ চাইলে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন যা কিছু শ্রেষ্ঠ যা মহান তা রুদ্রের দান, আরামের সুখসুপ্তি সে নয়। দুরূহ ব্রতপথে নিরন্তর দুঃসহ চেষ্টায় এগিয়ে যাওয়া—সেই হল জীবনে অমৃতের অধিকার লাভ। ক্ষিতিমোহনের প্রবন্ধে যখন রবীন্দ্রনাথের ভাষণ বা তাঁর আলোচনার সারমর্ম স্থান পায়, অনেক সময় তার অনুষঙ্গে সমান্তরাল ভাবের কবিতার পঙ্‌ক্তি তিনি তুলে আনেন—এটাই তাঁর লেখার ধরন। একটু আগেই যেমন দেখেছি, এখানেও তেমনই শ্রেষ্ঠ আশীর্বাদের প্রসঙ্গে 'বলাকা'-র কবিতা তাঁর মনে পড়ে গেছে :

> চেয়েছিলি অমৃতের অধিকার—/ সে তো নহে সুখ ওরে, সে নহে বিশ্রাম,
> নহে শান্তি, নহে সে আরাম।
> মৃত্যু তোরে দিবে হানা,/দ্বারে দ্বারে পাবি মানা—
> এই তোর নব বৎসরের আশীর্বাদ,/ এই তোর রুদ্রের প্রসাদ।[২৮৯]

মহামান্য তিলকের সঙ্গে নিজের সাক্ষাতের অভিজ্ঞতার কথা কোথাও বলেননি তিনি, কিন্তু তিলকের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যে-সব কথাবার্তা হয়েছিল তা বেশ বিস্তৃত করে বলেছেন, যদিও সেসময় তিনি উপস্থিত ছিলেন না। তিনি লিখেছেন :

> মহামতি তিলকের ইচ্ছানুসারে এবং গুরুদেবের আজ্ঞাক্রমে আমি কয়েক দিন পরেই পুণা যাই। ভারতের দুইজন বড় বড় পথপ্রদর্শকের মধ্যে কি কথা হইয়াছিল তাহাও জানিবার বিলক্ষণ আগ্রহ আমার ছিল। সমুদ্রযাত্রাকালে দেখিয়াছি প্রচণ্ড ঝড়ে সাংঘাতিক অবস্থায় দূরস্থিত দুই জাহাজের পাইলটের মধ্যে বেতারপরামর্শ চলে। ১৯২০ সালে ভারতের দুর্দিনে এই দুই পাইলট পরস্পরে দেখা হইলে কি কথাবার্তা বলিলেন? সৌভাগ্যক্রমে সেই সময়ে যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে স্বর্গীয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও বন্ধুবর প্রিন্সিপাল পটবর্ধন ছিলেন। তাঁহাদের কাছে অনেক কথা শুনিয়া তখন নোট করিয়া রাখিয়াছিলাম।[২৯০]

সেবারও ক্ষিতিমোহনের সুযোগ হয়েছিল স্বাধীনভাবে কোনো কোনো জায়গায় যাওয়ার। একটি প্রবন্ধে লিখেছেন : 'গুজরাটের ভরুচ অতি পুরাতন ও মহনীয় স্থান। ইহার

প্রাচীন নাম ছিল ভরুকচ্ছ। ১৯২০ সালে যখন আমেদাবাদের পণ্ডিত হরিপ্রসাদ দেশাইয়ের সঙ্গো ভরুকচ্ছ দেখিতে গেলাম তখন দেখিলাম এখানকার একটি প্রাচীন সূর্যমন্দিরই এখন মসজিদে রূপান্তরিত।'[২৯১]

ক্ষিতিমোহন যে রবীন্দ্রনাথকে ভাবনগরে ভক্তনারীদের মন্দিরা সহযোগে ভজনগান শুনিয়েছিলেন, কাঠিয়াওয়াড়ের সাধিকার সঙ্গো পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন, এ-সব সম্ভব হয়েছিল এই-সব জায়গায় তাঁর অনেক দিনের যাওয়া-আসা এবং পরিচয় ছিল বলেই। মনে তো হয় এর আগেও যেমন এর পরেও তেমনই তিনি আরও বহুবার গেছেন উত্তর ও পশ্চিম ভারতের নানা অঞ্চলে। তাঁর অভিজ্ঞতার অল্পস্বল্প আভাস ধরা পড়ে তাঁর লেখায়। এ দেশের ধর্ম ও সংস্কৃতির নানা রূপ, সমাজব্যবস্থার নানা বিশিষ্টতার কথা বলবার সময় তিনি কখনও স্মরণ করেন : 'বহুদিন পূর্বে একবার পশুপত ধর্মের আলোচনা উপলক্ষে আমাকে গুজরাতে বরোদা রাজ্যের অন্তর্গত কারাবণ নামে গ্রামে যেতে হয়েছিল।' এ গ্রাম একটি প্রসিদ্ধ শৈবতীর্থ। মন্দিরের বাইরে পাথরে খোদাই-করা মসজিদচিহ্ন চোখে পড়তে খোঁজ করে জেনেছিলেন এই কৌশলে কারাবণের মন্দিরগুলি মুসলমান যুগে আত্মরক্ষা করতে পেরেছিল। আবার কখনও তিনি দেখতে পেতেন গুজরাতে ব্রাহ্মণদের সব কুলদেবী আছেন, মুসলমান আক্রমণ এড়াতে তাঁদের মূর্তি বাড়ির কুয়োর ভিতর দিকের পাঁচিলের সঙ্গো গাঁথা।[২৯২] তিনি যেমন প্রত্যক্ষ পরিচয়ে জেনেছিলেন গুজরাতে অবরোধপ্রথা নেই, তেমনই জানা হয়েছিল রাজপুতানা বহু বছর ধরে মুসলমানদের সঙ্গো যুদ্ধ করতে করতে তাদেরই দুটি অতি মন্দ প্রথা আত্মসাৎ করেছিল— একটি অবরোধ ও অন্যটি আফিমসেবন। আবার দেখেছেন গুজরাত ও মহারাষ্ট্রের কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ে রাজপুতানার প্রভাবে এই দুই কুপ্রথারই অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। গুজরাতের গ্রামে বিয়ের নিমন্ত্রণে গিয়ে দেখেছিলেন বিয়ের উৎসবে 'কসুম্বা' অর্থাৎ আফিম বিতরণ করে 'গাঁইজা' অর্থাৎ নাপিত। সকলকেই তা গ্রহণ করতে হয়, যদিও তা সকলে খান না।[২৯৩]

সেবার গুজরাতভ্রমণের সঙ্গী ছিলেন তরুণ ছাত্র প্রমথনাথ বিশী। তাঁর স্মৃতিকথায় আমরা পড়ি :

> বাংলাদেশের বাহিরে রাজপুতানা গুজরাত প্রভৃতি অঞ্চলের শিক্ষিত সমাজেও এই মনীষী বাঙালী [ক্ষিতিমোহন] শ্রদ্ধার পাত্র; তিনি আগন্তুকের মতো নন, ঘরের লোকের মতো তাহাদের সঙ্গো মিশিতে পারেন। তাহার প্রধান কারণ তাঁহার সামাজিকতাগুণ। দ্বিতীয়ত ভারতবর্ষের সংস্কৃতির মধ্যে তিনি মানুষ হইয়াছেন বলিয়া ভারতবর্ষ তাঁহার বিচরণক্ষেত্র, কেবল বাংলাদেশ মাত্র নয়। তৃতীয় কারণ, ঐ সব অঞ্চলের প্রাদেশিক ভাষা তাঁহার দ্বিতীয় মাতৃভাষা।[২৯৪]

এ কথা অনুমান করতে দোষ নেই যে প্রমথনাথ ক্ষিতিমোহনকে গুজরাতি সমাজে ঘরের লোকের মতো মিশতে এবং কথা বলতে নিজেই দেখেছিলেন। রাজস্থান ও গুজরাতের মতো দেশের অনেক জায়গাতেই ক্ষিতিমোহন শিক্ষিত সমাজেও শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন, আবার অশিক্ষিত অতিসাধারণ গ্রামের মানুষের সঙ্গোও তাঁর অবাধ মেলামেশা ছিল। তা না-হলে এমন করে দেশের প্রথা আচার-সামাজিক রীতিনীতি, এমনকী কুসংস্কারগুলোরও

আঞ্চলিক রূপ জানা হত না তাঁর। জানা হত না এক এক সম্প্রদায় ও গোষ্ঠীর মধ্যে কত অসংখ্য ভাগ-বিভাগ। এবার ফিরে এসে করুণাশংকরজিকে ক্ষিতিমোহন যে চিঠি লেখেন তার এক জায়গায় আছে :

> গুজরাত আমার ভাই। যাকে জন্ম থেকে আজ পর্যন্ত আমার দেখা হয় নি। যখন একে দেখলাম, তার ভালোবাসা পেলাম, আমার উপর গুজরাতের অপরিমিত স্নেহ ও আতিথ্য বর্ষিত হল, তখন আমি বিচার করি নি, আমি তৃপ্ত হয়েছি, ধন্য হয়েছি।[২৯৫]

এ কথার অর্থ যদি এই হয় যে গুজরাতে তিনি এই প্রথম এলেন, তা হলে এইমাত্র যে বলেছি এই প্রদেশে এবার আসবার আগে থেকেই তাঁর আসা-যাওয়া ছিল, সে কথা যথার্থ নয়। কিন্তু তাঁর লেখার নানা উল্লেখ থেকে মনে হয় আরও আগে থেকেই দাদূসাহেবের বাণী সংগ্রহ ও অন্যান্য সাধুমহাত্মাদের সম্পর্কে জানতে, তখনও যাঁরা জীবিত আছেন তাঁদের দর্শন করতে ক্ষিতিমোহন এখানে আসতেন। তবে এবার রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এসেই প্রথম তাঁর পরিচয় হল শিক্ষিত গুজরাতি সমাজেব সঙ্গে। নিজেরই গরজে আসতেন এতদিন, এবারই প্রথম গুজরাত তাঁকে ভ্রাতৃত্ববন্ধনে বাঁধল, তাঁকে স্নেহ ও আতিথ্য দিল অপর্যাপ্ত—চিঠিতে এই কথাটার প্রতিই কি তিনি ইঙ্গিত করতে চেয়েছেন?

বন্ধুকে লেখা চিঠি

করুণাশংকরজির পত্রোত্তরে ৭ আগস্ট ১৯২০ এই চিঠি লিখেছিলেন ক্ষিতিমোহন। বন্ধুর কিছু প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন, কবীরবট প্রভৃতি দর্শন করে, নর্মদা নদীতে স্নান করে যে অনির্বচনীয় আনন্দ পেয়েছেন তার উল্লেখ করেছেন। হিন্দি চিঠির অনুবাদ এখানে দেওয়া গেল :

> শান্তিনিকেতন
> ৭ ৮ ১৯২০
>
> অভিন্নহৃদয়েষু
>
> শান্তিনিকেতন আশ্রম থেকে ক্ষিতিমোহনের কায়াগত মানসিক ও আত্মিক আলিঙ্গন গ্রহণ করুন। আমার অন্তরের অন্তবে যে প্রেম আছে, এই চিঠিতে তাকে কি করে প্রকাশ করব? সেই প্রেমের সংযোগ, প্রেমের মহোৎসব প্রণতির দ্বারা ব্যক্ত হয় না আর অভিবাদনের দ্বারা পরিস্ফুট হয় না। সাদর ও সৌজন্যসম্ভাষণের দ্বারাও প্রকট হয় না।...
>
> ...আপনার সঙ্গে আমার যোগাযোগ কয়দিনেরই বা। কিন্তু মনের ভিতরকার ভালোবাসা দিনস্থিতির উপর নির্ভর করে না। স্পর্শমণির নিমেষমাত্রের ছোঁওয়ায় লোহার কল্প-কল্পান্তের কালিমা দূর হয়ে যায়। পলকমাত্রের দৃষ্টিবিনিময়ে বহু বছরের অবিবাহিত জীবনের বাঁধ ভেঙে যায়। আমি ভূতার্থবাদী (মেটিরিয়ালিস্টিক) নই, আমি ভাবার্থবাদী (আইডিয়ালিস্টিক) তাই আমি ভালোবাসার ব্যাপারে কালের দীর্ঘতার উপর নির্ভর করি না।
>
> ...আপনার প্রারব্ধবশত আপনি গুরুদেবের উপস্থিতি নিত্যই লাভ করছেন। আপনার গৃহ আশ্রমতুল্য আর আপনিও নিশ্চয় গুরুদেবের কাছ থেকে অনেক আনন্দ লাভ করেছেন। এতে আমার আনন্দ।

আপনার চিঠিটি আপনি প্রশ্নে প্রশ্নে যেন শাহুডীর* মতো [কণ্টকিত] করে তুলেছেন। আপনি মিত্রসম্ভাষণকালেও নিজের শিক্ষকসত্তা ভুলতে পারেন না।

গুজরাত আমাব ভাই। যাকে জন্ম থেকে আজ পর্যন্ত আমাব দেখা হয় নি। যখন তাকে দেখলাম, তার ভালোবাসা পেলাম, আমার উপর গুজরাতের অপরিমিত স্নেহ ও আতিথ্যের বর্ষণ হল, তখন আমি বিচার করিনি, আমি তৃপ্ত হয়েছি, ধন্য হয়েছি।

সেই আতিথ্যে যে ত্রুটি আপনি দেখেছেন সে আপনারই যোগ্য। কেননা অধম সন্তানের উপবেও মায়ের যে অপবিমিত অসীম স্নেহভাব, তাতেও মায়ের তৃপ্তি হয় না। তবে পুত্রেব পক্ষে তো তা প্রাপ্যেব চেয়েও অনেক বেশি। ভালোবাসা কখনও সেবা কবে তৃপ্ত হয় না। কারণ প্রেম হল অসীম, তার ধর্মও অসীম, তার আকাঙ্ক্ষা আরও অসীম।

আপনি যে ছুটির উপর নেই, চাকুরিতে আবদ্ধ, তার দুঃখ আপনার চেয়েও বেশি আমার। আব দুর্ভাগ্য সমগ্র দেশের। প্রতিদিন নয়, প্রতি প্রহরে এ যেন আমাকে শেলের মতো বিঁধছে। আপনি স্বাধীনতার ভূমিতে গেছেন। দেশসেবার দৃষ্টান্ত উৎসব ও সাধন সেখানে প্রত্যক্ষ করুন, আর তা মনের মধ্যে সংগ্রহ করে নিয়ে আসুন ভারতবর্ষে। আর দেশমাতা ও পরমাত্মার সেবা করুন। দারিদ্র আসুক, দুঃখ আসুক, তাতে ভয় নেই। কেননা এসব তো দেহীকেই কেবল স্পর্শ কবতে পারে। আপনি দেহাতীত, আপনি বিদেহী—সেই আত্মার প্রকাশ আপনাতে। বৈদেহী সীতা ছিলেন জন্মদুঃখিনী। কিন্তু আপন তপশ্চর্যায় তাঁর আসন পাতা আছে সর্বজনচিত্তে। তাঁর স্বামী তাঁকে অযোধ্যাব সিংহাসন থেকে নির্বাসিত কবতে পারেন, কিন্তু সত্যব্রতে অধিষ্ঠিতা তাঁর জন্য যে মহাসিংহাসন শাশ্বত হয়ে গেছে আমাদের সব্বার চিত্তে, সেখান থেকে কে তাঁকে নির্বাসিত কববে? আপনার বৈদেহী কুসুমকেও সেই আশীর্বাদই করি। তাকে ঐশ্বর্য দেবেন না, তাকে দিন জ্ঞান, দীক্ষা, ব্রত, ত্যাগশিক্ষা, মাহাত্ম্য, তপোনিষ্ঠা। দীনবন্ধু ও চন্দ্রকান্তের জন্যও আমি এই-ই ইচ্ছা করি। চঞ্চল বোনেব জন্যও এই-ই প্রার্থনা। এমন স্ত্রী, এমন কন্যা লাভ সকলের ভাগ্যে হয় না।.

আপনাকে যে আমি ইংল্যান্ডে যেতে অনুরোধ করেছিলাম তার উদ্দেশ্য এই ছিল যে ইংল্যান্ড প্রচণ্ড প্রাণশক্তিতে প্রাণবান, প্রভূত বিদায় বিদ্যাবান আর বিচিত্র চেষ্টায় সদাচেষ্টিত মহাভূমি। এই দেশের দোষও অনেক, তথাপি এর গুণরাজিতে দীক্ষিত হওয়া চাই আর তা দিয়ে স্বদেশেব সেবা কবা চাই। ইংবেজি সাহিত্যের ভিতব দিয়ে যদি এই দীক্ষা নিতেন তো সে হত আপনাব পবোক্ষ দীক্ষা, আব স্বয়ং সেখানে গিয়ে সে দীক্ষাগ্রহণ করলে তা প্রত্যক্ষ দীক্ষা হবে। এই প্রত্যক্ষ দীক্ষাব তপোব্রত নিয়ে এখানে এসে আপনি তপস্বী হোন, এই আমার প্রার্থনা ও অন্তরেব মিনতি। তপস্বী কখনও দাস হতে পারেন না। অগ্নি আঁচলে বাঁধা তো অসম্ভব। সে আগুন ভস্মাচ্ছাদিত হলে তবেই তাকে বাঁধা সম্ভব হয়। তপস্বী যখন দেহগত ভোগেচ্ছা দ্বারা আবৃত, যখন তিনি সুখলুব্ধ, দুঃখভীত, তখনই তিনি বন্ধনের পাত্র। আপনি হলেন যুক্তাত্মা, আপনি হলেন অগ্নি, আপনাকে বন্দী কববে কে? আপনার ভস্ম উড়িয়ে দিন, দেখবেন সব বন্ধন ভস্ম হয়ে গেছে।

শান্তিনিকেতনে আসবাব ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। এ বিষয়ে আমার সঙ্গে একান্তে আলোচনা করে তবে সিদ্ধান্ত নেবেন। এখন এ অভিপ্রায় দমন করে রাখুন। তাছাড়া গুজরাতই আপনার সেবার ক্ষেত্র হওয়া চাই। দেশের অন্য কোনো প্রান্ত নয়।

আমেদাবাদে আপনার সঙ্গলাভ করে এবং কবীরবট, শুক্লতীর্থ, অগ্নিহোত্রশালা দেখে, নর্মদা নদীতে স্নান করে যে কী আনন্দ পেয়েছি সে কি প্রকাশ করে বলা সম্ভব?

শাহুডী—শজাবুর মতো এক ধরনের প্রাণী।

যে-সব প্রসঙ্গ আলোচনার ও যে-সব সম্প্রদায়ের মধ্যে যাবার আনন্দ লাভ করেছি, এখনও তা স্মৃতিলোকে সঞ্চিত থেকে আমার চিত্তকে সরসতা দান করছে।

গুরুদেবের গুজরাতে দেওয়া ভাষণের হিন্দি ভাষান্তর সম্পন্ন হয়েছে, আপনাকে পাঠিয়ে দেব। ...আপনার এ কথাটা স্মরণে থাকা চাই যে আমি আপনার বন্ধু, শিক্ষক নই। তবে বন্ধুর হাত থেকে যদি কিছু শিক্ষালাভ করা সম্ভব হয় তো সে প্রসঙ্গ আপনি ফিরে এলে হবে।[২৯৬]

এই দীর্ঘ চিঠির দর্পণে ক্ষিতিমোহনের মনটিকে দেখতে পাওয়া যায়। কীভাবে এই নতুন বন্ধুকে ভালোবাসা জানান তিনি, কীভাবে বন্ধুর দেশসেবার জন্য ব্যাকুল মনকে সান্ত্বনা ও প্রেরণা জোগান, বিশেষ করে বন্ধু যখন সেই মুহূর্তে ধনীগৃহে শিক্ষকতাকর্মে বন্দী হয়ে থাকার নৈরাশ্যে বেদনার্ত, কী বলে তাঁকে উজ্জীবিত করতে চান। ক্ষিতিমোহন অবশ্য মনে করেন গুজরাতই করুণাশংকরজির প্রকৃত সেবার ক্ষেত্র হওয়া উচিত, তবু বন্ধুর প্রশ্নের উত্তরে যে লিখলেন তাঁর সঙ্গে কথা না বলে যেন করুণাশংকর শান্তিনিকেতনে যোগদান ব্যাপারে সিদ্ধান্ত না নেন, তার পিছনে একটা অন্য কারণও ছিল বলে মনে করা যেতে পারে। কারণ ক্ষিতিমোহনের নিজের মধ্যেই তখন একটা ভিন্ন ভাবনা কাজ করছিল। সেই ভাবনার খবর একটু পরে আমরা পাব।

'কবি হলেন না রাজি'

গরমের ছুটির পর বিদ্যালয় ও বিশ্বভারতীর সব বিভাগে কাজ শুরু হয়ে গেছে। বিশ্বভারতীতে ভাষাশিক্ষা ও সাহিত্য অধ্যয়নের আয়োজন বেশ বিস্তৃত—সংস্কৃত পালি প্রাকৃত ইংরেজি পড়ানো হচ্ছে। এ ছাড়া সংগীত ও চিত্র বিদ্যা শিক্ষার আয়োজন হয়েছে। দেখা যাচ্ছে বোম্বাই প্রভৃতি জায়গা থেকে অনেকগুলি ছাত্রী এসে যোগ দিয়েছেন এই দুই কলাবিদ্যা শিক্ষার আগ্রহ নিয়ে। একটি সুরাতের ছাত্র বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত করে এখানে পড়তে এসেছেন। স্বভাবত মনে হয় রবীন্দ্রনাথ সদলবলে গুজরাত-মহারাষ্ট্র ঘুরে আসায় এই যোগাযোগগুলি ঘটেছে। ছুটির পরে আশ্রমবিদ্যালয়েও অনেকগুলি গুজরাতি ছাত্র এসেছেন।

এই যেমন একদিকের চিত্র, অন্যদিকে তেমন দেশের রাজনৈতিক উত্তেজনার ঢেউ এখানেও এসে আছড়ে পড়েছিল। কলকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনের পরে গান্ধীজি কয়েকদিনের জন্য আশ্রমে থাকতে এলে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর পর্যন্ত অসহযোগ আন্দোলনের সাফল্যের আশায় উত্তেজিত, অধ্যাপকদের অনেকের মনও একই আবেগে চঞ্চল। নেপালচন্দ্র রায়, কালীমোহন ঘোষের মতো কেউ কেউ দেশের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন, যেন একটা গণ্ডিভাঙার ডাক এসেছে। রবীন্দ্রনাথ ইতিমধ্যে লন্ডনে গিয়ে পৌঁছেছিলেন ৫ জুন, ৮ জুলাই তিনি ব্রিটিশ পার্লামেন্টে জালিয়ানওয়ালাবাগ-তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনের উপর আলোচনার মর্মার্থ শোনেন। পার্লামেন্টের ডায়ার-বিতর্কের সময়কার ইংরেজ-দৃষ্টিভঙ্গি স্বভাবতই তাঁকে ক্ষুব্ধ করেছিল। ২২ জুলাই ১৯২০ তিনি অ্যান্ডরুজকে

লিখেছিলেন : 'যা ঘটে গেছে তাতেই প্রমাণ হয়েছে যে, আমাদের মুক্তি আমাদের নিজেদেরই হাতে। একটি জাতির মহত্ত্বের ভিত্তি কখনো দীনাত্মার অবজ্ঞার কৃপণ দানের উপর নির্ভর করে না।'[২৯৭] মনের এই কথাটাই প্রকাশ পেল ক্ষিতিমোহনকে লেখা একটি তারিখহীন চিঠিতে, সেসময়কার রাজনৈতিক আন্দোলনের সমালোচনাতেও তাঁর লেখনী মুখর হয়ে উঠেছে। এ চিঠিও জুলাই মাসে লেখা বলেই মনে হয়।

ওঁ

সবিনয় নমস্কার নিবেদন

এখানে এসে অবধি জনসমুদ্রে হাবুডুবু খাচ্চি। চিঠিপত্র লেখা শক্ত হযেচে। এখানে এসে একটা জিনিষ খুব স্পষ্ট দেখতে পাচ্চি, আমরা মাংসাশী মানুষের হাতে। এরা প্রচন্ড, এরা নিষ্ঠুর। পাঞ্জাবে এরা যে-বিভীষিকার সৃষ্টি করেছিল মনে করেছিলুম সেটা আকস্মিক এবং সাময়িক আতঙ্ক থেকে তার উৎপত্তি। কিন্তু এখানে পার্লামেণ্টে সে সম্বন্ধে যে আলোচনা হয়েছিল তার থেকে স্পষ্টই দেখতে পেয়েছি এই প্রচণ্ডতা এদের মজ্জায় নিহিত, এদের রক্তে বহমান। ডায়ারের কীর্ত্তিকে এরা কেউ কেউ "Splendid brutality" বলে প্রশংসা করেচে। এই উপলক্ষ্যে এদের মেয়েদের মধ্যেও রক্তলোলুপ হিংস্রতার পরিচয় পেয়ে আমি বিস্মিত হয়ে গেছি। আমাদের বোঝবার সময় এসেচে যে, এদের কাছ থেকে আমাদের কিছু আশা করবার নেই—আশা করা আত্মাবমাননা। আমাদের এতকাল মনে এই দুবাশা ছিল যে, এরা দেবে আমরা পাব এদের সঙ্গে আমাদের এই দাতা-ভিক্ষুকের সম্বন্ধ। কিন্তু দেবার শক্তি এদের নেই ; সেই আমাদের সৌভাগ্য—কারণ দানের দ্বারা দুর্ব্বলকে যত নষ্ট করা যায় এমন বঞ্চনার দ্বারা নয়। আমাদের যদি পৌরুষ থাকত, বল থাকত তাহলে দানগ্রহণের দ্বারা আমরা ক্ষুদ্র হতুম না ; সকল বড় জাতই অন্যের কাছ থেকে গ্রহণ করে কিন্তু সেই গ্রহণ করা খাজনা গ্রহণ কবার মত—কেননা যার আছে সেই পাবে এই নিয়ম—রাজাই পাবে ভিক্ষুক পাবে না। অতএব এদের কাছে হাত পাতার চেয়ে আমাদের মৃত্যু শ্রেয়। আমাদের দেশের মডারেট যাঁরা তাঁরা হাত জোড় করে ভিক্ষা করেন, আরা যাঁরা এক্স্ট্রিমিস্ট তাঁরা চোখ রাঙিয়ে ভিক্ষা করেন এইমাত্র তফাৎ, একদল মনিবের পাতের সামনে ল্যাজ নাড়েন আর একদল ঘেউ ঘেউ করেন— একদল মনে করেন তাঁরা ভারি সেয়ানা, আর একদল মনে করেন তাঁরা ভারি তেজস্বী, কিন্তু মনিবের উচ্ছিষ্ট এবং লাথি দুই দলের পিঠে সমানভাবেই পড়ে—অথচ সেই উচ্ছিষ্টের ভাগ সম্বন্ধে দুই দলের কলহের আর অন্ত নেই। ওদিকে দেশের কাজ পড়ে আছে সেদিকে মন দেবার সময় নেই। অতএব উচ্ছিষ্টের চেয়ে এই লাথিই আমাদের পক্ষে যথার্থ সৌভাগ্য।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর[২৯৮]

যেমন অ্যান্ডরুজকে লেখা চিঠিতে আমরা দেখতে পাই লন্ডন থেকে ইউরোপের মূল ভূখণ্ডে চলে আসবার পরে রবীন্দ্রনাথের এই তিক্ত আত্মসমালোচনার ভাবটা অন্তর্হিত হয়ে গেছে, ২১ আগস্ট ১৯২০ তারিখে প্যারিস থেকে তিনি ক্ষিতিমোহনকে যে চিঠি লিখলেন তাতেও আর ওই হতাশা বেদনা বা ক্ষোভের সুর নেই। ক্ষমতাদর্পী নিষ্ঠুর সাম্রাজ্যবাদীরূপে নয়, পাশ্চাত্যবাসীকে কবি দেখছেন তার বৃহত্তর পরিচয়ে, যেখানে তার মাহাত্ম্য, যেখানে তার আত্মার অধিষ্ঠান।

যতবার পশ্চিম মহাদেশে এসেচি এই কথাটা বারবার মনে উদয় হয়েচে যে বর্ত্তমান যুগে পশ্চিম পৃথিবী যে এতবড় হয়েচে তার কারণ এ নয় যে, এরা কাড়চে এবং জমাচ্চে। বস্তুত সেইখানেই

এদের মৃত্যুর কোঠা। কিন্তু তারা প্রবলভাবে আত্মসমর্পণ করচে—তাদের সেই আত্মদানের স্রোতের অন্ত নেই—যেখানে সেখানেই তার ছোট বড় নানা ধারা দেখতে পাই। এই আত্মদানের ধারাই অমৃতধারা—এই অমৃতপানেই য়ুরোপ মৃত্যুবাণ খেয়েও কিছুতে মরে না। তার দেহে লোভের বিষ পাপের বিষ যথেষ্ট আছে, কিন্তু আরোগ্যের ঔষধও তেমনি বড়। এদের মহাত্মাদের যখন দেখি তখনই বুঝতে পারি এদের সমুদ্রমন্থনের সমস্ত বিষ কোন্ নীলকণ্ঠ হজম করচেন।[২৯৯]

কবির মন তখন বিশ্বভারতীর পরিকল্পনা ও সকল ভেদাভেদের সীমা-উত্তীর্ণ শান্তিনিকেতনের বৃহৎ ভূমিকার স্বপ্নে বিভোর। অল্পদিন আগেই ক্ষিতিমোহন তাঁর গুজরাত-ভ্রমণের সঙ্গী ছিলেন, সে কথা মনে করে লিখলেন :

আমাদের শান্তিনিকেতনকে এবার আপনি বাংলাদেশেরও বাহিরে বিস্তৃত করে দেখে এসেচেন। বুঝতে পেরেচেন সেই বড় শান্তিনিকেতনের অর্ঘ্য কত বড় থালায় সাজাতে হবে। কিন্তু ওখানেও সীমা নয়, সমুদ্রপারেও তার আসন পৌঁছবে। এই আসন প্রশস্ত করবার ভার আমরা পেয়েচি—আমাদের মন বড় হোক, আশা মহৎ হোক, আমাদের দানের শক্তি আনন্দে আপন বাধা মোচন করুক।[৩০০]

কবি আশা করছিলেন ইউরোপে নানা যোগাযোগে যে আয়োজন তিনি করছেন, শান্তিনিকেতনেই তার পরিণতি ঘটবে। 'একদিন য়ুরোপকেও সেখানে আতিথ্য দান করতে হবে তার লক্ষণ প্রকাশ পাচ্চে।' তাই গভীর প্রত্যাশায় লিখলেন :

সেইজন্যে আপনাদের প্রতি আমার একান্ত অনুরোধ, আশ্রমের যজ্ঞস্থলীকে আপনারা প্রশস্ত করবেন—প্রতিদিনই বিরাটের আগমনের প্রতীক্ষা করবেন। আর যত আয়োজন যেমনই হোক দক্ষিণার সঞ্চয় রাখবেন—উপকরণ সামান্য হোক কিন্তু দাক্ষিণ্যে কৃপণতা চলবে না—অনেক দিতে হবে।[৩০১]

প্যারিসে প্রাচ্যবিদ্যাবিদ ফরাসি পণ্ডিতদের সঙ্গে আলাপ হয়েছে তাঁর। তার মধ্যে বিশেষ করে সিলভ্যাঁ লেভি সম্পর্কে তিনি ক্ষিতিমোহনকে লিখলেন :

অধ্যাপক Sylvain Levi-র নাম নিশ্চয় শুনেচেন। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান যেমন গভীর তেমনি প্রশস্ত। ভারতবর্ষকে ইনি সমস্ত হৃদয় মন দিয়ে ভালবাসেন। এমন সরল এবং উদারচিত্ত পণ্ডিত আমি দেখি নি।[৩০২]

আরও দুই অধ্যাপকের সঙ্গে আলাপ হয়েছে—অধ্যাপক Finot ও Goloubew, আগামী নভেম্বর মাসে তাঁরা প্রাচীন ভারতীয় স্থাপত্য ও ভাস্কর্য সম্বন্ধে গবেষণার উদ্দেশ্যে ফরাসি কাম্বোডিয়ায় যাবেন। এই কাজের সঙ্গে বিশ্বভারতীর যোগ ঘটাতে মন উৎসুক, লিখছেন :

এদের সঙ্গে আলোচনা করে আমার মনে হয় যে প্রাচীন ভারতের উপনিবেশগুলি ভাল করে দেখে তখনকার অবস্থা প্রভৃতি জেনে নেবার জন্যে আমাদের কোনো অধ্যাপকের প্রস্তুত হওয়া দরকার। বিশ্বভারতীতে এই বিশেষ বিষয়টির চর্চা রাখতে চাই।[৩০৩]

লিখতে লিখতেই একটা প্রস্তাব মনে আসছে :

> যদি আমি কোনো উপায়ে আপনাকে এঁদের সাহচর্য্যে নিযুক্ত করতে পারি তাহলে আপনি এই ভার গ্রহণ করতে পারেন? আপনি ওঁদের সঙ্গে থাকলে ওঁদেরও উপকার হবে। অবশ্য সাংসারিক অভাবেব কোনো কারণ যাতে না ঘটে সে রকম সংস্থান করে দেব। এরূপ বাবস্থা করা দুঃসাধ্য হবে না জেনেই আমি এই প্রস্তাব করচি। যদি কৃতকার্য হতে পারি তাহলে আপনার দ্বাবা বিশ্বভারতীর একটা মহৎ অভাব মোচন হবে। শুধু পুঁথি পড়ে আমরা ভারতবর্ষকে চিনতে পাবব না।[৩০৪]

যে উৎসাহ নিয়ে ১৯১২ সালে ক্ষিতিমোহনকে ইংলন্ডে আহ্বান করেছিলেন, এবারও রবীন্দ্রনাথ সেই উৎসাহ নিয়েই তাঁকে লিখলেন, যদিও সেবারের মতোই এবারেও ব্যাপারটা ঘটল, কবির ইচ্ছা রূপ নিল না, অঙ্কুরেই শুকিয়ে গেল।

চিঠিটায় অন্য কাজের কথাও ছিল। ক্ষিতিমোহন সর্বাধ্যক্ষ বলেই তাঁকে দু-একটি জরুরি কথা জানানো দরকাব বোধ করছিলেন। রথীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বিদেশে গেছেন। তাঁর অনুপস্থিতিকালে যাতে অবহেলা বা অমনোযোগে শান্তিনিকেতনের যন্ত্রশালা নষ্ট না-হয়ে যায় সেজন্য সাবধান হওয়ার পরামর্শ দিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন : 'অধ্যক্ষসভা থেকে এ সম্বন্ধে পাকা ব্যবস্থা করে দেবেন।'

সম্ভবত এই আগস্টমাসেই ক্ষিতিমোহন সর্বাধ্যক্ষের দায়িত্ব এবং বিদ্যালয়ের কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্যপদ ত্যাগ কবেন। জানা যাচ্ছে শারীরিক অসুস্থতার কাবণে তিনি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।[৩০৫] তাঁকে লেখা অ্যান্ডবুজের ১৩ সেপ্টেম্বর ১৯২০ তারিখের চিঠি থেকে খবর পাচ্ছি যে তিনি তখন বেশ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন এবং শান্তিনিকেতনে নেই। অ্যান্ডবুজসাহেব তাঁর চিঠিতে ক্ষিতিমোহনকে প্রবাসী গুরুদেবের এবং আশ্রমের যৎকিঞ্চিৎ খবর দিয়েছেন, জানিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর জন্য নিজের একটি ছবি পাঠিয়েছেন। তাঁর অসুস্থতার কারণে উদ্‌বেগপ্রকাশও কবেছেন অ্যান্ডবুজ, লিখেছেন বিশ্রাম নিতে।[৩০৬] কী হয়েছিল ক্ষিতিমোহনের এই সময়ে, এ প্রশ্নের উত্তরে অমিতা সেন বলেছিলেন : 'একবার কাঁকড়া বিছে কামড়েছিল এবং বাবা অসহ্য যন্ত্রণাভোগ করেছিলেন, মনে হচ্ছে সেটা এই সময়ে। সম্ভবত তিনি তখন রাজসাহিতে।' এ কথা যখন হয় তখন শান্তিনিকেতন পত্রিকায় প্রকাশিত খবরটাই জানা ছিল, পবে অ্যান্ডবুজ এবং বিধুশেখর শাস্ত্রীর লেখা চিঠিতেও এই সময়কার অসুস্থতারই উল্লেখ পেলাম, কিন্তু কোনো সূত্র থেকেই স্পষ্ট হয় না তাঁর কী হয়েছিল। কিরণবালা ও বিধুশেখর শাস্ত্রীর এবং খানিকটা অ্যান্ডবুজের চিঠি থেকেও এটা বোঝা যায় যে বেশ গুরুতর কিছু হয়েছিল। এটাও বোঝা যাচ্ছে, এই সময়টাতে যে অসুস্থতার কারণেই ক্ষিতিমোহন আশ্রমে অনুপস্থিত থেকে থাকুন, সেইটুকুই শেষ কথা নয়। অ্যান্ডবুজ যে ক্ষিতিমোহনের এখনও রক্তক্ষরণ হচ্ছে জেনে উদ্‌বিগ্ন বোধ করছেন এবং বিধুশেখর যে জানাচ্ছেন সম্পূর্ণ সেরে উঠেই যেন ক্ষিতিমোহন আসেন—আসলে এঁরা উভয়েই সেইসঙ্গেই তাঁর মনের ক্ষতটুকু যাতে সম্পূর্ণ নিরাময় হয় তার জন্যও যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন। ক্ষিতিমোহন যে বিদ্যালয়ের প্রশাসনিক দায়িত্ব ছাড়লেন, তার পিছনে বোধ করি অনেকদিন ধরে মনের মধ্যে জমে-ওঠা ক্ষোভ ও বেদনার ভূমিকা বেশ

একটু ছিল। সে ব্যথা প্রশমিত করবার আন্তরিক ইচ্ছায় সেসময় বিধুশেখর শাস্ত্রী বন্ধুকে লিখেছিলেন :

Visva Bharati
Santiniketan
Bengal
Dated ৮. ৯. ১৯২০

প্রিয় ক্ষিতি,

তুমি যাওয়ার পর বিশেষ সংবাদ পাই নি, যদিও তোমার পরিবারবর্গের নিকট অনুসন্ধান করিতাম। আজ জানিলাম তুমি অনেকটাই ভাল আছ। একবারে সাবিলেই তোমার আসা ভাল, নতুবা পথশ্রমে আবার খারাপ হইতে পারে। কবে আসিবে?

নেপালবাবু যাবার পর যে ভাঙন ধরিযাছে শীঘ্র তাহা থামিবে বলিয়া মনে হয় না। প্রমদাবাবু ৮/১০ দিনেরই মধ্যে যাইতেছেন। তিনি কুচবিহার ইস্কুলে Asst. Hd. mastership পাইয়াছেন। প্রাপ্তি ১০০-৫-১২৫

তোমার যা সঙ্কল্প তা তুমি কাজে না করিয়া ছাড না। তাই কিছু বলিতেই ভয় হয়। অথচ না বলিয়াও পারি না। তোমার অনেক কথা শুনিয়াছি। তোমাব প্রতি নানা দিকে অবিচার করা হইয়াছে তাহাও জানি। ইহার কি প্রতিকার হয় না? গুরুদেবের অনুপস্থিতিতে বিদ্যালয়ের এইরূপ ছিন্নভিন্ন ভাব নিশ্চয় তোমাকে পীড়ন করিয়াছে।

এনড্রুজ সাহেবেব সঙ্গে কথা হইতেছিল। তুমি সম্পূর্ণভাবে বিশ্বভারতী লইয়া কাজ করিলে ভাল হয়। গুরুদেবও তো ইহা একবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। বিদ্যালয়ে, সাধারণ কর্মের মধ্যে থাকিয়া পড়াশুনা আলোচনায় তোমার অনেক ক্ষতি হইয়াছে। তোমার মধ্যে যাহা রহিয়াছে তাহা বাহির হইতেছে না, এদিকে থাকিলে তাহা প্রকাশ পাইবার সুবিধা পাইবে। সাক্ষাতে এ সব আলোচনা করিব। এখানে নানা কারণে তোমার মন উদ্বিগ্ন বা চঞ্চল থাকে। তাই দূরে থাকিবার সময় একটু জানাইয়া রাখিলাম। ভাবিয়া দেখিও।

তোমার বিধু [৩০৭]

'কবীর' সানুবাদ সংকলনের পরে ক্ষিতিমোহনের আর কোনো কাজ দীর্ঘকাল প্রকাশিত হয়নি কেন, বিধুশেখর শাস্ত্রীর এই চিঠিতে তার একটা ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। বিদ্যালয় ও ছাত্রাবাসের কাজের চাপে তিনি পড়াশোনা ও গবেষণার সময় পেতেন না। যাই হোক, বন্ধুর এই অনুরোধ বৃথা হয়নি এবং এর পর রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এ সমস্যার প্রতিকারবিধানে বিদেশ থেকে পুনরায় কলম ধরেছিলেন। সেই চিঠির প্রসঙ্গে আসবার আগে আরও দু-এক কথা বলে নেওয়া যাক। একটু আগে রবীন্দ্রনাথের যে ২১ আগস্টের চিঠির উল্লেখ করেছি, তার এক জায়গায় আমেরিকাযাত্রার প্রাক্কালে তিনি লিখেছিলেন :

> আপনি শুনে থাকবেন এবারে আমেরিকায় গিয়ে অর্থসংগ্রহের দুঃসাধ্য অধ্যবসায়ে প্রবৃত্ত হতে হবে। এবারে রিক্ত হস্তে ফিরব না এইরকম পণ করেচি। আমার পক্ষে এই ভিক্ষাবৃত্তির দুঃখ অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু দুঃখের মূল্যেই আমাদের সাধনাকে মূল্যবান করতে হবে। আর কোনো পন্থা নেই।[৩০৮]

এমন কর্মের আহ্বানে, সংকল্পের ঋজুতায় সম্পন্ন চিঠি যখন হাতে পেলেন ক্ষিতিমোহন, অনুমান করলে খুব ভুল হবে না যে তার আগেই তিনি বিদ্যালয়ের প্রশাসনিক প্রধানের পদ

ত্যাগ করেছেন এবং রবীন্দ্রনাথকে তা জানিয়েছেন, জানিয়েছেন যে এখন থেকে তিনি আশ্রমেব সঙ্গে মুক্তভাবে যোগাযোগ রাখতে ইচ্ছা করেন।

শিক্ষকতার দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে ক্ষিতিমোহন কি শান্তিনিকেতন থেকে চলে যেতেই চেয়েছিলেন? হয়তো এই সময়েই কলকাতায় গিয়ে কবিরাজি চিকিৎসাব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করবার কথা ভাবছিলেন নতুন করে। অমিতা সেনের কাছে শুনেছি বালিকা বয়সে গুরুপল্লির বাড়িতে বাবা-মাব মধ্যে এ ব্যাপারে টুকরো টুকরো কথাবার্তা কখনও কখনও তাঁর কানে আসত এবং তাঁর পিতা প্রায়ই আয়ুর্বেদিক চিকিৎসার নানা উপকরণ সংগ্রহ করে এনে মাকে দেখাতেন—সে কথা তাঁর বেশ মনে পড়ে। বিশেষ করে একবার এক খণ্ড সোনা এনে মাকে দেখাচ্ছিলেন বাবা—ওষুধ তৈরি করতে সোনা লাগে জেনে ভয়ানক বিস্মিত হয়েছিল বালিকা-মন।

কাশীতে ছাত্রাবস্থায যে ক্ষিতিমোহন বেশ যত্ন করে আয়ুর্বেদশাস্ত্রটাও আয়ত্ত করেছিলেন এবং তাঁদের বংশগত ধাবা অনুসরণে কবিরাজি চিকিৎসক হিসেবে প্রতিষ্ঠা অর্জন করবেন এমন ইচ্ছা যে তাঁর মনে ছিল, এ কথা তাঁর পরিচয় দিতে গিয়ে স্মরণ করেছেন অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ দত্ত। তিনি বলেছেন, নিজের শক্তির উপরে তাঁর বেশ আস্থাও ছিল এবং সেই উদ্দেশ্যে কলকাতায় চলে গিয়েছিলেন। কিন্তু তোড়জোড় করে এ ব্যবসায়ে নামবার আগেই রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছায় তাঁকে শান্তিনিকেতনে ফিরে আসতে হয়। তাই ক্ষিতিমোহন স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে বলতেন : 'কবি রাজি হলেন না তাই কবিরাজি করা হল না।[৩০৯]

এই উক্তিটিব বহুল প্রচার হয়েছে, কিন্তু ঠিক কোন্ ঘটনার সূত্রে এই উক্তির উদ্ভব তার নির্দিষ্ট উৎস নির্ণয় করা কঠিন। রবীন্দ্রনাথ যখন ১৯০৮ সালে ক্ষিতিমোহনকে আহ্বান করলেন, ঠিক সেই সময়ে তাঁর হিতৈষীরা তাঁকে পেশা গ্রহণের ব্যাপারে যে-সব পরামর্শ দিচ্ছিলেন তার একটা ছিল কলকাতায় গিয়ে কবিরাজ হয়ে বসা। কিন্তু তখন তাঁর নিজের মন ঝুঁকেছিল রবীন্দ্রনাথের ডাকে সাড়া দেওয়ার দিকে, সে কর্মক্ষেত্র হিসেবে বেছে নিয়েছিল শান্তিনিকেতনকেই। তাঁব সেদিনের সেই বিদ্যানুরাগী রবীন্দ্রাদর্শে মুগ্ধ মন আজ কি আবার তেমনই কোনো হিতৈসীর নির্বন্ধে পার্থিব উন্নতির আশায় কেজো বুদ্ধির পায়ে মাথা বিকোতে চাইছিল? বিধুশেখর শাস্ত্রীর পূর্বোক্ত চিঠির বিষয়বস্তু মনে রাখলে এ সম্ভাবনাটা পুরো দানাও বাঁধে না আবার সংশয়টাও পুরো কাটে না। ক্ষিতিমোহনের মনঃক্ষোভের যৌক্তিকতা মেনে নিয়ে তিনি প্রতিকারে অগ্রসর হতে চাইছিলেন। বরং তাঁর ভয় হচ্ছিল ক্ষিতিমোহন একবার কোনো সংকল্প করলে সেটা করেনই, তিনি বিধুশেখরের কথায় কান দেবেন কি না।

এইখানে আর-একটা প্রসঙ্গও এসে পড়ছে, সেটার আলোচনা করলে পাঠক দেখবেন ক্ষিতিমোহন যে একটা সংকল্প মনে নিয়ে রবীন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন তিনি বাইরে থেকে মুক্তভাবে আশ্রমের সঙ্গে যোগ বাখতে ইচ্ছা করেন, সেই সংকল্পটা অন্তত ষোলো আনা স্বার্থপ্রণোদিত ছিল না। কংগ্রেসের নাগপুর অধিবেশন হয় ২৬-৩০ ডিসেম্বর ১৯২০।

তার পর থেকে অসহযোগ আন্দোলন ক্রমশ ব্যাপক এবং প্রবল হয়ে উঠল। চিত্তরঞ্জন দাস ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন এই আন্দোলন সফল করে তুলতে। আন্দোলনের প্রেরণায় ছাত্ররা দলে দলে সরকারি স্কুল-কলেজ বয়কট করছিলেন। স্বদেশি আন্দোলনের সময় যেমন বাংলায় কয়েকটি জাতীয় বিদ্যালয় গড়ে উঠেছিল, এখন আবার তেমনই সারা ভারতে জাতীয় বিদ্যালয় ও কলেজ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চলেছিল। এই সময়ই কাশী বিদ্যাপীঠ, বিহার বিদ্যাপীঠ, গুজরাত বিদ্যাপীঠ, মহারাষ্ট্র বিদ্যাপীঠ, আলিগড় ন্যাশানাল মুসলিম বিদ্যাপীঠ এবং কলকাতায় ন্যাশনাল ইউনিভারসিটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯২১ কলকাতায় এটির উদ্‌বোধন কবেন গান্ধীজি। তখন সুভাষচন্দ্র সিভিল সার্ভিস থেকে পদত্যাগ করে এই আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন, তিনি ন্যাশনাল কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ হলেন।[৩১০]

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে অসহযোগ আন্দোলনের তাৎপর্য ও গুরুত্ব অপরিসীম। ভারত জুড়ে একই কর্মসূচি এবং একই কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের অধীনে এ সময় যে আন্দোলন গড়ে উঠেছিল. শান্তিনিকেতনের মানুষের হৃদয়ও যে আরও হাজার হাজার ভারতবাসীর মতো তাতে উদ্‌বেলিত হয়ে উঠেছে—এটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। অসহযোগ আন্দোলনের প্রথম অভিঘাতে ক্ষিতিমোহন সেন কালীমোহন ঘোষ নেপালচন্দ্র রায় আশ্রম থেকে সরে গিয়ে নানা কাজে ব্রতী হন, লিখেছেন প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। অবশ্য কলকাতা থেকে আসা ছাত্রদের নিয়ে সুরুলগ্রামে যে-সব গঠনমূলক কাজের পত্তন হয়, তার উদ্যোক্তা হিসেবে তিনি বিশেষ করে নাম করেছেন নেপালচন্দ্র রায়ের। মনে হয়, কৃষি কাজ ও গোশালা পরিচালনার এই উদ্যোগে কালীমোহন ঘোষের মতো চিরদিন স্বদেশি ভাবে মাতোয়ারা দেশপ্রেমিক মানুষও নিশ্চয় যুক্ত ছিলেন। ক্ষিতিমোহনের নামোল্লেখ আর পাই না এই প্রসঙ্গে। কিন্তু প্রভাতকুমার তার পরে লেখেন : 'ক্ষিতিমোহনের নিকট আহ্বান আসে চিত্তরঞ্জন দাসের, আয়ুর্বেদ বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য।' সেই সময়ে ক্ষিতিমোহন নাকি ঞ্জনকে বলেন : 'কবিরাজী করতে পারি—যদি কবি রাজি হন।' অতঃপর সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করেছেন, 'বলা বাহুল্য রবীন্দ্রনাথ ক্ষিতিমোহনকে এই দুঃসাহসিকতা হইতে নিবৃত্ত করেন।'[৩১১] সেই সময় দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রেরণায় গান্ধীজির প্রত্যক্ষ নেতৃত্ব মেনে যাঁরা সক্রিয় হয়েছিলেন, তাঁরা কেউই তো ভেবে-বুঝে নিজের স্বার্থবিচার করে এগোননি, তাঁদের সকলের সিদ্ধান্তই দুঃসাহসিক ছিল, ক্ষিতিমোহন ব্যতিক্রম নন।

নেতাদের কাছ থেকে ক্ষিতিমোহনের কাছে প্রস্তাব যে একটা এসেছিল তার অন্য কোনো প্রত্যক্ষ প্রমাণ হাতে না থাকলেও পরোক্ষ প্রমাণ একটা মেলে। পরের বছর ১৯২১ সালের এপ্রিল মাসে দ্বারকা থেকে কিরণবালাকে তিনি একটা চিঠিতে লিখেছিলেন :

> কলিকাতা হইতে জিতেন্দ্র দত্ত পত্র লিখিয়াছে যে সেখানে গুজব নূতন National College র অধ্যাপকতা আমি নিব। এ খবর তারা কেমন করিয়া পাইল?[৩১২]

১৯২১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের গোড়ার দিকে কলকাতায় উদ্‌বোধন হয়েছিল ন্যাশনাল কলেজের, তার মাস ছয়েক আগে ক্ষিতিমোহন সে কাজে যোগ দেওয়ার জন্য মনস্থির করে

শান্তিনিকেতনের সঙ্গে বাইরে থেকে স্বাধীনভাবে যোগাযোগ রক্ষায় ইচ্ছুক হয়ে রবীন্দ্রনাথকে চিঠিতে সে কথা জানিয়েছেন, এরকম যে হতে পারে না, তা নয়।

কবিরাজি করা প্রসঙ্গে সুধীরচন্দ্র করের লেখায় উপর্যুক্ত সব ঘটনার অনুষঙ্গবর্জিত যে বিবরণ পেয়েছি, তা সরাসরি উদ্ধৃত করে দেওয়া যাক :

> সংসার অচল দেখে অর্থোপার্জনের জন্য ক্ষিতিবাবু একবার থাকতে গেলেন কলকাতায়। কবিরাজীতে শিক্ষা ছিল, তাই তিনি কবিরাজীর পথ ধরতে গেলেন। পুঁজিপাটা সব দিয়ে দর্জিপাড়ায় এক আয়ুর্বেদীয় ঔষধ-প্রস্তুতের স্থান খোলা হল। কিন্তু তোড়জোড় সার। কবি ছাড়লেন না। তাঁকে ফিরে আসতে হল শান্তিনিকেতনের অধ্যাপনাতেই। ক্ষিতিবাবু বলতেন—"কবি হলেন না রাজী, —কবিরাজি আর হয় কী করে।" তবে কবির মতো কবিরাজীও ক্ষিতিবাবুকে টেনে রেখেছে তার অনুশীলনের দিকে বরাবরই। একটু-আধটু চর্চা সুযোগ পেলেই করতেন।[৩১৩]

যাই হোক, যে কথা প্রসঙ্গে এ-সব কথা এসে পড়ল, ক্ষিতিমোহন শান্তিনিকেতনের সঙ্গে বাইরে থেকে স্বেচ্ছাসংযোগ রাখবার ইচ্ছা জানিয়ে রবীন্দ্রনাথকে চিঠি লিখেছিলেন। আমেরিকায় বসে রবীন্দ্রনাথ তাঁর চিঠি পাওয়ার আগেই তাঁর সব খবরই পেয়েছিলেন। ঠিক যেমন, রবীন্দ্রনাথের প্রথম চিঠি পেয়ে যখন ক্ষিতিমোহন আশ্রমের কাজে যোগ দিতে তাঁর দ্বিধা এবং অযোগ্যতার কথা জানালেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁকে লিখেছিলেন চিঠি পড়ে নিরাশ হয়েও তিনি আশা ছাড়েননি, এবং শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে যে কাজের সংকল্প করেছেন তার জন্য তাঁর সহায়তা তিনি কেবল কামনা করবেন না, দাবি করবেন, তেমনই অক্ষুব্ধ শান্ত মনে বারো বছর পরে আবার একবার তিনি তাঁকে ৩০ নভেম্বর ১৯২০ লিখলেন :

> আপনার চিঠি পাবার পূর্ব্বেই আপনার খবর পেয়েচি। আপনি মুক্তভাবে আশ্রমের সঙ্গে যে যোগ রাখতে ইচ্ছা করেচেন সে যোগ পূর্ব্বের চেয়ে গভীর এবং দৃঢ় হবে সন্দেহ নেই। কিন্তু তবু আপনাকে বন্দী করবার বাসনা আমি সম্পূর্ণ ত্যাগ করি নি।[৩১৪]

এর আগে আগস্ট মাসে লেখা চিঠিতে বড়ো থালায় শান্তিনিকেতনের অর্ঘ্য সাজাতে হবে লিখেছিলেন, তারই রেশ টেনে বিশ্বভারতীর কাজে ক্ষিতিমোহনের পূর্ণ সহযোগিতা দাবি করে বললেন :

> আমি সম্প্রতি যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংকল্প নিয়ে এখানে কাজ করচি সে সংকল্প যদি ব্যর্থ না হয় তাহলে আপনাদের সকলকেই তার মধ্যে পূর্ণভাবে যোগ দিতে হবে। একটা বড় যজ্ঞের আয়োজন করচি—এতে আমার দেশের বন্ধুরা একত্র হলে তবেই বিদেশের অতিথিদের আহ্বান করতে পারব। আমি কেবল দূতের মতো আমন্ত্রণ করে আসতে পারি কিন্তু আয়োজন যে আপনাদের হাতে। ভারতবর্ষে একদিন দূরদেশ থেকে অতিথিসমাগম হত—বিশ্বের সঙ্গে সেদিন তার যোগ ছিল। সে অতিথিশালার দ্বার অনেকদিন থেকে রুদ্ধ, তার ভিত্তি সব বিদীর্ণ হয়ে গেছে। সেই অতিথিশালা নতুন করে গেঁথে তুলতে হবে এবং আমাদের মাতৃভাণ্ডারের দ্বার খুলে অন্ন আহরণ করে আনতে হবে।[৩১৫]

এ বিশ্বাসে মন সুস্থিত যে যজ্ঞশালার দ্বার খুলে যাবে, যে উদ্দেশ্য নিয়ে বিদেশিদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন তা ব্যর্থ হবে না, তাঁরা সাড়া দেবেন। তার পরে?

আমি এখানে বলে বেড়াচ্চি যে অন্ন আছে আমাদের ঘরে—সে কথা প্রমাণ করবার ভার আপনাদের সকলের উপরে। এরা নিমন্ত্রণ গ্রহণ করবে বলে বিশ্বাস করি—কিন্তু যখন যজ্ঞশালায় সকলে উপস্থিত হবে তখন কেউ যেন অভুক্ত না থাকে এই আমাদের চিন্তা করতে হবে। আমি কবি, দ্বারে বসে সানাই বাজাতে পারি, কিন্তু পরিবেষণের শক্তি কি আমার আছে?[৩১৬]

আগের চিঠিতে ফরাসি কাম্বোডিয়ায় প্রাচীন ভারতীয় স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের বিষয়ে গবেষণার কথা লিখেছিলেন, এ চিঠিতেও সেই প্রসঙ্গে দু-একটা কথা লিখতে গিয়ে বললেন একদিন ভারতবর্ষ চিত্তশক্তিকে প্রসারিত করে দিতে পেরেছিল বলেই বড়ো হয়েছিল, আজ তার যে দৈন্য তার চেয়ে বড়ো দৈন্য নেই।

যবদ্বীপ বলিদ্বীপ প্রভৃতি প্রাচীন ভারতের উপনিবেশে অনুসন্ধিৎসুদের পাঠাবার প্রস্তাব অগ্রসর করে রেখে এসেচি। এখান থেকে দেশে ফেরবার পথে যখন য়ুরোপের মহাদেশে যাব তখন সকল কথা পাকা করে নিতে পারব। আর যাই হোক সেখানে আমাদের যে কেউ যাবেন এই সন্ধান-কার্য্যে আনুকূল্য পাবেন। ভারতবর্ষ যখন ভারতের বাইরে আপন চিত্তশক্তি বিকীর্ণ করেছিল তখনি সে বড় হয়েছিল আজ তার চিত্ত সঙ্কুচিত, তার দীপ্তি ম্লান, এই দৈন্যই সবচেয়ে বড় দৈন্য।[৩১৭]

হয়তো কোনো কারণে ক্ষোভ জমেছিল, হয়তো বা শান্তিনিকেতন থেকে চলে যাওয়ার কথা ভেবেছিলেন, হয়তো বা নিজেদের কৌলিক ব্যবসায়ে উপার্জন বাড়ানোর কথা মনে হয়েছিল এবং সেই সঙ্গে সঙ্গেই হয়তো দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রেরণায় ন্যাশনাল কলেজে যোগ দিতে মন চাইছিল—কিন্তু রবীন্দ্রনাথের এই চিঠি পাওয়ার পরে আর বোধ হয় এ-সব ভাবনা মনকে টানেনি। চোদ্দো মাস পরে বিদেশ থেকে ফিরেছেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর আহ্বানে অধ্যাপক সিলভ্যাঁ লেভি, অধ্যাপক উইনটারনিটজ্‌ প্রমুখ প্রখ্যাত প্রাচ্যবিদ্যাবিদ পণ্ডিতরা একে একে বিশ্বভারতীতে আসতে শুরু করেছেন। ভারতের নানা প্রদেশ থেকে ছাত্রসমাগম হয়েছে। কাজ বেড়েছে উত্তরোত্তর, বেড়েছে দায়িত্ব। সমস্যার বাধা, পরিকল্পনা-অনুরূপ অর্থাভাবের বাধা, সব সত্ত্বেও পথ দেখা গেছে সামনে। মুক্তি পাওয়া দূরের কথা, ক্রমেই আরও জড়িয়ে পড়েছেন ক্ষিতিমোহন।[৩১৮]

শান্তিনিকেতনের এই কাজ হোক, সে যেন ভারতের নিত্যসম্পদকে বিশ্বের কাছে ' করতে পারে—এবং সেই মুক্ত দ্বার দিয়ে বিশ্বের সম্পদকে অসঙ্কোচে গ্রহণ করবার অধিকার লাভ করতে পারে। শান্তিনিকেতনের সেই সাধনার ভার আপনাদের হাতে...[৩১৯]

রবীন্দ্রনাথের এ প্রত্যাশা যে ব্যর্থ হয়ে যায়নি বিশ্বভারতীর সেদিনের ইতিহাস তার সমুজ্জ্বল সাক্ষ্য বহন করছে।

আবার গুজরাত

১৯২০-র পৌষ উৎসবে রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত ছিলেন না। ৭ পৌষ সকালে মন্দিরে বিধুশেখর এই পবিত্র দিনটির উদ্‌বোধন করে উপদেশ পাঠ করেছিলেন, সন্ধ্যায় উপাসনা

করেছিলেন ক্ষিতিমোহন। কয়েক মাস পরে তিনি গরমের ছুটির মাসখানেক আগেই বেশ লম্বা পাড়ি দিলেন, উদ্দিষ্ট গুজরাত। এই ভ্রমণপর্বে কিরণবালাকে লেখা দুটো চিঠি পেয়েছি, এই চিঠি দুটোই এ সময়কার যা-কিছু খবর দেয়। এর আগে আমরা দেখেছি ক্ষিতিমোহন কিঞ্চিৎ বিস্ময়ে একটি চিঠিতে কিরণবালাকে লিখেছিলেন তাঁর ন্যাশনাল কলেজে যোগ দেওয়ার খবর জানাজানি হল কী করে, সে কথা এই দুই চিঠিরই প্রথমটাতে আছে। সেটা দ্বারকা থেকে ২৩ চৈত্র লেখা, চিঠির মাথায় ইংরেজি তারিখেরও উল্লেখ আছে। পাঠক দেখবেন চিঠিটা কয়েক দিন ধরে লেখা হয়েছিল। ভ্রমণে বেরিয়ে এরকম ধারাবাহিকভাবে লেখা চিঠি আমরা এর পর কয়েকটাই দেখব।

Dwaraka 5.4.21

প্রিয় কিরণ, ২৩ চৈত্র ১৩২৭

কিছুদিন হইতে তোমাকে দীর্ঘ পত্র লিখি নাই। তোমার কোনো পত্রই আমেদাবাদ ছাড়িয়া পাই নাই। পোষ্টকার্ডে দীর্ঘ পত্রই দিয়াছি। পুরা পয়সা আদায় করিয়া কাজ করিয়াছি। রাজকোটে একদিন সেখানকার জলের কলের জন্য রক্ষিত হ্রদ দেখিতে গিয়াছিলাম। চমৎকার প্রকাণ্ড দুই হ্রদ। চারিদিকে খুব শুষ্ক প্রদেশ—একেবারে মরুভূমি। তার মধ্যে প্রকাণ্ড নীল হ্রদ। সেখানে দলে দলে সারস বক চক্রবাক প্রভৃতি পাখী—লক্ষ লক্ষ বন্য হংস। মাছের দলের আর অন্ত নাই। এখানে তো তারা বিনা ক্লেশে বিনা বাধায় বাড়িতে পারিতেছে। পক্ষী ছাড়া তাদের অন্য শত্রু নাই। সেখানে একটি ছোট পাথরের উপর বসিয়া অতি সুন্দর সূর্য্যাস্ত দেখিলাম—মোটরে গিয়াছিলাম—তাতেই ফিরিয়া এক বন্ধুর ওখানে যাইলাম।

১/৪/২১ রাজকোট হইতে পোরবন্দর আসিবার পথে মধ্যে দারুণ মরুভূমি। তার মধ্যে গণ্ডাল রাজ্য—রাজধানী অতি চমৎকার সবুজ। তার মধ্যে যত্নে রাখা বাগান-ক্ষেত্র-বৃক্ষরাজি—সবচেয়ে আশ্চর্য্য অতি সুন্দর নারিকেল গাছের শ্রেণী।

তারপর একটি নদী দেখিলাম তার নাম ভাদরা। তার তীরে একটি সহর—একটি দুর্গ—ভারি চমৎকার। তারপর পোরবন্দরের কিছু পূর্ব্বে সূর্য্য অস্ত গেল। আমাদের রেল চলিয়াছে পাহাড়ের মধ্য দিয়া। সেখানে সূর্য্য অস্ত গেল। বড় চমৎকার সূর্য্যাস্ত দেখিলাম। ক্রমে সমুদ্রের ভাব দূর হইতে অনুভব হইতে লাগিল। ঠাণ্ডা হাওয়া—ভিজা ভিজা ভাব। ক্রমে Light house দেখা গেল। তার আলো পড়িতে লাগিল। সমুদ্রও দেখা যাইতে লাগিল। সন্ধ্যার পর পোরবন্দর পৌঁছিয়া দেখি ষ্টেশনে গাড়ী আছে। রাজার দেওয়ান আসিয়াছেন। আমরা মহারাজার অতিথিশালায় গেলাম।

তার পরদিন সহর দেখিলাম। ভারি সুন্দর পরিষ্কার সহর। সমুদ্রের ধারে বেশ দেখায়। এখানে একটি ভক্তের মঠ দেখিতে গেলাম। ভক্তের স্ত্রীটি বড় চমৎকার মহিলা। তাঁর কি ভক্তি। তিনি বৃদ্ধা—মুখখানা ভরা একটি শ্রদ্ধা ও করুণা ও পবিত্রতার ভাব ভরা। ভক্তটির এক শিষ্য কিছু গাহিলেন। পরদিন আমরা এক মন্দিরে গেলাম—এখানে মীরাবাঈর গৃহদেবতা—গিরধর প্রতিষ্ঠিত আছেন। গান্ধীজীর প্রাচীন বাড়ী দেখিলাম। গান্ধীজীরা গন্ধবেনে জাতিতে। তাঁর কাকী এখনও দেখিলাম তিল তৈলে আমলার গন্ধ করিয়া বিক্রয় করেন। তাতেই সংসার চলে। দেখিয়া ভাল লাগিল। বড় জীবনের মধ্যে সরল জীবনযাত্রা বড় চমৎকার।

3/4/21 সেই রাত্রে আহার করিয়া Post officeএর ছাদে গিয়া শুইয়া রহিলাম। 4/4/21 ভোরে জাহাজ ছাড়িবে। আমরা ৫টায় Launch Boatএ উঠিলাম। সমুদ্রে গিয়া দেখি জাহাজ আসে নাই। ১ ঘণ্টা পরে জাহাজ দেখা দিল—তার নাম নেত্রাবতী। আমার বাড়ীও নেত্রাবতী—জাহাজও নেত্রাবতী—বড় আনন্দ হইল। জাহাজে উঠিতে একটু কষ্ট হয়—কারণ সমুদ্রে

Launch Boat ক্রমাগত নাচে—তারই মাঝে—কোনোমতে সিঁড়িতে উঠিতে হয়। উঠিয়া জাহাজে সব দ্রব্যাদি আনাইলাম। দ্রব্যাদি সব নানা খানা হইয়া উঠিল। তারপর জাহাজের উপরতলায় উপরের ডেকে যেই গিয়াছি অমনি দেখি কাশীর বাবু শিবপ্রসাদ গুপ্ত বসিয়া আছেন। তিনি ডাকাডাকি আরম্ভ করিলেন। তাঁর সঙ্গে দ্বারকা আসিয়া তাঁর সঙ্গে এই এক ভাটিয়া ধর্ম্মশালায় আছি। সহরটি ছোট—গাছপালা নাই। কতগুলি মন্দির ধর্ম্মশালা ও সমুদ্র। বড় চমৎকার সমুদ্র। সমুদ্রের ধারে বাড়ী। ছোটশঙ্খ প্রবাল শিলা প্রভৃতির অন্ত নাই। সমুদ্রেই রোজ স্নান করি। তার ধারে বসিয়া আনন্দ করি। সমুদ্রই এখানকার প্রাণ।

৫/৪/২১ কাল ভোরের সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে সমুদ্রে স্নান করিয়া আসিলাম। পরে দ্বারকার মন্দির দেখিতে গেলাম সমস্ত সকাল মন্দিরের বাহিরে বসিয়াছিলাম। ছায়া সঙ্গীত বাতাস বড় ভাল লাগিতেছিল। বাসায় ১১টায় ফিরিলাম। আহারাদি করিয়া মধ্যাহ্নে সমুদ্রে গেলাম। এক মন্দিরের ছায়ায় সমুদ্রকূলে বসিয়াছিলাম। বেলা পড়িলে বাসায় আসিলাম। ৫টায় একদল ভজন গায়ক আসিল। ৩জন পুরুষ—২জন নারী—চমৎকার মন্দিরা বাজাইয়া গান করিল।

সন্ধ্যার সময় সমুদ্রের তীরে গেলাম। বড় সুন্দর সমুদ্র দেখিলাম। বহুক্ষণ থাকিয়া ফিরিলাম। রাত্রে বেশ গান হইল। আমিও কিছু বাউল গান গাহিলাম। রাত্রে শুইলাম। বেশ ঠান্ডা—তবু কয়দিন যেন ভাল ঘুম হইতেছে না। তবু সমুদ্রের রবে মাঝে কাণে স্বপ্নধ্বনি আসিতেছে।

৬/৪/২৭ [১৯২১] আজ ভোরে সমুদ্রে স্নান করিয়া শঙ্করাচার্য্যের সারদা মঠে গেলাম সেখান হইতে আসিয়া গুরুদেবের কিছু কাব্য পড়িলাম। গীতাঞ্জলি পড়িয়া বুঝাইতেছি। তাতে বেশ শ্রোতা দ্বারকাতেও জুটিতেছে এবং আমার বেশ আহারাদিতে দিন কাটিতেছে। এখন তোমাদের খবর অনেকদিন হইতে না পাইয়া মনটা বড় উদাস লাগিতেছে। তোমাদের সঙ্গের অভাব বড় মনে লাগিতেছে। এরা সবাই বলিতেছেন তোমাদের গুজরাতে আনাইতে। আমার এবার তোমাদের আনিতে ইচ্ছা হয় না। আগামীবারে একসঙ্গে আনিতে ইচ্ছা। তোমার কাছে ইঁহারা অনেক আশা করেন। তার কারণ আমি নই। গুরুদেব তোমার বিষয় ইঁহাদের কাছে অনেক করিয়া বলিয়া গিয়াছেন। তোমার চিত্রাদি ঠিক করিয়া নেও। ইংরাজীটাও। তাঁতের ও চরখার কাজও ভাল অভ্যাস করা চাই। মহাজ্ঞ ও শংকর আসিয়াছে। এখন তারা কেমন আছে। এই সময় একটা ঘরের টঙ্গ যদি শক্ত করাইতে পার তবে অনেকটা দ্রব্য তুলিয়া রাখিতে পার।

কঙ্কর লাবু ও অমিতার পড়াশুনা কেমন চলিতেছে? এখানে থাকিয়া তাদের কথা সব সময়ই মনে হয়। তাদের একখানে স্থির হইয়া পত্র দিব।

কাল বোধহয় ভেট দ্বারকা যাইব। রবিবার এখান হইতে সোমনাথ প্রভাসাদি তীর্থযাত্রা করিব। আমাকে এই পত্র পাইয়াই রাজকোট ঠিকানায় পত্র লিখিবে—

C/o Ramprasad P. Mehta, Civil Station, Rajkot (Kathiawar) এই ঠিকানায় পত্র দিবে। আমি সব পত্রই এই ঠিকানায় পাইব।

রাজসাহী হইতে কোনো পত্র পাইয়াছ? ছুটির তারিখ কবে হইল? ছুটির সময় ব্যবস্থা করিয়া রাজসাহী যাইও। সেবক হয়তো আসিয়া লইয়া যাইতে পারে।

বাড়ীতে লংকর পড়া ছাড়িয়াছিল—কি করিল এখন? নেপালবাবুদের গ্রামসেবার কাজ কেমন চলিতেছে? সুরুলে ছাত্ররা কেমন কাজ করিতেছে? নেপালবাবু কেমন আছেন?

কলিকাতা হইতে জিতেন্দ্র দত্ত পত্র লিখিয়াছে যে সেখানে গুজব নূতন National Collegeর অধ্যাপকতা আমি নিব। এ খবর তারা কেমন করিয়া পাইল?

এখানে সব ভাল। তোমাদের কুশল চাই। রেবার কীর্ত্তিকাহিনী ও রেণুদের কুশল লিখিবে।

তোমার

ক্ষিতি[৩২০]

গত বছরে ঠিক এই সময়টায় কাথিয়াওয়াড় প্রভৃতি স্থানে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এসে অনেক মানুষের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল, কোনো কোনো মানুষকে আগেও চিনতেন। এ বছরে তাঁদেরই কারও কারও সাহচর্যে বেশ বিস্তৃত ভ্রমণের আয়োজন। এঁদের কাছে রবীন্দ্রনাথ কিরণবালার প্রশংসা করে গেছেন, বলে গেছেন তাঁর গুণের কথা। চিঠিতে সে-সব কথা, একটু বা ঘরসংসারের কথা, ভাইপো ছেলেমেয়ে নাতনির কথা লিখেছেন। সোমনাথ থেকে যে চিঠি এর ঠিক কয়েকটা দিন পরেই লিখলেন, সেটায় নিজের ভ্রমণের কথাই শুধু আছে, উপরকোটের দুর্গ দেখার বিবরণ দিতে গিয়ে রাখেঙ্গার-রাণকদেবী-সিদ্ধরাজের ঐতিহাসিক কাহিনি সম্পূর্ণ লিখে জানিয়েছেন। এই চিঠির সঙ্গেই কন্যা মমতাকে সেখানকার সংগ্রহশালা আর চিড়িয়াখানার বর্ণনা চিঠিতে লিখে পাঠিয়েছিলেন, পরে সম্ভবত ছেলেকেও সোমনাথ মন্দিরের কথা লিখেছিলেন, সে-সব চিঠি পাইনি। অমিতাকে লেখা চিঠিটি দেখেছি। কিরণবালাকে লেখা চিঠিটা দেখা যাক :

সোমনাথ
১৩/৪/২১

কিরণ

তোমাকে পরশু এক দীর্ঘ পত্র লিখিয়াছি। আজ আবার লিখিতেছি—কারণ লিখিতে ইচ্ছা করে। লিখিয়া তৃপ্তি হয় না। পরশু মধ্যাহ্নে চিঠি লেখার পর আমরা উপরকোট নামক দুর্গ দেখিতে গেলাম। সেখানে ১০ জন যাইবার হুকুম ছিল আমরা ৮ জন গেলাম। হুকুম লইয়া আসিতে হয়। এই দুর্গ এখন জুনাগড়ের নবাবের।

এই প্রাচীন দুর্গ গিরনার পর্ব্বতের রাজা রাখেঙ্গারের ছিল। গুজরাতের রাজা সিদ্ধরাজ বড় প্রবল ছিলেন। তিনি সুন্দরী রাণকদেবীকে বিবাহ করিতে চান রাণক দেবী রাখেঙ্গারকে ভালবাসেন। কাজেই রাখেঙ্গার তাঁহাকে পিতৃগৃহ হইতে লইয়া আসিয়া বিবাহ করেন। ইহাতে সিদ্ধরাজ ভয়ঙ্কর চটিয়া যান। সিদ্ধরাজের রাগ তো যার তার রাগ নয়। সমস্ত গুজরাতের শক্তি লইয়া তিনি রাখেঙ্গারকে আক্রমণ করিলেন। রাখেঙ্গার ছোট রাজা—তবু দুর্গ প্রবল—অতি দুর্দ্ধর্ষ। সে দুর্গ অজেয়। দেখিলাম যে কেমন করিয়া এই দুর্গ জয় হয় তাহা বুঝা দুঃসাধ্য। পর্ব্বতের উপর দুর্গ! তার চারিদিকে গভীর খাড়া পরিখা জলপূর্ণ। তার উপর ১০তলা সমান উঁচু প্রাচীর। অতি দুর্দ্ধর্ষ প্রাচীর। তার পর প্রকাণ্ড সব জলাধার ও কূপ—বিরাট শস্যগোলা। অবরোধে হারিবার কিছুই নাই। সেখানে অনন্তকাল অপেক্ষা করিলেও প্রবল পরাক্রান্ত সিদ্ধরাজের ঢুকিবার কোনো উপায় ছিল না। ১২ বৎসর অবরোধ গেল। ব্যর্থ অবরোধ। সর্ব্ব গুজরাতের শক্তি এই কাথিয়াওয়াড়ের রাজার বিরুদ্ধে খাড়া রহিল। অবশেষে চক্রান্ত। রাখেঙ্গারের দুই ভাগিনেয় ছিল—দেশল ও বিশল নামে। তারা ঘুষে বশ হইল। পিছের এক দরওয়াজা গুপ্ত ছিল—তার চাবী রাণীর কাছে থাকিত। তার চাবী কৌশলে ভাগিনারা নিল। সেখানে কাছের প্রহরীদের সরাইল—তারপর গোপনে সিদ্ধরাজের সৈন্য পরিখায় পড়িয়া সাঁতরাইয়া দড়ির সিঁড়ি বাহিয়া উঠিতে লাগিল। ক্রমে দুর্গের মধ্যে অপ্রত্যাশিতভাবে প্রবেশ করিয়া পড়িল। তারপর প্রবল ভীষণ সিদ্ধরাজের ধাক্কা সামলায় কে? যুদ্ধ চলিল। রাখেঙ্গার মরিল। সিদ্ধরাজের কাছে রাণক ও তার দুই ছেলে আনীত হইল। দুই ছেলেকে সিদ্ধরাজ সেখানেই কাটিয়া ফেলিল। রাণক সিদ্ধরাজের

প্রতি অভিশাপ দিল 'নির্ব্বংশ হইবে'। গিরনারের দেবতার প্রতি অভিশাপ দিল। তারপর সতী হইয়া স্বামী সঙ্গো গেল। —এইসব কাহিনী এদেশের ভাট ও চারণদের মুখে চমৎকার গান রূপে বিরাজ করিতেছে। রাণকদেবী তারপর হইতে এই দেশে দেবী রূপে সকলের হৃদয়ে আছেন। তিনি মরেন নাই। রাণককে শেষ পর্য্যন্ত সিদ্ধরাজ বিবাহ করিতে চায়। তার মনের দুর্নিবার বেদনা দেখিয়া সিদ্ধরাজ রাণককে নিজ পতির মৃতদেহ দেয়। রাণকের বিবাহস্থান দেখিলাম। সতীস্থান দেখিলাম। রাণকের বাড়ী দেখিলাম। অল্পদিন হইল রাণকের বাড়ী খুঁড়িয়া বহু বাসনপত্র ও শস্য বাহির হইয়াছে। হয়তো তারই ব্যবহারের হইবে। সেগুলি এখানকার সরকারী Museumএ দেখিলাম। দেখিয়া মন যেন কেমন হইয়া গেল। তারপর মাটির নীচে ৩ তলা ৪টি প্রকাণ্ড বাড়ী প্রভৃতি দেখিলাম। নবঘন রাজার (আখেঙ্গারের বাবা) [য] খণিত অতি প্রাচীন গভীর কূপ দেখিলাম তার চারিদিকে প্রাসাদ স্ক্রুর মত হইয়া নীচে পর্য্যন্ত গিয়াছে তারপর আড়িচাড়ি কূপ দেখিলাম—অতি গভীর ও পুরাতন। তারপর বাহির হইয়া বুলাকী দাসের ওখানে বাহির হইলাম। [...] দুর্গে ২টি তোপ [..] তোপের মত বড়। তার বড়টা নাকি একবার ১২ হাত একবার ১৩ হাত [...] হয়। অর্থাৎ নিঃশ্বাস প্রশ্বাস ফেলে। এই দুর্গে অনেক প্রাচীন কারুকার্য্য দেখিয়াছি। বহু decoration

বুলাকী দাসের নাতনীর সঙ্গো খুব ভাব হইল। বড় সুন্দর মেয়ে। তার নাম কপিলা। সে তার পুতুল দেখাইল। তার নাকি দুটি ছেলে কুয়ায় পড়িয়া মরিয়াছে। এখনও সে কুয়ায় গিয়া তাদের সঙ্গো কথা বলে। তার ৩ বৎসর বয়স তার দুটি পুতুল কূপে পড়িয়াছে। তাদের সে লুকাইয়া জলখাবার কুয়ায় ফেলিয়া আসে। তাকে সামলানো দায়। সে তো আমাকে পাইয়া বসিল। বড় মিষ্ট তার কথা। আজ রাত্রে শরীর বড় খারাপ হইয়াছিল। ২ টার সময় উঠিয়া একবার দাস্ত হইল। তারপর নিদ্রা।

১২/৪/২১ সকালে উঠিয়া দেখি খুব ভাল আছি। অমনি বাহির হইলাম। এদেশের প্রধান ভক্ত নয়মী দাসের চৌরা দেখিতে গেলাম। এখানে বসিয়া তিনি ভজন সাধন করিতেন। খুব ভাল কবি। ৪০০ বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করেন। তারপর এখানকার Museumএ রাখেঙ্গারের দুর্গের দ্রব্যাদি দেখি ও পশুশালা দেখি—তা লাবুকে লিখিতেছি। পত্রটা তার পড়া হইলে রাখিয়া দিও—তোমার সব পত্রের সঙ্গো থাকিলে—আমার ভ্রমণের বৃত্তান্ত পুরা হইবে। তারপর কঙ্করকে এখানকার সোমনাথের কিছু লিখিতেছি। অমিতাকে সমুদ্রের ধারের কড়ী শঙ্খ কুড়ানো লিখিতেছি। সব রাখিয়া দিও।

এই মিউজিয়ামের বাহিরেই zoo garden ও সুন্দর বাগান। কি সুন্দর আম বকুল নারিকেল গাছ। মনে হইল বাংলায় আছি। ফিরিবার সময় সহর স্কুল কলেজ হাসপাতাল রাজবাটী হইয়া আসিলাম। মধ্যাহ্নে বুলাকী দাসের ওখানে আহার। তারপর বৈকালে এক বাগানে বেড়ান ও এক আশ্রমে ভজন শোনা। রাত্রে খাইয়া শুইলাম।

১৩/৪/২১ আজ ৪টায় উঠিয়া ৪ ৷৷ টায় জুনাগড় হইতে [...] ৪ ৷৷ টায় গাড়ী। পথে কলিয়া নামে সুন্দর গ্রাম। উজয় নদী। বেলা ৯ টায় ভেরাবল্ল পৌঁছিয়াছি। ইহাই সোমনাথ। বড় সুন্দর সমুদ্রতীরের সহর। ইহারই একদিকে প্রভাস। এণ্ড্রুজ সাহেবকে তাঁর পত্র দিও। ভাল আছি। কুশল চাই। পত্র রাজকোটে দিও।

তোমার ক্ষিতি[৩২১]

জানি না ক্ষিতিমোহনের এই ভ্রমণপর্ব শেষ হল কবে। গরমের ছুটির আগেই বেরিয়েছিলেন, হয়তো ছুটির মধ্যে ফেরেন। ছুটির পরে যথানিয়মে নিজের কাজে যোগ

দিয়েছিলেন মনে হয়। রবীন্দ্রনাথও ফিরেছেন ১৬ জুলাই, এক বছরের বেশি সময় তিনি বিদেশে ছিলেন।

দেশজোড়া অশান্তির মধ্যেও

দেশে যে রাজনৈতিক আন্দোলন চলছে রবীন্দ্রনাথ যে তার ভাবাত্মক দিকটা দেখতে পাচ্ছিলেন না তা তো নয়, কিন্তু এর অভাবাত্মক দিকটা তাঁকে বেশি বিচলিত করেছিল। এই উত্তেজনার জোয়ারে ভেসে দেশের ঘরছাড়া মন যখন পাশ্চাত্যশিক্ষার সঙ্গে বিরোধের কথা বলেছে, তখন সে ভ্রান্তি পীড়া দিয়েছে তাঁকে। দেশে ফিরে এই প্রেক্ষাপটে 'শিক্ষার মিলন' নামে নতুন যে প্রবন্ধ লিখলেন, কলকাতার জনসভায় পড়ে শোনাবার আগে সেটি পড়লেন শান্তিনিকেতনে আশ্রমবাসীদের সমাবেশে, তার দিন দশেকের মধ্যেই কলকাতার সভায় পড়লেন 'সত্যেব আহ্বান'। তাঁর ইচ্ছা : 'ভারত আজ সমস্ত পূর্ব-ভূভাগের হয়ে সত্যসাধনার অতিথিশালা প্রতিষ্ঠা করুক।' মনে বিশ্বাস : 'তার ধনসম্পদ আছে। সেই সম্পদের জোরে সে বিশ্বকে নিমন্ত্রণ করবে এবং তার পরিবর্তে সে বিশ্বের সর্বত্র নিমন্ত্রণের অধিকার পাবে।' গান্ধীজির কণ্ঠে বিধাতা ডাকবার যে অসামান্য শক্তি দিয়েছেন সে ডাক সমগ্র জাতিকে তার শ্রেষ্ঠ আত্মপ্রকাশে উদ্‌বোধন করবে এ আশা যেমন করেছেন, তেমনই এ কথাও মনে হয়েছে যে, তার বদলে কোনো মন্ত্র বা অন্ধবিশ্বাসের কাছে জাতির আত্মবিক্রয় আত্মহত্যার সমান। 'কোনো একটা বাহ্যানুষ্ঠানের দ্বারা অদূরবর্তী কোনো একটা বিশেষ মাসের বিশেষ তারিখে স্বরাজলাভ হবে এ কথা যখন অতি সহজেই দেশের অধিকাংশ লোক বিনা তর্কে স্বীকার করে' তখন নবযুগের মহাসৃষ্টির ডাক ব্যর্থ হয়ে যায়, এ কথা জানাতে তিনি কুণ্ঠাবোধ করেননি।[৩২২]

যে তাগিদে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে প্রবন্ধ লেখেন, গান্ধীজির সঙ্গে আলোচনায় বসেন, উত্তেজিত দেশবাসীর অবজ্ঞা-অপমানে অবিচলিত থাকেন, তার জিম্মাতেই সমস্ত মনটা নেই। বাইরের অভিঘাতে কখনও উদ্‌ভ্রান্ত করে, কখনও ক্লান্ত করে, তবু ভিতরে যে কবি সার্বভৌমের আসনখানি পাতা, তাঁর আহ্বান স্বধর্মচ্যুতি ঘটতে দেয় না। 'শিশু ভোলানাথ'-এর কবিতাগুলি একে একে সৃষ্ট হয়ে উঠেছে। শারদ অবকাশের সময়ও শান্তিনিকেতনে আছেন। মনে হয় ক্ষিতিমোহন তাঁকে বিজয়ার প্রণাম জানিয়েছিলেন এবং তাতে দেশের তৎকালীন পরিস্থিতি সম্পর্কে কিছু কথা ছিল। তিনি তখন ঢাকায়, ঢাকার ঠিকানায় লেখা রবীন্দ্রনাথের উত্তর নীচে দেওয়া গেল :

ওঁ

প্রীতিনমস্কারপূর্ব্বক নিবেদন

আমার বিজয়ার অভিবাদন গ্রহণ করিবেন।

সমস্ত দেশের যে চিত্তবিক্ষেপ ঘটিয়াছে স্বভাবের নিয়মেই তাহার প্রতিক্রিয়া ঘটিবে। কিন্তু প্রতিক্রিয়াতেও উদভ্রান্ত করে। কিন্তু আমার শক্তি নাই পথ দেখাই। আমি অকর্ম্মণ্য। কর্ম্মক্ষেত্রে

নামিলে আমি স্বধর্ম্মভ্রষ্ট হই। সুতরাং দেখিতে দেখিতে তাহা ভয়াবহ হইয়া উঠে। আমার ক্লান্ত মন চারিদিক হইতে প্রতিহত হইয়া এখন বাল্যকালের মধ্যে ফিরিয়া গেছে : সেইখানে বসিয়া ছন্দের খেলা পাতিয়াছি। বাল্য হইতে বাল্যে ফিরিলে তবেই জীবনের প্রদক্ষিণ কার্য্য সমাপ্ত হয়— সেই সমাপ্তির জন্য আমার চিত্ত উৎসুক হইয়াছে। বিধাতা যদি দায়িত্ব বর্জ্জন করিবার অধিকার আমাকে দেন তবেই আমার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে।

অধ্যাপক লেভির পত্র পাইয়াছি তিনি আসিবেন কার্ত্তিকের শেষে।

ইতি ৩১ আশ্বিন ১৩২৮ আপনাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর[৩২৩]

দেশের চিত্তবিক্ষেপে শান্তিনিকেতনও আলোড়িত হয়েছিল, তা বলে যে তার শান্ত পরিবেশ, তার অধ্যয়ন-অধ্যাপনার আবহাওয়া একেবারে হারিয়ে গিয়েছিল এমন মনে করবার কারণ দেখি না, শান্তিনিকেতন পত্রিকার মাসিক প্রতিবেদনগুলিও সে কথা বলে না। গত বছরে কয়েকজন অধ্যাপক এসেছেন, পুরোনোরা তো আছেনই। মুজতবা আলী বিশ্বভারতীর ছাত্র হয়ে এসেছিলেন ১৯২১ সালে, তিনি লিখেছেন অধ্যাপক মরিসের ফরাসি ভাষা শেখানোর ক্লাসে তাঁদের সঙ্গো শিক্ষার্থী হয়ে বসতেন বিধুশেখর ও ক্ষিতিমোহনও। নভেম্বর মাসে প্রথম 'অভ্যাগত অধ্যাপক' হয়ে এলেন ফরাসি পণ্ডিত অধ্যাপক সিলভ্যাঁ লেভি। তিনি ফরাসি ভাষাও শেখাতেন, চিনা ও তিব্বতি ভাষাও শেখাতেন। আম্রকুঞ্জে সপ্তাহে সপ্তাহে তিনি বক্তৃতা দিতেন প্রাচীন ভারতের সঙ্গো বহির্জগতের সম্পর্ক বিষয়ে। এই-সব আলোচনাসভায় স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও উপস্থিত থাকতেন, অধ্যাপক লেভির ইংরেজি বক্তৃতা শেষ হলে তার বিষয়বস্তু সংক্ষেপে বাংলায় বলতেন। তিনি নিজেও প্রায় প্রতিদিনই সন্ধ্যায় সাহিত্য শিল্প শিক্ষানীতি সম্বন্ধে কিছু-না-কিছু পড়ে শোনান, আলোচনা করেন। কিছুদিন থেকে তিনি দেহলির পরিবর্তে আশ্রমের উত্তরদিকের মাঠে তাঁর জন্য তৈরি পর্ণকুটিরে বাস করছেন। সেইখানেই আগের নিয়মে সন্ধেবেলা সকলে জড়ো হন, কখনও ইংরেজি সাহিত্য, কখনও বা নিজের লেখা পড়েন রবীন্দ্রনাথ। অগ্রহায়ণ মাসের গোড়া থেকে বিশ্বভারতীর ক্লাসে 'বলাকা'-র কবিতা পড়াতে লাগলেন।[৩২৪] ক্ষিতিমোহন লিখেছেন :

পড়ার সঙ্গো সঙ্গো কবি আপন বক্তব্য বলিয়া যান, আর অনেকে বসিয়া লেখেন। তাহার মধ্যে শ্রীমান প্রদ্যোৎকুমারের লেখাও ভাল এবং লিখিয়া নিবার বিশেষ পটুতাও আছে। সকলের অনুরোধে তিনি পরে তাঁহার নোটগুলি বিশ্বভারতী পত্রিকায় ছাপাইয়া দেন।[৩২৫]

এ আলোচনা নিয়মিত শুনে লিখে রাখতেন ক্ষিতিমোহনও। তাঁর লেখা থেকে জানা যায় ১৯১৬ সালে 'বলাকা' প্রকাশের অব্যবহিত পরেই তাঁদের অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ এই কাব্য নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। অজিতকুমার চক্রবর্তী সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ অনেকে সেই আলোচনাসভায় থাকতেন এবং সকলেই কবির বক্তব্য লিখে নিতেন, ক্ষিতিমোহনও ব্যতিক্রম ছিলেন না, বলাই বাহুল্য। তবে 'বলাকা'-র সব আলোচনা ধারাবাহিকভাবে যেমন হয়নি তেমন উল্লিখিত উপলক্ষগুলি ছাড়াও যখনই রবীন্দ্রনাথ ক্ষিতিমোহনের উপস্থিতিতে

'বলাকা' কাব্যের কোনো আলোচনা করেছেন, সে বক্তব্য লিখে রাখার চেষ্টা থেকে তিনি বিরত থাকেননি। অনেকদিন পরে ক্ষিতিমোহন যখন 'বলাকা-কাব্য-পরিক্রমা' লেখেন তখন বলেছিলেন যে প্রায় বিশ-পঁচিশ বছর ধরে নানা উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ 'বলাকা' সম্পর্কে যে আলোচনা করেছেন, এই গ্রন্থে সেইগুলিই তিনি যথাসাধ্য ধরে রাখবার চেষ্টা করেছেন।[৩২৬]

পৌষ উৎসব এসে পড়েছিল। ৮ পৌষ সকালে আম্রকুঞ্জে বিশ্বভারতীর উদ্‌বোধন দিবস উপলক্ষে একটি সভা হল, সভাপতির আসনে ছিলেন আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল।[৩২৭] এই সভায় বিশ্বভারতী পরিষদ গঠিত হল এবং বিশ্বভারতীর নতুন সংবিধান গৃহীত হল। পরিষদ ও বিশ্বভারতীর বিভিন্ন বিভাগ থেকে নির্বাচিত ও মনোনীত সদস্যদের নিয়ে কার্যনির্বাহক সভা বা বিশ্বভারতী সংসদ গঠন করা হল। ১৬ মে ১৯২২ রেজিস্টার্ড সোসাইটি হল বিশ্বভারতী। এই সংবিধানের নিয়মাবলি রদবদল হতে হতে ১৯৩৬ সালে আবার নতুন সংবিধান তৈরি হয়। আগেই বলেছি বিশ্বভারতীর সূচনাপর্ব থেকেই পুরোনো রীতিতে আশ্রম পরিচালনার ব্যবস্থা বদল হতে থাকে এবং অধ্যাপকসভার গুরুত্ব হ্রাস পায়।[৩২৮] ১০ পৌষ ছিল ২৫ ডিসেম্বর। খ্রিষ্টোৎসব উপলক্ষে মন্দিরে বিশেষ উপাসনা হল। জিশুখ্রিষ্টের জীবন ও বাণী নিয়ে আলোচনা করলেন পিয়র্সন ও ক্ষিতিমোহন। এর মাসখানেক পরে আবার ক্ষিতিমোহন কবীর সম্বন্ধে একটি আলোচনার সুযোগ পেলেন, শান্তিনিকেতন পত্রিকায় সেই আলোচনার প্রতিবেদনে লেখা হয়েছিল 'হৃদয়গ্রাহী'।[৩২৯]

ইতিমধ্যে নতুন বছর এসে দখল নিয়েছে, ১৯২২ সাল। মোটামুটি একই ছন্দে-লয়ে অতিবাহিত হয়ে চলেছে ক্ষিতিমোহনের জীবনের বছরগুলো—'দিনের পরে দিনগুলি মোর এমনিভাবে তোমার হাতে ছিঁড়ে ছিঁড়ে হারিয়ে যাবে।' রবীন্দ্রনাথের তাঁকে লেখা একটি তারিখহীন চিঠি পাচ্ছি, মার্চ মাসে লেখা বলেই মনে হয় :

ওঁ

প্রীতিনমস্কারপূর্ব্বক নিবেদন

শেষকালে যাওয়া হল না। আপনার কার্ড শেষ দিনে পেলুম তখন সময়মতো আপনাকে আনিয়ে নেওয়া সম্ভবপর হল না। পিয়র্সন এণ্ড্রুজদের কাছে সব খবর নিশ্চয় পেয়েচেন। আমি আরো দিন দশেকের জন্যে আশ্রমে অনুপস্থিত থাকব। কাল কয়দিনের জন্যে শিলাইদহে যাচ্চি। ফিরে এসে আপনাদের সঙ্গে মিলে কাজকর্ম্মে মন দিতে পারব।

ইতি বুধবার

আপনাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর[৩৩০]

দেশ পত্রিকায় পত্রপরিচিতিতে লেখা হয়েছিল : 'এই পত্র লেখার সময় চৌরিচরা হত্যাকাণ্ডের সংবাদ প্রচারিত হয়। গান্ধীজীর ছয় মাস কারাদণ্ডের আদেশ হয়।' ৫ ফেব্রুয়ারি চৌরিচৌরার ঘটনা ঘটে, ৮ ফেব্রুয়ারি সে খবর সংবাদপত্রে বেরোয়। তীব্র অনুশোচনায় গান্ধীজি আন্দোলন স্থগিত রাখাব নির্দেশ দেন। ১০ মার্চ তাঁকে গ্রেফতার করে ব্রিটিশ সরকার তাঁর বিরুদ্ধে মামলা শুরু করে ১৮ মার্চ। গান্ধীজি সমস্ত দোষ নিজের উপরে নিয়ে বিচারকের কাছে কঠোর শাস্তির আবেদন জানালে ছ-বছরের জন্য তাঁর কারাবাসের

রায় দেয় কোর্ট। সেটা আরও কিছুদিন পরের কথা। সেজন্য মনে হয় চৌরিচৌরার ঘটনা প্রচারিত হওয়ার সমকালে এই তারিখহীন চিঠিটা লেখা হয়েছিল বললে কথাটা তথ্য হিসেবে অস্পষ্ট এবং অসম্পূর্ণ হয়ে থাকে। আর এ কথা বলা বাহুল্যই যে মাত্র ছ-মাসের কারাদণ্ড হয়নি গান্ধীজির। চিঠির শুরুতে যে কথা আছে তা থেকে বুঝতে পারা যাচ্ছে, কোথাও যাওয়ার কথা হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের, শেষকালে যাওয়া হয়নি। জানা যাচ্ছে অধ্যাপক লেভি সস্ত্রীক নেপাল যাচ্ছিলেন সেসময়, রবীন্দ্রনাথও যাওয়ার জন্য আগ্রহী হন। ১২ মার্চ তিনি প্রমথ চৌধুরীকে লিখেছিলেন যদি রেলের পথে বিশেষ বিঘ্ন না ঘটে তবে লেভিসাহেবের-সঙ্গে কয়েকদিন পরে কলকাতায় গিয়ে ১৮ মার্চ তিনি নেপাল রওনা হবেন। কিন্তু নেপালের দুর্গম রাস্তায় যাওয়ার প্রস্তাবে কেউই সায় দেননি, সেজন্য যাওয়া হল না।[৩৩১] এই চিঠিতেই রবীন্দ্রনাথ ক্ষিতিমোহনকে জানিয়েছিলেন যে পরদিন তিনি শিলাইদহ যাবেন কয়েক দিনের জন্য। সেখান থেকে তিনি আশ্রমে ফিরে আসেন ২৭ চৈত্র। তার ঠিক আগের দিন ক্ষিতিমোহনকে আশ্বস্ত করে নীচের চিঠিটা লিখেছিলেন :

> প্রীতিনমস্কারপূর্ব্বক নিবেদন
>
> আপনি কিছুমাত্র উদ্বিগ্ন হইবেন না। আমি কাল সোমবারে যদি না পারি মঙ্গলবারে নিশ্চয় আশ্রমে যাইব—আমি যে ব্যবস্থা করিয়াছি তাহাতে আপনার চিন্তার কারণ সদ্যই দূর হইবে। ইতি ২৬ চৈত্র ১৩২৮
>
> আপনাদের
> শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর[৩৩২]

সম্ভবত ক্ষিতিমোহন উদ্‌বিগ্ন ছিলেন তাঁর প্রাপ্য বেতনের জন্য। অবশ্য জোর করে কিছু বলা চলে না, তবে হয়তো এ চিঠির যোগ আছে তারিখহীন আর-এক চিঠির সঙ্গো। তারিখহীন হলেও চিঠির উল্লেখ থেকেই বোঝা যাচ্ছে, ২৪ বৈশাখ লিখছেন রবীন্দ্রনাথ। পরদিন ২৫ বৈশাখ তাঁর জন্মদিন উপলক্ষে প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ শান্তিনিকেতনে এলে সব কথার আলোচনা হতে পারবে বলে আশা করছেন তিনি। সেবার ১৪ বৈশাখ থেকে ১৪ আষাঢ় আশ্রমে গরমের ছুটি ছিল এবং এই ছুটির সময় রবীন্দ্রনাথ এখানেই ছিলেন। ক্ষিতিমোহন ছুটিতে চলে যাওয়ার পরে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে একশো টাকা পাঠান। এ চিঠিটা যে এই সময়ই লেখা তার আর-একটা প্রমাণ : রবীন্দ্রনাথ আশ্রমের সান্ধ্য আলোচনাসভায় 'প্রজাপতির নির্বন্ধ' পড়েছেন তার উল্লেখ। এই সময়েই তিনি এ নাটক পড়ে শুনিয়েছিলেন, পড়ে শুনিয়েছিলেন সদ্যরচিত 'মুক্তধারা'-ও। চিঠিটা উদ্ধৃত করি :

> ওঁ
>
> প্রীতিনমস্কারপূর্ব্বক নিবেদন
>
> আপনার নামে ১০০ টাকার একটা মণি অর্ডার পাঠিয়েচি। পেয়েচেন ত? পূর্ব্বেই জানিয়েছিলেম পাঠাব। আপনি চলে যাওয়ার পরে আমাদের আলোচনাসভা কেবল আর দুবার বসেছিল। তার পরে হঠাৎ সেদিন নন্দলালরা ফরমাস করলে প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ পড়তে। এই দুদিন সেইটে পড়া চলচে। আগামীকাল আমার জন্মদিন। সম্ভবত প্রশান্ত কাল আসবে। তার সঙ্গো সব কথার আলোচনা হবে। সে ত পূর্ব্বেই বলে রেখেচে আগামী জুলাই মাসে আমাদের

কলকাতার সভাধিবেশন হবে—এ সম্বন্ধে কলকাতায় একদিন ছাত্রদলকে ডেকে ভূমিকা করা হয়েচে। মাঝে প্রখর গরম পড়েছিল। এখন বৃষ্টি হয়ে অনেকটা ঠাণ্ডা হয়েচে, আমি এণ্ড্রুজ এবং Beniot সাহেব ছাড়া আর অতি অল্প লোকই এখানে অবশিষ্ট আছে।

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর[৩৩৩]

এই অধ্যায়ের শুরুতে, যখন ক্ষিতিমোহন সবে এসে যোগ দিয়েছেন শান্তিনিকেতনের কাজে, সেই সময়কার কথা প্রসঙ্গে এ কথা হয়েছিল যে, পরে বেতন-বিষয়ে আরও দু-এক কথা আলোচনা করা যাবে। আর কিছু নয়, তাঁকে লেখা রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি চিঠির প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে ইচ্ছা ছিল। এই মাত্র দেখেছি একশো টাকা পাঠিয়েছেন তাঁকে, অনতিবিলম্বে আর-একটি চিঠিতেও আমরা দেখতে পাব রবীন্দ্রনাথ তাঁকে দু-মাসের দক্ষিণা বাবদ দু-শো টাকা পাঠিয়ে দিয়েছেন। সে চিঠিও এই বছরেই লেখা হয়েছিল। ক্ষিতিমোহন যখন শান্তিনিকেতনে চাকরি করতে এলেন, একশো টাকা বেতনের প্রতিশ্রুতি ছিল, এবং বছরে বছরে দশ টাকা হারে বেড়ে একশো পঞ্চাশ টাকা হওয়ার কথা। মনে হয় আসবার আগে তাঁর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যে-সব চিঠিপত্রের আদানপ্রদান হয়েছিল, সেই প্রস্তাব ও প্রতিশ্রুতি মতো বেতনক্রম অনুসৃত হয়নি। তা ছাড়া যেমন ১৯২২ সালেও দেখছি তিনি মাসিক একশো টাকা বেতন পাচ্ছেন, তেমনই বাসগৃহ খাওয়াখরচ ইত্যাদি বাবদ কিছু টাকা সকলেরই বেতন থেকে বাদ যাওয়ার কথা, সে হিসেবও উহ্য থাকছে। ব্রহ্মচর্যাশ্রমের নিয়মানুসারে অধ্যাপকরা ছাত্রদের সঙ্গেই আশ্রমের রান্নাঘরে খেতেন। যাঁরা সপরিবারে থাকতেন তাঁদের বরাদ্দ খাবার রান্নাঘর থেকে পাওয়া যেত। ক্ষিতিমোহনের পরিবার থেকেও প্রতিদিন কেউ গিয়ে খাবার আনতেন। তেমনই প্রাক্‌কুটিরের কাছে লণ্ঠনে বরাদ্দ-মতো তেল ভরে দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল, সেজন্যও যেতে হত। শুনেছি ক্ষিতিমোহনের ছেলেমেয়েরাই কেউ এ কাজগুলি করতেন। বিশ্বভারতীপর্বে রান্নাঘর থেকে খাবার দেওয়ার প্রথা বন্ধ হয়ে যায়, তার বদলে বেতন কিছু বেড়েছিল এমন আভাস সব শিক্ষক সম্পর্কেই সাধারণভাবে দিয়েছেন প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। এ প্রসঙ্গ এখানেই শেষ করি। শুধু তার আগে সুধীরচন্দ্র কর ও হীরেন্দ্রনাথ দত্তের লেখায় যা পেয়েছি এ ব্যাপারে, তার একটু উল্লেখ করব। প্রথমজন বলেছেন ক্ষিতিমোহন যে স্বেচ্ছায় অর্ধেক বেতন ছেড়ে দিয়েছিলেন তার প্রতিকার হয় তেরো বছর পরে। তার মানে একটু আগে রবীন্দ্রনাথের যে চিঠি থেকে এই প্রসঙ্গ তুলেছিলাম তারই সমকালে, ১৯২১-২২ সালে। দ্বিতীয়জন বলেছেন চল্লিশের দশকেও শান্তিনিকেতনে সবচেয়ে বেশি বেতন ছিল আড়াইশো টাকা এবং সে বেতন পেতেন কেবল তিনজন—বিধুশেখর শাস্ত্রী, ক্ষিতিমোহন সেন এবং নন্দলাল বসু। অধ্যাপকরা তখন কাজ শুরু করতেন পঁচাত্তর টাকায়, অফিসের কর্মীরা আর-একটু কমে।[৩৩৪]

কলকাতায় বিশ্বভারতী সম্মিলনী স্থাপনের আয়োজন চলছিল। জুলাই মাসে বিশ্বভারতীর এই শাখাসমিতির সভাধিবেশন হবে বলে প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ জানিয়েছেন, রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন ক্ষিতিমোহনকে। ১৬ শ্রাবণ ১৩২৯ ক্ষিতিমোহনের বক্তৃতা হল এই

সম্মিলনীর অধিবেশনে। অল্পদিন আগে তিনি কবীর সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতীর সান্ধ্যসভায়, সম্মিলনীর অধিবেশনে সেই প্রবন্ধটিই পড়লেন এবং আলোচনা করলেন। কবীরদোঁহা কয়েকটি গেয়ে শোনালেন গুরুদয়াল মল্লিক ও অন্যান্যরা। সভাপতির আসনে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ।[৩৩৫] পরের বছরে সম্মিলনীর সভায় ক্ষিতিমোহন বেশ কয়েকটি বক্তৃতা করেন—'কবীরের ভারতপন্থ', 'মধ্যযুগে ভারতবর্ষে সেবার আদর্শ', 'বিশ্বসৌন্দর্যের উপাদান'; এই শেষের বক্তৃতার সঙ্গে প্রাচীন বাংলা সাহিত্য অথবা মধ্যযুগের সাহিত্য পাঠ করেছিলেন।[৩৩৬] প্রসঙ্গত বলি, গরমের ছুটিতে ক্ষিতিমোহন বাড়ি যেতেন। তখন তিনি ঢাকা প্রভৃতি জায়গায় বক্তৃতা করতেন। পত্রিকা থেকে তার একটু-আধটু আভাস পাওয়া যায়। ঢাকার দীপালি সঙ্ঘে তিনি একবার ভাষণ দিয়েছিলেন 'দাদূর কন্যাদের বাণী'।[৩৩৭] যা ছিল ক্ষিতিমোহনের একান্তে চর্চার বিষয়, শান্তিনিকেতনের ঘরোয়া সভায় এতদিন যা নিয়ে তিনি বড়োজোর আলোচনা করেছেন, বহু মানুষের মনের দ্বারে সেই মহান ভক্তবাণীর আবেদন পৌঁছে দেওয়ার আহ্বান এসেছে রবীন্দ্রনাথের অনুপ্রেরণায়। বিশ্বভারতী সম্মিলনীর সভায় তারই সূত্রপাত ঘটল কবীর-আলোচনার মধ্য দিয়ে। ভারতের মধ্যযুগ যে পাশ্চাত্য সভ্যতার মধ্যযুগের মতো ঊষর ও অন্ধকারাচ্ছন্ন নয় সে কথা যেন মানুষ ভুলেই গিয়েছিল। সন্তদের জীবন ও তাঁদের বাণীর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে তাদের সামনে এক ঐশ্বর্যময় রহস্যাবৃত কালের যবনিকা তুলে দেখাতে শুরু করলেন ক্ষিতিমোহন।

সেবার রবীন্দ্রনাথ বেশ দীর্ঘসময়ের জন্য ভারতের পশ্চিম ও দক্ষিণাঞ্চলে ঘুরতে গিয়েছিলেন, উদ্দেশ্য ছিল বিশ্বভারতীর আদর্শপ্রচার ও তার জন্য অর্থসংগ্রহ। এই ভ্রমণপর্বে ক্ষিতিমোহনকে লেখা তাঁর একটা চিঠি পাচ্ছি, সেটা সম্ভবত নভেম্বরের শেষের দিকে লেখা এবং চিঠির উল্লেখ থেকে মনে হয় বোম্বাই থেকে লেখা। ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে তাঁর আশ্রমে ফিরে আসবার কথা ছিল। ১৯২০-২১ সালের ইউরোপ ভ্রমণের সময় রবীন্দ্রনাথ অধ্যাপক সিলভ্যাঁ লেভি ও অধ্যাপক উইনটারনিট্‌জের সঙ্গেও পরিচিত হন। তাঁর আমন্ত্রণে প্রথমজনের মতো দ্বিতীয় জনও বিশ্বভারতীর অভ্যাগত অধ্যাপকরূপে আমন্ত্রিত হন, তিনি সম্ভবত এ বছরের নভেম্বরে এলেন, রবীন্দ্রনাথ ফেরবার আগেই। তিনি ফেরবার আগেই অধ্যাপক উইনটারনিট্‌জ শান্তিনিকেতনে এসে পৌঁছোবেন জানিয়ে রবীন্দ্রনাথ ক্ষিতিমোহনকে লিখেছিলেন তাঁরা যেন আশ্রমে তাঁকে যথাবিহিত সংবর্ধনা সহকারে গ্রহণ করেন। চিঠিটি এখানে তুলে দিই :

ওঁ

প্রীতিনমস্কারপূর্ব্বক নিবেদন

এ অঞ্চলে আমার ভিক্ষাকৃত্য প্রায় শেষ হয়ে এল—অর্থাৎ শনিগ্রহ আপাতত কিছুদিনের জন্যে রবিকে ছাড়বে। আগামী বৃহস্পতিবারে আমি বোম্বাই ত্যাগ করে আশ্রমে যাত্রা করব। তার পূর্ব্বে রবিবারে অধ্যাপক বিন্টারনিট্‌স এখান থেকে রওনা হবেন। তিনি অতি নিরীহ নম্র শান্ত প্রকৃতির লোক। আপনারা যথারীতি এঁকে অভ্যর্থনা করে আশ্রমে গ্রহণ করবেন। আপনার কথা

এঁকে বলেচি, আপনার সঙ্গে আলাপ করে ইনি প্রীত হবেন সংশয় নেই। আপনাকে অঘ্রান পৌষ দুই মাসের দক্ষিণা ২০০ টাকা পাঠিয়েচি, নিশ্চয় এতদিনে পেয়েছেন।
ইতি অগ্রহায়ণ ১৩২৯ আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর[৩৩৮]

মাসিক দক্ষিণা প্রসঙ্গ আগেই আলোচনা করেছি। প্রখ্যাত প্রাচ্যবিদ্যাবিদ পণ্ডিত উইনটার-নিট্‌জ এসে পৌঁছেছেন। ক্ষিতিমোহন অধ্যাপক সিলভ্যাঁ লেভির মতোই এই মানুষটির প্রতিও শ্রদ্ধাপরায়ণ। নিয়মিত তাঁর বক্তৃতা শোনেন, অনুলিখন করে রাখেন। পৌষ উৎসবের রেশ মিলিয়ে যেতে না যেতে ৬ মাঘ এসে পড়ে। মহর্ষিদেবের তিরোভাবদিনের শান্ত সকালে মন্দিরে উপাসনা করেন রবীন্দ্রনাথ। এবার দুপুরবেলা মাধবীকুঞ্জে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে একটি সভা হল, দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনী ও জীবনী থেকে, 'জীবনস্মৃতি' থেকে নির্বাচিত অংশ পড়ল তাদের কয়েকজন। সভাপতির ভাষণে ক্ষিতিমোহন ছোটোদের উপযোগী করে দেবেন্দ্রনাথ সম্পর্কে কিছু বললেন।[৩৩৯] এই-সবের মধ্যে হঠাৎ কয়েকটা ব্যতিক্রমী দিন এসে গেল। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তিনি কাশী চললেন।

কবির সঙ্গে কাশী এবং অন্যান্য স্থানে

কাশীতে প্রবাসী বাঙালিদের প্রথম সাহিত্যসম্মিলন অনুষ্ঠিত হবে ৩-৪ মার্চ ১৯২৩। রবীন্দ্রনাথ তারই অভ্যর্থনাসমিতির সভাপতি প্রমথনাথ তর্কভূষণের অনুরোধে এই সম্মিলনীর সভাপতিত্ব করবার দায়িত্ব স্বীকার করেছেন। সেজন্য ২৮ ফেব্রুয়ারি ক্ষিতিমোহনকে সঙ্গে নিয়ে কাশীর উদ্দেশে যাত্রা করলেন। ক্ষিতিমোহনের জন্মশহর কাশী, যেখানে সংস্কৃত ও হিন্দি ভাষার মধ্য দিয়ে জ্ঞানজগতে তাঁর প্রথম পদার্পণ। নিজের মাতৃভাষার সঙ্গে তখন পরিচয় যৎসামান্য, তার পরে তরুণ বয়সে রবীন্দ্র রচনার ভিতর দিয়ে সাহিত্যসম্পদে ধনী বাংলা ভাষা তাঁর চিত্ত জয় করে নিল। সেই অবধি রবীন্দ্রনাথ ও বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে চিরসৌহার্দবন্ধনে তিনি বাঁধা, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে শান্তিনিকেতনের কর্মবন্ধন তার অনেক পরে। সম্মিলনে সভাপতির ভাষণে রবীন্দ্রনাথ বললেন :

> আজকে প্রবাসের এই বঙ্গসাহিত্যসম্মিলনী হঠাৎ আত্মপ্রকাশের জন্য উৎসুক হয়েছে ; এই আগ্রহের কারণ হচ্ছে বাঙালি আপন প্রাণ দিয়ে একটি প্রাণবান সাহিত্যকে গড়ে তুলেছে। ...ভাষা-বসুন্ধরাকে আশ্রয় করে যে মানসদেশে তার চিত্ত বিরাজ করে সেই দেশ তার ভূসীমানার দ্বারা বাধাগ্রস্ত নয়, সেই দেশ তার স্বজাতির সৃষ্ট দেশ। আজ বাঙালি সেই দেশটিকে নদী প্রান্তর পর্বত অতিক্রম করে সুদূর প্রসারিতরূপে দেখতে পাচ্ছে, তাই বাংলার সীমার মধ্য থেকে বাংলার সীমার বাহির পর্যন্ত তার আনন্দ বিস্তীর্ণ হচ্ছে।[৩৪০]

এই সার্থকতা ঘটেছে বলেই সাবধানবাণী উচ্চারণ করলেন। বাঙালির স্বাজাত্য-অভিমানের মাত্রাধিক্য তার বৃহত্তর সত্তার পরিচয়কে যেন আচ্ছন্ন না করে। বললেন :

> আজ বাংলাভাষাকে অবলম্বন করে উত্তর ভারতের সঙ্গে সেই আন্তরিক পরিচয়ের প্রবাহ বাংলার অভিমুখে ধাবিত হোক। এখানকার সাহিত্যিকেরা আধুনিক ও প্রাচীন উত্তর ভারতীয়

> সাহিত্যের যে শ্রেষ্ঠ সম্পদ, যা সকলের শ্রদ্ধা উৎপাদন করবার যোগ্য, তা সংগ্রহ করে দূরে বাংলাদেশে পাঠাবেন—এমনিভাবে ভাষার মধ্য দিয়ে বাংলার সঙ্গো উত্তর ভারতের পরিচয় ঘনিষ্ঠতর হবে।[৩৪১]

প্রাচীন. হিন্দি সাহিত্যের কিছু কিছু অসামান্য সৃষ্টির সঙ্গো তাঁর নিজের পরিচয় ঘটেছে ক্ষিতিমোহনের মাধ্যমে, সে প্রসঙ্গা উত্থাপন করে ভাষণে রবীন্দ্রনাথ বললেন :

> আমি হিন্দি জানি না, কিন্তু আমাদের আশ্রমের একটি বন্ধুর কাছ থেকে প্রথমে আমি প্রাচীন হিন্দি সাহিত্যের আশ্চর্য রত্নসমূহের কিছু কিছু পরিচয় লাভ করেছি। প্রাচীন হিন্দি কবিদের এমন-সকল গান তাঁর কাছে শুনেছি যা শুনে মনে হয় সেগুলি যেন আধুনিক যুগের। তার মানে হচ্ছে যে কাব্য সত্য তা চিরকালই আধুনিক। আমি বুঝলুম যে হিন্দি ভাষার ক্ষেত্রে ভাবের এমন সোনার ফসল ফলেছে সে-ভাষা যদি কিছুদিন অকৃষ্ট হয়ে পড়ে থাকে তবু তার স্বাভাবিক উর্বরতা মরতে পারে না; সেখানে আবার চাষের সুদিন আসবে এবং পৌষমাসে নবান্ন-উৎসব ঘটবে। এমনি করে এক সময়ে আমার বন্ধুর সাহায্যে এ দেশের ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গো আমার শ্রদ্ধার যোগ স্থাপিত হয়েছিল। উত্তর-পশ্চিমের সঙ্গো সেই শ্রদ্ধার সম্বন্ধটি যেন আমাদেব সাধনার বিষয় হয়। মা বিদ্বিষাবহৈ।[৩৪২]

সেই বন্ধু তখন তাঁর সঙ্গোই রয়েছেন, প্রাদেশিক সংকীর্ণতার বাষ্পমাত্র যাঁর মনে কোনোদিন স্থান পায়নি। তাঁর স্বদেশের সীমানা অনেক বড়ো। রবীন্দ্রনাথ আশা করছিলেন এবং উৎসাহ দিচ্ছিলেন যে কাশী ভারতীয় সমস্ত বিদ্যার মিলনস্থান, সেখানকার এই বাঙালি সাহিত্য প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে প্রাচীন পুথি চিত্র ও মূর্তি সংগৃহীত হবে। 'এখানে যে সারস্বতভাণ্ডার স্থাপনের প্রস্তাব হয়েছে তা যেন আপনাদের স্থায়ী কাজে প্রবৃত্ত করে।' রবীন্দ্রনাথের ভাষণ শুনতে শুনতে ক্ষিতিমোহন নিজের ভিতরে অন্য এক কাজের তাগিদ বোধ করছিলেন। কাশী-প্রশস্তি ছিল তাঁর বক্তৃতায়—কাশী বস্তুত ভারতবর্ষের কোনো বিশেষ প্রদেশভুক্ত নয়, কাশী ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের। এ যেন ক্ষিতিমোহনের নিজেরই অন্তরের কথা।

> ভারতবর্ষে যে-সকল তীর্থস্থান আছে তার সর্বপ্রধান কাজই হচ্ছে এই যে, সেখানে যাতে সকল প্রদেশের লোক আপন প্রাদেশিক সত্তার চেয়ে বড়ো সত্তাকে উপলব্ধি করে। সমস্ত হিন্দু-ভারতবর্ষের যে একটি বিরাট ঐক্য আছে সেটি প্রত্যক্ষ অনুভব করবার স্থান হচ্ছে এই সব তীর্থ।[৩৪৩]

এ-সব কথা ক্ষিতিমোহনের মনের মধ্যে যে এক সংকল্পের জন্ম দিচ্ছিল তাঁর বইয়ের পাতায় তার প্রমাণ ধরা আছে। সেখানে তিনি নিজেও বলেছেন : 'কিন্তু তীর্থস্থানে গেলে নানা প্রদেশের নানা আচার পাশাপাশি এক স্থানেই দেখা যায়। কাশীতে থাকায় এইগুলি ছেলেবেলায় লক্ষ করিতাম। কিন্তু ইহার মহত্ত্ব তখনো বুঝি নাই।'[৩৪৪] এবার কাশীতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ যখন দেখলেন ঘাটে ঘাটে মন্দিরে মন্দিরে নানা প্রদেশের মানুষ পাশাপাশি আপন আপন পূজা আচার ও ব্রত পালন করছে, তাঁর ধারণা হল এই এক জায়গাতেই বসে সারা ভারতের পরিচয় লাভ করা যায়, এমন সুযোগ যেন বৃথা না যায় কাশীবাসীদের। '১৯২৩ সালে কাশীতে গিয়া এই কথাটা বিশেষভাবে বলিয়াছিলেন। আমি তখন হইতেই এই দিকে একটু একটু কাজ করিতেছি, যদিও আমার আসল কর্মক্ষেত্র স্বতন্ত্র।'[৩৪৫]

কাশী থেকে লখনউতে এসে অতুলপ্রসাদ সেনের বাড়িতে কয়েক দিন কাটিয়ে রবীন্দ্রনাথ ক্ষিতিমোহনকে নিয়ে বোম্বাই গেলেন ১০ মার্চ।[৩৪৬] সেখানে সমুদ্রের ধারে পাহাড়ের উপরে থাকা, বন্ধু মাওজির বাড়িতে যাওয়া, জাহাঙ্গীর পেটিটের বিদুষী কন্যার সঙ্গো পরিচয় প্রভৃতি নানা বিবরণ আছে ক্ষিতিমোহনের স্ত্রীর কাছে লেখা ১২ মার্চের চিঠিতে। ধনী পারসিগৃহে সন্তানের উপনয়ন উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গো সেখানে গিয়ে রীতিমতো সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন, নিঃসংকোচে সে কথা লিখেছেন কিরণবালাকে। তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতা-বৈচিত্র্যের এ আর-এক দিক। সেখানে একদিকে ডিনার, পোলিশ বাদকের অনুষ্ঠান। অন্যদিকে বোম্বাইতে থাকার সময়েই আলাপ হল সরোজিনী নাইডু, বিচারপতি চন্দ্রভানকর প্রমুখ মানুষের সঙ্গো। আলাপ-পরিচয়-যোগাযোগের যে বিশাল বৃত্ত তাঁর জীবন জুড়ে, তার এতই সামান্য খোঁজ বাস্তবে আমরা দিতে পারব যে দু-একটি নামমাত্র উল্লেখ করতে সংকোচ বোধ হয়। চিঠির সূত্র ধরে আবার এও লক্ষ করি যে তার মধ্যেই ক্ষিতিমোহন সোমনাথ গিয়ে পৌঁছেছেন, বন্ধু বুলাকী দাসের সঙ্গো দেখা হয়েছে। অজানা নদী অজানা গ্রাম দেখার আনন্দ থেকেও বঞ্চিত হচ্ছেন না, আশ্রমে ভজনও শোনার সুযোগ হচ্ছে। চিঠিটা একেবারে জরাজীর্ণ, তবু যতটা সম্ভব উদ্ধৃত করি :

Mount Petit. Peddar Road
12. 3. 23

প্রিয় কিরণ,

কয়দিন থেকে ভাবছি ভাল করে একটু চিঠি লিখি। লেখা আর হয় না। মাত্র খবর দিয়ে তো আর চিঠি লেখা [হয় না] । তার মূল্য বড় একটা কিছু নয়। তবু তোমাকে অনবসরের মাঝেও একটু পত্র লিখতে হোলো।

লখনউতে আসবার আগেব দিন রাজা মামদাবাদ রাজা নবাব আলি রাজা পৃথ্বীলাল প্রভৃতির সঙ্গে দেখা হয়েছে। সেখানে গুরুদেব আমাকে একেবারে সপ্তম স্বর্গে তুলে দিয়েছেন। আমার খাতির দেখে আমারই বড় লজ্জা করেছে।

এখানে গত শনিবার ১০ই মার্চ্চ এসেছি। বেলা এখন ৫ টা। ষ্টেশনে আমাকেই নিতে মাওজী [...] গোবিন্দজী শেঠ এসেছিলেন। যিনি লাবুকে টাকা দিয়েছিলেন। গুরুদেব বল্লেন "আপনি দূরে যাবেন না, কাছেই ব্যবস্থা হবে।" তবু সেই রাত্রের জন্য মাওজীর বাড়ী যাবার আজ্ঞা পাওয়া গেল। গুরুদেব ষ্টেশন থেকে অন্যত্র গেলেন। আমি তাঁর বাসায় অর্থাৎ Jahangir Petitর বাসায় গেলাম। [.] কন্যা হিলা বাই খুব চমৎকার মেয়ে। [চোখে তার] [.]। আলাপ হোল। আলাপও বেশ কর্ত্তে পারেন। তার [.] আমার আরও ভাল লাগলো। যেমন বুদ্ধি [.]—তেমনি একটি মধুর মাধুর্য।

বাড়িটি একটি পাহাড়ের ওপর, তার সামনে বাগান, তার সামনে সমুদ্র। এমন একটি স্থান মেলা কঠিন—তবু গাছপালায় সমুদ্র দেখা কঠিন। আমার বাসা হয়েছে হিন্দু পুরুষোত্তম মুরার [.] গোকুল দাসের বাড়ী। ইনিও অগাধ ধনী। এঁর ছেলে [.] চমৎকার লোক। এখান থেকে সমুদ্রের মাঝে কোন ব্যবধান নেই। গুরুদেবের ঘর আমার ঘর থেকে ১ $\frac{১}{২}$ মিনিটের ব্যবধান—এও পাহাড়ের উপর। —তবে ঠিক সমুদ্রের উপর [ ] আড্ডা—গাছপালা সমুদ্রের ধারে রাখতে দেয় নি। সন্ধ্যা হয়ে আসতে লাগল। —ক্রমে রৌদ্র সোনা হয়ে সমুদ্রকে তরঙ্গিত স্বর্ণ [...] করে তুললো। তার উপর আঁধার এসে আরও চমৎকার করলো। তখন আমি বাসা ছেড়ে Grand Road

ষ্টেশনে গিয়ে রেলে করে Santa Cruz ষ্টেশনে গেলাম। মাওজীর বাড়ী। তার এতকাল সন্তান হয় নি। এতদিনে একটি ২ মাসের শিশু দেখলাম। মাওজীর মার আনন্দ দেখে কে? ছেলের মা বড় রোগা ও অসুস্থ হয়েছেন। রাত্রে চমৎকার ভজন গান শুনলাম। খুবই সুন্দর সুর। রাত্রি ১টায় শুয়ে ভোরে ৫টায় ওঠা সহজ ব্যাপার নয়। তাই করতে হয়েছে। [প্রাতে] উঠে চা খেলাম। কাল খুব গরম জলে স্নান করে [ ] হওয়া গেছে—আজ বড় ভাল লাগছে।

চা খেয়ে ষ্টেশনে এসে টিকিট করে Parel ষ্টেশনে নামলাম। সেখানে বীরেন সেন—আমার ছাত্র—তার সঙ্গে দেখা হোলো। সেখান হতে Grand Road ষ্টেশনে এসে বাসাতে এলাম। পথে ক্ষিতীশ রায় (কালু)—তার সঙ্গে দেখা।

মধ্যাহ্নে গুজরাতী বাড়ী খাওয়া স্নান ও ১০/১২ খানা Post card লেখা ও নন্দবাবুকে পত্র লেখা। এমন সময় পারসীদের মধ্যে খুব ধনী Bhava মহাশয়ের বাড়ী তাঁদের এক সন্তানের পৈতা হওয়া উপলক্ষে নিমন্ত্রণ হোলো। বিরাট আয়োজন। একটা Band [.] প্রায় ১৫০ জন ইংরেজ বাজাচ্ছে। ৭/৮ শত নিমন্ত্রিত নরনারী। কি সাজসজ্জা। গুরুদেব আমাকে পরিচিত করে দিলে আমার বাঙালী ধুতি চাদরে সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট কোল্লো। পারসীদের ব্রাহ্মণদের সঙ্গে আমাকে বসতে দিলে। একজন পুরোহিত আমাকে সব বর্ণনা করতে লাগলো। অনেকটা আমাদের মত মন্ত্র। তবে নেড়া করা প্রভৃতি নাই। ছেলেটি বড় সুন্দর। পৈতা হয়ে গেলে—সকলে খেতে গেলেন—আমিও গেলাম। খেলাম না—বহু বড় লোকের সঙ্গে আলাপ হোলো। তাতার সঙ্গে আলাপ হোলো। [..] সুখী হওয়া গেল। বুড়োরা প্রাচীনপন্থী—যুবকরা [...] । এদের মধ্যে বেশ বিভাগ আছে দেখা গেল।

ইতিমধ্যে খ্যাত হয়ে গেছে যে আমি একজন আলাপী লোক। দলে দলে মেয়েদের দল আমার আলাপ শুনতে চায়। Mrs Petit আমাকে ক্রমাগত introduce কচ্চেন। Lady Tata-র সঙ্গে $\frac{১}{২}$ ঘণ্টাই আলাপ হোলো। তা ছাড়া আরও কতজন তার ইয়ত্তা নেই। খু[ব] আলাপাদি করে ৮টার সময় Dinnerএ বসলাম। রাত্রি ৯টায় Dinner শেষ করে বিখ্যাত Polandবাসী বাদক Premyolarর বাজনা শুনতে গেলাম। সেখানে Box আমাদের জন্য হয়েছিল। ষ্টেশন থেকে ১২টায় বাসায় আসি। আজ বেলা ৮টায় A K. Senর বাসায় যাই। সরোজিনী নায়ডুর সঙ্গে আলাপ হোলো। কাল Justice Chandravankar সঙ্গে আলাপ হয়েছে। সরোজিনী নায়ডু আলাপের সেরা রমণী বটে। আজ মধ্যাহ্নে খেয়েছি Petit বাড়ী। বৈকালে বহু দেখার যাব। সমুদ্র সামনে, দেখার সময় পাই নে। আমরা এখান থেকে আমেদাবাদ যাব। তারপর করাচী [...] । আমেদাবাদ ১৯শে মার্চ্চ [. .] তারপর করাচী। [. .]—The Retreat, Shahibag, Ahmed [abad] ঠিকানা ও করাচীতে Post Box 164-[...] ঠিকানা। শিশুদের ও অন্যদের ভ্রমণটা একটু বোলো। গুরুদেব বড় ক্লান্ত [...]

চিঠির মার্জিনে আরও দু-লাইন লেখা, তবে অস্পষ্ট ও ছাড়া ছাড়া—'Miss Green—চাদর ২০, ১০, তুমি নিও—ভালো আছি শুভ চাই'।[৩৪৭]

করাচি থেকে মার্চ মাসের তৃতীয় সপ্তাহে স্ত্রীকে লেখা ক্ষিতিমোহনের আর-একটি চিঠিতেও এই শফরের আরও খানিকটা খবর পাব। সে চিঠিও জীর্ণ, তবু যতটা উদ্ধার করা গেছে তুলে দিচ্ছি। 'রবীন্দ্রজীবনী'-র বিবরণের সঙ্গে ক্ষিতিমোহনের এই চিঠির বিবরণ সব জায়গায় মেলে না। রবীন্দ্রনাথ-ক্ষিতিমোহন করাচি পৌঁছোলেন ১৯ মার্চ, সেদিনই বার্নস উদ্যানে বিরাট জনসভায় কবিকে সংবর্ধনা জানানো হল। পরদিন ২০ মার্চ ক্ষিতিমোহন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দুটি বালিকা বিদ্যালয় দেখতে গিয়েছিলেন, আর সেদিন বিকেলে বাঙালিরা রবীন্দ্রনাথকে সংবর্ধনাজ্ঞাপন করে দু-শো একান্ন টাকা উপহার দিলেন।

ক্ষিতিমোহন লিখেছেন ২১ মার্চ সকাল দশটায় পৌর সংবর্ধনা হল আর বিকেলে প্রেস ক্লাবে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভাষণে নিজের জীবনের ক্রমবিকাশ ও বিশ্বভারতীর আদর্শের ক্রমবিকাশ বিষয়ে বললেন, ছাত্ররাও তাঁকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। করাচিতে তাঁরা জামসেদ মেটার অতিথি। গুরুদয়াল মল্লিকও আছেন। এখানে তাঁদের বেশ কেতাদুরস্ত হয়ে থাকতে হচ্ছে। ২২ মার্চ সন্ধ্যা সাতটায় বক্তৃতা দিলেন রবীন্দ্রনাথ। অনাবিল জাতির যুবসম্প্রদায় তাঁকে সভায় আহ্বান করেছিলেন, এই জাতির ছাত্রীরাও দেখা করতে এসেছিলেন, কেশবচন্দ্র সেনের ভাইপো নন্দলাল সেনের স্কুল তাঁরা দেখতে গিয়েছিলেন, মল্লিকজির আমন্ত্রণে গিয়েছিলেন তাঁর গৃহে—এমনই সব নানা খবর ক্ষিতিমোহনের চিঠিতে। এরই মধ্যে মন্দিরাবাদকের বাজনা শোনা, গান শোনা চলছে। বিলাতি আদবকায়দা, ডিনার ইত্যাদির পর্বও চলছে সমান তালে। একদিন পারসি বিবাহ দেখলেন। এই-সবের মধ্যে আবার একদিন এক মহারাষ্ট্রীয় ভদ্রমহিলার সাধা গলায় অপূর্ব গান শোনবার সুযোগ হয়েছে। জানা যাচ্ছে ২৩ মার্চ করাচি থেকে তাঁরা ট্রেনে হায়দরাবাদ রওনা হবেন, ফিরে এসে জলপথে পোরবন্দর যাবেন। তার পর যাবেন আমেদাবাদ ও বোম্বাই। এ চিঠিতেও ক্ষিতিমোহনের নিজের প্রসঙ্গ বেশ একটু আছে। করাচিতে একদিন হিন্দিতে বক্তৃতা দিয়েছেন ব্রাহ্মসমাজে, মহিলাসভায় রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি বক্তৃতার হিন্দি অনুবাদ করে প্রশংসা পেয়েছেন, রবীন্দ্রনাথ নিজে উচ্চ প্রশংসা করায় মনটা বেশি খুশি যেন। মংখাপীর তীর্থ ঘুরে এসেছেন, চিঠিটার গোড়ার দিকে সে বিবরণও আছে। এত-সব খবরের মধ্যে এ খবরটাও বাদ যায়নি যে ক্যাপটেন বসুর বাড়ির নিমন্ত্রণে বাঙালি রান্না খেয়ে তাঁর প্রাণ বেঁচেছে।

C/o Jamshed Mehta Esq
Karachi
২৩/৩/২৩ ২৫/৩/২৩ ১১ই চৈত্র ১৩২৯

কিরণ

তোমাকে ২০শে তারিখে এক পত্র লিখেছি। অর্থাৎ কার্ড লিখেছি। একটুকু স্থির হবার সময় পাই নে যে মন খুলে ভাল করে তোমাকে পত্র লিখি।

এখানে আমরা সমুদ্রবন্ধনে আছি। সমুদ্র ঠিক আমাদের এখান থেকে বেশ দূরে। তবে ২/৩ খানা motor আছে। ইচ্ছা হলেই একবার ছুটে গিয়ে দেখে আসি। কয়েক দিনই গুরুদেব ছিলেন বলে তবু motorএ বসে নীল সমুদ্রের লীলা ও দূরবিস্তার আরব সাগরের মহিমা দেখেছি।

আমেদাবাদ থেকে আসতে কি শুষ্ক দেশ। দেশ যেন জ্বরে আতুর হয়ে তৃষ্ণায় মরে যাচ্ছে। তপ্ত বালুর শয্যায় পড়ে বসুন্ধরা আগুনে পুড়ে যাচ্ছেন। গাছ নেই কেবল বালি। খেজুর বেঁটে ক্বচিৎ এক আধটা কি ক্ষুদ্র কাঁটা গাছ তাতে ভীষণতা আরও বাড়িয়েছে। সম্পূর্ণ টাক যেমন ভাল মাথায় মাঝে মাঝে এক আধটা চুল যেমন দেখতে আরও খারাপ। পরশু সকালে ২ ঘণ্টা [...] হতে ১২ মাইল দেখতে গিয়েছি। Motor তো দরজায় বাঁধা—কেবল দুঃখ যে সময় নেই। সেও একটা শুষ্ক নদী পার হয়ে বরাবর মরুভূমি দিয়ে পথ। কিছুদূর গিয়ে এক পাহাড় তার গা ঘেসে গিয়ে আবার পথ একটি স্থানে ঠাণ্ডা জলের একটা পুকুর তাতে গোটা ২০ কুমীর। জল দেখা যায় না। কেবল কুমীরই দেখছি, মনুষ্যখাদক—বিরাট বিরাট আকৃতি। ভক্ত যাত্রীরা এতে ছাগল

দেন—তাই এরা তৎক্ষণাৎ ছিঁড়ে খায়। আমি যখন গেলাম তখন ভক্তিভাজনরা ধ্যানে মগ্ন ছিলেন পাঠাদাতা ভক্ত কেউ না থাকায় ধ্যান ভাঙ্গানোর সুবিধে হোলো না। সেখান হতে ½ মাইল দূরে উষ্ণতীর্থ গরমজলের গন্ধক মিশান একটু গন্ধ। ভিন্ন ভিন্ন কুন্ড। স্ত্রীলোকদের, পুরুষদের, হিন্দুর মুসলমানদেরও বেশ স্বতন্ত্র, আবরু রেখে স্নান করা চলে। পারসীদেরও একটা ঘেরা বাথরুম ও তাতে গরমজলের ধারা আছে। আমি স্পর্শ করলাম—স্নান আর করলাম না। আমার গৃহস্বামী মিঃ জামসেদ মেটা সঙ্গে ছিলেন। এমন মানুষ দেখি নি। অবিবাহিত ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসীর মত পবিত্র। পারসীরা সব খায় তবু ইনি নিরামিষাশী। বিবাহ করেন নি বলে শুষ্ক নন। প্রীতিতে ভালোবাসায়, শিশুর মত সুকুমার ও ফুলের মত শুভ্র। এমন ভক্তিমান লোক পারসী কেন কোনো সম্প্রদায়েই দেখি নি। আমি একা এসেছি বলে বড় দুঃখ করলেন। আমার ঘরে দুখানি খাট রেখেছেন বলেছেন একবার সস্ত্রীক এসে ঐ ঘরটা পূর্ণ করে থাকবেন। আমার ঘরে Fan—স্নান প্রভৃতি সব বিলাতী আরাম। আবার পারসীক ধরনে গালিচা দিয়ে সাজানো। চমৎকার furnished—বাগান চারিদিকে অতি শান্ত শান্তিপ্রদ স্থান।

গুরুদয়াল ও আমি মাত্র এখানে থাকি। গুরুদয়ালও মাঝে মাঝে আমিও নানা কাজের ভীড়ে দিনে বার তিনেক স্নান করি ও বারবার ভদ্র পোষাক ও ভদ্র সাজগোজ করি। এই তো আমার কাজ। ১৯শে সন্ধ্যায় গুরুদেবকে address দিল। এখানে ৮টায়ও সন্ধ্যার অন্ধকার হয় না। তিনি উত্তর দিলেন। ২০ মার্চ্চ ২টি বালিকা বিদ্যালয় দেখা। গুরুদেব কিছু বলিলেন। সেখানেও গুরুদয়ালের মা ও বৌদি ভাইঝিদের দেখি। খুকী ২টি চমৎকার সুন্দরী। আজ বৈকালে বাঙ্গালীর অভিনন্দন ও ২৫১ উপহার দিলেন। পরে সমুদ্রতীরে যাওয়া। নামা হইল না। আজ নব চন্দ্রোদয় দেখা গেল। সমুদ্রের উপর দ্বিতীয়ার চাঁদ। এখানে আকাশ বড় নীল ও পরিষ্কার।

২১/৩/২৩ আজ প্রাতে ১০টায় [ ] বাগানে Municipality অভিনন্দন দিলেন। গুরুদেব সুন্দর নিজ আদর্শ বলিলেন।

বৈকালে প্রেসমণ্ডলীতে গুরুদেব তাঁর জীবনের ক্রমবিকাশটি তার সঙ্গে বিশ্বভারতীর আদর্শের ক্রমবিকাশ চমৎকার বলিলেন। এটা সম্পূর্ণ নিয়া আসিব। Reporterরা লিখিয়াছে। তারপরে কালকে ছাত্ররা চা খাওয়াইল। সেখানেও ছাত্রদের বলিলেন। তারপরে সমুদ্রতীরে motor করিয়া যাওয়া।

২২/৩/২৩ প্রাতে Jamshed পরিবারের সঙ্গে আমাদের Photo নেওয়া। এর বৌদি সংসারের কর্ত্রী। তাকে জামসেদ মার মতন ভক্তি করেন। তারপরই Prof. Vaswani আসেন। গুরুদেবের সঙ্গে আলাপ। আমি মংখাপীরে যাই। বিবরণ পূর্ব্বেই দিয়াছি। বৈকালে ৩॥ টায় গুরুদয়ালের বাড়ী চা। ২ জন চমৎকার মন্দিরা বাজানেওয়ালা। গান শোনা। তারপর এখানে নববিধান সমাজের কেশববাবুর ভাইপো নন্দলাল সেনের সঙ্গে দেখা ও তাঁর বালিকা বিদ্যালয় দেখা।

আজ বৈকালে ৭টায় Pearl Opera Houseএ গুরুদেবের বক্তৃতা 'ভারত ইতিহাসের ধারা'। বুঝিল কিনা তাহা বুঝিলাম না। তারপর ৮টা--৮-৪৫ মিনিটে করাচী ক্লাবে বিরাট Dinner। তাতে মদ বিলাতীয়ানার ঢলাঢলি। কাঁটা চামচে আর কষ্ট লাগিতেছে না।

২৩/৩/২৩ আজ প্রাতে ব্রাহ্মরা ও সূফীরা আসিয়া এদেশী গান গাহিল। গুরুদেব কিছু কিছু বলেন। ৯-৩০ মিনিটে এখানে ব্রাহ্মসমাজে আমি একটা হিন্দী বক্তৃতা করি। তারপর নীলরতন সরকারের ভাইপো শচীন সরকারের স্ত্রী সুশীলাকে দেখিতে যাই। সে এই দেশের মেয়ে আমার সঙ্গে পরিচয় আছে।

আজ বৈকালে ৬টায় Arvil [সম্ভবত অনাবিল] সভা। Arvil জাতীয় যুবকদের সভা। সেখানেও গুরুদেবকে ৫০০ উপহার দেয়। ফিরিয়া পারসী বিবাহ দেখিতে যাই। রাত্রে Mr. Mul

Joakar বাড়ী Dinner। তাঁর স্ত্রী মহারাষ্ট্রীয়। চমৎকার—অতি চমৎকার গান। সাধা গলা—অতি সহজ সুরলহরীলীলা।

২৪/৪ [৩]/২৩ আজ প্রাতে Arvil ছাত্রীরা এলেন। গুরুদেব কিছু বলিলেন। আজ Mr Chidigarর খেলনা পুতুল তৈরীর কারখানা দেখিতে গেলাম। চমৎকার। মধ্যাহ্নে Captain বসুর বাড়ী খাওয়া। তাঁর বাড়ী বরিশাল—স্ত্রী বরোদার নাগদের মেয়ে। এখানে সন্দেশ দই লাউচিংড়ি সুক্তো খেয়ে প্রাণ বাঁচলো। বসুপত্নী ও তাঁর এক পারসী বান্ধবী আশ্রমে ৮ মাস থাকবেন। Captain বসু বিলাত যাবেন।

এখানে এ পর্য্যন্ত ৫০০০৲ উঠেছে। আরও ৫০০০৲ উঠবে আশা রাখি। ১০০০০৲ উঠবার সম্ভব। অবস্থা যে বড় খারাপ এখানকার কারবারের নয়তো আরও অনেক উঠতো। তবে ভবিষ্যতের যোগ হোল।

এণ্ড্রুজ সাহেবের পেটের অসুখ হয়েছে আজ। খাবার গোলমালে। গুরুদেব মধ্যে বড় ক্লান্ত ছিলেন আজ একটু ভাল বৈকালে মেয়েদের সভা ও Parciদের সভা। আজ রাত্রি ১১টার ট্রেনে হায়দরাবাদ যাব।

বোধহয় বুধবার এখানে ফিরে এসে পোরবন্দর হয়ে কাথিয়াওয়াড় যাব। তোমার ১৯শে মার্চ্চের লেখা Post 164 Karachi City ঠিকানা দেওয়া পত্র আজ পেলাম। লক্ষ্ণৌ ও আমেদাবাদের পত্র পাই নি। এখানে সব ভাল। পত্র সকলকে দেখিও। পরে অবসরমত লিখব। ভাল আছি। তোমার পত্রের উত্তর দেব।

ইতি
শুভার্থী
শ্রীক্ষিতিমোহন সেন

কিরণবালার চিঠি সদ্যই পেয়েছিলেন। এ চিঠির পুনশ্চ অংশে তার উত্তরে যেটুকু লিখেছেন, তাতে ঘরের কথা অল্পবিস্তর পাওয়া যায়। আশ্রমের খবর পেয়েছেন কিরণবালার চিঠিতে, পেয়েছেন তাঁর ছবি এবং পুতুলগড়ার খবরও। তাই প্রসঙ্গত দু-একটা কথা লিখলেন, পুতুল সম্পর্কে নিজের মতামতটুকু সংক্ষেপে জানালেন। প্রতিমা দেবী ও মিস আন্দ্রে সম্পর্কে যেটুকু উল্লেখ রইল, বোঝা যায় আশ্রমের ঠাকুরদা ঠানদিকে ঘিরে নিকটজনমহলে অবকাশমতো হাস্য-পরিহাস বেশ ভালোই চলত। ক্ষিতিমোহন লিখেছেন :

পুঃ তোমার পত্রখানি পেয়ে এবার এইটুকু লিখছি।

প্রতিমা দেবী ও মিস আন্দ্রে আমাকে রাস্তাতেও সরস ঠাট্টা ও বেশ এক একটি বাক্যবাণ মারতেন।

এই পুতুলগুলিকে আমি ভাল বলবো না। এগুলি প্রাকৃত চেহারার অনুকরণ মাত্র যাকে realistic বলে। এর মধ্যে কোনো ভাব বা ideaর প্রাদুর্ভাব নাই। কাজেই এগুলিকে অনুকরণ না করে এর থেকে একটু একটু সাহায্য নিতে পাব মাত্র।

অসিতবাবুর মার মৃত্যুতে দুঃখিত হলাম। হরিবাবুর মার খবর কি? নুটুর মা ভাল হয়েছেন জেনে সুখী হলাম। অমিতার অসুখের খবর পেলাম। সাবধানে রেখো। যদিও সেরেছে।

বেবার খবর ও পাকামীর সংবাদ পেয়ে সুখী হলাম।

তোমার ছবির রং দেবার খবর পেলাম। ভাল। মন দিয়ে যা কাজ কয়ো তাই ভাল। ঝড়ের আগের মত ছবিটা হচ্ছে। বেশ ভাল। কারখানা ও পাউরুটী রান্নার খবরে সুখী হলাম। কঙ্কর

পড়ছে শুনে খুব সুখী হলাম। লাবু যদি মাছ ডিম না খেতে চায় তবে তাড়া দিও না। স্বাধীনতা দাও। আপনি যা [..] তা হবে।

ফিরতে ১লা বৈশাখের মধ্যে পারবো কিনা সন্দেহ। ইচ্ছা তো তাই। আজ আমরা করাচী থেকে হায়দরাবাদ এলাম। রাত্রি ১১টায় রওনা হয়েছি। আজ ৭টায় পৌঁছেছি। এখান থেকে ১৪ই চৈত্র করাচী ফিরবো। তারপর ষ্টীমারে আরবসমুদ্র দিয়ে পোরবন্দর হয়ে কাথিওয়াড় যাব। তারপর আমেদাবাদ বোম্বাই। আমার পত্র আমেদাবাদে C/o Ambalal Sharabhai Esq Sahibag Ahamedabad ঠিকানায় দিও। তারপর দেবে Mount Petit Peddar Road Bombay.

এবার প্রতিমা দেবীকে বোল যে মনের মত চিঠি পেয়েছো। আন্দ্রেকেও বোল। ইলামবাজারের পিকনিক কেমন হোলো একটু দীর্ঘ খবর দিও। কঙ্কর চাল আনতে পারে— বাণারসীর কাছে বলে।

তোমার পুতুল ভাল হয়েছে ও তা অবনীবাবু ব্রোঞ্জ করবেন বলে রেখেছেন জেনে বড় আনন্দ হোল।

করাচীতে কাল ৪টায় মেয়েদের সভা হয়। তাতে গুরুদেব ইংরাজীতে বলেন—আমি তা হিন্দীতে অনুবাদ করি। তাতে আমার খুব প্রশংসা হয়েছে। গুরুদেবও তার খুব প্রশংসা করেছেন। মেয়েরা কি ভক্তিতে গুরুদেবকে প্রণাম করে তাদের প্রণামী সঙ্গে সঙ্গে দিচ্ছিলেন। কাল ৭ টায় করাচীতে গুরুদেব পারসীদের বলেন। তাঁরা ২০০০, দিয়েছেন। মোট করাচীতে ৯৫০০, হয়েছে। ১০০০০, হবে। এই হায়দরাবাদেও ৫০০০, হয়েছে সংগ্রহ। আরও ২০০০, হবে। বর্ত্তমানেই এই সিন্ধুদেশে ১৭০০০, হোলো। এবং আরও ভবিষ্যতে হবে।

আজ ১২টায় ডাক যাবে। এখন আর সময় নেই। পরে তোমাকে আরো খবর দেব। আমেদাবাদে আমি বক্তৃতা করেছি মেয়েদের সভাতে তার বিজ্ঞাপন পাঠাচ্ছি। টাকার খবর রথীবাবুকে দিও। টাকা করাচী থেকে আধা নোটে পরশু হতে যাবে। এ খবর তাঁকে দিও। আমি টাকা আমাদের হাতে না দিয়ে সোজা তাঁর কাছে নোট পাঠাতে দিয়েছি। কেবল বাঙ্গালীরা যে ২৫০, দিয়েছে তা গুরুদেবের ভ্রমণের জন্য রাখতে বল্লেন।

এখানে সব ভাল। তোমাদের খবর দিও।

ক্ষিতি[৩৪৮]

করাচি থেকে সমুদ্রপথে পোরবন্দর এসে কাথিয়াওয়াড় যাওয়ার কথা ছিল তাঁদের। কয়েক দিন ধরে এই অঞ্চলের দেশীয় রাজ্যগুলিতে শফরের বিবরণ দিয়ে কিরণবালাকে যে চিঠি লিখেছিলেন ক্ষিতিমোহন, সেটি পাচ্ছি। এ চিঠিও যথেষ্ট দীর্ঘ, সবটাই তুলে দেওয়া গেল। নানা জায়গায় ঘুরে অবশেষে তাঁরা আমেদাবাদে অতি পরিচিতদের মধ্যে গিয়ে পৌঁছোলেন :

Dhrangadhra
3 4 23

কিরণ,

পোরবন্দরে নামিবার আগে ষ্টীমারে তোমাকে দীর্ঘ পত্র দিয়াছি। পোরবন্দর থামিয়া জাহাজে থাকিতেই দেখি একটি সাদা Launch সমুদ্রতীরের বন্দর হইতে আমাদের জাহাজের দিকে আসিতেছে। তাহাতে দেওয়ান সাহিব আসিলেন আমরা Launchএ নামিলাম। জাহাজ হইতে সদলে অভিবাদন করিলেন। Captain তাহার ঘরের কাছে দাঁড়াইয়া অভিবাদন করিলেন। Launch তীরে আসিলে দেখি পোরবন্দরের যুবা মহারাজা দাঁড়াইয়া আছেন। অতি চমৎকার

লোক। আমার সঙ্গো হাত মিলাইয়া বলিলেন "কোথা যেন দেখিয়াছি" আমি বলিলাম "আপনারই অতিথি একবার হইয়াছিলাম"। রাজা motor drive করিলেন গুরুদেব ও আমি তাতে আমাদের Guest house গেলাম। সেখানে সাহেবরা সুরাপানও করে। আমাকে ও সকলকে সুরা সাধিলে সকলে অস্বীকার করিল। সবাই লিমনেড চাহিল বা অন্য কোনো তদ্রূপ বস্তু। আমাকে strawberry juice দিল। ভুলক্রমে তাতে বোধ হয় একটু সুরা এক সাহেবের জন্য দিয়াছিল। আমি খাইবার সময় কেমন গন্ধ পাইলাম। তবে strawberryর essence হয়তো পুরাতন হইয়া গন্ধ হইয়াছে ভাবিয়া চুপ করিয়া রহিলাম। তারপর দেখি কান লাল হইতেছে—নাড়ী চঞ্চল একটু বক্তৃতার ইচ্ছা প্রভৃতি শুভ লক্ষণ প্রকাশ হইতেছে। তখন বাধ্য হইয়া মৌনব্রত অবলম্বন করিলাম। কেবল মনে মনে বলিতেছি কখন বাসায় ফিরি। অথচ clubএ সকলের সঙ্গো আলাপ হইতেছে। Limdi রাজার এক পুত্র বেড়াইতে আসিয়াছেন। বয়স ২২/২৩ চমৎকার যুবকটি, শ্রদ্ধাতে প্রীতিতে অবনত—ফুলের মত নির্ম্মল ও নারীর মত লাজুক। Sir প্রভাশঙ্কর Pattavi পুত্র—বটুক পট্টাবী রাজার Private Secretary. এখানে ভাবনগরের ত্রিবেদীর সঙ্গো আলাপ হইল। ইনি বোম্বাই প্রার্থনা সমাজের লোক। তারপর নগিনদাস গোকুলদাস মোদীর সঙ্গো আলাপ—ইনি এখানে Public কাজে উৎসাহী যুবক। কোনোমতে বাসায় আসিয়া আহার। তারপরে এদেশী কথকেরা মন্দিরা বাজাইয়া পুরুষ ও মেয়ে ভজন গাহিতে আসিল। অনেক রাত পর্য্যন্ত গান হইল। ১১টায় শুইতে গেলাম।

৩১.৩.২৩ আজ ভোরে উঠিয়া সমুদ্রতীরে বেড়াইয়া জংলী ক্ষুদে একপ্রকার সূর্য্যমুখী ফুল আনিলাম। গুরুদেব দেখিলেন। খুব গানে মত্ত। নগিনদাস গুরুদেবকে কিছু পুরাতন জিনিষ দিয়া গেলেন। শিল্পদ্রব্য। মধ্যাহ্নে দেওয়ান সাহেব আমাদের সঙ্গো খাইলেন। বৈকালে গুরুদেব কতক শিল্পদ্রব্য ও স্বর্ণঅলঙ্কার দেখিয়া পছন্দ করিলে—এই রাজ্য তাহা তাঁহাকে উপহার দিল। বকরী [.] (মেষপালক) ২টা হার আনিল—এমন চমৎকার সুন্দর হার দেখি নাই। ৭০০ করিয়া দাম। একটার নাম "ঝুমনা" অন্যটার নাম মনে নাই। তার চমৎকার কাজ ও নূতন ধরনের style. এমন কোথাও দেখি নাই। তাতে রোমান মুদ্রার ধরনে মুদ্রা ঝোলানো ছিল। বিস্ময়কর। তবে ৭০০ শুনিয়া দেনা মনে হইল—গুরুদেবেরও খুব পছন্দ। তিনি বলেন ইয়ুরোপে—ইহা ২০০০ বিক্রয় অনায়াসে হয়। যাক্ সে কথা বলিয়া লাভ কি। সন্ধ্যার পূর্ব্বে [ ] আমাদের লইয়া clubএ গেলেন। গুরুদেব একটি চমৎকার বক্তৃতা বাছা বাছা লোকদের করিলেন। এমন চমৎকার Prophetic বক্তৃতা শীঘ্র শুনি নাই। বসিয়াই বলিলেন। ৫০/৬০ জন শ্রোতা মাত্র। ইংরাজও আছে। তারাও শুনিল। তবে সবারই মর্ম্মস্পর্শ করিল। কেহ রাগ করে নাই। যদিও য়ুরোপকে অনেকটা আঘাত দিয়া ও ভারতকেও আঘাত দিয়া বলিলেন। সভাতে রাজা ৫০০০ ও রাণী ২০০০ দিলেন ঘোষণা হইল। সাধারণ লোকে দেখি কি দেয়? বাসায় ফিরিয়া দেওয়ান সাহেব সহ ভোজন। ভোজনান্তে ২ দফা ভজনীয়া আসিল। ও একজন মুসলমান তম্বুরাবাদক মীর লয় সুর অনেকটা বাংলার মত। অথচ সিন্ধুদেশীয় ধরনে গান। সে ইতিহাস ও ভজন গাহিল। তারপর মেয়েদের ভজন ও মন্দিরায় কি ধুন। পাল্লা দিয়া বলিতে লাগিল। আজ একটি ৯/১০ বছরের মেয়ে কি চমৎকার বাজাইতে লাগিল। তাহার সমস্ত দেহখানি যেন লতার ভঙ্গীর মতো সর্ব্বদিকে দুলিতে লাগিল। একেবারে অতি সুকুমার লতার মত তার সর্ব্ব শরীরের নৃত্যলীলা। সে বসিয়া এপাশে ওপাশে ফিরিবা মাথা নাড়িয়া বাজাইতে লাগিল। তার মাও বাজায় তবে তার শরীর যেন কঠিন হইয়া গেছে—এ একেবারে নৃত্যলীলারত সুকুমার দেহখানি নোয়াবার লীলা। আর গান। গুরুদেব মেয়েটিকে দেখে একেবারে মুগ্ধ। বলেন "ওকে এখনি কোলে করে আশ্রমে চলে যেতে ইচ্ছা হয়।" যাক ১২টা হয়ে থামলো। তখন আমি ও গুরুদয়ালের বাবা গেলাম সমুদ্রতীরে। আজ পূর্ণিমায় জ্যোৎস্না। বাংলার নীচেই নির্জ্জন সমুদ্র। চুপ করিয়া [বসিয়া] রাত্রি ১টা হইলে শুইতে ফিরিলাম। শুইয়া আবার ভোরে উঠিয়া মুখ হাত ধুইয়া সমুদ্রে গেলাম।

১.৪.২৩ আজ প্রাতে দেওয়ান সাহেব আসিলেন। চমৎকার লোক। দুপুর হোলো। আমি আবার গুরুদেবের হিন্দী বক্তৃতা বসে লিখলাম। ৪॥ টায় সমুদ্রতট ছেড়ে—বোধহয় এবারকার মত ছেড়ে—সুদামার মন্দিরে গুরুদেবকে নিয়ে গেলাম। বেলা ৫॥ টা তক সেখানে মেষপালক জাতির নৃত্য চল্লো। তারপর Mass meeting অর্থাৎ বিরাট লোকসভায় যাওয়া গেল। সেখানে গুরুদেব হিন্দীতে পড়লেন। Hon ত্রিবেদী কিছু বল্লেন। আমিও একটু হিন্দী বক্তৃতা করলাম। এই পোরবন্দরে সব শুদ্ধ ১০০০০ উঠলো। আরও হাজার পাঁচেক উঠবে আশা আছে। সেখান হতে ষ্টেশনে আসা গেল। গিয়া দেখি মহারাজার Saloon আমাদের জন্য প্রস্তুত। মহারাজা আমাদের নিয়ে এসেছেন drive করে।

Trainএর সময় যায়—তবু আমরা উঠি না বলে ছাড়ে না। অবশেষে ছাড়লে। সন্ধ্যা হয় নি পুরা—সমুদ্রে সূর্য্য গেছে—এদিকে উড়দা পাহাড়ে চন্দ্র উঠছে! রাতটি চন্দ্রালোকে কাটানো গেল। সঙ্গে খানসামা রাজার এসেছে। তারা ৯টায় Dinner দিল। তারপর নিদ্রা। ভোরে দেখি Dhasa ষ্টেশনে এলাম। বহু ময়ূর ও হরিণ। বেলা ১০টায় Limdi এলাম। এখানে আমাদের জন্য রাজা খাবার পাঠিয়েছেন। যুবরাজ Limdi motor করে দেখা করতে আসছেন—এমনি সময়ে গাড়ী ছেড়ে দিলে। ষ্টেশনে থাকলে তিনি গাড়ী থামাতে পারতেন—তখনও কিছু দূরে—তিনি motor করে একটা দূরে Railway gate থেকে দাঁড়িয়ে বিদায় নিলেন। আমরা ১৫ মাইল গিয়ে Wadhudan ষ্টেশনে গিয়ে দেখি যুবরাজ অপেক্ষা করছেন। এখান থেকে গুরুদেব Saloon ফিরিয়ে দিলেন। আমরা Motorএ ২২ মাইল Dhrangadhra যাব। ২ খানা motorএ এসেছি। যুবরাজ বল্লেন গুরুদেবকে "চলুন আমি পৌঁছাই।" তারা চলে গেলেন। আমি পরে এক motor এ কিছু দ্রব্য নিয়ে ও আর এক motorএ দ্রব্য রওয়ানা হোলো। আমরা বেলা ১।। টায় পৌঁছে দেখি গুরুদেব পৌঁছেন নি। ব্যাপার? ১৫ মিনিট পরে দেখি তিনি হাজির। Petrol ফুরাইয়া যায়—[.] পথে Petrol নিতে কোথায় যেতে হয়েছিল।

এখানে এসে দেখি রাজা হঠাৎ জয়পুরে যেতে বাধ্য হয়েছেন। আমরা খেলাম। অপরাহ্নে কুমার ও দেওয়ান মানসিংহজী এলেন। অনেক কথা হোলো। বেলা ৫টায় চা খেয়ে ৬টায় বাহির হওয়া গেল। জেল দেখতে গেলাম। গুরুদেব দেখলেন ২টি স্ত্রীলোক দারিদ্র্যবশতঃ জেলে এসেছে—তুলা চুরী করে। গুরুদেব তাদের দেখে একটু দুঃখিত হলেন—অমনি দেওয়ান সাহেব তাদের মুক্তি দিয়ে দিলেন। তারা পাথেয় ও খাবার পেয়ে সন্ধ্যার পূর্ব্বে তৎক্ষণাৎ মুক্তি পেয়ে চলে গেলো। আশীর্ব্বাদ করে গেলো। আমরা তারপর এখানকার Lake, Club, রাজবাড়ী প্রভৃতি [দেখে] motor করে মন্ত্রীর বাড়ী বসলাম ও সরবৎ খেলাম। রাত্রে Saloon পেলে আমরা ফিরতে পারতাম তবে গুরুদেব Saloon ফিরিয়ে দিয়েছেন—এখন উপায় কি? তারপর দিন যেতে হবে। Limdi রাজ্যের যুবরাজ যিনি সঙ্গে এসেছেন—তিনি বল্লেন সকালে খুব ভোরে আপনাদের motorএ নিয়ে যাব। তাই তিনি Limdi নিয়ে গেলেন তার পরদিন।

রাত্রে রাজবাড়ী শয্যায় ঘুমালাম। Electric বাতী, পাখা। বাতী নিবিয়ে পাখা চালিয়ে মশারী ফেলে শুলাম। চমৎকার চন্দ্রালোক জানালা দিয়ে উকী মারতে লাগলো। রাত কাটলো। ৬টায় চা খেয়ে তৈয়ার আছি,

৩.৪.২৩ এমন সময় লিমড়ী যুবরাজ motor নিয়ে হাজির—আমি তার A.D.C. সঙ্গে দ্বিতীয় motorএ বস্‌লাম। সীতাপুর হয়ে Wadhwan এলাম। ৭টায় রওয়ানা হয়ে ৮॥ টায় Wadhwan এলাম। তারপর Limdi ৯॥ তে এলাম। এখানে স্নান আহার করে—দোতলায় ধূ ধূ রৌদ্রতপ্ত দিগন্ত দেখছি। এমন সময় Palanpur হতে কয়েকজন গাইয়ে এলেন। গান চমৎকার এক বৃদ্ধ ও তার নাতি গায়। বৃদ্ধের ছেলেরা সেতার ও বীণা বাজায়। চমৎকার। ৩টায় motorএ উঠে—ট্রেনে এলাম। ১ম শ্রেণী reserved গাড়ী। Wadhwan [...] সব দ্রব্যাদি নিয়ে এলো। Viram Gam এলাম। গাড়ী বদল করে reserved 1st classএ উঠে নটায় আহমেদাবাদ। ঝড় উঠেছে—

বৃষ্টিও যেন আসবে। ষ্টেশন এলো। Andrews, অম্বালাল, তাঁর স্ত্রী, করুণাশঙ্কর, হরিপ্রসাদ প্রভৃতি সব রয়েছেন। বাসাতে শুলাম। স্নান আহার করে বেশ নিদ্রা হোলো। প্রভাতে চা খেয়ে করুণাশঙ্কর ঘরে গেলাম।

তারপর হরিপ্রসাদ বাড়ী হয়ে আবার অম্বালাল ঘরে এসে জানলাম—আমরা ৫ই তারিখ এখান হতে রওয়ানা হয়ে ৬ই সুরত ও ৭ই বোম্বাই পৌঁছে ৮ই রাত্রে বোম্বাই ছাড়বো ও ১০ই বৈকাল বা রাত্রে আশ্রমে পৌঁছোবো। আমার পত্র কি আমবা যাবার আগে যাবে?

যাক মধ্যাহ্নে করুণাশঙ্কব বাড়ী আহার। রাত্রে গটুলালের ওখানে আহার। যিনি সস্ত্রীক আশ্রমে গেছেন। আজ সন্ধ্যায অম্বালালের সঙ্গে শিক্ষা বিষয়ে অনেক কথাবার্ত্তা। রাত্রে গটুলালের ওখানে বিদ্যাবেনের মেয়েরা এলেন—তরঙ্গিণী সৌদামিনী প্রভৃতি। আহার ও কবীরের গল্প—রাজপথ ও নারীর আচ্ছাদনের গল্প হোলো। রাত্রে করুণাশঙ্কর ওখানে শুলাম।

৫.৪.২৩ আজ প্রাতে উঠে—চা খেয়ে হরিপ্রসাদ ওখানে চা। তারপর গোবিন্দভাইর পুত্রের নামকরণ—"বিনোদরাম"। তাবপর ইন্দুলালের বাড়ী—তিনি কাল জেলে যাবেন। দেখা হোলো না। তারপর বাড়ী ফিরে গুরুদেবের পড়া শুনলাম। এখানে তোমার দীর্ঘ পত্র পেয়ে মন বড় তৃপ্ত হয়েছে। রেণুকে পত্র দেই নাই। বড় অন্যায়। দিচ্ছি। আমরা বোধহয় ১০ই আশ্রমে পৌঁছবো। ১০ই বৈকালে বা রাত্রে। বর্দ্ধমানে যদি মধ্যাহ্নের গাড়ী ধবতে পারি। ভাল আছি। কুশল চাই।

শুভার্থী
ক্ষিতি[৩৪৯]

মনে হয় এই-সময় পোরবন্দর থেকে তারিখহীন চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ বিধুশেখর শাস্ত্রীকে জানান বিশ্বভারতীতে শিক্ষকদের মধ্যে কারা আচার্যরূপে ও কারা অধ্যাপকরূপে গণ্য হবেন। আচার্যতালিকায় যাঁদের নাম ছিল তাঁরা হলেন : বিধুশেখর শাস্ত্রী, ক্ষিতিমোহন সেন, [মার্ক] কলিনস, কালিদাস নাগ, নন্দলাল বসু ও এলম্‌হার্স্ট।[৩৫০]

আশঙ্কা ছিল ১ বৈশাখ অর্থাৎ এপ্রিলের মাঝামাঝির ভিতর হয়তো ফেরা সম্ভব হবে না, কিন্তু চৈত্র মাসের দিন দুই-তিন থাকতেই তাঁরা আশ্রমে ফিরে এসেছিলেন, বর্ষশেষ ও নববর্ষের অনুষ্ঠানে যোগদানে বাধা ঘটেনি। এই বছরেই পুজোর ছুটির শেষদিকে রবীন্দ্রনাথ আবার বিশ্বভারতীর জন্য অর্থসংগ্রহ করতে কাথিয়াওয়াড় যান, এবারও ক্ষিতিমোহন সঙ্গী ছিলেন তাঁর, অ্যান্ডরুজ ও গৌরগোপাল ঘোষও সঙ্গে গিয়েছিলেন। বেশ কয়েকটি দেশীয় রাজ্য থেকে বিশ্বভারতী তহবিলে উল্লেখযোগ্য অর্থসাহায্যের প্রতিশ্রুতি পান তাঁরা।[৩৫১] মাস দেড়েক পরে পৌষ উৎসবের আগেটাতে আশ্রমে ফেরা হয় সেবারে। এই ধরনের কোনো কাজ এসে পড়লে আলাদা কথা, না হলে শান্তিনিকেতনের অভ্যস্ত পরিবেশে নিয়মিত অধ্যয়ন-অধ্যাপনায় ক্ষিতিমোহনের দিন কাটে। এই সময়কার শান্তিনিকেতন পত্রিকা বিশ্বভারতী প্রসঙ্গে খবর দেয় :

> পন্ডিত শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় সংস্কৃতে মূল মহাভারত পড়াইতেছেন। বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপনার ভারও তাঁহার উপর আছে।[৩৫২]

রবীন্দ্রনাথের সম্পাদনায় এ বছরের এপ্রিল মাস থেকে প্রকাশিত হতে শুরু করেছিল বিশ্বভারতী কোয়ার্টার্লি পত্রিকা। জুলাই সংখ্যায় ক্ষিতিমোহনের প্রবন্ধ ছিল Dadu's Path of Service, ইংরেজি অনুবাদ করেন অধ্যাপক মনোমোহন ঘোষ। এই পত্রিকার জানুয়ারি

১৯২৪ সংখ্যায় তাঁরই অনুবাদ-করা ক্ষিতিমোহনের আর-একটি দাদূ-সম্পর্কিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় Dadu on the Mystery of Forms। এর মধ্যে পত্রিকায় ক্ষিতিমোহনের লেখা প্রবন্ধ কিছু কিছু প্রকাশিত হয়েছে, ইংরেজি প্রবন্ধ এই প্রথম। বিশ্বভারতীর নিজস্ব ইংরেজি পত্রিকা বেরোনোর ফলে পরবর্তীকালে তাঁর অনেক প্রবন্ধই অনূদিত হয়েছে। বিশ্বভারতী কোয়ার্টার্লি পত্রিকার জুলাই ১৯২৩ সংখ্যা পড়ে ৩০ ডিসেম্বর ১৯২৩ সুইজারল্যান্ড থেকে রম্যাঁ রলাঁ রবীন্দ্রনাথকে যে চিঠি লেখেন, তাতে ক্ষিতিমোহনের প্রবন্ধের উল্লেখ ছিল :

> We are reading, my sister and I, your fine review, Visva Bharati, it interests us very much. We enjoyed particularly—along with your illuminating studies which whether historical or philosophical, are always visions of the soul—the articles of Prof. Winternitz, of Bipin Chandra Pal on "Narayana" and one of Prof. Kshiti Mohan Sen's on that wonderful Dadu, whose personality attracts me I shall write about these numbers in the review Europe.[৩৫৩]

এবার চিনদেশ ও জাপানে

ক্ষিতিমোহনের জীবনে ১৯২৪ সালের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে চিনভ্রমণ, এবার আমাদের সেই প্রসঙ্গে মনোযোগ দিতে হবে। শান্তিনিকেতন পত্রিকার যে-সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের চিনযাত্রার অগ্রিম সংবাদ আছে, সেই সংখ্যাতেই লেখা হয়েছিল সুরুলের কুঠিবাড়িতে গত বছরে স্থাপিত পল্লিউন্নয়নকেন্দ্র শ্রীনিকেতনের বর্ষপূর্তি উৎসবের বিবরণ। সেখানে ৬ ফেব্রুয়ারি সকালে 'সুরুলের বনাঙ্গনে' রবীন্দ্রনাথ উপাসনা করলেন, 'তৎপরে শ্রদ্ধেয় শ্রীক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় কয়েকজন ছাত্রের সহিত বৈদিক শ্লোক আবৃত্তি করেন।' সমস্ত দিনব্যাপী উৎসব, দুপুরে একত্রে মধ্যাহ্নভোজন, বিকেলে জনসভা।[৩৫৪] বিশ্বভারতীর এই পল্লিসংস্কারবিভাগের উদ্যোগে ২৭ ফেব্রুয়ারি বোলপুরে আর-এক জনসভা হয়। রথীন্দ্রনাথ ছিলেন সভাপতি, কালীমোহন ঘোষ নেপালচন্দ্র রায় এলম্‌হার্স্ট ও ক্ষিতিমোহন বক্তা। তখন তাঁদের মনে তাগিদ গ্রামবাসীদের পল্লিসংস্কারের প্রয়োজনীয়তা বোঝাতে হবে, বোঝাতে হবে সমবায়সমিতি গঠনের উদ্দেশ্য কী। ক্ষিতিমোহন তাঁর বক্তৃতায় বেদ ও পুরাণ থেকে নানা দৃষ্টান্ত দিয়ে বোঝালেন প্রাচীন ভারতে কীভাবে সমবায় পদ্ধতিতে কাজ হত। বললেন প্রাচীনকালে যেমন অনেক রাজা প্রজাকল্যাণসাধনে তৎপর ছিলেন, তেমন প্রজাসাধারণও রাজসহায়তার মুখাপেক্ষী হয়ে না থেকে নিজেদের সমবেত চেষ্টার দ্বারা সমাজের হিতসাধনব্রত গ্রহণে দ্বিধা করতেন না।[৩৫৫] জানা যাচ্ছে এই সভার পরে পরেই ক্ষিতিমোহন কলকাতায় গেছেন অন্য এক কাজে। রবীন্দ্রনাথ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আহ্বানে সাহিত্য সম্পর্কে ভাষণ দেবেন ১, ২ ও ৩

মার্চ, তার অনুলেখন করতে হবে তাঁকে।[৩৫৬] সম্ভবত এ কাজ তাঁর নিজেরই ইচ্ছায় করা, সে অভ্যাস তাঁর ছিল, আমরা দেখেছি। তথ্য বলছে পত্রিকায় এই বক্তৃতাগুলির অনুলেখন যা প্রকাশিত হয় তা যথাযথ মনে হয়নি রবীন্দ্রনাথের, তিনটি বক্তৃতাই তিনি বঙ্গবাণীতে প্রকাশের জন্য পুনরায় লিখে দেন। তখন ক্ষিতিমোহনের অনুলেখন তাঁর কাজে লেগেছিল কি না জানি না, শুধু এইটুকু জানি যে সেই 'শান্তিনিকেতন ভাষণমালা'-র সময় থেকেই রবীন্দ্রনাথই অনেক সময় তাঁর ভাষণের লিখিত রূপ দেওয়ার জন্য ক্ষিতিমোহনকৃত অনুলেখনের উপর নির্ভর করেছেন।[৩৫৭]

১৯২৪ সালে পেকিঙের চিয়াঙ্ গুয়ে শে (বক্তৃতা সভা)-র আমন্ত্রণে রবীন্দ্রনাথ সেখানে বক্তৃতা দিতে যাবেন। আগের বছর এই আমন্ত্রণ আসবার পর থেকে এই যাত্রার পরিকল্পনা নিয়ে কথাবার্তা চলছিল। দৈনিক পত্রিকায় খবর বেরিয়েছিল ২৫ ডিসেম্বর ১৯২৩ :

> প্রকাশ যে, রবীন্দ্রনাথ কিছুদিনের মধ্যে একদল ভারতীয় পণ্ডিতসহ চীন জাপান সুমাত্রা বালী প্রভৃতি বৌদ্ধধর্ম্মবহুল দেশ পরিভ্রমণে গমন করিবেন। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য এ বিষয়ে খুব উদ্যোগী হইয়াছেন এবং ববীন্দ্রনাথেব জন্য অর্থ সংগ্রহ করিবার ভার গ্রহণ করিতে স্বীকাব কবিয়াছেন।[৩৫৮]

পরে শান্তিনিকেতনসূত্রে খবর পাওয়া গিয়েছিল :

> ২৭ মার্চ্চ পূজনীয় গুরুদেব চীনযাত্রা করিবেন। তাঁহাব সাথে মিঃ এলম্‌হার্স্ট্, ডাঃ শ্রীকালিদাস নাগ, পণ্ডিত শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী, ও শ্রদ্ধেয় শ্রীক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়, শ্রীমতী প্রতিমা দেবী, ও মিস্ গ্রীন যাইবেন।[৩৫৯]

বিশ্বভারতী বুলেটিন থেকে জানা যায় ১৯২৩ সালের অক্টোবরে কলকাতায় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কথা হয় যুগলকিশোর বিড়লার, তিনি স্বেচ্ছায় অর্থসাহায্যের প্রস্তাব দেন। মনে হয় এই আশ্বাস পাওয়ার পরে বিশ্বভারতীর পক্ষ থেকে বিধুশেখর শাস্ত্রী ও ক্ষিতিমোহন সেন যাবেন স্থির হয় কিন্তু কোনো অনিবার্য কারণে শাস্ত্রীমশায় গেলেন না। প্রতিমা দেবীরও যাওয়া হয়নি।[৩৬০] গিয়েছিলেন নন্দলাল বসু, এলম্‌হার্স্ট এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে ড. কালিদাস নাগ। তাঁদের যাত্রা শুরু হল ২১ মার্চ, কলকাতা বন্দর থেকে ইথিয়োপিয়া নামের জাহাজ ছাড়ল দোলপূর্ণিমার দিন।[৩৬১]

ক্ষিতিমোহন বলেছেন তিনি কোনোদিন চিনদেশে যেতে আগ্রহবোধ করেননি। কিন্তু একটা ব্যাপারে তাঁর মন জিজ্ঞাসু হয়ে উঠেছিল বলে চিনাভাষা শিখতে শুরু করেছিলেন, অধ্যাপক সিলভ্যাঁ লেভির কাছে চিনাভাষার চর্চা যেটুকু করছিলেন তাই যথেষ্ট ছিল। তা ছাড়া চিন তো তাঁর কার্যক্ষেত্র ছিল না। তবে ভারতীয় বৌদ্ধসাধনাশাস্ত্র—বিশেষ করে তার ভক্তিপ্রধান অংশটি পড়তে হলে এমন কয়েকটি বই পড়া দরকার যা কেবল চিনাভাষাতেই আছে, মূল ভারতীয় ভাষার গ্রন্থগুলি অবলুপ্ত হয়ে গেছে। আমাদের দেশে এই প্রাচীন গ্রন্থগুলি পাওয়া যায় না বলে কয়েকজন পশ্চিমদেশীয় পণ্ডিত এমন অনুমান করেছেন যে ভারতে ভক্তিমার্গের উদ্ভব খ্রিষ্টান ধর্ম থেকে। কারণ দেখা যাচ্ছে দ্বিতীয়

শতাব্দীতে ভারতের দক্ষিণ অঞ্চলে মাদ্রাজ এলাকায় খ্রিষ্টধর্মের একটি শাখার গোড়াপত্তন হয় এবং এ দেশে তো রামানুজ মধ্বাচার্যের মতো ভক্তিমার্গের আচার্যরাও জন্মেছিলেন। অবশ্য অন্য পণ্ডিতরা এ সিদ্ধান্তে সন্দেহও করেছেন এই যুক্তিতে যে ভবিষ্যতে ভারতীয় এই-সব মূলগ্রন্থের সন্ধান হয়তো এ দেশেই পাওয়া যাবে। ইতিমধ্যে অশ্বঘোষের 'শ্রদ্ধোৎপাদ শাস্ত্র' নামে একটি গ্রন্থ চোখে পড়তে ক্ষিতিমোহন নিশ্চিত হন যে ইউরোপীয় পণ্ডিতদের ওই অনুমান টেকে না। তখন এ বিষয়ে বিস্তারিত জানবার কৌতূহলে তিনি চিনা ভাষা শিখছিলেন। তার পর হঠাৎ রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছায় অপ্রত্যাশিতভাবে চিনদেশেই চললেন নিজে।[৩৬২] রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধে চিঠিপত্রে বারবারই শান্তিনিকেতনের বৃহত্তর পরিচয়ের চিন্তা ব্যক্ত হয়েছে, ক্ষিতিমোহনকে লেখা চিঠিতেও এ প্রসঙ্গ আমরা দেখেছি। এবার চিনযাত্রার অব্যবহিত আগেও সেই দৃঢ় বিশ্বাস অথবা সংকল্পটাই প্রকাশ পেয়েছিল তাঁর মন্দির-ভাষণে :

> দেশের গণ্ডির মধ্যে আশ্রমের পরিচয় যতই মনোরম হোক, তার যথার্থ যে বড়ো চেহারা, তার ভিতরকার বড়ো শক্তির পরিচয় নেই। যদি শান্তিনিকেতনের দূত হয়ে ভারতবর্ষের বাইরে এখানকার বাণী বহন করে যেতে পারি, যদি কোনো বিশ্ববাণীকে অন্তরে বহন করে আনতে পারি, তবে আশ্রমের বড়ো পরিচয়টি পাব।[৩৬৩]

তখন রবীন্দ্রনাথ ভাবছিলেন জাভা-সুমাত্রা-বালীদ্বীপেও যাবেন, তা অবশ্য হয়নি। পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে তিনি যান ১৯২৭ সালে। তখনও তিনি ক্ষিতিমোহনকে সঙ্গে নিতে চেয়েছিলেন এবং ঘনশ্যামদাস বিড়লার কাছে আর্থিক সহায়তার আবেদন জানিয়েছিলেন, কিন্তু যাওয়া হয়নি ক্ষিতিমোহনের। পরে আমরা তা দেখব। এবার দেখা যাক যাত্রাশুরুর পরেই রথীন্দ্রনাথকে ক্ষিতিমোহন যে চিঠি লিখলেন, সেই চিঠিটা। তাতে প্রথম দিককার বেশ কিছু খবর আছে এবং জানা যাচ্ছে জাহাজে অনভ্যস্ত খাওয়াদাওয়ার কারণে অবশ্য বেশ একটু কষ্ট তাঁর হচ্ছে, তবু তাঁরা তিনটি বাঙালি খুব ভালো আছেন।

> Sj. Rathindranath Tagore S. S. Ethcopia
>
> 23.3 24
>
> প্রিয় রথীবাবু,
>
> পরশু ষ্টীমার ছেড়ে—গুরুদেবের সঙ্গে কথা বল্‌চি এমন সময় খাবারের ঘণ্টা। ৮।। টায়। সব মাংস আর মাংস। কোনোমতে কাঁটা চামচ নেড়ে আমি ও নন্দবাবু ডেকে এসে বস্‌লাম। নাগ মশায় করিৎকর্ম্মা তাঁর সবই সহজ। গুরুদেবও ডেকে বস্‌লেন—দেখা যায় তবে মধ্যে বেড়া দেওয়া। গুরুদেব বসে বেশ বিশ্রাম করতে লাগলেন। প্রায়ই ঘুমিয়ে পড়চেন—যেন ক্লান্তি দূর হচ্চে। বেলা ১০টায় উলুবেড়িয়া তারপর রূপনারায়ণের মোহনা—তারপর ১২টায় খাওয়া—২টায় ষ্টীমার অচল। জল নেই। ৭টায় জোয়ার এলে চল্‌বে। গঙ্গার তীরের কলকারখানা চলে গেলে গ্রাম দেখতে দেখতে বেশ আস্‌ছিলাম—এখন বসে বসে খারাপ লাগতে লাগলো। সন্ধ্যা ৬।। টাতে খেতে গেলাম—তারপরই জাহাজ চললো। গুরুদেব বেশ আছেন বুঝতে পারচি। তবে Sanatogenটা খুঁজে পাওয়া গেল না। Rangoon গিয়ে নেওয়া যাবে।

২২.৩.২৪ রাত্রে এগারোটায় সবাই শুতে গেলাম। ভোরেই উঠে দেখি নীল জলে এসেছি। ডাঙ্গা দেখা যাচ্ছে না। গুরুদেব রাত্রে ভাল ঘুমিয়েছেন। আজ Chinese lectureএ হাত দিয়েছেন। জাহাজে ২/৩টি জাপানী অধ্যাপক যাচ্চেন। কালিদাসবাবু তাঁদের সঙ্গে আলাপ করলেন—তাঁরা গুরুদেবকে দেখতে এলেন। এদের সঙ্গে আলাপে খুব কাজ হল। একজন বৌদ্ধদর্শনের অধ্যাপক, সংস্কৃত অল্প জানেন। অন্যজন [...] পড়ান। সংস্কৃত জানা আছে। তবে কথা ইংরাজীতে। তাছাড়া উপায় নেই।

আজ দুপুরে খবর এলো—wireless-এ—রেঙ্গুনের চীনাসমাজ গুরুদেবকে সেখানে নিমন্ত্রণ করছে আর গবর্ণর সাহেবও করচেন। উত্তর গেল—"তথাস্তু" [...] গিয়ে সব ঠিক হবে। এখানে কোথায় থাকা হবে ঠিক হয় নি। হয়তো গুরুদেব কোনো হোটেলে থাকবেন আমরা বন্ধু-বান্ধবদের ওখানে উঠবো। গিয়ে বোঝা যাবে। Elmhirstকে হিসাব ও তহবিল দেবার কথা আমিও কয়বার বলেছি, কালিদাসবাবুও বলেছেন। ফল হয় নি। অর্থাৎ না হিসাব না অর্থ কিছুই পাই নি। না পেলে আমি আর কি করবো বলুন? কাজেই আমার কোনো দোষ তো নেই। যথাসাধ্য করেচি। এখন চেপে যাচ্চি। যদি আপনা হতে পরে দেন।

'লিখতী কুছ ভিমরী খাচ্চেন [ ] লেগে। তবে [ ] যতদূর শান্তির কাছাকাছি হতে পারে তা (কালীমোহনবাবুর বাড়ীর দৃষ্টান্ত ছাড়া) এখানে দেখতে পাচ্চি। Elmhirst প্রথমদিক একটু অসুস্থ ছিলেন। আমরা বাঙ্গালী তিনটি খুব ভাল আছি। আমাদের ঘরখানি ও ব্যবস্থা খুবই ভাল। কোনো অভিযোগ করবার হেতু নেই। ডেকেই বেশী থাকি। নন্দবাবু ডেকেই শোন আমাদের দরকার হয় নি। আজ বৈকালে গুরুদেব অনেকক্ষণ তাঁর লেখাটা কেমন হবে তার আলোচনা করলেন। যাবার ব্যবস্থাদি ভাবা গেল। রাত্রি ১১টায় শুতে যাওয়া গেল।

23.3.24 ভোরে উঠে দেখি গুরুদেবও এলেন ডেকে। আজ বললেন প্রথম বক্তৃতাটা বড় হয়েছে। তাকে ছেঁটে সেই ছাঁটা মশলা দিয়ে দোসরা বক্তৃতার সুরু পত্তন করবেন ঐ ছাঁটা উপকরণই তাঁকে গড়বার পথ দেখাবে। লেখা হবে।...

রেঙ্গুন গিয়ে কিছু পাতলা কাপড় গুরুদেব করতে চান। যা আছে তার চেয়ে পাতলা চাচ্চেন। দেখি কবে ওঠা যায় কিনা। আশা করি রেঙ্গুনে বন্দরে সবার দেখা পাবো। কালিদাসবাবু প্রশান্তকে লিখবেন। Miss Green গুরুদেবের কাছে বসে বসে খুব গল্পটল্প করেন। Elmhirst সাহেব যথাসাধ্য গুরুদেবের যত্ন করচেন। আমরা যা পারি করি—তবে করবার সুযোগ বড় পাইনে। নেমে যা হয় করা যাবে। গুরুদেব হোটেলে গেলেও Elmhirst সঙ্গে সঙ্গে থাকবেন। রেঙ্গুন পালা শেষ হলে কিছু লিখবার হবে। এখন লিখবার বিশেষ নেই। এটা qualify করে সকলকে শোনাবেন। সবাই আছেন ভাল। আমার বাড়ীর চিঠিগুলি দয়া করে যদি নিয়ে ঠিকমত পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেন তবে ভাল হয়। ইতি

শুভার্থী
শ্রীক্ষিতিমোহন সেন[৩৬৪]

রেঙ্গুন পেনাং সুইটেনহাম সিঙ্গাপুর হংকং হয়ে তাঁরা ১২ এপ্রিল সাংহাই পৌঁছেছিলেন। কবি সর্বত্র সম্মানিত হচ্ছেন, সর্বত্র তাঁর সংবর্ধনার আয়োজন। ক্ষিতিমোহন প্রমুখ কবির ভ্রমণসঙ্গীরাও কম আদর-যত্ন পাচ্ছেন না। কোথাও বিশিষ্ট পন্ডিত ও অধ্যাপকদের সঙ্গে পরিচয় হচ্ছে। কোথাও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বা অন্যান্য বিশিষ্ট মানুষ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে এলে তাঁদের সঙ্গেও আলাপ হচ্ছে। নিজেদের বন্ধুরা তো আছেনই, প্রবাসী অন্য ভারতীয়রাও আসছেন, কোথাও আবার বাঙালিদের দলবদ্ধ কবিসংবর্ধনা। কখনও বাঙালিগৃহে নিমন্ত্রিত হচ্ছেন তাঁরা, কখনও ভারতীয়গৃহে আতিথ্যলাভ করছেন।

রেঙ্গুনে ২৫ মার্চ বিকেলে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যসম্মিলনীতে ভাষণ দিলেন। সেইদিনই তার পরে ক্ষিতিমোহন বক্তৃতা দিয়েছিলেন ব্রাহ্মসমাজে—'মীরাবাঈ ও ভারতে অধ্যাত্মসাধনায় ভারতীয় নারীর স্থান।' জাহাজেও নিজেদের মধ্যে ভাবের আদানপ্রদান চলছে। ৩ এপ্রিলের ডায়েরিতে কালিদাস নাগ লিখেছেন: 'ক্ষিতিবাবুর সঙ্গে মধ্যযুগের সাধনা নিয়ে আলোচনা।'[৩৬৫]

সাংহাই-এর পথে যেতে ১২ এপ্রিল সকালে উঠেই দেখা গেল জাহাজ ইয়াংসি-কিয়াং নদীমুখে প্রবেশ করেছে। কখনও বা গঙ্গা কখনও পদ্মা নদীর সঙ্গে এ নদীর এমন আশ্চর্য মিল যে ক্ষিতিমোহনের মনে হচ্ছিল তিনি যেন পৌঁছে গেছেন পূর্ববঙ্গে তাঁর নিজের গ্রামে। গঙ্গারই মতো সেই ঘোলা জলরাশির বিস্তার, সেইমতোই জলের ধারে ধারে এখানে-ওখানে জমে-ওঠা পলিমাটির স্তর, মানুষের ভিড়, বাজার—যেমন চোখে পড়ে আমাদের দেশে। মুগ্ধচোখে চেয়ে আছেন রবীন্দ্রনাথও। ইয়াংসি-কিয়াঙের জল কেটে জাহাজ এগিয়ে চলেছে আর গুরুদেবের আদেশে ক্ষিতিমোহন গঙ্গাস্তোত্র আবৃত্তি করছেন। শ্লোকগুলি যেন একটির পর একটি অর্ঘডালির মতো ভাসিয়ে দিচ্ছেন নদীস্রোতে।[৩৬৬]

সেদিন বেলা দশটা নাগাদ সাংহাই পৌঁছে সদলে বার্লিংটন হোটেলে তাঁরা উঠলেন, রইলেন সাত দিন। সেইদিনই দুপুরে বিশ্রাম সেরে শহরের একটু বাইরে একটা বৌদ্ধ মন্দির দেখতে গিয়েছিলেন। খুব উল্লেখযোগ্য কিছু নয়—হাল আমলের মন্দির, মামুলি নকলে গড়া। আমাদের দেশেরই পাণ্ডাদের মতো অশিক্ষিত পুরুতের দল টাকার ধান্দায় মানুষ ধরবার তালে ঘুরছে। সেই মন্দিরেই আবার ছাউনি ফেলেছে চিনা সেপাইরা।[৩৬৭] ক্ষিতিমোহনের লেখায় এই মন্দিরের সামান্য উল্লেখমাত্র পাই :

> চীনে পৌঁছিয়া আমরা যে প্যাগোডাটি সর্বপ্রথম দেখি তাহা সাংহাইর উপকণ্ঠস্থিত লুং হোয়া মন্দির।[৩৬৮]

১৩ এপ্রিল সকালে তাঁদের নিমন্ত্রণ ছিল এক ইহুদি ধনকুবের মি. হার্ডুনের বাগান-বাড়িতে। দুপুরবেলা শিখ গুরুদ্বারে শিখ ও হিন্দুরা সমবেত হয়ে রবীন্দ্রনাথকে সংবর্ধনা জানালেন। সেখানে মীরাবাইয়ের ভজন 'পিয়া ঘর আয়ে' গেয়ে উপাসনা হল, তার পরে রবীন্দ্রনাথের ভাষণ। কালিদাস নাগ লিখেছেন :

> গভীর ভাবের সঙ্গে কবি কথাগুলি বলতে ক্ষিতিবাবু সেটি হিন্দিতে অনুবাদ করে দিলেন—সকলে খুব moved হয়েছিল—[৩৬৯]

সেখান থেকে কারসান চ্যাঙ নামে এক বিখ্যাত কর্মী ও দেশনায়কের বাগানে গিয়ে তাঁরা রবীন্দ্রনাথের সম্মানে যুবচিনের পক্ষ থেকে আয়োজিত চা-পান সভায় যোগ দেন। পরের দিন বাংলা নববর্ষ। সকালবেলা সকলে রবীন্দ্রনাথকে প্রণাম করে আটটার গাড়ি ধরলেন, এবার গন্তব্য হাঙচৌ। সেখানকার সি-হু বা পশ্চিম হ্রদের অতুলনীয় শোভার বিমুগ্ধ বর্ণনা দিয়েছেন চৈনিক কবি ও শিল্পীরা। তার মধ্যে মধ্যে ইতস্তত ছড়ানো সবুজ গাছপালায়-ঢাকা

দ্বীপ, মন্দিরও আছে। হ্রদের উপরে এক চিনা হোটেলে উঠলেন সকলে, খানিকক্ষণ বিশ্রাম করে বেরোলেন। সন্ধ্যায় নৌকায় বেড়ানো হল। স্থানীয় দুটি মন্দিরে ভারতীয় শিল্প ও সভ্যতার প্রামাণ্য নিদর্শন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখা হল। একটির নাম Lei Feng অর্থাৎ Thunder Peak (বজ্রকূট) এবং অন্যটির নাম Pei Lung অর্থাৎ Temple of the White Serpent (শ্বেতনাগ)। ক্ষিতিমোহন বলছেন :

> সেই হ্রদতীরে শ্বেতনাগ বা বজ্রকূট মন্দিবটি ঠিক আমাদের দেশের মন্দিরের মত। মনে হইল নববর্ষের দিন যেন দেশেই ফিরিয়াছি।[৩৭০]

ক্ষিতিমোহনের প্রবন্ধ আছে 'বজ্রকূট মন্দির বা শ্বেতনাগ মন্দির'।[৩৭১] হ্রদের একধারে Ling Yin Monastery, যার অর্থ আত্মার বিশ্রাম। হু-লি নামে এক ভারতীয় সন্ন্যাসী প্রায় সতেরোশো বছর আগে এখানে এই বৌদ্ধ মঠ স্থাপন করেছিলেন। রাজগীরের গৃধ্রকূট পাহাড়ের মতো পাহাড় দেখে তাঁর এত ভালো লাগে যে, এই মঠ তৈরি করে তিনি বাকি জীবন এখানে থেকে ধর্মপ্রচার করেছিলেন। চিনা ভাষায় এই পাহাড়ের নাম হয়েছে Vulture Peak।[৩৭২] হু-লি সে দেশকে নিজের বলে গ্রহণ করেছিলেন, সম্পূর্ণ আয়ুষ্কাল নিবেদন করে দিয়েছিলেন তার জন্য। মৃত্যুতে শুধু তাঁর নশ্বর দেহ বিলীন হয়নি এ দেশের মাটিতে, তাঁব অবিনশ্বর আত্মাব শক্তিও সেইখানেই মিশেছে। এই দীর্ঘকাল ধরে চিনদেশের কত অসংখ্য মানুষ তাঁর সমাধিপ্রান্তে নিজের প্রার্থনা নিবেদন করল, কত ব্যথিত হৃদয় সান্ত্বনা লাভ করল—সে কথা মনে করে উদ্‌বুদ্ধ বোধ করেছেন ক্ষিতিমোহন, গভীর শ্রদ্ধায় বলেছেন এই মহাত্মার কথা। এখানকার বেণুকুঞ্জের শোভা ও ভিক্ষুদের আন্তরিক অভ্যর্থনার স্মৃতি মনের মধ্যে অক্ষয় হয়ে থেকেছে। ফুল-ফলের অর্ঘ সাজিয়ে নিয়ে তীর্থযাত্রীরা মঠ-অভিমুখে চলেছেন—সেই শোভাযাত্রার দিকে তাকিয়ে তাঁর নিজের দেখা ভারতের তীর্থস্থানের চলমান ছবি মনে আসে।[৩৭৩]

১৭ এপ্রিল সাংহাই ফিরে এসেছিলেন। ১৯ এপ্রিল সকালবেলা নদীপথে বেরিয়ে পরদিন পৌঁছোলেন নানকিন। আবার সেই অপ্রতিম ইয়াংসি-কিয়াং। ক্ষিতিমোহনের কলমে কিরণবালাকে লেখা চিঠিতে তার খানিকটা বর্ণনা পাই :

> Yang-Tsu-Kiang কি চমৎকার নদী। ঘোলা জল গঙ্গার মত। চৌড়া পদ্মার মত। ক্রমে মোহনায় পড়লাম। Factory—কাল চিমনী কারখানা সব শেষ হয়ে গেল। তারপর সমুদ্রের মত মোহনার পব মোহনা দেখে একটি চৌড়া মুখে ঢুকলাম। একটি পদ্মাবই মত চৌড়া নদী।
>
> কত নৌকা, জেলেনৌকা, মালের নৌকা—পাল দিয়ে যাচ্চে আসছে। পদ্মার মতই বেড়াজাল ফেলে জেলে বসে আছে।
>
> ক্রমে নদীর চৌড়াই কমে আসতে এক তীরে গিরিমালা অন্য তীরে সমভূমি। ধানখেত, খাল, গ্রাম, কুঁড়েঘর। তীরের বাঁধের পথ সবই দেশের মত। ভুলে যাই যে বিদেশে এসেছি। মাঝে মাঝে ষ্টেশন— নৌকাতে কবে জাহাজে লোক আসচে ও যাচ্চে। ষ্টেশন বড় দূরে দূরে। পাহাড়ে মাঝে মাঝেই কেল্লার সৈন্যনিবাস। বৈকালে ধানের ক্ষেত্র, সমতল খাল গ্রাম বড় সুন্দর লাগছিল।

আজ ৬ই বৈশাখ—এখানে পূর্ণিমা। বড় সুন্দর চাঁদ উঠেছে। ঠিক দেশের মত। তবে হাড়ভাঙা শীত। দার্জ্জিলিঙে এক সাহেব ছিলেন—তিনি আমাদের সহযাত্রী—তিনি Thermometer দেখে বললেন—এখানে April মাসে দার্জ্জিলিং-এর December হতে বেশী শীত।[৩৭৪]

সেসময়ে তাঁদের নিজেদের মধ্যে কথা হচ্ছে আসন্ন পেকিঙ সফর নিয়ে। বোধ হয় রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন নিয়েও কথা হচ্ছিল, তার মধ্যে ক্ষিতিমোহন-কিরণবালার বিবাহবার্ষিকীর কথাটাও এসে পড়েছে, হয়তো বন্ধুদেরই দাবি। তারপরে সে-সব লিখতে লিখতে আরও নানা কথা এসে পড়ল :

আজ রাত্রে খেয়ে ঠিক হোলো—Peking এ Elmhirst সাহেব চিত্রা নাটকের অর্জ্জুন হবেন। Peakingএ চিত্রা হবে ইংরাজীতে—এরা ভাল বলতে পারে না। তাই Elmhirst হবেন। আমরা ভারতীয় বেশে সবাইকে সাজাবো।

২৫শে বৈশাখে—আমার বিবাহতারিখ ২৬—আমি এবার তা ২৫শেই করবো। কারণ সেইদিন এরা উৎসব করবে—অন্যদিন করতে গেলে এবার অসুবিধা হয়। ২৫শেই তার দিন রাখা ভাল। আমি ২৫শেই বলে দিয়েছি।

কাল Nankin[g] যাব। তারপর Peking। এখনও তোমাদের একখানা পত্র পাই নি। সেখানে গিয়ে পাব।[৩৭৫]

২০ এপ্রিল নানকিন পৌঁছে লিখলেন :

20.4.24 Nankin[g] আজ ভোরে ষ্টীমার নানকিন থামলো। সময়ের আগে এসেছে। খানিক পরে ২ জন বন্ধু এলেন—এখানকার। আমরা Bridge House হোটেলে গেলাম। সব ভাল ভাল হোটেলেই থেকে যাচ্চি। এখানে স্নানাদি করে—৮টার সময় Breakfast করে অমনি নূতন Universityতে যাওয়া। তারপর President Kuoর বাড়ী। তারপর ৩টা প্রদেশের সামরিক গবর্ণরের বাড়ী গেলাম। গুরুদেবের সঙ্গে অনেক আলাপ হোলো চীন সম্বন্ধে। তারপর civil গবর্ণরের বাড়ী যাওয়া গেল। বৃদ্ধ খুব ভদ্রলোক। তার পূর্ব্বে বৈদেশিক মন্ত্রীর বাড়ী হইয়া আসিয়াছি। তারপর Universityতে চীনা খাদ্য খাইতে দিল। আমরাও তাই অতি কষ্টে দিন কাটাইলাম। ১০ বছরের পুরাতন ডিম প্রভৃতি খাদ্য। গন্ধে প্রাণ অতিষ্ঠ। ফল কিছু ছিল তাই রক্ষা।

খাইয়া গুরুদেব ছেলেদের সঙ্গে আলাপে বসিলেন—বাগানে। বাগান চমৎকার এই বসন্তে ফুলে ফুলে এই বসন্তে ফুলময়। তবে আজ শীতটা নাই। বসন্তই যেন বোধ হয়। এ দেশে হঠাৎ ৫ মিনিটে ভয়ঙ্কর শীত আসিয়া পড়ে। বৈকালে ৩টায় গুরুদেব University হলে নগরবাসী সাধারণকে বক্তৃতা দিলেন। চমৎকার বলিলেন তারপর চীনা অনুবাদ। একটা ফাঁড়া গেছে। গুরুদেব ও আমরা যেখানে বসিয়া ছিলাম—তার উপর একটি বারান্দা ছিল—সেটা হঠাৎ আস্তর ভাঙ্গিয়া পড়ে তার উপর ৫০০ লোক। কিন্তু একটা কাঠে ঠেকিয়া আমাদের মাথায় পড়ে নাই। পড়িলে ২ সেকেণ্ডে সব [...] যাইতাম। তখনি সব লোক [.] বক্তৃতা চলিল। লোক বো[ধহয়] ৩ হাজার হইয়াছিল। ৩টায় বক্তৃতা—১২টাতেই হল সব ভরিয়া গিয়াছিল।

বক্তৃতার পর উদ্যান সম্মিলন ও চা। এটা বরং একটু ভদ্ররকমের। চা খাওয়া সর্ব্বদাই চলিয়াছে। যেখানে যাই চা দিবেই এবং না খাইলেই অভদ্রতা। তবে চাতে চিনি বা দুধ নাই—কেবল গরম জলে সিদ্ধ। কিন্তু ভারী সুগন্ধ—সবুজ রংএর চা।

চা খাইয়া গুরুদেব হোটেলে ফিরিলেন। ভয়ঙ্কর ক্লান্ত। আমরা নগরের প্রকাণ্ড চীনের প্রাচীরের উপর গেলাম। একটি পর্ব্বত বিশেষ—তার উপর বসিয়া নগরের বাহিরের একটি হ্রদ দেখিতে লাগিলাম। তাতে নৌকা চলিয়াছে—তীরে উদ্যান ক্ষেত্র। আর একদিকে নগর। পুরাতন বাড়ী বা মন্দির কিছুই নাই। 1840 সালে একদল খ্রীষ্টান ধর্ম্মোন্মত্ত বিদ্রোহী হয় তাদের নাম Taipuing—তারা সব ভাঙিয়াছে। মানুষ এমন হত্যা করে যে হ্রদ আত্মঘাতীদের শরীরে পূর্ণ হয়। Hangchow নগরের West Lake এপার ওপার শবদেহে হওয়া গেছে। পুরাতন চিহ্ন লাইব্রেরী সব ধ্বংস করেছে। তারপর সূর্য্যাস্ত সেখানে দেখে হোটেলে এলাম। রাত্রে একদল অধ্যাপক এসেছেন—তাদের সঙ্গে আলাপ করে ১০টায় শোয়া গেল।

Nankin[g] ভোরে পত্র লিখ্‌চি! আজ ৮টার ট্রেনে Peking রওয়ানা হব। মধ্যে ২/৩ স্থান 21 4 24 থেকে Peking পৌঁছাব। আমার এই পত্র ২/৩ স্থান বাদ ও পরিবর্ত্তন ভদ্র করে রথীবাবুকে পাঠিও। এই কাজ তোমার রৈল। আমি সময় পাই না—এই পত্রও যেমন তেমন লিখি।[৩৭৬]

স্পেশাল ট্রেনে তাঁরা চলেছেন পেকিঙের পথে। ২২ এপ্রিল শানটুঙের রাজধানী ৎসি-নানে পৌঁছে অপরাহ্নের জনসভায় কবির সংবর্ধনা, পরে শানটুঙ খ্রিশ্চিয়ান ইউনিভারসিটিতে কবির ভাষণ। মধ্যে মধ্যে অন্য নানা যোগাযোগ, Buddhist Revial Society-র গ্রন্থাগার প্রভৃতি দেখা। প্রচণ্ড ব্যস্ততায় চিঠি লিখতেও সময় পাওয়া যাচ্ছে না। কিরণবালাকে চিঠিতে লিখছেন তাঁর চিঠি সম্পাদনা ও কপি করে মার্জিত আকারে রথীন্দ্রনাথকে দিতে। এ অনুরোধ পরেও আবার করবেন। এই নিয়ে আবার নন্দলাল বসুর একটি চিঠিতে দেখব একটুখানি সকৌতুক উল্লেখ, পরে আসছি সে চিঠির কথায়। ক্ষিতিমোহন-নন্দলালের সপ্রীতি সম্পর্কের যে আভাসটুকু চিঠিপত্রের দু-এক টুকরো মন্তব্যের ভিতর দিয়ে ধরা পড়ে যায়, তা সেকালের শান্তিনিকেতনিক গোষ্ঠীজীবনের মধুর স্পর্শমাখা।

২৩ এপ্রিল সন্ধ্যায় তাঁরা পেকিঙ পৌঁছোলেন। স্টেশনে কবিকে অভ্যর্থনা জানাতে চিনা জাপানি ইংরেজ আমেরিকান ভারতীয় সব জাতের মানুষের ঠাসাঠাসি ভিড়, ছাত্র অধ্যাপক সাংবাদিক নানা প্রতিষ্ঠানের বিশিষ্ট প্রতিনিধি প্রমুখ আছেন তার মধ্যে। ক্ষিতিমোহনের চিঠি থেকে কয়েক দিনের যেটুকু খবর পাচ্ছি তা থেকে জানা যাচ্ছে পেকিঙ হোটেলে তাঁরা সকলে ছিলেন। ২৬ এপ্রিল সেখান থেকে ক্ষিতিমোহনরা তিনজনে অন্যত্র গেছেন, রবীন্দ্রনাথও অন্য হোটেলে জায়গা নিয়েছেন ২৮ তারিখে।

আমরা ২৩শে Peking আসি সবচেয়ে বড় হোটেলে উঠি। ২৩শে রাত্রি ও ২৪শে, ২৫শে সেখান থেকে ২৬শে মধ্যাহ্নে আমি নন্দবাবু ও কালিদাসবাবু Peking Hotel ছেড়ে দিলাম। এখন আমরা ৩ জন একজন সিন্ধুবাসী বড় ব্যবসায়ীর বাড়ী আছি। গুরুদেব ও Mr Elmhirst ২৮শে ঐ হোটেল ছেড়ে একটি শান্ত চিনা হোটেলে একটি উঠান ও শান্ত কয়খানা ঘর নিয়েছেন। সেখানে খুব পরিষ্কার ও য়ুরোপীয়ভাবে খাওয়া দাওয়া ... চমৎকার শান্ত স্থান। এখানে সব বাড়ী কেবল উঠানের পর উঠান—একতলা চালাঘরের সব tileএর ঘর। অনেকটা দাক্ষিণাত্যের মন্দিরের মত।[৩৭৭]

২৪ তারিখে একটু শারীরিক অসুস্থতা নিয়েই চিনা থিয়েটার দেখতে গিয়েছিলেন ক্ষিতিমোহন—'সাজ, সজ্জা, এদেশের গান বাজনা অভিনয়ভঙ্গী এসব দেখা গেল।' অবশ্য

চিঠির গোড়াতেই জানিয়েছেন যে শরীর এখন ভালো এবং সিন্ধি ব্যবসায়ীর গৃহে আতিথ্য গ্রহণের প্রসঙ্গও পুনরপি একটু বিস্তারিত করে লিখলেন :

> শরীর এখন খুব ভাল আছে। জ্বরের ভাব ও পেটের গোলমাল চলিয়া গেছে। চীনের Pekingএ এখন গ্রীষ্মকাল—সমস্ত সময় বৃষ্টির অপেক্ষা করচে অসহ্য গরম। তাই ৬০ ডিগ্রির উপর কখনও হয় না—রাত্রে আমরা কম্বল গায়ে দেই। তাও মাঝে মাঝে শীত করে। এদেশের লোকে রাত্রে ২ খানা কম্বল চাপায়। এ যাবৎ নিজ বিছানা কোথাও ব্যবহার করিতে হয় নাই—বিছানা সর্ব্বত্র পেয়েছি। ...এখন আমরা ৩ জন একজন সিন্ধুবাসী বড় ব্যবসায়ীর বাড়ী আছি।.... ২৬/৪/২৪ আজ আমরা ৩ জন হোটেল ছাড়িয়া ভারতীয় ব্যবসায়ী Mr Lekhumalর বাড়ীতে দ্রব্যাদিসহ গেলাম। এই Pekingএ একটি মাত্র হিন্দু। আমাদের এখানে থাকাকালীন আতিথ্যের ভার নিয়েছেন।[৩৭৮]

২৫ এপ্রিল সকাল থেকে তাঁদের প্রায় সারাদিনই কাটল ফরবিড্‌ন সিটিতে মাঞ্চু রাজপ্রাসাদ ও তৎসংলগ্ন বাগানে প্রদর্শনী আর সংগ্রহশালা দেখে। ক্ষিতিমোহন অনেকটা বর্ণনা দিয়েছেন :

> প্রভাতে Breakfast খাইয়া Pekin[g] হোটেল হইতে Museum দেখিতে গেলাম। আমি নন্দবাবু ও কালিদাসবাবু। আমরা ৩ জন একত্র চলি। গেলাম বলিলেই বুঝিবে ৩ জন। আর যদি গুরুদেব বা অন্যেরা যান তবে লিখিব। Museum গেলাম। পুরাতন রাজপ্রাসাদকে নানা খণ্ড করিয়া ফেলা হইয়াছে—তারই একটি খণ্ডে এই সব কাণ্ড। তার প্রথমটাই Central Park সেখানে প্রত্যেকে ১০ cent করিয়া টিকিট নিয়া ঢুকিলাম। ঢুকিয়াই দেখি প্রকাণ্ড সব gate ও dragonর মূর্ত্তি। তারপর একটি হলে চীনা ছবির Exhibition খুলিয়াছে—সেখানে অনেক রকম নূতন ও পুরাতন ছবি দেখিলাম ও জাপানী ছবি, চীনা ধরণে জাপানী ছবি এসব বহুক্ষণ ধরিয়া দেখিলাম। সেখান হইতে আমরা ভিতরের Palaceএ যাইতে জনে ২০ cent করিয়া দিলাম ও Museum Curio বিভাগ দেখিতে জনে ১ ডলার করিয়া দিলাম। Palaceর ঝাউবাগান চমৎকার—একটা বিরাট ছায়াতে ঘন স্থান। বহু শতাব্দীর স্মৃতির বিষাদে যেন ভারাক্রান্ত। একটু বসিয়া আমরা এখন পশ্চিম Gate দিয়া Museum ভাগের প্রাসাদে ঢুকিলাম। সেখানে দরজায় ছাতা রাখিয়া—Bronze Porceleine [য] প্রভৃতি হাজার হাজার বছরের সংগ্রহ দেখিতে লাগিলাম। সবই তো Europe ও America লুটিয়া লইয়া গিয়াছে। তবু যা আছে তা অসাধারণ। Bronze সংগ্রহে কত form দেখিলাম, নেপালী অক্ষরে লেখা স্তূপের Bronzeও দেখিলাম। তারপর চিনা মাটির vase প্রভৃতি। সে তো এই দেশেরই সৃষ্টি। কত রকম গঠন ও বর্ণই দেখিলাম। কত Experiment (পরীক্ষা) ও নূতন চেষ্টা—কত চমৎকার রূপ।
>
> কাঠের শিকড় জড়াইয়া কত চমৎকার Table ও অন্যান্য জিনিষ কত রকমের Brush ও কালি ও কালি ঘুটিবার পাত্র। বাঁশের চিল্‌তার কত সব কালি ঘুটিবার আধার—অতি সুন্দর। গালার কত কাজ।
>
> এরা সব জিনিষেরই যত্ন জানে। বেঙ্গের ছাতা কাঠে হয়—তাই একটার সুন্দর form দিয়ে একটু সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে রেখেছে। একটি বেঙের ছাতা মেঘের আকার সব কি যত্নে রেখেছে! কত তীর ধনু তরওয়াল—তাই বা কত চমৎকার কাজ করা! এই দেখতে সমস্ত মধ্যাহ্ন গেল—এসে কালিদাসবাবু খাইলেন—আমি আর খাইলাম না। তখন বেলা ২।। টা।[৩৭৯]

সেদিন বিকেলবেলা এই প্রাসাদেরই ভিতরে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি দেখা এবং পণ্ডিত লিয়াং চি চাউয়ের আমন্ত্রণে রবীন্দ্র-সংবর্ধনাসভা। লিয়াং চি চাউয়ের মতো মনীষীর সঙ্গে পরিচয় ও সংবর্ধনা-ভাষণের একটু প্রসঙ্গ ক্ষিতিমোহনের চিঠিতে পাব। সংবর্ধনাসভার বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে ড. উইলহেম (Dr. Wilhelm) ও মি. জনস্টন (Mr. Johnston) নামে দুই ইউরোপীয় পণ্ডিতও তাঁদের বেশ আকৃষ্ট করেছিলেন। ক্ষিতিমোহন লিখেছেন :

> তারপর রাজবাড়ীর আর এক বড় টুকরায় Mr. Liang Chi Chau [য] নামে এক বড় পণ্ডিত নিমন্ত্রণ করিয়াছেন সেখানে গেলাম। Sun Po Libraryতে প্রায় ৬০০০ বৌদ্ধ গ্রন্থ আছে, তার অধিকাংশ ভারতের অনুবাদ। Mr Liang Chi Chao তাহা দেখাইলেন। কত চিত্র। পাথরে ঘসিয়া নানা পর্ব্বতাদির আকার। মাটীর পুতুল ও ঘোড়া যাহা গহ্বরাদিতে পাওয়া যায় তাহা। Tung Hwan ও Swingan Fu পর্ব্বত [...] যে মন্দির হইয়াছিল—তাহার [ ] কালির ছাপ কাগজে তোলা দেখিলাম। তারপরে যে ঘরে সম্রাট বসিতেন সেখানে আমরা চা খাইলাম। বহু পণ্ডিত লোক ও ২ জন বৃদ্ধ প্রাচীন মন্ত্রী আসিলেন। Liang Chao বলিলেন 'ভারত বড় ভাই আমরা ছোট ভাই। বহুদিন ভারত আমাদের খবর নেয় নাই। আবার এই খবর নেওয়াতে বড় আনন্দ।' গুরুদেবও চমৎকার উত্তর দিলেন। এ একটি খুব বাছা বড় লোকের সম্মিলন। এখানে সম্রাটের শিক্ষক Mr. Johnston ও জার্ম্মান পণ্ডিত Dr Wilhelmর সঙ্গে আলাপ হইল। চমৎকার লোক এঁরা।
>
> এঁরা বললেন ভারতের সঙ্গে চীনের সম্পর্ক নতুন করে পাকা হোক। গুরুদেব বললেন 'আমিও তাই চাই। আমি কবি ভালবাসতেই পারি—তাতেই সম্বন্ধ পাকা হয়। আমাকে সম্মান দিও না—ভালবাসা দিও—তবেই আমার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হবে।'[৩৮০]

পরদিন বিকেলে আর-একটি রবীন্দ্র-সংবর্ধনা উপলক্ষে এক প্রাচীন বৌদ্ধবিহারে গিয়ে মঠটি দেখে সকলে মুগ্ধ। প্রাচীন লাইলাককুঞ্জে কবির সংবর্ধনার উত্তরে তিনি তরুণ বৌদ্ধদের উদ্দেশে কিছু বললেন। ক্ষিতিমোহনের চিঠিতে এই প্রসঙ্গ অল্প একটু আছে :

> বৈকালে একটি মন্দিরে গেলাম। সেখানে Liliac [য] ফুল চমৎকার ফুটেছে। মাধবীর মত বড় অল্প আয়ু এর—অথচ বড় সুকুমার ফুলগুলি। সেখানে লোহার পাতের চমৎকার ফুল পাতা দেখিলাম। না দেখিলে বুঝিবে না কত সুন্দর। নানা বুদ্ধ ও [...] মূর্ত্তি—চমৎকার সুন্দর। প্রধান পুরোহিত সন্ন্যাসী। চমৎকার লোক—আমাদের মন্দিরেই অতিথি হইয়া থাকিতে অনুরোধ করিলেন। ধন্যবাদ দিয়া প্রত্যাখ্যান করিলাম।
>
> সন্ধ্যাকালে ৩০০ সাধু আরতির স্তব পাঠ করিলেন—ঠিক ভারতীয় স্তবের মত। গুরুদেব এখানে তরুণ বৌদ্ধ দলকে একটি বক্তৃতা দিলেন। তারা খুব অভ্যর্থনা করিল।'[৩৮১]

সেদিনই তাঁরা বিখ্যাত দার্শনিক ড. হু সির (Dr Hu Shih) বাড়িও গিয়েছিলেন। পরের দিন ২৭ এপ্রিল সকাল দশটায় সম্রাটের সঙ্গে সাক্ষাৎকার-কর্মসূচি। বিশাল তোরণের সামনে গাড়ি থামল, তিনটি তাঞ্জামে কবি এবং মহিলাদের বহন করে নিয়ে চলল, অন্য সঙ্গীরা চারপাশের সব-কিছু দেখতে দেখতে হেঁটে চললেন। বড়ো বড়ো তোরণ ও প্রাঙ্গণ পার হয়ে যথাবিহিত অভ্যর্থনার মধ্য দিয়ে অবশেষে সম্রাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল। তিনি নিজে তাঁদের বিভিন্ন মহল বাগান প্রাসাদের ভিতরকার বৌদ্ধ ও তাও-ধর্মীয় মন্দির,

দফতরখানা বা রেকর্ডরুম এবং শেষে বিরাটায়তন দরবারকক্ষ ঘুরিয়ে দেখালেন, সাদরে অন্দরমহলে এনে বসালেন, চা ফল ও অন্যান্য খাদ্য দিয়ে অতিথিদের আপ্যায়িত করা হল। দেখানো হল শিল্পসংগ্রহ, ছবি তোলা হল সম্রাটের সঙ্গে।[৩৮২]

সন্ধ্যাবেলায় সেদিন পেকিঙের বুধমন্ডলী কবি ও তাঁর সঙ্গীদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন ভোজসভায়—'academic dinner'—লিখেছেন কালিদাস নাগ। সে সভায় পূর্বপরিচিত পণ্ডিত ও চিন্তাবিদদের সঙ্গে দেখা হল—মি. লিয়াং, মি. লিন, মি.জনস্টন, ড. উইলহেম প্রমুখ। আর দেখা হল পেকিঙ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক হলস্টেনের সঙ্গে—কালিদাস নাগ খবর দিচ্ছেন : 'Baron Stäal Holstein Peking Universityর সংস্কৃতের অধ্যাপক—Chinese-Tibetanএ সমান দক্ষ—কাশীতে গদাধর শাস্ত্রীর ছাত্র—ক্ষিতিবাবুর সতীর্থ। বেশ আলাপ জমল, তাঁর art collection দেখতে ডাকলেন।'[৩৮৩] এই বুদ্ধিজীবীদের সভায় রবীন্দ্রনাথ সংবর্ধনার উত্তরে যে ভাষণ দেন, তাতে প্রসঙ্গত ক্ষিতিমোহনের উল্লেখ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন : 'আমাদের বন্ধু অধ্যাপক ক্ষিতিমোহন সেন এখানে আছেন। তিনি বলতে পারবেন ত্রয়োদশ থেকে ষোল এবং সপ্তদশ শতক পর্যন্ত মধ্যযুগের ভারতীয় কাব্যের কী সৌন্দর্য ছিল। আমি তাঁর লেখার মধ্য দিয়ে এগুলোর সঙ্গে পরিচিত হয়ে মুগ্ধ হয়েছি, দেখেছি তাঁরা কত আধুনিক ছিলেন। সব ভাল জিনিসই চির-আধুনিক এবং সেগুলো কখনো সেকেলে হতে পারে না।'[৩৮৪] ২৯ এপ্রিল সকালবেলাটা তাঁরা অধ্যাপক হলস্টেনের গৃহে তাঁর গ্রন্থাগার ও কাজকর্ম দেখে কাটিয়েছিলেন, দেখেছিলেন তাঁর ছবি ও মূর্তির সংগ্রহ। ক্ষিতিমোহনের চিঠিতে সামান্য একটু উল্লেখ পাই : প্রাতে Baron Holstein-র বাড়ী গুরুদেব সহ গেলাম। বহু চিত্র মূর্ত্তি ও গ্রন্থ এখানে আছে।[৩৮৫]

বিকেলে চায়ের নিমন্ত্রণ মি. জনস্টনের বাড়িতে। ক্ষিতিমোহন লিখেছেন :

> বৈকালে সম্রাটশিক্ষক Johnstonর বাড়ী চা। সেখানে সম্রাটের photographer আমাদের Photo নিল—তার ওখানে সম্রাটের cousin সঙ্গে দেখা হইল। চমৎকার যুবক। এখানেও অনেক পুস্তক চিত্র মূর্ত্তি দেখিলাম। চীনে শিল্পের অন্ত নাই।[৩৮৬]

আগের দিন ২৮ এপ্রিল সেন্ট্রাল পার্কে চিনা-জাপানি আধুনিক চিত্রপ্রদর্শনীতে যাওয়া হয়েছিল আর ৩০ এপ্রিল অন্য এক চিত্রপ্রদর্শনীতে—সেখানে প্রাচীন ধরনের ছবির প্রদর্শনী চলছিল। এখানে রবীন্দ্রনাথ একটি ভাষণ দেন। ক্ষিতিমোহনের চিঠিতে অল্পস্বল্প বিবরণ আছে।[৩৮৭] 'রবীন্দ্রজীবনীতে পাচ্ছি ন্যাশনাল ইউনিভারসিটিতে চিনা ছাত্রদের সঙ্গে মিলিত হন রবীন্দ্রনাথ আর ২৮ এপ্রিল টেমপল অব আর্থ প্রাঙ্গণে তিনি সহস্রাধিক ছাত্রের সমাবেশে দীর্ঘ ভাষণ দেন। এইখানে চিনা সম্রাটরা তাঁদের দরবার আহ্বান করতেন। ক্ষিতিমোহন লিখেছেন এই প্রসঙ্গে তাঁর চিঠিতে :

> ২৮শে গুরুদেব একটি বক্তৃতা করলেন—ছাত্রদের—৫ হাজার ছাত্র হয়। Temple of Earthএ যেখানে চীন সম্রাটরা বলতেন সেখানে বক্তৃতা হয়। গুরুদেব ৫০ মিনিট বলেন। খুবই ভাল হয়েছিল।[৩৮৮]

মে মাসের প্রথমে রবীন্দ্রনাথ আতিথ্যগ্রহণ করলেন ৎসিঙ হুআ (Tsing Hua) কলেজে। ১ মে ড. লির (Dr. Li) তত্ত্বাবধানে ক্ষিতিমোহনরা তিন সঙ্গী যাত্রা করলেন কয়েকটি বিশিষ্ট স্থান দেখবার জন্য।[৩৮৯] এবার খাঁটি চিনা শহর ও গ্রামের সঙ্গে তাঁদের পরিচয় হবে, পশ্চিমি প্রভাবে যা হারিয়ে যায়নি। পরদিন বিকেল পাঁচটা নাগাদ Loyang পৌঁছে সন্ধ্যায় শহরটা অল্পস্বল্প দেখে হোটেলে ফিরে এলেন। সেইদিনই কিরণবালাকে যে চিঠি লিখতে শুরু করেছিলেন তাতে লোয়াং আসবার পথের বর্ণনা বেশ খানিকটা পাব :

কাল ১লা আমরা ১১-৫০ মিনিটে ট্রেনে উঠলাম—এই পথটা বড় খারাপ। আমাদের জন্য চীন Government ১ খানা reserve ১ম শ্রেণীর গাড়ী দিয়াছেন। তাতে বৈঠকখানা, শোবার ঘর, স্নানের ঘর, বসে খাবার টেবিল, kitchen সব আছে। পাচকও আছে। তাছাড়া boy আছে। এছাড়া একদল সিপাহী চলেছে। তারা সমস্ত রাত পাহারা দেয়।

রাত্রে সিপাহী ও officer আরও বাড়লো। পথে বড় বড় ষ্টেশনে soldier ও officer উঠচে ও আমাদের খোঁজ নিচ্চে। এরা সব Central Government থেকে ভার পেয়েছে। সমস্ত রাত গেল। প্রাতে ৯টায় Hoang-Ho পীত নদী পার হয় [হয়ে] পর্ব্বতের দেশে পড়লাম। এখানে tunnel পার হলাম। বেলা ১০-১৫ মিনিটে Chen-Chow ষ্টেশনে পৌঁছিলাম। সেখানে সেখানকার সেনাপতি, পুলিশ বিভাগের কর্ত্তা প্রভৃতি ১০/১৫ জন লোক এলেন। ভার পেয়ে তাঁরা আমাদের অভ্যর্থনা করতে এসেছেন। আমি, নন্দবাবু ও কালিদাসবাবু, আমাদের সাথী আছেন Mr. Li। ইনি চীনদেশী ও একজন অধ্যাপক। বেশ চমৎকার লোক। আমেরিকার Harvardর ছাত্র। বাঙ্গালী ২/১ জন বন্ধু আছে।

সেনাপতি প্রভৃতিরা আমাদের দ্রব্যাদি সৈন্যদের জিম্মায় দিলেন। আমরা সকলে আমরা বেরিয়ে একটি হোটেলে চীনা খাদ্য খেতে বসলাম। কাঠী দিয়ে খাচ্চি। চীনা খাদ্য যা তা। তাই খেতে বাধ্য হচ্চি। যা থাকে কপালে। বেলা ১$\frac{১}{২}$টায় ষ্টেশনে ফেরা গেল। সৈন্যরা waiting roomএ দ্রব্য নিয়ে বসেছিল। Platformএ এল। বেলা ১$\frac{১}{২}$টায় গাড়ী এল। ২টায় ছাড়লো।

এরপর পাহাড়ে দেশ। মাটীর পাহাড়। তাতে গুহা করে চমৎকারভাবে চীনারা আছে। তার উপত্যকায় সুন্দর থাকে থাকে ধানের ক্ষেত। কাল বৃষ্টি হয়ে গেছে। সবই চমৎকার। এতদূর [..] কেবল ক্ষেত দেখছি—গাছ নেই। এখন গাছ দেখা দিচ্চে। বসন্ত এসেছে—তাতে চমৎকার বেগুনি আভায় হলদে আভায় সাদাটে ফুল ফুটেছে। পাতা নেই কেবল ফল—এ কেবল বরফসাদাশীতের দেশেযই [দেশেই] সম্ভব।

ক্রমাগত tunnel ও উপত্যকা—ধানের ক্ষেতের যবের ক্ষেতের সারি সারি থাক। গুহা, গুহার পাশাপাশি সংযোগে গুহা—একটু নীচে ঝরনা। পার্ব্বত্য নদী, ফুলের গাছ—সবই ছবির মত চমৎকার। বর্ণনা করে বলা যায় না। বেলা ২টায় বাতি জ্বালাইয়া দিল—তারপর ক্রমাগত সুরঙ্গের পর সুরঙ্গ। বেলা ৪টায় সুরঙ্গ শেষ হোলো। তখন Lo নদী দেখা দিল। ভারী সুন্দর পাহাড়ে নদী। তাতে পাল তোলা সব নৌকা। তাতে নীল পাড়। থরে থরে পাড় সাজানো, তাতে মনে হয় নীলকণ্ঠ পাখীর পাখা যেন মেলে আছে।

সব নৌকা যাচ্চে আসচে—খুব কম জলে। তুলার বস্তা সব ষ্টেশনে উঠচে। এখন মে মাস—আমাদের পৌষের চেয়েও বেশী শীত। সিপাহী সর্ব্বত্র আছে। বিশেষতঃ এটা একটা মস্ত জরুরী পার্ব্বত্য পথ।

বেলা ৫-১৫ মিনিটে Lo-Yang সহরে পৌঁছলাম। এই খাঁটী চীনা সহর। ইংরাজী কেউ জানে না। এক চীনা হোটেলে উঠলাম। ৪ জন আমরা দিন ৫ ডলার ভাড়া। এ ছাড়া খোরাকী

আলাদা, না খাইলেও চলে। সবই ভাল তবে বাথরুমের ব্যাপার বড় নোংরা। স্নানের বোধহয় কিছুই নেই।

এখানে দ্রব্যাদি রেখে Rikshaw করে সহর দেখতে গেলাম। সেখানে কিছু চীনা বই ও ছবি কিনে ৮টায় হোটেলে ফিরলাম। তখনো আলো আছে। তারপর ৮।। টায় খেলাম—চীনা খাদ্য—কাঠিতে করে। এখন রাত্রি ৯টা এখন শুতে যাব।[৩৯০]

৩ মে সকালেই তাঁরা Lungmen গ্রামের বৌদ্ধতীর্থ দেখবার উদ্দেশে বেরোলেন। ঘণ্টা চারেকের পথ। মাঝপথে Kwan-de-long গ্রামের দ্রষ্টব্য দেখা হল। এবার তারই বর্ণনা :

প্রাতে উঠে মুখ হাত ধুয়ে চা খেয়ে ৮-১৫ মিনিটে একখানি Rikshawতে আমরা ৩ জন ও Mr Li রওয়ানা [হয়ে] পথে Lo নদী খেয়া পার হওয়া গেল। তারপর গ্রাম মাঠ বাজার সব চীনা জীবনের সাধারণ জিনিষ দেখতে দেখতে বেলা ১০টায় Kwan-de-Long গ্রামে পৌঁছিলাম। Rikshawওয়ালারা সর্ব্বত্র চায়ের দোকানে খাবার ও চা খাইতেছে। তারা খাইতেছে—আমরা একটি সুন্দর মন্দির দেখিলাম। General Kwan Yee—১৭শত বৎসর পূর্ব্বে দেশরক্ষা করেন—তাই তিনি পূজিত। মন্দিরটি বেশ। বেলা ১২টায় Lungmen গ্রামে আসিলাম। নদীর নাম Yi—২ দিকে পর্ব্বত। বহু ঝরনা—২ দিকে অসংখ্য হাজার হাজার গুহা—তাতে বুদ্ধ ও দেবদেবী মূর্ত্তি। আমরা ধূপকাঠি জ্বালাইলাম। আমাকে সকলে কাশীর লামা মনে করিয়া খুব সমাদর করিল। বেলা ৩ টা পর্যন্ত ঘুরিয়া দেখিলাম। অনেক চিত্র নন্দবাবু কিনিলেন।....

এখানে গুহার সংখ্যা হাজার হাজার—মূর্ত্তির সংখ্যা নাই। এক এক ঘরে ছোট ছোট মূর্ত্তি হাজার হাজার আছে। কত কালে [..] কত লোকের কত যত্নে তৈরী। বুদ্ধ ও দেবদেবী মূর্ত্তি ভারতের প্রতি কত শ্রদ্ধার চিহ্ন। সব দেখিয়া মন উদাস হইল। বেলা ৩টায় ফিরিয়া রওয়ানা হইলাম। বেলা ৬-৪০ মিনিটে হোটেলে আসিয়া স্নান করিয়া—এইমাত্র খাইয়া পত্র লিখিতেছি।[৩৯১]

ক্ষিতিমোহন ছোটোবেলায় কাশীতে যে-সব তীর্থযাত্রীদের কাছে বসে তাঁদের তীর্থভ্রমণের অভিজ্ঞতার বিস্ময়কর গল্প শুনতেন, তাঁদের মধ্যে এমন-সব সন্ন্যাসী ও যোগী থাকতেন যাঁরা অনেকে ভারতের বাইরে তিব্বত চিন মঙ্গোলিয়া রাশিয়া তুরস্ক পারস্য আরব মিশরের মতো বহু দূরদেশেও তীর্থ করতে যেতেন। সেই তখনই তিনি শুনেছিলেন যে সংকল্পধারী সাধুরা চিনদেশের সহস্রবুদ্ধ গুহাতীর্থ, নাগদ্বার ও পই-মা-স্যু বা শ্বেতাশ্বতীর্থে কখনও দলবেঁধে কখনও একা গিয়ে থাকেন। আজ সেই নাগদ্বার বা লাঙমেনের গুহামন্দিরে তিনি নিজেই এসে হাজির হয়েছেন। তাঁর বেশ উত্তেজিত বোধ করবারই কথা, সে তুলনায় তাঁর চিঠির বর্ণনা সাদামাঠা এবং সংক্ষিপ্ত। শুধু নাগদ্বারতীর্থই নয়, পরের দিন তাঁরা যাবেন শ্বেতাশ্বমঠে আর ১২ মে সুযোগ হবে সহস্রবুদ্ধগুহায় যাওয়ার। কিরণবালাকে তিনি লিখেছেন :

কাল Pei mo-san মঠে যাইব। অর্থাৎ White horse monastery শ্বেতাশ্ব মঠ। সেখানেই ভারতের প্রথম পন্ডিতরা আড্ডা করেন।[৩৯২]

৪ মে সকালে আটটা নাগাদ বেরিয়ে চিনা বৌদ্ধধর্মের আদিকেন্দ্র ও প্রথম মন্দির পইমা-স্যাতে গেলেন তাঁরা।

> ভারত হইতে প্রথম বৌদ্ধ তপস্বী কাশ্যপ মাতঙ্গ চীনদেশে যাইয়া এই তীর্থেই তাঁহার তপস্যা সমাপ্ত করেন। তাঁহার জন্য প্রেরিত একটি শ্বেত অশ্ব এইখানে প্রাণ দেওয়ায় এখানে Lo নদীর তীরে একটি চমৎকার পুণ্যক্ষেত্র রচিত হইয়াছে। প্রায় দুই হাজার বৎসর এই তীর্থ চলিয়াছে।[৩৯৩]

ক্ষিতিমোহনের লেখায় খবর আছে :

> আমরা যখন সেখানে যাই তখন ভারতীয় যাত্রী বলিয়া সেখানে খুব সৎকার পাইয়াছিলাম। কিন্তু তখন মন্দিরগুলি বড় জীর্ণ অবস্থায় ছিল। শুনিয়াছি পরে শ্রীযুক্ত তাও চি তাও মহোদয়ের চেষ্টায় বহু লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে এই তীর্থটির আগাগোড়া জীর্ণোদ্ধার করা হইয়াছে।[৩৯৪]

৫ মে সকাল ন-টায় লোয়াং ছেড়ে বেরিয়ে বিকেল তিনটেয় তাঁরা গিয়ে পৌঁছোলেন কাইফং (Kaifung)। সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরা অভ্যর্থনা করলেন। হোটেলে জিনিসপত্র রেখে প্রথমেই সেখানকার সর্বপ্রাচীন বৌদ্ধ মন্দির দেখতে যাওয়া হল। ভিক্ষুরা সযত্নে তাঁদের গ্রন্থাগার অর্হৎ গ্যালারি প্রভৃতি দেখালেন। ভক্ত ভিক্ষুর হাতে খোদাই-করা দু-শো বছরের পুরোনো একটি অলংকৃত শিলালিপি দেখে সকলে মুগ্ধ। মন্দিরের বাইরে বাজার, দৈনন্দিন জীবনের আনাগোনা, ভিতরে কথকতা চলছে—যেমন হয়ে থাকে প্রাচ্য দেশের মন্দিরের পরিবেশ, ঠিক সেই রকমই। তার পর সেখানকার নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে সব ঘুরে দেখলেন। আর দেখলেন মাঠের মধ্যে বিশ ফিট উঁচু ব্রোঞ্জের তৈরি প্রাচীন এক অতিকায় দাঁড়ানো বুদ্ধমূর্তি।[৩৯৫] বোধ করি তাঁদের সবচেয়ে বিস্মিত ও মুগ্ধ করেছিল কাইফঙের বারোতলা উঁচু প্যাগোডা—তার গায়ে সব চিনামাটির রং-করা ইট।

> সেই ইটের মধ্যে এক জায়গায় দেখি কীর্তন চলিয়াছে। ঠিক বাংলাদেশের কীর্তন। কীর্তনীয়াদের কোমরে চাদর বাঁধা, কোঁচা ঝুলান, কারও কারও গায়ে চাদর, মাথায় ঝুঁটি, বাঁশি ধরিবার ভঙ্গীতে খোল করতালে কীর্তন বসিয়াছে।[৩৯৬]

পুনরপি স্মরণ করেছেন :

> ভারতীয় বৌদ্ধ মহাযানদের কীর্তনের প্রাচীন ভিত্তিচিত্র চীনদেশে দেখিয়াছি। খোল কর্তাল সহ রীতিমত কীর্তন।[৩৯৭]

৬ মে সকালে তাঁরা গেলেন Temple of Confucius পাবলিক লাইব্রেরি ও মিউজিয়াম দেখতে। সেদিনও বিশ্ববিদ্যালয়ে গোলটেবিল ঘিরে অধ্যাপক ইতিহাসবিদ প্রত্নবিদ্যাবিশারদ প্রমুখ মানুষের সঙ্গে একত্র বসে হিন্দু ও বৌদ্ধশিল্প, বৌদ্ধধর্ম, হিন্দুজীবন ও ভারতের তৎসাময়িক পরিস্থিতি সম্বন্ধে বিস্তর আলোচনা হল। বিকেল তিনটেয় এসে পৌঁছোলেন চেন চাউ এবং সেখান থেকে যাত্রা করলেন পেকিঙ। ৭ মে বিকেল পাঁচটায় পৌঁছোলেন।[৩৯৮]

পরদিন রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনে সন্ধ্যাবেলায় ক্রেসেন্ট মুন সোসাইটির (শিন য়ুয়ে শে) উদ্যোগে উৎসব, পুরোহিত ড. হুসি। পেকিং নর্মাল বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠান হয়, চারশো

বিশিষ্ট অভ্যাগত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। কবিকে উপাধি প্রদান করা হল 'চু-চেন-তান'—ভারতবর্ষের রবীন্দ্র,* তারপর 'চিত্রা' অভিনয়। কবির স্নেহভাজন সঙ্গীরা সেদিন সকালে শান্তভাবে উদ্‌যাপন করেছিলেন দিনটি। নন্দলাল উপহার দিয়েছিলেন নিজের আঁকা ছবি, কালিদাস নাগ পাঠ করেছিলেন স্বরচিত কবিতা 'কবিপ্রশস্তি', ক্ষিতিমোহনও স্বরচিত শ্লোক পড়েছিলেন। সন্ধ্যার অনুষ্ঠানেও তিনি দুটি সংস্কৃত কবিতা আবৃত্তি করেন, কালিদাস নাগ আবৃত্তি করেন 'বলাকা'-র 'পুরাতন বৎসরের জীর্ণ ক্লান্ত রাত্রি'।[৩৯৯]

ক্ষিতিমোহনকে তো পথ-চলা মানুষ বলে জানি, গৃহের আরাম তাঁকে বাঁধে না। কিন্তু দূরপ্রবাসে অনভ্যস্ত জীবনযাত্রায় কখনও কখনও একটু বিচলিত বোধ করছিলেন মনে হয়। তাঁর সেই সময়কার আত্মভোলা ঈষৎ গৃহকাতর অন্তরের আভাস পাই রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লেখা নন্দলাল বসুর চিঠিতে। রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনেই নন্দলাল লিখেছিলেন।

> ঠাকুরদা বেশ বিস্তারিত খবর রাখছেন। কালিদাসবাবু একটু নিজের মসলা দিয়ে মিশিয়ে খবর রাখছেন। আর আমি সব খবর ঘন্ট করে ফেলছি। ...ক্ষিতিবাবুর চিঠি ত ধারাবাহিক আশ্রমে যাচ্ছে। ঠানদি বোধহয় বড ব্যস্ত। কারণ শুনছি নাকি তাঁর চিঠি সব তিনি পুনরায় নকল করে যথাস্থানে পাঠাচ্ছেন। ঠানদিকে জানাবেন আমি ঠাকুরদার তত্ত্বাবধান সদাই করি কারণ তিনি একটু ভোলা লোক কিনা। ঠাকুরদার মুখে শুনলাম ঠানদি নাকি উঁহার ভার আমার উপর দিয়েছেন আর আমার কথামত চলতে বলেছেন। তাঁর হাতে নিয়ে গিয়ে ঠাকুরদাকে আবার সঁপে দিতে পারলে বাঁচি। তিনি বেশ একটু হোমসিক হয়ে পড়েছেন।
>
> আমরা তিনজন মিলে আমাদের দেশবাসীর তরফ হতে এবং আশ্রমের তরফ হতে ইঁহার [গুরুদেবের] জন্ম-উৎসব করিলাম। আমি একটা ছবি, কালিদাস বাবু একটা কবিতা, ঠাকুরদা একটা ওজনদার শ্লোক দিয়ে পূজা শেষ করলাম। ঠাকুবদার আজ বিবাহেব উৎসব কি একটা করব তাই ভাবচি। ঠাকুরদা আজ সকাল হতে বসে ঠানদিকে চিঠি লিখতে আরম্ভ করেছেন। ...আমরা তিনজনে ভাল আছি। তবে ঠাকুরদার পেটটা ৫"-৬" বেড়ে কমেছে। ৮. ৫. ১৯২৪।[৪০০]

এ-সবের মধ্যে তাঁদের পেকিঙ শহরের দ্রষ্টব্য বস্তু দেখা চলছিল। টেমপল অব হেভেন, জেড ফাউন্টেন, মোগলযুগের ব্রোঞ্জ বুদ্ধ, সহস্রবুদ্ধ গুহা, সামার প্যালেস, ইয়েলো টেমপল, উ তাও মিয়াও বা মহাসত্যজ্ঞান মন্দির, দামামা মন্দির, ঘণ্টা মন্দির। লামা টেমপল—লামাদের এই বিখ্যাত মঠটিও পেকিঙে, বহু তিব্বতি লামা বাস করেন এখানে। এখানে দেখলেন ভগবান মৈত্রেয়ের বিশাল মূর্তি, Song-Kha-Pa মূর্তি, আশ্চর্য সব তিব্বতি চিত্র। মোগলযুগে মহা ধুমধাম ছিল এ-সব মঠে, এখন আর নেই—তবুও গম্ভীর ভাবের আরতি দেখে বিশ্বনাথের আরতি মনে পড়ছিল, দ্বারদেশে ব্রোঞ্জের জোড়া সিংহ দেখে মনে পড়ছিল এই রকমই একটি সিংহ দেখেছিলেন কাশীর চৌষট্টি যোগিনী মন্দিরে।

* চু-চেন-তান—'চেন' মানে মেঘাচ্ছন্ন মলিন আকাশ ভেদ করে সহসা দীপ্তির প্রকাশ, ব্যঞ্জনা 'বজ্রদেবতা ইন্দ্র' আর 'তান' মানে সূর্য (আক্ষরিক অর্থে 'উষা')। 'চু-চেন-তান' মানে দাঁড়াল 'ভারতবর্ষের রবীন্দ্র'। বিতর্কিত অতিথি ৬১ শিশিরকুমার দাশ ও তান ওয়েন।

একদিন সকালে অবজারভেটরিতে গিয়ে মোগল আমলের ব্রোঞ্জের সব যন্ত্র দেখলেন। দেখে এলেন কনফুসিয়াসের স্মৃতিমন্দির, চিনের প্রাচীর। সংস্কৃত ও তিব্বতি শিলালিপি, প্রাচীন ছবি ও গ্রন্থ অজস্র দেখা হচ্ছে। ৎসিঙ হুয়া মহাবিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ঘুরে দেখলেন, দেখলেন পেকিঙ বিশ্ববিদ্যালয়। বিদ্বজ্জনদের সঙ্গে ভারতীয় ও বৌদ্ধ দর্শন প্রভৃতি নানা বিষয়ে আলোচনার সুযোগ পাচ্ছেন। জানছেন বৌদ্ধধর্ম প্রভৃতি বিষয়ে প্রাচীন গ্রন্থের সন্ধান কোন্ মঠে পাওয়া যাবে। ১৫ ও ১৬ মে যথাক্রমে ক্ষিতিমোহন ও ড. নাগের বক্তৃতা ছিল। ক্ষিতিমোহনের বিষয় ছিল Hindu Hetarodoxy আর কালিদাস নাগের Renaissance of Indian Art। ১৮ মে বিকেলে Peking National University-তে তাঁদের বিদায়সভা হল। পরদিন আবার Gilbert Reid-এর International University দেখতে গেলেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষণের পরে ক্ষিতিমোহন ও কালিদাস নাগ কিছু আলোচনা করলেন : 'গুরুদেব Poet's Religion বলে শেষবিদায় নিলেন—ক্ষিতিবাবু ভারতীয় অধ্যাত্ম অনুভূতি ও শাস্ত্রের প্রভেদ দেখালেন—আমি ভারতীয় ইতিহাসের মধ্যে বিশ্বভ্রাতৃত্বের আভাস কোথায় সে বিষয়ে আলোচনা করলাম।' সেইদিন ১৯ মে ড. হুসির সঙ্গে আবার একবার তাঁরা পেকিঙ বিশ্ববিদ্যালয়ের চিনা সংস্কৃতি বিভাগের কাজ দেখতে গেলেন। উল্লেখযোগ্য সব কাজ চলছে। সেখানেই একটি হিন্দি ভাষায় লেখা দরখাস্ত দেখেছিলেন, দেখেছিলেন কয়েক টুকরো বাংলা জীর্ণ কাগজ, সেও সম্ভবত নেপালের বঙ্গাসীমা থেকে আসা দরখাস্ত। অনেকদিন পরে সে-সব কথা স্মরণ করেছেন ক্ষিতিমোহন।[৪০১] স্মরণ করেছেন ১২ মে পেকিঙের কাছাকাছি ৎতা স্ সু অর্থাৎ পঞ্চচূড়া মন্দিরটি দেখতে গিয়ে চমক লেগেছিল—সে মন্দির বাংলার পঞ্চরত্ন মন্দিরের ধাঁচে তৈরি। বলেছেন : 'তারপর দেখি সেখানে অক্ষরে লেখা সব মন্ত্র ও ধারণী। বুদ্ধমূর্তিগুলি বাংলাদেশের মতো চাদর মুড়ি দেওয়া।'[৪০২] 'চিন্ময় বঙ্গ'-এ ক্ষিতিমোহন পঞ্চদশ শতাব্দীতে নির্মিত এই মন্দিরের ইতিহাসটি বলেছেন। পেকিঙে এক বাঙালি থাকেন শুনে দেখতে গিয়ে দেখেছিলেন তিনি একজন বিহারবাসী মুসলমান। তাঁর বাঙালিত্বের ইতিবৃত্তটিও বাদ দেননি। ব্রহ্মদেশে এক শ্রেণির বাঙালি দেখেছিলেন, তাঁদের বলে পৌনা। এঁরা বাংলা বলতে পারেন, বাংলা ধর্মগ্রন্থ পড়েন, বাংলা কীর্তন করেন, এঁদেরও পরিচয় আছে 'চিন্ময় বঙ্গ'-এ। আছে চিনে দেখা বাংলা অক্ষরে লেখা বইয়ের কথা—'গোবিন্দলীলামৃত'।[৪০৩]

২০ মে পেকিঙের পালা শেষ হল। ২৮ মে সান্ সি (Shansi) ও হ্যাংকাও (Hangkow) হয়ে সাংহাই এসে পৌঁছোলেন।[৪০৪] সেখান থেকে সাংহাইমারু জাহাজে জাপানের উদ্দেশে তাঁরা যাত্রা করলেন, ৩০ মে সকাল সাড়ে আটটায় জাহাজ ছাড়ল। জাপানে তাঁদের পনেরো দিনের ভ্রমণসূচি।[৪০৫] সাংহাই পৌঁছে কিরণবালাকে লেখা যে চিঠি ডাকে দিয়েছিলেন, তার কথা আর-একটি চিঠির প্রথমেই লিখছেন :

> ২৭শে তারিখ পর্য্যন্ত Yang-Tse নদীতে লেখা এক পত্র ২৮শে তারিখে সাংহাই হইতে তোমাকে পাঠাইয়াছি। তারপর তোমাকে আর পত্র লিখিতে পারি নাই।[৪০৬]

সাংহাইয়ের এই কয়েকটি দিনের একটু বিবরণ এই পরে-লেখা চিঠিতে আমরা পাই :

> ২৮ শে তারিখ বেলা ১০টায় সাংহাই পৌঁছিলাম। ষ্টেশনে ভারতীয় ও ইয়োরোপীয় অনেক বন্ধু এসেছেন। গুরুদেব Mr. ও Mrs. Bena নামে এক ইতালীয় ভদ্রলোকের বাড়ী গেলেন। আমরা লালচাঁদের বাড়ী গেলাম।
>
> জাপান হতে আমাদের নিতে লোক এসেছে। জাপান হতে আমাদের জাহাজ ঠিক করে পাঠিয়েছে। অথচ আমরা আর এক জাহাজ ঠিক করেছিলাম। যাক্, চল্লাম, সে তোমরা বুঝে নাও। তারা সব কি ঠিক [কল্ল]। আমাদের কথা ছিল যাব ৩১শে, এখন যেতে হবে ৩০শে সকালে কাজেই আর বাহির হবার সময় নেই। মধ্যাহ্নে খেতেই ২টা বাজলো—৩টার সময় শাস্ত্রী আমাদের নিতে এলেন আমরা তাঁর বাড়ী হয়ে Mr. Sabul নামে এক পেশওয়ারী Merchantর সঙ্গে দেখা করে Mr. ও Mrs. Benaর বাড়ী গিয়ে গুরুদেবের সঙ্গে দেখা করলাম। সন্ধ্যায় গুরুদেবের বক্তৃতা হোলো শিক্ষা সম্বন্ধে বললেন। পরদিন সভার পর সভা—শেষ সভা হোলো চীনাদের শেষ বিদায়। তারপর রাত্রে এসে খেয়ে জাপানের ষ্টীমারে উঠলাম।[৪০৭]

২ জুন রাত সাড়ে ন-টায় কোবে পৌঁছোনো গেল। সেখান থেকে ৪ জুন বেরিয়ে ওসাকা, নারা, কিয়োটো ঘুরে ৬ জুন আবার সেখানেই ফিরলেন। নানা জায়গায় কবির বক্তৃতা, অনেক চিন্তাশীল বিশিষ্ট মানুষের সঙ্গে পরিচয়, মিউজিয়াম, মন্দির, বিশ্ববিদ্যালয় দেখা। কিয়োটো বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রহে বহু আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থ আছে, নিজের চোখে সেগুলি দেখবার সুযোগ হল, নারায় এবং হরিউজিতে অসংখ্য হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি আছে, সে-সব দেখলেন। 'এখানে সিংহবাহিনীর মূর্তি দেখিলে মনে হয় যেন বাংলাদেশের কোনো পূজার দালানে আসিয়াছি।'[৪০৮]

৭ জুন রবীন্দ্রনাথ, এলমহার্স্ট, নন্দলাল বসু ও কালিদাস নাগকে নিয়ে টোকিয়ো গেলেন, এই ক-দিন যে অনেকগুলি জায়গায় ঘুরে আসা হয়েছে তার বিস্তারিত প্রসঙ্গে না গিয়ে* ক্ষিতিমোহন চিঠিতে লিখলেন :

> এই কয়দিন একটুও অবসর পাই নি। আমাকে গুরুদেব মন্দির ও তীর্থ দেখতে পাঠিয়ে রাজধানী Tokio (য) চলে গেলেন।[৪০৯]

ড. নাগের দিনলিপি থেকে জানতে পারি কোবের ইন্ডিয়া ক্লাবে গিয়ে প্রায় দেড়শো-দুশো জন ভারতীয়ের সঙ্গে তাঁদের দেখা হয়েছিল। স্পষ্ট করে বলতে পারব না সেখানেই ক্ষিতিমোহন তাঁর পুরোনো বন্ধুর সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন কি না। তেমন হওয়া অসম্ভব নয়, আবার কোবে-প্রবাসী বন্ধুর সঙ্গে তিনি আগে থেকে যোগাযোগ করেছিলেন এমনও হতে পারে। আমরা দেখছি কিরণবালাকে চিঠিতে তিনি জানাচ্ছেন :

> এখানে আমার এক পুরাতন বন্ধুর সঙ্গে এসে একটি নূতন বন্ধু পেয়েছি। পুরাতন বন্ধুর নাম ভাইলামভাই পাটেল—নূতন বন্ধুর নাম ছগনলাল হীরজী। ইনি মুসলমান—তবে খোজা। অর্থাৎ আগা খাঁ দলের লোক—এদের আচার ব্যবহার ও নাম ধাম হিন্দুর মত। এরা দেশে মাছ মাংসও খান না। গোমাংস তো দূরের কথা। ইনি কচিৎ মাছ খান—তবে রোজই নিরামিষ খাদ্য

* এই জায়গাগুলি পরিদর্শনের বিবরণ আছে তাঁর গুজরাতি গ্রন্থ 'চীনজাপাননী যাত্রা'-য়।

হয়। দেবমন্দিরে যান—ও ভক্তির সঙ্গে উপদেশ শোনেন। গীতা প্রভৃতি পড়েন। অর্থাৎ মুসলমান গুরুর কাছে দীক্ষাপ্রাপ্ত এঁরা একদল হিন্দু। ইনি খুব চমৎকার লোক।[৪১০]

পরদিন ক্ষিতিমোহন তীর্থদর্শনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন তিন বন্ধুর সঙ্গে। একজন জাপানিভাষা-জানা ভারতীয় বন্ধু, আর দুজন তরুণ জাপানি বন্ধু, এঁরা অধ্যাপক। ক্ষিতিমোহন লিখেছেন :

১৯২৪ সালে ৮ই জুন তারিখে আমি বিশেষ করিয়া জাপানে কোয়াসান তীর্থ দেখিতে গিয়াছিলাম। সেখানে পর্ব্বতের চূড়ায় নাকি দশ হাজার মন্দির আছে। ...কোয়াসান হইল জাপানী বৌদ্ধদের গয়া কাশী। এই তীর্থের আদিগুরু কো-বো-দাইশি ছিলেন তান্ত্রিক সাধক। তাঁহাদের স্থণ্ডিল ও যন্ত্র দেখিলাম বাংলার সঙ্গেই মেলে। তিনিও এই দেশীয় বিশুদ্ধ তন্ত্রমতেই দীক্ষিত। এখানে লোকেরা পরলোকগত আত্মীয়স্বজনের শ্রাদ্ধ করেন এবং অস্থি পবিত্র কোয়া নদীতে নিক্ষেপ করেন। তাহার পরে সেখানে যে কাষ্ঠ প্রোথিত করেন তাহা এই আমাদের দেশেরই বৃষকাষ্ঠ। তাহাতে যে-সব অক্ষর লিখিয়া দেন তাহাও আমাদের দেশেরই মত নিজেরা তাহা বুঝেন না।[৪১১]

পরে বঙ্গদেশের ধর্ম সংস্কৃতি প্রভৃতির নানা ধারা কীভাবে এশিয়া মহাদেশের এত দূর দূর দেশে প্রসারিত হয়েছিল তার দৃষ্টান্ত রূপে জাপানের এই-সব চাক্ষুষ অভিজ্ঞতার উল্লেখ করেছেন ক্ষিতিমোহন তাঁর লেখায়। কোয়াসানতীর্থটি বিশেষভাবে দেখা হলেও আরও বেশ কয়েকটি তীর্থ ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মঠও দেখতে গিয়েছিলেন। তবে বোধ হয় সবচেয়ে কষ্ট হয়েছিল অতি দুর্গম পথ পার হয়ে কোয়াসান পৌঁছোতে। অবশ্য পৌঁছোবার পরে সব কষ্টের অবসান। যা দেখলেন, যে দুর্লভ অভিজ্ঞতা হল, তাঁর মতো বহুদর্শী মানুষের পক্ষেও তা অনুপম। সময়াভাব সত্ত্বেও চিঠিতে বেশ খানিকটা বর্ণনা পাব :

আমি যে তীর্থেই যাই সে তীর্থই ৩০০০/৪০০০ feet উঁচু পাহাড়ের উপরে। এরা এমন ধার্ম্মিক যে সর্ব্বত্র রেল ট্রাম করেছে, পাহাড়ে করে নি। কাজেই সবই হেঁটে হেঁটে উঠতে হয়েছে। প্রাণ যায় আর কি। যেদিন Koyasan বলে মহাতীর্থে উঠি সেদিন ১টায় তার তলায় পৌঁছে—৬টা পর্য্যন্ত বৃষ্টিতে ও চড়াইতে ভিজে আধমরা হয়ে পৌঁছলাম।.

Koyasan চমৎকার স্থান ২ পর্ব্বতের উপর Shillongর মতন একটি Plateau [.] অধিত্যকা। তাতে প্রায় ২৫০ মন্দির। কি বিরাট তার প্রাঙ্গণ ও কি চমৎকার সে স্থান। [ ] দেখলেই আমাদের দেশের তীর্থ মনে হয়। আগে এই তীর্থে নারীদের আসবার নিয়ম ছিল না—এখন আসেন তীর্থযাত্রী বোধহয় নারীই বেশী। তীর্থযাত্রীরা সব সাদা রঙ্গের বস্ত্র গায়ে প্রতি মন্দিরে গিয়ে সেই দেবতার নাম ছাপ দেয়—তাতে লাল ও কালো ছাপের নামাবলী সুন্দর হয়ে উঠে। মাথায় একটি বস্ত্র বাঁধে—ঠিক পাগড়ীর মত। ভারত হতেই বোধহয় এই শিক্ষা। হাতে একটি লাঠী তার মাথায় ত্রিশূলের মত আঁকা আছে তাতে অনেক আংটী ঝোলানো।* তাই পরে স্নাত শুভ্র যাত্রীর দল তীর্থদর্শনে চলেছে। প্রতি মন্দিরে গিয়ে ধূপ ও দীপ দিয়ে হাতে জপমালা গলায় কাঠের ও তুলসীর মালা নিয়ে নমো নমো বলে মন্ত্রপাঠ করচে। দেবতাকে জল দিয়ে স্নান করাচ্চে—জপ করচে।

চিঠিতে আংটি-ঝোলানো ত্রিশূল আঁকা আছে।

Koya san থেকে নামবার দিন সবাই দুঃখী। ভোর পাঁচটায় প্রধান পুরোহিত মন্দিরের আরতি করে আমাকে আশীর্ব্বাদী ফুল ও কবচ দিলেন। Akizuki আমার সঙ্গে চললেন—আমরা ৪ জন যাত্রী। আমার একটি ভারতীয় বন্ধু—ভাল জাপানী বলেন ও ২ টি জাপানী তরুণ Professor বন্ধু। তখনও প্রভাত—পর্ব্বতের শীত ভাঙ্গে নি, লোক-চলাচল সুরু হয় নি। তীর্থ সীমাতে এসে একটি পর্ব্বত চড়াই—আমি বল্লাম 'আপনি এবার যান।' তার এত স্নেহ আমার প্রতি হয়েছে যে বল্লেন 'চড়াইটা উঠি'—। উঠে একটি মন্দির, এই পর্য্যন্তই পূর্ব্বে নারীরা আসতে পেতেন। এইখানে তীর্থের বাহিরের সীমা। এখানে প্রকাণ্ড বুদ্ধ মূর্ত্তি, মঞ্জুশ্রী শোকহরণ অবলোকিতেশ্বর মূর্ত্তি। এখানে বহুক্ষণ তাকে বিনয় করে বিদায় দিলাম। দেখলাম শোকহরণ মূর্ত্তির কাছে দাঁড়িয়ে "নমো নমো অমিতাভ" বলে নমস্কার করচেন ও চক্ষু মুছচেন। কয়দিনের পরিচয়? আমি* তিনি জ্ঞানী সন্ন্যাসী। সংসারে কেউ নেই। তাঁর এই মায়া কেন? যতদূর নাবচি দেখচি ঐ মূর্ত্তির কাছে স্তব্ধ মূর্ত্তি সাধু দাঁড়িয়ে তাঁর নমস্কার করচেন। বহুক্ষণ পর পর্ব্বতের গা ঘুরলে পর আর তাঁকে দেখা গেল না—কতক্ষণে সেদিন মন্দিরে ফিরেছেন—আর কেমন করে সেদিন তিনি দেবপূজা সেরেছেন তা কে জানে?

এই Akizuki আমাকে কি দৃষ্টিতে দেখেছেন বলতে পারি নে। সদা আমার সঙ্গে রয়েছেন—রাতে আমি শুয়ে ঘুমানো পর্য্যন্ত আমার পাশে বসে আছেন। মহাপণ্ডিত, শান্ত স্তব্ধ লোক। বল্লেন ভারতে একবার তীর্থদর্শনে যাব। হায়, সেখানে সব মন্দিরের দ্বার তাঁর কাছে রুদ্ধ। এ কথা বলতেও লজ্জা হোলো। বার বার আমাকে বল্লেন "আবার আসবেন জাপানে, এখানে এসে থাকবেন—সস্ত্রীক এসে থাকবেন, আমরা থাকবার সব ব্যবস্থা করে দেবো।"

যাক Koya sanর মায়া কাটিয়ে ১০ই জুন নেমে এলাম। ৮ মাইল নীচে নামবার পর Motor পাবার মত জায়গা এলো। মাঝে হেঁটে চল্‌চি—আর দলে দলে বৃদ্ধ যুবা পুরুষ মেয়ে উৎসাহদীপ্ত হয়ে দেবতার নামে জয়ধ্বনি করে—গায়ে নামাবলী মাথায় নামের চাদর, হাতে ত্রিশূললাঠী—তাতে আংটী ঝোলানো। গলায় তুলসীর মালা—আনন্দে চলেছেন। আমাকে দেখে অনেকে নমস্কার করচেন। সন্ন্যাসী বা কিছু ভাবচেন। এক জায়গায় বুদ্ধের পদচিহ্ন গয়ার মত। পথে অগণিত ছোট ছোট মন্দির সেখানে ফুল পয়সা যাত্রীরা দিচ্চে—ঠিক আমাদের দেশের তীর্থস্থান—একটুও ভেদ নেই। সিন্দুর লেপা দেবতাও আছেন।

আধা নেমে "কামিয়া" নামে গ্রাম—এখানে দেখি মাছ বিক্রী হচ্চে। Koyasan তীর্থে মাছ মাংস প্রবেশ করতে পায় না। তবে সব তীর্থেই মেয়েরা এখন যায়। Kamiyaতে অনেক দোকান। এখানে একটু বসলেই চা এনে দিলে—ফল দিলে—উঠবার সময় কিছু দিলাম। এই নিয়ম। মেয়েদের এইভাবে কিছু উপায় হয়।

মেঘ ও রৌদ্র ক্রমাগত চলাচল করচে—আর পাইন বনের মধ্যে নির্জ্জন পথ বেয়ে চল্‌চি। ঝিঁ ঝিঁ [.] মত ও মাঝে মাঝে পাখীর গান, ছায়া ও ঝরনার শব্দ—আর নামচি।

বেলা ৯টায় তলায় পৌঁছে—একস্থানে থামতেই চা দিলে। এই চা মানে গরম জল—একটু সবুজ পাতা ভিজান—চিনি বা দুধ নেই। তাই খেয়ে Motorএ উঠে ষ্টেশনে গেলাম।[৪১১]

এবারে তেন রিকিয়ো নামে এক বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রধান মঠ দেখতে যাওয়া হল। ক্ষিতিমোহনের যেমন স্বভাব, তাঁর চিঠিতে এই সম্প্রদায়-পরিচিতি অল্পবিস্তর জায়গা নিয়েছে। আমাদের দেশেরই মতো এঁদের মন্দিরে আরতি ও ভোগ দেওয়ার রীতি, সংগীত-বাদ্যযন্ত্র-নৃত্য সহযোগে এঁদের উপাসনা। তার চেয়েও বেশি যা উল্লেখ্য মন্দিরে দেবমূর্ত্তির

* এখানে কোনো শব্দ লিখতে গিয়ে বাদ পড়েছে।

স্থলে আছে একটি আয়না, যার ভিতর দিয়ে ভক্ত দেখেন আপনাকেই। ভক্তরা যে কী অমানুষিক পরিশ্রমে প্রধান মন্দিরের আয়তন বাড়ানোর কাজ স্বহস্তে করছেন, তা দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন—সে প্রসঙ্গও চিঠিতে এল। ক্ষিতিমোহন লিখলেন :

> এখানে Ten rikyo নামে এক প্রকাণ্ড সম্প্রদায় তাদের প্রধান মন্দির। নেবেই এক হোটেলে জাপানী খাদ্য অর্থাৎ কাঁচা মাছ দিয়ে ভাত কাঠি দিয়ে খেয়ে মন্দিব দেখতে গেলাম। মন্দিরে আমাকে খুব আনন্দে গ্রহণ করলো। চা খাবার দিলে। তাদের উপাসনা দেখলাম—তাতে নৃত্য গীত ও নৈবেদ্য উপহার। বাদ্য বীণা ডমরু খুব বাজে। তাঁরা তাদের বার্ষিক উৎসব দেখতে ১২ই তারিখে Dai ni chi Dai নামক স্থানের মন্দিরে নিমন্ত্রণ করলেন।
>
> এই সম্প্রদায় Miki নামে একটি নারীর প্রতিষ্ঠিত। তাঁর শিক্ষা দীক্ষা ছিল না—তিনি ভগবানের কাছে প্রত্যাদেশ পেয়ে এই ধর্ম্ম করেন। এতে খুব উচ্চ শ্রেণীর লোক কম, তবু অনেক শিক্ষিত যুবক ও যুবতী, বৃদ্ধ বৃদ্ধা, বালক বালিকা এই ধর্ম্মে আছে। এরা বড় উৎসাহী। ১০ লক্ষের উপর এদের ভক্তসংখ্যা—৬০০০ মন্দির—৫০টি শাখা—এখন Tham baichi তে তাঁরা মন্দির বড় করচেন—হাজার হাজার শিক্ষিত যুবক যুবতী—সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত মাটি খুঁড়ে পাথর টেনে মন্দির তৈবীর সহায়তা করচেন। তারা খাবার পর্য্যন্ত বাড়ী হতে আনেন। তাদের মুখের উৎসাহ ও sacrifice দেখে স্তম্ভিত হয়েছি। মোটকথা জাপানে ধর্ম্মটা জ্যান্ত জিনিষ। যা আগে মনে করি নি।
>
> এদের উৎসবে আমাদেব বিশেষ করে নিমন্ত্রণ করলেন। মেয়েরা আমাদের সেবার ভার নিলেন। ভাষা বুঝি না—দোভাষী বুঝিয়ে দিচ্চে—তবু তাদের বিদেশী অতিথির প্রতি ভক্তি অসাধারণ। আমাদের দেশের মন্দিরে নিয়ে গেলে কি এদের দেখাতে পারি?
>
> তারপর মেয়েরা বীণা ও জাপানী সেতার বাজাতে লাগলেন—পুরুষেরা বংশী ও দুন্দুভি (তবলার মত) বাজাতে লাগলেন—আর সংগীত ও নৃত্য চল্লো। তাদের আরতি ও ভোগ দেবার পদ্ধতি আমাদেরই মত। মন্দিরে দেবতা নেই—একটি "আরসী"—অর্থাৎ আপনার স্বরূপ দেখো।[৪১৩]

যাওয়ার আগেই খেয়েছিলেন, পেট ভরা ছিল, তাই এখানে কেবল ফল খেলেন এবং বাড়ি ফিরেই এক নাটক দেখতে গেলেন। সেই নাটক দেখার অভিজ্ঞতার বর্ণনাও চিঠিতে পাই :

> এদের নাটক এখন বিলিতী ধবনের হয়েছে। তবে পুরাতন নাটক দেখতে গিয়েছি বলে প্রাচীন সাজসজ্জা দেখলাম। দেখলাম—ভারতের প্রাচীন সম্মুখে কামানো পিছনে শিখা সব মূর্ত্তি। তারা Samurai—অর্থাৎ সমরধর্ম্মা জাতি। বুদ্ধমূর্ত্তি স্তব আরতি পাঠ—এসব কথায় কথায় আছে। Sceneটা একটু বেশী। বর্ত্তমান নাটকে মেয়েদের ন্যাকামিই যেন actingর প্রধান উপাদান। সবাই acting করছে না ন্যাকামি করচে। পুরুষ বীর হলেই—যাত্রার দলের ভীমের মত গম্ভীর বাজখাঁই সুরে কথা বলে।
>
> যুদ্ধ তলওয়ার নিয়ে করতে করতে stageএর বাইরে দর্শকদের মধ্যেও করে এবং তাদের ভেতর দিয়ে বাইরে যায়—যাত্রারই মত। এই হোলো পুরাতন প্রথা।[৪১৪]

১৬-১৭ জুন আর-এক জায়গায় যান। চিঠিতে লিখেছেন :

> গত ২ দিন Suwa Yama বলে এক পাহাড়ে বেড়াতে গেছি। চমৎকার সুন্দর পাহাড়। উপত্যকা ঝরনা Pineর বন—নির্জ্জনতা পাখীর ডাক বায়ুর ধ্বনি ঝিঁ ঝিঁ সবই মনকে ব্যাকুল করে।[৪১৫]

কোয়াসানতীর্থের অনবদ্য অভিজ্ঞতার মধ্যে একটা ব্যাপার বড়োই বিশ্রী মনে হয়েছিল। আগে কোনো চিঠিতে চিনে স্নানঘরের অপরিচ্ছন্নতার উল্লেখ করেছেন। কিন্তু জাপানে যে স্ত্রী-পুরুষে একত্রে বিবস্ত্র হয়ে স্নান করার পুরোনো রীতি আছে, কোয়াসানে গিয়ে সরাসরি তার মুখোমুখি হয়ে তিনি দারুণ অস্বস্তিতে পড়েছিলেন। কিরণবালাকে লেখা চিঠিতে প্রসঙ্গটা আছে। সেদিন যা ভীষণ বিড়ম্বনা বলে মনে হয়েছিল, এতদিনের ব্যবধানে আজ সেটা আমাদের কাছে একটু হয়তো বা কৌতুককর মনে হবে :

> Koya sanর প্রতি মন্দিরে আমাকে বিশেষ করে নিমন্ত্রণ করেচে—আমি তাদের সঙ্গে থেকেছি খেয়েছি। সবই ভাল—কেবল বিপদ স্নানে।
>
> স্নানের ঘরে বড় বড় চৌবাচ্চা। ঘরে ঢুকে সব ল্যাংটো হয়ে স্নান করচে—এক এক টবে ৮/১০ জন নেবেচে। প্রথমে টবের বাইরে গরম জল ঢেলে সাবান মেখে স্নান তারপর গরম জল দিয়ে স্নান করে—টবে নামচে। পুরুষ ও মেয়েরা একই টবে স্নান করে। পূর্ব্বে সহরেও এই নিয়ম ছিল—এখন আইনে উঠিয়েছে—কিন্তু গ্রামে আছে। আমি অনেক বলে একলা স্নানের বন্দোবস্ত করলাম—তবু দেখি আমার ঘরে কয়জন স্নান করতে এলেন। এবং আর মেয়েরা ল্যাংটো হয়ে ওর মধ্যে দিয়েই অন্য ঘরে চলেছে। এতে এদের খারাপ বোধ হয় না। কিন্তু ভারতের লোকের প্রাণান্ত। কাজেই সেদিন কোনোমতে পালিয়ে—তারপর থেকে আমার মুখ ধোবার ঘরে বরফের মত জলে Sponge করচি। তারপর Rev Kizuki নামে এক পুরোহিত আমার দুঃখ দেখে নিজে বাইরে দাঁড়িয়ে লোক সরিয়ে রেখে আমার স্নানের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। তাতেও সঙ্কোচ হয়, কোনোমতে শীঘ্র স্নান সেরে নিই।[৪১৬]

আর-একটা ব্যাপারে খুবই অসুবিধা ভোগ করেছিলেন, খাওয়াদাওয়ার বড্ড কষ্ট হয়েছিল। কোনো কোনো চিঠিতে আমরা তার আভাস পেয়েছি। যেন খুব গোপন কথা জানাচ্ছেন যা আর কাউকে বলা চলে না, এইভাবে একমাত্র কিরণবালাকেই লিখেছেন 'চীনা খাদ্য যা তা'। লিখেছেন : 'এখানে চীনা হোটেল—দিন রাত্রি চীনা খাদ্য খাইতেছি। কি যে দুঃখ তা আর কি বলিব। কবে যে নিষ্কৃতি কে জানে। এ খবর কাকেও দিও না।'[৪১৭] জাপানি খাবারও তথৈবচ। আগে একটা চিঠিতে লিখেছিলেন এক হোটেলে তাঁরা কাঁচা মাছ ও ভাত কাঠি দিয়ে খেয়ে মন্দির দেখতে গেলেন। এই চিঠিতেই পরে যেন একটুখানি আত্মপ্রসাদের সুরেই বলতে শুনি : 'তখন জাপানী খাদ্য খেতে আরম্ভ করেছি। কাঠি দিয়ে খাই—এবং কাঁচা মাছও খাই। এদের মশলা দিয়ে। যার গন্ধ পেলে তোমরা বমি করবে। দায়ে ঠেকে করতে হয়। তবে কাঁচা মাছের গন্ধ খুব কম—বিশেষ জাতীয় মাছ—ও খুব ধুয়ে খেতে দেয়।'[৪১৮]

এ সময়কার যে কয়টি চিঠি হাতে এসেছে তাতে ব্যক্তিগত ঘরোয়া কথা এবং খবরাখবরও বেশ কিছু আছে। পথে কখনও স্ত্রীপুত্রকন্যা বা অন্য আত্মীয়স্বজনের চিঠি হাতে পেয়ে প্রাপ্তিস্বীকার করেছেন : 'আজ তোমার একখানা পত্র পাইলাম। Singapur ঘুরিয়া আসিয়াছে। ...রেণু অমিতা লাবু ও কঙ্করের পত্র পাইয়াছি।' আবার লেখেন : 'তোমার বাবার পত্র পাইয়াছি। উত্তর পরে দেব। তোমার তুলী কেনা হইয়াছে।' 'কখনও লেখেন কঙ্করের পড়ার কি শেষ ব্যবস্থা হোলো—এবং কি result হোলো—তাও তো লেখো

নাই। ছেলে পিলের লেখা আর কোনো পত্র পাচ্চি না।' আঁকার তুলি ছাড়াও কেনাকাটার খবর আর একটুও দেন—বেশ সস্তায় ভালো জিনিস পেয়ে স্ত্রীর জন্য সোনার ব্রেসলেট ও ঘড়ি কিনে মনটা খুশি। কিরণবালার চিঠিতে বাড়ির খবর, শান্তিনিকেতনের নানা খবর, এবং বলা বাহুল্য সন্তানদের খবর থাকে। ক্ষিতিমোহনের খুব ব্যস্ততার মধ্যে লেখা চিঠিতেও নানা খবরের সঙ্গে কিরণবালার দেওয়া খবরের ভিত্তিতে মন্তব্য বা প্রশ্ন থাকে। তার মধ্যে শান্তিনিকেতনের জলকষ্ট বা সন্নিহিত কোনো জায়গায় আগুন লাগার সংবাদও বাদ যায় না, বাড়ির বাগানের প্রসঙ্গও এসে পড়ে। কখনও লেখেন : 'লাবুর গলার চিকিৎসা যত্ন মত কোরো। ওর গাহিবার শক্তিটা যেন নষ্ট না হয়।' একটি চিঠি শেষ করবার আগে ঈষৎ অতৃপ্তি নিয়ে যোগ করেছেন :

> এবারকার পত্র লম্বা হলেও কেমন একটা খাপছাড়া ভাব আছে যে তাতে ঘটনার পরম্পরা ঠিক দিতে পারি নি।
>
> মনের কথা যখন যেমন আসে—তা যদি সময় হারাই তবে আর লিখতে পারি নে। মুস্কিল এই জাপানেব কয়দিন বড় নানা স্থানে টানাটানি করে সময় বড় কম পেয়েছি। আজ ডাক যাবে। এখন বেলা ২।। টা—৪টায় গুরুদেবের বক্তৃতা—তারপর একটি জাপানী ভক্ত বৌদ্ধের বাড়ী যাব। ৮টায় আর একটি সভা। এখন বল লিখি কেমন করে। ৩টার সময় একজন বৌদ্ধ পুরোহিত আসবেন। তাঁব কাছে অনেক জানবার আছে। লিখতে হবে। আশ্রমে সনৎকুমার নামে কার বিয়ে হোলো গার্গীদেবীর সঙ্গে—বুঝলাম না। এখানে সব ভাল। আশা করি তোমরা ভাল আছ।[৪১৯]

দর্শনীয় স্থানে গিয়ে অনেক সময় তাঁর মন কেমন করে কিরণবালার জন্য, কিন্তু আবার সেই সঙ্গেই লেখেন অন্য এক ভাবনার কথা, 'আবার যখন খাবার বা স্নানের এই দুর্গতি দেখি, তখন ভাবি না এসে ভালই করেছো।' একবার কিরণবালা কী এক স্বপ্নের বিবরণ লিখেছিলেন চিঠিতে। তার মধ্যে কি জাপানি সতীনের প্রসঙ্গ কিছু ছিল? উত্তরে ক্ষিতিমোহন যা লিখলেন সেটুকু বেশ গুরুগম্ভীর। জাপানে প্রবাসী ভারতীয় সমাজটাকে যেমন দেখছেন তারই অল্প একটু পরিচয় রইল তাতে :

> তোমার অদ্ভুত স্বপ্নের কথা পড়লাম। জাপানে এসে এই পত্র হাতে পড়লো। জাপানে ভারতের সতীন অনেক আছে। এখানকার মেয়েদের সেবার কর্ম্ম ও নিপুণতার এমন একটি সৌকুমার্য্য আছে যে তা অনেককে ভুলিয়ে রেখে দেয়। কিন্তু তাদের মধ্যে কাউকে বড় সুখী দেখলাম না। তবে ২/৪টি লোক আছেন যারা যথার্থভাবে বিবাহিত—তাঁরা কেউ কেউ বেশ ভাল আছেন। তবে জাপানেও এমন বিবাহ নিন্দিত—এবং সমাজস্বাধীনতা থাকলেও এমন বিবাহকে ও তার সন্তানদের জাপানেব সমাজ ভাল স্থান দেয় না।[৪২০]

প্রবাসপর্ব শেষ হয়ে আসছে। এলমহার্স্ট, ড. নাগ ও নন্দলাল বসুকে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ১৮ জুন কোবে ফিরে এলেন। তবে তাঁরা ফেরবার পরেও ক্ষিতিমোহন আরও কয়েকটা দিন পূর্ব-উল্লিখিত বন্ধুদের কাছেই ছিলেন। চিঠিতে লিখেছেন : 'গুরুদেবরা Tokyo হতে ফিরে এসেছেন। তবে আমরা যে বাড়ীতে আছি সেখান ছেড়ে তাঁদের সঙ্গে যোগ দিতে যাই নি।'[৪২১] খবর পাওয়া যাচ্ছে : 'আমরা ২২ জুন অর্থাৎ রবিবার রওয়ানা হব। গুরুদেব

এখন সোজা যেতে চাচ্ছেন। আবার Indo China Java মলয় যাবার কথাও আছে—এখন কিসে যে কি হয় বুঝতে পারি নে। জাহাজ সাংঘাই হংকং থেমে যাবে। হংকং থেকে হয়তো Dr. Sun Yat San সঙ্গে দেখা করে যেতে হবে।'[৪২২] অর্থাৎ তখনও ইন্দোচীন, জাভা, মালয় প্রভৃতি জায়গায় যাওয়ার পরিকল্পনা রবীন্দ্রনাথের মনের মধ্যে ঘুরছিল, যদিও তিন মাস বিচ্ছেদের পরে স্বদেশের তীরভূমির টানটা ভিতরে ভিতরে তাঁকে দুর্বল করে দিচ্ছিল বোঝা যাচ্ছে। শেষপর্যন্ত অবশ্য সেই ফিরতে-চাওয়া মনটারই জয় হল। চিঠি যখন লিখছেন তখনও পর্যন্ত যেটুকু দেরি বা অনিশ্চয়তা ছিল তার কথা ভুলে ক্ষিতিমোহন ভাবছিলেন : 'এখন চীনের সমুদ্রও দোলা দেবে—বঙ্গাসাগরে তো কথাই নেই'—সেই সাগরদোলায় দুলতে দুলতে কলকাতা বন্দরে এসে জাহাজ ভিড়ল ২১ জুলাই ১৯২৪। যাত্রা অবসান।[৪২৩]

কোমলে-কঠোরে মেশানো এক ব্যক্তিত্ব

প্রথম প্রথম বিশ্বভারতী বলতে শান্তিনিকেতনের উচ্চতর বিদ্যাচর্চা ও গবেষণার নতুন বিভাগকে বোঝাত। তার পর আশ্রমবিদ্যালয় অংশ বিশ্বভারতীর পূর্ববিভাগ এবং নব-প্রতিষ্ঠিত উচ্চশিক্ষা বিভাগ তার উত্তরবিভাগ নামে পরিচিত হল। তখন সমগ্র শান্তিনিকেতন আশ্রমকেই স্পর্শ করল বিশ্বভারতীর প্রসারিত সীমানা। উত্তরবিভাগে তার নিজস্ব ধারায় পরীক্ষা-নিরপেক্ষ পড়াশোনার আয়োজন। যে সময়ের কথা এখন আমরা বলছি সেসময়ে বিশ্বভারতীর পূর্ব ও উত্তরবিভাগের নাম যথাক্রমে হয়েছে পাঠভবন ও বিদ্যাভবন। আর এ দুয়ের মাঝখানে শিক্ষাভবন নামে আর-একটি স্তর রাখা হয়েছে, সেখানে কলেজ-স্বগোত্রীয় নির্দিষ্ট পাঠক্রম অনুসরণে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পরীক্ষা দেওয়ার জন্য ছাত্রছাত্রীরা প্রস্তুত হতে পারেন। অল্পে অল্পে পরিবর্তনের ঢেউ এসে লাগছে, প্রশাসনিক নিয়মকানুন সুনির্দিষ্ট আকার নিতে চাইছে। এ-সব সত্ত্বেও আশ্রমের আবহাওয়াটা আগের মতোই মায়াময়। অতি শান্ত নিস্তরঙ্গ পরিবেশ। ছাত্ররা শিক্ষকরা সকলেই আবাসিক। বিদ্যাদান-গ্রহণের হিসাব মাপে না সময়নির্ধারক যন্ত্র, শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষাগুরুদের দ্বার খোলা সর্বদাই। মাথার উপরে আছেন আশ্রমগুরু রবীন্দ্রনাথ, সদা সজাগ, সদা সক্রিয়, সদা সৃষ্টিশীল। বিদেশিরা অনেকেই আসছেন, আসছেন ভারতের নানা প্রদেশ থেকে ছাত্ররা। সবচেয়ে বেশি আসছেন গুজরাত প্রদেশের ছাত্র। এর পিছনে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব তো আছেই, ১৯২০ সাল থেকে তিনি কয়েকবারই পর পর গেলেন গুজরাতে, গুজরাতের মানুষ শুনল তাঁর কথা, তাঁর বিশ্বভারতীর কথা। সেইসঙ্গে ক্ষিতিমোহনের প্রভাবও সামান্য নয়। গুজরাতে তাঁর জন্য শ্রদ্ধা প্রীতি ও বন্ধুত্বের আসন পাতা। অনেক কালের পরিচয়, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেও গেলেন। তা ছাড়া ১৯২৫-৩০ সালের মধ্যে দাদূ-সাহেবের জীবনের উপকরণ ও তাঁর গান সংগ্রহ করতে কয়েকবারই গুজরাত ও রাজস্থানে

তাঁকে যেতে হল। সে কারণেও সেখানকার মানুষজনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বেড়েছিল। শুধু দাদূসাহেব কেন, সন্তদের জীবনসাধনা ও তাঁদের বাণীর সন্ধান করতে উত্তর ও পশ্চিম ভারতের নানা জায়গায় তো তাঁকে ঘুরতে হয়েছে। তাঁর ব্যক্তিত্বে আকৃষ্ট হয়ে অনেক গুজরাতি পরিবার তাঁদের সন্তানকে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে পড়তে পাঠাচ্ছেন। রবীন্দ্রনাথকে তাঁর ১৯২৬ সালের এক ভাষণে বলতে শুনি : 'আজ আমাদের আশ্রমে প্রায় ত্রিশ জন গুজরাটের ছেলে এসে বসেছে।'[৪২৪]

শান্তিনিকেতন-বিশ্বভারতীর জীবনের সঙ্গে অচ্ছেদ্য বাঁধনে বাঁধা ক্ষিতিমোহনের জীবনের ছন্দ। স্বভাবটা বরাবরই শৃঙ্খলাপরায়ণ। আবাল্যের অভ্যাসমতো প্রতিদিন শেষরাত্রে শয্যাত্যাগ করেন। অন্ধকার থাকতে ভ্রমণে বেরোন, কিরণবালাও সঙ্গে থাকেন। আশ্রমের সীমানা ছাড়িয়ে হাঁটতে হাঁটতে অনেকটা চলে যান। তার পর পূর্বদিকের আকাশে যখন ভোরের আলো ফোটে, তখন খোয়াইয়ের নির্জন প্রান্তরে দুজনে পূর্বাস্য হয়ে বসেন। সূর্যোদয় দেখে ঘরে ফেরেন। মীরা দেবী লিখেছেন :

> ঠাকুরদা খুব বেড়াতে ভালোবাসতেন। সকালে উঠে রোজ খানিকটা হেঁটে আসা চাই, তার কোনো ব্যতিক্রম হবার জো নেই। ঠানদিকেও তখন ডেকে নিয়ে যেতেন। ঠাকুরদার সঙ্গে অত তাড়াতাড়ি হাঁটতে ঠানদি নিশ্চয়ই হাঁপিয়ে পড়তেন, এটা অবিশ্যি আমার নিজের অনুমান। আমাদের ঠানদি হচ্ছেন পাতলা ছোট্টখাট্টো মানুষটি, ঠাকুরদার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পারবেন কেন?[৪২৫]

কিরণবালা পারতেন অবশ্য। জীবনের যে মুহূর্তগুলি একান্তভাবে নিজস্ব, যখন আপন অন্তর্লোকে অবগাহন করার শুভক্ষণটি এসেছে, সহধর্মিণীকে কাছে পেতে চেয়েছেন ক্ষিতিমোহন। আমরা দেখেছি মাঘোৎসবের সময় কিরণবালা দূরে থাকলে কত ব্যাকুল হয়েছেন, বাস্তবিক ব্যবধান সত্ত্বেও যাতে মানসিক যোগ অনুভব করতে পাবেন সেজন্য পূর্বাহ্ণে স্ত্রীকে লিখেছেন। তেমনই তিনি চাইতেন সূর্যোদয় বা সূর্যাস্তক্ষণে দূরে নির্জনে গিয়ে উন্মুক্ত প্রান্তরে দুজনে শান্ত মনে বসবেন। তবে সমমনস্ক সহশিক্ষকরাও কেউ কেউ ক্ষিতিমোহনের বেড়ানোর সময় সঙ্গী হতেন, নানাজনের স্মৃতিকথায় এই প্রসঙ্গে হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের নাম পাওয়া যায়।

যাই হোক, বেড়িয়ে ফেরবার পথে কারো না কারো সঙ্গে দেখা হয়ে যেত, অনেক সময় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেও দেখা হত। তিনি তখন আশ্রমের উত্তরপ্রান্তে একটি কুটিরে বাস করেন। কিরণবালা অবশ্য স্মরণ করেছেন উত্তরায়ণগৃহবাসী রবীন্দ্রনাথকে, শেষজীবনে যখন তাঁর গতিবিধি অনেকটা সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে :

> ...তখনো দেখা যেত উত্তরায়ণের ভিতরের রাস্তায় ধীরভাবে তিনি পায়চারি করছেন। স্বামীর সঙ্গে আমি গোয়ালপাড়া বা খোয়াইয়ের তালপুকুরের দিকে অনেক সময়ে প্রাতঃভ্রমণে গিয়েছি। যাওয়া বা ফেরার পথে দেখা হয়ে গেলে গুরুদেব এগিয়ে আসতেন। উত্তরায়ণের কোনো বেড়া বা প্রাচীর ছিল না। চলতে চলতেই আমার স্বামীর সঙ্গে সুন্দর সুন্দর বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। আলোচনার বিষয়বস্তু আমার স্বামী কিছু কিছু বাড়িতে এসে লিখেও রাখতেন।[৪২৬]

ভোরবেলা বেড়াতে যাওয়ার অভ্যাসটা নিয়মিত ছিল বটে, তবে নিয়মের ব্যতিক্রম যে ছিল না এমন বলা চলে না। অথবা সে অভ্যাস অব্যতিক্রমী হয়ে উঠেছিল ক্ষিতিমোহনের আরও বেশি বয়সে। এক সময়ে এমন ঘটনাও বিরল ছিল না যে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এসে হাজির হয়েছেন অধ্যাপকদের কারো গৃহে, হয়তো কোনো উপলক্ষে, বিনা উপলক্ষেই কখনও বা। তেমনই একদিনের কয়েকটি অবিস্মরণীয় মুহূর্ত ধরা আছে কিরণবালার কলমে :

> একটা দিন, ভোরের আকাশ সবে তখন রাঙা হয়ে এসেছে ; এমন সময়ে আমাদের পাশের হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে গিয়ে, গুরুদেব তাঁকে নিয়ে আমাদের বাড়ির সামনে এসে উপস্থিত। অত ভোরে হঠাৎ তাঁর গলা শুনে আমরা চমকে উঠলাম। তিনি বলছেন :
>
> উষা সমাগত
> রবির উদয় হয়েছে
> ক্ষিতির দ্বারের সম্মুখে
> ক্ষিতি কি জাগ্রত নন।[৪২৭]

বেড়িয়ে ফেরার পথে ক্ষিতিমোহন যেমন খানিকক্ষণ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কথা বলে আসতেন, তেমনই আবার কোনোদিন দিনেন্দ্রনাথের বাড়িতে যেতেন। প্রথম দিন থেকেই 'দিনুসাহেবের' সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব। অমিতা সেনের কলমে ছবিটা এইরকম পাই :

> প্রতিদিন সূর্যোদয়ের অনেক পূর্বে শয্যাত্যাগ করেন আমার বাবা। অন্ধকার থাকতে বেরিয়ে পড়েন হাতে লাঠিগাছটি নিয়ে। দিগন্তবিস্তারিত মাঠে খোয়াইয়ের একধারে নির্জন একটি স্থানে স্থির হয়ে বসে অপেক্ষা করেন সূর্যোদয়ের। ফেরার পথে কখনো উত্তরায়ণে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মাধবীলতা জড়ানো শিমুল গাছটির তলায় বসে আলাপ-আলোচনা করেন কিছুক্ষণ, কখনো বা 'দিনু সাহেব দিনু সাহেব' হাঁক দিয়ে সুরপুরীতে গিয়ে জমিয়ে কিছুক্ষণ গল্প করে কমলা দেবীর হাতের তৈরি সুস্বাদু কিছু খাবার খেয়ে বাড়ি ফেরেন।[৪২৮]

মনে হয় ছুটির দিনেই এ-সবের জন্য যথেষ্ট সময় পাওয়া যেত, কেননা আশ্রমে তো সকালবেলাতেই ক্লাস থাকে। তাই বেড়িয়ে ফিরে সপ্তাহের দিনে বিদ্যাভবনে চলে যান। এখন আর তাঁকে বিদ্যালয়ের ক্লাস নিতে হয় না, যদিও প্রয়োজনে এখনও বিশেষ ক্লাস নেন। শিক্ষাভবন ও বিদ্যাভবনে অধ্যাপনার যথাবিহিত দায়িত্বপালনের পরে নিজের পড়াশোনা ও গবেষণার কাজে বাকি সময় কাটে। বিদ্যাভবনের দোতলায় উঠলে সিঁড়ির মুখে প্রথম ঘরখানা তাঁর। সেই ঘরে তাঁর যাবতীয় বই ও পুথিপত্র থাকে, বাড়িতে থাকে সামান্যই। সেই ঘরে বইপত্রের মাঝখানে মেঝের উপরে বিছানো মাদুরে বসে আপন মনে কাজ করেন। ক্ষিতিমোহনের সে ঘর এখন বিদ্যাভবনের পুথিঘর হয়েছে।

অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রাক্তন ছাত্রদের মুখে ক্ষিতিমোহনের সুদক্ষ অধ্যাপনার বিস্ময়কর প্রশংসা শুনেছিলেন, এ কথা আগে বলেছি। তিনি বলেছিলেন : 'তার একটুও যে অত্যুক্তি নয় তাঁর পূরবী ব্যাখ্যানের কয়েকটি ক্লাসে উপস্থিত থেকেই আমি তার প্রমাণ পেয়েছি।'[৪২৯] 'পূরবী' ব্যাখ্যান কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। দীর্ঘদিন ক্ষিতিমোহন নিয়মিত রবীন্দ্র-সাহিত্যের ক্লাস নিয়েছেন এবং সে ক্লাস ছিল নিয়মের বাইরের ক্লাস। শান্তিনিকেতনের মানুষ অনেকেই সেই সবার জন্য উন্মুক্ত ক্লাসের কথা বলেছেন, যেখানে

নানা বয়সের নানা স্তরের মানুষ আপন প্রাণের টানে এসে হাজির হতেন। হীরেন্দ্রনাথ লিখেছেন :

> রবীন্দ্রনাথ যখন সাহিত্য কিংবা কাব্যালোচনার ক্লাস নিতেন তখন যেমন ছাত্র শিক্ষক কর্মী এবং আশ্রমবাসী স্ত্রী-পুরুষ সকলে উপস্থিত থাকতেন, ক্ষিতিমোহনবাবুর ক্লাসেও তাই হত। আমি সেই ক্লাসে উনিশ-কুড়ি বছরের ছাত্র থেকে সত্তর বছরের বৃদ্ধ বৃদ্ধাকেও উপস্থিত থাকতে দেখেছি। এ ধরনের ক্লাস এক সময়ে শান্তিনিকেতনের একটি বিশেষ আকর্ষণ ছিল।[৪৩০]

মীরা দেবীর স্মৃতিকথাতেও এই ক্লাসের উল্লেখ আছে : 'ঠাকুরদার ক্লাসে তাঁর মুখে বাবার কবিতার ব্যাখ্যা শোনবার জন্যে অনেকেই যেতেন।' এক সময় মীরা দেবী তাঁর ছাত্রী ছিলেন, হয়তো সেই সময়কার কথাই স্মরণ করে এইসঙ্গেই বলেছেন : 'আমাদের "খেয়া" থেকে পড়াতেন ও সহজ করে বুঝিয়ে দিতেন।'[৪৩১] অথবা হয়তো রবীন্দ্র-সাহিত্যের সাধারণ ক্লাসেই 'খেয়া' আলোচনা শুনেছিলেন তিনি। বিশ্বভারতীর যুগেও জ্ঞানচর্চার যে এক সর্বাত্মক লক্ষ্য সামনে রেখে চলবার চেষ্টা ছিল, তাতে বহুদিন আগে লাবণ্যপ্রভা দেবী-মীরা দেবী-সুশীলা দেবীদের পড়াশোনার চর্চার মধ্যে রাখবার উদ্যোগের মতন উদ্যোগের প্রয়োজনীয়তা হারিয়ে যায়নি। যেমন কমলা রায় অল্প বয়সে শান্তিনিকেতনে বধূ হয়ে এসেছিলেন। গ্রামের কিশোরী মেয়েটিকে এখানকার পরিবেশের উপযুক্ত করে তুলতে তাঁর শ্বশুর নেপালচন্দ্র রায় নিজে তাঁকে ইংরেজি পড়াতেন আর ক্ষিতিমোহনবাবুর রবীন্দ্র-সাহিত্য পড়ানোর ক্লাসে পাঠাতেন।[৪৩২] দুপুরের পরে এই ক্লাস বসত আম্রকুঞ্জে কারমাইকেল বেদির সামনে, কখনও বা বকুলবীথিতে। অমিতা সেনের লেখায় খানিকটা আভাস পাওয়া যায় কারা এই ক্লাসটির টানে জড়ো হতেন :

> এই ক্লাসটির একটি বিশেষ রূপ ছিল। ছাত্রছাত্রীদের বৈচিত্র্যমেলায় ক্লাসটি ছিল অনন্য। সাহিত্য অনুরাগী ছাত্রছাত্রী অধ্যাপকরা তো আসতেনই, আশ্রমবাসী গৃহিণীরা, কাষায়বাসধারী বৌদ্ধ ভিক্ষু, প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যদেশী ছাত্র-অধ্যাপক মিলে যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্-এর সার্থক রূপ ধরত। 'মানসী' 'সোনার তরী' 'চিত্রা' 'বলাকা' 'পূরবী' একটির পর একটি কাব্য পড়িয়ে যেতেন বাবা। তাঁর ব্যাখ্যায় কাব্যের রস এতটুকু শুকিয়ে যেত না। যাঁরা তাঁর কাছে রবীন্দ্রকাব্য পড়েছেন তাঁরা আজো তাঁর পড়াবার মাধুর্য ভুলতে পারেন নি।[৪৩৩]

বয়স হল চুয়াল্লিশ। পরনে ধুতি আর ঘরে-তৈরি ফতুয়া, গায়ে চাদর খালি পা ঝোলা হাতে বিদ্যাভবনের দিকে চলেছেন, অথবা মধ্যাহ্নে ফিরে চলেছেন গুরুপল্লির দিকে—শান্তিনিকেতনের আরও কিছু কিছু দৃশ্যের মতো এ দৃশ্যও সেখানকার সব মানুষের চিরকালের চেনা। অপরাহ্ণেও ক্লাস থাকে, তা ছাড়া অনুষ্ঠান-উৎসব-সভা লেগেই থাকে, সুতরাং আশ্রমের মধ্যে আসা-যাওয়ার পথে তাঁর পরিচিত মূর্তিটি চোখে না পড়ে যায় না।

বন্ধুরা অনেকেই আন্তরিক গুণগ্রাহী ছিলেন। ক্ষিতিমোহনের বিদ্যাবত্তা, জ্ঞানানুরাগ, বহু বিচিত্র বিষয়ের প্রতি সজীব কৌতূহল, বৃহত্তর প্রাচীন ভারতীয় উৎসব-অনুষ্ঠান-প্রথা-লোকাচারের পরম্পরা ও উত্তরাধিকার বিশ্লেষণের মুনশিয়ানা অনেক মানুষকেই মুগ্ধ করত, কর্মজীবনের প্রথম পর্যায়ে শান্তিনিকেতনের সমমনস্ক সহকর্মী-বন্ধুদেরও তা বিশেষভাবেই

আকৃষ্ট করত। কবীরচর্চা প্রসঙ্গো এর একটু আভাস আমরা লক্ষ করেছিলাম। পিয়র্সন সাহেবের একটি চিঠি দেখেছি, ১৯১৬ সালে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গী হয়ে তিনি ও অ্যান্ডরুজ যখন জাপানে যান, তখন ১৪ জুলাই ১৯১৬ য়োকোহামা থেকে লিখেছিলেন ক্ষিতিমোহনকে। অ্যান্ডরুজের মতোই ক্ষিতিমোহনের বন্ধুত্ব ছিল পিয়র্সনের সঙ্গো। তিনি বয়সের দিক থেকে ক্ষিতিমোহনের একেবারে সমসাময়িক। কিন্তু ক্ষিতিমোহনের নিজের যখন সুযোগ হল চিন-জাপান ভ্রমণে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গী হওয়ার, তখন স্বল্পায়ু পিয়র্সনের জীবনের অতি সামান্যই বাকি। যাই হোক জাপানভ্রমণকালে রবীন্দ্রনাথ ও পিয়র্সন একটি বৌদ্ধ মঠ দেখতে গিয়েছিলেন, ক্ষিতিমোহনকে লেখা চিঠিতে সেই মঠ-পরিদর্শন ও সেখানে কবির সংবর্ধনার দীর্ঘ বিবরণ আছে। শুরুতে যা লিখেছেন কেবল সেইটুকুর অনুবাদ উদ্ধৃত করলে, বন্ধু সম্পর্কে তাঁর উচ্চ ধারণার পরিচয় পাওয়া যাবে :

> প্রিয় ক্ষিতিমোহনবাবু,
>
> গত কাল আমরা যখন একটি জেন সম্প্রদায়ের বৌদ্ধ মঠ দেখতে গিয়েছিলাম, তখন মনে হচ্ছিল আপনি যদি আমাদের সঙ্গো থাকতেন। যে-সব অনুষ্ঠান সেখানে হচ্ছিল, বেশ অনুভব করতে পারছিলাম আপনি সঙ্গো থাকলে তার অনেকগুলির ব্যাখ্যা করতে পারতেন এবং নিজেও সেগুলির প্রতি প্রবল আগ্রহবোধ করতেন। যে-সব সম্প্রদায় ধ্যানের চর্চা করেন এটি তাঁদেরই একটি এবং জাপানে এই সম্প্রদায়েব অনুগামীর সংখ্যা বিরাট। এই ডাকেই আপনাকে আমি সোজিজি মঠের একটা পরিচিতি-পুস্তিকা আর তাঁদের ধ্যানঅনুশীলন সম্পর্কিত একটা বইয়ের অনুবাদ পাঠালাম।

এমনকী সেই জেন মঠে রবীন্দ্রনাথের অভ্যর্থনার আয়োজন দেখেও পিয়র্সনের মনে হয়েছিল যে সেটা এতই সুন্দর এবং সুসম্পূর্ণ যেন তার পরিকল্পনা ক্ষিতিমোহনেরই করা।[৪৩৪]

এই বন্ধুজন-শংসিত মানুষটি প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় অত্যন্ত সহজ, অনাড়ম্বর। স্নানাহার নিয়মিত বাঁধা সময়ে, ব্যতিক্রম কমই। গ্রীষ্ম-বর্ষা-শীত নির্বিশেষে ঠান্ডা জলে দু-বেলা স্নান, মিতাহার, বিশেষ করে ভাত কম খাওয়ার দিকে বেশ একটু ঝোঁক চিঠিপত্রে চোখে পড়ে। তবে খেতে ভালোবাসতেন—বর্ষাকালে খিচুড়ি, শীতকালে পিঠে-পায়েস। আর পছন্দ করতেন গরমের দিনে তেঁতুল-লেবুপাতা দিয়ে বেলের সরবৎ। একাদশীতে ভাত খেতেন না। সেদিন যে ফলার মাখতেন, বাড়ির সকলকে খাইয়ে তা নিজে খেতেন। সকলের কাছে এটার পরিচিতি ছিল 'একাদশী মাখা'। ড. অমর্ত্য সেন বললেন : 'দাদুর হাতের একাদশী মাখা ঢের খেয়েছি।' তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন কেন করেন একাদশী। ক্ষিতিমোহন বলেছিলেন : 'একটা বদলও হয়, ফল এবং ফলার খেতেও আমার ভালো লাগে। তাছাড়া খুব নিয়মিত একটা দিন সংযম পালন করতেও তৃপ্তি বোধ করি।' বরাবর নিজের কাপড় নিজে ধুতেন।[৪৩৫]

'বাবাকে সকলে কৃপণ বলে জানতেন, আমরাও তাই জানতাম', বলেছেন অমিতা সেন. 'এটা ঠিক, বাবা সংসারের খরচপত্রের ব্যাপারে উদাসীন ছিলেন না'। সংসারও বেশ বড়োই

ছিল। পারিবারিক দায়দায়িত্ব অনেক ছিল, বিশেষত অবনীমোহনের অকালমৃত্যুর কারণে সোনারঙের বাড়ির অনেকটা দায়িত্ব তাঁর উপর এসে পড়েছিল। শান্তিনিকেতনে চাকরি নিয়ে এসে ভাইপোদের কারো কারো জন্য এখানেই লেখাপড়ার ব্যবস্থা করেন। অমিতা সেনের মুখে শুনেছি: 'শুধু তো নিজের ছেলেমেয়েদের নয়, দাদাদের ছেলেমেয়েদেরও একই সঙ্গো মানুষ করেছেন। কেউ কেউ শান্তিনিকেতনেই পড়েছেন, কেউ কেউ আসা-যাওয়া করতেন। পিসিমা পিসতুতো ভাইবোনেরা এসে থাকতেন। মায়ের বাপের বাড়ির থেকেও আসা-যাওয়া চলত।' তাঁর কাছেই শান্তিনিকেতনের সংসারের আরও খবর পাই : 'মোটা ভাতের অভাব হয় নি, মোটা মিলের কাপড় পরেছি। ডিম দুধ প্রচুর খেতাম।' আবার বলেছেন : 'শান্তিনিকেতনের জীবনেও সকলে পেটভরে ভাতডালই খেয়েছি। চিঁড়ে-মুড়ি জলখাবার ছিল, আর পূর্ববাংলার নিয়মে তো তিনবেলাই ভাত খাওয়া—তাই খেয়েছি। শান্তিনিকেতনে দাদারাই কুয়ো থেকে প্রতিদিন জল তুলে রাখতেন। তাঁদেরও কষ্ট করতে হয়েছে। বাবা হিসেবী ছিলেন বলে ঘরে-পরে সকলেই সমালোচনা করেছেন। কিন্তু এ-কথাও সেইসঙ্গো স্মরণীয় যে, যে-টাকার প্রতিশ্রুতি ছিল যখন বাবা এখানকার কাজে যোগ দেন, নিয়মিত সে টাকা তিনি কোনোদিন হাতে পেতেন না। ক্ষিতিমোহন কিন্তু কোনোদিন এ নিয়ে অভিযোগ করেননি। শান্তিনিকেতনের এবং সোনারঙ্গোর সংসার চালানোর ভার তাঁর উপর, ভাইপোদের মানুষ করেছেন, ভাইঝিদের বিবাহ দিয়েছেন, মেয়েদের বিবাহ দিয়েছেন, আর সেইসঙ্গো অল্পস্বল্প অর্থ নিয়মিত সঞ্চয় করেছেন ভ্রমণের নেশায়।'[৪৩৬]

ক্ষিতিমোহনের বরাবরের অভ্যাস ছিল, যখনই বাড়ি ফিরতেন দূর থেকেই ডাক দিতেন —'কিরণ'। গুরুপল্লির সকলেই টের পেতেন—ক্ষিতিবাবু বাড়ি ফিরলেন। কিরণবালাও যে কাজেই থাকুন, ডাক শুনলেই হাসিমুখে দরজায় এসে দাঁড়াতেন। স্ত্রীকে চিঠিতে যেমন সব বিস্তারিত করে লিখতেন ক্ষিতিমোহন, নিজের মনের কথা, অভিজ্ঞতার কথা জানাতেন, তেমনই বাড়িতেও প্রতিদিনকার খুঁটিনাটি নানা কথা দুজনে দুজনকে বলা চাই, আর সাংসারিক কথা তো হতই। দু-একটা ব্যাপারে কিন্তু ক্ষিতিমোহনের অন্যায় জিদ ছিল। মাসের শেষে কারো কাছে কোনো কারণে টাকা বাকি পড়েছে জানতে পারলে রাগ করতেন। কিন্তু কিরণবালা এ ব্যাপারে অনেক সময়ে নিরুপায় হয়ে যেতেন, টাকায় কুলাতে পারতেন না। অমিতা সেন বলেছিলেন : 'মায়ের চোখে জল দেখলে আমরা তখন মনে মনে বাবাকেই দোষী করতাম। তাঁর উপরে রাগ হত। টাকার ব্যাপারে তিনিও যে নিরুপায় ছিলেন তা সে বয়সে বুঝতে পারতাম না।'[৪৩৭]

এদিকে প্রত্যেক ছুটিতেই বেরোনোর আয়োজনটা হতেই হবে। সপরিবারে অনেক সময়, ছাত্ররাও বরাবর কেউ না কেউ সঙ্গো থাকতেন। ছুটি হওয়ার আগে থেকেই পরিকল্পনা করতেন—কিরণবালাকে লেখা চিঠিতে অল্পস্বল্প আভাস মেলে টুকিটাকি আয়োজনের। স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নিয়ে গেলেও 'কিন্তু ওই থার্ড ক্লাসে যাওয়া। কুলি কখনও করতেন না, আমাদেরই মালপত্র বইতে হত।' বয়স এবং স্বাস্থ্য অনুসারে যার যার

বহনউপযোগী মালের বরাদ্দ—সুটকেস-বেডিং তো নয়, পুঁটলি, ঝোলা, কম্বলমোড়া বিছানা, প্রয়োজনে শক্ত করে দড়ি দিয়ে বাঁধা ছাতা-লাঠির বান্ডিল। কিন্তু একটা নীতি বরাবর মানতেন ক্ষিতিমোহন, কিরণবালাকে কখনও বোঝা বইতে দিতেন না—হয়তো প্রতিদিনের সংসার-নির্বাহে তাঁকে বহু পরিশ্রম করতে হত বলেই। কলকাতাতেও ছেলেমেয়েরা বাবার সঙ্গে বেড়িয়েছেন যথেষ্ট—সেও ওই সেকেন্ড ক্লাস ট্রামে। 'সব জায়গায় নিয়ে যেতেন—পরেশনাথের মন্দির দেখেছি, ইডেন গার্ডেনে বেড়িয়েছি—সাহেবদের ছেলেমেয়েরা বেড়াত, গোরাদের ব্যান্ড বাজনা শুনেছি।' আর ক্ষিতিমোহনের সঙ্গে যেখানেই যে বেড়াতে যাক না কেন, তাকে হাঁটতে হবে প্রচুর, এটা জানা কথা।[৪৩৮]

ধর্মতান্ত্রিকতা মানেননি ক্ষিতিমোহন, তাঁর আচারবিমুখ মন সবচেয়ে বেশি মূল্য দিয়েছে চিত্তসম্পদকে। বলতেন বাঙালির বিদ্যাবুদ্ধি আছে, তবে আরও চারিত্রিক দার্ঢ্যের প্রয়োজন আছে তার। নিজের জীবনে যে তিনি চরিত্রচর্চাকে অত্যন্ত মূল্যবান মনে করেছেন : 'এ বিষয়ে তাঁর শান্তিনিকেতন-জীবনের সহকর্মী পুরোনো দু-একজন অধ্যাপকের মুখেও কৃতজ্ঞতাপূর্ণ সাধুবাদ শোনা গেছে।'[৪৩৯]

নিষ্ঠাবান বৈদ্যসন্তানের সহজাত টান আয়ুর্বেদচর্চার প্রতি। স্বাস্থ্যরক্ষায় আয়ুর্বেদশাস্ত্র বিহিত নিয়মকানুনের প্রতি যথেষ্ট পক্ষপাতিত্ব। বেল এবং ডাব প্রীতি সর্বজনবিদিত। সৈয়দ মুজতবা আলী বলেছেন :

> ক্ষিতিমোহন সমাজে সংস্কারমুক্ত ছিলেন বলে কেউ যেন মনে না করেন তিনি শুচি-অশুচির পার্থক্য করতেন না। কিন্তু তাঁর কষ্টিপাথর মনু এমন কি ঋগ্বেদ থেকেও তিনি আহরণ করেন নি। বেদ থেকে নিশ্চয়ই কিন্তু সেটি আয়ুর্বেদ। একে তিনি বৈদ্যকুলোদ্ভব, তদুপরি তিনি গভীর মনোযোগসহকারে আয়ুর্বেদ অধ্যয়ন কবেছিলেন, আহার বিহার তিনি তাই আয়ুর্বেদসম্মত পদ্ধতিতেই করতেন।[৪৪০]

আয়ুর্বেদশাস্ত্রানুসবণ তাঁর কেবল যে আহারেবিহারেই সীমাবদ্ধ ছিল তা নয়, কবি রাজি হননি বলে অবশ্য কবিরাজ হওয়া হয়নি, তবু বন্ধুবান্ধব-আপনজনের মধ্যে কবিরাজি চিকিৎসার সুযোগ মন্দ পেতেন না। হোমিয়োপ্যাথিও ভালোই জানা ছিল। সেকালের শান্তিনিকেতনে ডাক্তার-বৈদ্য সুলভ ছিল না। অনেক সময় বন্ধু-সহকর্মী-প্রতিবেশীরা অসুখ-বিসুখে তাঁর শরণাপন্ন হতেন, উপকারও পেতেন।[৪৪১] পাঠকের মনে থাকতে পারে ক্ষিতিমোহন শান্তিনিকেতনে আসবার অল্পদিন পরেই কালীমোহন ঘোষকে বায়ু-পরিবর্তনের জন্য সেখানে আসবার পরামর্শ দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁকে লিখেছিলেন : 'তবে তুমি শীঘ্র আরোগ্য-লাভ করিতে পারিবে।' সেইসঙ্গে তিনি যোগ করেছিলেন : 'সেখানে ক্ষিতিমোহন আছেন। অন্য হোমিওপ্যাথ ডাক্তারও রহিয়াছেন।' অর্থাৎ তিনি জানাতে চেয়েছিলেন যে প্রয়োজন হলে চিকিৎসকের অভাব হবে না। ২৯ ডিসেম্বর ১৯১৮ ডা. দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্রকে একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথকে লিখতে দেখি :

> বৌমা ন্যুমোনিয়ায় পড়েছিলেন—এক রাত্রি একদিন শ্বাসকষ্ট এমন হয়েছিল, যে ভেবেছিলুম রক্ষা বুঝি পাবেন না। আমার এখানে ডাক্তারের মধ্যে আমি এবং ক্ষিতিমোহনবাবু। Phosph

> দিয়ে ব্যামোটাকে ঠেকানো গেল— এদিকে সুহৃদ এসে পড়ল। কিন্তু তার ওষুধ ব্যবহার করতে হয় নি—[৪৪২]

তেমনই নিয়মিত ওষুধ দিতেন গ্রামের মানুষদের। তাদের সঙ্গে যোগাযোগ, কথাবার্তা সর্বদাই হত। বোলপুরের দোকানদার ও অন্য সাধারণ মানুষদের ভালোই চিনতেন। আর বাড়িতে যারা নানা উপলক্ষে আসত—গোয়ালা, নাপিত বা আর কেউ—তাদের সংসারের খুঁটিনাটি সব খবর রাখতেন।

কিরণবালাও নিজের সংসার সামলে এক অতি কঠোর দায়িত্ব দীর্ঘদিন পালন করেছেন। তাঁর মায়ের কাছে তিনি প্রসূতিবিদ্যা শিখেছিলেন। সেসময় শান্তিনিকেতনের প্রায় সব শিশুই তাঁর হাতে জন্মেছে। কি দিন কি রাত যখনই ডাক পড়েছে, কিরণবালা মেয়েদের উপর সংসার ফেলে দিয়ে চলে যেতেন, ঝড়-বৃষ্টি-অন্ধকার রাত কিছুই গ্রাহ্য করতেন না। এমনও হয়েছে দু-একদিন বাড়ি ফিরতেই পারেননি। কারো অসুখ করলেও তাঁর সেবার হাত সর্বদাই প্রসারিত থাকত। ক্ষিতিমোহন তাঁর অল্পবয়সের চিঠিতে কিরণবালাকে কর্মে উদ্‌বুদ্ধ করতেন, সে প্রেরণা তাঁর জীবনে সার্থক হয়েছিল তাঁর নিজেরই স্বভাবগুণে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও তাঁকে পাঠভবনের শিশুদের দেখাশোনা করার মতো কাজ দিয়েছেন কখনও, অন্য কাজও কখনও বা, কিরণবালা যথাযথ পালন করেছেন নিজের দায়িত্ব। তাঁকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি এ কথার সাক্ষ্য দেয়।[৪৪৩] কিরণবালা শিল্পচর্চায় বা এই ধরনের সব কাজে স্বামীর উৎসাহ ও সহায়তা সর্বদাই পেয়েছেন, বাধা দেননি তিনি কখনোই।

যেখানেই যেতেন ক্ষিতিমোহন, মিশুক স্বভাবের জন্য সদালাপী বলে নাম রটে যেত। পাণ্ডিত্যের ভারেও চাপা পড়েননি কখনও, গাম্ভীর্যের ভারেও না। অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন :

> ...ক্ষিতিমোহন বাবুর পাণ্ডিত্য ছিল বহুমুখী। কত বিষয়ে যে তাঁর আগ্রহ ছিল তার অন্ত নেই। বিদ্যাবত্তা তো ছিলই, তা ছাড়া সারা ভারত পর্যটন করে বহু দর্শনে বহু শ্রবণে বিচিত্র অভিজ্ঞতাপুষ্ট ছিল তাঁর মন। যে কোনো বিষয়ের আলোচনায় তিনি অনায়াসে অংশগ্রহণ করতে পারতেন এবং বাকচাতুর্যে বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্যে, পাণ্ডিত্যের ঝলকে বিষয়টিকে ঝলমলে করে শ্রোতাদের কাছে তুলে ধরতেন। যে কোনো বিদ্বজ্জনসভা তিনি একাই জমিয়ে রাখতে পারতেন।[৪৪৪]

বিশিষ্ট জ্ঞানীগুণীদের সভায় যেমন তিনি স্বচ্ছন্দ, তেমনই তাঁর অনায়াস বিচরণ শিশু ও কিশোরদের গল্প-শোনাবার আসরে। আবার দ্বিজেন্দ্রনাথ-রবীন্দ্রনাথের মতো দার্শনিক-মহাত্মা বা কবিমনীষী সকাশেও তিনি নিষ্প্রভ নন। তাঁদের প্রতি নিজেও যেমন আকৃষ্ট হন তেমনই নিজের প্রতি তাঁদেরও আকৃষ্ট করেন। ওদিকে দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুরেরও তিনি বন্ধু। তাঁর মজলিশ অনেক সময় বসত বোলপুরের একটি খড়ের চালের বাংলো ধরনের বাড়িতে, অনেক গণ্যমান্য মানুষ আসতেন সেখানে। দ্বিপেন্দ্রনাথ নিজে এবং ক্ষিতিমোহন উপস্থিত থাকলে তিনি সরস গল্পে আড্ডা জমিয়ে তুলতেন। তেমনই আবার দিনেন্দ্রনাথের মতো সহকর্মী-বন্ধুরা আছেন, আছেন কলকাতার বা অন্য প্রদেশের বন্ধুরা—সকলেই তাঁর

সঙ্গাভিলাষী। সেই-সব বিচিত্র ও আনন্দরসঘন বৈঠক, ঘরোয়া আড্ডা বা গল্পের আসরের দিনগুলি স্মরণ করে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন :

> গল্প বলে, শব্দের pun করে শ্রোতাদের হাসাবার যে শক্তি ছিল ঠাকুর্দার তার জুড়ি দেখি নে আর।[৪৪৫]

একটি রচনায় গীতা চক্রবর্তী বলেছেন :

> আচার্য ক্ষিতিমোহনের একটি আশ্চর্য বর্ণাঢ্য ব্যক্তিত্ব ছিল। তাঁর লৌকিক রসিকতার ভাণ্ডার ছিল যেমন বিপুল, লোকসাহিত্যের চর্চাও ছিল তেমনি অগাধ। সেই দিক থেকে দেখলে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর যোগকে মণিকাঞ্চন যোগ বলা চলে। রবীন্দ্রনাথ নিজেই জানিয়েছেন "আমার আবার স্বভাব এমন ঠাট্টা না করলে বাঁচি নে"—তাঁর এই স্বভাব প্রতিবিম্বিত হত ক্ষিতিমোহনের সঙ্গে হাস্যপরিহাস বিনিময়ে। যেমন, অনেকেই যে দোষে অল্প-বিস্তর দুষ্ট, শুধু ব্যক্তিবিশেষকে সেই দোষে অপরাধী বলে চিহ্নিত করার প্রবণতাকে বর্ণনা করতে ক্ষিতিমোহন একদিন একটি দেশজ প্রবাদ উল্লেখ করেন—"সর্ব পক্ষী মৎস্যভক্ষী মৎস্যরাঙ্গাই কলঙ্কিনী"। সঙ্গে সঙ্গে কবির ক্ষিপ্র মিল দেওয়া—'সবাই কলম ধার করে নেয়, আমিই কেনে কলম কিনি'।[৪৪৬]

এ-সবই হারিয়ে গেছে। না কেউ ধরে রেখেছে সে-সব আড্ডা ও সভার বিবরণ, না কেউ মনে রেখেছে সে-সব সরস মনের কাহিনি। তাঁর সরসতার যে অতি-খাপছাড়া নমুনার উল্লেখ এখানে-ওখানে পেয়েছি বা কারো মুখে শুনেছি, সে যৎসামান্য। হাস্যরসের একটি নিত্যউৎস ছিল অন্তরে। একদিন, তখন অঝোরে বৃষ্টি পড়ছে। তার মধ্যেই এক ভদ্রলোক এসেছেন ক্ষিতিমোহনের সঙ্গে দেখা করতে। ছাতা বন্ধ করে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে তিনি বললেন : 'উঃ, কী বিষ্টি কী বিষ্টি!' অমনি ক্ষিতিমোহন বলে উঠলেন : 'অ্যাঁ! বাইরেও বৃষ্টি হচ্ছে না কি!' নিজের ঘরের খড়ের চাল ফুটো হয়ে ঘরেই তো জল পড়ছে, তাই রসিকতা ঘরে তো বৃষ্টি পড়ছেই, বাইরেও যে হচ্ছে যেন জানা ছিল না। এই রকমের সরস সব উক্তি তাঁর যত্রতত্রই শোনা যেত, যেমন তার ঔজ্জ্বল্য তেমন তার বৈচিত্র্য। পাঞ্জাবি পরিবারে নিমন্ত্রণে গিয়ে গুরুভোজন হয়েছে, ফিরে এসে তারই প্রতিক্রিয়ায় মন্তব্য : 'পাঞ্জাবি—প্রাণ যাবি!' বন্ধুমহলে স্ত্রীর মেজাজ সম্পর্কে তাঁর রসাত্মক সব অত্যুক্তির যথেষ্ট প্রসিদ্ধি ছিল। হয়তো বা কারো কাছে কোনো সময়ে নিরীহ গম্ভীর মুখে টিপ্পনী কাটলেন : 'বাইরে রোগা, ভিতরে দারোগা।' কিংবা হয়তো গুজরাতের বন্ধুরা শান্তিনিকেতনে এসেছেন, কথায় কথায় বাড়ি ফিরতে দেরি হয়ে গেছে। শেষে যখন বিদায় নিয়ে বাড়ির পথে পা বাড়াতে যাবেন, বন্ধুরা কেউ বললেন : 'অনেক দেরি হয়ে গেল, আপনার খাবার ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।' সঙ্গে সঙ্গে সহাস্য প্রত্যুত্তর : 'কিছুমাত্র না! কিরণবেনের মাথা এমনি গরম হয়ে থাকবে যে হাঁড়ি বসিয়ে দিলেই ভাত গরম হয়ে যাবে।' নিজের নামটা নিয়েও মাঝে মাঝে মজা করতেন। তাঁর চেহারা বেশ ভারী, তাই বলতেন : 'আমার নাম কেন ক্ষিতিমোহন হল, ক্ষিতিদমন হওয়া উচিত ছিল—আমি তো ক্ষিতিকে দমন করেই চলি।' নাম নিয়ে নাড়াচাড়া করাটা প্রায় প্রিয় ব্যসন ছিল। ছাত্রদের নামকরণ তো করতেনই, আর তাদের নামের সঙ্গে সমধ্বন্যাত্মক কিন্তু ভিন্নার্থবোধক শব্দ

জুড়ে কৌতুক করতে ভালোবাসতেন। কৌতুক-সৃষ্টির নেশায় স্ত্রীর নামও বাদ যেত না। কিরণবালা ছোটোখাটো মানুষ, সংসারের কাজকর্মও করেন ক্ষিপ্রহাতে, আশ্রমের অনুষ্ঠানসভায় কি কবির সান্ধ্য আলোচনাসভায় যথাসময়ে দ্রুতপায়ে গিয়ে হাজিরও হন ঠিক। আর কোনো কাজে গুরুদেব যদি ডেকে পাঠান, তবে তো কথাই নেই। 'তাঁর টাট্টুঘোড়ার মতো চলন দেখে ক্ষিতিবাবুই একদিন বলেছিলেন, 'সার্থক নাম কিরণ। কি run দেখেছ?' একবার গেছেন এক স্নেহভাজন অধ্যাপকের বাড়িতে। গরমের দিন। তাঁরা তাঁর জন্য আম কেটে রেকাবিতে সাজিয়ে দিয়েছেন। বলেছেন 'ল্যাংড়া আম', সকলেই জানেন ক্ষিতিবাবু আম খেতে ভালোবাসেন। ক্ষিতিমোহন মুখে দিয়েই বুঝেছেন ল্যাংড়া নয়, আমগুলো বেশ টক। তাই খেতে খেতে গম্ভীরভাবে বললেন : 'না, এ আমের দুই পা-ই আছে।' সযত্ন আতিথ্যের পরিবেশনে অম্লরসসিক্ত আমও স্বাগত, আর চা-পানের প্রস্তাব কোথাও প্রত্যাখ্যান করতে হলেও তাতে প্রত্যাখ্যানের সুর লাগবে না। ক্ষিতিমোহন স্মিতমুখে সবিনয়ে বলবেন : 'আমি no-tea, না-চার দলে।' অর্থাৎ তিনি নটী, নৃত্যের দলভুক্ত। সুধীরঞ্জন দাস ছাত্র ছিলেন তাঁর শিক্ষকজীবনের গোড়ার দিকে। বহুদিন পরে আশ্রমে এসেছেন, তখন ক্ষিতিমোহন সুপ্রবীণ, দেখা গেল 'সম্প্রতি দাড়িগোঁফে মাস্টারমশায়ের হাসিটি অল্প-বিস্তর চাপা পড়লেও বচনগুলি পূর্বের মতোই সতেজ ও সরস আছে।' সুধীরঞ্জন তখন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারক। চাপরাশি নিয়ে ঘুরে বেড়ানো বিশেষ রপ্ত হয়নি, শান্তিনিকেতনের মাঠে-বাটে এমনিই ঘুরে বেড়ান। ক্ষিতিমোহন বললেন : 'কৈ রে সুধীরঞ্জন, তোর চাপরাশি তো দেখছি না— কী জজিয়তি করিস! লোকে মানবে কেন?' ছাত্রের উত্তর, চাপরাশি নিয়ে ঘুরতে অসুবিধা বোধ করেন। ক্ষিতিমোহন বললেন : 'বলিস কী—চাপরাশি, তার মানে হল চাপের রাশি, অর্থাৎ ইংরেজিতে যাকে বলে concentreted pressure—চাপরাশি না থাকলে জজ কিসের রে?'[৪৪৭] অমিতাভ চৌধুরী লিখেছেন :

> শান্তিনিকেতনের প্রথম যুগে রবীন্দ্রনাথ ছাত্রদের ইংরেজি কবিতা পড়াতেন। সেই ক্লাসে মাস্টারমশাইয়েরাও যোগ দিতেন। রবীন্দ্রনাথ একদিন শেলি পড়াচ্ছেন। মাটিতে আসন পেতে বসে সবাই শুনছেন। হঠাৎ ক্ষিতিমোহনবাবু বলে উঠলেন—"গুরুদেব, আপনি তো শেলি পড়াচ্ছেন, এদিকে কীটস্-এর যন্ত্রণায় আর তো বসতে পারছি না।"

জানা গেল কোনো পোকার আক্রমণ তাঁকে অতিষ্ঠ করেছে।[৪৪৮]

কথায় কথায় এমন হাসিকৌতুক, অথচ মানুষটা স্বভাবত গম্ভীর প্রকৃতির। জগদানন্দ রায়ও যেমন। তাঁদের মধ্যে গাম্ভীর্য ও হাস্যরসের এই স্বচ্ছন্দ সহাবস্থানের রহস্য বিশ্লেষণ করেছেন প্রমথনাথ বিশী। তাঁর মতে আমুদে যারা তারা কখনও হাস্যরসিক নয়। স্বভাবে গভীরতার অভাববশত তারা নিজেরাই হাস্যকর হয়ে পড়ে। 'যথার্থ হাস্যরসের মধ্যে একটা গভীরতা আছে।'[৪৪৯]

করুণাশংকরজির মতো অন্তরঙ্গ বন্ধুজন ক্ষিতিমোহনের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন :

> পূজ্য ক্ষিতিমোহন সেন এক ব্রাহ্মণ। কাশী ওঁর জন্মস্থান। কাশীতে সরস্বতী দেবীর আরাধনা করেছেন। সত্যিকার ব্রাহ্মণের সব গুণ ওঁর আছে। অকিঞ্চন, বহিরঙ্গ দ্রব্যের অভাবে পূর্ণ। উনি

> ইচ্ছা করলে বাহ্যলক্ষ্মী ওঁর সেবায় আসতে প্রস্তুত, কিন্তু ইনি হৃদয়লক্ষ্মীর সেবক। রঘুবংশ থেকে বরতন্তুর শিষ্য কৌৎসের গল্প মনে পড়ে।[৪৫০]

তিনি ক্ষিতিমোহনের বয়োজ্যেষ্ঠ এবং সুপণ্ডিত। বন্ধুর চরিত্রনির্ণয়ে সংক্ষেপে আপন অভিমত দেন এই বলে যে :

> ক্ষিতিমোহনবাবুর হৃদয় দুরারাধ্য। এই দুরারাধ্য হৃদয় ভাই শ্রীজয়ন্তীলাল আচার্যের কাছে খুলেছে আর বন্ধুবান্ধবের কাছে বাবুজী পূর্ণ স্পষ্টতার সঙ্গে বলেন যে 'এই আমার ছাত্র আচার্য'।[৪৫১]

আর-এক ছাত্র ক্ষিতিমোহন-স্মরণ প্রবন্ধে লেখেন :

> তাঁর মতো সংযতবাক, রাশভারী লোক কমই দেখা যায়। ফলত শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রী ও কর্মীরা সাধারণত তাঁকে বিশেষ ভয় ও সমীহ করে চলতেন। কিন্তু বাইরের এই কঠিন আবরণের অন্তরালের মানুষটিকে জানবার সৌভাগ্য যাঁদের হয়েছে তাঁরাই জানেন তাঁর মতো হৃদয়বান উদারদৃষ্টি ও সুরসিক ব্যক্তি এ জগতে বিরল। সৌভাগ্যগুণে বর্তমান লেখকের কখনও কখনও সুযোগ হয়েছিল এই মহান হৃদয়ের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসবার। তাই অনেক সময়ে উনি আমার সঙ্গে হাস্য-পরিহাসের সুরেই কথাবার্তা বলতেন। আজও তাঁর অনেক টুকরো কথা, যার মধ্যে একই সঙ্গে তাঁর প্রজ্ঞা ও হাস্যরসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়—আমার কানে বাজছে।[৪৫২]

একদিন চৈত্রমাসের দুপুরে যখন শান্তিনিকেতনের বাঁধে স্নান করে ফিরছিলেন তিনি, ক্ষিতিমোহনের সঙ্গে দেখা হতেই তিনি মৃদু হেসে বলেছিলেন : 'তীর্থের পুণ্য পথে পথেই ক্ষয়'। সে কোনোদিন তিনি ভোলেননি। ইঙ্গিতটুকু হল চৈত্রের রোদে ঘরে যেতে যেতে অবগাহন স্নানের আরামটুকু হারিয়ে যাবে। তেমনই গভীর কোনো তত্ত্বব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মোহনদাস পটেল তাঁর মুখে শুনেছিলেন : 'বরণে অলংকার মিলনে নিরলংকার'।

শিক্ষক হিসেবে যেমন রাশভারি, গৃহকর্তা হিসেবেও তেমনই। ছেলেমেয়েরা ভয় এবং সমীহ করতেন। ক্ষিতিমোহন যে বকাবকি করতেন তা নয় অবশ্য, বরং 'বকতেন মা, চড়-চাপড় পাখার বাড়ি মায়ের হাতেই'—বলেছিলেন অমিতা সেন। দুই বোনে ঝগড়া-মারামারি করলে ক্ষিতিমোহন হয়তো কোনোদিন অতিষ্ঠ হয়ে দুজনকে ঘরের দুকোণে দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন, এর বেশি নয়। সে তুলনায় ছেলের বেলা কঠোর ছিলেন। গায়ে হাত না তুললেও শাসন বেশ কড়া ছিল। কিরণবালা রাগ করে বলতেন : 'ছেলে আমার আর মেয়েরা তোমার।' ক্ষিতিমোহন মেনে নিতেন : 'হ্যাঁ তাই।'[৪৫৩] স্নেহের এই কঠিন রূপ, এই কর্তব্যবোধজাত অনমনীয়তা আমাদের সমাজের অতি পরিচিত চরিত্রলক্ষণ, অন্তত সেকালে। তবে প্রয়োজনে কঠিন হতেন বলে ক্ষিতিমোহনের বাড়ির আবহাওয়া যে তাঁর স্বভাবসরস মনের স্পর্শ থেকে বঞ্চিত হত এমন ভাববার কারণ নেই।[৪৫৪] তাঁদের ছেলেমেয়েরা এখানকার অবাধ আশ্রমিক পরিবেশে বড়ো হয়েছেন। শ্রীসদনের মেয়েদের জন্য যে রকমের শিক্ষার আয়োজন ছিল, যে মেয়েরা গুরুপল্লিতে বাবা-মার কাছে থাকত তাদের জন্যও তাই। একটু বড়ো হতে বাড়িতেও মায়ের

নির্দেশে কিছু কিছু সাংসারিক কাজ করতে হত। মেয়েদের সংসারের কাজ শেখাবার জন্য কিরণবালা দুই কিশোরী কন্যাকে নির্দিষ্ট কাজ ভাগ করে দিতেন। বয়সসুলভ চাপল্য ও প্রতিযোগে তাঁরা তা নিয়ে পরস্পরের সঙ্গে ঝগড়া করতেন, কে বেশি কাজ করল, কে বা কম, তার চুলচেরা হিসেবে যথেষ্ট উৎসাহ ছিল। সেই মধুর শৈশবের দিনগুলি স্মরণ করে অমিতা সেন লিখেছেন,

> শুধু একটি জায়গায় আমাদের ভাগাভাগির প্রশ্ন তো ছিলই না বরং বাবার জন্য পিঁড়ি-পাতা থালা বাটি গোছানোতে আমাদের ছিল আনন্দ। আমার বাবা সবার আগে শুতে যেতেন। তিনি শুতে গেলে তাঁর মশারিটি গুঁজে দিয়ে বাবার আর কিছু লাগবে কিনা এটা জিজ্ঞাসা করতে আমরা দুজনেই ভালোবাসতাম।[৪৫৫]

অমিতা সেনের লেখায় একটি ঘটনার কথা পড়েছিলাম, এখানে সেটির উল্লেখ করতে লোভ হচ্ছে। তাঁরা দুইবোন তখনও নিতান্ত বালিকা, অমিতার বয়স দশ বছরও নয়। ১৯২১ সালের কথা, বর্ষামঙ্গল হবে, রোজ গান শেখানো চলছে। আশ্রমের সব অনুষ্ঠানে বালক-বালিকারা যারা গান গাইতে পারে তারা সকলেই যোগ দেয় সমবেত গানে। এবারে কথা হয়েছে শান্তিনিকেতনের পরে কলকাতায় জোড়াসাঁকোর বাড়িতেও বর্ষামঙ্গল হবে। সেই কলকাতায় যাওয়ার গানের দল থেকে অমিতার নাম বাদ পড়ল। অভাবিত আশাভঙ্গে কী কষ্ট যে হল মনে তা বলা যায় না। 'নুটুদি রেখাদি বাসুদির সঙ্গে আমার লাবুদি আনন্দে গান গাইতে গাইতে কলকাতা চলে গেল।' ফাঁকা আশ্রমে শুকনো মুখে ঘুরে বেড়ান অমিতা, পড়ায় মন বসে না। 'এইরকম আমাদের দুঃখ কষ্টে মাকে কখনো বিচলিত হতে দেখি নি, বিচলিত হতেন বাবা।' মেয়ের এত মন খারাপ দেখে তিনিই সঙ্গে করে কলকাতায় নিয়ে গেলেন। জোড়াসাঁকোর বাড়িতে গানের মহড়াতেও বসিয়ে দিলেন, দিনেন্দ্রনাথ খুশিই হলেন খুদে গাইয়েটি এসেছে বলে। অমিতা সেন যোগ করেছেন তখন তো মনে আত্মসম্মানবোধের বালাই ছিল না, সুতরাং বাদ-পড়া এলেবেলে মেয়ে হলেও বর্ষামঙ্গল অনুষ্ঠানে সবার সঙ্গে বসে পরামানন্দে গান গেয়েছিলেন তিনি।[৪৫৬] আমাদের কাছে পিতা ক্ষিতিমোহন সম্পর্কে নানা কথা বলতে বলতে অমিতা সেন স্মরণ করেছিলেন : 'বাবা তো বেশি কথা বলতেন না—রাশভারি মানুষ। পরীক্ষার আগে অনেক সময় বলতেন : 'যেটুকু জানো তাই লিখবে, বেশি লিখে নিজের অজ্ঞতার পরিচয় দিও না'।[৪৫৭]

বর্ষামঙ্গলের গানের কথাটা যখন উঠল, তখন বলি যে ক্ষিতিমোহন নিজেও আবাল্য গানের নেশায় ভরপুর। কাশীতে অল্পবয়স থেকেই সাধুসন্ন্যাসীদের কণ্ঠে ভজন শুনতেন তাঁদের আখড়ায় বা গঙ্গার ধারে। গান শুনতেন বিশ্বনাথমন্দিরে, অন্য আরও কত মন্দির-আঙিনায় গান হত, গান হত নানা ধর্মসম্প্রদায়ের মঠে-আশ্রমে। ক্ষিতিমোহন সুযোগমতো সব জায়গাতেই গিয়ে হাজির হতেন, শুনতে শুনতে শেখা হয়ে যেত সে-সব গান। বাউলগানের সঙ্গেও প্রথম পরিচয় কাশীতেই। তার পরে কত ঘোরাঘুরিই হল জীবনভর

এই-সব ভজন-দোঁহা-বাউলগান সংগ্রহের আকর্ষণে। সুর-সমেতই সংগ্রহ করতেন, গানগুলি শিখে নিতেন। তা ছাড়া তাঁর লেখা থেকে জানতে পারি যে কাশীতে তিনি শাস্ত্রীয় সংগীতও অনেক শুনেছেন। দুঃখ করে বলেছেন এত বড়ো বড়ো সংগীতগুরুর সান্নিধ্যে এসেও যে সংগীতশাস্ত্রে পূর্ণ অধিকার লাভ করেননি, সেজন্য অনেকটাই দায়ি তিনি নিজে। তবে তাঁর লেখার ভাবে বোধ হয়, পারিপার্শ্বিকের মধ্যে সংগীতচর্চার অনুকূল পরিবেশ ছিল না বলেই বাধা ঘটেছিল।[৪৫৮]

পাঠকের নিশ্চয় মনে আছে ক্ষিতিমোহন লিখেছেন যে তিনি গান জানেন মনে করে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে 'শারদোৎসব'-এ ঠাকুরদার ভূমিকা দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি সম্মত হননি। আসলে প্রকাশ্য সভায় বা মঞ্চে গান গাইতে তাঁর বরাবরই সংকোচ ছিল, তা বলে বেগানা মানুষ ছিলেন না। সৈয়দ মুজতবা আলী লিখেছেন : 'তিনি সঙ্গীতে পারদর্শী ছিলেন।' নিজের মনে গান গাইতেন. বন্ধুবান্ধব-সহকর্মীরাও সকলে তাঁর গান শুনেছেন, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও শুনেছেন। অনেকে কবীর বা মীরার ভজন শিখেছেন তাঁর কাছে, শিক্ষার্থীর তালিকায় দিলীপকুমার রায়ের মতো বিশিষ্ট সংগীতজ্ঞেরও নাম আছে। শুনেছিলাম শান্তিনিকেতনে ক্ষিতিমোহন তাঁকে 'মেরে চাকর রাখো জী' গানটি শেখান। অধ্যাপক গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় লিখেছেন : '...আচার্য ক্ষিতিমোহন সেনের কাছ থেকে যখন তিনি [দিলীপকুমার রায়] মীরার ভজনের সন্ধান পান, তখন সেই 'চাকর রাখোজী'-ই তাঁর জীবনের মূল মন্ত্র হয়ে ওঠে এবং সেই ভজন গানেই নিজের জীবনকে তিনি উৎসর্গ করে দেন।'[৪৫৯] আর ক্ষিতিমোহন নিজে তো বসবাস করেছেন রবীন্দ্রনাথের গানের সাম্রাজ্যে, সুতরাং রবীন্দ্রসংগীত স্বভাবতই তাঁর অনায়ত্ত থাকেনি। একটি স্মৃতিচারণ থেকে জানতে পারি শিলংবাসী তৃষিতকুমার দত্ত নামে এক বন্ধুকে একবার শিলঙে থাকার সময় তিনি গান শিখিয়েছিলেন।[৪৬০]

ছুটিতে ছুটিতে ক্ষিতিমোহন নানা জায়গায় যেতেন বটে, কিন্তু গরমের ছুটির বেশ খানিকটা সময় দেশের বাড়িতেই থাকতেন। এই সময়টাতেই অনেক সময় পেতেন বাউলদের খোঁজে গ্রামে গ্রামান্তরে ঘুরে বেড়ানোর। অমিতা সেনের মুখে শুনেছি তাঁদের সোনারঙ গ্রামের বাড়ির কথা। অনেকখানি জায়গা নিয়ে বাড়ি, যেন একটা টিলার মতো, তার চারদিকে খাল। মাঝখানে উঠান, ছিটেবেড়ার ঘর তার চারপাশ ঘিরে, টিনের চাল। গাছপালায় ছাওয়া, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পরিবেশ। ঘরদোর উঠান সব গোবর-মাটি লেপা, তাকে বলত 'পিড়ালেপা'। তাঁরা ছোটোবেলায় সোনারঙে যখন থাকতেন, খালিপায়ে খালিগায়ে ইচ্ছামতো যত্র-তত্র ঘুরে বেড়ানো চলত, পুকুরে স্নান, মুড়িমুড়কি খাওয়া। পুজোর ছুটিতে মামাবাড়ি যেতেন—দাদামশায়ের কর্মস্থলে, সেখানে পরিবেশ অনেকটাই ভিন্ন। তিনি বড়ো চাকুরে, নানা সময় নানা জায়গায় থাকতেন। সেখানে গেলে দাদামশায়ের সম্মানে একটু সভ্যভব্য হয়ে থাকতে হত। সাহেবি কায়দাকানুনও কিছু ছিল—অন্তত খালিগায়ে খালিপায়ে থাকা চলত না, ইচ্ছেমতো বাড়ির বাইরে যাওয়া তো নয়ই। এই দুয়ের টানাপোড়েনে বোনা ছিল তাঁদের জীবন আর সেই জীবনের কেন্দ্রে ছিল শান্তিনিকেতন।

বাউলগান নিয়ে যৎকিঞ্চিৎ

চিন ও জাপান ভ্রমণপর্ব শেষ করে রবীন্দ্রনাথের সঙেগ ক্ষিতিমোহনরা কলকাতা বন্দরে এসে নেমেছিলেন ২১ জুলাই ১৯২৪। আশ্রমজীবনের ছিন্ন গ্রন্থি জোড়া লেগেছিল আবার। ক্ষিতিমোহন ফিরে এসে আশ্রমিক সমাবেশে কয়েকদিন ধরে নিজেদের অভিজ্ঞতার গল্প শোনালেন। শান্তিনিকেতন পত্রিকা খবর দিচ্ছে :

> অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন তাঁহার চীনভ্রমণ সম্বন্ধে পাঁচটি বক্তৃতা দেন। বক্তৃতাতে তিনি দেশবিদেশে গুরুদেবের অভ্যর্থনা, ব্রহ্মনাচ, রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, চীনদেশের ভাস্কর্য, মন্দির, নৃত্যগীত, রাজনৈতিক সামাজিক আচার-ব্যবহার ও অন্যান্য অনেক বিষয়ে বলেন। তাঁহার বক্তৃতা সংক্ষেপে দেওয়া অসম্ভব বলিয়া এখানে দেওয়া হইল না। বিশ্বভারতী বুলেটিনের প্রথম খণ্ডে যে সব বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে সেগুলি বাদ দিয়া অন্যান্য ঘটনা চীন ও ব্রহ্মদেশের বিষয়ে তিনি তাঁহার স্বাভাবিক হাস্যরসমণ্ডিত ভাষায় বলেন। সভাগুলিতে পূর্ববিভাগের শিশু হইতে উত্তরবিভাগের বয়স্ক ছাত্র, অধ্যাপক ও আশ্রমে আগত অতিথিগণ উপস্থিত ছিলেন। সকলেই বক্তৃতাগুলি খুব উপভোগ করিয়াছিলেন। বক্তা শীঘ্রই তাঁহার জাপানভ্রমণ সম্বন্ধে কতকগুলি বক্তৃতা দিবেন। তাঁহার এই বক্তৃতাগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবার সম্ভাবনা আছে।[৪৬১]

এর পরে গুজরাতে চিন ও জাপান ভ্রমণের বিস্তারিত গল্প করেছিলেন ধারাবাহিকভাবে। সেই ভাষণগুলি লিখিত রূপ পেয়েছিল এবং গুজরাতি ভাষায় প্রকাশিত হয়েছিল। তবে সে ভাষণ প্রথানুসারী চিন-জাপানের ভ্রমণবৃত্তান্ত ছিল না, অনেক বিশেষ অভিজ্ঞতা, বিশেষ করে নানা ধরনের ধর্মপ্রাণ মানুষকে দেখার অভিজ্ঞতা তাতে স্থান পেয়েছিল। শ্রোতাদের মধ্যে ছোটো ছেলেমেয়ে ছিল বলেই হয়তো বক্তা বেশ কয়েকটি চিনা-জাপানি গল্প বলেছিলেন। এ বিষয়ে ক্ষিতিমোহনের বাংলা বই নেই।

১৯২৪ সালের শেষভাগে অধ্যাপক স্টেন কোনো বিশ্বভারতীর অতিথি-অধ্যাপক হয়ে এসেছেন। তাঁর সভাপতিত্বে গঠিত হয়েছে বিদ্যাভবন গবেষণা সমিতি এবং পূর্বনির্দিষ্ট কয়েকটি প্রাচ্যবিদ্যাবিষয়ক বক্তৃতা দিচ্ছেন তিনি। ক্ষিতিমোহনের যোগ রয়েছে এ-সবের সঙ্গে। সভা বা ক্লাসের বাইরে ভারতের ধর্ম-দর্শন-ইতিহাস-সংস্কৃতি নিয়ে শান্তিনিকেতনের অনেকের সঙ্গে অধ্যাপক কোনোর মতো পণ্ডিতরা আলাপ-আলোচনা করে বিশেষ আনন্দ পান, ক্ষিতিমোহন তাঁদের অন্যতম। বিশেষত তাঁর মুখে বাংলার লোকধর্ম, বাউলগান ও বাউলদের জীবনদর্শনের প্রসঙ্গ শুনে অধ্যাপক কোনো কৌতূহলী হয়ে ওঠেন। সেবার তাই বাউল সাধকদের প্রত্যক্ষ সান্নিধ্য পাওয়ার আগ্রহে তিনি কেন্দুলিতে জয়দেব-মেলাতেও গিয়েছিলেন।[৪৬২]

ক্ষিতিমোহন যে তরুণ বয়স থেকে বাউলগান সংগ্রহ করে আসছেন, তা সাহিত্যরসাস্বাদনের জন্য নয়, অধ্যাত্ম আর্তি থেকে এই সঞ্চয়বাসনার উদ্ভব। যাঁদের কাছ থেকে তিনি এই-সব গান সংগ্রহ করতেন, তাঁরা চাইতেন না এগুলি সর্বজনসমক্ষে প্রচারিত হয়। সাধনার্থী মানুষ সাধনসহায় করবার জন্য এ গান চাইলে তাঁরা প্রত্যাখ্যান করেন না, কিন্তু সাহিত্যরসিক বা অন্য কারও প্রতি তাঁরা নিরুৎসক। একবার এক সাধক বাউল

ক্ষিতিমোহনকে বলেছিলেন কোনো মানুষ যদি কেবল রসাস্বাদন সুখের জন্য তাঁর আত্মজাকে চেখে দেখতে চান, তা হলে যেমন সেই কন্যা, কন্যার পিতা অর্থাৎ তিনি নিজে এবং কন্যার প্রার্থয়িতা সকলেই অধন্য, এই বাউল গানগুলি সম্পর্কেও সেই একই কথা। এই-সব সাধকদের মতে এ গান কেবলমাত্র সাধনসামগ্রী রূপেই গ্রহণীয়। ক্ষিতিমোহন শান্তিনিকেতনে আসবার পরে তাঁর বন্ধু চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথকে তাঁর বাউলগান সংগ্রহের কথা বলেন। পরে রবীন্দ্রনাথ ও চারুচন্দ্রের আগ্রহে ক্ষিতিমোহন সংগ্রহের বাউলগান দু-একটি করে প্রবাসীতে মাসে মাসে 'হারামণি' শিরনামায় প্রকাশিত হতে থাকে। এ হল ১৯১৫ সালের কথা। কিন্তু হঠাৎ শোনা গেল এগুলি নিরক্ষর বাউলদের রচনা হতে পারে না বলে কেউ কেউ মতপ্রকাশ করছেন। তাঁরা বলছেন এ-সব এখনকার শিক্ষিত লোকের রচনা, অর্থাৎ খাঁটি বাউলগান নয়। এ হেন তঞ্চকতার অভিযোগ আরোপিত হয়েছে জেনে রবীন্দ্রনাথ যা বলেছিলেন ক্ষিতিমোহন তাঁর 'বাংলার বাউল' গ্রন্থে তার উল্লেখ করেছেন।

> তিনি বলিলেন, "শিক্ষিত লোকের মুরদ তো আমার অজানা নেই। এইসব জিনিস যে তাঁহাদের রচনার শক্তির বাহিরে তাহা আমি খুবই বুঝি। একটা গান পাইলে হয়তো তাহারা কতক অনুরূপ আর একটা গান করিতে পারেন, কিন্তু মূলটা রচনা করা কোনো শিক্ষিত লোকের কর্ম নয়। অন্ততঃ আমার তো তাহার কাছাকাছি শক্তিও নাই।"

এর পরে ক্ষিতিমোহন নিজে আর বাউলগান প্রকাশ করেননি। সন্তবাণী প্রকাশের ব্যাপারেও তিনি যথেষ্ট রক্ষণশীল ছিলেন। এ-সব নিয়ে তিনি নিজে চর্চা করতেন, বন্ধুবান্ধবদের এ নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে দেখাতেন, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলোচনা হত।[৪৬৩] সে-সব আলোচনা অতি মূল্যবান স্বীকৃতি পেল রবীন্দ্রনাথের The Philosophy of our People প্রবন্ধে।[৪৬৪] কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন মহাসভার সভাপতিপদে বৃত হয়ে তিনি ১৮ ডিসেম্বর ১৯২৫ এই ভাষণ দিলেন। ভারতবর্ষের আপাতদৃষ্টিতে অশিক্ষিত এবং বাস্তবিক নিরক্ষর সাধারণ মানুষের মধ্যে যে গভীর আধ্যাত্মিক জীবনদর্শন আছে তার ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে ক্ষিতিমোহনের বাউলসংগ্রহের বেশ কয়েকটি গানের অনুবাদ এই প্রবন্ধে ব্যবহৃত হল। ক্ষিতিমোহনকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠিগুলির সঙ্গে যে কয়টি তারিখহীন চিরকুট দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল, তার একটিতে আছে : 'সেই কুসুমবনে জহুরীর অনধিকার প্রবেশের সম্বন্ধে বাউল কবির দুটি লাইন'।[৪৬৫]

এই বক্তৃতা লেখার সময় ক্ষিতিমোহনের কাছে মূল পদটির জন্য রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত অনুরোধ করে চিরকুট পাঠিয়েছিলেন, পদটির ইংরেজি অনুবাদ প্রবন্ধে ব্যবহার করা হয়েছে। এই প্রবন্ধে ক্ষিতিমোহন-সংগ্রহের আরও দুটি সম্পূর্ণ গানের ইংরেজি অনুবাদ রবীন্দ্রনাথ উদ্ধৃত করেছেন : 'নিঠুর গরজী, তুই কি মানস মুকুল ভাজবি আগুনে' আর 'হৃদয় কমল চলতেছে ফুটে'। ১৯২৮ সালে লেখা 'অরবিন্দ ঘোষ' প্রবন্ধে তিনি প্রথম গানটি পুনরায় ব্যবহার করেন। যে একান্ত সত্যসাধনায় স্বদেশাত্মার উদ্‌বোধন ঘটবে তার পথ

থেকে সরে এসে, দেশে যে তখন তাড়াতাড়ি দশের মনভোলানো সিদ্ধির লোভে সত্যকে হারাবার পালা চলছে, তার প্রসঙ্গে বললেন :

বন্ধু ক্ষিতিমোহন সেনের দুর্লভ বাক্যরত্নের ঝুলি থেকে একদিন এক পুরাতন বাউলের গান পেয়েছিলুম। তার প্রথম পদটি মনে পড়ে :

'নিঠুর গরজী তুই কি মানস মুকুল ভাজবি আগুনে?'

যে মানসমুকুলের বিকাশ সাধনসাপেক্ষ, দশের সামনে অগ্নিপরীক্ষায় তার পরিণত সত্যকে আশুকালের গরজে সপ্রমাণ করতে চাইলে আয়োজনের ধুমধাম ও উত্তেজনাটা থেকে যায়, কিন্তু তার পিছনে মানসটাই অন্তর্ধান করে।[৪৬৬]

বিশ্বভারতী কোয়ার্টার্লিতে মহম্মদ মনসুরউদ্দীনের বাউলগান সংগ্রহগ্রন্থের আলোচনা বেরোল রবীন্দ্রনাথের, সেই আলোচনা প্রসঙ্গেও স্বভাবতই তাঁর মনে এসেছে ক্ষিতিমোহন-সংগ্রহের কথা :

"অন্তরতর যদয়মাত্মা' উপনিষদের এই বাণী এদের মুখে যখন 'মনের মানুষ' বলে শুনলুম, আমার মনে বড়ো বিস্ময় লেগেছিল। এর অনেক কাল পরে ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়ের অমূল্য সঞ্চয়ের থেকে এমন বাউলের গান শুনেছি, ভাষার সরলতায়, ভাবের গভীরতায়, সুরের দরদে যার তুলনা মেলে না— তাতে যেমন জ্ঞানের তত্ত্ব তেমনি কাব্যরচনা, তেমনি ভক্তির রস মিশেছে। লোকসাহিত্যে এমন অপূর্বতা আর কোথাও পাওয়া যায় বলে বিশ্বাস করি নে।[৪৬৭]

একাধিক প্রসঙ্গে ক্ষিতিমোহন এ কথার উল্লেখ করেছেন যে তিনি যদিও নিজের ইচ্ছায় বাউলগান আর প্রকাশ করেননি, কিন্তু নিজের সংগ্রহের গানগুলি তিনি সাজিয়ে লিখে রেখেছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে লীলা বক্তৃতা দেওয়ার আহ্বান পেয়ে ১৯৪৯ সালে ক্ষিতিমোহন প্রথম বাউলদের সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন, তার অনেক আগেই কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যখন দার্শনিকসভার অভিভাষণ প্রভৃতিতে ক্ষিতিমোহনের সংগৃহীত বাউলগান উদ্ধৃত করেছিলেন, তার অল্পদিনের মধ্যে তিনি নিজেও এক দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন। তাঁর Bauls and their cult of Man বিশ্বভারতী কোয়ার্টার্লি পত্রিকায় জানুয়ারি ১৯২৯-এ প্রকাশিত হয়।[৪৬৮] ২৮ ডিসেম্বর ১৯২৮ রবীন্দ্রনাথ খুব ছোটো একটি চিঠিতে ক্ষিতিমোহনকে লিখেছিলেন :

ওঁ

প্রীতি নমস্কার

বাউলের ইংরেজী অনুবাদটা একবার দেখব। সুরেন জানতে চায় কি কি বদল হয়েচে। ইতি
২৮ ডিসেম্বর ১৯২৮

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর[৪৬৯]

সম্ভবত 'বাউলের ইংরেজী অনুবাদটা' বলতে রবীন্দ্রনাথ ক্ষিতিমোহনের এই প্রবন্ধটা বুঝিয়েছিলেন। দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত ক্ষিতিমোহনকে লেখা রবীন্দ্র-পত্রাবলির সম্পাদক এই চিঠি সম্পর্কে যে টীকা দিয়েছেন, তা আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হয়নি।[৪৭০]

সেখানে বক্তব্য স্পষ্টও নয়, আর যা বলা হয়েছে তার যুক্তিটাও যে কী তা ঠিক বোঝা গেল না। কারণ রবীন্দ্রনাথ ১৯২৫ সালে ভারতীয় দর্শনসভার সভাপতির ভাষণ দেওয়ার তিন বছর পরে উপরের চিঠি লিখেছেন, অন্যদিকে তখনও তাঁর অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে হিবার্ট লেকচারস দিতে প্রায় দেড় বছর বাকি।

সুধীরচন্দ্র করের লেখা থেকে নিজের সংগৃহীত এই বাউলগানগুলি সম্পর্কে ক্ষিতিমোহনের অপরিসীম মমতা ও আকর্ষণের একটি নজির এইখানে উল্লেখ করি। গুরুপল্লিতে ক্ষিতিমোহনের ঠিক পাশের বাড়িতে থাকতেন নেপালচন্দ্র রায়। ঘটনাটা রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ক্ষিতিমোহনের চিনযাত্রার অল্পদিন আগে হয়তো ঘটেছিল—একবার কার অসাবধানতায় নেপালবাবুর বাড়িতে আগুন লাগল।[৪৭১] সুধীরচন্দ্রের বিবরণের প্রেক্ষাপট সেটাই :

> ক্ষিতিবাবুর সম্পত্তির মধ্যে আর যতই কিছু থাক, লোকপ্রবাদে স্থান পেয়েছে একটি ঝোলা। সেটিকে হাতছাড়া করতে দেখা যায় নি কোনোদিন। আগুন লেগেছে পাশের বাড়িতে, থাকতেন তখন গুরুপল্লীর খড়ের ঘরে। বাড়ির সকলে আর সব কিছু সামলে রাখতে ব্যস্ত। বাড়ির কর্তা তাঁর ঝোলাটি হাতে করে দাঁড়ালেন এসে পথে। ঝোলাগহ্বরের সম্পদ ছিল বেশি কিছু নয়—কতকগুলি কাগজ। নোটের তাড়া বা কোম্পানীর কাগজ বললে ভুল হবে। সেগুলি ছিল তাঁর বাউল গানের সংগ্রহ।[৪৭২]

ঝোলাগহ্বরে সন্ধান করলে দু-একখানা সন্তবাণীর খাতাও কি আব পাওয়া যেত না? এগুলি তাঁর অমূল্য ধন, যথাসর্বস্বের বিনিময়েও এগুলি বোধ হয় তিনি হারাতে রাজি ছিলেন না। এই-সব সন্তবাণী ও বাউলগানগুলি তিনি তাঁর কথকতায় নানা প্রসঙ্গে আলোচনা ও বিশ্লেষণ করতেন। সৈয়দ মুজতবা আলী বলেছেন, আচার্য ক্ষিতিমোহন ভরত-মম্মটসম্মত প্রাচীনতম আলংকারিক সূত্র 'অতি সাধারণ অতিশয় গ্রাম্য গীতিকাতে আরোপণ করে' সে গান যে রসোত্তীর্ণ হয়েছে তার প্রমাণ দিতেন।[৪৭৩]

আরও নানা কাজ

সন্তজীবনসাধনা ও তাঁদের বাণীসংকলনের কাজও চলছে তাঁর। খবর পাচ্ছি :

> বিশ্বভারতী গবেষণা সমিতির একটি অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। তাহাতে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন মধ্যযুগের হিন্দি কবি 'দাদু' সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন।[৪৭৪]

মহাসাধক দাদূ-সম্পর্কিত গবেষণার কাজটিও শেষ হয়েই এসেছিল মনে হয়। শান্তিনিকেতন পত্রিকা খবর দিচ্ছে :

> আশ্রমের অধ্যাপক শ্রীক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়ের 'দাদু' নামক একখানি গ্রন্থ বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় হইতে প্রকাশিত হইতেছে। পূজনীয় আচার্যদেব ইহার ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন।[৪৭৫]

রবীন্দ্রনাথের লিখিত 'দাদূ' গ্রন্থের ভূমিকা 'মরমিয়া' নামে স্বতন্ত্র প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হয়

প্রবাসী পত্রিকার ভাদ্র ১৩৩২ সংখ্যায়। 'দাদূ' গ্রন্থ আরও দশ বছর পরে প্রকাশিত হয়েছিল। এই ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথকে কোথাও লিখতে দেখি :

> ক্ষিতিবাবুর কল্যাণে ক্রমে হিন্দুস্থানের আরো কোনো কোনো সাধক কবির সঙ্গে আমার কিছু কিছু পরিচয় হল। আজ আমার মনে সন্দেহ নেই যে হিন্দী ভাষায় একদা যে গীতিসাহিত্যের আবির্ভাব হয়েচে তার গলায় অমর সভার বরমাল্য। অনাদরের আড়ালে আজ তার অনেকটা আচ্ছন্ন ; উদ্ধার করা চাই আর এমন ব্যবস্থা হওয়া চাই যাতে ভারতবর্ষের যারা হিন্দী ভাষা জানে না তারাও যেন ভারতের এই চিরকালের সাহিত্য আপন উত্তরাধিকার গৌরবে ভোগ করতে পারে।[৪৭৬]

কোথাও তিনি ক্ষিতিমোহনের প্রতি তাঁর অগাধ আশা ব্যক্ত করেছেন :

> তাঁরা (মরমিয়া কবিরা) যে রসের ধারাকে বৈকুণ্ঠ থেকে এনেছিলেন, আমাদের দেশের সামাজিক বালুর তলায় তা অন্তর্হিত। কিন্তু তা মরে যায় নি। ক্ষিতিমোহনবাবু ভার নিয়েছেন বাংলা দেশে সেই লুপ্ত স্রোতকে উদ্ধার করে আনবার। শুধু কেবল হিন্দী ভাষা থেকে নয়, আশা ক'রে আছি বাংলা ভাষার গুহার থেকে বাউলদের সেই সুবর্ণরেখার বাণীধারাকে প্রকাশ করবেন যার মধ্যে সোনার কণা লুকিয়ে আছে।[৪৭৭]

প্রথম প্রবাসীতে 'হারামণি' শিরোনামে কয়েকটি বাউলগান প্রকাশিত হলে যে সমালোচনা হয়েছিল ক্ষিতিমোহন সে কথা বলেছেন, একটু আগে উল্লেখ করেছি। পরেও ক্ষিতিমোহনের বাউলগানসংগ্রহ ও বাউল-বিষয়ক আলোচনা তীব্র সমালোচনার মুখে পড়েছিল। কিন্তু লক্ষ করছি রবীন্দ্রনাথ প্রথম থেকেই এই গানগুলির পরম সমাদর করেছেন। ভারতীয় লোকধর্মের প্রতি তাঁর যে গভীর শ্রদ্ধার প্রকাশ তাঁর বিভিন্ন লেখায় আমরা দেখতে পাই, তার পিছনে ক্ষিতিমোহনের সংগৃহীত বাউলগান ও সন্তবাণীর একটি গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা ছিল। প্রকৃত ভাবুকের মন নিয়ে এই গান ও দোঁহাগুলিব মর্মগ্রহণ করেছিলেন বলেই বিদেশির কাছেও এর মর্মার্থ ও দার্শনিক মূল্য ব্যাখ্যায় তিনি প্রণোদিত হয়েছিলেন।

কেবল সন্তদের জীবনসাধনা ও তাঁদের বাণী, কেবল বাউলদর্শন ও বাউলগান—এ-সব নিয়ে গবেষণাকর্মে নিমগ্ন হয়ে থাকলেই চলে না ক্ষিতিমোহনের, আরও অনেক কাজ তাঁর। শুধু রবীন্দ্রনাথেরই কত দাবি তাঁর কাছে। কখনও তাঁর কাছ থেকে চিরকুট আসে : 'অয়মহং ভোঃ—-আপনার শ্লোকভাণ্ডারদ্বারে বসন্তের কবি সমাগত। বাসনা পূর্ণ করবেন। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।'[৪৭৮] কখনও বা তিনি লিখে পাঠান : 'ক্ষিতিবাবু বেদে বাক্যের যে স্তব আছে পেলে আমার কাজে লাগবে।'[৪৭৯] একটি চিঠিতে লিখেছিলেন :

> সবিনয় নমস্কার
>
> ৭ই পৌষের বক্তৃতাটি আপনার কলমের অগ্রে যদি উদ্ধার না করেন তবে সে ডুবল। তার আর আশা নেই। কর্ত্তৃপক্ষেরা খুব ধুম করে লিখে নেবার আয়োজন করেছিলেন বলেই এই দুর্গতি ঘটল। তাই আপনার শরণ নিলুম। ইতি ৭ই জানুয়ারি ১৯২৬
>
> আপনাদের
>
> শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর[৪৮০]

৭ পৌষের এই বক্তৃতাটি শান্তিনিকেতন মন্দিরে ২২ ডিসেম্বর ১৯২৫ পৌষ উৎসবের সূচনায় প্রভাতি উপাসনায় প্রদত্ত হয়। সেজন্য মনে হয় 'কর্তৃপক্ষ' শান্তিনিকেতনেরই পরিচালকমণ্ডলী। এ ভাষণ 'শুভ ইচ্ছা' নামে প্রবাসী ফাল্গুন ১৩৩২ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের আদেশে ক্ষিতিমোহন তাঁর স্মৃতি থেকে অথবা তার দিনপঞ্জির পাতা থেকে উদ্ধার করে দেন। লেখাটি এখনও গ্রন্থভুক্ত করেননি বিশ্বভারতী, ক্ষিতিমোহন উদ্ধার করে না-দিতে পারলে ভাষণটি হারিয়েই যেত। ক্ষিতিমোহন-অনুলিখিত রবীন্দ্রনাথ-পরিমার্জিত ভাষণ মাঝে মাঝে পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। প্রয়োজনে ক্ষিতিমোহনকে পাঠানো রবীন্দ্রনাথের ছোটো চিঠি বা চিরকুটের আর-একটি দৃষ্টান্ত এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে : 'আমার কোনো নূতন সম্বন্ধের নাৎনীর অভিজ্ঞতালব্ধ পরামর্শ এই যে কেশুর্তে পাতার রস খুস্কির অমোঘ প্রতিকার, এ সম্বন্ধে বিজ্ঞজনের অভিমত জেনে পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হতে চাই। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর'।[৪৮১] মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। আয়ুর্বেদজ্ঞ ক্ষিতিমোহনের ওষধি-জ্ঞানের শরণ নিচ্ছেন কবি। তাঁর 'অথর্ব্ববেদে ব্রাত্যদের সম্বন্ধে যে প্রশস্তিবাদ আছে সেইটের প্রয়োজন হয়েচে। বঙ্গানুবাদ হলেও চলবে' কিংবা শুধুমাত্র 'ছুটি পেলে একবার দর্শন দেবেন' গোছের চিরকুটও কয়েকটি চোখে পড়ে।[৪৮২]

মহামতি দ্বিজেন্দ্রনাথ

১৯২৬ সালের প্রথম দিকে শান্তিনিকেতনে সর্বজনশ্রদ্ধেয় প্রবীণ আশ্রমিক দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনাবসান হল—১৮ জানুয়ারি ১৯২৬, ৪ মাঘ ১৩৩২। আগের দিন একটু অসুস্থ হয়েছিলেন, তাও বিকেলের আগে পর্যন্ত দেখে কারও মনে হয়নি সর্দি-জ্বরের চেয়ে বেশি কিছু। শেষ রাত্রে ক্ষিতিমোহনদের ডাক পড়ল, তখন শেষসময় উপস্থিত। ভোর চারটেয় প্রয়াণ ঘটল, সমস্ত মুখে একটি শান্ত বিশ্রামের ভাব মাখানো যেন। ক্ষিতিমোহন লিখেছেন : 'তাঁহার মৃত্যুর মত সহজ মৃত্যু বড় একটা দেখি নাই।' অপরাহ্ণে যথোচিত মর্যাদায় দ্বিজেন্দ্রনাথের দেহ বহন করে প্রথমে আনা হল ছাতিমতলায়, সেখানে তাঁর প্রিয় 'কর তাঁর নামগান' গানটি গাওয়ার পরে আশ্রমিকরা শান্তিনিকেতন আশ্রমের উত্তরদিকবর্তী শ্মশানে শেষযাত্রায় তাঁর অনুগমন করলেন। এই আর-একটি অসামান্য মানুষ, শান্তিনিকেতন আশ্রমে যোগ দিয়ে প্রায় আঠারো বছর ক্ষিতিমোহন যাঁর সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন। তরুণ বয়সেই তাঁর লেখার সঙ্গে পরিচয়, তার পর জোড়াসাঁকোয় ঠাকুরবাড়িতে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের শ্রাদ্ধবাসরে প্রথম তাঁকে দেখবার সুযোগ হয়। শান্তিনিকেতনে এসে যখন তাঁর সঙ্গে পরিচয় হল, তখন মনে হল দ্বিজেন্দ্রনাথের লেখা প্রবন্ধ পড়ে তাঁর সম্পর্কে যে সশ্রদ্ধ ধারণা জন্মেছিল, স্বয়ং তিনি মানুষ হিসাবে তার চেয়েও অনেক বড়ো। শিশুর মতো সরল, তত্ত্বজ্ঞানী ও মহাপণ্ডিত এই মানুষটি সদাই জ্ঞানের চর্চায় রত থাকতেন। মনের মধ্যে ভারতীয় শাস্ত্র বা দর্শন বিষয়ে কোনো প্রশ্ন দেখা

দিলে বিধুশেখর বা ক্ষিতিমোহনকে পত্র লিখে পাঠাতেন—প্রায়শ তাতে মজার কবিতা থাকত, থাকত হেঁয়ালি-ছবি, বলা বাহুল্য কোনোটাই প্রাসঙ্গিকতাবর্জিত হত না। অনেক সময় নিজের নাম না লিখে পাখির ছবি এঁকে দিতেন, দ্বিজ শব্দের অর্থ পাখি, তাই চিঠির নীচে পাখির ছবি আঁকার অভ্যাসটা তাঁর বরাবরই ছিল। এই দুই পন্ডিতকে লেখা চিঠিতে দেখা যেত ছবির পাখি তৃষ্ণার্ত হয়ে পিপাসিত চাতকের মতো উর্ধ্বমুখে চেয়ে আছে, অর্থাৎ দ্বিজেন্দ্রনাথ ব্যাকুলভাবে তাঁদের সাক্ষাৎবারি প্রার্থনা করছেন। কখনও বা প্রাচীন কোনো গ্রন্থের জিজ্ঞাস্য নিয়ে নিজের রিকশাতে চড়ে তিনি নিজেই তাঁদের কাছে এসে হাজির হতেন। একদিন রাত্রি প্রায় এগারোটার সময় এইভাবে মুনীশ্বরকে নিয়ে তিনি ক্ষিতিমোহনের কাছে এলেন। ক্ষিতিমোহনও তাঁর সাড়া পেয়ে তাঁর লেখাপড়ার জায়গায় বাতিটা উজ্জ্বল করে দিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন। তিনি তখনও শুতে যাননি দেখে দ্বিজেন্দ্রনাথ বেজায় খুশি। কারণ মুনীশ্বর তাঁকে নিরস্ত করবার জন্য এই যুক্তিতেই নিষেধ করেছিল যে এত রাতে কেউ জেগে থাকবেন না।[৪৮৩]

দ্বিজেন্দ্রনাথ বিধুশেখর শাস্ত্রীকে বলেছেন 'নিখিল শাস্ত্রপারাবারের অগস্ত্যমুনি'।[৪৮৪] ক্ষিতিমোহনকে বলেছেন : 'অ্যাকা নবরতন ক্ষিতিমোহন।'[৪৮৫] একবার বিধুশেখর শাস্ত্রীকে লিখেছিলেন :

> আপনারা আমাকে বলপূর্ব্বক মোহনিদ্রা হইতে জাগাইয়া তুলিয়া তীর্থযাত্রায় প্রবৃত্ত করাইতেছেন—গাধা পিটিয়া ঘোড়া করিতেছেন—এখন ইহার তাল সামলান। তীর্থপর্যটক ক্ষিতিমোহন আয়ুর্বিদাং বরঃ পান্ডা হইয়া যাত্রীগণের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন ইহার অর্থ এই যে আপনাদের মতো লোকের সৎসঙ্গের বাতাস গায়ে লাগিলে পঙ্গুও গিরিলঙ্ঘন করিতে পারে।[৪৮৬]

বিধুশেখর-ক্ষিতিমোহনের কাছে উৎসাহ পেয়ে বার্ধক্যগ্রস্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ নতুন করে জ্ঞানচর্চাতীর্থে যাত্রা করে বেরিয়েছেন, এখন আলোচনা ইত্যাদির প্রয়োজন সামলাবার দায়িত্ব তাঁদের নিতে হবে, দাবি এই। আর তাঁর আশা বরণীয় আয়ুর্বেদশাস্ত্রবিদ এবং তীর্থপর্যটক ক্ষিতিমোহন পান্ডা হয়ে তাঁদের মতো তীর্থযাত্রীদের পথ দেখাবেন। এমন-সব মানুষ, যাঁরা দ্বিজেন্দ্রনাথের মতো জ্ঞানতপস্বীর সঙ্গে শাস্ত্রীয় ও দার্শনিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে পারেন, প্রয়োজনে তাঁদের দেখা পেলে যেমন এই পরম জ্ঞানী ও তত্ত্বজিজ্ঞাসুর আনন্দ, দেখা না পেলে তেমনই তাঁর ক্ষোভ। সেই অপ্রাপ্তির অতৃপ্তি ও ক্ষোভে তিনি পুনরায় লেখেন :

> শাস্ত্রীমহাশয়,
>
> সুদুর্দান্ত ক্ষিতিমোহন আয়ুর্বেদী কাশী প্রয়াগ মথুরা বৃন্দাবন নর্ম্মদা কাবেরী গোদাবরী প্রভৃতি সারা তীর্থ পর্যটন করিয়া এখনও তাঁহার তীর্থযাত্রার আশা মেটে নাই—এইমাত্র তিনি কালিঘাটাভিমুখে পদব্রজে রওনা হইলেন। তাহাকে পেরে ওঠা ভার, তিনি গৃহস্থ হইয়া সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করিয়াছেন—শান্তিনিকেতনের শান্তিধর্ম্মের পরিত্যাগ করিয়া শান্তিহারা পরিব্রাজকের ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। আপনি যদি তাঁহাকে গীতার এই শ্রেয়স্কর বাক্যটি স্মরণ

করাই/া দ্যান যে. স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মোভয়াবহঃ তবে বড্ড ভাল হয়, তার আশা আমি পরিত্যাগ করিলাম। আপদ ধর্ম্মের বিধি অনুসারে আপনি [যদি] ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম হইতে নীচে নাবিয়া উপস্থিত পান্ডাগিরি কার্য্যটির ভার গ্রহণ করেন, তবে আমি আপনাকে first prize প্রদান করিতে রামানন্দবাবুকে অনুরোধ করিব।

অনন্যোপায় দীন দ্বিজ[৪৮৭]

ক্ষিতিমোহন বরাবর হাঁটাপথে যেতেন বোলপুর স্টেশন, যাওয়ার রাস্তায় নিচু বাংলায় হয়তো দেখা করে গিয়েছিলেন, আর তিনি কলকাতা যাচ্ছেন শুনেছিলেন বলেই দ্বিজেন্দ্রনাথ পর্যটক ক্ষিতিমোহন কালিঘাট তীর্থদর্শনে চলেছেন, এই কথা বলেছেন। বিধুশেখর শাস্ত্রী এই চিঠির আনুষঙ্গিক টীকা যোগ করেছেন : 'পর্যটনপটু বন্ধুবর ক্ষিতিমোহন অনেক সময় তাঁহার কাছে যাইতে পারিতেন না, ইহাই এই পত্রের বিষয়।' আর-একখানি চিঠিতে ক্ষিতিমোহনপ্রসঙ্গ আছে, সেটি বিধুশেখর বিকল্পে দ্বিজেন্দ্রনাথের সেক্রেটারি বা একান্ত সচিব অনিলকুমার মিত্রকে লেখা। নাম ও তার অর্থ নিয়ে নানাভাবে ভাবতে ও তা নিয়ে কৌতুক করতে ভালোবাসতেন দ্বিজেন্দ্রনাথ, এই চিরকুটে তারই নমুনা পাই। উপলক্ষ ক্ষিতিমোহন ও ভীমরাও শাস্ত্রী।

অনিল

শাস্ত্রীমহাশয়,

যদি বসুন্ধর ধনুর্ধর মহাশয়কে এবং গুণগুণকারী ভোমরা ভীমরাওকে টানিয়া আনেন অথবা তুমি টানিয়া আনো তবে ভালো হয়—বসুন্ধর মহাশয় বলিয়াছিলেন তিনি সকালে আসিবেন।[৪৮৮]

বিধুশেখর এ চিঠির সঙ্গে টীকা যোগ করেছেন : "এই পত্রে বসুন্ধর শব্দে ক্ষিতিমোহন-বাবুকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। ক্ষিতি স্ত্রীলিঙ্গ, তাই বসুন্ধরা। কিন্তু আমাদের ক্ষিতি অর্থাৎ ক্ষিতিমোহনবাবু পুরুষ, তাই তিনি হইলেন বসুন্ধর।"

এমন করে যিনি ডাক পাঠাতে পারতেন, অদর্শনে ব্যাকুল হতেন, সেই মানুষ গত হলেন। এক অতি বিরল সম্পর্কের অবসান। সেসময় রবীন্দ্রনাথ ছিলেন না শান্তিনিকেতনে, সংবাদ পেয়ে তিনি ফিরে এলেন। ২৫ জানুয়ারি মাঘোৎসব ছিল। অনুমান করছি ক্ষিতিমোহন বরাবরের অভ্যাসমতো এই উপলক্ষে কলকাতায় গিয়েছিলেন। ১৪ মাঘ অর্থাৎ ২৮ জানুয়ারি শান্তিনিকেতনে দ্বিজেন্দ্রনাথের শ্রাদ্ধানুষ্ঠান, তাই আগের দিন রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় কিরণবালার পিতৃগৃহের ঠিকানায় ক্ষিতিমোহনকে টেলিগ্রামে জরুরি বার্তা পাঠালেন সেইদিনই শান্তিনিকেতনে ফিরে যাওয়ার জন্য :

Santiniketan — Date / Hour / Minute: 27 10 5

Kshitimohan Sen
A 400 Russa Road South
Tollygunge Calcutta

Come positively tonight for
sradh ceremony
tomorow—Rabindranath[৪৮৯]

বড়োদাদার শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে মন্ত্রপাঠের জন্য এই ত্বরিত আহ্বান, ক্ষিতিমোহনের না গেলেই নয়। এই শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের বিবরণ আছে শান্তিনিকেতন পত্রিকায় :

> ১৪ মাঘ পরলোকগত আত্মার মঙ্গালকামনায় শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পন্ন হয়। ছাতিমতলায় শ্রাদ্ধবাসর হইয়াছিল। ঠাকুর পরিবারের প্রথামত শাস্ত্রপাঠ করিয়া এই ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। দ্বিজেন্দ্রনাথের পৌত্র শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর দান ও বৃষউৎসর্গাদি করেন। দ্বিজেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ ভ্রাতা আচার্য রবীন্দ্রনাথও উপস্থিত ছিলেন। শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন ও শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী আচার্যের কাজ করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত ভীমরাও শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত গোখ্‌লে, শ্রীযুক্ত রঙ্গাস্বামী ও শ্রীযুক্ত আয়ারস্বামী এই উপলক্ষ্যে বেদপাঠ করেন।
>
> বিকালবেলায় আম্রকুঞ্জে তাঁহার জীবনী আলোচনার জন্য একটি সভা আহূত হয়। প্রথমে শ্রীযুক্ত ভীমরাও শাস্ত্রী গীতাপাঠ করেন, তৎপরে শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন মহাভারতের শান্তিপর্ব হইতে কিয়দংশ পড়িয়া তাহার ব্যাখ্যা করেন। শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী বড়বাবুর জীবনের কয়েকটি ঘটনা বিবৃত করেন। অবশেষে শ্রীযুক্ত নেপালচন্দ্র রায় বাংলাসমাজের উপর বড়বাবুর প্রভাব সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করেন।[৪৯০]

কথকতা। গুজরাতে আবার

পঁচিশে বৈশাখ সেবার শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রজন্মোৎসবে ক্ষিতিমোহন উপস্থিত ছিলেন।[৪৯১] গ্রীষ্মাবকাশ শুরু হয়ে গেলেও বেরিয়ে পড়বার সুযোগ ছিল না, সামনেই মেজো মেয়ে মমতার বিয়ে। কবির জন্মদিনে উত্তরায়ণে সন্ধ্যাবেলায় 'নটীর পূজা'-র প্রথম অভিনয় হল, শান্তিনিকেতনের নাটক ও নৃত্যচর্চার ইতিহাসে সে অভিনয় এক নবযুগের সৃষ্টি করেছিল, সকলেই জানেন। নটী শ্রীমতীর ভূমিকায় নন্দলাল বসুর কন্যা গৌরী দেবীর অনবদ্য অভিনয় ও নৃত্য চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। তাঁর সহ-অভিনেত্রীরাও সামান্য দক্ষতার পরিচয় দেননি। মমতা সেন রাজকন্যা বাসবীর ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন, তখন তাঁর বিয়ের ঠিক হয়ে গেছে। মমতার ভাবী স্বামী শৈলেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত তখন কটকের র‍্যাভেন্শ কলেজের অধ্যাপক। অমিতা সেন লিখেছেন :

> পঁচিশে বৈশাখের উৎসবে ভাবী বর এলেন শান্তিনিকেতনে, সঙ্গে ক'জন তাঁর আপনজন। উৎসবের আগের বিকেলবেলা লাবুদিকে সঙ্গে করে তাঁরা উত্তরায়ণে রবীন্দ্রনাথের কাছে গেলেন। সন্ধ্যায় যখন আমার মা উত্তরায়ণে গেলেন, রবীন্দ্রনাথ অনুযোগের সুরে বললেন, "তোমার আক্‌কেলটি কিরকম বলো তো কিরণ, লাবুর ভাবী শ্বশুরবাড়ির সব এসেছেন, আর আজ তুমি তাকে ঐ বেগুনি রঙের শাড়ি পরতে দিলে?" বিশ্ব জুড়ে যে কবিকে নিয়ে আজ কত গবেষণা, সেদিনের বালিকাদের ঘিরে তাঁর ভাবনাচিন্তায় তিনি ছিলেন আমাদেরই একজন ঘরের মানুষ।[৪৯২]

মমতার বিবাহঅনুষ্ঠান হল কলকাতায়, ২৮ মে ১৯২৬, ১৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩। তখন রবীন্দ্রনাথ সমুদ্রপথে চলেছেন ইতালির দিকে, ১২ মে তিনি যাত্রা করেন। আশ্রমবালিকা 'কল্যাণীয়াসু লাবী'-র নবজীবনে যাত্রারম্ভের প্রাক্কালে বহু দূরবর্তী রোহিত সমুদ্র থেকে আশ্রমগুরুর আশীর্বাণী এসে পৌঁছোল।[৪৯৩] আর এবারকার বিদেশভ্রমণে ক্ষিতিমোহনের

কাছে যখন এসে পৌঁছোল তাঁর 'কুশল সম্ভাষণ', তখন তিনি গিয়ে পৌঁছেছেন নরওয়ে, আগস্ট মাসের শেষ সপ্তাহে। সেখান থেকে তিনি লেখেন :

> প্রীতি নমস্কার
>
> নরওয়ের বনরাজিশ্যামল শৈলমালাবন্ধুর দিগন্তপথে প্রাতঃসূর্য্যের প্রথম কিরণসম্পাতে প্রবুদ্ধ রবীন্দ্রনাথের কুশল সম্ভাষণ
>
> শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন[৪১৪]

পরে অধ্যাপক শৈলেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত লখনউ বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস বিভাগে অধ্যাপনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সেই অবধি স্বামীর কর্মস্থলেই মমতার বিবাহিত জীবন কেটেছে। সে-কালের লখনউ শহরে বহু বিদ্বান ও গুণী মানুষের সমাবেশ ছিল। তাঁদের অনেকের সঙ্গেই আগে থেকেই ক্ষিতিমোহনের পরিচয় বা হৃদ্যতার সম্পর্ক ছিল। কন্যা-জামাতা লখনউতে সংসার পাতলে ক্ষিতিমোহনেরও সুযোগ হয়েছিল সেখানে বেশ কয়েকবারই যাওয়ার। তিনি গেলে প্রতিদিন কোথাও না কোথাও আলাপ-আলোচনার আসর বসত। তাঁর আসার অপেক্ষায় সেখানকার অনুরাগী বন্ধুজনেরা উৎসুক হয়ে থাকতেন। এই প্রসঙ্গে গীতা চক্রবর্তী লিখেছেন :

> ক্ষিতিমোহনের চরিত্রের আর একটি দিকের সঙ্গে পরিচিত হবার দুর্লভ সৌভাগ্য আমার দুই-একবার হয়েছিল—বুদ্ধদেব বসু যাকে বলেছেন তাঁর 'কথকতা প্রতিভা', সামনে বসে শোনা সেই কথকতা। তাঁর কন্যা মমতার স্বামী প্রফেসর দাশগুপ্ত তখন লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনায় নিযুক্ত ছিলেন। ঐ পাড়ায় বহু বাঙ্গালী ও উত্তরপ্রদেশের অধ্যাপক চিকিৎসক ইত্যাদি শিক্ষিত গুণগ্রাহী মানুষের বাস ছিল। ধূর্জটিপ্রসাদ, রাধাকমল-রাধাকুমুদ ভ্রাতৃদ্বয়, নির্মল সিদ্ধান্ত এমন অনেকেরই উল্লেখ করা যায়। সকলের সাগ্রহ অনুরোধে কখনও তাঁর কন্যার গৃহে, কখনও অন্য কারও গৃহে ক্ষিতিমোহনের কথকতার সভা বসত। এই মানুষটিকে সর্বার্থেই 'সভা-উজ্জ্বল' বলা যেত। যে-কোনো সভায় মধ্যমণি হয়ে বসার ক্ষমতা তাঁর ছিল।
>
> তিনি কখনও একটি বিষয় নিয়ে বলতেন—তাঁর সরস সাবলীল ভাষায় শ্রোতাদের সমস্ত মনোযোগকে তাঁর বক্তব্যে আগাগোড়া অচঞ্চল রেখে বলে যেতেন। আবার কখনও বৈঠকীভাবে সকলের মধ্যে কথাবার্তা হতে হতে খানিক পরে দেখা যেত তিনিই একা বক্তা, বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে অনায়াস তাঁর বিচরণ। তারই মাঝে থেকে রসিকতাগুলি ঝলকে উঠছে—'যেন ঢেউয়ে ঢেউয়ে রবির কিরণ দোলে আসি'। এখন পরিতাপ হয় কেন সেগুলিকে কারও লিপিবদ্ধ করে ধরে রাখার কথা মনে হয় নি। মনে হত অমন সুন্দর সরস ও বিদগ্ধ কথকতার স্রোত বুঝি বরাবরই অমনি অগাধ দাক্ষিণ্যে বয়ে চলবে।
>
> কত ভুলে যাওয়া কথার মধ্য থেকে মনে পড়ছে একদিনের কথা। সেদিন আমাদের পিতৃগৃহে সকলের সমাগম। আমার ঠিক ওপরের দিদি যাঁকে নদি বলি—ব্যস্ত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন সমস্ত ব্যবস্থা নিখুঁতভাবে যাতে সম্পন্ন হয়। আমার ছোটখাটো কোনো একটা কথা মনে পড়ে যাওয়াতে অনুচ্চ স্বরে 'নদি শোন' বলে তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাইলাম বটে, কিন্তু পারলাম না, তিনি দ্রুতবেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। আমি নিরাশ দৃষ্টি সামনে ফেরাতেই ক্ষিতিমোহনের সঙ্গে দৃষ্টি-বিনিময় হল। তিনি নিচু গলায় ও মৃদুহাস্যে বললেন, 'নদী আপনবেগে পাগলপারা'। এই সব রঙ্গরসিকতা, আবার তারই মাঝে স্বল্পখ্যাত মরমীয়া কবিদের রচনা থেকে হাল্কা সুরেই গভীর কথা শুনিয়ে দিতেন। একবার ওই রকম একটি চার ছত্রের

ক্ষুদ্র মারাঠি কবিতা উপস্থিত সকলের মনেই গভীর রেখাপাত করে। আমার মায়ের কলমে তার সাবলীল অনুবাদে .

প্রদীপ ধরি সাধিনু গৃহকাজ
তপনে যবে বিদায় দিনু সাঁঝে।
সহসা দেখি মেলে না আঁখি আর
কমলকলি, মানস-সরঃ মাঝে।।

তাই ভাবি প্রদীপের আলোয় গৃহকাজ সুসম্পন্ন হয় সন্দেহ নেই, ও উপস্থিত মত তাতেই চাহিদা মিটে যায়। কিন্তু অন্তরের কমল-কলিকাটিকে ফুটিয়ে তুলতে ভোরের আলোর জন্য যে অভিনিবেশ ও ব্যাকুল প্রত্যাশা, তাকে জাগিয়ে রাখার কাজে যাঁরা আমাদের উদ্বুদ্ধ করতেন, একে একে কোথায় হারিয়ে গেলেন তাঁরা।[৪৯৫]

১৯২৬ সালের মাঝামাঝি ক্ষিতিমোহন-কন্যা মমতার বিবাহ হল এবং তখন তাঁর স্বামীর কর্মস্থল কটকে হলেও অল্পদিন পরে তাঁরা কর্মসূত্রে লখনউতে বসতি করলেন, এই প্রসঙ্গ ধরে এ-সব কথা এসে গিয়েছিল। এখন আবার সেইখানে ফিরি। সে বছর পুজোর ছুটিতে ক্ষিতিমোহনের নিমন্ত্রণ ছিল গুজরাতে। এ দেশ তাঁর বহুকালের চেনা। সন্তদের জীবন ও সাধনা সম্পর্কে জানতে, তাঁদের বাণী সংগ্রহ করতে এখানে অনেকবার এসেছেন, ঘুরে বেড়িয়েছেন এই প্রদেশের গ্রামে-গ্রামান্তরে। কোনো সহায় নেই, সম্বল নেই, তবু এই-সব মহামূল্য রত্ন লাভের আশা বুকে নিয়ে প্রচণ্ড দাবদাহ উপেক্ষা করে তিনি দিনের পর দিন ঘুরেছেন। মানুষের সঙ্গে পরিচয়ের পরিধিও ছিল বেশ ব্যাপ্ত, তার পর আবার ১৯২০ সালে তিনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গী হয়ে আমেদাবাদে এসেছিলেন, নতুন অনেক মানুষের সঙ্গেও তখন পরিচয় হয়েছিল। সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়েছিলেন করুণাশংকর কুবেরজি ভট্ট, তাঁর কথা আগেই একটু বলেছি। ক্ষিতিমোহন তাঁকে সম্বোধন করতেন 'মাস্টারজী', আর তিনি ক্ষিতিমোহনকে ডাকতেন 'বাবুজী'। করুণাশংকরজি গান্ধীজির আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সংখেরা জেলায় কোসিন্দ্রা গ্রামে একটি আশ্রম স্থাপন করেছিলেন। কৃষক সম্প্রদায়ের ছেলেদের উন্নততর কৃষিকাজের প্রশিক্ষণ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের মনোভূমির কর্ষণও তাঁর লক্ষ্য ছিল। আঞ্চলিক কৃষকদের অর্থসাহায্যেই চলত আশ্রম। কোসিন্দ্রাসংলগ্ন গ্রাম কাশীপুরা, মাঝে কেবল ছোট্ট একটি নদী বয়ে যাচ্ছে, হরিণী তার নাম। এই দুই গ্রামে একযোগেই চাষবাসের উন্নয়ন ও আত্মোন্নতির ব্রত গৃহীত হয়েছিল। ১৯২৬ সালের অক্টোবরে ক্ষিতিমোহন এলেন এই আশ্রমে করুণাশংকরজির আমন্ত্রণে। তিনি আসতে করুণাশংকরজি, শিবাভাই প্রমুখ বরোদায় এলেন তাঁকে নিয়ে যেতে। তাঁরা যখন পৌঁছোলেন, অন্ধকার রাতে ভজনমণ্ডলী হাতে মশাল নিয়ে হনুমানদেরী পর্যন্ত এসে তাঁকে তিন মাইল আগে থেকে স্বাগত জানিয়ে আশ্রমে নিয়ে গেলেন। নবীন উৎসাহের জোয়ার বইল যেন। আশ্রমে চারিদিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, দেওয়ালে কোথাও কোথাও স্তোত্র বা শ্লোক লেখা হয়েছে। ক্ষিতিমোহনকে ঘিরে উৎসুক মানুষের ভিড়। তাঁরাও ডাকেন 'বাবুজী', কেউ বা বলেন 'ক্ষিতুভাই'। সেবার আশ্রমে ক্ষিতিমোহন ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থার ধারা সম্পর্কে

ধারাবাহিক ভাষণ দিয়েছিলেন। প্রথমে কোসিন্দ্রায়, তার পর কয়েক দিন কাশীপুরায়। শ্রোতা ছিলেন আশ্রমের বিদ্যার্থী ও শিক্ষকরা। তা ছাড়া ক্ষিতিমোহনের টানে আমেদাবাদ থেকে এসেছিলেন অনেকে—রসিকলাল, ছোটালাল পারিখ, রামনারায়ণ পাঠক, হরিপ্রসাদ পীতাম্বরদাস মেহতা, হরিপ্রসাদ ব্রজলাল দেশাই প্রমুখ। গ্রামবাসীরাও তাঁর ব্যাখ্যান শুনতে আসতেন। ক্ষিতিমোহন যে কয়দিন ছিলেন সকালে দুপুরে এবং আবার সন্ধ্যায় তাঁর ভাষণ হত, কখনও কখনও রাত্রেও তিনি বলতেন। ফলে গ্রামবাসীরাও কাজের অবসরে নিজেদের সময়-সুযোগমতো তাঁর ব্যাখ্যানসভায় যোগ দিতে পারতেন, কেউ বঞ্চিত হতেন না। মোট চোদ্দোটি ভাষণ দিয়েছিলেন ক্ষিতিমোহন, তার অনুলিখন করেন রসিকভাই ও অন্যান্যরা। সেবার পরবর্তীকালে শান্তিনিকেতনের ছাত্র জয়ন্তীলাল আচার্য এখানেই তাঁকে প্রথম দেখেন। তিনি লিখেছেন :

> খবর পেলাম রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন থেকে এক বাঙালি ভদ্রলোক কাশীপুরায় এসেছেন। বৃক্ষচ্ছায়ায় বসেছিলেন—কবুণাশংকরজী, বালক নারী বৃদ্ধ সকলে একত্রিত। এমন কখনও দেখিনি। অনেক কিছু নতুন নতুন জানলাম— মাঝে মাঝে রবীন্দ্রকাব্যের উল্লেখ, বাউলের কথা আসে, বেদের কোনো মন্ত্রের উচ্চারণ হয়, কুমারসম্ভবের শ্লোক, উপনিষদের সূত্র, কবীর দাদূ ইত্যাদি ভক্তদের বাণী আবার মাঝে মাঝে এমন হাসির কথা যে হাসতে হাসতে পেটে ব্যথা ধরে যায়। যেমন মানুষ কথাগুলিও তেমনই। প্রাণ ভ'রে গিয়েছিল। তখন ভাবি নি একদিন ভবিষ্যতে ইনি আমার শিক্ষাগুরু হবেন।

এই ভাষণগুলি থেকে প্রথম নয়টি নিয়ে ১৯৪৭ সালে গুজরাতি ভাষায় 'শিক্ষণ সাধনা' নামে একটি বই প্রকাশিত হয়। চতুর্দশ ভাষণের বিষয় ছিল বৃক্ষরোপণ, সেটি এই গ্রন্থে স্থান পায়নি। পরে 'সাধনাত্রয়ী' গ্রন্থে তাঁর কয়েকবারের ভাষণের সঙ্গে সেটিও অন্তর্ভুক্ত হয়।[৪৯৬] সেবারই—১৯২৬ সালে, ক্ষিতিমোহন কোসিন্দ্রা আশ্রমের বৃক্ষরোপণ উৎসবে পাঁচটি বৃক্ষচারা রোপণ করেছিলেন। সেই উপলক্ষে বলেছিলেন : 'এখানে গৌরীপূজার সময় মায়েরা যে-ভাবে নিজেদের সন্তানদের স্নেহের রসে পোষণ করেন, সেই রকম এই গাছগুলিরও পোষণ করেন এই আমার অপেক্ষা।' চিনে এক পরলোকগত প্রাচীন ঋষির কমণ্ডলু ও জপমালা ভারতে নিয়ে যাওয়ার জন্য তাঁকে উপহার দেওয়া হয়েছিল। সেই ঋষি চেয়েছিলেন ওই জপমালা নিয়ে ভারতের তীর্থপরিক্রমা করবেন। ক্ষিতিমোহন সেই মালা কয়েকটি তীর্থে নিয়ে গিয়েছিলেন।[৪৯৭] এবার এই দুটি জিনিস কোসিন্দ্রায় উপহার দিয়ে তিনি বলেন পঞ্চবটি স্থাপনে এখানকার ভূমি পবিত্র হয়েছে। অর্থাৎ এই ভূমি তীর্থভূমি হয়েছে বলেই এই জপমালা ও কমণ্ডলু এখানেই তিনি দিয়ে গিয়েছিলেন। আরও কয়েকবার গুজরাতে কোসিন্দ্রা-কাশীপুরার আশ্রমে আসর জমিয়ে বসেছেন ক্ষিতিমোহন। তিনি এলে আমেদাবাদ থেকে বন্ধু ও গুণগ্রাহীরা, প্রাক্তন ছাত্ররা এবং অন্য আগ্রহী মানুষ এসে জড়ো হতেন সেখানে। সকলে মিলে আশ্রমিক পরিবেশে খুব আনন্দে কাটত। আগেই বলেছি ১৯২৬ সালে যখন আসেন, তাঁর আলোচনার মুখ্য বিষয় ছিল শিক্ষার সাধনা। পরের বার সপরিবারে এলেন ১৯২৮ সালে। সেবার চিন ও জাপান

ভ্রমণের গল্প করলেন অনেকগুলি অধিবেশনে। আবার যখন ১৯৩৮ সালে আসেন, রবীন্দ্রনাথের 'প্রান্তিক' কাব্য নিয়ে অনেকগুলি ভাষণ দেন। সে বিষয়ে পরে আমরা আলোচনা করব।

যথাসময়ে আশ্রমে ফিরেছেন, নিয়মমতো কাজকর্ম চলছে। তার মধ্যে একদিন পিয়র্সন সাহেবের মৃত্যুতিথি পালিত হল। সেদিন ২৪ সেপ্টেম্বর। পিয়র্সন-অনুরাগী ছাত্ররা নিজেদের শ্রমে তাঁর নামে একটি রাস্তা তৈরি করেছে, সেই রাস্তার উপরেই সেবার স্মৃতিসভার আয়োজন। সভায় কালীমোহন বিধুশেখর ও ক্ষিতিমোহন পরলোকগত আশ্রমবন্ধু সম্পর্কে কিছু বললেন, পথটিরও উদ্‌বোধন হল।[৪৯৮] বিদেশ থেকে রবীন্দ্রনাথ ফিরে এলেন ডিসেম্বরের মাঝামাঝি নাগাদ। বিচিত্র কর্মব্যস্ততা তাঁর, নানা আহ্বানে বারবার কলকাতাতেও যেতে হয় তাঁকে। তার উপরে কলকাতায় জানুয়ারি মাসে 'নটীর পূজা' অভিনয়ের কথা, তার মহড়াতেও অতিশয় ব্যস্ত থাকেন। এই সবের মধ্যেই নিজের দুটি পারিবারিক ক্রিয়ায় ক্ষিতিমোহনকে আচার্য-পদ গ্রহণের অনুরোধ জানিয়ে একটি চিঠি লিখলেন কলকাতা থেকে, তাঁর প্রবল ব্যস্ততার সুর সেই চিঠিতেও লেগেছে যেন :

ওঁ

6 Dwarakanath Tagore Street
Calcutta

প্রীতিনমস্কার নিবেদনমেতৎ

নিবেদন এই যে আগামী ১১ই মাঘে আমাদের বাড়িতে যে সাম্বৎসরিক উৎসব হয় তাতে আপনাকে আচার্য্যের কাজ করতে হবে। নম্বর দুই—২৪শে মাঘে জয়ার অসবর্ণ বিবাহে পৌরোহিত্যভার আপনাকে গ্রহণ করতে হবে সুরেনের এই একান্ত ইচ্ছা। অনুনয় এই যে দরবার মঞ্জুর করবেন। মোকাবিলায় আবেদনের ইচ্ছা ছিল কিন্তু লেখনীযোগে কথাটা আরো পাকা হতে পারবে। ইতি ৩ মাঘ ১৩৩৩।[৪৯৯]

জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির দালানে ১১ মাঘ আদি ব্রাহ্মসমাজের প্রভাতি অনুষ্ঠানে বেদ পাঠ প্রভৃতি দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন ক্ষিতিমোহন যুগ্মভাবে আচার্যের কাজও করেছেন, হয়তো প্রধান আচার্যের দায়িত্বও আরও কয়েক বছর আগে থেকেই পালন করে আসছেন। এবারেও মূল আচার্যের আসন গ্রহণ করতে আহ্বান এল, আর তার পরেই সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা জয়শ্রীর বিবাহে পৌরোহিত্য করার। সম্ভবত বৈদিক প্রথায় বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পাদন তাঁর এই প্রথম।

আবার নৈরাশ্য

কিছুদিন পরে ক্ষিতিমোহনের জীবনে দুটি বিদেশভ্রমণসম্ভাবনা একই সঙ্গে দেখা দিয়ে প্রায় এক সঙ্গেই মরীচিকার মতো মিলিয়ে গেল। কিছুদিন থেকে জাভা-বালী-সুমাত্রা-শ্যাম প্রভৃতি দূরপ্রাচ্যের দেশগুলিতে ঘুরে আসবার ইচ্ছা মনে মনে লালন করছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

ভাবনাটা যে আনকোরা নতুন তাও নয়. কেননা ১৯২৪ সালে তাঁরা যখন চিন ও জাপান গেলেন, তখনই সেই সঙ্গে দূরপ্রাচ্যে যাওয়ার পরিকল্পনাও শোনা গিয়েছিল। বাস্তবে অবশ্য তা সম্ভব হয়নি। ২৯ চৈত্র ১৩৩৩ শান্তিনিকেতন থেকে বিখ্যাত ভারতীয় ব্যবসায়ী ঘনশ্যামদাস বিড়লাকে লেখা চিঠিতে তিনি নিজের অভিপ্রায় ব্যাখ্যা করে এই উদ্যোগে আর্থিক দায়িত্ব গ্রহণের জন্য তাঁকে অনুরোধ করেন। প্রসঙ্গত ক্ষিতিমোহনের মতো শাস্ত্রজ্ঞ পন্ডিতকে এই যাত্রায় সঙ্গী করার প্রয়োজনীয়তার কথাও উল্লেখ করেছিলেন। চিঠিটি উদ্ধৃত করি :

ওঁ

Visva Bharati
Santiniketan
Bengal

মহোদয়েষু

বিনয় সম্ভাষণ পূৰ্ব্বক নিবেদন,

ভারতবর্ষের [বাহিরে] যে কোনো দেশের সহিত বিদ্যায় বা ব্যবহারে ভারতবর্ষের যোগ আছে আপনি সেই যোগসূত্রকে স্বীকার করিবার ও দৃঢ়তর রাখিবার জন্য উৎসাহী ইহা আমি অবগত আছি। যবদ্বীপ ও বলীদ্বীপে ভারতের প্রাচীন সভ্যতার প্রভাব এখনো অনেক পরিমাণে বৰ্ত্তমান। বস্তুত বলীদ্বীপের ধর্ম্ম হিন্দু ধৰ্ম্ম। সেখানকার অধিবাসীরা ভারতবর্ষের সঙ্গে অনেকদিন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আছে। তাহাদের সহিত প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ স্থাপন করা আমাদের কর্ত্তব্য ইহাতে সন্দেহ নাই। এই উদ্দেশ্য মনে রাখিয়া আমি যদি সেখানে যাই তবে আমার বিশ্বাস আমি কৃতকাৰ্য্য হইতে পারিব। সেখানকার রাজপুরুষরাও আনন্দে সমাদর ও আমায় সহায়তা করিবেন ইহা আমি জানি।

যদি সেখানে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভবপর হয় তবে শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়ের মত একজন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতকে সঙ্গে লওয়ার প্রয়োজন হইবে। এই উদ্যোগের ব্যয় বহনে যদি আপনার সম্মতি থাকে তবে সেখানকার গভর্ণমেণ্টের সহিত লেখাপড়া করিয়া এই চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইতে পারিব। এই ভারগ্রহণ করিতে আপনি ইচ্ছা করেন কিনা আমাকে অনুগ্রহপূর্ব্বক জানাইলে আমি যথোচিত ব্যবস্থা করিতে পারি। ইতি ২৯শে চৈত্র ১৩৩৩

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর[৩০০]

পিতার পক্ষে পুত্র যুগলকিশোর বিড়লা রবীন্দ্রনাথের চিঠির উত্তর দিয়ে থাকবেন, কারণ তাঁকে লেখা চিঠি পাওয়া যাচ্ছে এই প্রসঙ্গে, যদিও চিঠিটি তারিখহীন তবু অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক :

মহোদয়েষু

বিনয়সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন

আপনার সাদর পত্র পাইয়া আনন্দ বোধ করিলাম।

জাভা হইতে নিমন্ত্রণলিপি পাইয়াছি। সেখানে সমস্তই প্রস্তুত। ব্যয় সম্বন্ধে আপনার আনুকূল্য যদি পাই তবে অবিলম্বে সেখানকার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিব। এই সময়টি অতীত হইয়া গেলে

ভবিষ্যতে সহজে এমন সুযোগ আর ঘটিবে না এই কারণেই আমি এমন আগ্রহ বোধ করিতেছি।

শুনিয়া আনন্দিত হইলাম যে শ্রীযুক্ত নারায়ণদাস বাজোরিয়া ক্ষিতিমোহনবাবুকে ভারতীয়বিদ্যাপ্রচার উদ্দেশ্যে য়ুরোপে সঙ্গে লইয়া যাইবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। এ প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইলে কল্যাণকর হইবে। যদি ঘনশ্যামবাবুর সম্মতি পান তবে ক্ষিতিবাবু চলিয়া যাইবেন। তাঁহার পরিবর্তে আমরা অন্য উপযুক্ত পণ্ডিতকে সঙ্গে লইব।

আমার সমস্ত কাজ করিবার জন্য একজন সেক্রেটারি লওয়ারও প্রয়োজন আছে।

য়ুরোপে যখন ছিলাম তখন শ্যামদেশের কোনো রাষ্ট্রবিভাগের কর্ম্মচারী আমাকে সেখানে যাইবার জন্য বার বার অনুরোধ করিয়াছিলেন। সুযোগ ও অবকাশ পাইলে সেখানে যাইব এমন প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলাম। শ্যামের নিকটবর্ত্তী ফরাসী কাম্বোডিয়ার প্রাচীন মন্দির প্রভৃতি কীর্ত্তি দেখিবার জন্যও নিমন্ত্রণ আছে। জাভা দ্বীপে কৃষিকার্য্যের যেরূপ ব্যবস্থা তাহা অসামান্য। ভারতবর্ষের কৃষির উন্নতিকল্পে তাহা বিশেষভাবে পরিদর্শন করা আবশ্যক। ভ্রমণ ও তথ্যসংগ্রহ কার্যে ১৫ হইতে ২০ হাজার পর্য্যন্ত ব্যয় হইবার সম্ভাবনা আছে। যদি প্রসন্ন হইয়া আনুকূল্য করেন তবে উৎসাহিত হইব এবং ইহাতে আমাদের দেশের স্থায়ী উপকার হইবে বলিয়া আশা করি।

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্র[৫০১]

জানা যাচ্ছে ইতিমধ্যে ক্ষিতিমোহনের কাছে আর-এক ধনী ব্যবসায়ী বাজোরিয়ার তরফ থেকে তাঁদের অর্থসাহায্যে ইউরোপ যাওয়ার প্রস্তাব এসেছিল। ক্ষিতিমোহন উৎসাহবোধ করেন এবং এ ব্যাপারে পরামর্শ করেন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে। তিনিও উৎসাহ দিলেন এবং বিড়লাদের কাছে নিজের দূরপ্রাচ্যভ্রমণ-পরিকল্পনা-বিষয়ক উদ্দেশ্য সফল করতে ক্ষিতিমোহনের পরিবর্তে আর কোনো শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ব্যক্তিকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা জানালেন। ক্ষিতিমোহনের কাছে এ প্রস্তাব কীভাবে এবং কেন এসেছিল বলা যাবে না। আমরা শুধুমাত্র ক্ষিতিমোহনের কাগজপত্রের মধ্যে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র জীতেন্দ্রমোহন সেনের লেখা একটি তাগিদপত্র দেখেছি এবং সেই একই খামের মধ্যে তাঁকে লেখা G. D. Loyalaka & Co. Bankers and Stock and Share Brokers-এর চিঠি দেখেছি। যদি পরে কোনো সূত্র আবিষ্কার হয়, এই আশায় সে চিঠি দুটি এখানে তুলে দেওয়া গেল :

United Advertising Agency

Sankar
63 College street. Calcutta
150 Amherst St
Calcutta
20th [May 1927]

শ্রীচরণেষু

Mr. Ram Narain Bajaria Aden থেকে টেলিগ্রাম করেছেন, আপানকে পাঠিয়ে দিতে। আপনি possible হলে Mr. Bajaria'র friend Mr. Ram Kumar Khemka'র সঙ্গে, 63 College St এ দেখা করবেন; তিনি আপনার বার্থ (Berth) reserve করে দেবেন।

যদি তাঁকে ঐ ঠিকানায় না পান তবে Amal Home'র (Mr. Khemka'র বন্ধু) সঙ্গে দেখা করলেই তিনি Mr. Khemka'র খবর দেবেন। আপনি at once চলে আস্‌বেন। আপনাকে ওরা একটা telegram‌ও করবে, তার ওপরেও এই চিঠি লিখতে বলেছে—আমরা সব ভাল—

ইতি স্নেহের "শঙ্কর"[৫০২]

দ্বিতীয় চিঠিটাও এক দিনেই লেখা :

G. D. Loyalka & Co.
Bankers
Stock and share Brokers
Telegraphic Address :—
"Loyalwalla"
Phones . Office—3589 Calcutta
Residence—2809 Cal.

P.O. Box No. 324
1, Royal Exchange Place
Calcuta 20th May 1927

Pundit Kshitimohan Sastri
P.400, Russa Road
Tollygunge. Calcutta.

Dear Sir,

On his way to [...] Mr. Narayandasji Bajoria requested us to have a passage for you by the next ship bound for Europe. We shall be much obliged if you will kindly call at our office for reservation of ticket.

Yours faithfully
G.D. Loyalka & Co[৫০৩]

তাগিদ এবং অনুরোধ গেল তাঁর টালিগঞ্জে শ্বশুরবাড়ির ঠিকানায় ২২ মে, সেখান থেকে ঠিকানা বদল হয়ে ২৩ মে পৌঁছোল ১৪৫ দয়াগঞ্জ রোড, নারিন্দা, ঢাকা—এই ঠিকানায়।

তখন গরমের ছুটি চলছে। কিন্তু ততদিনে ক্ষিতিমোহনের কাছে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে বাজোরিয়া তাঁকে বিশ্বভারতীর প্রতিনিধিরূপে ইউরোপ নিয়ে যাওয়ার কথা ভাবছেন না। এইটুকুই ক্ষিতিমোহনের দ্বিধান্বিত হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট ছিল, আর আমাদের ধারণা সেইসঙ্গে তাঁর সম্ভাব্য পৃষ্ঠপোষক এমন কোনো শর্তাধীনে তাঁকে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন যা তাঁদের ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যসাধক এবং হিন্দু ধর্মাচরণের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গিসঞ্জাত। আচার্য ক্ষিতিমোহন সেনের কনিষ্ঠা কন্যার কাছে এমন ইঙ্গিত আমরা পেয়েছি। বিশ্বভারতীকে সাহায্য করবার সদিচ্ছা যখন তাঁদের ছিল না, ব্যক্তিগত কোনো উদ্দেশ্যসাধন করতে না চাইলে ক্ষিতিমোহনকে তাঁদের সঙ্গে ইউরোপে নিয়ে যাওয়ার নেপথ্যকারণ কী ছিল, এ প্রশ্ন স্বভাবত মনে আসে। আর তাঁদের উদ্দেশ্য নিঃস্বার্থ এবং উদার হলে ক্ষিতিমোহন পিছিয়ে এলেন কেন শেষপর্যন্ত। তাঁর দ্বিধার কথা আমরা জানতে পারি রবীন্দ্রনাথের চিঠি

থেকে। ক্ষিতিমোহন তাঁর দ্বিধার কথা নিশ্চয় জানিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথকে। রবীন্দ্রনাথ শিলং থেকে লিখলেন :

Uplands ওঁ 6 Dwarakanath Tagore Street
Shillong Calcutta

প্রীতিনমস্কারপূর্ব্বক নিবেদন

কিছুকাল [পূর্বে] আপনার ঢাকার ঠিকানায় চিঠি পাঠিয়েছিলুম। তার কোনো উত্তর পাই নি। কি স্থির করলেন কোনো উত্তর পাওয়া গেল না। য়ুরোপ যাওযার সম্বন্ধে আপনার মনে দ্বিধা উঠেছে। সে স্থলে যাওয়া বন্ধ করাই ভালো। নিশ্চিত বিশ্বাসে কোনো পরামর্শ দেওয়া কঠিন। য়ুরোপে যথাস্থানে যদি পৌঁছোতে পারেন তবে প্রতিষ্ঠালাভ করতে পারবেন বলে আমার ধারণা। যে সংসর্গে যাবার কথা তাতে ঠিক সেই সুযোগ ঘটবে কিনা ভালো বুঝতে পারছি নে। কলকাতায় আপনার কথা শুনে বোধ হয়েছিল ওরা বিশ্বভারতীর যোগে আপনাকে পাঠাতে রাজি হয়েছিল। তখন এমন একটা তাড়াতাড়ি ও গোলমাল যে, স্পষ্ট করে কিছুই বুঝবার সুযোগ পেলুম না। এখন তো বোধ হচ্ছে ওরা বিশ্বভারতীর সম্পর্ক স্বীকার করবার কোনো ব্যবস্থা করে নি। য়ুরোপের বিদ্বানসমাজে ওরা যে কোনো স্থান পাবে এমন আশামাত্র নেই। অতএব এ সময়ে য়ুরোপে যাত্রা হয়ত আপনার পক্ষে নিষ্ফল হবে। আর্থিক দিক থেকে প্রচুর সুবিধা ঘটেছিল বলেই প্রস্তাবটা আমার কাছে লোভনীয় ঠেকেছিল। যাইহোক কি স্থির করলেন জানাবেন। বিরলার কাছ থেকে এখনো শেষ খবর পাইনি—দেরী দেখে বোধ হচ্ছে জাভা যাবার পাথেয় জুটবে না।

আপনার কলকাতার ঠিকানা হারিয়ে ফেলেচি—বিস্মরণ শক্তিবশত ভুলেও গেছি। তাই কিরণের শেষ চিঠির উত্তর দিতে পারছিলুম না। এ চিঠিখানা অগত্যা শান্তিনিকেতন ঠিকানায় পাঠাই—কবে পাবেন বলতে পারি নে।

এখানে হাওয়া বদল হয়েচে কিন্তু তার শুভ ফল এখনো পাই নি। আমি অসুস্থ হয়েছিলুম এখন পুপের অসুখ চলচে। শিলঙের অধিবাসীরা ইচ্ছে করচে আপনি এখানে আসেন—আমিও সেই ইচ্ছার সঙ্গে আমার ইচ্ছা যোগ করি। ইতি ১৪ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর[৫০৭]

বোঝা যাচ্ছে এই চিঠির আগেও একটা চিঠি রবীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গে ক্ষিতিমোহনকে লিখেছিলেন, হয়তো সে চিঠি ক্ষিতিমোহনের হাতে পৌঁছোয়নি, উত্তর না পেয়ে তিনি কী স্থির করলেন বুঝতে না পেরে আবার লিখলেন। ক্ষিতিমোহনের দীর্ঘকাল অন্তরলালিত একটি বাসনা ফলবান হয়ে ওঠার পরিবর্তে এমন সমূলে শুকিয়ে গেল অনুভব করে রবীন্দ্রনাথের হয়তো বা খারাপ লাগছিল একটু। আরও মাসখানেক আগেই তিনি এই প্রসঙ্গে কিরণবালাকে প্রায় একই কথা লিখেছিলেন .

ওঁ

6 Dwarakanath Tagore Street
Calcutta

কল্যাণীয়াসু

তোমার চিঠি হারিয়ে ফেলে এবং কলকাতার ঠিকানা ভুলে গিয়ে এতদিন চিঠি লিখতে পারি [নি]। আজ হঠাৎ আবিষ্কার করলুম চিঠিখানা পকেটে ছিল।

ক্ষিতিবাবুকে ঢাকার ঠিকানায় চিঠি লিখেছিলুম তার কোনো উত্তর পেলুম না—তিনি কি ব্যবস্থা করেছেন তাও জানা গেল না। আশা করি শেষকালে আমার উপরে তিনি অসন্তুষ্ট হননি। য়ুরোপে গেলে তিনি কাজ করতে পারবেন ও খ্যাতিলাভ করবেন এই কথা মনে করে বজোরিয়াকে আমি উৎসাহিত করেছিলুম—সুযোগটা দুর্লভ বলে আমিও খুসি হয়েছিলুম। ক্ষিতিবাবুর কথায় আশা হয়েছিল ওরা বিশ্বভারতীর যোগে ওঁকে পাথেয় দেবে। শেষকালে কি হল জানিনে। আমার এখনো মনে বিশ্বাস য়ুরোপে গেলে ক্ষিতিবাবুর কাজে লাগবে—সেখানকার মনীষী লোকদের সঙ্গে ওঁর যোগসাধন হতে পারবে। অবশ্য আগে থাকতে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত বলা যায় না। ওঁর মনে যদি দ্বিধা হয়ে থাকে তাহলে ছেড়ে দেওয়াই ভালো। আমি বিরলার কাছ থেকে এখনো কোনো চিঠিপত্র পাই নি। ইতি ১৫ই বৈশাখ ১৩৩৪

তোমাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর[৫০৫]

রবীন্দ্রনাথের মনে সংশয় ছিল, সত্যই শেষপর্যন্ত দূরপ্রাচ্যভ্রমণের জন্য অর্থসাহায্য বিড়লাদের কাছ থেকে পাওয়া যাবে কি না। জানা যাচ্ছে প্রকৃতপক্ষে আশাতীত সাহায্য পাওয়া গিয়েছিল, নারায়ণদাস বাজোরিয়াও অর্থ দিয়েছিলেন। শ্যামদেশ ও জাভা-বালী-মালয়-সুমাত্রা ভ্রমণে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে গিয়েছিলেন বিশ্বভারতীর প্রতিনিধি হিসেবে সুরেন্দ্রনাথ কর ও ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মা, রবীন্দ্রনাথের একান্ত সচিবের দায়িত্ব নিয়ে আরিয়াম। আর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।[৫০৬] ক্ষিতিমোহনের আর সে দলভুক্ত হওয়ার সুযোগ হয়নি, তাঁর বিকল্প ভূমিকা একমাত্র সুনীতিকুমারের পক্ষেই নেওয়া সম্ভব ছিল। বিপরীতমুখী দ্বৈত কেন্দ্রাতিগ শক্তি অকস্মাৎ তাঁকে টান দিয়েছিল যুগপৎ, কিঞ্চিৎ মানসিক আলোড়নও যে ঘটায়নি এমন নয়। কিন্তু তাঁর জন্য পথ খুলল না দূরের পূর্বে, না সুদূরের পশ্চিমে। কোনো এক কেন্দ্রানুগ শক্তির টানে তিনি শান্তিনিকেতনেই অনড় হয়ে রইলেন।

কাজ চলছে পূর্ববৎ। বিদ্যাভবনে নিয়মিত ছাত্র-গবেষক সংখ্যায় পাঁচজন, অন্যান্য বিভাগের কয়েকজন অধ্যাপক কয়েক বিষয়ে পাঠ নিতে আসেন। ক্ষিতিমোহন মধ্যযুগে ভারতীয় ধর্ম বিষয়ে ক্লাস নিচ্ছেন। শিক্ষাভবনে পড়িয়ে থাকেন সংস্কৃত ও বাংলা। পাশাপাশি নিজের গবেষণার কাজ চলছে। বিশ্বভারতীর বার্ষিক প্রতিবেদনে বলা হচ্ছে তিনি দাদূসাহেবের জীবনী লেখার কাজ শেষ করেছেন, এখন তাঁর মহান শিষ্য রজ্জবজির জীবন ও সাধনা সম্পর্কে কাজ করছেন। এ কাজও শেষ হয়ে যেত মাঝখানে তাঁর স্বাস্থ্যভঙ্গ না হলে।[৫০৭] এই অসুস্থতার একটু আভাস আমরা আগে পেয়েছি। শারদ অবকাশে কোথায় ছিলেন জানি না, তবে কবি তাঁকে বিজয়াদশমীর 'সাদর নমস্কার' ডাকযোগে পাঠিয়েছিলেন, তার প্রমাণটুকু রয়ে গেছে।[৫০৮]

সামনের বছর তাঁর সুযোগ হবে গুজরাত যাওয়ার, এ বছরে একই দিনে তাঁকে তিনখানি চিঠি ইংরেজিতে লিখতে দেখছি তাঁর সেখানকার বন্ধুদের। প্রথমে উল্লেখ করি কোসিন্দ্রা-কাশীপুরার ছাত্রদেব উদ্দেশে লেখা চিঠিটির :

[কোসিন্দ্রা ও কাশীপুরার বালবন্ধুরা] কলিকাতা

৩. ১১ ১৯২৭

তোমরা মহান সব শিক্ষকদের অধীনে আছ, যাঁরা পরম প্রভুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেছেন। হে বালকবৃন্দ, তোমরা এক সারি দীপ। তোমাদের প্রত্যেককে আপন আলোকশিখাটি জ্বালাতে হবে। তোমরা যদি শিখতেই থাকো, নানা জ্ঞাতব্য তথ্য জমা করতেই থাকো, তোমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে শাণিত করতেই থাকো, অথচ তোমাদের সেই আলোকবর্তিকা হারিয়ে যায়, তবে তোমাদের জীবনের উদ্দেশ্যের বিনষ্টি ঘটবে। এ এক প্রাণবান উদ্দেশ্য। তোমাদের জীবনব্যাপী তপস্যায় এ-উদ্দেশ্য সফল করে তোলো।[৫০৯]

একই সঙ্গে কোসিন্দ্রা কাশীপুরা আশ্রমের অধ্যাপক গোবর্ধনভাই দেশাইকে যে চিঠি লিখেছিলেন ক্ষিতিমোহন, তার অতি সামান্য অংশমাত্র উদ্ধৃত করতে পারব :

মাস্টারজী এখন কিছুদিন এসে কোসিন্দ্রা-কাশীপুরায় থাকবেন জেনে খুশি হলাম। আমাদেব আশ্রমের জন্যে যে বাগান তৈরি করবার কথা ছিল তা কি হয়েছে? .. কোথায় স্থান নির্বাচন করলেন—চিখোদ্রায় বা কোসিন্দ্রায়?[৫১০]

তৃতীয় চিঠিটি করুণাশংকরজিকে লেখা এবং অপেক্ষাকৃত বড়ো। এই সময়ে এ চিঠি লেখার তাৎপর্য পাঠকের সহজেই চোখে পড়বে। ক্ষিতিমোহন যে এই সময়ে সংশয়ে ও হতাশায় কষ্ট পাচ্ছিলেন তার স্পষ্ট ইঙ্গিত এখানে আছে :

কলিকাতা

৩.১১.১৯২৭

মাস্টারজী, আপনার সব টেলিগ্রাম ও পোস্টকার্ড যথাসময়ে পেয়েছি। আপনার পোস্টকার্ডগুলি সংক্ষিপ্ত, কিন্তু যেমন গভীর তেমনই চমৎকার। পুঞ্জীভূত অন্ধকারের চেয়ে একটি ক্ষুদ্র আলোর শক্তি অনেক বেশি। বিরাটের পূজারী নন আপনি, একটি সত্য বস্তুর—যদিও তা বৃহৎ বা চটকদার নয়, তবু তার যথার্থ মূল্য আপনি জানেন। আমি যখন হতাশাগ্রস্ত হয়ে ভাবছিলাম কী করি, আপনার মাধ্যমে ঈশ্বর আমাকে সহায়তা প্রেরণ করেছেন। আমরা ভুলে যাই যে আমরা তাঁরই যন্ত্র এবং আমাদের ভিতর দিয়ে তাঁরই উদ্দেশ্য সাধিত হচ্ছে। যখন আমরা নিজেদের স্বাধীন ভাবি, ভাবি নিঃসঙ্গ, তখনই তাঁর কর্মপরিকল্পনায় আঘাত হানি। আর যখনই তাঁর পরিচালনাধীন হবার জন্য আত্মসমর্পণ করি, তখনই পাই অনন্ত দীপাবলী, অনন্ত উৎসব। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস দুর্বল, আমাদের দৃষ্টি ক্ষীণ বলেই আমরা সন্দেহ করি, হতাশায় ভুগি। আর সেই মুহূর্তে অকস্মাৎ তাঁর করুণার স্রোত আমাদের সব সংশয় ভাসিয়ে নিয়ে যায়।[৫১১]

গুজরাতে আরও একবার

১৯২৭ সাল বিদায় নিয়ে গেল। নানা পরিবর্জন-পরিবর্তন-পরিমার্জনের ভিতর দিয়ে বিশ্বভারতী চলেছে, তার মধ্যেও ক্ষিতিমোহনের ভূমিকাটা একই রকম মোটের উপর। নানা দেশের নানা ভাবের মানুষ আসেন, তাঁদের সঙ্গো পরিচয় হয়, কারও সঙ্গো বন্ধুত্ব গভীর হয়ে ওঠে, কেউ বা ছাত্রের কৌতূহল নিয়ে কাছে আসেন। ১৯২৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে শান্তিনিকেতনে এলেন অধ্যাপক তান-য়ুন-সান। বিশ্বভারতীতে

চিনাভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপনায় তিনি আত্মনিয়োগ করলেন যেমন, তেমন নিজেও মন দিলেন সংস্কৃত শেখার প্রতি, ক্ষিতিমোহন তাঁর শিক্ষক।[৫১২] তানসাহেবের সঙ্গো ক্ষিতিমোহনের একটি গভীর ও আন্তরিক সম্বন্ধ স্থাপিত হয়েছিল। এই শিক্ষক ও শিক্ষকপত্নীকে তানসাহেব 'বাবা' ও 'মা' ডাকতেন, তাঁদের তিন কন্যাকে ডাকতেন বড়োদিদি মেজোদিদি ও ছোটোদিদি।[৫১৩]

রবীন্দ্রনাথ যখন থাকেন শান্তিনিকেতনে, নানা প্রসঙ্গের আলোচনায় ক্ষিতিমোহন গভীর আনন্দলাভ করেন। একদিন মহম্মদ মনসুরউদ্দীনের সঙ্গো তাঁদের পল্লিগান ধ্বংসের কারণ নিয়ে দীর্ঘ আলোচনার সুযোগ হল। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতী পত্রিকায় অধ্যাপক মনসুরউদ্দীনের বাউলগান সংগ্রহের আলোচনা করতে গিয়ে ক্ষিতিমোহনের অমূল্য বাউলগান সংগ্রহের উল্লেখ করলেন।

গুজরাতের বন্ধুরা ক্ষিতিমোহনকে অনেকবার সস্ত্রীক যাওয়ার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন। এ বছর পুজোর ছুটিতে ক্ষিতিমোহন কিরণবালা ও অমিতাকে সঙ্গো নিয়ে বেরোলেন। বেশ লম্বা পাড়ি। কাশী সহ উত্তর ভারতের অনেকগুলি জায়গায় ঘুরলেন, অমিতা সেনের মুখে কাশীভ্রমণের স্মৃতিচারণ শুনেছিলাম, এই জীবনীর গোড়ার দিকে তার উল্লেখও করেছি, সেটা এই সময়কার। গুজরাতে এসেও তাঁরা নানা স্থানে ঘুরলেন। সুরাতে গিয়েও সেই পুণ্যতীর্থ কবীরবটের তলায় স্ত্রীকন্যাকে নিয়ে বসলেন ক্ষিতিমোহন, তাঁর সেই বহুব্যবহৃত অতি প্রিয় কাহিনিটি শোনালেন। একবার এই গাছতলায় এক ভক্ত এলেন কবীর সকাশে। ভিনদেশি মানুষ, দুজনে কেউ কারও ভাষা বোঝেন না। দুজনে দুজনের হাতে হাত রেখে বসে রইলেন সমস্ত রাত্রি, ভোর যখন হল তখন মন-জানাজানি হয়ে গেছে, ভাষার বাধায় পরস্পরের প্রকৃত পরিচয় অজ্ঞাত থাকেনি পরস্পরের কাছে।

গুজরাতে তখন ক্ষিতিমোহনের অনুরাগীসংখ্যা অনেক। অমিতা সেন বলেছিলেন, আমেদাবাদে পৌঁছে তাঁরা 'স্টেশনে নামতেই বাবাকে সকলে ঘিরে ধরলেন, বাবার গুণগ্রাহী তাঁরা সবাই—আমাদের দিকে কেউ তাকাচ্ছেন না। অযত্ন পাইনি তা বলে—আমাদের তাঁরা নিয়ে গেলেন করুণাশংকরজির বাড়িতে, সেখানে খাওয়াদাওয়া, বিশ্রাম সব কিছুরই চমৎকার সুব্যবস্থা। কিন্তু ক্ষিতিমোহন যেন আলাদা কেউ, তাঁকে পেয়ে সবাই মুগ্ধ। যেমন তাঁর বিদ্যাবত্তা, তেমন তাঁর রূপবান চেহারা। বাবা যখন ঘরে ফিরলেন, মা অভিমানে অনেকক্ষণ কথা বলেননি। বাবা বারবার চেষ্টা করছেন তাঁর মান ভাঙাতে। আমি তো তখন বড়ো হয়েছি, সব বুঝি। বাবা বলছেন : 'কিরণ, ওরা তোমার কথাই জিজ্ঞাসা করছিল'।[৫১৪]

আগের বছরই কোসিন্দ্রা আশ্রমে এক রবীন্দ্রসংগীত-জানা মানুষ এসে গান শিখিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন।[৫১৫] তারপর থেকে আশ্রমে নিয়মিত গাওয়া হচ্ছে সে-সব গান—'জীবনে যত পূজা', 'তোমারি গেহে পালিছ স্নেহে', 'আর নাই রে বেলা'। অপ্রত্যাশিতভাবে এখানে এসে এ-সব গান শুনে স্বকন্যা ক্ষিতিমোহন-কিরণবালা একেবারে অভিভূত।[৫১৬] আগেই বলেছি কোসিন্দ্রা ও কাশীপুরার মধ্যে ছিল হরিণী নামে ছোট্ট একটি নদী। সেই

হরিণী নদীর তীরে বসে ক্ষিতিমোহনও গান শোনাতেন, অমিতা গাইতেন গান। ক্ষিতিমোহনের অত্যন্ত প্রিয় গান ছিল : 'আর নাই রে বেলা নামল ছায়া ধরণীতে'। কন্যাকে গাইতে বলতেন সে গান, নিজেও সেই সঙ্গে গাইতেন। সে-সব এখনও অমিতা সেনের আনন্দস্মৃতি হয়ে আছে।[৫১৭]

আগের বারের মতো ক্ষিতিমোহনের সঙ্গাভিলাষী বন্ধুরা কোসিন্দ্রায় এসেছিলেন, স্বয়ং মাস্টারজি উপস্থিত ছিলেন। ক্ষিতিমোহন এবার প্রধানত আলোচনা করেন তাঁর চিন ও জাপান ভ্রমণের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে। এই আলোচনা প্রথানুগ ভ্রমণবৃত্তান্ত ছিল না, বিবিধ বিশিষ্ট অভিজ্ঞতার কথা বলেছিলেন, অনেক আদর্শ ও ত্যাগব্রতী ধার্মিক মানুষের কথা প্রাধান্য পেয়েছিল, আশ্রমের ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েদের শুনিয়েছিলেন বলে নানা গল্প ছিল তার মধ্যে, আর তাঁর ভাষণমাত্রেই যে সরসতাগুণে সমৃদ্ধ, সে গুণ তো ছিলই। এই ভাষণ যে পরে প্রকাশিত হয়েছিল, তার পিছনে বেশ কয়েকজন মানুষের যথেষ্ট পরিশ্রম ছিল। তিনি বলতেন হিন্দিতে, কয়েকজন সেখানেই সঙ্গে সঙ্গে অনুলেখন করতেন এবং পরে একত্রে বসে নিজেদের মধ্যে মিলিয়ে ও সম্পাদনা করে তার একটি নির্দিষ্ট আকার দিতেন। তারপরে সে লেখার গুজরাতি অনুবাদ শান্তিনিকেতনে পাঠানো হত ক্ষিতিমোহনের কাছে। তিনি দেখে-শুনে দিলে তা ছাপার জন্য প্রস্তুত বলে গণ্য হত। ভাষণগুলির গুজরাতি অনুবাদ করেন কিকুভাই রতনজি দেশাই। 'চীন জাপাননী যাত্রা' ১৯৩৪ সালে প্রকাশিত হয়। এটিতে চিন সম্পর্কে চারটি ও জাপান সম্পর্কে তিনটি ভাষণ ছিল।[৫১৮]

রবীন্দ্রপরিচয়সভা

সে বছর নভেম্বর মাসে সর্বভারতীয় প্রাচ্য সম্মেলনের পঞ্চম অধিবেশন হবে লাহোরে। পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী, পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী ও ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তার প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছিলেন। তাই শারদীয় অবকাশের পরে বিশ্বভারতীর কাজ শুরু হতে না হতেই বিধুশেখর ও ক্ষিতিমোহনকে লাহোরের পথে যাত্রা করতে হল।[৫১৯]

দেখতে দেখতে শেষ হয়ে গেল বছরটা। ১৯২৯ সাল। খবর পাওয়া যাচ্ছে ১০ ফেব্রুয়ারি সকালে বিশ্বভারতীর পল্লিসেবা বিভাগের উদ্যোগে শ্রীনিকেতনে বীরবংশী ও অন্যান্য অবনত শ্রেণির প্রতিনিধিদের সম্মেলনে বীরভূম বাঁকুড়া বর্ধমান জেলা থেকে বহু মানুষ এসেছিলেন, কালীমোহন ঘোষ প্রমুখ বক্তা, ক্ষিতিমোহনের উপর সভাপতিত্ব করবার দায়িত্ব। আবার আগস্ট মাসে বর্ষামঙ্গলের সময় আশ্রমে কবির স্বহস্তের বৃক্ষরোপণে, তাঁর রচিত বর্ষাসংগীতের সমবেত পরিবেশনে উৎসব জমে উঠেছে। তার সূচনাপর্বে সারিবদ্ধ আশ্রমবালিকারা অর্ঘ বহন করে নিয়ে এল সভাস্থলে, পুরোভাগে আছেন দিনেন্দ্রনাথ ও ক্ষিতিমোহন, তাঁদের দ্বৈতকণ্ঠের বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণধ্বনিতে চারিদিক গমগম করছে।[৫২০]

অল্প কিছুদিন আগে জুলাই মাসে রবীন্দ্রপরিচয়সভা গঠিত হয়েছিল। এই সভার উদ্দেশ্য ছিল যে-রবীন্দ্রনাথের ভাবের আকর্ষণে নানা মানুষ শান্তিনিকেতনে একত্র হয়েছেন, তাঁর সম্পর্কে বহুধা আলোচনার আয়োজন। ২৮ জুলাই বিকেলে বিদ্যাভবনের বারান্দায় ক্ষিতিমোহনের সভাপতিত্বে এই সভার প্রথম অধিবেশন বসল এবং একটি কার্যনির্বাহী সমিতি গঠন করা হল। সভাপতি হলেন বিধুশেখর ভট্টাচার্য ও ক্ষিতিমোহন সেন, কয়েকজন সম্পাদকের উপর বিভিন্ন বিভাগীয় দায়িত্বভার অর্পিত হল। উদ্যোক্তাদের বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর ভাবাদর্শের সঙ্গো নিয়মিত সম্যক পরিচয়ের মধ্যে দিয়ে সকলের মনে সশ্রদ্ধ অনুরাগে আশ্রমসেবার অনুপ্রেরণা সঞ্চারিত হবে। প্রভাতচন্দ্র গুপ্ত লিখেছেন :

> আশ্রমে আগে যে-সব ঘরোয়া আসর ও মণ্ডলী ছিল, বহুদিন তাতে ছেদ পড়েছিল। রবীন্দ্রপরিচয়সভার ভিতরেই তার সুপ্ত ধারা পুনরায় নূতনভাবে প্রকাশ পেল, ...[৫২১]

তিনি বলেছেন :

> সেখানে আসর জমলো সকলকে নিয়ে, ব্যক্তিনির্বিশেষে আশ্রমবাসী সকলেরই সহজাত অধিকার রইলো সেখানে। শুধু সাহিত্য নয়, সংগীত নৃত্য ও নাট্যকলা চর্চার এক নূতন ধারা ও উদ্যোগপর্বের সূত্রপাত হল। রবীন্দ্রপরিচয়সভা হল আশ্রমের সংস্কৃতি জীবনের সর্বসাধারণের প্রথম সম্মিলিত বে-সরকারী সংস্থা।[৫২২]

সভার ইতিহাস আলোচনা করে এই লেখক সিদ্ধান্ত করেছেন যে বছরে বছরে রবীন্দ্রপরিচয়সভার কাজ করতে নতুন নতুন কর্মকর্তা এগিয়ে এসেছেন : 'কিন্তু প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পরিচালনার ক্ষেত্রে দুজন ছিলেন অবিচ্ছিন্নভাবে যুক্ত। তাঁরা হলেন সভাপতি ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী মহাশয় ও সহকারী সম্পাদক সুধীরচন্দ্র কর মহাশয়।'[৫২৩] সভার পক্ষ থেকে প্রথম অধিবেশনের পরেই সবার কাছে সুধীরচন্দ্র কর লিখিত আবেদন উপস্থিত করেন। তাতে সভার জন্য কে কী কাজ করবেন তা জানাতে অনুরোধ করা হয়েছিল। অনেকেই নিজের নিজের সংকল্প লিখে নাম স্বাক্ষর করে দিলেন। ক্ষিতিমোহনের সংকল্প ছিল, 'ভারতীয় মধ্যযুগের ভাব ও সাধনধারার সহিত রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধ' বিষয়ে গবেষণা।

রবীন্দ্রপরিচয়সভার কর্মসূচি মুখ্যত আবদ্ধ ছিল শান্তিনিকেতন-আশ্রমিকদের ছোটো বৃত্তে এবং এ সভা তাঁদের মধ্যে যথেষ্ট উৎসাহ ও আনন্দ সঞ্চার করেছিল। বেশ সক্রিয়ভাবে তার কাজ চলে ১৯৩৫-৩৬ সাল পর্যন্ত। এই সময়ের মধ্যে যে অধিবেশনগুলি হয়েছিল নানা বিষয়ে নানা জনে সেখানে আলোচনা করেন। আলোচক হিসেবে একবারই ক্ষিতিমোহনের নাম পাচ্ছি। তাঁর আলোচনার বিষয় ছিল 'রবীন্দ্রনাথ ও বাউল'। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রপরিচয়সভার পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন যে, এই সভার সভাপতি ছিলেন ক্ষিতিমোহন সেন এবং শান্তিনিকেতনের অর্থনীতির অধ্যাপক প্রভাতচন্দ্র গুপ্ত ও প্রকাশন বিভাগের কর্মী সুধীরচন্দ্র কর দ্বারা পরিচালিত 'রবীন্দ্রপরিচয় পত্রিকা' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হত।[৫২৪]

শিক্ষাভবন ও বিদ্যাভবনে যথারীতি ক্লাস চলে। বিদ্যাভবনের ছাত্র-গবেষকদের মধ্যে কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর উপাধিপ্রাপ্ত ছাত্র আছেন, বিশ্বভারতীর স্নাতক আছেন, আবার কেউ বা কাশী বিদ্যাপীঠ থেকে এসেছেন। শিক্ষাভবনের ছাত্র ও শিক্ষকদের কেউ কেউ ক্লাস করেন, আজকাল বিদেশি ছাত্ররাও যোগ দিয়েছেন। নিয়মিত ক্লাস ছাড়াও এ বছরে ক্ষিতিমোহন নাথ সম্প্রদায় ও যোগী সম্প্রদায় সম্পর্কে দুটি বিশেষ বক্তৃতা দিলেন। এভাবে এই কয় বছরে আর যে-সব বিষয়ে তিনি ধারাবাহিক আলোচনা করেছেন তা হল, সংস্কৃত সাহিত্য, মধ্যযুগে ভারতীয় ধর্মসমূহ, ভারতবর্ষীয় মরমিয়াবাদ প্রভৃতি। বার্ষিক রিপোর্ট থেকে জানা যাচ্ছে রজ্জবজির বাণীসংকলনের কাজ তাঁর হাতে রয়েছে, বাউলগান সংগ্রহের কাজও এগিয়েছে। বিদ্যাভবনের অধ্যক্ষ বিধুশেখর শাস্ত্রী বার্ষিক প্রতিবেদনে আরও জানিয়েছেন যে এ বছরে ক্ষিতিমোহন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বক্তৃতা দেওয়ার আহ্বান পেয়ে ভারতের মধ্যযুগীয় ধর্ম আন্দোলনের সম্পূর্ণ ইতিহাস লিখতে আরম্ভ করেছেন। বিধুশেখর লিখেছেন ক্ষিতিমোহনের কাজের যা প্রকৃতি তার জন্য পশ্চিম ভারতে বিস্তীর্ণ ভ্রমণের প্রয়োজন, সেই সুযোগ-সুবিধা ও আর্থিক সহায়তা তাঁর অবশ্যই প্রাপ্য।[৫২৫]

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আহ্বান । মীরার গান । কথকতা

ক্ষিতিমোহন ১৯২৯ সালের অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বক্তৃতা মার্চ মাসে দিয়েছিলেন।[৫২৬] তাঁর আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল ভারতের মধ্যযুগে ধর্মীয় সাধনার ইতিহাস। এই বক্তৃতার পরিচয়-প্রসঙ্গে তিনি নিজে বলেছেন :

> এইখানে যে অবসরটুকু পাইয়াছিলাম তাহাতে কোনোমতে সেই যুগের সাধনার একটু আভাসমাত্র দিতে পারিয়াছি। এখানে কোনোমতে কাঠামোখানা মাত্র দেখান গিয়াছে। সম্ভব হইলে ভবিষ্যতে সেই যুগকে আর একটু পূর্ণতরভাবে দেখাইতে চেষ্টা করিব। জীবন্ত একটি যুগের কেবল কঙ্কাল মাত্র দেখাইয়া বিশেষ কিছু বুঝানো যায় না। তার উপর একটু রক্তমাংস না থাকিলে জীবনের রূপটি বুঝিতে পারা কঠিন হয়। তখনকার সাধকদের সাধনা ও বাণীর একটু পরিচয় দিতে পারিলে সেই যুগের রূপটি প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিতে পারে।[৫২৭]

ক্ষিতিমোহন অতৃপ্তি বোধ করলেও তাঁর এই বক্তৃতা থেকে সামান্য এই 'কাঠামোখানা'-র পরিচয় লাভ করেই পাঠক তাঁর সামনে সেই যুগের ভারতবর্ষের বিশাল এক আলোকিত মানসভূমির প্রেক্ষাপট উদ্ঘাটিত হতে দেখেন। ইংরেজিশিক্ষিত মানুষ ভারতীয় মধ্যযুগকে পশ্চিমি medieval age-এর ধারণা নিয়ে বুঝতে চেয়েছেন। আমাদের মধ্যযুগীয় সাধক ও সাধনার পরিচয় দিতে গিয়ে ক্ষিতিমোহন দেখালেন সর্বার্থে অন্ধকারাচ্ছন্ন মধ্যযুগীয় পাশ্চাত্য মানসের অনুষঙ্গে এই প্রাচ্য উপমহাদেশের যুগবিভাজনের ভ্রম কোন্‌খানে। এই বক্তৃতায় শাস্ত্র-মানা সাধকদের সাধনা ও মতাদর্শের পাশাপাশি শাস্ত্র-না-মানা স্বাধীন মনের

সাধকদের যে বিস্ময়কর জীবন-দর্শনের কথা শোনালেন তিনি, তাতে ভারতীয় মধ্যযুগের স্বাতন্ত্র্য স্বতঃপ্রকাশিত হল।

ক্ষিতিমোহনের এই বক্তৃতা পরের বছর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রন্থাকারে 'ভারতীয় মধ্যযুগে সাধনার ধারা' নামে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থভূমিকায় তিনি লিখেছিলেন :

> ভারতীয় মধ্যযুগের ধর্মসাধনার ইতিহাস-কথা বলিতে যে কোনো বিদ্বজ্জনসভায় আহ্বান আসিবে তাহা কখনো মনে করি নাই।[৫২৮]

রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে এই ধর্মসাধনার ইতিহাস লেখবার জন্য, এই-সব মুক্তমনা সাধকদের অমর বাণীসংগ্রহ প্রকাশ করার জন্য যে নিরন্তর উৎসাহ ও সহায়তা তিনি পেয়েছিলেন সে কথা বহুবার বহু প্রসঙ্গেই বলেছেন। এই গ্রন্থে ক্ষিতিমোহন অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করলেন আর-একজন দূরদর্শী বিদ্যানুরাগী বিশিষ্ট মানুষের নাম, তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। ক্ষিতিমোহন লিখেছেন :

> সত্যকার বিশ্ববিদ্যালয় গড়িয়া তোলা যাঁর জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল সেই মনীষী জ্ঞানতপস্বী আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই সব বিষয়ে আলাপ করার জন্য স্বয়ং ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এই সূত্রে তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ হয় ও এই বিষয়ে কোনো একটা ব্যবস্থা (Scheme) করা যায় কিনা তাহা নানা ভাবে আলোচনা করেন। অনেক কিছু করার তাঁর ইচ্ছা ছিল; কিন্তু তাঁর অকালমৃত্যুতে সে সবই অপরিপূর্ণ রহিয়া গেল।[৫২৯]

ক্ষিতিমোহন স্পষ্ট করে বলেননি, তবে তাঁর লেখায় এমন ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে ভারতে মধ্যযুগের ইতিহাস ব্যাপ্ত করে যে আত্মিক ভাবান্দোলনের বৈভব ছড়িয়ে আছে তা যথাসাধ্য সম্পূর্ণ উদ্ধার ও গ্রন্থাকারে প্রকাশ-উপযোগী গবেষণা-পরিকল্পনা গ্রহণের ইচ্ছা আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের ছিল। হয়তো তাঁর অকালমৃত্যু না-ঘটলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং হয়তো বা বিশ্বভারতীর সহযোগে উদ্দিষ্ট বিষয়ে একটি বৃহৎ কর্মপরিকল্পনা রূপ নিতে পারত। এ কথা আরও মনে হয় এইজন্য যে ক্ষিতিমোহন এই গ্রন্থের নিবেদনে এই বিষয়ের গবেষণা প্রসঙ্গে বেশ কয়েকটি কথা বলেছেন।

বিধুশেখর শাস্ত্রীর একটি চিঠি আগেই উল্লিখিত হয়েছে, যা থেকে এ তথ্য পাওয়া যায় যে ১৯২০-২১ সাল পর্যন্ত বিদ্যালয়ের কাজ নিয়েই ব্যস্ত থাকতে হত ক্ষিতিমোহনকে, কোনো পরিকল্পিত গবেষণার কাজের জন্য পড়াশোনার সময় তিনি পেতেন না। বিশ্বভারতীতে যোগ দেওয়ার পরেই সে সুযোগ ও সময় হাতে পেলেন। 'কবীর'-এর পরে প্রকাশিত হয় 'ভারতীয় মধ্যযুগে সাধনার ধারা'। তাঁর গ্রন্থ-তালিকায় এ গ্রন্থের স্থান দ্বিতীয়, মধ্যে বিশ বছরের ব্যবধান। ক্ষিতিমোহন বলতে গেলে লোকচক্ষুর অন্তরালে বসে আপন মনে অনেকগুলি বিষয়ে একই সঙ্গে অনুসন্ধানে রত ছিলেন। পরেও তাঁর যে-সব বই বেরিয়েছে, তারও কিছু কিছু কাজ এই সময়েই চলছিল। সাময়িকপত্রে মাঝে মাঝে প্রবন্ধ-আকারে তাঁর লেখা বেরিয়েছে। ১৯২৭ সালের বিশ্বভারতী বার্ষিক প্রতিবেদনে খবর ছিল 'দাদূ'-র কাজ শেষ হয়েছে। ১৯৩৫ সালে প্রকাশিত হয় সে গ্রন্থ। সেই হিসেব ধরলে 'দাদূ'

তাঁর তৃতীয় বই, কিন্তু ১৯৩৪ সালে তাঁর গুজরাতি গ্রন্থ 'চীন জাপাননী যাত্রা' প্রকাশিত হয়েছিল, সুতরাং তৃতীয় স্থান তাকেই দিতে হয়, 'দাদূ' চতুর্থ। 'দাদূ'-র কাজ শেষ হওয়ার অর্থ অবশ্য এ নয় যে ক্ষিতিমোহন বিশ্বভারতীর হাতে তার প্রেসকপি সমর্পণ করে ছুটি পেয়েছেন। যতদিন বই প্রকাশিত না হয়েছে সম্পাদনার কাজ তাঁর চলেছেই। ১৯৩৩ সালের বিশ্বভারতী বার্ষিক প্রতিবেদনে চোখে পড়ে তখনও তিনি দাদূ-রচিত অনেকগুলি নতুন পদের সন্ধান পেয়ে সেগুলি গ্রন্থে সংযোজন করছেন। বই প্রকাশের আগের কয়েক বছর যেমন তিনি এই প্রকাশিতব্য বই নিয়েও পরিশ্রম করছিলেন, তেমন অন্য আরও কয়েকটি কাজ নিয়েও ব্যস্ত ছিলেন। ১৯৩০-৩১ সালের বার্ষিক বিবরণ থেকে জানা যাচ্ছে যে, বরোদার মহারাজার বার্ষিক ছয় হাজার টাকা অর্থসাহায্য বিশ্বভারতীতে আসে। তার দ্বারা বিদ্যাভবনে পন্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী ও পন্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রীকে গবেষণাদক্ষিণা দেওয়া সম্ভব হয়ে থাকে। অধ্যাপক-গবেষকদের দায়িত্ব প্রধানত শিক্ষকতা, গবেষণা এবং প্রাগ্রসর ছাত্রদের গবেষণাকর্মের পরিচালনা ও তত্ত্বাবধান। প্রতিবেদনে এও বলা হচ্ছে যে Visva Bharati Studies নাম দিয়ে অনেকগুলি গবেষণাগ্রন্থ বিশ্বভারতী প্রকাশের আয়োজন করেছে। তার মধ্যে অচিরেই যেগুলি পাওয়া যাবে বলে আশা করা যায় সেগুলি হল : দাদূসাহেবের জীবন ও বাণী, সন্ত কবীরের জীবন ও বাণী, সাধক রজ্জবের বাণীসংকলন, সপ্তদশ শতাব্দীর জৈন মরমিয়া সাধক আনন্দঘনর জীবন ও বাণী। পরে এই প্রতিবেদনেই আবার জানানো হয়েছে যে, উপকরণের অভাবে দাদূশিষ্য রজ্জব-সম্পর্কিত কাজটি যথেষ্ট অগ্রসর হতে পারেনি। বলা বাহুল্য এ কাজগুলি সবই ক্ষিতিমোহনের। কিন্তু পরিকল্পনা অনুযায়ী এই নামে বইগুলি প্রকাশিত হতে দেখি না, সুপরিকল্পিত বিরাট গ্রন্থ 'দাদূ' ভিন্ন। তবে উক্ত বিষয়গুলি অবলম্বনে সাময়িকপত্রে তাঁর এক বা একাধিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। খবর পাওয়া যাচ্ছে তাঁর বাউল-সম্পর্কিত কাজও তিনি শেষ করেছেন। এই সময় অনাথনাথ বসু ও সুধীরচন্দ্র সেন যথাক্রমে মীরাবাই ও নাথসম্প্রদায় সম্পর্কে তাঁদের গবেষণাকর্মে তত্ত্বাবধায়করূপে ক্ষিতিমোহনকে পেয়েছেন, ইভা দেবী তাঁর তত্ত্বাবধানে ধর্মমঙ্গাল-এর একটি বিচারধর্মী সংস্করণের কাজ করছেন।[৫৩০]

ক্ষিতিমোহন নিজে বহুদিন থেকেই মধ্যযুগের সাধিকা মীরাবাই-এর গানগুলি পরম আগ্রহে সংগ্রহ করছেন, পড়াশোনা ও অনুসন্ধান করছেন তাঁর জীবন ও সাধনা সম্পর্কে। মীরাবাই-এর ছয়টি পদ সাধকসমাজে ষট্‌কমল নামে পরিচিত। এই পদাবলির পরিচয় ক্ষিতিমোহন দিলেন 'বিচিত্রা পত্রিকা'-র ১৩৩৬ চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত একটি রচনায়— 'মীরার জীবনসঙ্গীত'। এই লেখায় অনুবাদ সহ মীরার ষট্‌কমলভুক্ত গানগুলি ছাপা হল, স্বরলিপিও রইল সেই সঙ্গো। স্বরলিপি করেছিলেন সুরসাগর হিমাংশুকুমার দত্ত। হিমাংশুর পিতা যোগেন্দ্রচন্দ্র দত্ত ক্ষিতিমোহনের বন্ধু। বন্ধুপরিবারের সঙ্গো ক্ষিতিমোহনের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল, হিমাংশুকেও শৈশবকাল থেকে জানতেন। ছুটির সময় কুমিল্লায় বন্ধুর বাড়িতে যেতেন, কখনও কখনও সপরিবারেও গেছেন, কখনও বা কয়েকটি ছাত্রকে সঙ্গো নিয়ে।

বন্ধুর বালক পুত্রের গানে সহজ অনুরাগ ও অধিকার দেখে তাকে এই-সব সাধকপদাবলির সব গান শেখাতেন। 'ক্ষিতিমোহনের সুরবোধের সঙ্গে প্রখর স্মরণক্ষমতাও ছিল। তিনি ভজনগুলির সুরের আদল মৃদুকণ্ঠে শোনাতেন।' এমনই করে বহু ভজন হিমাংশুকুমারের শেখা হয়ে গিয়েছিল। 'মীরার জীবনসঙ্গীত'-এ তরুণ স্বরলিপিকারের পরিচয় দিয়ে ক্ষিতিমোহন লিখেছিলেন :

> শ্রীমান হিমুর প্রধান শিক্ষাই হইল প্রাচীন সঙ্গীতশাস্ত্র অর্থাৎ ক্লাসিক্যাল মিউজিক-এ। কিন্তু ভজনের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় অনুরাগ। সবাই জানেন সাধকেরা তাঁদের ভজনে সঙ্গীতব্যাকরণের নানা বিধিনিষেধ অতিক্রম করিয়া নানা সৃষ্টি সম্ভবপর করিয়াছেন। শ্রীমান হিমু প্রাচীন ওস্তাদী পদ্ধতিতে শিক্ষিত হইলেও ভজনের এই বিশিষ্টতা অতিশয় শ্রদ্ধার সহিত স্বীকার করিয়াছেন, কোথাও ভজনের সুর একটুও হীন করেন নাই। সাধুদের মধ্যে ভজনের যেমন সুর পাওয়া যায় তাহা শুনিয়া তিনি নিপুণভাবে তাঁহার স্বরলিপিতে সুবিন্যস্ত করিয়াছেন। খোদার উপর খোদকারি কোথাও করেন নাই। কাজেই তাঁহার সাহায্যে মীরার এই ভজনগুলির সম্যক পরিচয় দেওয়া সম্ভব হইল।[৫৩১]

'বিচিত্রা'-র পরের সংখ্যাতেও ক্ষিতিমোহন-সংগৃহীত আরও কয়েকটি সন্তদোঁহার হিমাংশুকুমার-কৃত স্বরলিপি প্রকাশিত হয়েছিল। কয়েক বছর পরে ক্ষিতিমোহনের কাছে শেখা তাঁর চারটি ভজনগানের রেকর্ড প্রকাশিত হয়। তার আগে থেকেই ক্ষিতিমোহন তাঁকে তাঁর সন্তবাণী ব্যাখ্যানসভার সহযোগী করে নিয়েছিলেন। নানা সময়ে নানা অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হয়ে তিনি ভারতীয় সাধকদের জীবন ও উপলব্ধির ব্যাখ্যা করতেন আর সেই-সব সভায় ভজন গাইতেন হিমাংশু। ক্ষিতিমোহনের মর্মস্পর্শী বাচনভঙ্গি ও হিমাংশু-কুমারের দরদি সুকণ্ঠের সহযোগ এক আশ্চর্য সমন্বয়ের সৃষ্টি করত।[৫৩২]

অল্প বয়স থেকেই ক্ষিতিমোহন ভালো বক্তা। ইতিমধ্যে দেশে তিনি সুবক্তা হিসেবে ব্যাপক খ্যাতি অর্জন করেছেন। দিনে দিনে তাঁর জনপ্রিয়তা বাড়ছে। ছোটোবেলায় কাশীতে মুগ্ধ হয়ে কথকতা শুনতেন। কথক ঠাকুরের যে বাক্‌নৈপুণ্য এবং দুরূহ তত্ত্বকথারও প্রাঞ্জল ব্যাখ্যাকুশলতায় জনচিত্ত মোহিত হত, সেই গুণগুলি তাঁরও ছিল। তাঁর সম্পর্কে বলতে গিয়ে অনেকেই তাঁর বাগ্মিতা ও বাচনভঙ্গি, অপূর্ব মন্ত্রোচ্চারণ ও মন্দিরোপাসনার কথা বলেছেন।

> চমৎকার ছিল কণ্ঠস্বর, ভাষণ দিতেন যখন, গলার স্বরের মাধুর্য আকর্ষণ করত, মন্ত্রোচ্চারণের তুলনা ছিল না।[৫৩৩]

অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ দত্তের লেখায় পাই :

> এককালে আমাদের সমাজে কথকতার প্রচলন ছিল; কথকতাই ছিল জনশিক্ষার প্রধান বাহন। ক্ষিতিমোহনবাবু ছিলেন কথককুলমণি। এমন মধুর ভাষণ কম লোকের মুখেই শুনেছি। ...কোলরিজ সম্বন্ধে হ্যাজলিট্ বলেছিলেন—He talks far above singing। এ কথাটি ক্ষিতিমোহনবাবু সম্পর্কেও বলা যেত। লোকে ভাবে কেবলমাত্র ধর্মকথাই কথামৃত।

ক্ষিতিমোহনবাবুর কথা শুনে আমি বুঝেছি যে সুন্দর করে বলতে পারলে সব কথাই কথামৃত। অবশ্য শান্তিনিকেতন মন্দিরে যাঁরা তাঁর ভাষণ শুনেছেন তাঁরাও বলবেন, ক্ষিতিমোহনের কথা অমৃতসমান।[৫৩৪]

অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী তাঁর লেখায় উল্লেখ করেছেন ক্ষিতিমোহনের বক্তৃতার কথকতা-শৈলী এবং তার নিজস্ব ভঙ্গির প্রসঙ্গ। আর বলেছেন তাঁর প্রখর মাত্রাজ্ঞানের কথা। কখনও লাগামছাড়া দীর্ঘ ভাষণ দিতেন না। পকেটঘড়িটি বার করে সামনে রেখে বলতে শুরু করতেন। নির্ধারিত সময় কখনও পার হত না। ঘড়ির কাঁটা দেখে বক্তৃতা শেষ করতেন। পান্ডিত্যের বোঝায় চাপা পড়েননি, অন্যের মাথাতেও বোঝা চাপাতেন না।

আচার্যের পান্ডিত্য যেন তাঁর গলায় ফুলের মালা, কত অনায়াসে বহন করতেন তাকে।[৫৩৫]

কখনও কখনও তরুণ শিল্পী হিমাংশুকুমার দত্তকে সংগীতসহযোগী নিয়ে তিনি কথকতার ঢঙে আলোচনাসভা জমিয়ে তুলতেন। কলকাতা ও ঢাকা বেতারকেন্দ্র থেকেও তাঁর কথিকা প্রচারিত হয়েছে বহুবার। সে-সব অনুষ্ঠানেও হিমাংশুকুমার গান গাইতেন। আরও অনেকে গান গেয়েছেন ক্ষিতিমোহনের আলোচনাসভায়। বিশেষত শান্তিনিকেতনের অনেক ছেলেমেয়ে ভালো গান গাইতে পারতেন, তাঁদের অনেককে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সঙ্গে নিতেন ক্ষিতিমোহন। আলোচনা-উপযোগী রবীন্দ্রসংগীত যখন যা তিনি ব্যবহার করতেন তা নিয়ে তো ভাবনা ছিল না, শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীরা অনায়াসে সে-সব গান গাইতে পারতেন। আর যে বাউল ভজন সন্তদোঁহাগুলি এই উপলক্ষে প্রয়োগ করতেন, তার সুর তাদের তিনি নিজেই শিখিয়ে নিতেন।

মীরা (বাবলী) চৌধুরীকে লেখা ক্ষিতিমোহনের তিনখানি চিঠি আমাদের চোখে পড়েছে। মীরার বাড়িতে ক্ষিতিমোহনের ভাষণের দিনক্ষণ ও বিষয় নির্ধারণ সম্পর্কে চিঠিগুলি ডিসেম্বর ১৯৪৪ থেকে মার্চ ১৯৪৫ সালের মধ্যে লেখা হয়েছিল। কত জায়গা থেকে ভাষণ দেওয়ার আহ্বান আসত, কী বিষয় নিয়ে বলবেন, কবে কোথায় বলবেন, তা স্থির করতে কত-না ছোটো-বড়ো উদ্যোক্তার সঙ্গে মৌখিক বা লিখিত আলাপ হয়েছে তাঁর, তার তো হিসাবনিকাশ নেই। মীরা চৌধুরীকে লেখা চিঠিকয়টি তার একটু ধারণা দিতে পারে এই আশায় উদ্ধৃত করছি। পাঠক দেখবেন, ক্ষিতিমোহন যে অঞ্চলে সভা হবে সে পাড়ার অধিবাসীদের মধ্যে উপযুক্ত গায়ক বা গায়িকার সন্ধান জানা থাকলে তাঁদের যোগাযোগ করতে চাইছেন :

Santiniketan (Birbhum)
11.12.44

কল্যাণীয়াসু

নিশ্চিন্ত হইলাম। ১৯শে সন্ধ্যা রহিল নহিলে এই সময়টুকুর জন্য অন্যত্র তাগিদ আসিতেছিল। মীরা তোমার নাম জানি তাই মীরা দিয়া আরম্ভ করিতে চাহিয়াছিলাম। ভাল, মীরা না হয় পরেই হইবে। প্রথম দিনে বাংলার বাউল সাধকদের কথাই বলিব। এই বিষয়ে আমি

সাধারণতঃ বলি না। মীরা সম্বন্ধে বলিতে চাহিয়াছিলাম বলিয়া তোমার নাম "মীরা" না লিখিয়া বাবলী লিখিয়াছিলাম। যাক্ এখন আর বাধা নাই। বাউলই হইবে। ১৯শে মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৫টায় ঠিক করিও। রাত্রিটা ঘোর অন্ধকার। বাড়ী ৬।। টা ৭টার মধ্যে ফিরিতে পারিলে সুবিধা। তার পরদিন ভোরেই আবার ফেরৎ রওয়ানা হইতে হইবে। তাই চেষ্টা করিও ৫টায় যাতে আরম্ভ হয়। সব শ্রোতাই তো তোমার পাড়া প্রতিবেশি. তবে আর জানাইতে অসুবিধা কি, আসিতেও বাধিবে না। যদি ৫টায় কারও একান্ত অসুবিধা হয় তবে একটু পরে না হয় অগত্যা দিও। আশা করি খোদনকে তোমার ওখানে পাইব। আমার বাউল গান কে আর করিবেন তবে অন্য বাউল গান কেহ গাহিলে ভাল। টুকু (... রায়ের বাড়ী) কে বলিও, তিনি কালীনারায়ণ রায়ের গান জানেন। শ্রীযুক্তা সুবলা আচার্য্য তাঁর বাবার গান এখনও সুন্দর করিতে পারেন। বাংলাদেশে প্রথম সন্ধ্যায় বাঙ্গালী সাধকদের কথা বলিয়া পরে পশ্চিমের সাধক সাধিকাদের কথা বলা সঙ্গত হইবে।

আশা করি ভাল আছ।

শুভার্থী
ক্ষিতিমোহন সেন[৫৩৬]

এই চিঠি অনুসারে যে সভা বসেছিল, তার পরেও এক বা একের বেশি সভা হয়েছিল। পরের চিঠি থেকে তাই মনে হয়। তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে, রাতে ব্ল্যাক আউট, ক্ষিতিমোহন তাই তাগিদ দিচ্ছেন বিকেল-বিকেল আসর শুরু করতে। পরের বছরের গোড়ার দিকে আবার লিখেছেন। অব্যবহিত পূর্ব সভায় কবীর আলোচনা করেছেন এবং বোধ হয় সেইখানেই স্থির হয়েছিল পরের সভা হবে ১৪ জানুয়ারি।

ওঁ

Santiniketan (Birbhum)
8.1.45

কল্যাণীয়াসু

১লা মাঘ ১৪ই জানুয়ারী রবিবার যে আমাদের কথা পুনরায় হইবার কথা ছিল তাহা ঠিক আছে তো? ৫ই মাঘ আমার নাতনীর বিবাহ। তার পরই ৬ই মাঘ হইতে মাঘোৎসব—এখানে ও কলিকাতায়। তাহাতে আর সময় নাই।

১লা মাঘ রবিবার। কাজেই যদি একটু আগে আরম্ভ কর তবে লোকদের অন্ধকারে কষ্ট কম হয়। ঠিক কখন সময় কর তাহা জানাইও—এবং পত্রপাঠ লিখিও। সেই অনুসারে আমি তোমার ওখানে উপস্থিত হইব।

বিষয় কবীরের কথা (তাহা অসম্পূর্ণ আছে)

শুভার্থী
ক্ষিতিমোহন সেন[৫৩৭]

ওঁ

Santiniketan (Birbhum)
14..3.45

কল্যাণীয়াসু,

৬ই মার্চ তোমাকে পত্র দিয়াছি। আজও উত্তর পাইলাম না। এইজন্য ১৯শে মার্চ সোমবার যে মীরাবাঈ করার ইচ্ছা ছিল তাহা বদলাইতে হইল। বিদ্যালয়েরও জরুরি কাজ একটা সেদিন

থাকায় তোমার পত্রের জবাব না পাওয়ায় ভালই হইল। এখন প্রস্তাব করি ২৮শে মার্চ পূর্ণিমাতে সন্ধ্যায় তোমার বাড়ী মীরাবাঈর কথা বলিব। সেদিন বুধবার ১৪ই চৈত্র। পত্র পাইয়াই জানাইও সেইদিন তোমার সুবিধা হইবে কিনা। নচেৎ অন্য কোনো প্রয়োজনীয় engagement এখানে লইব। কাজেই পত্র পাইয়াই উত্তর দিবে। তবে ঐদিন আর অন্য কাজ লইব না। আশা করি ভাল আছ।

শুভার্থী
ক্ষিতিমোহন সেন[৫৩৮]

আগেই বলেছি মীরা চৌধুরীকে লেখা চিঠি একটি উদাহরণমাত্র। ক্ষিতিমোহন সারা বছরই এই রকম বক্তৃতা বা কথকতা করে বেড়াতেন নানাজনের আহ্বানে। অমিতাভ চৌধুরী লিখেছেন :

ক্ষিতিমোহনবাবু বই কম লিখেছেন, কিন্তু মুখে মুখে বলেছেন অনেক বেশি। তিনি এ-যুগের সর্বশেষ কথক। কথকতাকে কত উচ্চ মার্গে তোলা যায় তার দৃষ্টান্ত তিনি। তিনি বেদ-সংহিতা-উপনিষদ গুলে খেয়েছিলেন। আউল-বাউলদের নাড়ি-নক্ষত্রের খবর রাখতেন এবং সর্বোপরি রবীন্দ্রনাথের মননে স্নিগ্ধ হয়েছিলেন।[৫৩৯]

ড. সোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম আচার্য ক্ষিতিমোহন সেনের মন্দির-ভাষণের বিশিষ্টতা কী ছিল। উত্তরে তিনি যা বলেছিলেন, সেই বক্তব্যের একটু আভাস দিতে চেষ্টা করছি এবার :

রবীন্দ্রনাথের মন্দির-ভাষণ সন্তোষচন্দ্র মজুমদার লিখতেন, পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন নিজেও লিখেছেন—এগুলি এইভাবে না লেখা হলে রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক মনকে জানা যেত না। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য ক্ষিতিমোহনের মন্দির-ভাষণ কেউ লিখে রাখেননি। বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের পর নিয়মিত প্রতি সপ্তাহে যে মন্দির নিতেন ক্ষিতিমোহন, শুধু যদি সেই ভাষণগুলি লিখিত ও প্রকাশিত হত, তা হলে তা আগ্রহী চিত্তকে আশ্চর্য বর্ণবৈচিত্র্যময় এক জগতের সন্ধান দিত। রবীন্দ্রনাথ যখন মন্দিরভাষণ দিতেন তাঁর প্রধান উপাদান ছিল উপনিষদ, গীতা, বুদ্ধবাণী। ক্ষিতিমোহন নির্ভর করতেন বৈদিক মন্ত্রের উপর—ঋক্ সাম নয় শুধু, বিশেষ করে অথর্ব। আর তার সঙ্গে থাকত মধ্যযুগের সাধক সন্তদের বাণী—দাদূ কবীর নানক তুকারাম। সেই সঙ্গে পারস্যের সুফিদের বাণী। সংস্কৃত মন্ত্রের সঙ্গে এমন অজস্র সন্তদোঁহার মিশ্রণ—এ আর কোথাও পাইনি। আবার তারই সঙ্গে মিশত বাংলার বাউলগান—মদন বাউল, লালন ফকির, পবন বাউল—প্রধানত মেদিনীপুর ও পদ্মাতীরের বাউলবা সব। তাঁর আলোচ্য বিষয়ের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে শুধু মনীষীদের বাণী যোগ করতেন তিনি তা নয়, বরং তিনি বেশি টেনে আনতেন লৌকিক সব গল্প—ভারতের, পারস্যের, হিন্দি বা গুজরাতি সাহিত্যের গল্প আসত বা কখনও। নানা প্রদেশের সামান্য লৌকিক গাথা বা গল্প অসামান্য হয়ে উঠত প্রয়োগের গুণে। কখনও হয়তো বা ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ এসে গেল। রান্নাঘরের প্রসঙ্গই এল বা, কিংবা পাকপ্রণালি—তিনি নিজে অসুস্থ হয়ে ডাক্তারের নিষেধে খেতে পারছেন না কিছু, শুয়ে শুয়ে পাকপ্রণালি পড়ছেন। এমনও হয়েছে 'ঠানদি'র উল্লেখ করলেন। কিন্তু একটা কথাও নিরর্থক নয়, এলোমেলো নয়, মূল লক্ষ্য থেকে খসে-পড়া বেহিসাবি কথার কথা নয়। যখনই যা বলতেন একটা সমন্বয়ের ঠাস বুনোট আপনি তৈরি হত, একেবারে প্রয়োগহীন, অকৃত্রিম। আশ্চর্য তার বর্ণবৈচিত্র্য। বক্তব্যকে

পরিস্ফুট করতে তাঁর কাছে কিছুই অপাঙ্‌ক্তেয় বা অকুলীন নয়। মন্দিরে এমন এক পরিমণ্ডল সৃজন করে তুলতেন ক্ষিতিমোহন যা গানের মতোই উপাদেয়। এক ঘণ্টার বক্তৃতা শুনতে শুনতে মনে হত যেন কোথা দিয়ে কেটে গেল সময়টা।

তাঁর ভাষণের সেই ধরন বা আঙ্গিক হারিয়ে গেছে, কোনো কালেই তা আর পাওয়া যাবে না। তবে রাবীন্দ্রিক ঢং সে নয়। ক্ষিতিমোহনের কণ্ঠস্বরে, উচ্চারণের ভঙ্গিতে কোনো কোনো শব্দের পূর্ববঙ্গীয় টানে সে একেবারেই আলাদা। আর ভাষণ শুনেই মনে হত লোকটা মাটি-ঘেঁষা। সেইখানে তাঁর একটা নিজস্ব জোর ছিল। আসলে ক্ষিতিমোহন ভাষণ দিতেনই না। তিনি এ কালের শিক্ষায় শিক্ষিত নব্য কথক। তাঁর ঢং কথকতার ঢং, নানা রসের সমাহার তাতে। রবীন্দ্রনাথ আগাগোড়া সুগম্ভীর, উদাত্ত, গভীর উপলব্ধির প্রকাশ ঘটত তাঁর ভাষণে। ক্ষিতিমোহনের লক্ষ্য এবং তাঁর অসামান্য ক্ষমতা কোনো গভীর জীবনতত্ত্ব শ্রোতার মর্মে পৌঁছে দেওয়া। নানা দেশের নানা ভাষার জিনিস নিয়ে মেশাতেন। যেন জলতরঙ্গ—বলতেন যখন যেন নানান পর্দায় নানান সুর বাজত। লঘুতে-গুরুতে মেশাতেন ক্ষিতিমোহন, গম্ভীরের সঙ্গে কৌতুকের অবাধ মিশ্রণ ঘটত। বিষয়বৈচিত্র্যের শেষ ছিল না। শ্রোতারা অন্যমনস্ক হওয়ার সময়ই পেতেন না।[৫৪০]

রবীন্দ্রজন্মোৎসব ও একটি বিবাহপ্রসঙ্গ

রবীন্দ্রনাথ ১৯৩০ সালটা প্রায় আগাগোড়াই আশ্রমে অনুপস্থিত ছিলেন। তিনি ইউরোপ যাত্রা করেছিলেন ২ মার্চ। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি হিবার্ট বক্তৃতা দিলেন, তার আগে এবং পরে ইউরোপের নানা জায়গায় তাঁর আঁকা ছবির প্রদর্শনী হল, সোভিয়েট ইউনিয়ন সফর করলেন, সেখান থেকে আমেরিকা ঘুরে তিনি ফিরেছিলেন। অক্সফোর্ডে বক্তৃতার পরে জুন মাসের শুরুতে তিনি যান এলমহার্স্টের ডার্টিংটন হলে। ৬ জুন ১৯৩০ ক্ষিতিমোহনকে তাঁর লেখা একখানি চিঠি পাচ্ছি, কবির জন্মদিন উপলক্ষে ক্ষিতিমোহন তাঁকে যে চিঠি লিখেছিলেন, এটি তার উত্তর। বিদেশে প্রবল কর্মব্যস্ততার চক্রে আবর্তিত তাঁর মন খ্যাতির স্বর্ণসিংহাসনে বসে ঈষৎ ক্লান্তকণ্ঠে যেন অন্তরঙ্গ বন্ধুর কাছে তাঁদের সেই একান্ত আপন নিভৃত শান্তিময় আশ্রয়ে স্বজনপরিবেষ্টিত হয়ে বসে বছরশেষে সাতই পৌষের পুণ্য দিনটিকে অন্তরে গ্রহণ করবার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছে।

ওঁ

প্রীতিনমস্কার নিবেদন

আমার জন্মবাৎসরিক অভিনন্দনপত্র আপনার কাছ থেকে আজ পাওয়া গেল। সত্তর বছর পূর্ব্বে আমার জীবনের প্রথম ঘটনা ঘটেছে; আজ আমার জীবনের শেষ ঘটনা ঘটবার দিন কাছে এল। এবারকার মতো এ জন্মের কৃত ও অকৃত কর্ম্মের পালা শেষ হয়ে এসেচে। কতবার মনে ইচ্ছা হয় এই অস্তসাগরের খেয়াঘাটে সুগভীর অকর্ম্মণ্যতার মধ্যে অবগাহন স্নান করে তার পরে পাড়ি দিই।

আমার এখানকার ইতিবৃত্তান্ত লেখবাব যোগ্য। কিন্তু কী জানি আমার তাতে কিছুতেই রুচি হয় না। আমার সঙ্গী যে আছে তার লেখনীও জড়তাগ্রস্ত। বক্তৃতা এবং ছবির খ্যাতি যথেষ্ট পরিমাণ পাওয়া গেচে—এমন কি পরিমাণ ছাড়িয়ে গেছে বল্‌লে হয়ত কথাটা অতিপরিমিত হবে না।

দিল্লীর জমীদার শ্রীরাম সাহেব তাঁর উইলে বিশ্বভারতীকে ৪০,০০০ চৌকাগজ ভূমি দান করেচেন এ খবর আপনার চিঠিতে পেয়ে খুশি হলুম। আমি অস্তগত হবার আগে হয়ত হস্তগত হবে না—যখন সময় হবে তখন ব্যবহার করবার যোগ্য বুদ্ধির অভাব ঘটবে না এই আশা করি—নইলে সম্পদ হয়ে ওঠে বিপদ, দান হয়ে ওঠে বোঝা। সুহৃদ কয়েকদিন হল দেশে যাত্রা করেচে। তার কাছ থেকে আমাদের সব খবর বিস্তারিতভাবে শুনতে পাবেন।

সেদিন পূর্ব্বতন আশ্রমবাসী মনোমোহন ঘোষ অমিয়র কাছে দুঃখ করে লিখেচেন যে আমি সংবাদপত্রে আমাদের ভারতীয় রাষ্ট্রনীতির প্রতি বিমুখতা জানিয়েছি। আমার সম্বন্ধে দেশের ও বিদেশের লোক বহু অহৈতুক মিথ্যা প্রচার করেচে সেজন্যে কোন্ গ্রহকে দায়ী করব? বিস্ময়ের বিষয় এই যে বিশ্বাস করবার পক্ষেও দেশের লোকের মনে কোনো বাধা নেই। নিন্দার চেয়ে সেইটাতেই অধিক বেদনা পাই। আজ মধ্যাহ্নভোজনের পর বথীকে দেখতে যাব। শুনচি সে ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠচে। আমার শরীর ভালোই আছে—নইলে এত কাজ করতে পারতুম না—কিন্তু মন বড়ো ক্লান্ত।

বিদ্যালয়ের কাজ এতদিন আরম্ভ হয়েচে—সেই পথেই আমার হৃদয়ের গতায়াত চল্‌চে। আপাতত এই আশা নিয়ে দিন গণনা করচি যে ৭ই পৌষের পূর্ব্বে আশ্রমে পৌঁছতে পারব।

আমার সংবাদ ও আশীর্ব্বাদ আশ্রমবাসী সকলকে জানাবেন। ইতি

৬ই জুন ১৯৩০ আপনাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর[৫৪১]

পৌষ উৎসবের আগে ফেরা হয়নি রবীন্দ্রনাথের এবং সম্ভবত পৌষ উৎসবের আগেই অথবা তার অব্যবহিত পরে ক্ষিতিমোহনরাও কয়েকজন কদিনের জন্য পাটনা গিয়েছিলেন প্রাচ্যবিদ্যা সম্মেলনে যোগ দিতে। পণ্ডিত বিধুশেখর ভট্টাচার্য, পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন, Dr. Julius Germanas, ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ এই সম্মেলনে বিশ্বভারতীর প্রতিনিধি।[৫৪২]

আর-একটি উল্লেখযোগ্য তথ্য এখানে যোগ করি। রবীন্দ্রনাথের হিবার্ট বক্তৃতা যখন গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হল, তার সংযোজন অংশে (Appendix) তিনি ক্ষিতিমোহনের The Baul Singers of Bengal এবং Dadu and the Mystery of Form এই প্রবন্ধ দুটি যোগ করলেন।[৫৪৩]

৩১ জানুয়ারি ১৯৩১ ফিরলেন রবীন্দ্রনাথ। প্রবাসপ্রত্যাগত আচার্যের প্রতি শ্রদ্ধায় ভালোবাসায় হয়তো তাঁকে ঘিরে ছাত্র-শিক্ষক-আশ্রমিকরা সকলে একত্রিত হয়েছিলেন আম্রকুঞ্জতলে এবং ক্ষিতিমোহন আশা করি সেই আনন্দসমাবেশের রসাস্বাদন থেকে বঞ্চিত হননি। তবে সংবাদপত্রের সাক্ষ্য অনুযায়ী দীর্ঘ অনুপস্থিতির পরে রবীন্দ্রনাথকে যে অনুষ্ঠানে মধ্যমণি হয়ে বিরাজিত দেখি, সেটা শ্রীনিকেতনের বার্ষিক উৎসব। দিনটা ২৫ মাঘ, ইংরেজি

৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৩১, উৎসব-সূচনায় বিশ্বভারতীর ছাত্রছাত্রীদের সমবেত কণ্ঠে 'জয় হোক নব অরুণোদয়' গানের পরে ক্ষিতিমোহন বেদমন্ত্র পাঠ করলেন।[৫৪৪]

এ বছর রবীন্দ্রনাথের সত্তর বছর পূর্ণ হল। সমগ্র দেশের পক্ষ থেকে মহাসমারোহে রবীন্দ্রজয়ন্তী পালনের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। কবির জন্মদিনে শান্তিনিকেতনেই তাঁর সপ্ততি বর্ষপূর্তি উৎসব হবে। এই উপলক্ষে আশ্রমের পক্ষ থেকে ১৩ ফাল্গুন ১৩৩৭ পত্রিকায় একটি আবেদন প্রকাশ করা হল। তাতে বলা হল বিশেষ করে শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র অধ্যাপক কর্মী বা আর যাঁরা যে-কোনোভাবে মনে মনে আশ্রমের সঙ্গে যুক্ত, তাঁরা যেন তাঁদের বর্তমান ঠিকানা অগ্রিম জানান ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়কে, এই উপলক্ষে কোনো চিঠি লিখলেও তাঁকে লেখেন।[৫৪৫] শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রজন্মোৎসবের দায়িত্ব এবার রবীন্দ্রপরিচয়সভার। সভার পক্ষ থেকে কবির সত্তরতম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে একটি সংকলনগ্রন্থ প্রকাশের সংকল্প নেওয়া হয়েছে। সেজন্য অনেক আগেই এই মর্মে আর-একটি আবেদন আশ্রমবন্ধুদের কাছে পাঠানো হয় যে, তাঁদের মধ্যে কেউ যদি এই সংকলনগ্রন্থের জন্য দেশে ও বিশ্বজগতে কবির দান সম্বন্ধে যে-কোনো দিক থেকে আলোচনা-সংবলিত প্রবন্ধ লিখে পাঠান তাঁদের মাতৃভাষায় বা ইংরেজিতে, তবে রবীন্দ্রপরিচয়সভার সদস্যরা অনুগৃহীত হবেন। 'ভিন্ন ভিন্ন চিত্তে এই মহাকবির ভাব কিরূপে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে, এই উপলক্ষ্যে তাহার একটা সংগ্রহ করিতে আমরা ইচ্ছা করিয়াছি।'[৫৪৬]

পঁচিশে বৈশাখ সকালে আম্রকুঞ্জে শান্ত গাম্ভীর্যপূর্ণ অনাড়ম্বর পরিবেশে কবির জন্মোৎসব। তাঁকে জন্মদিনের শ্রদ্ধানিবেদনের মানসে আশ্রমিকরা, কবির গুণগ্রাহী বহু বিশিষ্ট ও অন্যান্য মানুষ উৎসবক্ষেত্রে সমাগত। আগের দিন থেকে আলপনা ও বিবিধ উপচারে সুন্দর করে সাজানো হয়েছিল উৎসবের স্থানটি, রাত্রের ঝড়বৃষ্টিতে সব পণ্ড হয়ে যায়। প্রত্যুষে আবার সব নতুন করে সাজাতে হল। সভার শুরুতে পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী স্বরচিত সংস্কৃত শ্লোক পাঠ করলেন, তার পর বৈদিক স্তোত্রপাঠ ও কয়েকটি রবীন্দ্রসংগীত। বৈদিক মন্ত্রগুলি সবই নেওয়া হয়েছিল অথর্ববেদ থেকে। 'মন্ত্রগুলি শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী কর্তৃক নির্ব্বাচিত ও অনুবাদিত। সেগুলির সানুবাদ আবৃত্তি তিনিই করেন।' —লেখা হয়েছিল পত্রিকায়। মাল্যে-চন্দনে ভূষিত কবির হাতে স্বদেশ ও বিদেশের অনুরাগী বন্ধুরা নানা উপহার তুলে দিলেন। বৃক্ষরোপণ ও প্রপা উৎসর্গের পর কবির অভিভাষণ। তার পরে অধুনা রচিত তিনটি কবিতা আবৃত্তি করলেন—'প্রণাম' 'জন্মদিন' ও 'পান্থ'। অবশেষে পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী আশীর্বচন পাঠ করলেন।[৫৪৭] এ বছরের শেষের দিকে বড়োদিনের সময় কলকাতা টাউনহলে যখন রবীন্দ্রজয়ন্তী উৎসব হল, রবীন্দ্রপরিচয়-সভার পক্ষ থেকে ক্ষিতিমোহন তাঁদের সংকলিত 'জয়ন্তী উৎসর্গ' গ্রন্থ রবীন্দ্রনাথের হাতে তুলে দিয়েছিলেন।

কিন্তু সেবার পঁচিশে বৈশাখের দিনই তাঁকে রবীন্দ্রনাথের আদেশে আর-এক সম্পূর্ণ ভিন্ন ভূমিকা পালন করতে হয়েছিল। ইতিমধ্যে তাঁকে ব্রাহ্মপরিবারের বিবাহানুষ্ঠানে আচার্যের আসনে বসতে হয়েছে, সে কাজে রবীন্দ্রনাথই তাঁকে প্রবৃত্ত করেছিলেন। বৈদিক

পদ্ধতি অনুসরণে এই-সব বিবাহ-অনুষ্ঠান সম্পাদনে তিনি নিজেও আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু এবারের ব্যাপারটা অন্যরকম ছিল। শান্তিনিকেতনের রমা মজুমদার ও সুরেন্দ্রনাথ কর বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হবেন, দিন স্থির হয়েছে কবির সত্তর বছরের জন্মদিনেই—২৫ বৈশাখ। রমার মা চান হিন্দুমতে সনাতন পদ্ধতিতে বিবাহ-অনুষ্ঠান হোক। জীবনে তিনি বিস্তর শোক পেয়েছেন, রবীন্দ্রনাথ বন্ধুপত্নীর এই ইচ্ছার অমর্যাদা করতে চান না। তিনি উদ্যোগী হয়ে চেষ্টা করা সত্ত্বেও কিন্তু ব্রাহ্মণ পুরোহিত অমিল হল। বিশ-তিরিশের দশকে তখনও হিন্দু সমাজবিধান যথেষ্ট কড়া, এই অসবর্ণ বিয়ের পৌরোহিত্য করতে পেশাদার পুরোহিতের বাধা ছিল, অথবা হয়তো অন্য কোনো বাধা দেখা দিয়েছিল।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কে লেখা রবীন্দ্রনাথের ২১ বৈশাখ ১৩৩৮-এর চিঠি থেকে জানা যায় আগে তাঁকে রবীন্দ্রনাথ এই বিয়ের পৌরোহিত্য করবার জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন। তাঁকে লিখেছিলেন :

> কল্যাণীয়েষু
>
> সুনীতি, একটা সামাজিক সঙ্কটে তোমার শরণাপন্ন হলুম। ইতিহাসটা এই—সুরেন এবং নুটু কোনো এক গ্রহচক্রে পরস্পরকে পছন্দ করেচে। নুটু বৈদ্য ঘরের মেয়ে সুরেন কায়স্থ ঘরের ছেলে। নুটুর মা হিন্দু সমাজের সনাতন বিধিবিধানে অবিচলিত নিষ্ঠাবতী। তাঁর মন শান্ত করবার জন্য প্রমথনাথ তর্কভূষণ মশায়ের কাছ থেকে এক পত্রী সংগ্রহ করেচি। তিনি বলচেন এরকম বিবাহ শাস্ত্রমতে এবং লোকাচারের মতে বৈধ। এখন ঠেকেচে পুরোহিত নিয়ে। যদি সুরেন হিন্দুসমাজ থেকে তিরস্কৃত হবার মতো কোনো অপরাধ না করে থাকেন তবে তাঁকে সে দণ্ড থেকে অব্যাহতি দেওয়া তোমাদের কর্তব্য হবে। যদি তোমরা আনুকূল্য না করো তবে অগত্যা অশাস্ত্রীয় ভাবে কার্যসমাধা করা ছাড়া উপায় থাকবে না। কিন্তু হিন্দুসমাজে এমন করে ছিদ্র খনন করলে সমাজ কতদিন টিকবে?
>
> বিবাহের দিন ২৫শে বৈশাখ শুক্রবারে। বিলম্ব করা চলবে না যেহেতু শীঘ্র আমাকে স্থানান্তরিত হতে হবে। তুমি স্বয়ং যদি বন্ধুর প্রতি অনুকম্পা করে এই কাজটি সম্পন্ন করে দাও তো সবচেয়ে ভালো হয়। যদি কোনো অনিবার্য বিঘ্ন থাকে তবে তোমার কোনো সুহৃদকে এই কাজে নিয়োগ করে দিয়ো। সময় অল্প অতএব তারযোগে সম্মতি জানিয়ে আমাকে নিরুদ্বিগ্ন কোরো। ইতি ২১ বৈশাখ ১৩৩৮
>
> শুভানুধ্যায়ী
>
> শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ফণীভূষণ অধিকারীকে এই প্রসঙ্গে ২০ বৈশাখ লেখা রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠি পাওয়া যায়। তাঁর প্রশ্নের উত্তরে কবি জানিয়েছিলেন এই বিয়ে হবে পূর্ববঙ্গে যে হিন্দুমতে কায়স্থে বৈদ্যে বিবাহ প্রচলিত আছে, সেই মতে।[৫৪৮] অবশ্য সুনীতিকুমার বা তাঁর কোনো সুহৃদকে এই কাজে তিনি পাননি দেখা যাচ্ছে। অনিবার্য বিঘ্নই ঘটেছিল। তবু 'অশাস্ত্রীয়ভাবে কার্যসমাধা'-র পথ রবীন্দ্রনাথ এড়িয়েছিলেন ব্রাহ্মণ পুরোহিত সংগ্রহ করে। সুজিতকুমার মুখোপাধ্যায় তখন বিদ্যাভবনের ছাত্র, শেষে তাঁকেই এ কাজের দায়িত্ব নিতে আহ্বান জানালেন কবি। রমা সুজিতকুমারের বড়োদিদির মতো, সুরেন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীর অধ্যাপক—এ বিয়েতে তাঁর মতো অর্বাচীন কী করে পৌরোহিত্য করবে ভেবে তিনি যখন

দিশাহারা, তাঁকে নিশ্চিন্ত করে রবীন্দ্রনাথ বললেন : 'তার জন্যে ভাবিস নে। ক্ষিতিমোহনবাবু সব ঠিক করে দেবেন।' নিশ্চয় পূর্বাহ্নেই 'ক্ষিতিবাবু'-র সঙ্গে পরামর্শ সারা হয়ে গিয়েছিল তাঁর। সুতরাং শুভদিনে শুভলগ্নে ২৫ বৈশাখ ১৩৩৮ শালগ্রাম শিলা সাক্ষী রেখে হোম করে হিন্দুমতে হিন্দুপদ্ধতিতে যথারীতি সুরেন্দ্রনাথ-রমার বিবাহ-অনুষ্ঠান হল। জাতিভেদ-বিরোধী অপৌত্তলিক রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত রইলেন। লিখেছেন সুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়।[৫৪৯] যে মানবিকতাবোধে নিজের বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্ন দূরে রেখে এই বিয়েতে রবীন্দ্রনাথ যোগ দিতে পারলেন, সেই একই বোধহেতু ক্ষিতিমোহনও তাঁর গুরুদেবের ইচ্ছা শিরোধার্য করে নিয়ে সুজিতকুমারের পাশে থেকে এই হিন্দুপদ্ধতি অনুসারে বিয়ের পৌরোহিত্যকর্ম তাঁকে দিয়ে করিয়ে নিতে পারলেন। এই মানুষই কোনো পৌত্তলিক অনুষ্ঠানে যোগদানে চিরদিন বিরত থেকেছেন এবং কন্যাদের বিবাহ পারিবারিক বিশ্বাসমতে হিন্দুপ্রথায় হতে দিয়েছেন, কিন্তু নিজে তাঁদের কাউকে সম্প্রদান করেননি।

রামমোহন শতবার্ষিকীতে বক্তৃতা। বন্ধুর চোখে ও আরও কিছু

অনেকদিন থেকেই দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ভয়ানক উত্তপ্ত ও অস্থির হয়ে উঠেছে। ইতিহাসের তথ্যানুসারে এই সময়—এই তিরিশের দশকের সূচনা থেকেই তা যেন একটা চরম সীমার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল।

> ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ একদিকে যেমন গোলটেবিল বৈঠক ব্যর্থ করিয়া দিতে সচেষ্ট ছিল, অপর দিকে ভারতবর্ষে তাহার অনিবার্য প্রতিক্রিয়ার মোকাবিলা করিবার জন্য সমস্ত রকমের প্রস্তুতি করিতেছিল। বলা বাহুল্য, এই প্রস্তুতি তাহার চিরকালের বীভৎস পাশবিক দমননীতি।[৫৫০]

রাজশক্তির প্রতিনিধিরা একের পর এক অর্ডিন্যান্স পাস করে এবং মারণাস্ত্র প্রয়োগ করে এক হাতে দেশের অহিংস আইনঅমান্য আন্দোলন ও অন্যহাতে দেশের সশস্ত্র বিপ্লব আন্দোলন স্তব্ধ করে দেওয়ার জন্য তখন মরিয়া।[৫৫১] সারা দেশের উপর দিয়ে সরকারি নির্যাতনের ঝড় বয়ে গেলেও কিন্তু ইংরেজের পক্ষে বিক্ষুব্ধ ও জাগ্রত ভারতের কণ্ঠরোধ করা সম্ভব হয়নি। নেতারা সব জেলে, তবু সরকারি নিষেধাজ্ঞা ও নির্যাতনকে উপেক্ষা করে স্বতঃস্ফূর্ত ব্রিটিশশাসন-বিরোধী আন্দোলন নিত্য নবপ্রাণ সংগ্রহ করে প্রসারিত হচ্ছিল[৫৫২] তবে সেই সঙ্গে ব্রিটিশ সরকারের ভেদনীতির বিষক্রিয়ায় হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা বেধে ভয়াবহ আত্মক্ষয়ও ঘটছে। একই নীতিতে হিন্দুসমাজকে দুর্বল করতে অনুন্নত হিন্দু সম্প্রদায়গুলিকে তার থেকে বিচ্ছিন্ন করার কূটচালও চেলেছে তারা, যার পরিণতিতে অবশেষে যারবেদা জেলে গান্ধীজির আমৃত্যু অনশনব্রত গ্রহণ।[৫৫৩] ভারতের জাতীয় চেতনার অভ্যুদয়জাত এই আন্দোলনকে যে ভীষণ আক্রোশে নিষ্পেষিত ও পঙ্গু করে দিতে চাইছিল শাসক ইংরেজ, তার প্রতিক্রিয়ায় পশ্চিম মহাদেশের বিবেকী বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে নিদারুণ চাঞ্চল্য ও উদ্‌বেগেরও সৃষ্টি হয়েছিল।[৫৫৪] তবে শুধু ভারত নয়, সেই প্রাক

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্বে সামগ্রিকভাবে সারা বিশ্বই সংকটাক্রান্ত।[৫৫৫] এমনই সময় ক্ষিতিমোহনের গৃহে মঙ্গলানুষ্ঠান, গুরুপল্লির বাড়িতে ৪ আষাঢ় ১৩৩৯ কনিষ্ঠা কন্যা অমিতার বিবাহ। সেদিন পূর্ণিমা, 'কল্যাণীয়া অমিতার শুভ পরিণয় উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথের আশীর্ব্বাদ' ছিল একটি কবিতা। বিয়ের দিন সন্ধ্যাবেলা সেই আশীর্বাদি কবিতা নিয়ে তিনি স্বয়ং এসেছিলেন বিবাহসভায়।

বধূবেশিনী কল্যাণীয়া আশ্রমকন্যার দিকে চেয়ে বিশ্বব্যাপ্ত সৃষ্টিলীলারহস্য মনে আসছে কবির। মন বলছে এই ক্ষুব্ধ যুগান্তের ভিতর দিয়ে মানুষের ভাগ্যনিয়ন্তা মহাকালের কণ্ঠে দীপক রাগে বাজছে মরণবিজয়ী প্রাণমন্ত্রে সৃষ্টির বাণী।[৫৫৬] কিছুকাল আগে ক্ষিতিমোহনের কণ্ঠেও যেন এই ধরনেরই কয়েকটা কথা শুনেছিলাম বর্ষশেষ দিনের মন্দির-ভাষণে, চৈত্র সংক্রান্তিতে। আচার্য-আসনের সামনে তাঁর মুখোমুখি বসে নবীন প্রজন্মের প্রতিনিধি আশ্রমের ছাত্রছাত্রীদের দল। পৃথিবীজোড়া আলোড়িত জীবনের উদ্‌বেগবিক্ষুব্ধ অনিশ্চয়তার দিকে নয়, বর্ষশেষের সূর্যাস্তের দিকে চেয়ে ক্ষিতিমোহন তাদের শোনাচ্ছিলেন নবযুগের আগমনি। একদিকে অস্ত আর-একদিকে উদয়। নবীন দেখে কেবল উদয়কে, প্রবীণের চোখে অবসানের অবসান নেই যেন। আরম্ভ ও শেষে আসলে বিরোধ তো নেই, উভয়ে পূর্ণ করছে উভয়কে।

> পুরাণের যাঁরা পূজক তাঁরা বৃথা নূতনকে করেন উপেক্ষা, আবার নূতনের যাঁরা পূজক তাঁরা পুরাতনকে করেন অস্বীকার। এ কথা আমরা ভুলে যাই যে পুরাতনই তার অর্থহীন যত আবর্জ্জনার ভার ঝরিয়ে দিয়ে চলে আসছে নূতনের মধ্যে নবরূপ নিয়ে।[৫৫৭]

মহাপ্রভুর সময় যেমন এক নবভাবের যুগ এসেছিল, সে ছিল কেবল ভারতের এক কোণে—বঙ্গভূমির সীমানায় বদ্ধ। আর আজ এসেছে পৃথিবীজুড়ে 'সর্বযুগসার' নতুন যুগ। —বলেছিলেন ক্ষিতিমোহন।

> চারিদিকে দুঃখকষ্ট আঘাত-সংঘাতের সুকঠোর বিরুদ্ধতার মধ্যে তারই আগমনীর সুগভীর রহস্য রয়েছে প্রচ্ছন্ন। ভবিষ্যৎ ইতিহাসের একটি সুমহৎ তপস্যা চলেছে এই মহাযুগেরই প্রাঙ্গণ জুড়ে। ...তোমরা যে এমন সময়ে জগতের সাধনাক্ষেত্রে এসে উপস্থিত হয়েছ এ তোমাদের পরম সৌভাগ্য।[৫৫৮]

এ কথার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আরও বললেন দানবের হাতে দেবতার শক্তিও দানবীয় হয়ে ওঠে—কল্যাণ যার অভীষ্ট সেই অভিশাপ নিয়ে আসে। কিন্তু দেশে যাঁরা কল্যাণের সাধনা করছেন, সেই মানব-তাপসেরা নবযুগের তীর্থরচনা করবেন। তাঁদের তপস্যা সিদ্ধ হোক, এই সাধনায় জগতের সবাই সকলকে বলদান করুক, একই কল্যাণধ্যানমন্ত্র সকলের চিত্তকে উদ্‌বুদ্ধ করুক। তারই সঙ্গে যোগযুক্ত হোক শান্তিনিকেতন আশ্রমের সাধনা—

> এখানে তোমরা সবাই প্রতিদিনকার কল্যাণসাধনায় এমন একটি তীর্থরচনা করবে যা আপনার কল্যাণের দ্বারা ভিতর বাহিরের সব বাধা ধৌত অপগত করে মানবকে একটি নবজন্ম দিতে পারবে।[৫৫৯]

বছরখানেক পরের কথা। সেদিন ১০ মার্চ, বিকেলে ক্ষিতিমোহন শ্রীনিকেতনে 'বিনুরি মেলা'-র উদ্‌বোধন করলেন। শ-তিনেক মানুষের সম্মেলন মেলা উপলক্ষে, নানা ধরনের গ্রামীণ হস্তশিল্প প্রদর্শনীর আয়োজন। গ্রামের মানুষের হাতে তৈরি এই-সব বিচিত্র লোক-শিল্পের যথার্থ মর্যাদা ও রসটুকু খুব ভালো করেই জানেন ক্ষিতিমোহন, গ্রাম্য বা দেহাতি জীবনের সঙ্গো তাঁর আজন্মের যোগ। হাসি-গল্পে সভা এমন জমিয়ে তুললেন যার তুলনা বিরল। উদ্‌বোধনী বক্তৃতায় গ্রামজীবনের নানা মজাদার সব উদাহরণ টেনে আনলেন, নানা লোককাহিনির প্রসঙ্গা মিশল তার সঙ্গো।[৫৬০] তাঁর ভাষণ এমনই নানা বৈচিত্র্যে-বৈশিষ্ট্যে সর্বদাই সমুজ্জ্বল। কখনও তা প্রেরণাময়, মানবচিত্তের গভীরে সে জ্বালিয়ে তোলে আলো, এই আবার কখন যে গল্পে-গানে-হাসির কথায় অতি সাধারণ খেটে-খাওয়া মানুষদেরও কিংবা চপলমতি বালক-বালিকা কিশোর-কিশোরীদেরও নিজের ভাবজগতে সে টেনে নিয়ে আসে, যেন বুঝতেই পারা যায় না। সেসময় বিশ্বভারতী এক্সটেনশন লেকচার পর্যায়ে ক্ষিতিমোহন প্রত্যেক বৃহস্পতি শনি ও সোমবার রবীন্দ্র-সাহিত্য সম্পর্কে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। আম্রকুঞ্জে বেলা তিনটের সময় এই বক্তৃতা হত। কেবলমাত্র আশ্রমবাসীদের জন্যই এই বক্তৃতার ব্যবস্থা, বাইরে থেকে কেউ এসে যোগ দিতে চাইলে বক্তার পূর্ব অনুমতি নিতে হত।[৫৬১] 'দাদূ'-র কাজ শেষ হয়ে গিয়েছিল, বইটা ছাপা হচ্ছে। গত বছরে আবার তাঁর অনেকগুলি নতুন ও মূল্যবান পদের সন্ধান পেয়ে সেগুলি বইয়ে যোগ করেছেন। ২৯ জুন যখন গরমের ছুটির পরে বিশ্বভারতী খুলল, রবীন্দ্রনাথ প্রতি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় নিয়মিত বাংলা ছন্দ নিয়ে আলোচনা করতে শুরু করলেন অধ্যাপক ও ছাত্রদের সমাবেশে।[৫৬২] যখন ক্ষিতিমোহন এখানে জীবন শুরু করেছিলেন তখন তাঁর প্রথম দশ-বারো বছর এক রকমের আশ্রমিক পরিবেশে কেটেছিল। কবিকে ঘিরে আশ্রমিকদের ঘরোয়া সভা তখন বলতে গেলে প্রত্যহ বসত। আর সকলের মতো সে-সব বৈঠকে যোগ দিয়ে ক্ষিতিমোহন সীমাহীন আনন্দ পেতেন। অবশ্য পরেও, রবীন্দ্র-তিরোধান পর্যন্তই, যখনই কবি তাঁর নতুন রচনা পড়ে শুনিয়েছেন, বা নিজের কোনো সৃষ্টি নিয়ে আলোচনা করেছেন ক্ষিতিমোহন পারতপক্ষে অনুপস্থিত থাকেননি। সেই প্রথম যুগের আশ্রমের জনহীন শান্ত পরিবেশে সময়ে-অসময়ে যথেচ্ছ কবিসান্নিধ্য-পাওয়া মধুর দিনগুলি এখন হারিয়ে গেছে। এখন রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে থাকলে অনেক সময় অনেক বিশিষ্ট মানুষ আসেন, বাইরের অনেকেই থাকেন সন্ধ্যায় কবির বৈঠকে, কিন্তু বিধুশেখর-ক্ষিতিমোহন আর আগের মতন যান না। তবু মনে প্রশ্ন আসে, এইবারের এই ছন্দ-আলোচনাসভাতেও কি তিনি না গিয়ে থাকতে পারতেন?

২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৩৩ রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যুর শতবর্ষ পূর্ণ হল। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ও রামমোহন লাইব্রেরির যৌথ উদ্যোগে একটি সভার আয়োজন হয়েছে। সেদিনের রামমোহন লাইব্রেরির সভায় অন্যতম বক্তা ক্ষিতিমোহন। তাঁর বন্ধু করুণাশংকরও এই উপলক্ষে এসেছেন, তিনিও ভাষণ দিলেন। সভায় সভাপতির আসনে প্রথমে ছিলেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, পরে সেই আসনে বসলেন কৃষ্ণকুমার মিত্র।

ক্ষিতিমোহন তাঁর মৌখিক ভাষণে বললেন হিন্দি সন্তকবির পদ আছে—রাত্রির অন্ধকারে যখন গ্রামে মহামানবের পদার্পণ ঘটে, পাহারাদার কুকুরগুলো একসঙ্গো চেঁচাতে থাকে, এই প্রতিবাদী চিৎকার-হট্টগোলেই সারা পৃথিবীর মনোযোগ আকৃষ্ট হয়, বোঝা যায় যে এক মহাপুরুষের আবির্ভাব ঘটেছে। সত্যি কথা বলতে কি, ঘটমান ইতিহাসের তাৎপর্য আমাদের দেশের মানুষ তো নয়ই, সমস্ত পৃথিবীর মধ্যেও খুব কম মানুষই সময়মতো বুঝতে পারেন। ধরা শিকারটা যতক্ষণ না পচে গলে যায় ততক্ষণ কুমির সেটা খায় না। প্রায়ই দেখা যায় দেশের সবচেয়ে বরণীয় ব্যক্তিদের সম্বন্ধে মানুষের মনোভাব তেমনই শোচনীয়। রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যুর পর একটা পুরো শতাব্দী কেটে গেল এবং এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে, আমরা এখন এই সবে তাঁকে জানতে শুরু করেছি। ক্ষিতিমোহন আরও বললেন ইতিহাসে আকস্মিক বলে কিছু নেই। এ কথা মনে করা ভুল যে ভারত-ইতিহাসের কেন্দ্রভূমিতে রামমোহন হঠাৎ এসে দাঁড়িয়েছিলেন। প্রকৃত কথা হল, এই ভারতভূমিতে আবির্ভূত ধর্মগুরু-পরম্পরার শেষ সূত্রটি তিনি নিজে। রামমোহন-সমসাময়িক যুক্তপ্রদেশের সন্ত দেধরাজ প্রসঙ্গা একটু আনলেন ক্ষিতিমোহন। উভয়ের ধর্মভাবনার আশ্চর্য মিলগুলি একটু উল্লিখিত হল এবং এই কথাটিও যথেষ্ট প্রাধান্য পেল যে রামমোহন শুধু বাংলা গদ্যের জনক নন, হিন্দি গদ্যেরও সৃজক তিনি। ক্ষিতিমোহন নিজে অল্পবয়সে রামমোহন-কৃত কোনো একটি উপনিষদের হিন্দি অনুবাদগ্রন্থ দেখেছিলেন, কিন্তু এখন সেটি আর চোখে পড়ে না, সে কথা তিনি উল্লেখ করলেন। শেষ করবার আগে মন্তব্য করলেন রাজার যে, কী আশ্চর্য স্বচ্ছন্দ ও গম্ভীর হিন্দি রচনার হাত ছিল, তার পরে তাঁর পরিচয় দেবেন তাঁর বন্ধু করুণাশংকর কুবেরজি ভট্ট।[৫৬৩]

এইসময় বেশ কিছুদিন করুণাশংকরজি কলকাতায় আছেন এবং ক্ষিতিমোহনের সঙ্গা লাভ করে যে আনন্দ ও তৃপ্তি পাচ্ছেন, সে কথা তাঁর রতিভাইকে লেখা চিঠি থেকে জানতে পারি। একটি চিঠিতে লিখেছিলেন :

> আজ সকালে ক্ষিতিবাবু নিত্যনিয়মানুসার আমার বাসায় আসিলেন। প্রসঙ্গা অনুসারে তাঁহার দ্বারা অতি বিরল প্রাণপ্রদ বস্তু পাওয়া যায়। তাঁহার নিকট হইতে যে প্রেরণা পাইতেছি তাহা অবাচ্য। সাক্ষাতে ধন্যক্ষণে তাঁহার অভিহিত কথাগুলি আমি সহজভাবে বলিব।[৫৬৪]

আর-একটি চিঠিতে ক্ষিতমোহন প্রসঙ্গো তিনি লেখেন :

> পূজ্য ক্ষিতিবাবুর দ্বারা অজস্র প্রেরণাত্মক বাউল গান বৈষ্ণব কীর্তনাদি শুনিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছি। প্রভূত ধন্যক্ষণ এইভাবে অতিবাহিত হইতেছে। তদন্তর পুনঃ পুনঃ বহু কিছু নূতন জানিতে পারিতেছি। সেই সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে আপনাকে লিখিবার ইচ্ছা আছে। প্রস্তরগাত্রেও বৃক্ষ জন্মায়। ভৃতকাধ্যাপন বিষয়ে আপনি যথেষ্ট অবগত আছেন, সেজন্য কিছু লিখিতেছি না।[৫৬৫]

বোধ হয় শেষ দুটি বাক্যের ইঙ্গিত এই যে, ভৃতকাধ্যাপনকর্মে নিয়োজিত আছেন করুণাশংকর, অর্থাৎ তিনি অর্থের বিনিময়ে অধ্যাপনা করেন এবং তার ফলে ক্রমশ পাথরের

মতো কঠিন জড়বৎ হয়েছে তাঁর মন, কিন্তু পাথরের গায়েও যেমন গাছ জন্মায়, তিনিও তেমনই ক্ষিতিমোহনের কাছ থেকে প্রেরণা পেয়ে শ্যামল ও সরস হয়ে উঠছেন। বলা বাহুল্য, এ তাঁর বিনয়। তিনি পরাধীন, স্বেচ্ছামতে মানসচর্চা করতে পারেন না, সেজন্য তাঁর বেদনা ছিল। আমরা আগেও দেখেছি।

সেপ্টেম্বরে পুজোর ছুটি ছিল বলে আগেই স্থির হয়েছিল যে, রামমোহন রায় শতবার্ষিকী-সমিতির অনুষ্ঠান হবে বড়োদিনের ছুটিতে। এই অনুষ্ঠানসূচির অন্যতম ছিল সিনেট হলে আয়োজিত ২৯-৩১ ডিসেম্বরব্যাপী রামমোহন-বিষয়ক আলোচনাচক্র। বলতে গেলে একই সময়ে বরোদায় সপ্তম প্রাচ্যবিদ্যা সম্মেলন। ২৭-২৯ ডিসেম্বর বরোদা কলেজে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল, এই উপলক্ষে সারা ভারত থেকে বিদ্বজ্জনেরা এসে মিলিত হয়েছিলেন।[৫৬৬] এই সম্মেলনে ক্ষিতিমোহন যে প্রবন্ধ দেন তা হল 'The Conception and Development of Sunya Vada in Medieval India'। স্পষ্ট উল্লেখ পাইনি সম্মেলনে ক্ষিতিমোহন নিজে গিয়েছিলেন কি না। এমনও হতে পারে যে, তিনি বরোদার সম্মেলন শেষ হওয়ার আগেই রামমোহন আলোচনাচক্রে যোগ দিতে ফিরে এসেছিলেন। তাঁর রামমোহন আলোচনাচক্রের প্রবন্ধ হল 'যোগক্ষেত্র ভারতের পূর্ণসাধক রামমোহন'।[৫৬৭] সবশেষ দিন রবিবার ৩১ ডিসেম্বর এই প্রবন্ধ পড়বার কথা ছিল। কিন্তু শতবার্ষিকী-সমিতির সভাপতি রবীন্দ্রনাথের ভাষণটি এগিয়ে আনার প্রয়োজনে অনেকগুলি প্রবন্ধপাঠ স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিতে হয়, তার মধ্যে ক্ষিতিমোহনের প্রবন্ধও ছিল। রামমোহন শতবার্ষিকীর অব্যবহিত পরে প্রবন্ধটি দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত হয় এবং তার পরে শতবার্ষিকী-সমিতি প্রকাশিত 'রামমোহন রায় স্মারক গ্রন্থ ১৯৩৩'-এর অন্তর্ভুক্ত হয়।[৫৬৮]

মনে তাঁর ভাবনা ছিল এই তিন দিনের আলোচনাচক্রে যখন দেশবিদেশের জ্ঞানীগুণীরা নানা দিক থেকে বিচার-বিশ্লেষণ করেও 'রামমোহনের গভীরতার তল পাননি, তখন তিনি আর শেষদিনে নতুন কথা কী বা বলবেন। কিন্তু কার্যত তাঁর প্রবন্ধ রামমোহনচর্চায় এক নতুন পথের সন্ধান দিল বলা যেতে পারে। এর আগে ২৭ সেপ্টেম্বরের সভায় যে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, এ প্রবন্ধে তারই বিস্তৃততর আলোচনাকল্পে ক্ষিতিমোহন প্রশ্ন তুললেন : 'রামমোহন কি ভারতের পূর্বাপর সাধনার নিত্যধারার সঙ্গে আন্তরিক প্রাণযোগে যুক্ত, না তিনি অকারণে বাহির হইতে আপতিত একটি আকস্মিক উপদ্রব মাত্র?' তাঁর মতে রামমোহনের পরে শতাব্দীকাল অতিবাহিত হয়ে গেলেও তিনি সব ক্ষেত্রেই আমাদের চেয়ে এত এগিয়ে আছেন যে আমরা আজও তাঁর নাগাল পাই না, তবু তাঁর নিজের দেশকালের সঙ্গে তাঁর যোগই গভীরতম, নিত্য ও শাশ্বত। তিনি আকস্মিক নন, 'তিনি ভারতে সনাতন চিরন্তন ধারারই যুগগত পরিপূর্ণতা'। প্রাচীন ও মধ্যযুগবর্তী মহাসাধকদের সাধনধারা নিরবচ্ছেদে চলে এসেছে রামমোহনের আমল পর্যন্ত এবং তিনি নিজের মধ্যে সেই সাধনার উত্তরাধিকার বহন করেছেন। প্রসঙ্গক্রমে হিন্দু-মুসলমান ধর্মমতের বিরোধের অসারতা প্রদর্শনে কবীরের চেষ্টার কথা এল, এল দাদূর ব্রহ্ম-সম্প্রদায়ের কথা এবং

রজ্জবজির সত্য অন্বেষণের কথা। আরও পূর্ববর্তী সাধকদের পরিচয় দিলেন, সম্রাট আকবরের 'দীন ইলাহি' ও তাঁর পৌত্র দারা শিকোহ্‌র ধর্মসমন্বয়-স্বপ্নের কথা বললেন। দেখালেন রামমোহনের উদার সাধনার আদি প্রেরণা আছে রজ্জবজির বাণীতে। তিনি যেমন বলেছেন : 'ঘটে ঘটে প্রতি মানবের অন্তরে অন্তরে যে প্রাণময় বেদ, হে রজ্জব, তাহা একবার দেখ পড়িয়া', রামমোহনও তেমনই তাঁর সব শাস্ত্রবিচারে সব বেদবেদান্তভাষ্যে এই প্রাণবেদকেই খুঁজে বেড়িয়েছেন। 'রামমোহনের পশ্চাতে ভারতের অগণিত সাধু-ভক্ত-মহাত্মাদের সকল প্রাণ-মন-আত্মার মহাযোগ।' রামমোহনের একেবারে সমসাময়িক সাধক দেধরাজের প্রসঙ্গ এ প্রবন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করলেন ক্ষিতিমোহন। তাঁর জন্ম ১৭৭১ সালে পাঞ্জাব-রাজপুতানার মধ্যবর্তী নারনৌল জেলাতে ধারসু গ্রামে, আর মৃত্যু রামমোহনের মৃত্যুর পরে। পলটুসাহেব নামে অন্য যে আর-কিছুদিন আগেকার এক সাধকের উল্লেখ করলেন, এই প্রবন্ধে তাঁর অবসর হয়নি তাঁর সম্পর্কে আলোচনার। দেধরাজের ধর্মসাধনপ্রণালির বিস্ময়কর ঔদার্যের পরিচয় দিয়ে ক্ষিতিমোহন বললেন : 'অনেক বিষয়ে তিনি রামমোহন হইতেও আধুনিক।' তবুও কেন রামমোহনকেই যুগগুরু বলে মানতে হবে সে প্রশ্ন উত্থাপন করে তিনি উত্তর দিলেন। মধ্যযুগে কেবল হিন্দুমুসলমান ধর্মের যোগই ছিল সমস্যা, আর রামমোহনের সময়ে তখন এসে পড়েছে ইউরোপ তার বিজ্ঞান কর্ম শিক্ষা সভ্যতা-সংস্কৃতি নিয়ে। পূর্ব ও পশ্চিমের সংক্ষুব্ধ মিলনে আলোড়িত বিভ্রান্ত সেই যুগসন্ধিতে অসামান্য দৃঢ়তা জ্ঞান ও দূরদৃষ্টির দ্বারা রামমোহন ভারতের নতুন যুগের সাধনাকে শুধু ধর্ম ও ধর্মসাধনায় সীমাবদ্ধ না রেখে জ্ঞান ও কর্মের সর্ববিধ ক্ষেত্রে প্রসারিত করে দিলেন। বিশাল বিপদসংকুল নদীমোহনায় জাহাজের সুদক্ষ পাইলটের যে ভূমিকা, ভারতের গতিপথ নির্ধারণে রামমোহনেরও তাই, সেজন্যই তিনি আধুনিক যুগের সার্বভৌম যুগনেতা।

বাউলরা বলে : 'ডাক থুইয়া যাওয়া'। ''মহাপুরুষেরা নাকি উত্তরকালের জন্য ডাক রাখিয়া যান ; তাহাই মন্ত্র।'' সে মন্ত্র যিনি গ্রহণ করে আপন জীবনে প্রতিষ্ঠিত করেন তিনি তাকেও সার্থক করেন, নিজেকেও ধন্য করেন। রামমোহন তাঁর ডাক থুয়ে গেছেন এবং মহর্ষি তাঁর জীবনে দেখিয়েছেন আকাশে ভাসমান বীজ জীবনে গ্রহণ করলে কী হয়— এ-সব কথা বলতে গিয়ে ক্ষিতিমোহনের মনে হচ্ছিল : 'আজ উৎসব উৎসবই নয়, যদি আমাদের জীবনে এইসব জীবন্ত বীজমন্ত্রকে আশ্রয় দিতে না পারি', মনে হচ্ছিল : 'আজ জীবনে সেই বীজমন্ত্র গ্রহণের দিন।'

প্রায় একই সময়ে ক্ষিতিমোহন রামমোহন বিষয়ে আর-একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন— 'রামমোহন ও তাঁহার সমসাময়িক ভারতীয় সাধক'। এটি মুদ্রিত হয় রামমোহন শতবার্ষিকী উপলক্ষে ছাত্রদের পক্ষ থেকে প্রকাশিত গ্রন্থে। এটি তাঁর পূর্ব-প্রবন্ধের পরিপূরক অথবা বলা যেতে পারে এ প্রবন্ধ তার ধারাবাহিকতা রক্ষা করেছে।[৫৬৯]

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে ও উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে ভারতের চার জায়গায় চার মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়েছিল, এই ভেদবিড়ম্বিত দেশে তাঁরা ঐক্যের

সাধনা করেছিলেন, ক্ষিতিমোহন বলেছিলেন এই প্রবন্ধে। এঁরা হলেন : তুলসীদাস হাথরসী (১৭৬০ সালের কাছাকাছি, মহারাষ্ট্র); পলটুসাহেব (তুলসীসাহেবের অল্পদিন আগে, উত্তর-পশ্চিমের ফৈজাবাদ জেলা); দেধরাজ (১৭৭১, পাঞ্জাব-রাজপুতানার মাঝখানে নারনৌল জেলা) ; রামমোহন রায় (১৭৭২, বঙ্গাদেশ)। প্রথম তিনজনের সাধনা ছিল ধর্মসাধনার মধ্যে এবং সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যে যে অন্যায় ভেদবুদ্ধি রয়ে গেছে, তার উচ্ছেদ করে ঐক্য ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা। রামমোহনের সাধনা বিস্তৃততর ক্ষেত্রে। তাই ভারতীয় আধুনিক যুগের প্রবর্তক তিনি, যুগনেতৃত্বের ভার তাঁর উপর। এই প্রবন্ধে ক্ষিতিমোহনের মূল অভীষ্ট রামমোহন প্রসঙ্গের প্রেক্ষিতে তুলসীদাস হাথরসীর আলোচনা।

বছরশেষে বিশ্বভারতীর বার্ষিক বিবরণে তাঁর বেশ কয়েকটি গবেষণাকর্মের উল্লেখ চোখে পড়ে, তার মধ্যে কতকগুলির পাণ্ডুলিপি সম্পূর্ণ প্রস্তুত, অর্থাভাবে বিশ্বভারতী ছাপার ব্যবস্থা করতে পারছে না। কয়েকটি গবেষণাপ্রবন্ধও প্রস্তুত হয়েছে। এ বছরের প্রতিবেদনে তাঁর সমাপ্ত-অসমাপ্ত যে কাজগুলির উল্লেখ আছে তা হল : ১. বাউল পরিচয়; ২. কবীর : জীবন ও বাণী ; ৩. আনন্দঘনর বাণীসংকলন ; ৪. সরমাদ-এর বাণীসংকলন ; ৫. বাংলার বাউলের নির্ভয় বাণীসংকলন ; ৬. ভারতীয় মধ্যযুগের ধর্মান্দোলনের ইতিহাস (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বক্তৃতায় এরই একটি রেখাচিত্র দিয়েছিলেন) ; ৭. রজ্জবের বাণীসংকলন ; ৮. সহজ বাণীসংকলন; ৯. রশিদপুরী বাণীসংকলন ; ১০. নিরঞ্জনপন্থ সম্প্রদায়ের ইতিহাস।

এর বাইরে আরও কতকগুলি বিষয় মাথার মধ্যে পাক খাচ্ছে। মনে ইচ্ছা সেগুলিকে এক-একটি প্রবন্ধে রূপ দেন। যেমন, ভারতের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে প্রাক বৈদিক যুগের ধর্মের প্রভাব ; মহেঞ্জোদরোর ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস ; ঋগ্‌বেদীয় যুগের ধর্ম ও সংস্কৃতি ; অথর্ববেদীয় যুগের ধর্ম ও সংস্কৃতি ; শূন্য ও সহজবাদের ক্রমবিকাশ ; মধ্যযুগীয় শূন্যবাদ। এইসঙ্গে উত্তরবঙ্গের তিনটি অপেক্ষাকৃত অজ্ঞাত বাউল সম্প্রদায় সম্পর্কেও অনুসন্ধান ও তথ্যসংগ্রহের কাজ চলছে তাঁর। এই সম্প্রদায়গুলি হল : কমলকুমারী-সম্প্রদায়, মাঝবাড়ি-সম্প্রদায় ও মধ্যম-সম্প্রদায়।[৫৭০]

বিদ্যাভবন ও শিক্ষাভবনে যথারীতি ক্লাস চলছে। ১৯৩৩ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনে ১৯৩০ সালের পঞ্চবার্ষিক প্রতিবেদনের উল্লেখ করে জানানো হয়েছে যে, এই কয়েক বছরে পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী ও পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেনের তত্ত্বাবধানে বিদ্যাভবনের ছাত্ররা প্রায় পঞ্চাশটি গবেষণা-প্রবন্ধ প্রস্তুত করেছেন, তার কোনো-কোনোটি প্রাচ্যবিদ্যাচর্চা-বিষয়ক পত্রিকায় প্রকাশিতও হয়েছে।[৫৭১]

দিনেন্দ্রনাথ ও বিধুশেখরের প্রস্থান

মাস তিনেক পরের কথা। জানা যাচ্ছে বাংলা নববর্ষের আগে ক্ষিতিমোহন বেশ একটু অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন এবং শান্তিনিকেতনে ছিলেন না। শান্তিনিকেতন থেকে তাঁকে লেখা

রবীন্দ্রনাথের ৩ বৈশাখ ১৩৪১ তারিখের চিঠি পাচ্ছি, পয়লা বৈশাখ সকালে উপাসনার পরে চিরকালের অভ্যাসমতো তাঁর মন খুঁজেছিল ক্ষিতিমোহনকে এবং না-পেয়ে বেদনাবোধ করেছিল—সে কথা তিনি জানিয়েছেন।

প্রীতিনমস্কার শান্তিনিকেতন

এবার নববর্ষাবম্ভের উৎসবে আপনি উপস্থিত থাকতে পারেন নি। এমন বোধ হয় আব কখনো ঘটেনি। মন্দির থেকে বেরিয়ে চিরাভ্যাসমতো মন আপনাকে প্রত্যাশা কবেছিল—পবক্ষণেই আপনার অনুপস্থিতির বেদনা চিত্তকে কঠিন আঘাত করল। জানি দূরে রোগশয্যা থেকেই আপনাব ধ্যানেব সত্তা আমাদের সকলের নিকটেই ছিল। আমার সর্বান্তঃকবণের শুভকামনা আপনি গ্রহণ করুন।

এই মাসেব শেষভাগে সিংহল যাত্রা করতে হবে। তারি উদ্যোগ চলচে। কিছু আহরণ কবে আনতে পাবব কিনা জানিনে। নানা ব্যর্থ পরীক্ষার পর দেখা গেল আমাদের ভিক্ষার ঝুলি এই নাচ গান। এই উপায়ে অল্প পরিমাণ অর্থ ও বহুল পরিমাণ লোকনিন্দা সংগ্রহ করে আনি। ছেলেমেযেবা খুসি আছে দেশ দেখা ও সমুদ্রযাত্রার এই সুযোগে। কিছু যদি না পাই অন্তত এইই হবে পুবস্কাব। ফিরে যখন আসব তখন আপনি বল লাভ করে শয্যা ছেড়ে উঠতে পেবেছেন এই যেন দেখতে পাই—অনেকদিন উদ্বেগ ভোগ করেছি। ইতি

৩ বৈশাখ ১৩৪১ আপনাদেব

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুব[৫৭২]

রবীন্দ্রনাথ সিংহল থেকে ফিরলেন ২৮ জুন, আর গরমের ছুটির পরে বিশ্বভারতী খুলল ১ জুলাই। প্রভাতকুমাব মুখোপাধ্যায় লিখেছেন : 'বিদ্যালয়ের মধ্যে পরিবর্তন কিছু-না-কিছু সর্বদাই চলিতেছে।' কখনও কখনও কথাটা খুব মর্মান্তিকভাবে সত্য। ১৩৪১ সালের শ্রাবণে আশ্রম ছেড়ে চলে গেলেন দিনেন্দ্রনাথ, চলে গেলেন চিরকালের মতো। এর আগেও তিনি ব্যক্তিগত কারণে রাগ-অভিমান করে চলে গেলেও আবার ফিরে এসেছেন, এবার আর ফিরলেন না। তার পব বিদায় নিলেন শ্রীভবনের পরিচালিকা হেমবালা সেন। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন : 'সম্প্রতি কতকগুলি ছোটোখাটো ঘটনায় এমন-একটি আবহাওয়ার সৃষ্টি হয় যে, হেমবালা দেবী ছুটি লইয়া অন্যত্র চলিয়া যাওয়াই স্থির কবিলেন।' তাঁকে লেখা ববীন্দ্রনাথেব চিঠি পড়লে বোঝা যায় যে তিনি চলে যাচ্ছেন বলে ববীন্দ্রনাথ ব্যথিত হযেছিলেন কিন্তু এ ব্যাপারে তিনি নিরুপায় হয়ে পড়েছিলেন। অবশ্য যে-ববীন্দ্রনাথকে ১৯০৯-১০ সালে ক্ষিতিমোহনকে লিখতে দেখেছিলাম : 'প্রিন্সিপল্ নামক একটা আধুনিক জুজু আছে আমি তাহাকে খুব বেশি ভয় করি না—আমি নিয়ম একেবারে মানি না তাহা নয় আবাব তাহাকে অত্যন্ত বেশি সম্মান করাকেও আমি পৌত্তলিকতা বলিয়া মনে করি', এখন দেখছি সেই মানুষই হেমবালা সেনকে লিখছেন : 'কর্মের নিয়ম নির্মম ..তাব উপর আমিও হস্তক্ষেপ করি নে—'।[৫৭৩] এর পরে বিদায় নিয়ে গেলেন বিধুশেখর শাস্ত্রী, 'আদর্শের বিরোধই এই বিচ্ছেদের অন্যতম কারণ।' কিছুদিন থেকে তিনি অনুভব করছিলেন আশ্রমের আগেকার আদর্শ যা ছিল, যে আদর্শ ছিল বিশ্বভারতীর সূচনাপর্বে, এখন আশ্রম তা থেকে ক্রমশই নানাভাবে সরে আসছে। 'বিধুশেখর

খুঁজিতেছিলেন তাঁহার পুরাতনকে ; কিন্তু জগতে চলমান প্রতিষ্ঠানে সেই অচল মূর্তি আশা করিলে দুঃখ পাইতে হয়।'[৫৭৪] সৈয়দ মুজতবা আলী লিখেছেন :

> বিধুশেখর যখন ব্রাহ্মবিদ্যালয়ে যোগদান করেন তখন তিনি এই দৃঢ় বিশ্বাস নিয়েই আসেন যে, তিনি বৈদিক যুগের আশ্রমেই প্রবেশ করেছেন। এখানে বেদমন্ত্র পাঠ হয়, ব্রাহ্মণ-সন্তান মাত্রই যজ্ঞোপবীতধারী, আমিষ পাদুকা আশ্রমে নিষিদ্ধ, ব্রহ্মচর্যের বহু ব্রত এখানে পালিত হয় এবং গুরুশিষ্যের সম্পর্ক অতি প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যানুযায়ী।[৫৭৫]

আগে যতদিন বারো বছরের বেশি বয়সের ছাত্র নেওয়া হত না ততদিন কঠিন হলেও আশ্রমবিদ্যালয়ে ব্রহ্মচর্যের আদর্শ সামনে রেখে চলা তবু সম্ভব ছিল, এখন বিশ্বভারতীতে পূর্ণবয়স্ক ছাত্রও যোগ দিচ্ছেন, কর্মী ও শিক্ষক নিয়োগের সময় রবীন্দ্রনাথের সেই পুরোনো কালের নিজস্ব মানদণ্ড প্রয়োগ করা হচ্ছে এমন মনে করবার কারণ নেই, এখন নানা মানসিকতার মানুষ নানা প্রয়োজনসাধন করতে নিয়োজিত হচ্ছেন। আবহাওয়া তো বদলাবেই। তবে আদর্শগত বিরোধের কথা বললেও প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় এ কথাও স্বীকার করেছেন যে, সেটাই বিধুশেখরের আশ্রম ছেড়ে যাওয়ার একমাত্র কারণ নয়, অন্য কারণও ছিল। তিনি বলেছেন : 'আপিসের দৌরাত্ম্যের সূত্রপাত হইয়াছে, তাহা বিধুশেখরের পক্ষে সহ্য করা কঠিন হয়।' হয়তো এই-সব কারণেই প্রভাতকুমার অন্যত্র লিখেছেন : 'কিছুকাল হইতে বিধুশেখরের সহিত বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের কয়েকটি বিষয় লইয়া মতভেদ চলিতেছিল।'[৫৭৬]

কিন্তু কারা এই কর্তৃপক্ষ? যাঁরা প্রশাসনিক দায়িত্বে রয়েছেন তাঁরা তো বহিরাগত কেউ নন, শান্তিনিকেতনেরই মানুষ, তাঁদের কেউ কেউ ব্রহ্মচর্যাশ্রমের ছাত্র ছিলেন। এককালের ভাবনা অন্যকালে হয়তো খানিকটা বদল হয়ে যায়, বর্তমানের প্রয়োজন মেটাতে দৃষ্টিভঙ্গি পালটাতে হয় কিছুটা। তা বলে ১৯৩৪ সালেই কতটা বদলে গিয়েছিল শান্তিনিকেতনের আবহাওয়া যে বিধুশেখর শাস্ত্রীর মতো শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্বকে শান্তিনিকেতন থেকে চলে যেতে হবে? যৌবনে যিনি অনায়াসে এই আশ্রমবিদ্যালয়ে নিজের জীবনসাধনার আসন পেতেছিলেন, পদমর্যাদা বা অধিক অর্থোপার্জনের উচ্চাশা যাঁকে এই তিরিশ বছরে বিচলিত করেনি, এ বছর বরোদার মহারাজার বার্ষিক অনুদান বন্ধ হয়ে গেল বলে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত বিভাগে অধ্যাপনার চাকরি নিয়ে চলে গেলেন, এ কথা অবিশ্বাস্য মনে হয়।[৫৭৭]

রবীন্দ্রনাথ তো শান্তিনিকেতনে সকলকে মেলাতেই চেয়েছিলেন, সেখানে কারও কোনো ব্যক্তিগত মত বিশ্বাস বা আচার-অভ্যাসের জন্য কেউ অপাঙ্‌ক্তেয় হয়ে যেতেন না। বিধুশেখরের মতো পরম নিষ্ঠাবান স্বপাক-আহারি ব্রাহ্মণের সঙ্গে প্রথমাবধি তাঁর শ্রদ্ধা ও প্রীতির সম্বন্ধ। বিধুশেখরের তিনি গুরুদেব, বিধুশেখর তাঁর শাস্ত্রীমশায়। তাঁর পুরাতনকে খুঁজছিলেন বিধুশেখর, তাই সমস্যা হল? কিন্তু সৈয়দ মুজতবা আলী যে বলেন বিধুশেখর শাস্ত্রীকে সংকীর্ণচেতা কূপমণ্ডূক ভাবলে তাঁর উপর নির্মম অবিচার হবে, সে কথা কি তবে ভুল? অ্যান্ড্রুজ যাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু, ব্রহ্মমন্দিরে আচার্যের আসনে বসে যিনি ব্রহ্মলাভের

পন্থাবর্ণনা প্রসঙ্গে আবৃত্তি করেন ইমাম গজ্জালীর 'কিমিয়া সাদৎ' (সৌভাগ্য স্পর্শমণি), মৌলানা শোওকৎ আলীকে বাহুপাশে আবদ্ধ করে আশ্রমের খাওয়ার ঘরে নিয়ে যান, তিনি যদি সংকীর্ণচেতা হন তবে 'প্রার্থনা করি সর্বভারতবাসী যেন এরকম সংকীর্ণচেতা হয়'—বলেছেন তিনি। সে কথা ভুলি কেমন করে?[৫৭৮]

অনেক ব্যাপারেই আদর্শগত দ্বন্দ্ব ছিল তাতে সন্দেহ নেই, সেটা আকস্মিক পথরোধ করেছিল এমন নয় বলে আমাদের ধারণা। জীবনে অনেক সময়ই দেখা যায় অনেক অসন্তোষ ও ক্ষোভ জমতে জমতে হঠাৎ কোনো একটা ঘটনায় যেন ফেটে পড়ে, আমাদের মনে হয়েছে এখানেও হয়তো তাই ঘটেছিল। এ প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করে অমিতা সেনের কাছে শুনেছিলাম এক অঘটনের কথা। একটা গর্হিত অনৈতিক ব্যাপার ঘটে যেতে চাপে পড়ে বাধ্য হয়ে অপরাধীকে তখনকার মতো সরিয়ে দেওয়া হলেও কর্মপরিচালকরা কিছুকাল পরে পরিস্থিতি থিতিয়ে গেছে দেখে তাঁকে পুনর্নিয়োগ করেন। বিধুশেখর আর সহ্য করেননি। 'এই অন্যায়ের প্রতিবাদে বিধুশেখর শাস্ত্রী শান্তিনিকেতন ছেড়ে চলে যান। অথচ রটনা করা হল যে টাকার লোভে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি নিয়ে চলে গেছেন তিনি।'[৫৭৯] কেন তার অল্পদিন আগে হেমবালা সেনকেও যেতে হয়েছিল সেই প্রসঙ্গে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের একটি মন্তব্য যদি এর পাশাপাশি রাখি তবে এই-সব ভিন্ন ভিন্ন ঘটনার মধ্যে একটা অদৃশ্য যোগসূত্র যেন টের পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন :

> ছাত্রীদের প্রতি তিনি যেমনই দরদী, তেমনই নিয়মশৃঙ্খলারক্ষায় কঠোর ছিলেন। এই কঠোরতা কাহারও কাহারও মনে হইত অত্যধিক নীতিপরায়ণতা মাত্র। বালিকাদের পক্ষে অসময়ে বাহিরে যাওয়া-আসা সম্বন্ধে যে সব নিয়ম প্রত্যেক হস্টেলেই আছে, তাহা তিনি কর্তব্যবোধেই পালন করিতেন। তাহাতে সকলে সন্তুষ্ট ছিলেন না। তাঁহার বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ তুলিয়া কবির মন তাঁহার প্রতি বিরূপ করিয়া দেওয়া হয়।[৫৮০]

স্বভাবত মনে হয়, ক্ষিতিমোহন এই সময় এই-সব ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় কী ভাবছিলেন? বিধুশেখর যখন চলে যাওয়ার জন্য মনস্থির করলেন, তাঁর কী প্রতিক্রিয়া হল? দুই সতীর্থ তাঁরা,

> ...দুজনেই শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত। বেদ উপনিষদ শাস্ত্রাদিতে দুজনেরই সমান অধিকার। সংস্কৃত কাব্য সাহিত্যেরও উভয়েই ছিলেন রসজ্ঞ সমজদার। শান্তিনিকেতনে আগমনের পরে উভয়েরই অনুসন্ধিৎসা নব নব ক্ষেত্রে প্রসারিত হয়েছে; পাণ্ডিত্যের খ্যাতি দিকে দিকে প্রসারিত হয়েছে। ...দুজন ছিলেন সহপাঠী, শান্তিনিকেতনে এসে হলেন সহকর্মী, বিদ্যালয়ের কাজে দুজনেই রবীন্দ্রনাথের প্রধান সহযোগী, আলাপ আলোচনায় তাঁর নিত্যসহচর, বিশ্বভারতীর গুণীজনসভায় প্রধান সভাসদ। শান্তিনিকেতনের জীবনে এই দুই প্রতিভাবানের দান অপরিমেয়।[৫৮১]

জোড় ভেঙে চলে গেলেন একজন, অন্যজন নির্বিকার থাকবেন তা কি হয়? লিখিত প্রমাণ কিছু নেই, মৌখিক যা জেনেছি তাতে মনে হল অবশ্যই তা হয়নি,—নির্বিকার থাকতে পারেননি ক্ষিতিমোহন। শেষপর্যন্ত অবশ্য চলে যাওয়াও হয়নি তাঁর। একই কারণে তিনিও চলে যাবেন বলেই স্থির করেছিলেন : "কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এমন বেদনার সঙ্গে বল্লেন তাঁকে

'ক্ষিতিবাবু আপনিও আমাকে ছেড়ে যাবেন?' —যে বাবা সে সংকল্প ত্যাগ করেন।" বাড়িতে এসে কিরণবালাকে বললেন : 'কবিকে কথা দিয়ে এলাম তাঁকে ছেড়ে যাব না'।[৫৮২] জোড় ভেঙে গেল বটে, সেও চিরতরে নয়। শান্তিনিকেতনের মায়া বিধুশেখরের কাটেনি। এই পুনরাগমনে অবশ্য তাঁর প্রধান আকর্ষণ ছিল বিশ্বভারতীর চিনাভবন।[৫৮৩]

এই ঘটনায় ক্ষিতিমোহনের শান্তিনিকেতন ছেড়ে চলে যাওয়ার আর-একটা সম্ভাবনা দেখা দিয়ে মিলিয়ে গেল। এই শেষ। একদিন যে জীবনতরিখানা শান্তিনিকেতনের ঘাটে এসে লেগেছিল, সে আর কোনো কারণেই কোনোদিন নতুন ঘাটের সন্ধানে ভেসে যাওয়ার কথা ভাবেনি। হয়তো এই তাঁর ভবিতব্য। পরমশ্রদ্ধেয় পিতৃপ্রতিম কবির অনুনয়-মেশানো প্রশ্নের বেশে সে-ই তাঁকে বাঁধন পরিয়েছে। তাঁর স্বভাবেরও সহযোগ ছিল সন্দেহ নেই। যা শাশ্বত, যা সনাতন তার প্রতি তাঁরও মনের টান যদিচ সামান্য নয়, কোনো অন্যায় বা অনাচার ব্যভিচারকে পরোক্ষেও সমর্থন জানানোর প্রশ্নই ওঠে না, তবু কিশোর বয়স থেকেই পরিব্রাজকের মতো পথে পথে ঘুরেছেন বলেই হয়তো সব-রকম পরিস্থিতিতে নিজেকে মানিয়ে নেওয়ার শক্তিটা বেশিই ছিল। আমাদের মনে পড়ছে সৈয়দ মুজতবা আলীর একটি বিশ্লেষণী মন্তব্য—প্রাচীন-অর্বাচীন নিয়ে ক্ষিতিমোহনের ব্যক্তিগত জীবনে কোনো দ্বন্দ্ব ছিল না, আর :

> তিনি ছিলেন বিধুশেখর ও রবীন্দ্রনাথের মাঝখানে সেতুস্বরূপ...। তিনি এ যুগে ব্রহ্মচর্যাশ্রমের 'অসম্ভব' আদর্শে বিশ্বাস করতেন না. আবার সখা বিধুশেখরের নিষ্ঠায় শ্রদ্ধাবান ছিলেন বলে তাঁকে সমর্থন করতে পারলে আনন্দিত হতেন।[৫৮৪]

জীবনের নিয়মে শান্তিনিকেতনের রাঙা মাটির রাস্তা তাঁকে কোন্ বাঁকে বা ধন দেখালো, কোন্খানে বা দায় ঠেকালো—তারই উপর দিয়ে আপন অন্তরালোকটি জ্বালিয়ে নিয়ে 'মঝ্ঝিমপন্থা'-য় বিশ্বাসী ক্ষিতিমোহন পথ চলতে লাগলেন।

তখন দিনেন্দ্রনাথ বোধ করি শান্তিনিকেতন ছেড়েই গেছেন এবং বিধুশেখর তখনও চলে না-গেলেও তিনিও যে এখানকার বাঁধন অচিরেই ছিন্ন করবেন তা আর বোধ হয় কবির অজানা নেই। সেই সময়কার এক ভাষণে কবি বলেছিলেন : 'আমার আজ বিপদের দিন। ...বিচিত্র আঘাতে ও বিরুদ্ধতায় আজ আমার মন ক্লান্ত ক্লিষ্ট।'[৫৮৫] এর চার মাস পরে বিশ্বভারতীর বার্ষিক পরিষদসভায় যখন তিনি ভাষণ দিলেন, এই বিষাদবোধ, এই বিপদশঙ্কা তখন কোথায় অন্তর্হিত হয়ে গেছে। তিনি বলছেন :

> অনেকদিন পরে আজ এ আশ্রমকে সমগ্র করে দেখতে পাচ্ছি ; দেখছি আপন নিয়মে এ আপনি গড়ে উঠেছে। গঙ্গা যখন গঙ্গোত্রীর মুখে তখন একটিমাত্র তার ধারা। তারপর ক্রমে বহু নদ-নদীর সহিত যতই সে সংগত হল, সমুদ্রের যত নিকটবর্তী হল তত তার রূপান্তর ঘটেছে। সেই আদিম স্বচ্ছতা তার আর নেই, কত আবিলতা প্রবেশ করেছে তার মধ্যে, তবু কেউ বলে না গঙ্গার উচিত ফিরে যাওয়া, যেহেতু অনেক মলিনতা ঢুকেছে তার মধ্যে, সে সরল গতি আর তার নেই। সব নিয়ে যে সমগ্রতা সেইটিই বড়ো—আশ্রমও স্বতোধাবিত হয়ে সেই পথেই

চলেছে, অনেক মানুষের চিত্তসম্মেলনে আপনি গড়ে উঠছে। নিত্যকালের মতো কিছুই কল্পনা করা চলে না—তবে এর মূলগত একটি গভীর তত্ত্ব বরাবর থাকবে এ কথা আমি আশা করি—সে কথা এই যে, এটা বিদ্যাশিক্ষার একটা খাঁচা হবে না, এখানে সকলে মিলে একটি প্রাণলোক সৃষ্টি করবে। এমনতরো স্বর্গলোক কেউ রচনা করতে পারে না যার মধ্যে কোনো কলুষ নেই, দুঃখজনক কিছু নেই ; কিন্তু বন্ধুরা জানবেন যে এর মধ্যে যা নিন্দনীয় সেইটাই বড়ো নয়। ... নিন্দনীয়তার হাত থেকে কেউই রক্ষা পেতে পারে না। কিন্তু তাকে পরাস্ত করে উত্তীর্ণ হয়েও টিঁকে থাকতেই প্রাণের প্রমাণ। ... আমি কল্পনা করি, এখানকার বিদ্যালয়ের আস্বাদন এক সময়ে যাঁরা পেয়েছেন, এখানকার প্রাণের সঙ্গে প্রাণকে মিলিয়েছেন, অনেক সময় হয়তো তাঁরা এখানে অনেক বাধা পেয়েছেন, দুঃখ পেয়েছেন, কিন্তু দূরে গেলেই পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে পান এখানে যা বড়ো, যা সত্য। ... এক সময়ে তাঁরা এখানে আনন্দ পেয়েছেন, সখ্যবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন—এর প্রতি তাঁদের মমতা থাকবে না, এ হতেই পারে না।[৫৮৬]

রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই দুই প্রবীণ সহযোগীকে খুব ভালো করেই চিনতেন। আমাদের বিশ্বাস, শান্তিনিকেতন আশ্রমকে সত্যালোকে দেখবার এই প্রয়াস তাঁদের অন্তরকে স্পর্শ করেনি, এও কখনোই হতে পারে না। বিধুশেখর শাস্ত্রী চলে যেতে বিদ্যাভবনের অধ্যক্ষতার ভার ক্ষিতিমোহনের উপর অর্পিত হল। ১৯৫২ সাল পর্যন্ত তিনি এই দায়িত্ব বহন করেছেন।

এ বছরের সেপ্টেম্বর মাসের একটি কথা বলা হয়নি। ২৭ সেপ্টেম্বর রামমোহন রায়ের প্রয়াণদিবস। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধানিবেদনের জন্য দেশের বহু জায়গায় সভার আয়োজন হয়েছিল। শান্তিনিকেতনে রামমোহন-স্মৃতিসভায় ক্ষিতিমোহন যে বক্তৃতা করেন তার বিষয়বস্তু জানতে পারি আনন্দবাজার পত্রিকার প্রতিবেদন এবং প্রবাসী থেকে। তিনি বলেন সমগ্র হিন্দুভারত এই সময়ে পরলোকগত পিতৃপুরুষদের তর্পণ করে। এমন একটি সময় ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সন্তানের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করবার সুযোগ হয়ে ভালো হয়েছে। রামমোহন রায়ের ব্যক্তিত্ব মহামানবত্বের দীপ্তিতে সমুদ্ভাসিত। দেশকে তিনি একটি গৌরবময় লক্ষ্যের দিকে নিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা উত্তরোত্তর বর্ধিত হয়ে অবশেষে সেই নিত্যজ্ঞানময়ের চরণে উৎসর্গীকৃত হয়। যখন তিনি সাহসের উপর ভর করে নতুন যুগের সূচনাকল্পে কালের গুরুর আহ্বানে এক নতুন ভাবধারা বহন করে আনলেন, সেই ছিল তাঁর জীবনের যুগপ্রবর্তনকারী শুভ মুহূর্ত। সেসময় দেশে বাইরে থেকে নতুন ভাবের বন্যা প্রবেশ করে দেশবাসীকে পাশ্চাত্য জ্ঞানের স্পর্শে মুগ্ধ করেছিল। যাঁরা তার সংস্পর্শে এলেন তাঁদের মধ্যে অসন্তোষের আগুন জ্বলে উঠেছিল। রামমোহন তাঁর বিরাট ব্যক্তিত্ব ও অসামান্য বুদ্ধিবলে সুদক্ষ নাবিকের মতো সেই বিক্ষোভ-আবর্ত থেকে জাতীয় ভাবধারাকে একটা সুনিয়ন্ত্রিত পথে পরিচালিত করলেন। এর দ্বারা তিনি সংস্কৃতিগত পরাজয়ের গ্লানি থেকে ভারতবর্ষকে রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছিলেন। ক্ষিতিমোহন বলেন, রামমোহন ধর্মের মূলসূত্রকে আধুনিক জ্ঞানালোকের সাহায্যে একটি আধুনিক ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করেন এবং জাতীয় জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রেই তাঁর বিশেষ দান রয়েছে।

উপসংহারে ক্ষিতিমোহন বর্তমান ভারতের যুবশক্তিকে এই মহৎ জীবন থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করার জন্য অনুরোধ করেন।[৫৮৭]

দাদূ। শিক্ষা-বিষয়ক বক্তৃতা। নানা চিঠিপত্র

১৯৩৪ সালে ক্ষিতিমোহনের 'চীন জাপাননী যাত্রা' প্রকাশিত হয়, সে কথা আগেই বলা হয়েছে। এটি হিন্দি থেকে গুজরাতিতে অনুবাদ করেন কিকুভাই রতনজি দেশাই। ক্ষিতিমোহনের ভূমিকাও গুজরাতি ভাষায় লেখা।

১৯৩৫ সালের গোড়ার দিকেই স্থির হয়েছে 'বিশ্বভারতী কোয়ার্টার্লি' আবার প্রকাশিত হবে, ৭ মে রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনে প্রথম সংখ্যা বেরোবে।[৫৮৮] 'দাদূ'-ও বেরোল ওই সময়েই, প্রথম বাঁধানো কপিখানা কবির জন্মদিনের অনুষ্ঠানে তাঁর হাতে তুলে দিতে পারলেন ক্ষিতিমোহন। 'এক যুগের কবিগুরু শ্রীশ্রীদাদূর বাণী অন্যযুগের কবিগুরু শ্রীশ্রী রবীন্দ্রনাথকে তাঁহার ৭৫তম জন্মদিনে শ্রদ্ধার অর্ঘ্য দিলাম'—উপসর্গপত্রে তিনি লিখেছিলেন।[৫৮৯] প্রায় পঁচিশ বছর উত্তর ও পশ্চিম ভারতে ঘুরে ঘুরে দাদূসাহেবের পদগুলি ও তাঁর জীবন সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন, এতদিনে সে-সব উপকরণ একটি গ্রন্থের আকারে সংবদ্ধ করার কাজ সম্পূর্ণ হল।[৫৯০] প্রিয় ছাত্র জয়ন্তীলাল আচার্যকে আগস্ট মাসে লেখা একটা চিঠিতে আভাস পাওয়া যায় বইটা প্রকাশের মুখে কী প্রচণ্ড ব্যস্ততায় দিন কেটেছে তাঁর। যাই হোক, নানা অসুবিধার মধ্যে শেষপর্যন্ত বইটা বেরিয়েছে। এই সময় আবার এক প্রিয়জনের অসুস্থতার কারণে গভীর উদ্‌বেগের মধ্যে পড়েছিলেন, ধারও হয়ে গেছে বেশ কিছু টাকা। আমেদাবাদে রণছোড়ভাই মিস্ত্রির কাছ থেকে যে প্রতিশ্রুত টাকা পাওয়ার কথা ছিল, তার জন্য জয়ন্তীলালকে তাগিদ দিতে লিখলেন। বিশ্বভারতী থেকে 'দাদূ' পেয়েছেন পঁচিশ কপি, কলকাতার বন্ধুদের দিয়ে আর তা থেকে কিছু বাঁচানোই মুশকিল। তবু তারই মধ্যে এক কপি মাস্টারজির জন্য আলাদা করে রেখেছেন, বিশ্বভারতী যদি আরও পঁচিশ কপি বই না দেয় তা হলে হয়তো জয়ন্তীলালকে মাস্টারজির বইটাই পড়তে হবে, তিনি নিরুপায়।[৫৯১]

এ বছরের অন্যান্য সংবাদের মধ্যে রবীন্দ্র-সাহিত্যের সঙ্গে আশ্রমবাসীর পরিচয় গড়ে তুলতে রবীন্দ্রপরিচয়সভা নিয়মিত পাঠচক্রের আয়োজন করছে। ক্ষিতিমোহন সভাপতি, প্রভাতচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদক। প্রত্যেক শুক্র ও রবিবার ক্ষিতিমোহন প্রাগ্রসর ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিশেষ ক্লাস নিচ্ছেন। বিশ্বভারতীর শীতকালীন সত্রকালে ১১ ও ১৮ জানুয়ারি তাঁর বিশেষ বক্তৃতা ছিল। এবারকার বক্তৃতায় প্রথম দিনের বিষয় ছিল রবিদাস, আর দ্বিতীয় দিনের তুলসী হাথরসী। এর পরে বর্ষাকালীন সত্রকালে ১৬ ও ৩১ আগস্ট তিনি বক্তৃতা দিলেন 'মধ্যযুগীয় ভারতের ধর্মান্দোলন'।

এবার বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠানের দিনে রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত রইলেন না। গত বছরের বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠানে তিনিই ছিলেন আচার্য, বিধুশেখর ও ক্ষিতিমোহন তাঁর পাশে থেকে

মন্ত্রোচ্চারণ করেছিলেন। এবার আচার্যের আসনে ক্ষিতিমোহন একা। পিয়র্সন মেমোরিয়াল হাসপাতালে সকাল সাড়ে সাতটায় বৃক্ষরোপণ উৎসবের কথা ছিল, কিন্তু প্রবল ঝড়বৃষ্টির দাপটে স্থগিত অনুষ্ঠান বিকেল সাড়ে তিনটের সময় করতে হল। তার পর সন্ধ্যাবেলা সিংহসদনে বর্ষামঙ্গল। কয়েক মাস পরে ২৯ নভেম্বর এবারই প্রথম শ্রীনিকেতনে নবান্ন উৎসব হল। রবীন্দ্রনাথ বসেছেন আচার্যের আসনে, পাশে থেকে ক্ষিতিমোহন তাঁকে অনুষ্ঠান পরিচালনায় সহায়তা করলেন। পরের দিন জাপানি কবি নোগুচির সংবর্ধনা আম্রকুঞ্জে। নন্দলাল বসুর নির্দেশে কলাভবনের শিক্ষার্থীরা সভা সাজিয়েছেন, 'জনগণমন-অধিনায়ক' গানে সভার সূচনা হল, রবীন্দ্রনাথ স্বাগত জানালেন বিশিষ্ট অতিথিকে। ক্ষিতিমোহন কয়েকটি অনুষ্ঠান-উপযোগী বৈদিক মন্ত্র আবৃত্তি করলেন।[৫৯২]

বিশ্বভারতী নিউজ পত্রিকায় খবর পাচ্ছি কলকাতায় শিক্ষাবিভাগ শিক্ষাসপ্তাহ পালন করবেন ১৯৩৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। আর তারই অঙ্গ হিসেবে নবশিক্ষাসংঘের ভারতীয় শাখার উদ্যোগে একটি আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হবে। অবলা বসু, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ক্ষিতিমোহন সেন, বীরেশ গুহ প্রমুখ প্রবন্ধ পাঠ করবেন তাতে।[৫৯৩] রবীন্দ্রনাথ এই যৌথ সম্মেলনের প্রথম দিনে 'শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে সংগীতের স্থান' এবং দ্বিতীয় দিনে 'শিক্ষার সাঙ্গীকরণ' ভাষণ দিলেন। ক্ষিতিমোহনের প্রবন্ধের বিষয় ছিল 'শিক্ষার স্বদেশী রূপ'। কাশীর চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়নকালে তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে এই প্রবন্ধের উল্লেখ করেছিলাম। চতুষ্পাঠীতে গুরুশিষ্যের মধ্যে যে স্নেহ ও শ্রদ্ধার সম্বন্ধ ছিল, যে অনাড়ম্বর আন্তরিক পরিবেশে জ্ঞানচর্চা হত, তার পুনরুজ্জীবনের পক্ষে মতপ্রকাশ করলেন ক্ষিতিমোহন। বললেন :

> আমাদের ভবিষ্যৎ সাধনার জন্য যে-সব বাধা জমিয়া উঠিয়াছে চতুষ্পাঠীকে সেই সব হইতে মুক্ত করিতে হইবে।

তাঁর প্রস্তাব ছিল জগতের সর্বস্থানের সর্ববিধ জ্ঞান বিজ্ঞান সাহিত্য ইতিহাস কলা দর্শন প্রভৃতির জন্য চতুষ্পাঠীর দরজা খুলে দিতে হবে এবং বাংলা ভাষাকে শিক্ষার বাহন করতে হবে। সেই সঙ্গে আমাদের জ্ঞানসাধনা ও কর্মসাধনার ক্ষেত্রকে সব সংকীর্ণ সংস্কার ও বন্ধন থেকে মুক্ত করতে হবে, কেননা বন্ধন মানেই মৃত্যু।[৫৯৪] শিক্ষাসপ্তাহের লিখিত বিবরণের সঙ্গে মুদ্রিত হল এই প্রবন্ধ।[৫৯৫] বিশ্বভারতীও 'Education Naturalised VB Bulletin No 20 শিক্ষার ধারা'—এই নামে একটি সংকলনে রবীন্দ্রনাথ ক্ষিতিমোহন ও নন্দলালের শিক্ষাসপ্তাহ উপলক্ষে পঠিত প্রবন্ধগুলি প্রকাশ করলেন।[৫৯৬]

ঠিক এর পরেই নিখিলবঙ্গ শিক্ষকসম্মিলনীর অধিবেশন হল ঢাকায়, ক্ষিতিমোহন অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি। এই ভাষণেও প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করলেন। এখানেও প্রসঙ্গত টোল-চতুষ্পাঠীর আলোচনা এল, তবে সেটুকু সামান্য ছুঁয়ে গেলেন মাত্র। প্রাধান্য পেল প্রাচীনকালের বৌদ্ধযুগের পুরাণ ও তন্ত্রযুগের শিক্ষা ও তখনকার গুরুশিষ্য সম্পর্ক প্রভৃতি। মুসলমান জগতে শিক্ষা সম্পর্কে

বেশ বিস্তারিত বললেন। কয়েক বছর থেকে দেশে হিন্দু-মুসলমানের ভেদ অসহ্য হয়ে উঠেছে। এই দুর্গতির দিনে ক্ষিতিমোহন বেশি তাগিদ বোধ করেছেন এককালে এই দেশেই যে হিন্দু ও মুসলমান উভয়ে মিলেই অজ্ঞানসাগর পার হওয়ার জন্য সাধনা করেছিলেন তা দেখাতে। সাধক দাদূ সাহেবের বাণী উদ্ধৃত করলেন :

> খংড খংড করি ব্রহ্মকৌ পক্ষ পক্ষ লিয়া বাঁট (সাচ অঙ্গা ৫০)

'ব্রহ্মকেও ইহারা খণ্ড খণ্ড করিয়া আপন দলে লইতে চায় ভাগ করিয়া।' আর দাদূশিষ্য মুসলমানবংশীয় সাধক রজ্জবজির বাণী শোনালেন তার সমান্তরালে :

> 'রজ্জব বসুধা বেদ সব, কুল আলম কোরান। প্রাণপুস্তক দেখহু হিন্দু মুসলমান সব মেঁ বিদ্যা একহী পঢ়ে সুপংণ্ডিত প্রাণ'।—হে রজ্জব, বিশ্বই হইল জীবন্ত বেদ ও কুরান। হিন্দুমুসলমান উভয়ে মিলিয়া এই প্রাণপুস্তক দেখ। এই বিশ্বগ্রন্থ সবারই এক। যে ইহা পড়ে সেই তো পণ্ডিত।

ক্ষিতিমোহন বলছিলেন তখনকার দিনে যখন রেল-জাহাজ ছিল না, তখন গুরুরা এবং সাধুসন্তরা দেশ-দেশান্তরে তীর্থে তীর্থে ঘুরে দেশের সংস্কৃতিকে সারা দেশে অনায়াসে ছড়িয়ে দিতেন, 'তখন আমাদের বিয়োগধর্ম (exclusiveness) হইতে যোগধর্ম (inclusiveness) ছিল প্রবল'—এই প্রসঙ্গ ধরে মন্তব্য করলেন ঢাকায় এই যে নিখিল বঙ্গ শিক্ষকসম্মেলনের আয়োজন হয়েছে, সেকাল হলে এ অবশ্যই নিখিল ভারত শিক্ষক সম্মেলনের রূপ নিত। তিনি স্মরণ করিয়ে দিলেন ইংরেজ শাসনব্যবস্থায় শিক্ষার যথার্থ অগ্রগতি হচ্ছে না বলে নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকলে ক্ষতি আমাদেরই। সম্মিলিত শিক্ষকদের সম্বোধন করে দুঃখ দারিদ্র্য অশ্রদ্ধা বিরুদ্ধতা সব সত্ত্বেও তাঁদের পদোচিত মাহাত্ম্যের প্রমাণ দিতে আহ্বান জানালেন, বললেন তার জন্য সমবেত সাধনায় ব্রতী হতে হবে। রজ্জবজির বাণী উচ্চারণ করে সবশেষে বললেন :

> প্রত্যেকটি বিন্দু স্বতন্ত্র হইয়া চলিতে চাহিলে প্রত্যেকেই মরে শুকাইয়া। কিন্তু সকলে যদি একত্র হইতে পারে তবে পৌঁছিতে পারে সেই ভগবৎসাগরে। মানবসাধনার ও জ্ঞানের এই চলিত ধারাই জীবন্ত গঙ্গা, এই সদা বহন্ত গঙ্গাতেই মেলে মুক্তি। এইখানে স্নান না করিয়া লোকে কিনা ডুব দিয়া মরে মৃত গঙ্গায়।[৫৯৭]

ঢাকার মতো শহরে তো কেবল বক্তৃতা করতেই যাওয়া নয়। এ শহর তাঁর অতিপরিচিত বললে যথেষ্ট বলা হয় না, এ শহর তাঁর নিজের শহরের মতো এবং এখানে তাঁর পরিচিত ও বন্ধুবান্ধবের সংখ্যাও অনেক। এলে সাক্ষাৎ হয়, ক্ষিতিমোহন আসেনও নিয়মিত। বন্ধু চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। সম্ভবত এই সময়ই চারুচন্দ্র তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিবাহ উপলক্ষে ক্ষিতিমোহনের কাছ থেকে একটি আশীর্বাণী চেয়েছিলেন এবং শান্তিনিকেতনে ফিরে তিনি তা পাঠিয়েও দিয়েছিলেন দেখা যাচ্ছে। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রাপ্তি স্বীকার করে লিখলেন :

ভাই ক্ষিতিমোহন,

তোমার আশীর্বচন পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হলাম। এই আশীর্বাদ তোমার মতন পন্ডিত আর আমার সোদর-সদৃশ বন্ধুরই উপযুক্ত হয়েছে। আশীর্বচন সংগ্রহের কি নাম দেবো ভাব্‌ছিলাম। তোমার দেওয়া প্রশস্তিকা নামটি চমৎকার হয়েছে। তাই রাখ্‌ব। স্বস্তিকা নামটিও সুন্দর, তবে স্বস্তিক শব্দটি এখন নাৎসিদের উৎপাতে অস্বস্তিক হয়ে উঠেছে।

আচ্ছা, আশীর্বচন-সংগ্রহেব উপরে কি রকম ভাবে প্রশস্তিকা শব্দটি দেবো?

পরমকল্যাণভাজন শ্রীমান কনক বন্দ্যোপাধ্যায়

ও

সুমঙ্গলী শ্রীমতী লীলা দেবীর

শুভপরিণয় উপলক্ষ্যে

প্রশস্তিকা

এইরকমভাবে দেবো কি? অবশ্য কনক ও লীলার নাম ছোট অক্ষরে ছাপা হবে, এবং প্রশস্তিকা নামটি খুব বড় অক্ষরে ছাপা হবে বইয়ের মধ্যস্থলে। তোমার পরামর্শ চাই। বই ছাপা হলে নিশ্চয় একখানি তোমাকে পাঠাব। যাঁরা যাঁরা আশীর্বচন পাঠাচ্ছেন তাঁদের সকলকেই পাঠাব।

তোমার হাতের দেবাক্ষর সম্পূর্ণ পড়তে পেরেছি কিনা সন্দেহ হচ্ছে। ইউনিভার্সিটি খোলা থাকলে অথর্ববেদ থেকে মন্ত্রগুলি মিলিয়ে নিতে পারতাম। তাই সমস্ত প্রশস্তিটি টাইপ করে তোমার কাছে পাঠাচ্ছি, তুমি প্রুফ দেখার মতন সংশোধন করে ফেরৎ পাঠিয়ে দিলে সুখী হবো।

দ্বিতীয় মন্ত্রের বাংলা অনুবাদে রহ শব্দটি সবশেষে দিলে ভালো হয় না? শ্রীমান আশুর শরীর এখন কেমন আছে। অমিতা ও তার ছেলেটিই বা কেমন? আমাদের মঙ্গল।

তোমার

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়[৫৯৮]

জয়ন্তীলাল আচার্যকে লেখা ক্ষিতিমোহনের একটি চিঠি থেকে জানতে পারা যায় যে কলকাতায় শিক্ষাসপ্তাহ ও ঢাকায় শিক্ষকসম্মেলন উপলক্ষে দেওয়া দুটি শিক্ষা-বিষয়ক বক্তৃতার কাছাকাছি সময়ে তিনি সুরুলের শিক্ষকসম্মেলনেও একটি মৌখিক ভাষণ দিয়েছিলেন। কিছুদিন পরে ছাত্রকে চিঠিতে এ বিষয়ে লেখেন :

> শিক্ষা সম্বন্ধে আমাকে বাধ্য হয়ে এক বৎসরের মধ্যে দুটি লেখা ছাপাতে দিতে হয়েছে এবং তার একটি ঢাকায় টিচার্স কনফারেন্সের রিসেপশান কমিটির সভাপতিরূপে আমার অভিভাষণ। সেটা কি তুমি পেয়েছ? না পেয়ে থাকলে জানাবে, আমি পাঠিয়ে দেব। আর একটা হচ্ছে কলকাতায় এডুকেশন উইক-এ আমার বক্তৃতা। তাও ছাপা হয়েছে। গুরুদেবও সেখানে বক্তৃতা দিয়েছেন। তাও ছাপা হয়েছে। তার সঙ্গেই আমারটা ছাপা হয়েছে। আমি অফ্ প্রিণ্ট পাই নাই। যদি পাই তোমাদের পাঠিয়ে দেব। তারপর সুরুলের টিচার্স কনফারেন্সে আমি একটা মুখে বলেছি। বোধ হয় ভালই বলেছি। কিন্তু তা লেখা হয় নি, ছাপাও হয় নি, কিন্তু তার নোটস্ আছে।[৫৯৯]

সেবার কোনো কারণে অন্য বছরের তুলনায় বেশ আগেই ১ এপ্রিল গরমের ছুটি পড়ে গিয়েছিল। সম্ভবত কিরণবালার পিতা মধুসূদন সেন দীর্ঘদিন অসুস্থ ছিলেন, এই সময় কলকাতায় তাঁর মৃত্যু হল। ক্ষিতিমোহনকে শান্তিনিকেতন থেকে এই উপলক্ষে শোক

জানিয়ে চিঠি লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সেই সঙ্গেই একটি বিবাহের অনুষ্ঠানের জন্য তাঁর সহায়তাও চেয়েছিলেন। চিঠিটি এইরকম :

Uttarayan
Santiniketan, Bengal

প্রীতিনমস্কার সম্ভাষণ

আপনাদের শোকের সংবাদ পেলুম। দীর্ঘকাল থেকে ঘটনাটা প্রত্যাশিত, তবু স্নিগ্ধজন সুনিশ্চিত পরিণামকেও স্বীকার করতে পারে না। তাঁর কঠিন দুঃখের অবসান হোলো, সংসারে যে বেদনা রেখে গেলেন একদা তারও শান্তি হবে। কিরণকে আমার ব্যথিত হৃদয়ের সান্ত্বনা জানাবেন।

এদিকে আমাদের ঘরে বিবাহের অনুষ্ঠান আসন্ন। প্রতিদিন আপনার আগমন প্রত্যাশা করছিলুম। কেন না আপনার সহায়তা ছাড়া এ কাজ সুসম্পন্ন হতে পারবে না। ৬ই বৈশাখে শান্তিনিকেতনে বিবাহের দিন স্থির হয়েছে।

আমি দু-চার দিনের জন্যে কাল ভোররাত্রির গাড়িতে কলকাতা মুখে যাত্রা করব। জোড়াসাঁকোয় থাকতে পারি নে বরানগরে আশ্রয় নেব। যদি আপনি নিকটে কোথাও থাকেন সংবাদ পেলে আপনার সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করব। এ বিবাহ প্রচলিত রীতি অনুসারে সম্পন্ন হতে পারে না। এই কারণে আপনার শরণ নিতেই হবে। ইতি ২৫ চৈত্র ১৩৪২

আপনাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর[৬০০]

মীরা দেবীর কন্যা নন্দিতার বিয়ে কৃষ্ণ কৃপালনীর সঙ্গে, সেই উপলক্ষেই ক্ষিতিমোহনের সহায়তা প্রার্থনা কবির, অবশ্য বিয়ের দিনটা শেষপর্যন্ত ১২ বৈশাখ ধার্য হয়েছিল (২৫ এপ্রিল ১৯৩৬)। কবির অভিপ্রায়মতো ক্ষিতিমোহন এ বিয়ের পৌরোহিত্য করেছিলেন। বিশ্বভারতী নিউজ নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৯৩৬-সংখ্যায় Vedic Marriage Service নামে ক্ষিতিমোহন-সংকলিত বৈদিকরীতি-অনুসারী বিবাহমন্ত্রগুলির ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হয়। পরে রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পালিতা কন্যা নন্দিনীর বিবাহ-অনুষ্ঠানও এই রীতিতে সম্পন্ন হয়েছিল।

২২ জুন বিশ্বভারতী খুলেছে, বিধিমতে কাজকর্ম আরম্ভ হয়েছে। বাড়িতে বলতে গেলে একাই আছেন ক্ষিতিমোহন। দুই কন্যা মমতা ও অমিতা পুরী গেছেন, কিরণবালা গেছেন তাঁদের সঙ্গে। ছেলে স্বদেশি করেন, মাঝে-মধ্যেই গ্রেফতার হয়ে কারাবাস করেন। মেয়েরা সংসারজীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত এখন, তবে দৌহিত্র-দৌহিত্রীরা অনেকে শান্তিনিকেতনে দাদামশায়-দিদিমার কাছে থেকে বিশ্বভারতীতে পড়তে আসছেন এক এক করে। এই সময়টা সুনীপা আছেন তাঁর কাছে। আর আছেন ছাত্র সুব্রত। এঁর কথা আর-একটু বলার অপেক্ষা রাখে। ছাত্ররা কেউ না কেউ অনেক সময়ই কাছে থেকেছেন। এখানে জয়ন্তীলাল আচার্যকে লেখা ক্ষিতিমোহনের একটি চিঠির প্রথম অংশ উদ্ধৃত করছি, এ চিঠি থেকে আগেও আমরা উদ্ধৃতি দিয়েছি। 'চীন জাপানননী যাত্রা' প্রকাশিত হয়েছিল কয়েক বছর আগে, কিছুদিন আগে তার জন্য প্রাপ্য সাম্মানিক দক্ষিণার জন্য তদবির করতে জয়ন্তীলালকে লিখেছিলেন একটি চিঠিতে, পাঠকের হয়তো স্মরণে আছে। এই চিঠিতে

ক্ষিতিমোহন তাঁকে সম্ভবত এই কথাটাই জানাচ্ছেন যে কিষণসিং চাওড়া সে কাজটা করে তাঁর মস্ত উপকার করেছেন। জয়ন্তীলালকে তিনি সেই প্রকাশকেরই কাছ থেকে অন্য-একটি পাণ্ডুলিপি উদ্ধার করে আনবার জন্যেও বললেন।

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

২৬. ৬. ১৯৩৬

তোমার পত্রের পর পত্র আমি পেয়েছি। প্রত্যেকবারই মনে করেছি ভাল করে জবাব দেব। কাজেই জবাব আর দেওয়াই হয় নি। তোমার সব খবরই আমি জানি। যে কেউ আসে তার কাছে জিজ্ঞাসা করি এবং মাঝে মাঝে ওখানকার পত্রেও তোমার খবর পাই। এতদিন কিষণসিং চাওড়া এখানে ছিলেন, তাঁর কাছেও তোমাব খবর পেলাম। ভাল করে তোমাকে পত্র লিখব মনে করে, দেখি, আর পত্রই লেখা হয় না। আজ লোক যাচ্ছে, তাই ভাবলাম যা পারি লিখে দেই।

কিষণসিং চাওড়া আমার একটি মস্ত উপকার করেছেন। তিনি রণছোড়ভাই মিস্ত্রীর কাছে বার বার গিয়ে এবং তাগাদা করে চীন জাপানের আমার পুস্তক সম্বন্ধে সব কাজ সম্পন্ন করেছেন। মিস্ত্রীজী বলেছেন আমার 'শিক্ষণ ব্যাখ্যানমালা' ছাপবেন না। তিনি মনে করেন তাতে তেমন লাভ নাও হতে পারে। তিনি কিষণসিং চাওড়াকে সে ম্যানস্ক্রিপট্‌টা ফিরিয়ে দিতে চেয়েছেন। কিষণভাই বললেন যে তিনি বম্বেতে ভাল পাবলিশারের কাছে তা দেখাবেন। কিষণভাইকে বলেছি যে তোমাকে সঙ্গে করে যেন মিস্ত্রীজীর কাছে যান, কারণ তুমি সেই ম্যানস্ক্রিপ্‌টের কারেকশান, এডিশান, অলটারেশান সবই জান। কাজেই তুমি গেলে ঠিক বুঝতে পারবে যে সবটা পাওয়া গেল কিনা। হয়তো কিষণভাই তোমার কাছে গিয়েছেন এবং তোমরা উভয়ে গিয়ে ম্যানস্ক্রিপট্‌টা এনেছ। যদি কিষণভাই তোমার কাছে না গিয়ে থাকেন, তাহলে তুমি একলাই মিস্ত্রীজীর কাছে গিয়ে ম্যানস্ক্রিপট্‌টা নিয়ে এসো এবং তোমার কাছে রেখে দিও। তারপর যা হয় আমি করব।[৬০১]

আরও মাস দুয়েক পরে প্রচলিত প্রথা ভেঙে ৭ ভাদ্র বর্ষামঙ্গল ও বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠান হল শান্তিনিকেতনের নিকটবর্তী ভুবনডাঙা গ্রামে। সবেমাত্র সেখানকাব একমাত্র সম্বল পুকুরটির সংস্কারসাধন হওয়ায় গ্রামবাসীদের তীব্র জলকষ্ট দূর হয়েছিল। তাই উৎসবের আয়োজন হল সেই সদ্য-সংস্কৃত জলাশয়ের ধারে। চতুর্দোলাবাহিত গাছের চারা সহ আশ্রম থেকে নৃত্যগীতময় শোভাযাত্রা এসে পৌঁছোল সেখানে, ক্ষিতিমোহন বৈদিক মন্ত্রে অভিনন্দিত করলেন তরুশিশুগুলিকে, রবীন্দ্রনাথ সেগুলিকে জলসিঞ্চিত করলেন। সংস্কৃত জলাশয়ের নবপ্রতিষ্ঠা উপলক্ষে ক্ষিতিমোহন নির্বাচিত বৈদিক মন্ত্র আবৃত্তি করলেন।[৬০২]

এবার বিশ্বভারতীর শারদ অবকাশ আরম্ভ হবে ১৭ অক্টোবর, শেষ হবে ১৯ নভেম্বর। ক্ষিতিমোহনের ইচ্ছা ছিল ছুটিতে পশ্চিম ভারত যাওয়ার। জয়ন্তীলালকে লিখেছিলেন :

কবে যে দেখা হবে তাই বা কি করে বলব। পথ সুদূর, ব্যয় অনেক এবং আমার সামর্থ্য কম। তবু এবার পুজোর সময় একবার যাবার চেষ্টা করব। কতকাল যে তোমাদের দেখি না তা বলতে পারি না। মন দেখবার জন্য একেবারে ব্যাকুল হয়ে আছে। তুমি এবং মাস্টারজী নিত্য আমার চিত্তকে সেই সুদূর হতে টানছ।[৬০৩]

তাঁর সেই টানে গুজরাতের বন্ধু এবং স্নেহভাজনদের সঙ্গে দেখা করবার তাগিদ যেমন ছিল, তেমনই তাঁর নিজের অনুসন্ধান ও গবেষণার প্রয়োজনেও ঘোরবার তাগিদ ছিল। সেই যখন ১৯২৩ সালে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কাশীতে গিয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁকে অনুরোধ করেছিলেন ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের ধর্ম ও সংস্কৃতিগত বৈশিষ্ট্যগুলির তুলনামূলক আলোচনা করতে। পরে ক্ষিতিমোহন বলেছেন যে সেই অবধি তিনি যখনই তীর্থভ্রমণে বেরিয়েছেন, এ বিষয়ে মূল্যবান তথ্য সংগ্রহের জন্য সজাগ থেকেছেন। তাঁর এবারকার ভ্রমণতালিকায় স্থান পেয়েছিল সিন্ধুদেশও। সে দেশের নানাস্থানে ঘুরে ক্ষিতিমোহন দেখতে পেলেন প্রথমে মুসলমান ও পরে পাশ্চাত্য সংস্কৃতি সেখানে এমনই প্রাধান্য বিস্তার করেছে যে হিন্দু সংস্কৃতির কোনো বৈশিষ্ট্যই আর বজায় নেই। সন্ধান করেও কোনো ভালো পণ্ডিত বা সংস্কৃত গ্রন্থ বা কোনো হিন্দু সম্প্রদায়ের দেখা পেলেন না। দেখা হল কেবল কয়েকজন মুখস্থমন্ত্রমাত্রসর্বস্ব ব্রাহ্মণ পুরোহিতের সঙ্গে, এঁরা রাজপুতানার পুষ্করের পোখরনা ব্রাহ্মণ। সিন্ধুদেশবাসীরা তাঁকে বললেন এ দেশে ব্রাহ্মণরাই এত দুর্গত যে অস্পৃশ্য বলতে তাদেরই বোঝায়। দারিদ্র্যে অজ্ঞানতায় নিমজ্জিত একদল মানুষ শুদ্ধ-অশুদ্ধ মন্ত্রে কোনোমতে বিবাহ শ্রাদ্ধ প্রভৃতি অনুষ্ঠান চালিয়ে অতি কষ্টে বেঁচে আছেন মাত্র। সিন্ধুদেশের ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের এই দুর্গতি দূর করবার জন্য এই প্রদেশেরই সুসন্তান দেওয়ান দয়ারাম গিডুমল দক্ষিণদেশ থেকে ভালো পণ্ডিত এনে সংস্কৃতচর্চার প্রবর্তন করেছিলেন জানতেন বলে, ক্ষিতিমোহন সিন্ধু-হায়দরাবাদে পুনার সুপণ্ডিত কাশীনাথ শাস্ত্রীকে দেখে সেবারে আশান্বিত হয়েছিলেন। কিন্তু পরে শোনেন সেই পণ্ডিতকে সেখানকার সংস্কৃতচর্চার দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।[৬০৪]

অ্যান্ড্রুজের লেখায় । আর-এক আত্মার আত্মীয়

১৯৩৬ সালে ক্ষিতিমোহনের 'ভারতীয় মধ্যযুগের সাধনার ধারা' বইটির ইংরেজি অনুবাদ Medieval Mysticism of India নামে প্রকাশিত হয়। মূল গ্রন্থের রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা সহ ক্ষিতিমোহনের অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় স্মারক বক্তৃতা দুটি অনুবাদ করেছিলেন অধ্যাপক মনোমোহন ঘোষ। অনুবাদগ্রন্থের প্রথমভাগে স্থান পেয়েছে এগুলি : Foreward by Rabindranath Tagore; Lecture I Orthodox Thinkers ; Lecture II Liberal Thinkers। আর তার পর Appendices ভাগে 'বিশ্বভারতী কোয়ার্টার্লি'-তে প্রকাশিত কয়েকটি প্রবন্ধ যুক্ত হয়েছে : Dadu's Brahma society ; Dadu's Path of Service; Dadu and the Mystery of Forms ; Bauls and their Cult of Man। পাঠক অবগত আছেন শেষ প্রবন্ধ রবীন্দ্রনাথের The Religion of Man গ্রন্থের শেষেও যোগ করা হয়েছিল।

কিছুদিন আগে অ্যান্ড্রুজ তাঁর এক ভাষণে ক্ষিতিমোহনের এই বইয়ের উল্লেখ অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে করেছিলেন। ভাষণের শুরুতেই তিনি বলেন :

> আজ সন্ধ্যাবেলার ভাষণে কী বলব তার ইঙ্গিত আমি পেয়েছি আমার বন্ধু শান্তিনিকেতনের ক্ষিতিমোহন সেনের হিন্দি সাহিত্য সম্পর্কে একটি নতুন বই পড়ে। তাঁর এই ইংরেজি প্রবন্ধ-সংকলনখানি অল্পদিনের মধ্যে Luzac & Co. London থেকে প্রকাশিত হবে। বইটি পড়ে আমি এতই লাভবান হয়েছি যে আমার ইচ্ছা আমার শ্রোতারা যেন সকলেই এটি পড়েন। সত্যই এ বই আমাকে এমনই মুগ্ধ করেছে যে আমার এখন মনে হচ্ছে এই লেখকের দাদূ সম্পর্কিত যে বিরাট এবং সর্বোত্তম গ্রন্থ সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে, যার ভূমিকা লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ, তার একটি ইংরেজি সংস্করণ অবশ্যই প্রকাশিত হওয়া উচিত।[৬০৫]

চারপাশে কতই থাকেন অবুঝ মানুষ—নিজের দেশের সুদীর্ঘকালবাহিত সাধনা ও ঐতিহ্যের প্রতি উদাসীন, অন্ধ এবং বধির। আবার কখনও বা পৃথিবীর কোনো প্রান্ত থেকে এসে হাজির হন খাঁটি মরমি মানুষটি, দেশ-সমাজ-সংস্কৃতির দুস্তর বাধা অতিক্রম করে ভারতবর্ষের অশাস্ত্রীয় ব্রাত্য ধর্মসাধনার মর্মের কথাটিও যাঁর অন্তরে পৌঁছে যায়। অ্যান্ডরুজ সাহেবের মতো মানুষের পক্ষে যে তা সম্ভব হত তাতে আমাদের খুব বিস্মিত করে না, তিনি এতই ঘরের লোক। শান্তিনিকেতন-বিশ্বভারতীতে আর যে-সব জ্ঞানান্বেষী বা রসপিপাসু মানুষের আনাগোনা চলে ক্ষিতিমোহনের সঙ্গে তাঁদের অনেকেরই অন্তরঙ্গ আলাপ-পরিচয় হয়। এমনও কখনও ঘটেছে যে বিদেশাগত কোনো মানুষকে তিনি তাঁর নিজের বিশ্বাস-অনুসারী আধ্যাত্মিক সাধনধারায় উদ্‌বুদ্ধ করেছেন। তেমনই এক ভদ্রমহিলার উল্লেখ আছে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের রবীন্দ্রজীবনী গ্রন্থে। কাউন্টেস হ্যামিলটন নামে এক বিদুষী মহিলা ১৯৩৬ সালে শান্তিনিকেতনে এসে মাস তিনেক ছিলেন। তাঁর নিজের দেশ সুইডেনেই তিনি সংস্কৃত ভাষা শেখেন, কিছু কিছু সংস্কৃত শাস্ত্রও অধ্যয়ন করেছিলেন। এখানে এসেও অধ্যাপক দুর্গাপ্রসাদ পাণ্ডের নিকট তিনি সংস্কৃত শাস্ত্র ও সাহিত্য অধ্যয়ন করলেন এবং আচার্য ক্ষিতিমোহন সেনের নিকট ভারতীয় সাধকদের বাণীর মর্মগ্রহণ করবার সুযোগ হল।

> তিন মাস আশ্রমে বাস করিয়া তিনি দেশে ফিরিয়া গেলেন। কাউন্টেস কবি ও ক্ষিতিমোহন সেনকে কী শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন, তাহা তাঁহার পত্রাবলী হইতে জানা যায়।[৬০৬]

এই মানুষটি ক্ষিতিমোহনের কাছ থেকে যে আধ্যাত্মিক প্রেরণা লাভ করেছিলেন, তা কোনোদিন ম্লান হয়ে যায়নি, যেন একটি অনির্বাণ দীপশিখার মতন সেই প্রেরণা তাঁর অন্তরকে আলোকিত করে রেখেছে। অবশ্য এ কথা বলা বাহুল্য যে তাঁর নিজেরই ভিতরে প্রদীপ জ্বালানোর আয়োজনটুকু প্রস্তুত হয়েই ছিল। সুইডেনে ফিরে গিয়ে ২৫ এপ্রিল ১৯৩৬ তিনি রবীন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন :

> শান্তিনিকেতনে আমি এত সুখে ছিলাম। এই সময়টা আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ কাল। মনের অনেকখানি অংশ আমি ওখানে রেখে এসেছি। কিন্তু তার মধ্যেও আপনার ও ক্ষিতিবাবুর জন্য আমার মধ্যে এমন একটা তীব্র ব্যাকুলতা অনুভব করি যে চোখের জল না ফেলে পারি না। ভালোবাসলেই দুঃখ পেতে হয়। ভালোবাসতে না পারার চেয়ে ভালোবেসে দুঃখ পাওয়াও ভালো।[৬০৭]

পরেও আবার কখনও লিখেছেন :

> আমার সমস্ত মন একটিই স্থানে যাবার জন্য আকুল, সে শান্তিনিকেতন। সেখানে আপনি আছেন, আছেন আমার গুরু এবং কেবলমাত্র আপনারাই আমার শূন্য শুষ্ক পরিশ্রান্ত আত্মাকে সহায়তাদান করতে পারেন।[৬০৮]

রবীন্দ্রনাথকে লেখা চিঠিতে যেমন তিনি ক্ষিতিমোহনের কথা লিখেছেন, তেমনই ক্ষিতিমোহনকেও অনেক চিঠি লিখেছেন। তাঁর গুরু ক্ষিতিমোহনকে লেখা বেশ কয়েকটি চিঠির সন্ধান পাওয়া গেল, এমনকী ১৯৬১ ও ১৯৬২ সালেও লিখেছিলেন। বোঝা যাচ্ছে যে তখনও তিনি জানতে পারেননি যে তাঁর গুরু আর ইহলোকে নেই, দু-বছর আগেই গত হয়েছেন।

ক্ষিতিমোহনের কাগজপত্রের মধ্যে ১৯৪২ সালে লেখা তাঁর নিজেরই একটি চিঠি রক্ষিত হয়েছে, জানি না এটি প্রেরিত চিঠির খসড়া, অথবা কোনো কারণে চিঠিটা পাঠানোই হয়নি। কাউন্টেস হ্যামিলটনের পাঠানো অভিনন্দনবার্তা পেয়ে ক্ষিতিমোহন এ চিঠি লিখেছিলেন ২ ফেব্রুয়ারি, নিজের দীক্ষাদিবসে। তিনি লিখেছেন :

> এই দিনটি এসেছে এবং আমার চিত্ত আজ আপনার দিকে প্রবাহিত হয়ে যাচ্ছে। গত বছরে আপনার প্রীতিপূর্ণ চিঠি পেয়েছিলাম। উত্তর লিখতে আরম্ভ করেও আপনাকে কোনো বার্তা পাঠাতে পারি নি, মনে হচ্ছিল যেন আমার অন্তর্জীবন স্তব্ধ হয়ে আছে। কিছু দেবার ছিল না। কিন্তু এবার আমার প্রাক্তন গুরুরা এবং প্রয়াত কবি সকলেই সন্নিকটে আছেন, সহায়তা দান করছেন। প্রাপ্তিযোগ্যতা না থাকলেও ঈশ্বরের প্রসাদ অভিসিক্ত করে দিচ্ছে আমাকে, সেই দিব্য শুভালোকে আমার হৃদয়পদ্মের পাপড়িগুলি খুলে যাচ্ছে। আজ কিছুক্ষণের জন্যও যেন সীমা ও অসীমের মধ্যবর্তী যবনিকা অত্যন্ত অঘন ও স্বচ্ছ হয়ে এসেছে। সমস্ত সাময়িক দুঃখবেদনা, তা সে যত যন্ত্রণাদায়ক হোক, মানবাত্মার অন্তহীন আত্মিক বিবর্তন-পথে বিলীয়মান আকস্মিক দুর্ঘটনা। কোনোদিন আমাদের দেখা হবে, এ জীবনে বা আগামী জীবনে। ইতিমধ্যে আমার মধ্যে অপার্থিব আত্মবেদী যদি কিছু থাকে, তা বাহিত হয়ে যাক আপনার দিকে, আপনার সব পরীক্ষা ও ক্লিষ্টতার সঙ্গী হোক, আমাদের নিজেদের জীবনে ও সমগ্র মানবজীবনে যা কিছু আলোকহীন, স্বার্থপর, নিষ্ঠুর, অমানবিক, তাকে শান্ত করুক।[৬০৯]

এই ভদ্রমহিলার নাম ক্রিস্টিন, এই নামেই তিনি ক্ষিতিমোহনকে বছরে বছরে চিঠি লিখেছেন। যে চিঠিগুলি রক্ষিত হয়েছে তার ভিত্তিতে বলতে পারি ১৯৩৮ সাল থেকে তাঁর লেখা চিঠি দেখবার সুযোগ হয়েছে আমাদের। ১৯৬১-৬২ সাল পর্যন্ত যে চিঠিগুলি আছে, তার মধ্যে মাঝে মাঝে কোনো কোনো বছরের চিঠি নেইও আবার, তবে ধারণা হয় ক্রিস্টিন প্রতি বছরই অন্তত জানুয়ারি মাসে চিঠি লিখতে চেষ্টা করেছেন গুরুর দীক্ষাদিন স্মরণ করে এবং কোনো কোনো বছরের দু-তিনখানা চিঠিরও সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। চিঠিতে তিনি ক্ষিতিমোহনকে সম্বোধন করেছেন 'My dear dear Guru' বা 'My dear dear Guru and Friend', কখনও বা 'Gurruji dear dear'। তাঁর হতাশ্বাস মন যখন নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে, ক্ষিতিমোহনের চিঠি যেন আলো দেখায়। নানা শ্রেণির গুরু ও শিষ্যের কথা ক্ষিতিমোহন লিখলেও নিজের দুর্বলতা মেনে নিয়ে ক্রিস্টিন বলেন :

> আমি সেই ভাগ্যবানদের দলে থাকতে পেলে খুশি হই, যারা তাদের গুরুর কাছে থাকতে পায়, তাঁদের দ্বারা সুরক্ষিত থাকে, যেমন থাকে পক্ষীশাবক তার পক্ষীমায়ের ডানার তলায়।

তাঁর ভিতরে একটা নিরুপায় কান্না গুমরে ওঠে ভারতবর্ষের জন্য, গুরু ক্ষিতিমোহনের কাছে যাওয়ার জন্য।[৬১০] কখনও আবার বিপরীত কথাটাই মনে আসে :

> এই বিষবাষ্পাচ্ছন্ন ইউরোপের ভূখণ্ড থেকে কারও চিঠি কেবল যন্ত্রণাই বহন করে নিয়ে যেতে পারে, তার দ্বারা আমি কেন আমার বন্ধুকে বিব্রত করব?

তবু গুরুর দীক্ষাদিনে কয়েক পঙ্ক্তি লেখবার তাগিদ ভিতরে কাজ করে। শিষ্যার কাছেও এ দিন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে :

> কেন না এই দিনে আপনি আপনার অন্তরাত্মার দ্বার আমার জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন, আমাকে দেখিয়েছিলেন কোন্ স্তরে আপনার আত্মার অধিষ্ঠান। আমার অন্তরের আকুল আকাঙ্ক্ষা ওই স্তরে পৌঁছোবার জন্য।[৬১১]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বাধায়, ব্যক্তিগত জীবনের বাধায় শান্তিনিকেতনে আসবার ইচ্ছা তাঁর চিরব্যাহত থেকেছে। এ বাধা যে তাঁরই আত্মসাধনার অবশ্যম্ভাবী স্তর তা ক্রিস্টিন বুঝেছেন, তবু কষ্টও পেয়েছেন। সেই বিচ্ছেদের মধ্যেও এ কথা বলতে ভালো লেগেছে যে, সেই পুরুষোত্তমকে অন্তরে অনুভব করার পথে গুরু ক্ষিতিমোহন তাঁর নিত্যসঙ্গী :

> প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলায়, যখন সারাদিনের কাজকর্মের শেষে বাড়িটা শান্ত এবং নিস্তব্ধ হয়ে যায় আর আমার মন অন্তর্মুখী হবার চেষ্টা করে, তখনই আপনার উপস্থিতি অনুভব করি।[৬১২]

কখনও সেই সাধনপথের শ্রদ্ধেয় সাথির জন্য তাঁরই কণ্ঠে প্রার্থনা শোনা যায় বা :

> আমার প্রিয় প্রিয় গুরু, আমি একান্ত মনে প্রার্থনা করি আপনার অন্তর্মানসের ইচ্ছা পূর্ণ হোক, সেই মহানাত্মার, সেই অদ্বিতীয় একের আশিস বর্ষিত হোক আপনার উপর।[৬১৩]

হিন্দিভবন ও অন্যান্য প্রসঙ্গ

১৯৩৬ সালের কথা হচ্ছিল। বছরটা শেষ হয়ে আসছে। ছুটির পরে ২০ নভেম্বর খুলেছে বিশ্বভারতী। ৭ পৌষের পরদিন, ৮ পৌষ, ২৪ ডিসেম্বর আম্রকুঞ্জে বিশ্বভারতী পরিষদের বার্ষিক সভায় ক্ষিতিমোহনকে দেখতে পাচ্ছি বেদির উপরে নিজের আসনে অধিষ্ঠিত। বিধুশেখর এসেছেন, তিনি বসেছেন তাঁর পাশে, উভয়ে যথাযোগ্য মন্ত্র পাঠ করলেন, সভার কাজ শুরু হল, প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য উপস্থিত সদস্যদের সম্ভাষণ করলেন।[৬১৪]

নতুন বছরের গোড়ায় ক্ষিতিমোহন ও অধ্যাপক তান-য়ুন-সান কাশী গেলেন। বৌদ্ধ ধর্মশালার উদ্‌বোধন উপলক্ষে ভাষণ দেওয়ার জন্য তাঁরা আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। ফিরে এসে একদিন আশ্রমে এই ভ্রমণের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে কিছু বললেন।[৬১৫] ৫ ফেব্রুয়ারি শ্রীনিকেতনের বাৎসরিক উৎসব, এবার তার পনেরো বছর পূর্ণ হল। প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য

অসুস্থ ছিলেন, ক্ষিতিমোহন আচার্যের দায়িত্ব পালন করলেন। নিকটবর্তী গ্রামগুলি থেকে দর্শকসমাবেশ হয়েছিল, পল্লিউন্নয়ন বিভাগের কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক জীবনে তার গ্রামগুলির স্থান যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, সে কথার উপর ক্ষিতিমোহন বিশেষ জোর দিলেন তাঁর ভাষণে, বললেন গ্রামের অধঃপতন সারা দেশের অবক্ষয় ডেকে এনেছে।[৬১৬]

মার্চ মাসে ক্ষিতিমোহন মেদিনীপুরে গিয়েছিলেন। ৬ চৈত্র মেদিনীপুর সাহিত্য-সম্মেলন হল সেখানকার সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে, তিনি সভাপতি। তাঁর অভিভাষণ মুদ্রিত হয়, পরে আবার ছাপাও হয় *দেশ* পত্রিকায়।[৬১৭] ভাষণ-সূচনায় বাণীর অধিপতিকে বৈদিক মন্ত্রে আবাহন জানালেন ক্ষিতিমোহন, নমস্কার জানালেন পূর্ববর্তী সব সম্মেলনের অধিবেশন-সভাপতিবৃন্দকে। তার পর মেদিনীপুরের গৌরবময় অতীত ইতিহাস-প্রসঙ্গ এল। বললেন :

> গঙ্গা যমুনা মিলিয়া যেমন পুণ্যতীর্থ প্রয়াগ, তেমনি আর্য্য ও দ্রাবিড় সভ্যতা মিলিয়া ভারতের মহাসভ্যতা। উত্তরের আর্য্য সভ্যতা ও দক্ষিণের দ্রাবিড় সভ্যতা যুক্তবেণী হইয়াছে এই মেদিনীপুরের প্রয়াগধামে। কাজেই সাধকের পক্ষে ইহা মুক্তির ক্ষেত্র। ...এইখানে বসিয়া এই দেশের পূর্বতন মহাপুরুষেরা এই সভ্যতারই মাহাত্ম্য ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতেন। ভারতের প্রত্যন্ত সীমাতে থাকিতেন বলিয়া যেমন যাস্ক পাণিনি প্রভৃতি মহাপুরুষেরা ভারতীয় ভাষার যথার্থ স্বরূপটি ধরিতে পারিয়াছিলেন, সেইরূপ এখানে বসিয়া আর্য দ্রাবিড় উভয় সভ্যতার যথার্থ পরিচয় পাওয়া অধিকতর সম্ভব ছিল।

তা ছাড়া পুরী ও উত্তর ভারতে যাতায়াতের পথ ছিল বলে মেদিনীপুরে অসংখ্য সাধক ও ভক্তের পদধূলি পড়েছে। প্রসঙ্গত বহু সাধক ও ভক্তের কথা বললেন। এখানকার ধর্ম সাহিত্য সংস্কৃতির গৌরব উদ্ধারের জন্য কোনো কোনো কাজ মেদিনীপুরের সাহিত্য পরিষদ করতে পারেন তারও কিছু কিছু মূল্যবান প্রস্তাব রইল।[৬১৮]

বাংলা নববর্ষের দিন সূর্যোদয়ক্ষণে শান্তিনিকেতন মন্দিরে কবি উপাসনা করে স্বাগত জানালেন নতুন বছরকে। তার পর সকাল সাড়ে আটটায় চিনাভবনের দ্বারোদ্‌ঘাটন অনুষ্ঠান। প্রথমে ক্ষিতিমোহন ঋগ্‌বেদের মন্ত্র উচ্চারণ করলেন, অতঃপর রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং একটি বুদ্ধস্তুতিমূলক স্বরচিত গান গাইলেন ও তাঁর ভাষণটি পাঠ করলেন। চিনাভবনের দ্বার-উদ্‌ঘাটনের কথা ছিল কংগ্রেস সভাপতি জওহরলাল নেহরুর, অসুস্থতার কারণে তিনি আসতে পারেননি।[৬১৯]

২৯ এপ্রিল গ্রীষ্মাবকাশ আরম্ভ হতে রবীন্দ্রনাথ সপরিবারে আলমোড়ায় গিয়েছিলেন সেবার। ক্ষিতিমোহন প্রথম দু-একদিন কাটিয়ে থাকবেন কলকাতায়, তার পরে রংপুর গিয়েছিলেন, ২৫ বৈশাখ কবির জন্মোৎসব উপলক্ষে তার আগের দিন আবার ফিরে এলেন শান্তিনিকেতনে। এসে শুনলেন রবীন্দ্রনাথ আলমোড়ায় যাওয়ার পথে খুব কষ্ট পেয়েছেন। পরদিন সন্ধ্যাবেলা উৎসবের পরে জন্মদিনের প্রণাম জানিয়ে ক্ষিতিমোহন লিখলেন :

Santiniketan
Bengal India
২৫ বৈশাখ, ১৩৪৪

প্রণতিপূর্ব্বক নিবেদন,

আজিকার দিবসোচিত শ্রদ্ধা ও প্রণতি জানাইতেছি। ভগবানের কাছে আজ প্রার্থনা করি আরও দীর্ঘদিন এমনি চিত্ত মন ও প্রাণের শক্তি লইয়া সকলকে উদ্‌বোধিত করুন।

আজ এখানে আশ্রমবাসী সকলে সন্ধ্যায় আম্রকুঞ্জে একত্র হইয়া উৎসব করিয়াছেন। তার মধ্যে খাওয়াদাওয়াও ছিল। রান্নাও সেখানেই হইতেছিল। সব শেষ না হইতেই বিষম বৃষ্টি আসে। তাতে খাওয়া-দাওয়া একটু পিছাইয়া যায়। কিন্তু বৃষ্টিতে সব তাপ ও ধূলা শান্ত হইয়া যায়।

আমি কলিকাতা হইতে রংপুর জেলার এক গ্রামে গিয়াছিলাম। সেখান হইতে ২৫শে এখানে যোগ দিবার জন্য কালই সন্ধ্যায় এখানে ফিরিয়াছি। পথে শুনিলাম আপনার কষ্ট হইয়াছে। আশা করি এখন ভাল বোধ করিতেছেন। [..] হইয়া পর পূর্ব্ববঙ্গের গ্রামে প্রবেশ করিব। এখানে সব কুশল। শ্রীচরণকুশল প্রার্থনীয়। ইতি

শ্রদ্ধাপ্রণত
ক্ষিতিমোহন সেন

পুঃ আশা করি আপনার সঙ্গের সবাই ক্রমশঃ স্বাস্থ্যলাভ করিতেছেন। বুড়ীর কথা তো কৃষ্ণই বলিলেন, ভাল হইতেছে।[৬২০]

রবীন্দ্রনাথ এ চিঠির উত্তর দিলেন ৩১ বৈশাখ। বাহুল্যবর্জিত সংক্ষিপ্ত উত্তর :

প্রীতিনমস্কার

পথে পেয়েছি বিষম দুঃখ, তীর্থে পৌঁছিয়ে তীর্থফল লাভ করেছি। স্নিগ্ধ বাতাস, নির্ম্মল আকাশ, অক্ষুণ্ণ অবসর। বাড়িটি পৃথু পরিসর মানুষের বাসের যোগ্য। এখানে ডাকঘর ছাড়া আর কোনো উপদ্রব নেই। ইতি ৩১ বৈশাখ

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর[৬২১]

রবীন্দ্রনাথকে চিঠি লেখার দিনই জয়ন্তীলাল আচার্যকে ক্ষিতিমোহন একটি দীর্ঘ চিঠি দেন, নানা কথা ছিল তাতে। মূল চিঠি বাংলাতেই লেখা :

Santiniketan
Bengal, India
8.5.1937

প্রিয়বরেষু,

অনেকদিন তোমাকে চিঠি দেই নাই, কিন্তু প্রতিদিন তোমাকে স্মরণ করেছি। তবু আমার অন্যায় হয়েছে, আমাকে ক্ষমা করিও।

তোমার কাজের কথা তোমার স্কুলের কথা সর্ব্বদাই মনে হয়। আজ তোমার পত্র পড়ে জানলাম তোমার দুঃখ ও অভাব এখনো আছে। জানি না ভগবান তোমাকে দুঃখ দিয়ে তাঁর কি কাজ সম্পন্ন করতে চান। তবে দুঃখের দিনে তুমি যে অন্তরের মর্ম্মে প্রবেশ করে আনন্দ-

রসপান কর ইহাতে বড়ই সুখী হইলাম। জগতে দুঃখ অনেক। তাহার সান্ত্বনা বাহিরে নাই, যা আছে তাহা অন্তরে। যখন অন্তরের পূর্ণ সন্ধান পাইবে তখন কোনো দুঃখ তোমাকে অবসন্ন করিতে পারিবে না।

আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন্।

তুমি Triveniতে ও বুদ্ধিপ্রকাশে লেখা দিতেছ জেনে সুখী হইলাম। যদি তাহা আমাকে পাঠাও তবে আমিও পড়ে দেখতে পারি।

তুমি লিখেছ যাহা শান্তিনিকেতনে পেয়েছি তাহা গুজরাতকে দিতে চাই। ভাল কথা। সুধু ইহাই কেন, এই জগতে ভগবানের কৃপায় যে কিছু আনন্দ পাবে তাহা সকলকে দিয়ে যাবে। দুঃখ যা পাও তাহা তোমার নিজস্ব। তাহা কাহাকেও দিতে পার না। কারণ তাহা তোমাকে ভগবান ব্যক্তিগতভাবে দিয়াছেন—তাহা personal gift of God to you—not transferable.

প্রণামী সম্প্রদায়ের manuscript কি পেয়েছ কি কাজ কর তাহা জানাইও। জানিবার জন্য ব্যাকুল আগ্রহ লইয়া প্রতীক্ষা করিব।

তোমাকে আমি আমার লেখার কিছু কিছু off prints পাঠিয়েছি বাকীটা পাঠাইব, ছুটির পরে।

আজ ২৫ বৈশাখ, ৮ই মে। গুরুদেবের জন্মদিন, এই পূণ্যদিনে তোমার পত্র পাইলাম। তাহাতে আমার আরও আনন্দ। গুরুদেব আছেন আলমোড়ায়। আমাদের ছুটি ২৭ এপ্রেল হইতে হ'য়েছে। আমি উত্তরবঙ্গে রংপুর জেলাতে যোগীদের কাছে গিয়াছিলাম। সেখান হইতে এই জয়ন্তীতে যোগ দিতে কাল আসিয়াছি। আবার পূর্ব্ববঙ্গে বাউলদের অন্বেষণে বাহির হইব। জুন মাসের অন্তভাগে এখানে ফিরিব। জুলাই মাসের প্রথমে আশ্রম খুলিবে।

তোমার 'নৈবেদ্য' অনুবাদের কথা আমার মনে আছে। এখানে গুরুদেবের হিন্দি ও গুজরাতী অনুবাদ approve করিবার একটি board হইতেছে। কারণ বহু unauthorised অনুবাদ হইয়া গিয়াছে। সেগুলির সন্ধান জানিতেই কিশোরী সাঁতরা মহাশয় শ্রীমান পিনাকী ও শ্রীমান শুক্রকে বলিয়াছেন। তাহারা বাজার হইতে বহু unauthorised অনুবাদ সংগ্রহ করিয়া পাঠাইয়াছেন। এখন সেই সব পুস্তকের বিরুদ্ধে Legal steps নেওয়া হইবে। এই নূতন Gujrati ও হিন্দী board এ আমি আছি, শ্রীযুত মহাদেব দেশাই আছেন, আরও member হইবেন। সব ঠিক হইলে তোমার অনুবাদ তাঁহাদের কাছে place করিতে হইবে। ইতিমধ্যে তুমি মহাদেবভাইকে তোমার অনুবাদ দেখাইয়া approve করাইয়া রাখিতে পার।

পূজ্য মাষ্টারজীর খবর বহুদিন পাই না। কবে আমি তাঁহার সংবাদ পাইব? কবে তাঁহার পুণ্য দর্শন লাভ করিব? কুসুমবেনের বিবাহের কোনো ব্যবস্থা অগ্রসর হইতেছে কি? চন্দ্রকান্ত ভাই কি করে? দীনবন্ধুকে কাশীতে আমি দেখিয়া আসিয়াছি। শ্রীদেবী কত বড় হইয়াছে? পূজ্য মাষ্টারজী ও তাঁর পত্নীকে আমার ও আমার পত্নীর প্রণতি জানাইবে। শিশুদের স্নেহ সম্ভাষণ দিবে।

তোমার ঘরের নূতন অতিথির সংবাদে বড়ই সুখী হইলাম। কবে আমি আমার 'রমা'র সুন্দর মুখখানি দেখিব? তোমরা উভয়ে আমাদের স্নেহ ও কল্যাণ কামনা জানিবে। শিশুকেও জানাইবে।

আমার স্ত্রী সর্ব্বদা তোমাদের স্মরণ করেন। শ্রীযুত হরিপ্রসাদ পীতাম্বর দাস মেহতার সঙ্গে দেখা হয়? তাঁহার সকুটুম্ব শুভবার্তা দিবে। তাঁহার মাতৃশ্রী কেমন আছেন? তাকে ভক্তিপ্রণাম দিবে।

গুজরাত বহুদূরে। পথ বহু ব্যয়সাধ্য। আর্থিক শক্তি আমাদের সীমাবদ্ধ। তাই নিত্য তোমাদের অন্তরে স্মরণ করি। কবে যে দেখা হইবে তাহা জানি না। প্রার্থনা করি তোমাদের শুভ হউক, ভগবানের কৃপা তোমাদের উপর বর্ষিত হউক।

শুভার্থী
শ্রীক্ষিতিমোহন সেন

P. S. Please inform me whether you have been able to read this letter or if you have been able to have read to you, but this is natural out our of my heart which you will see if you can read it or have it read to you [৬২২]

বিশ্বভারতীতে ১ জুলাই কাজ শুরুর কিছুদিন পরে যেদিন পার্শ্ববর্তী সাঁওতাল গ্রামে হলকর্ষণ ও বৃক্ষরোপণ উৎসব হল, সেদিন অনুষ্ঠানভূমিতে শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনের অধিবাসীরা সমবেত হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ আছেন সভাপতির আসনে, পাশে বসে ক্ষিতিমোহন অনুষ্ঠান-উপযোগী বৈদিক মন্ত্রগুলি একে একে উচ্চারণ করছেন।[৬২৩] ১৭ নভেম্বর গুরু নানকের জন্মতিথিতে একটি বিশেষ মন্দিরোপাসনা হল। মন্দির পরিচালনা করলেন ক্ষিতিমোহন, গুরুদয়াল মল্লিক তিনটি নানকের ভজনগান করলেন।[৬২৪] অনেকদিন থেকেই ক্ষিতিমোহন শিখধর্মের ইতিহাস ও তার সাধনধারা বিষয়ে চর্চা করে আসছেন। 'শিখদের মহাগ্রন্থ' নামক প্রবন্ধে তিনি এম.এ. ম্যাকলিফের শিখধর্ম-বিষয়ক ছয় খণ্ডে সম্পূর্ণ বিরাট গ্রন্থের উচ্চপ্রশংসা করলেও এই লেখক যে বলেছেন ভারতীয় অন্য ধর্মের সঙ্গে শিখধর্মের যোগ থাকা স্বাভাবিক নয়, সে কথা মানতে পারেননি।[৬২৫] তিনি নিজে তো বরাবর বিভিন্ন ভারতীয় ধর্মের যোগসূত্রই খুঁজে আসছেন, তাই তাঁর মনে হচ্ছিল ভবিষ্যতে তাঁকে শিখধর্মের আলোচনাতেও প্রবৃত্ত হতে হবে। প্রীতিভাজন কেউ কেউ সেই মর্মে প্ররোচনাও দিচ্ছিলেন। অবশ্য শেষপর্যন্ত এই বিষয় নিয়ে খুব বিস্তারিত লেখার কাজ করবার সুযোগ তাঁর হয়নি। কেবল 'গুরু নানকের জন্মোৎসব', 'গুরু নানকের বসন্তোৎসব' প্রভৃতি শিখধর্মের আলোচনামূলক তাঁর কয়েকটি প্রবন্ধ আমরা পাই, ঢাকার শিক্ষক-সম্মিলনীর ভাষণেও শিখধর্ম ও শিখগুরুদের প্রসঙ্গ অনেকটা আছে। তাঁর প্রবন্ধেই উল্লেখ পাওয়া যায় যে, তাঁর ছাত্র জয়ন্তীলাল আচার্য বর্তমান কালের উপযোগী করে 'গ্রন্থসাহেব' সম্পাদনা করছেন। এ কাজের পিছনে তাঁরই অনুপ্রেরণা ছিল এমন অনুমান করা যেতে পারে। প্রধান ভারতীয় ধর্মগুলির সঙ্গে শিখধর্মের ওতঃপ্রোত সম্পর্ক দেখাবার আবশ্যকতা মনে নিয়েই মন্তব্য করেছেন :

আমার কয়েকজন প্রীতিভাজন কর্মসহচর এই কাজে হাত দিয়াছেন। আশা করি তাঁহাদের দ্বারা এই বিষয়ে অনেকে অনেক ভিতরের কথা জানিতে পারিবেন।[৬২৬]

কয়েকটা দিন যেতে না যেতেই পুনরপি একটি বিশেষ মন্দির-উপাসনার উপলক্ষ ঘটল বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুর মৃত্যুতে। সেইদিন ক্ষিতিমোহন জগদীশচন্দ্রের সাফল্যের অন্তর্নিহিত অর্থ ব্যাখ্যা করলেন। এই বিশাল ব্যক্তিত্বের তিরোধানে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ বিশ্বভারতীর সব বিভাগ বন্ধ ছিল, বিশ্বভারতী-সম্মিলনীর পক্ষ থেকেও একটি শোকসভা আয়োজিত হয়েছিল। ৩০ নভেম্বর জগদীশচন্দ্রের জন্মদিন। সেইদিন কলকাতায়

বোস ইনস্টিটিউটে তাঁর ভস্মাবশেষ প্রোথিত করার অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করার জন্য ক্ষিতিমোহন আমন্ত্রিত হয়েছেন।[৬২৭]

প্রসঙ্গান্তরে রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠি উদ্ধৃত করা যাচ্ছে :

Founder President
Rabindranath Tagore

Santiniketan
Bengal, India
193 ...

প্রীতিনমস্কার সম্ভাষণ

আজ ছুটির দিন আছে। গোঁসাইজি পন্ডিতজি প্রভৃতি অধ্যাপকদের সঙ্গে পরামর্শ করে যদি বিদ্যাভবনের গবেষণা কার্য্যঘটিত একটা সঙ্কলন স্থির করে দিতে পারেন তবে সেটা নিয়ে আলোচনা করতে ইচ্ছা করি। বিদ্যাভবনকে নূতন করে গড়ে তোলবার জন্য মন উৎসুক হয়ে উঠেছে।

সেই জাভাবাসী যুবক আমার কাছে এসেছিলেন—আপাতত তিনি ইংরেজি অধ্যয়ন করাই স্থির করেচেন। ইতি বুধবার

আপনাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর[৬২৮]

জাভাবাসী যুবক সুব্রত শান্তিনিকেতনে পড়তে এসেছিলেন তিরিশের দশকে। তিনি ক্ষিতিমোহনের বিশেষ অনুগত ছিলেন, তাঁর বাড়িতেই স্থান পেয়েছেন আগে আমরা ক্ষিতিমোহনের একটি চিঠিতে তার উল্লেখ পেয়েছি। কিরণবালাকে 'মা' বলতেন। সুব্রতর লেখা কয়েকটি চিঠি ক্ষিতিমোহনের কাগজপত্রের মধ্যে সংরক্ষিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের এই তারিখহীন চিঠিটি বিদ্যাভবনে গবেষণাকর্মসূচি বিষয়ে আলোচনা-সংক্রান্ত। এ চিঠি একেবারে সমসাময়িক কি না নির্দেশ করা যাবে না, তবু এই সূত্র ধরে ১৯৩৭ সালের গোড়ার দিকে বিদ্যাভবনের বিভিন্ন গবেষণাকর্মের একটু যে সংবাদ আশ্রমপত্রিকায় বেরিয়েছে, তার উল্লেখ করা যাচ্ছে। ক্ষিতিমোহন তখনও সন্ত রবিদাস বিষয়ে কাজ করছেন, অথর্ববেদ সম্পর্কেও একটি গবেষণাপ্রকল্প তাঁর হাতে রয়েছে। ড. মণিলাল প্যাটেল ঋগ্‌বেদ সম্পাদনা করছেন, অধ্যাপক জিয়াউদ্দীন সদ্য সমাপ্ত করেছেন ইসলাম ধর্মের সম্প্রদায়-সম্পর্কিত গবেষণাকর্ম, আজমল খাঁ আরবের প্রাক্-ইসলাম যুগের সাহিত্য নিয়ে কাজ করছেন।[৬২৯]

একটি উল্লেখ থেকে জানা যাচ্ছে কলকাতায় ওয়াল্ট হুইটম্যান স্মৃতিসভায় রবীন্দ্রনাথের চিঠি পঠিত হওয়ার পর পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেনের পত্রপ্রবন্ধের কিয়দংশ পড়া হয়। 'কবি হুইটম্যানের বাণী' নামে এই পত্রপ্রবন্ধ প্রবাসী ভাদ্র ১৩৪৪ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।[৬৩০] এ বছরের শেষের দিককার খবর, পাটনায় অনুষ্ঠিত প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনে ক্ষিতিমোহন সভাপতিপদে বৃত হয়েছিলেন।[৬৩১] সেখানকার কর্তব্য সেরে নিজের কর্মক্ষেত্রে ফিরলেন। নতুন বছর আরম্ভ হয়েছে, ১৯৩৮ সাল।[৬৩২]

এখন থেকে সে প্রায় তিরিশ বছর আগেকার কথা, যখন ক্ষিতিমোহনের সঙ্গে প্রথম পরিচয় হওয়ার পরে রবীন্দ্রনাথ হিন্দি সন্তসাহিত্যে তাঁর আশ্চর্য অধিকারের সন্ধান

পেয়েছিলেন। ক্ষিতিমোহন তাঁর কৈশোর কাল থেকে নিজের খেয়ালে গভীর অধ্যাত্ম অর্থবহ বাণী সংগ্রহ করতেন, পরম শ্রদ্ধায় বোঝবার চেষ্টা করতেন এই-সব সাধকদের সাধ্য ও সাধনের স্বরূপ। শান্তিনিকেতনে এসে রবীন্দ্রনাথের আগ্রহে তিনি নিয়োজিত হলেন সন্তবাণী অনুবাদ ও সন্তদের জীবন ও সাধনার বিস্তৃত পরিচয় দেওয়ার কাজে। এখন বিশ্বভারতীরই কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এই কাজ। ক্ষিতিমোহন একে দুর্লভ সৌভাগ্য বলেই গণ্য করতেন। বলেছেন :

> এই কার্যে আমি কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের কাছে যে কি পরিমাণে ঋণী তাহা বলিয়া বুঝাইতে পারি না। সেই যুগের সাধকদের গম্ভীর বাণীর রসসম্ভোগে রসানুভব-নিপুণ তাঁহার যে সশ্রদ্ধ প্রতিভা দেখিয়াছি এমন আর কাহারও দেখি নাই। সেই-সব বাণীর প্রতি তাঁহার অনুরাগ ও উৎসাহই এতকাল আমার মহা-সহায় হইয়া আসিয়াছে।[৬৩৩]

আবার বলেছেন :

> এই সব বিষয়ে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথের কাছে অশেষ উৎসাহ ও সহায়তা পাইয়াছি। কোনো বিদ্যায়তনে এই অনুসন্ধানের কোনো স্থান কখনো হইতে পারে তাহা মনেও করি নাই। অন্য কাজ করিয়া অবসর সময়ই এই কাজে দিতাম। তিনি বিশ্বভারতীতে এই কাজের অবসরও রচনা করিয়া দিয়াছেন।[৬৩৪]

রবীন্দ্রনাথ নিজে অবশ্য এ কথা বিশ্বাস করবার উপায় রাখেননি যে একা কেবল ক্ষিতিমোহনই ঋণী তাঁর কাছে। ক্ষিতিমোহনের কাছে তাঁরও ঋণ যে কত তাঁর কয়েকটি রচনায় তার স্বীকৃতি আছে, আছে কোনো কোনো সন্তবাণীর অধ্যাত্ম ভাবসম্পদের ব্যাখ্যা।

ক্রমশ হিন্দি সাহিত্যের চর্চা আশ্রমজীবনের অঙ্গ হয়ে উঠেছিল। ক্ষিতিমোহনের বন্ধু ও সহকর্মীরাও ভারতীয় মধ্যযুগের এই অতুল ভাবৈশ্বর্যের রসাস্বাদ করে আনন্দিত হয়েছেন, অজিতকুমার চক্রবর্তীর সময় থেকেই তার সূচনা। অনেক দিন পরে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় একটি প্রবন্ধে লিখেছিলেন :

> ক্ষিতিমোহনবাবুই বাঙালীর কাছে মধ্যযুগের সন্তদের কথা বাংলাভাষার মাধ্যমে এনে দিয়েছিলেন। আজ হিন্দী নিয়ে 'শিখতেই হবে'-র ও 'শিখবো না'-র জিদ দেশকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করতে চলেছে— কিন্তু আমাদের মনে সে প্রশ্ন আসে নি ; কারণ হিন্দী সন্তদের পরিচয় পেলাম ঠাকুর্দার কাছ থেকে। তাঁর সেই মোটা মোটা গলায় হিন্দী গান শুনেছিলাম। কখনো মনে করতে পারি নি ভাষাটা শেখবার মতো নয়। ... রবীন্দ্রনাথ বহুকাল থেকে শান্তিনিকেতনে হিন্দীচর্চার পরিবেশ রচনা করেছিলেন, তখনো দিল্লী নাগপুর থেকে হিন্দী ম্যানিয়াকদের জুলুমবাজি সুরু হয় নি। ক্ষিতিমোহন শান্তিনিকেতনে সেই হিন্দীপ্রীতির পরিবেশ রচনা করেছিলেন।[৬৩৫]

১৯৩৪-৩৫ সালে বিশ্বভারতীতে হিন্দি ভাষা ও সাহিত্যের বিস্তৃত চর্চার ক্ষেত্র প্রস্তুতকল্পে হিন্দিভবন স্থাপনের চেষ্টা শুরু হয়। প্রস্তাবটা যখন আলোচনান্তরে, অ্যান্ডরুজ একটি প্রবন্ধে লিখেছিলেন :

> মধ্যযুগীয় হিন্দি সাহিত্যচর্চায় রবীন্দ্রনাথ ও ক্ষিতিমোহনের ঘনিষ্ঠ সহযোগ হিন্দি কবিদের খ্যাতি বহুগুণে বৃদ্ধি করেছে এবং সারা পৃথিবীতে তাঁদের নাম ছড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু তার চেয়েও বড়

> কথা হল কবির শান্তিনিকেতনে এই হিন্দিসাহিত্যের চর্চা আমাদের আশ্রমজীবনের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে গেছে। ভবিষ্যতে বিশ্বভারতীতে যাতে হিন্দিসাহিত্যের একটি অধ্যাপকপদ সৃষ্টি করা যায় ও একটি হিন্দি গ্রন্থাগার গড়ে তোলা সম্ভব হয় সে-বিষয়ে আমরা ভাবছি। ইতিমধ্যেই বহু বিশিষ্ট হিন্দি লেখক এই প্রস্তাবিত গ্রন্থাগারের জন্য বই পাঠিয়েছেন। হিন্দি ও বাংলা সাহিত্যে সমাধিকারসম্পন্ন পণ্ডিত হাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদীর মতো অসাধারণ অধ্যাপককে আমরা পেয়েছি, এখনই পনেরো জন ছাত্র বিশ্বভারতীতে হিন্দি সাহিত্য অধ্যয়ন করছেন এবং এছাড়াও দুজন ইউরোপীয় ছাত্র হিন্দি নিয়েছেন। এ সবই প্রধানত মধ্যযুগীয় হিন্দি সাহিত্যের প্রতি রবীন্দ্রনাথ-ক্ষিতিমোহনের গভীর আগ্রহের ফল।[৬৩৬]

অ্যান্ডরুজের এই প্রবন্ধ প্রকাশের দু-বছর পরে ১৬ জানুয়ারি ১৯৩৮ হিন্দিভবনের ভিত্তিপ্রস্তরস্থাপন অনুষ্ঠান হল শান্তিনিকেতনে। রবীন্দ্রনাথের অনুপস্থিতির কারণে অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করলেন অ্যান্ডরুজসাহেব, স্বাগতভাষণ দিলেন ক্ষিতিমোহন। এই স্বাগতভাষণ 'সংস্কৃতির যোগসাধনা' নামে প্রবাসী-তে প্রকাশিত হয়। যাঁদের প্রত্যক্ষ সহায়তা ও অর্থসাহায্যে বিশ্বভারতীতে হিন্দি ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যয়ন ও গবেষণাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হল, তাঁদের সকলকে বার বার সবিনয় নমস্কার জানালেন ক্ষিতিমোহন।[৬৩৭] তিনি বললেন যে চলতি জাতীয়তার উপরে উঠে রবীন্দ্রনাথ এই বিশ্বভারতীতে সব মানুষকে বিশ্বজনীন সত্যের মধ্যে মহাযোগ স্থাপনের জন্য ডাক দিয়েছেন। এখানে পরস্পরের পরিচয়ের ও মিলনের যে একটি মহাক্ষেত্র রচিত হয়ে উঠছে তার মূল্য অনেক। এই প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে তাঁর বাণী সারা ভারতকে, সমগ্র জগৎকে আহ্বান করে বলেছে : 'সকলে এই সাধনার বেদীমূলে সমবেত হও, পরস্পর পরস্পরকে জান, ভাইয়ে ভাইয়ে সব বৃথা দ্বন্দ্বের ও দুর্গতির অবসান হউক।'[৬৩৮]

ইতিমধ্যে বিশ্বভারতীতে যে-সব সাধনা ও সংস্কৃতিচর্চার আসন পাতা হয়েছে তার উল্লেখ করে ঈষৎ ক্ষুব্ধস্বরে তিনি বললেন :

> শুধু কি ভারতের সকল প্রদেশের সংস্কৃতি এখানে সমবেত হইবে না? এই উপলক্ষ্যে প্রাদেশিকতার সর্ববিধ বেড়া কি বিলীন হইয়া আসিবে না? বড় দুঃখে সাধকশ্রেষ্ঠ কবীর বলিয়াছিলেন, 'বেঢ়াহী ক্ষেত খায়'। অর্থাৎ 'বেড়াই খাইল ক্ষেত'।[৬৩৯]

তবু নৈরাশ্যের অবকাশ নেই। সনাতন ভারত পারস্পরিক বোঝাপড়া ও সহনশক্তির কথাই বলেছে চিরকাল।

> ভারতবর্ষে যুগের পর যুগ দেখা গিয়াছে ধর্মের পাশে ধর্ম, মতের পাশে মত বিরাজমান। কেহ কাহাকেও নিঃশেষ করে নাই, বরং একে অন্যকে অনুপ্রাণিত করিয়াছে। অন্যকে মারিয়া গ্রাস করিয়া আপনি স্ফীত হইয়া উঠিবার রাক্ষসী বৃত্তিটা অভারতীয়, বাহির হইতে আমদানী করা। কাজেই এইরূপ সংস্কৃতির মিলনক্ষেত্রের কথা বুঝিতে আমাদের দেশের লোকের পক্ষে কঠিন হইবে না।[৬৪০]

সমবেত সজ্জনমণ্ডলীকে এ কথাটাও মনে করিয়ে দেন তিনি যে, মিলনের এই সাধনা জীবনের সাধনা। তাই ক্ষুদ্র আরম্ভে ভয় নেই—'ক্ষুদ্র বীজের মধ্যেই তো ভবিষ্যৎ মহারণ্য নিহিত'।

কিন্তু কিছুকাল ধরিয়া চাই জল, চাই সেবা। আবদর রহীম খানখানাঁকে সামান্য একটি গ্রামকন্যা যে অন্তরের ব্যথাটি শুনাইয়া দিয়াছিল সেই কথাটিই আজ আপনাদিগকেও শুনাইয়া রাখিতে চাই।

প্রেম প্রীতকো বিরবা চল্যৌ লগায়।
সীঁচন কী সুধী লীজৌ মুরঝি ন জায়।।

প্রেম প্রীতির তরুটি যে রোপণ করিয়া গেলে, তাহাতে রসসেচনেরও ব্যবস্থা করিও, যেন সে না যায় শুকাইয়া।[৬৪১]

রবীন্দ্রজয়ন্তী

২৮ এপ্রিল গরমের ছুটি শুরু হবে। দিন পনেরো আগে পয়লা বৈশাখের দিন সকালে নববর্ষের উপাসনার পরে রবীন্দ্রজন্মোৎসব পালিত হল। আম্রকুঞ্জে অনুষ্ঠান। ২৪ এপ্রিল রবীন্দ্রনাথ চলে গেলেন কালিম্পঙে তাঁর জন্মদিনে আশ্রমিকরা পুনরপি উৎসব করলেন। হয়তো সেইদিনই উৎসবের পরে কলকাতায় চলে গিয়েছিলেন ক্ষিতিমোহন, পরের দিন তাঁর জন্মদিন উপলক্ষে চিঠি লিখলেন। তা থেকে জানা যায় প্রাক্তন ছাত্র ও অধ্যাপকরা কলকাতায় রবীন্দ্রজন্মোৎসবের আয়োজন করেছেন কয়েকদিন পরে, কিন্তু ক্ষিতিমোহন সে-সময় অন্যত্র রবীন্দ্রজয়ন্তী উপলক্ষে আমন্ত্রিত হয়েছেন বলে এখানে যোগ দিতে পারবেন না। এ বছর আকাশবাণীর অনুরোধে ২৫ বৈশাখ রবীন্দ্রনাথ তাঁর দূর পর্বতাবাস থেকে একটি সদ্যরচিত কবিতা দূরভাষযোগে পাঠ করেছিলেন, কলকাতা বেতারকেন্দ্র থেকে তা সম্প্রচারিত হয়। কবিতাটিও অনবদ্য, যান্ত্রিক কুশলতার সফল প্রয়োগে কবিকণ্ঠে তার পাঠও চমৎকার শোনা গেছে, সকলেই আনন্দ পেয়েছেন। ক্ষিতিমোহনের চিঠিতেও সে আনন্দপ্রসঙ্গ ছিল। ক্ষিতিমোহন লিখেছিলেন :

২০ রাজা বসন্ত রায় রোড, কালীঘাট
২৬। ১। ৪৫

শ্রীচরণকমলেষু

১লা বৈশাখ আশ্রমে আপনার জন্মোৎসব করিলেও আবার ২৫শে বৈশাখের দিনে আপনার জন্মোৎসব দিনোচিত স্মরণ করিয়াছি। আমাদের জন্য, আমাদের দুর্গত দেশবাসীর জন্য আপনার দীর্ঘজীবন বার বার প্রার্থনা না করিয়া উপায় নাই।

প্রাক্তন ছাত্র ও অধ্যাপকগণ আগামী শুক্রবার এখানে উৎসব করিবেন। আমি পূর্ব্ববঙ্গে, ময়মনসিংহ জেলায় শেরপুরে আপনার জয়ন্তী অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হইয়া যাইতেছি। সেখানে ১৩-১৪ মে উৎসব হইবে। তাহার পর আমি দেশে যাইব ও দেশ হইতে কিছু আখরা মঠ প্রভৃতি দেখিতে যাইব।

আপনার কবিতা যাহা রেডিওতে শুনিলাম তাহা চমৎকার। সবাই দেখিলাম তাহার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিতেছেন। পরে কাগজেও তাহা পড়িলাম। ইংরাজীটুকুও চমৎকার হইয়াছে। আপনার কণ্ঠ এমন সুন্দর শুনিতে পাওয়া গিয়াছে যে তাহা বুঝাইয়া বলা যায় না।

ওখানকার খবর মাঝে মাঝে খবরের কাগজে দেখিতে পাই। দেখা হইলে আরও শুনিতে পাইব। আপনার শরীর আশা করি ওখানে ভাল আছে। আর সকলেরও কুশল কামনা করি।

এখানে অমিতার রক্তাল্পতা ও দুর্বলতা কিছু কমিয়াছে। আর একটু ভাল হইলে রেঙ্গুন যাইতে পারিবে। এখনও ডাক্তাররা যাইতে দিতে রাজী নহেন।

ইতি
শ্রদ্ধানত
ক্ষিতিমোহন সেন[৬৪২]

রবীন্দ্রনাথ উত্তর দিলেন :

ওঁ

প্রীতিনমস্কার সম্ভাষণ ·

গিরিচূড়ায় বসে আছি—আমার উপরে চারদিক থেকে অর্ঘ্যবর্ষণ হচ্চে। আমি কত যে কুণ্ঠিত হই সেকথা কাউকে বুঝিয়ে বলতে পারিনে। মৃত্যু যখন নৈকট্যের পর্দ্দা তুলে নেবে তখনি আমার যে প্রকাশ সত্য হবে আমার চিরজীবনের যা কিছু প্রাপ্য তারই কাছে পৌঁছিয়ে দিলে সেটা যথার্থ হবে। জীবিতকালে সাধক মহাপুরুষরাই পূজা পাবার যোগ্য। কবিরা পায় হাততালি, সেটা অত্যন্ত বিমিশ্রিত, সেটা শুদ্ধ হয়ে উঠতে দেরি হয়, সেটা চোলাই হয় দীর্ঘকালের ভিতর দিয়ে। স্বাস্থ্যের কিছু উন্নতি হয়ে থাকবে। মৈত্রেয়ীর নিমন্ত্রণে আজ চলেছি সিন্‌কোনা ক্ষেত্রে মঙপুতে। ইতি ৭ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫

আপনাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর[৬৪৩]

কিরণবালা একইসঙ্গে লিখেছিলেন কবিকে, রবীন্দ্রনাথও একসঙ্গেই উত্তর পাঠিয়েছিলেন তাঁকেও।

কল্যাণীয়াসু

তোমার চিঠিখানি পেয়ে খুশি হলুম। সেদিন আমার কণ্ঠস্বর ছড়িয়েছিল অনেকদূরে—রেডিয়োওয়ালাবা সতর্ক ছিল কোনো বাধা ঘটতে দেয় নি পথে। ওরা এত করে উদ্যোগ করেছিল যে সেইজন্যে আমিও আমার বাণীরচনা করতে আলস্য করি নি। এ জায়গাটি ভালো লাগছে—বেশ নির্জন—বেশি বৃষ্টি নেই—যথেষ্ট আলো—সামনেই হিমাচলের শুভ্র কিরীট মাঝে মাঝে দেখতে পাওয়া যায়। বর্ষা যখন নামবে তখন বর্ষামঙ্গলের কবিও নামবে নিম্নভূমিতে, কেয়া ফুটবে কোপাইয়ের ধারে, আমার দ্বারের কাছে শিমুলশাখা থেকে মালতীলতা পুষ্পবৃষ্টি করবে। ইতি ৭ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর[৬৪৪]

ময়মনসিংহের শেরপুরে রবীন্দ্রজয়ন্তী অনুষ্ঠানের প্রসঙ্গে ক্ষিতিমোহনের লেখা সমকালীন আরও একখানি চিঠি চোখে পড়েছে। ময়মনসিংহের অন্যতম জমিদার সত্যেন্দ্রমোহন চৌধুরী তাঁর বহুদিনের পরিচিত এবং শ্রদ্ধেয় মানুষ বলেই মনে হয়, তাঁরই প্রস্তাবে এসেছেন শেরপুরে। এবার অন্য এক শরিক জমিদারও রবীন্দ্রজয়ন্তীর আয়োজন করেছেন, তাঁরাও ক্ষিতিমোহনের অপরিচিত নন, আর এবারকার রবীন্দ্রজয়ন্তী-প্রতিযোগিতায় একটা নতুন অভিজ্ঞতাও হচ্ছে। ক্ষিতিমোহন রবীন্দ্রনাথকে লিখছেন :

পূজনীয়েষু

এখানে কয়েকজন যুবক ও একটি সরিক জমীদারের উদ্যোগে রবীন্দ্রজয়ন্তী প্রতি বৎসরই অনুষ্ঠিত হয়। এবার তাহাদের অনুরোধে আমি এখানে আসি, ইহাদের মধ্যে আমার কাশীর পরিচিত দুই একজন আছেন।

জমীদারদের মধ্যে সরিকে সরিকে বড় প্রতিদ্বন্দ্বিতা, তাহা জানিতাম না। তবু যাঁহার উদ্যোগে আমি এখানে আসি, তিনি শ্রীসত্যেন্দ্রমোহন চৌধুরী আপনার অতিশয় অনুরাগী পাঠক। তাঁহার library চমৎকার। তাঁহার পড়াশুনা খুবই ভাল। ইঁহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী শরিকেরাও তাই রবীন্দ্রজয়ন্তীতে নাবিয়াছেন। ভালই।

সত্যেন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের পত্নী শ্রীমতী জ্যোৎস্না দেবী আপনার খুব ভক্ত। তিনি জয়ন্তী উপলক্ষ্যে আপনার চরণকমলে বিশ্বভারতীর জন্য ৫০০্ পাঁচ শত টাকা দিলেন।

ইহার জন্য ধন্যবাদ দিতে হইলে যেন তাঁহার নামে দেওয়া হয়। অর্থাৎ শ্রীমতী জ্যোৎস্না দেবী, C/o শ্রীযুত সত্যেন্দ্রমোহন চৌধুরী, শেরপুর ময়মনসিংহ।

আমি কালই এখান হইতে ঢাকা যাইব। ঠিকানা হইবে C/o. Dr. Nityaranjan Gupta Armenian Street, Dacca.

আশা করি আপনি ভাল আছে[ন]। এই উপলক্ষ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতাবশতঃ ঐ পক্ষ হইতেও কিছু যদি বিশ্বভারতী পায় তবে ভাল। আমি তাঁহাদের কাছেও যাই আসি। তবে তাঁহারা আনিয়াছেন শ্রীযুত নীহাররঞ্জন রায়কে। ধূমধাম দুই দিকেই খুব চলিয়াছে। এই অভিজ্ঞতা আমার জীবনে এই প্রথম।

আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি জানাইতেছি। অমিতা কলিকাতায় একটু ভাল আছে। আর একটু ভাল হইলেই বর্ম্মা যাইবে।

প্রণত

ক্ষিতিমোহন সেন[৬৪৫]

গুজরাতের টান

কিছুদিন থেকে গুজরাতের বন্ধুদের জন্য ক্ষিতিমোহনের মনটা ব্যাকুল হয়েছে। বছর দুই আগে লেখা চিঠিতেও আমরা দেখেছিলাম গুজরাতে যাওয়ার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করছেন, টাকার অভাবে এতদূরে যাওয়া সম্ভব হয়নি সেবারে। এবারও ভাবছেন পূজোর ছুটিতে যদি কয়েকটা দিনের জন্য সেখানে যেতে পারেন। 'প্রান্তিক' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, মাস্টারজির সঙ্গে তার কবিতাগুলি নিয়ে আলোচনা করতে চান। আজকাল বয়সের কথা মনে হয়, আটান্ন বছর বয়স হল। আয়ু তো কমছে দিনে দিনে। যদি গুজরাত যাওয়ার সুযোগ হয়, পথে আরও কয়েকটি জায়গায় ঘুরে যেতে হবে বলে গুজরাতে পৌঁছোতে খানিকটা দেরি হবে তাঁর। লখনউতে কন্যা-জামাতা আছেন, বোম্বাইতে আছেন রতিভাই, গুজরাতে গেলে আমেদাবাদে ছাড়াও কোসিন্দ্রাতেও যেতে হবে, সেখানেও বন্ধুরা আছেন। জয়ন্তীলাল আচার্যকে লিখলেন :

এক মাসের ছুটি। পনেরো দিনও মাস্টারজীর সঙ্গো যদি কাটাতে পারি তবে ছুটি সার্থক হবে। আমাদের উভয়েরই বয়স হয়েছে। আয়ু ক্ষীণ হচ্ছে। কখন কে আছি কে নাই কে জানে? তোমাদের দেখবার জন্য অত্যন্ত আকাঙ্ক্ষা। আরও বন্ধু-বান্ধব অনেক আছেন। যদি মাস্টারজী আমার যাওয়া অনুমোদন করেন এবং তোমার পত্র পাই তবে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব। তবে তোমার পত্র একটু শীঘ্র পাওয়া চাই। ছুটি যদি ২৫ সেপ্টেম্বর শুরু হয় তবে দশ পনেরো দিনের মধ্যে তোমার উত্তর পাওয়া দরকার। তোমার উত্তরের অপেক্ষায় রইলাম। কি ঠিক করলে তা জানাবে। মাস্টারজী এখন কোথায় আছেন? তিনি কি নতুন বাড়ি ভাড়া নিয়েছেন না শাহীবাগে আছেন? তিনি সপরিবারে কি রকম আছেন? ... এবার আমি কোথায় গিয়ে উঠলে ভাল হয়? আমি মাস্টারজীকে বিপন্ন করতে চাই না, যদিও তাঁকে সর্বদাই পেতে চাই। কোথায় থাকলে তাঁর পক্ষে সুবিধা হয় জানালে সেইমতো ব্যবস্থা করব আমি। ...তুমি মাস্টারজীকে এই পত্রখানা দেবে।[৬৪৬]

পুজোর ছুটিতে বেরিয়ে পড়লেন। লখনউ থেকে মীরা চৌধুরীকে লেখা তাঁর একটি চিঠি পাচ্ছি, মূল্যবান জ্ঞাতব্য তেমন কিছু না থাকলেও সেটি উদ্ধৃত করেই দেওয়া যাক :

ওঁ

76, Badshabag, Lucknow
3.10.'38

কল্যাণীয়াসু

কী সুন্দর ছবি দুখানি হয়েছে? আজ তোমার পাঠানো Photo দুটি পেলাম। শান্তিনিকেতন ঘুরে এসেছে।

আসবার সময় তোমার পায়ের ব্যথা যে ছিল, এখন তা কেমন আছে?

আমি কাল এখান হতে রাজপুতানা রওয়ানা হব। ঠানদি এখানে আর ৮।১০ দিন থেকে পাটনা হয়ে আশ্রমে ফিরবেন। আমার খবর খোদনকে দিও ও আমার আশীর্ব্বাদ বোলো। এই ঠিকানায় পত্র এলে আমি পাব।

আশা করি তোমরা ভাল আছ। ভগবান তোমাদের মঙ্গল করুন। Photo দুখানির জন্য বহু ধন্যবাদ।

শুভার্থী
ক্ষিতিমোহন সেন[৬৪৭]

মমতা-শৈলেন্দ্রনাথের গৃহ থেকে লিখেছেন ক্ষিতিমোহন, বোঝা যাচ্ছে রাজস্থান বা অন্য যেখানেই তিনি থাকুন এর পরে, এই ঠিকানায় চিঠি লিখলে পৌঁছোবে তাঁর কাছে। গুজরাত থেকে নিশ্চয় ইত্যবকাশে বন্ধু ও প্রিয় ছাত্রদের সাদর আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন। রাজস্থান থেকে গুজরাত। ২০ অক্টোবর পর্যন্ত তাঁদের সংসর্গে আনন্দে কাটল। আমেদাবাদে মাস্টারজি বাড়িতে ছিলেন। অন্য বন্ধু ও স্নেহভাজনদের সঙ্গো দেখা করবার জন্য নড়িয়াদ, বসো, পেটলাদ, আনন্দ প্রভৃতি জায়গাতেও গিয়েছিলেন। কয়েক মাস আগে লিখেছিলেন জয়ন্তীলালকে :

ইচ্ছা হয় গুরুদেবের নূতনতম যে গ্রন্থ 'প্রান্তিক' তাঁর মৃত্যুলোকের অভিজ্ঞতার কথা—এই কবিতাগুলি নিয়ে খুব নিভৃতে তাঁর (মাস্টারজী) সঙ্গো বসে আলোচনা করি। খুব ছোট বই কিন্তু খুব গম্ভীর। দশ বারো দিনেতেই বোধ হয় সমাপ্ত করা যায়।[৬৪৮]

এ কাব্য কেবলমাত্র দুই সমমনস্ক বন্ধুর অন্তরঙ্গ একান্ত আলোচনার বিষয় হয়ে থাকেনি। এবার গুজরাতে বিভিন্ন স্থানে যে-সব আলোচনা করলেন ক্ষিতিমোহন, তার একটি মুখ্য ভাগ জুড়ে রইল 'প্রান্তিক'-এর কবিতাগুলির পাঠ ও ব্যাখ্যা। 'প্রান্তিক' ক্ষিতিমোহনের অত্যন্ত প্রিয় কাব্যগ্রন্থ। তিনি মনে করতেন রবীন্দ্রনাথ যে গত বছর প্রায় যাট ঘণ্টা অচৈতন্য ছিলেন, সেই সুষুপ্তি তাঁর রুগ্‌ণাবস্থা মাত্র ছিল না, সে ছিল তাঁর একটি অনুভূতিদর্শন বা উপলব্ধির অবস্থা, 'প্রান্তিক'-এর কবিতাগুলিতে তারই যৎকিঞ্চিৎ প্রকাশ ঘটেছে। এই বই তাঁর আন্তর অনুভবের প্রকাশ বলেই বই বেরোনোর পরে সেসময় পর্যন্ত বাংলার কোনো সমালোচক এর সমালোচনা করতে সাহস করেননি। এ মতামতও তাঁরই। ক্ষিতিমোহন এই সময়কার অধিবেশনগুলিতে 'প্রান্তিক'-এর এক থেকে চার ও ছয় থেকে চোদ্দো সংখ্যক কবিতার ব্যাখ্যা করেন।[৬৪৯] ক্ষিতিমোহনের 'প্রান্তিক'-এর ভাষণগুলির কিকুভাই-কৃত অনুলিখন ও গুজরাতি অনুবাদ প্রথম মুদ্রিত হয় 'সাধনাত্রয়ী'-তে। তাই গ্রন্থসম্পাদক মোহনদাস পটেল সানন্দে মন্তব্য করেছেন : এই প্রকাশন যদি না হত তা হলে এই দুর্লভ বিবরণ আমরা পেতাম না।[৬৫০]

'প্রান্তিক' ছাড়াও সেবার আরও নানা বিষয়ে ক্ষিতিমোহন আলোচনা করেছিলেন, অনেক সময় সে-সব আলোচনা হত কথোপকথনের ছলে, কখনও বা বাবুজির সঙ্গে দেখা করতে এসে কেউ কোনো প্রসঙ্গ উত্থাপন করতেন বা কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতেন, সেই সূত্রে নানা আলোচনা এসে পড়ত। জয়ন্তীলাল আচার্য এই-সব আলোচনার কিছু কিছু অনুলিখন করেছিলেন। বুদ্ধিপ্রকাশ পত্রিকার সম্পাদকের অনুরোধে তিনি তা থেকে কয়েকটি অংশ প্রকাশের জন্য প্রস্তুত করে দিলে 'জ্ঞানগোষ্ঠী' নামে তা প্রকাশিত হয়। ক্ষিতিমোহন ফিরে যাওয়ার পরে জয়ন্তীলাল তাঁকে বুদ্ধি প্রকাশ-সম্পাদকের প্রস্তাব জানালে ক্ষিতিমোহন তাঁকে লিখেছিলেন :

> আমার আলাপ-টালাপের সংগ্রহ করবার জন্য রসিকভাই ইচ্ছা করেছেন সেজন্য তাঁর প্রীতিকে ধন্যবাদ দেই, কিন্তু আমার আলাপের মধ্যে এমন কী আছে তা আমি বুঝলাম না।[৬৫১]

বরং তাঁর প্রস্তাব ছিল : "'প্রান্তিক' তুমি পড়তে শুরু করেছ শুনে খুশি হলাম। পড়ে যে-রকম ভাব তোমার মনে আসে এবং আমার কথা যা মনে আছে সব মিলিয়ে একটি সংগ্রহ লিখে রাখতে পারো।"[৬৫২] কোনো আলোচনা শুনে ক্ষিতিমোহন নিজেও এইভাবে লিখতেন। রবীন্দ্রনাথের আলোচনাও তিনি এইভাবেই নিজের ভাবনার সঙ্গে মিশিয়ে লিখেছেন।

ক্ষিতিমোহনের 'প্রান্তিক'-এর ব্যাখ্যানগুলি যেমন রক্ষা পেয়েছে, বুদ্ধিপ্রকাশ-এর আলাপ-আলোচনাগুলিও তাই। জয়ন্তীলাল আচার্যের অনুলিখিত এই আলাপ-আলোচনাগুলি বুদ্ধিপ্রকাশ প্রকাশ করেন বলেই জানা যায় সহজ আলাপ-আলোচনায় নিজের অভিজ্ঞতার কথা বা চিন্তাভাবনার কথা তিনি কী বলেছিলেন। এই সুযোগ সুলভ নয়। শান্তিনিকেতনের বাইরেও সারাজীবনে অজস্র ভাষণ দিয়েছেন, ঘরোয়া পরিবেশে কত বন্ধু বা অভ্যাগত মানুষের সঙ্গে কত আলোচনা করেছেন, তার প্রায় সবই হারিয়ে গেছে।

'জ্ঞানগোষ্ঠী'-র অনুলেখক জয়ন্তীলাল আচার্য ভূমিকায় জানিয়েছেন কেন ক্ষিতিমোহনের একাধারে সরস এবং গভীর উপলব্ধিজাত ভাষণগুলির যথাযথরূপ লেখায় প্রকাশ করা যায় না, লিখতে গিয়ে অনেক কিছু কেন হারিয়ে যায়।

> তাঁর প্রসঙ্গোচিত ভাবধারার লিপিবদ্ধ রূপ নীচে প্রকাশ করা হল, তাতে হয়তো অনেক ত্রুটি থেকে যাবে। তাঁর জ্ঞানকিরণ যেটুকু ধারণ করতে পেরেছে আমার মন, দুর্বল ভাষায় তা প্রতিবিম্বিত করতে চেষ্টা করেছি। তাঁর রসিকতার অদ্ভুত বিনোদশৈলী (যার জন্য বাংলায় তাঁকে ঠাকুরদা উপাধি দেওয়া হয়েছে।),* আসর জমানোর অদ্বিতীয় এবং অব্যর্থ কৌশল, অতি গম্ভীরকে সুসাধ্য ও সহজ করে বোঝাবার রীতি ইত্যাদি যা যথার্থভাবে উপস্থিত করা অসম্ভব, তা বাদ পড়বেই।[৬৫৩]

আলোচনাকালে কত কথা উঠত প্রসঙ্গত, কতজন কত জিজ্ঞাসা নিয়ে আসতেন, ক্ষিতিমোহন কখনও বা সরাসরি উত্তর দিতেন, কখনও বা এমন এক প্রসঙ্গে কথা শুরু করতেন, সজাগ প্রশ্নকর্তা বা শ্রোতা যার মধ্যে থেকে সে প্রশ্নের উত্তর নিজেই খুঁজে পেতেন। তিনি নিজেই বলেছেন তিনি অনেক সময় বাংলায় আলোচনা করতেন অন্য প্রদেশের সাধক ও তাঁদের সাধনা নিয়ে, আর বাংলার বাইরে বাংলার বাউলদের কথা বলতেন। 'জ্ঞানগোষ্ঠী'-তেও বাউলদের প্রসঙ্গ ও গান বেশ কয়েকটি আছে। একদিন মীরার ভজনসংগ্রহ প্রসঙ্গে কথা উঠলে ক্ষিতিমোহন নিজের জীবনের এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতার কাহিনি শোনালেন। একবার জয়পুর থেকে রেলগাড়িতে উঠে যাচ্ছেন, সহযাত্রিণী এক বৃদ্ধার কণ্ঠে মীরার একটি গান শুনে মন ভরে উঠল সেই গানের রসে। কিন্তু লক্ষ করলেন গানটি সম্পূর্ণ নয়। বাকিটুকু কী করে পাওয়া যাবে জানতে চাইলে বৃদ্ধা বললেন ভাটুটু স্টেশনে নেমে সেখান থেকে রনিলায় গিয়ে এক বৃদ্ধের কাছে যদি যেতে পারেন, তিনি হযতো সন্ধান দিতে পারেন। সেইমতো ভাটুটু গিয়ে সেখানে খোঁজ করে জানা গেল রণিলা একশো সাঁইত্রিশ মাইল দূর, মরুভূমির পথ পার হয়ে যেতে হয়। পকেট তখন খালি, কেবল পাঁচ আনা পয়সা পড়ে আছে। প্রচণ্ড খিদে পেয়েছিল, খাবারের আশায় ঘুরতে ঘুরতে এক দইওয়ালার কাছে দু-পয়সায় খানিকটা পচা দই নিয়ে খেলেন, আর কিছু ছিল না, সে দোকান বন্ধ করতে যাচ্ছিল। তার পর পান্থশালায় শুয়ে সারাদিনের শ্রান্তিতে তখনই ঘুমিয়ে পড়লেন। মাঝরাতে কার আর্তস্বর শুনে ঘুম ভেঙে গেল। আওয়াজ অনুসরণ করে গিয়ে দেখলেন এক বৃদ্ধ রোগযন্ত্রণায় কাতর। অভ্যাসমতো কিছু আয়ুর্বেদিক ও বায়োকেমিক ওষুধপত্র সঙ্গে ছিল, জলে গুলে একটা বড়ি খাওয়াতে কিছুক্ষণ পরে সেই অসুস্থ বৃদ্ধ শান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। পরদিন উঠতে বেলা হয়ে গিয়েছিল ক্ষিতিমোহনের। বাইরে এসে দেখেন পান্থশালার প্রাঙ্গণে বহু লোক তাঁর অপেক্ষায় বসে আছে, গ্রাম থেকে রোগীরা এসেছে। সকাল হতে-না-হতে খবর রটে গেছে যে এক সাধুবাবা এসেছেন, তিনি একটুখানি

* এ ধারণা ভুল, সে কথা আগেই আলোচিত হয়েছে।

জল খাইয়ে সব রোগ ভালো করে দেন। প্রথমটায় হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলেন, তার পর যখন দেখলেন প্রকৃত ঘটনাটা কাউকে বোঝানোই যাচ্ছে না, তখন সবাইকেই কিছু-না-কিছু ওষুধ দিলেন। এর মধ্যে তাঁর জন্যে থালা ভরে ভরে খাবার এসে হাজির। ক্ষিতিমোহন কৌতুকবোধ করছেন—সাড়ে চার আনা পয়সা যার সম্বল, এখন তো দেখা যাচ্ছে সে অনেক লোককে পেটভরে খাওয়াতে পারে। খানিকক্ষণ পরে রনিলা যাওয়ার ব্যবস্থাও হয়ে গেল আপনা হতে। ভারবাহী উটের দল চলেছে রনিলার দিকে, তিনিও একটা খালি উট পেয়ে গেলেন। অবশেষে খুঁজতে খুঁজতে সেই সাধুর মঠ, যাঁর কাছে সেই অর্ধশ্রুত মীরার ভজন শোনবার আশা। সাধু মৃত্যুশয্যায় শুয়ে। ক্ষিতিমোহন তাঁর আসবার উদ্দেশ্য জানিয়ে সেই বৃদ্ধার কাছে অর্ধেক-শোনা ভজন গাইতে বৃদ্ধের স্তিমিত প্রাণশক্তি যেন নিভে যাওয়ার আগে দীপশিখার মতো জ্বলে উঠল। তিনি সেই ভজনের বাকি অংশটুকু বেশ জোর গলাতেই তাঁকে গেয়ে শোনালেন। বৃদ্ধের ইচ্ছায় তিনি দেহত্যাগ না-করা পর্যন্ত তাঁর কাছে ক্ষিতিমোহন ছিলেন। তিনি তাঁকে তাঁর সঞ্চয় হাতে-লেখা পুথিগুলির উত্তরাধিকার দান করেছিলেন বলেছেন ক্ষিতিমোহন, তবে সেই সাধুর উত্তরক্রিয়া পর্যন্ত রনিলায় থাকলেও এই পুথিগুলি তিনি নিয়ে আসতে পেরেছিলেন কি না সে বিষয়ে কিছু বলেননি। যারা তাঁকে রনিলা নিয়ে গিয়েছিল তারাই ভাট্টুতে ফিরিয়ে এনেছিল এবং কে বা কারা যে তাঁর জন্যে ফেরবার টিকিট, পাথেয় হিসেবে পঁচিশটি টাকা আর গাড়ির খাবারের বন্দোবস্ত করে দিয়েছিল, কোনোদিনই সে কথা তাঁর জানা হয়নি।[৬৫৪]

গুজরাতের আনন্দময় দিনগুলির শেষে শান্তিনিকেতনে ফিরে এলেন। ছুটি ফুরিয়েছে। ফেরার পরও সেই-সব সহমর্মী বন্ধু ও স্নেহাস্পদদের জন্য একটা শূন্যতাবোধ পীড়িত করছিল। তাই জয়ন্তীলালের চিঠির উত্তরে তাঁকে লিখতে দেখি :

> তোমার এগাবো তারিখের চিঠি আমি পেয়েছি। তোমরাও যে এইরকম শূন্যতা অনুভব করছ জেনে একটা তৃপ্তিবোধ করলাম। যদিও তাকে আনন্দ বলা যায় না। এখন আমার সেই ভোরবেলাকাব পাঠ, মধ্যাহ্নের এবং সন্ধ্যার গান এবং কথাবার্তা, তোমাদের সঙ্গ—সব মিলে মনের মধ্যে একটি ব্যাকুলতা উৎপন্ন করে।[৬৫৫]

মনে হয় করুণাশংকর ভট্টকে আগেই চিঠি লিখেছিলেন, এখানে জয়ন্তীলালের চিঠিতেও তাঁর প্রসঙ্গ বেশ খানিকটা রইল। লিখলেন :

> মাস্টারজীর শরীর ভালো আছে শুনে খুশি হলাম। লিখেছ প্রত্যেক দিন তিনি বেড়াতে চেষ্টা করেন কিন্তু তিনি যেন দুবেলা প্রতিদিন রীতিমত বেড়ান। কুসুমের আর শরীর খারাপ হয় নি তো? সে এখন শক্তিলাভ করছে? মাস্টারজীকে এবার পত্র আমি দিলাম না। তোমার পত্রখানাই দেখাবে। বরং তাঁর কাছে একটি পত্র পাওনা আছে। তাঁর কথা দুইবেলা মনে হয়—সূর্যোদয়ের আগে এবং সূর্যাস্তের পরে। বিশেষ করে তাঁর গৃহকে আমি আপন গৃহ বলে জানি। কবে আবার সেই গৃহে আমি আশ্রয় পাব তাই ভাবছি। তাঁর বাড়ির সকলকে আমার যথাযোগ্য সম্ভাষণ জানাবে।[৬৫৬]

এই-সব চিঠিতে অন্যান্য ছাত্র ও পরিচিত বন্ধুজনের নানা খবরাখবর থাকে, নিজের কোনো প্রবন্ধ বা ভাষণ মুদ্রিত হয়ে থাকলে 'অফপ্রিন্ট' পাঠাবার প্রসঙ্গ থাকে, জয়ন্তীলালের কোনো রচনা গুজরাতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে থাকলে সেটি পড়বার আগ্রহ প্রকাশ করেন। জয়ন্তীলালরা সুদূর আমেদাবাদে বসে কলকাতা বেতারকেন্দ্র ধরে তাঁর বেতারভাষণ শুনেছেন জেনে খুশি হয়ে তাঁর পরবর্তী বেতারভাষণের তারিখ জানিয়ে লেখেন :

> তোমরা আমার রেডিয়ো ব্রডকাস্ট শুনতে পেয়েছ সে খুব আশ্চর্য। ওখানকার বন্ধুবান্ধবদের বোলো যে ২৬ নভেম্বর শনিবার 7 15 p.m. স্ট্যানডার্ড টাইম আমার একটি ভাষণ আছে—বিষয় সাধক কবীরের ভক্তি। সঙ্গে হিমাংশুর গান। ওখানকার বন্ধুবান্ধবদের যেন খবর দিয়ো। বিশেষ করে আমার ছাত্র সুধীর সেনকে এবং তার কন্যা পুতুলকে বোলো। তাকে যে চিঠি এই তোমার চিঠির সঙ্গে দিচ্ছি তাও তাকে দিয়ে এসো। তাদের বাড়ি তুমি গিয়েছ—মীরজাপুর রোড firm building । এইরকম সব উপলক্ষে তোমাদের পরিচয় আরও ঘনিষ্ঠ হয় এইটা আমি চাই।[৬৫৭]

যেমন খবর পাচ্ছি, ৬ আগস্ট সন্ধ্যাবেলা শান্তিনিকেতনে বঙ্কিমচন্দ্রের শতবার্ষিকী উপলক্ষে একটি সভা হয়। রবীন্দ্রনাথের ভাষণটি আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হল 'শান্তিনিকেতনে বঙ্কিম-শতবার্ষিকী/সাহিত্য-সম্রাটের প্রতি কবিগুরুর শ্রদ্ধাঞ্জলি' শিরনামায়। এই ভাষণ পত্রিকার জন্য পরে লিখে দেন ক্ষিতিমোহন।[৬৫৮]

আলোয় অন্ধকারে

এই চিঠিতে খবর পাওয়া যাচ্ছে ২২ নভেম্বর কেশবচন্দ্র সেনের শতবার্ষিকী উপলক্ষে কলকাতায় আদি ব্রাহ্মসমাজে ক্ষিতিমোহন উপাসনা করবেন। ঠিক তার পরেই তাঁর প্রথম দৌহিত্রী রেবার বিয়ে ২৪ নভেম্বর। তার পর আবার-একটা দিন পরে 'সাধক কবীরের ভক্তি' বিষয়ে তাঁর বেতারভাষণ। এমনই নানা কাজ, নানা দায়িত্বের মধ্যে দিন কাটে ক্ষিতিমোহনের, তারই সঙ্গে মিশে থাকে পারিবারিক জীবনের ছোটোবড়ো কত ঘটনা। এই বছরেই রবীন্দ্রনাথ ভারতী সংসদ নাম দিয়ে একটি পাক্ষিক সভা স্থাপন করেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল সেখানে বিশ্বভারতীর অধ্যাপক ও বিদ্যার্থীরা মিলিত হবেন। সভার উদ্দেশ্য সংস্কৃত ভাষার বিভিন্ন বিষয় থেকে বস্তু সংগ্রহ করে মাতৃভাষায় প্রবন্ধ রচনা করতে উৎসাহদান। সভাপতি ছিলেন ক্ষিতিমোহন সেন, সম্পাদক হাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী। এ ছাড়াও এই সময়ে কবির ইচ্ছায় বিশ্বভারতীতে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে স্নাতকোত্তর বিভাগ খোলা হয়। এই বিভাগেরও অধ্যক্ষ ছিলেন ক্ষিতিমোহন। তিনজন ছাত্র নিয়ে কাজ শুরু হয়েছিল। কিন্তু ক্রমশ ছাত্রাভাবে বিভাগটি বন্ধ হয়ে যায়। ভারতী সংসদের বার্ষিক অধিবেশন হয়েছিল বেশ ভালোভাবে, রবীন্দ্রনাথ সভাপতিত্ব করেন, বার্ষিক প্রতিবেদন সংস্কৃত ভাষায় রচিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভাষণে বলেছিলেন :

> সংস্কৃতভাষায় অনভিজ্ঞ জিজ্ঞাসুর নিকট প্রাচীন ভারতের চিন্তাধারা উপস্থিত করবার নিমিত্ত সংস্কৃত-জানা ব্যক্তিগণকে মাতৃভাষায় সেতু রচনা করতে হবে। বিদেশী ভাষায় আমরা যতই বিদ্বান হই-না কেন, তাঁদের মতো হতে পারব না। আমাদের প্রাণের খোরাক আমাদেরই পিতামহগণ রেখে গিয়েছেন।

১৯৪০ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল যে, ভারতী সংসদ বিদ্যাভবনের সঙ্গে বিশ্বভারতীর অন্যান্য বিভাগের সংযোগসেতু। এও জানা যাচ্ছিল যে, এর অধিবেশনগুলি নিয়মিত অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এ-সব সত্ত্বেও ভারতী সংসদ বেশিদিন চলেনি। উৎসাহের অভাবে এর বৃহৎ সম্ভাবনা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে যায়।[৬৫৯]

ব্যর্থতা তো আছেই। ব্যক্তিগতভাবে একা ক্ষিতিমোহনের কথাই ধরি, আর সমষ্টিগতভাবে বিশ্বভারতীর কথাই বলি, সব পরিকল্পনাই সফল হবে এমন কেউ আশা করতেও পারে না, আর বাস্তবে তা হয়নিও। কিন্তু এটুকু নির্দ্বিধায় বলতে পারি, ক্ষিতিমোহন সহ বিশ্বভারতীর সেকালের সংস্কৃতজ্ঞ অধ্যাপকদের রচিত গ্রন্থতালিকায় দৃষ্টিপাত করলে বোঝা যায় ভারতী সংসদ স্থাপনের পিছনে রবীন্দ্রনাথের যে উদ্দেশ্য ছিল, সাধ্যমতো তা চরিতার্থ করতে তাঁরা চেষ্টার ত্রুটি করেননি। মাতৃভাষায় গ্রন্থরচনা করে প্রাচীন ভারতের বিবিধ চিন্তাধারার সঙ্গে দেশের সংস্কৃত-অনভিজ্ঞ সাধারণ মানুষের পরিচয় ঘটিয়েছেন।

আগেকার কালে অধ্যাপকদের মধ্যে ছুটির দিনে বা বৈকালিক অবসরে যে আড্ডা জমত, কারো কারো স্মৃতিচারণে তার ছবি ধরা আছে। প্রমথনাথ বিশী লিখেছেন দিনেন্দ্রনাথ যখন দেহলি বাড়িতে থাকতেন, তখন বিকেলবেলা বাগানে তক্তপোশ পেতে চায়ের আড্ডা বসত। সে আড্ডায় নন্দলাল বসু, সন্তোষচন্দ্র মজুমদার, অসিতকুমার হালদার, তেজেশচন্দ্র সেন প্রমুখ যোগ দিতে আসতেন।

> মাঝে মাঝে ক্ষিতিমোহনবাবুও দেখা দিতেন। শাস্ত্রী মহাশয় কখনো চা পান করিতেন না, তবু তিনি দু-দশ মিনিট দাঁড়াইয়া গল্প করিয়া 'আনন্দ করুন' বলিয়া বেড়াইতে চলিয়া যাইতেন।[৬৬০]

সে-সব এখন অনেকদিনের পুরোনো কথা হয়ে গেছে। সেই পুরোনো মানুষেরা অনেকেই এখন নেই। কেউ ছেড়ে গেছেন ইহলোক, কেউ ছেড়ে গেছেন শান্তিনিকেতন। সুতরাং অতীত দিনের ছবিটা আজ আর খুঁজতে যাওয়া বৃথা। ইতিমধ্যে ছাত্র নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিদ্যালয়ের পড়া শেষ করে যাওয়ার এক যুগ পরে ১৯৩৮ সালের শারদ অবকাশের পরে পাঠভবনে শিক্ষকতার দায়িত্ব নিয়ে শান্তিনিকেতনে ফিরে এলেন। তিনি লিখেছেন :

> আমাদের ছাত্রজীবনে দেখা আর্যাবর্তের মানচিত্রে একটি বড় পরিবর্তনের আঘাত পেলাম এবার শান্তিনিকেতনে এসে। শ্রদ্ধেয় বিধুশেখর শাস্ত্রী মশাইকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁদের সংস্কৃত শাখার প্রধান অধ্যাপক পদের জন্য নিয়ে গেছেন। গঙ্গার দেশে গঙ্গা চলে গেলেও কিন্তু যমুনার প্রবাহ সৌভাগ্যক্রমে তখনও প্রবহমান আমাদের কল্পনার আর্যাবর্তে। বিশ্বভারতী 'বিদ্যাভবন' বা গবেষণাবিভাগের অধ্যক্ষ তখন আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন। কাজের ফাঁকে অবসর

পেলেই তাঁর কাছে সেকালের লাইব্রেরি বাড়ির দোতলায় চলে যাই। বিদ্যার ক্ষেত্র ছাড়া এমন কি ব্যক্তিগত কোনো প্রশ্ন বা সমস্যা থাকলেও নিঃসংকোচে তাঁর শরণার্থী হয়েছি। তাঁর 'নিমফল'-কে তিনি ভোলেন নি জেনে বড় তৃপ্তি হল ; প্রথম দিন প্রণাম করতেই তিনি তাঁর দেওয়া সেই পুরাতন নামে সস্নেহে সম্ভাষণ করলেন।[৬৬১]

নির্মলচন্দ্রের কাছেই কলকাতার বাড়িতে তাঁর নিজের ঘরে বসে একটা গল্প শুনেছিলাম। ক্ষিতিমোহনের গল্প। তখনও রবীন্দ্রনাথ আছেন। কীসের যেন মহড়া হওয়ার কথা ছিল তাঁর সামনে, কিন্তু একদিন তাঁর শরীর খারাপ থাকায় তা হল না। নির্মলচন্দ্র উত্তরায়ণের দিক থেকে ফিরে আসছিলেন। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে তখন, পথে ক্ষিতিমোহনের সঙ্গে দেখা, তিনিও বাড়ি ফিরছেন। নির্মলচন্দ্রকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন তিনি 'সেতুবন্ধ ক্লাব' থেকে আসছেন কি না। উত্তরায়ণে তখন ব্রিজ ক্লাবে তাসের আড্ডা বসে নিয়মিত। দুজনে একসঙ্গে চলতে চলতে গুরুপল্লিতে যাওয়ার পথে বিরাট খেলার মাঠটা এসে পড়ল। বলা বাহুল্য, সেটা তখনও বেড়া-দেওয়া কেতাদুরস্ত খেলার মাঠের আকার নেয়নি। ক্ষিতিমোহনের বরাবরের অভ্যাস সেই মাঠের উপর দিয়ে বাড়ি ফেরার পথ সংক্ষেপ করা। চারদিকে এমন নিশ্ছিদ্র অন্ধকার যে নির্মলচন্দ্রের মুখ দিয়ে আপনা হতেই বেরিয়ে এল— 'এই অন্ধকারে যাবেন!' ক্ষিতিমোহন হাসলেন। হঠাৎ গল্প বলতে শুরু করলেন একটা। বেগুন ভাজছিলেন এক গৃহিণী। গোটাকতক আছে সরাসরি তেলের উপর, বাকি টুকরোগুলো তার চারপাশে কড়ার ধারে ধারে সাজানো। একবার উঠতে হল বলে ছোটো একটা মেয়েকে বসিয়ে সাবধান করে গেলেন—দেখিস যেন ধারের বেগুন তেলে না পড়ে। ছাঁকা তেলে ভাজা বেগুন গৃহকর্তাদের জন্য, বাকি টুকরোগুলো বাড়ির আর সবাইকার। সম্ভবত ভাগটা এই জাতীয় কিছু ছিল। মেয়েটা লক্ষ রাখছে—যদি একটা ধারের বেগুন তেলে পড়ে যায় অমনি চেঁচিয়ে উঠে জানান দেবে রন্ধনকর্ত্রীকে। তিনি এসে যা করতে হয় করবেন। গল্পটা এইখানেই থেমে গেল। কিছু কি ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন ছিল? অন্ধকারে ডুবে-থাকা গুরুপল্লির সঙ্গে আলো-জ্বলা উত্তরায়ণস্থিত ব্রিজ ক্লাবের কোনো তুলনা এসেছিল মনে? কে জানে। কণ্ঠস্বরে কোনো ক্ষোভ নেই, গল্প শেষ করে ক্ষিতিমোহন তাঁর অভ্যস্ত মাঠের পথে স্বচ্ছন্দে পা বাড়িয়েছেন ততক্ষণে।[৬৬২] উনষাট বছর বয়স হল তাঁর। আলো-অন্ধকারের পথ বেয়ে জীবনটা চলে তো এল অনেক দূর।

নতুন বছর এসে পড়েছিল, ১৯৩৯ সাল। এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি বাংলা বছর-শুরুর দিনটিতে সন্ধ্যাবেলায় উত্তরায়ণ প্রাঙ্গণে শান্তিনিকেতন-আশ্রমবাসীরা কবির জন্মদিনের অনুষ্ঠান করলেন। 'সভাস্থল অর্ঘ্য-পুষ্পে ও আলিম্পনে সুসজ্জিত হইয়াছিল। মাল্যচন্দনে অভিনন্দিত কবি আসনগ্রহণ করিলে পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থাদি হইতে কবি-বন্দনাসূচক মন্ত্র পাঠ করেন।' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের ভাষণের যে সারাংশ বেরিয়েছিল তার এক জায়গায় তিনি বলেছিলেন :

...মানুষের যথার্থ জন্ম হয় যখন সে পরম ক্ষেত্রে শুভমনে আপনাকে উপলব্ধি করে, প্রকাশ করে, সে নবজন্মকে দিনক্ষণ দ্বারা চিহ্নিত করা যায় না। কখন যে সে ভিতরে ভিতরে পরিপুষ্টি

লাভ করতে থাকে, তা কেউ জানে না ;....আজ এখানে যে স্তুতিমন্ত্র পঠিত হল তাতেও সেই কবিরই অভিবাদন আছে, যে কবি কল্পরথে আরোহণ করে বিশ্ব পরিভ্রমণ করেন ও অন্য সকলকে সেই পথে প্রবর্ত্তিত করেন—বিশেষ করে কোনদিন সেই কবির আগমন তা কেউ বলতে পারে না।...বাঙালা দেশের এক অখ্যাত কোণের লাজুক স্বল্পভাষী বালক আমি নিজের গৃহসীমাকে যে অতিক্রম করতে পারব তা কখনও আশাও করি নি, কল্পনাও করি নি ; কখন বিশ্বকর্ম্মা চাবি খুলে আত্মার ভিতরে প্রবেশ করে ভিতরে ভিতরে কাজ করেছেন তা জানতেও পারি নি;বিধাতার আশীর্ব্বাদে কবি রূপে যে জন্ম হয়েছে তা কোনো বিশেষ দিনক্ষণে নয়, বস্তুত সে বিশেষ দিনক্ষণ আজ নিরর্থক ;...। যে বন্ধুরা আমার কর্ম্মকে শ্রদ্ধা করেন তাঁরা আমার জন্মদিবসকে স্মরণ করে আজ যে প্রীতির অর্ঘ্য এনেছেন, স্নিগ্ধ অন্তরে তা আমি গ্রহণ করি।[৬৬৩]

এ বছর ২৫ বৈশাখ কবি আছেন পুরীতে, ক্ষিতিমোহন শান্তিনিকেতনেই আছেন। জন্মদিনের প্রণাম জানিয়ে রবীন্দ্রনাথকে তিনি চিঠি লিখেছিলেন :

Santiniketan
Visva Bharati Bengal
India
২৫ বৈশাখ ১৩৪৬

প্রণতিপূর্ব্বক নিবেদন,

আজিকার দিনে আপনাকে দূর হইতে আমার প্রণাম জানাইতেছি। আপনার কাছে আসিয়া জীবনে যাহা পাইয়াছি তাহা আজ প্রকাশ করিয়া বলা অসম্ভব। তাই আজিকার দিনে সেই সব কথার উল্লেখ না করিয়া শুধু শ্রদ্ধানত প্রণতি জ্ঞাপন করিতেছি। আপনার নিজের হয়তো প্রয়োজন নাই, কিন্তু আমাদের প্রয়োজনে এবং বহুজনের কল্যাণের জন্য দীর্ঘকাল আপনাকে ভগবান জীবিত ও সুস্থ রাখুন ইহাই প্রার্থনা করি।

শ্রদ্ধাপ্রণত
ক্ষিতিমোহন সেন[৬৬৪]

হয়তো সেদিনও আশ্রমবাসীরা সমবেত হয়ে দূরস্থিত গুরুদেবকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন, তাঁর কল্যাণপ্রার্থনায় বৈদিক মন্ত্রের ধ্বনি মিশেছিল শান্তিনিকেতনের আকাশে।

তার বেশ কয়েকদিন পরে একদিন সন্ধ্যায় শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সংঘের উদ্যোগে কলকাতায় দেশবন্ধু বালিকা বিদ্যালয়ে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে রবীন্দ্রজয়ন্তীর আয়োজন হয়েছিল। এই উৎসবে কবিতা পাঠ, রবীন্দ্রসংগীত প্রভৃতির আয়োজন ছিল, ভাষণ দেন পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন, পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী, ড. নীহাররঞ্জন রায় প্রমুখ। ক্ষিতিমোহন তাঁর ভাষণের সূচনায় রবীন্দ্রনাথ পয়লা বৈশাখ তাঁর জন্মদিনের অনুষ্ঠানে জন্মদিনপ্রসঙ্গে যা বলেছিলেন তার উল্লেখ করে পরে বলেন :

...আমাদের দেশের ইতিহাসেও দেখি, মহাপুরুষদের জন্মোৎসব ইত্যাদি অনুষ্ঠানের দিন নির্ণয় তাদের ভক্ত ও অনুরাগীরাই করেছেন, প্রকৃত জন্মতারিখের সঙ্গে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তার

কোন সম্পর্ক নেই ; এই জন্যই দেখতে পাই আমাদের ধর্ম্ম-ইতিহাসের মহাপুরুষগণ অনেকের জন্ম-উৎসব হয় পূর্ণিমাতে—তাঁরা যে সকলেই প্রকৃতপক্ষে পূর্ণিমাতেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন এ হতে পারে না। এই উৎসবের দিন তাঁদের ভক্তরাই স্থির করেছেন। যেমন নানকের বেলায় দেখি, তাঁর ভক্তগণ তাঁর জন্ম-উৎসব প্রকৃত তারিখের ছয় মাস পরে করেন।[৬৬৫]

মনে পড়ছিল তাঁর নিজের প্রথম জীবনের কথা, যখন কাশীতে প্রথম তাঁর পরিচয় হল রবীন্দ্র-সাহিত্যের সঙ্গে। সন্তসাহিত্যের সঙ্গে তার আশ্চর্য মিল লক্ষ করে অবাক হয়েছিলেন। জোর দিয়ে বললেন :

রবীন্দ্রনাথ এই সব সন্তদের রচনা পূর্ব্বে কখনও পড়েন নি, আমিই এইসব রচনার সহিত তাঁর রচনার কোন কোন স্থলে সাদৃশ্যের প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

তাঁর মতে রবীন্দ্রনাথ ভারতের মাটিতে আকস্মিক বা অস্বাভাবিক কিছু নন, এ দেশের ভাবধারার সঙ্গে তাঁর প্রাণের যোগ আছে। আগেকার কালে আমাদের দেশে মানুষকে তার গোত্র-প্রবর ঘোষণা করতে হত—

স্থানে স্থানে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর পূর্ব্বাচার্য্যগণের যে সহজ মিল এতে বোঝা যায়, রবীন্দ্রনাথ ভারতের ভাব-ক্ষেত্রে গোত্র-প্রবরহীন নন।

প্রসঙ্গাক্রমে এই দিনের ভাষণে যেমন একদিকে ক্ষিতিমোহন বলেন, কেন রবীন্দ্রনাথকে কবীরের কবিতার ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করতে হয়েছিল, তেমনই অন্যদিকে উল্লেখ করেন :

এই সাদৃশ্যের কিন্তু কুব্যাখ্যাও অনেক হয়েছে আমাদের দেশে। কাশী নাগরী প্রচারিণী সভা থেকে কবীরের রচনাসংগ্রহে এমন কথা বলা হয়েছে রবীন্দ্রনাথ সবই কবীরের কাছ থেকে নিয়েছেন। আমি পূর্ব্বেই বলেছি, আমি এই সাদৃশ্য কবির দৃষ্টিগোচর করবার পূর্ব্বে এই সকল সন্তবাণী পড়বার তাঁর কোন সুযোগই ছিল না—উভয়ের মধ্যে যে মিল কোন কোন স্থানে দেখি তা স্বভাবগত। এও আমি বলেছি যে, এই মিল সর্ব্বত্র দেখা যায় না, স্থানে স্থানে এই মিল দেখা দিয়ে তাঁর রচনার ও জীবনের ভারতবর্ষীয় পটভূমিকার কথা প্রতিষ্ঠিত করেছে।[৬৬৬]

আমরা One Hundred Poems of Kabir আলোচনা করবার সময়ও দেখব, অন্য কোনো প্রসঙ্গেও আমাদের নজরে পড়বে, এই রবীন্দ্রজয়ন্তীতে যে-সব কথা ক্ষিতিমোহন তাঁর ভাষণে উল্লেখ ও আলোচনা করেছিলেন, সে-সবই তাঁর মনের গভীর বিশ্বাসের কথা, তাঁর ভাষণে এবং তাঁর রবীন্দ্র-বিষয়ক প্রবন্ধে সে-সব কথা বার বার এসেছে। ক্ষিতিমোহন মনে করতেন রবীন্দ্রনাথের যথার্থ জীবনী লেখা অন্তত কঠিন। আর বলতেন তাঁর চিন্তা ও ভাবের যে অজস্রতা, তার খণ্ডাংশ মাত্র সাহিত্যরূপ পেয়েছে। এই দিনের ভাষণে এই দুই প্রসঙ্গও স্থান পেয়েছিল। ক্ষিতিমোহন বলেছিলেন :

তিনি অজস্র রচনা করেছেন সত্য, কিন্তু তাঁর বিপুল ভাবসম্পদের এক অংশও তিনি লিপিবদ্ধ করেন নি, এই সাক্ষ্য আমি দিতে পারি। তাঁর এই বহুমুখীনতা, এই অজস্রতার জন্যই তাঁর সত্য জীবনী লেখা সুসাধ্য নয়। সুবিদ্বান এলমহার্ষ্টসাহেব বহুকাল তাঁর সহচর ছিলেন, তাঁর মনে

বাসনা ছিল, তিনি কবির জীবনী রচনা করবেন। এইজন্য বহু বৎসর কবির সাহচর্য করে কবি যখন যা-কিছু আলোচনা করেছেন, যা বলেছেন, সব বিষয়ের অনুলিপি নিয়েছেন, তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরেছেন। অবশেষে একদিন তিনি এসে বললেন, কবির জীবনীরচনার আশা তিনি ত্যাগ করলেন—কারণ তাঁর প্রতিভার এত বিচিত্র ধারা যে, একলা তাঁর পক্ষে তাঁর সম্পূর্ণ পরিচয় গ্রহণ সহজ নয়। আর বিভিন্ন লোক মিলে এই জীবনী রচনার বিপদ এই যে, এতে সমগ্রভাবে রবীন্দ্র-জীবনের যে রূপ তার দৃষ্টি হারিয়ে ফেলবার সম্ভাবনা খুব বেশী। এইজন্যই বহুকাল রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে বাস করেও তাঁর সম্বন্ধে কিছু বলতে সঙ্কোচ বোধ করে এসেছি।[৬৬৭]

কিন্তু এবার বোধ করি বয়সের ধর্মে তাঁরও মনটা পিছনে ফিরে চাইছিল, আর রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের মতো দূরদর্শী সম্পাদকের তাগিদ ছিল বলেই মনে হয়। প্রবাসীতে ক্ষিতিমোহনের প্রবন্ধ প্রকাশিত হল 'রবীন্দ্রনাথ ও তাঁহার আশ্রম'। লেখক যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছিলেন তিন দশক আগেকার সেই ক্ষুদ্র শান্তিনিকেতন আশ্রমটিকে, দেখতে পাচ্ছিলেন তাঁর প্রথম সহকর্মীদের এবং আশ্রমগুরুকে। স্মৃতিচারণ যেমন করলেন, তার পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব ও ভাবনার নানা দিকের পরিচয় দিলেন। গভীর বিশ্লেষণধর্মী কথাও যেমন এল, তেমনই ভৃত্যদের সঙ্গে কবির সম্পর্কের কথাটাও বাদ গেল না। বনমালী, যে তখনও কবির সেবক, আদর করে যাকে কবি ডাকেন নীলমণি বা লিলমণি, তার কথাটা একটু বিশেষ করেই বললেন। একবার তাঁর জন্য শরবত নিয়ে এসে তাঁর কাছে বাইরের লোক রয়েছেন দেখে সে দরজার বাইরে ইতস্তত করছে দেখে রবীন্দ্রনাথ গেয়ে উঠেছিলেন 'হে মাধবী দ্বিধা কেন'। এই সুপ্রসিদ্ধ ঘটনাটি ক্ষিতিমোহনের এই লেখাতেই প্রথম স্থান পেল মনে হয়।* কিন্তু ক্ষিতিমোহন যেন কতকটা নিস্পৃহভাবে আর-একটি ঘটনার বিবরণ এই প্রবন্ধে দিয়েছেন, তাঁর সেই অভিজ্ঞতাটি একদিক থেকে আরও উল্লেখযোগ্য। তিনি লিখেছেন :

> সত্যাগ্রহ আন্দোলনের বহু পূর্ব্বে ১৯০৯ সালে কবি তাঁহার 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটক রচনা করেন এবং তাহার পরেই নাটকটি একাধিকবার আশ্রমে অভিনীত হয়। এই নাটকের ধনঞ্জয় বৈরাগীর চরিত্র কবির একটি অপূর্ব্ব সৃষ্টি। অবাঙালী কেহ কেহ তখন এই দুঃখ করিতেন, "অহিংস উপায়ে অন্যায়ের প্রতিকারের কথা যদি কবি তাঁহার কবিজনোচিত ভাষায় প্রকাশ করিতেন তবে বড়ই ভাল হইত।" আমি ইহাদিগকে বলিলাম, "বার বৎসর পূর্ব্বে কবি এই সব কথাই প্রায়শ্চিত্ত নাটকে লিখিয়াছেন, কাজেই এখন তাহার পুনরুক্তি না করিলেও ক্ষতি নাই, তাহা একবার দেখিতে পারেন।" তাঁহাদের মধ্যে একজন বাংলা ভালই জানিতেন। তিনি বইখানা দেখিতে চাহিলেন। কলিকাতায় এই কথাবার্ত্তা হয়। বাজারে বইটা না পাওয়ায় শ্রীযুক্ত রামানন্দবাবুর কাছ

* হে মাধবী দ্বিধা কেন। রচনাকাল ১ ফাল্গুন ১৩৩৪।

ক্ষিতিমোহন 'রবীন্দ্রনাথ ও তাঁহার আশ্রম' প্রবন্ধে লিখেছেন :

> সে বৎসর তখন শীতকাল যায় যায়, বসন্ত আসি আসি করিতেছে। বনমালীও সরবৎ হস্তে ঢুকিবে কিনা বুঝিতে না পারিয়া একটু ইতস্তত করিতেছিল। বনমালীর ভাব দেখিয়া কবির মনে হইল যেন বসন্তের সেই ইতস্ততঃভাব। মাধবী ফুল তখন এক একবার দুই একটি ফুটিতেছে আবার এক একবার প্রচণ্ড শীতে যাইতেছে মরিয়া। কবির চিত্ত ছিল সেই ভাবে ভরপুর।

> হইতে বইখানা আনিয়া তাঁহাকে দিলাম। তিনি পড়িয়া খুব খুশী হইলেন। বলিলেন "বইখানা অবিলম্বে নানা ভাষায় অনুবাদ করিতে হইবে।" বইখানা তাঁহার হাতে দিলাম। তারপর অনেকদিন পরে বইখানা আমাকে ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন, "এই বইখানার অনুবাদ হয় ইহা অনেকের অভিপ্রেত নহে।" অনুবাদ করা আর হইল না।

সন্দেহ নেই, এর চেয়ে বেশি মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন ছিল। যে মানসিকতা কাজ করেছিল ক্ষিতিমোহনের এতাদৃশ অভিজ্ঞতার পিছনে, ১৯১৯ সালে জালিয়ানওয়ালাবাগ-অঘটনের পরে রবীন্দ্রনাথের প্রতিক্রিয়ার প্রেক্ষিতে অমৃতসর কংগ্রেসে অমল হোমের অভিজ্ঞতার পিছনেও সেই মানসিকতাই ছিল। অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে যেমন 'প্রায়শ্চিত্ত' অনুবাদ করে দেখানো যায়নি কত আগে রবীন্দ্রনাথ রাষ্ট্রশক্তির সঙ্গে অসহযোগিতার পথ দেখিয়েছিলেন, তেমনই অমৃতসর কংগ্রেসে রবীন্দ্রনাথের নাইটহুড উপাধিবর্জনের সিদ্ধান্তকে অভিনন্দিত করে প্রস্তাব গ্রহণ করা যায়নি।[৬৬৮]

ক্ষিতিমোহনের কোনো কোনো প্রবন্ধ প্রকাশের সমকালেই ইংরেজিতে অনুবাদ করা হয়েছে। 'রবীন্দ্রনাথ ও তাঁহার আশ্রম' অনুবাদ করেন ক্ষিতীশ রায়, বিশ্বভারতী কোয়ার্টার্লি পত্রিকা-র মে ১৯৩৯ সংখ্যায় এবং বিশ্বভারতী নিউজ পত্রিকার জুন ও জুলাই ১৯৩৯ সংখ্যায় তা প্রকাশিত হয়। তাঁর 'ভক্ত রবিদাস' প্রকাশিত হয় শারদীয় আনন্দবাজার ১৩৪৬ সংখ্যায়, বিশ্বভারতী কোয়ার্টার্লি-তে এর অনুবাদ বেরিয়ে যায় তার আগেই, নভেম্বর ১৯৩৮-জানুয়ারি ১৯৩৯ সংখ্যায়। তাঁর মধ্যযুগীয় সন্তদের জীবনতথ্য-অন্বেষণ ও বাণীসংগ্রহের ধারা চলেছেই, তারই ফসল ফলছে একে একে। প্রত্যেক প্রবন্ধের পৃথক উল্লেখের প্রয়োজন হবে না, তাঁর গ্রন্থ ও রচনাপঞ্জি থেকেই পাঠক ধারণা করতে পারবেন। আপাতত একটু তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই 'ভক্ত রবিদাস' প্রবন্ধের সূচনার কথাগুলির দিকে।

কয়েক বছর ধরে দেশে অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ আন্দোলন চলছে। এর কর্মসূচি অনুসারে অনেক জায়গায় বর্ণহিন্দু ও অস্পৃশ্যদের একত্রে ভোজন-উৎসব প্রভৃতি হয়। সব দেবমন্দিরের দ্বার আপামর জনসাধারণের জন্য খুলে দেওয়ার দাবিতে আন্দোলন আরম্ভ হলে দেশ আলোড়িত হয়ে ওঠে। অস্পৃশ্যতা-উচ্ছেদ আন্দোলনের আবেদনে সাড়া দিয়ে শান্তিনিকেতন আশ্রমেও সংস্কার সমিতি স্থাপিত হয়েছিল। অবশ্য আশ্রমের ভিতরে তো এ সমস্যা ঠিক দেশের অন্য আর-সব জায়গার মতো ছিল না। এখানে খাবার ঘরে পঙ্‌ক্তিভেদ ক্রমে ক্রমে আপনিই উঠে গিয়েছিল অনেক দিন আগেই, তার জন্য কোনো আন্দোলনের প্রয়োজন হয়নি। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন বিভিন্ন শ্রেণির মানুষ পাশাপাশি বাস করতে করতে এ-সব খাওয়া-ছোঁয়ার বাধা ও সংস্কার ক্রমে খসে পড়ে যাবে, কোনো বিধান বাইরে থেকে আরোপ করার চেয়ে তা অনেক বেশি স্থায়ী ফল দেবে। আর আমরা তো ক্ষিতিমোহনের নিজের লেখাতেই পড়েছি যে তিনি এসে দেখেছিলেন এখানকার কাজের লোকেরা সকলেই তথাকথিত অস্পৃশ্যজাতীয়। তবুও এই সামাজিক-মানবিক আন্দোলনের শরিক হয়েছিল শান্তিনিকেতন। একবার শ্রীনিকেতনের সাংবৎসরিক উৎসবের

পরে মেলাপ্রাঙ্গণে বিকেলে অস্পৃশ্যতাবর্জনের দাবিতে এক বিরাট জনসভা হয়েছিল। চারপাশের অনেকগুলি গ্রাম থেকে অনুন্নত সম্প্রদায়ের মানুষরা সব এসে জড়ো হয়েছিলেন। সভার অন্যতম বক্তা বিধুশেখর ও ক্ষিতিমোহনের প্রতিপাদ্য ছিল অস্পৃশ্যতা হিন্দুশাস্ত্রসম্মত নয়। আর রবীন্দ্রনাথের ভাষণের একাংশে ছিল :

> আমার লজ্জা বোধ হয় যে, মানুষকে মানুষ ভালোবাসবে এই সহজ কথাটি এত শাস্ত্রপ্রমাণ ও তর্ক দিয়ে আমাদের এই দুর্ভাগা দেশকে এখনও বলতে হয়। ...আমরা যাদের অপমান করেছি বিশ্ব-মন্দিরের পূজারী তারাই। আমরা মনে করি, পাথরের দেয়াল দিয়ে ঘেরা মন্দিরে তাদের না-প্রবেশ করতে দিলে আমাদের সম্মান বজায় রইল। সে মন্দির মন্দির না কারাগার? যারা ঘণ্টা নেড়ে আচার-অনুষ্ঠান মেনে পূজা করছে, ভগবানের মন্দির থেকে নির্বাসিত তারাই।[৬৬৯]

এ-সব কয়েক বছর আগেকার কথা। এখন ক্ষিতিমোহন 'ভক্ত রবিদাস' প্রবন্ধে দেশের এই আত্মবিচ্ছেদ-সমস্যার প্রেক্ষিতে বিষয়টিকে আর-একভাবে দেখছেন। মনে হচ্ছে আন্দোলন-বিরোধীদের চেয়েও বেশি সমালোচনা প্রাপ্য আন্দোলনপক্ষীয়দেরই। পতিতোদ্ধারের মোহে যাঁরা এই-সব তথাকথিত নীচের তলার মানুষদের করুণার চোখে দেখছেন, ক্ষিতিমোহন একমত নন তাঁদের সঙ্গে।

> আজ ভারত জুড়িয়া চলিয়াছে 'হরিজন' আন্দোলন। হরিজনদের প্রতি নাকি দয়া করিতে হইবে। ক্রমাগতই শুনিতেছি "তাহারা পতিত, তাহাদিগকে 'তুলিয়া' লইতে হইবে। আমরা যদি নিতান্ত দয়া করিয়া তাহাদিগকে 'তুলিয়া' না লই, তবে নাকি তাহাদের আর কোন আশা নাই, এমনই তাহাদের দৈন্য। তাহাদের চিত্ত-দারিদ্র্য এমন ভয়ঙ্কর যে, আমরা তাহাদের কোনপ্রকারে না বাঁচাইলে তাহাদের রক্ষা নাই। তাই দয়া করিয়া আমাদের ধর্ম্মের একটু ভাগ তাহাদের দিতে হইবে, আমাদের মন্দিরের দ্বার তাহাদের কাছে একটু উন্মুক্ত করিতে হইবে, আমাদের শাস্ত্রে ও সাধনায় তাহাদের একটু অধিকার দিতে হইবে।"...
>
> এই তুমুল ধ্বনির মধ্যে কণ্ঠ মিশাইতে আমার মনে একটু সঙ্কোচ আসে। তাহার কারণ ইহা নহে যে, আমি হরিজনদের এতই হীন মনে করি যে, তাহাদিগকে উদ্ধার করা আমাদের পক্ষে অনুচিত বা অসম্ভব। আমাদের মন্দিরগুলিকেও আমি এমন মহাস্থান মনে করি না, যেখানে গেলেই হরিজনদের চৌদ্দপুরুষ একেবারে কৃতার্থ হইবে। বরং হরিজনদের মধ্যে যে-সব সাধু ও সন্ত যুগে যুগে হইয়া গিয়াছেন, আমরাই যদি তাঁহাদের যোগ্য অনুবর্ত্তী হইতে পারি তবে ধন্য হইয়া যাইব।
>
> ... মধ্যযুগে ভারতীয় সাধনার মন্দিরে তাঁহারাই তো একচ্ছত্র সম্রাটের গৌরবে বিরাজ করিতেছিলেন। তাঁহাদের আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্য্য অতুলনীয়। এই ঐশ্বর্য্য লাভ করিবার জন্যই ব্রাহ্মণোত্তম মহাগুরু রামানন্দ নিজ জাতিগৌরব জলাঞ্জলি দিলেন। ...জোলা কবীর, মুচি রবিদাস, কসাই সদনা, জাঠ ধন্না, নাপিত সেনা, ডোম নাভা, ধুনকর দাদু, রজ্জব প্রভৃতি সব মহাসাধকদের কথা কে না শুনিয়াছেন? ইহারা প্রত্যেকে যে কোন দেশের গুরু হিসাবে বন্দনীয়, তাই হরিজনদের উদ্ধার করিবার মত দম্ভ বা সাহস আমার নাই।[৬৭০]

এই 'পতিতদের' দয়া করবার, তাদের 'তুলে' নেওয়ার উচ্চমন্য আন্দোলনে মন সায় দেয় না বটে, তবে তাতে মহাত্মা গান্ধীর প্রতি তাঁর নিজের শ্রদ্ধা হ্রাস পায় না। তাই দেখতে পাই, অক্টোবর মাসে সিংহসদনের গান্ধীজয়ন্তী অনুষ্ঠানে ক্ষিতিমোহন মহাত্মাজির দীর্ঘজীবন

প্রার্থনা করছেন, তাঁকে বর্ণনা করছেন এক আদর্শ কর্মযোগীরূপে, সত্য ও অহিংস নীতির উপরে প্রতিষ্ঠিত যাঁর সাধনধারার দান ভারতীয় সাধনার ইতিহাসে চিরদিন অনন্য বলে পরিগণিত হবে।

পৌষমেলার পরে আর-এক দায়িত্ব এসে পড়েছিল। ৩০ ডিসেম্বর উত্তরায়ণে নন্দিনীর বিবাহ-অনুষ্ঠান হল, বিধুশেখর ও ক্ষিতিমোহন পৌরোহিত্য করলেন। কয়েকদিন আগে মেদিনীপুর যেতে হয়েছিল। সেখানে বিদ্যাসাগর-স্মৃতিমন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করবার জন্য স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। ১৫ ডিসেম্বর তিনি সকালের গাড়িতে কলকাতায় এলেন। তাঁর সঙ্গে আসেন ক্ষিতিমোহন সেন, অমিয় চক্রবর্তী, কৃষ্ণ কৃপালনী, অনিল চন্দ, সুধাকান্ত রায়চৌধুরী, সজনীকান্ত দাস। সেদিনই খাদ্য ও পুষ্টি প্রদর্শনীর উদ্‌বোধন করেন রবীন্দ্রনাথ, তার পর মেদিনীপুর যাত্রা করেন। আচার্য যদুনাথ সরকার, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ অনেকেই কবির সঙ্গে ছিলেন, ছিলেন অমিয় চক্রবর্তী ও ক্ষিতিমোহনও। রাত্রি প্রায় দশটার সময় তাঁরা মেদিনীপুর পৌঁছোলে স্টেশনে বিরাট জনতা ও জেলার বিশিষ্ট ব্যক্তিরা কবিকে স্বাগত জানালেন।[৮৭১] পরদিন সকালে বিদ্যাসাগর-স্মৃতিমন্দির উদ্‌বোধন-অনুষ্ঠানে অন্যতম বক্তা ছিলেন ক্ষিতিমোহন। তিনি যে ভাষণ দেন পরে তার লিখিতরূপ প্রবাসীতে 'বিদ্যাসাগরের মেদিনীপুর' নামে প্রকাশিত হয়। পরের দু-দিনে বেশ কয়েকটি সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়, তা ছাড়া মহিলা ও ছাত্রদের আয়োজিত একটি সভায় কবি ভাষণ দিয়েছিলেন। ক্ষিতিমোহন এ-সব সভায় উপস্থিত ছিলেন বলেই তো মনে হয়।

একটি চিঠি উদ্ধৃত করি, পৌষ উৎসবের পরে ইংরেজি নতুন বছরের গোড়ার দিকে লেখা। ক্ষিতিমোহন জয়ন্তীলাল আচার্যকে লিখছেন :

Santiniketan (Birbhum)
15.1.'40

প্রীতিভাজনেষু

তোমার দুইখানি পত্র আমার কাছে বহুদিন হতে উত্তরের প্রতীক্ষা করিতেছে। নানা বিঘ্ন বহু কাজ, সময় পাই না। তারপর ৭ই পৌষের উৎসব গেল। তার পরেই এল রথীন্দ্রবাবুর পালিতা কন্যা পুপের বিবাহ। সেই বিবাহে শ্রীযুত মহামহোপাধ্যায় বিধুশেখর শাস্ত্রী ও আমি এই দুইজনে প্রাচীন বৈদিক মন্ত্রের দ্বারা বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিয়াছি। বরপক্ষ বোম্বাইবাসী, কচ্ছের ভাটিয়া, খুব ধনী। তবে প্রাচীন মন্ত্রের অনুষ্ঠান তাহাদের কেমন লাগলো তাহা জানি না। মুখে তো খুব ভালই বল্লেন। সঙ্গে তাঁহাদের দুইজন পন্ডিত ছিলেন, তাঁহারা যেন খুব সন্তুষ্ট হয়েছেন বোঝা গেল।

তোমার শিশুদের জন্য লেখা ভালই মনে হোলো। তবে আমি তো এই বিষয়ে authority নহি। লিখতে লিখতে এই বিষয়ে ক্রমে তোমার উন্নতি হবে। তবে প্রধান কথা, ঐ শিশুদের জন্য তোমার চাই হৃদয়ের গভীর প্রীতি। তাহা যদি না থাকে তবে শুধু খ্যাতি বা অর্থের জন্য লিখলে কখনও শ্রেষ্ঠতা লাভ করবে না, এ আমি বলে দিতে পারি।

আমার লেখা সবই প্রবাসীতে, আনন্দবাজার পত্রিকায় দোল সংখ্যা বা পূজা সংখ্যায় বা বিশ্বভারতী ম্যাগাজিনে বাহির হয়েছে। তুমি বনবিহারীকে নিয়ে যদি বাংলা গ্রন্থালয়ে গিয়ে কয়

বৎসরের লেখা দেখ তবেই পাবে। গত বৎসরের আগে পূজায় দেশ সংখ্যাতেও বাহির হইত। যুগান্তরের পূজা সংখ্যাতেও হইয়াছে। এবার আর দেশ বা যুগান্তরে পূজা সংখ্যায় লিখি নাই।

এবার মাস্টারজীর বাড়ী নতুন স্থানে হয়েছে শুনে বড় সুখী হলাম। তার ঠিকানা বুঝিলাম না যাহা লিখিয়াছ। তাহা কি স্বস্তিক সোসাইটি, নবরঙ্গাপুরা? (Swastika Society, Navarangapura ?) এটা ঠিক হোলো কিনা লিখিবে। মাষ্টারজীর পত্র পাইয়াছি তাঁহাকে বলিবে নন্দবাবু এখন ছাত্রদের লইয়া excursion করিতে গিয়াছেন। শীঘ্রই আসিবেন। তাঁহাকে তিনি যেন সোজাসুজি (directly) পত্র লেখেন। আমরা বলিলে কিছু ফল হয় না।

বহুদিন মাস্টারজীকে দেখি নাই। মনটা দেখিবার জন্য ব্যাকুল। দূর তো কম নহে। আর এখন তো কাজ চলিতেছে, গ্রীষ্মের বন্ধে যাওয়া যায় না, এত গরম। একমাত্র ভাবিতেছি যদি আগামী পূজার বন্ধে যাইতে পারি। তাহারও তো বহু বিলম্ব। এখানে এবার আমার কাজ সমাপ্ত হইবার কথা—কারণ এখানে ৬০ বৎসর বয়সে age restriction আছে। যদি আমাকে ছাড়ে তবে তাঁহাদের কাছে যাওয়া সহজ হইবে।

গুরুদেব না বলিলে যে আমি কিছুই করিতে বা ছাড়িতে পারি না, এই তো মুস্কিল। তাঁহাকে ও তাঁহার পত্নীকে আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার। শ্রীমতী কুসুম, চন্দ্রকান্তভাই, দীনবন্ধুভাই ও শ্রীমতী দেবীবেনকে সস্নেহ শুভ সম্ভাষণ দিবে।

গোর্ধনভাই এখন কেমন আছেন? ক্রমে কি উন্নতি হইতেছে? জয়ন্তভাই কবে আসিতে পারিবে? আমার প্রীতিসম্ভাষণ ও আবোগ্য কামনা তাঁহাকে জানাইবে। তাঁহার ঠিকানা কি? এবাব নন্দবাবুর সঙ্গলাভ করিয়া সুখী হইয়াছ জানিয়া আমি সুখী হইয়াছি।

মল্লিকজীকে তোমার নমস্কার দিয়াছি। তাঁহার প্রীতি জানিবে। তোমরা উভয়ে ও তোমার শিশু আমার স্নেহসম্ভাষণ জানিবে। তোমার মাতাকে নমস্কার জানাইবে। আমার স্ত্রীরও শুভাশীর্বাদ জানিবে। তিনি ও সকলে কুশলে আছি। গুরুদেব ভালই আছেন, তবে ক্রমে বৃদ্ধ হইতেছেন, শক্তি কমিতেছে—শরীরের শক্তি, মনের শক্তি যথেষ্ট আছে। এখনও তাঁর ধ্যান ও অধ্যাত্ম দৃষ্টি দিন দিন গভীরতর হইতেছে। এখানে কুশল। তোমাদের কুশল চাই।

শুভার্থী

ক্ষিতিমোহন সেন[৬৭২]

মাষ্টারজীর পত্রখানা তাঁহাকে দিবে।

বিশ্বভারতীর বিদ্যাচর্চা ও গবেষণার দুটি সর্বোচ্চ বিভাগ বিদ্যাভবন ও চিনাভবন। এই দুই ভবনে যথাক্রমে ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী ও অধ্যাপক তান-য়ুন-সানের পরিচালনায় বৃহদর্থে প্রাচ্য মহাদেশের এবং বিশিষ্টার্থে ভারতের সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় ইতিহাস বিষয়ে মূল্যবান গবেষণা চলে। দুটি বিভাগই বার্ষিক আর্থিক অনুদানের উপর নির্ভরশীল। প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করে তহবিল গড়তে না-পারলে যে-কোনো সময় মহামূল্য এই বিভাগ দুটির ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়বার আশঙ্কাটা সব সময়ই লেগে থাকে।[৬৭৩] অর্থচিন্তা এখনও বিশ্বভারতীর নিত্যসঙ্গী। তবে এ-সব ভিতরকার কথা। এদিকে আবার প্রায়ই গণ্যমান্য অতিথিদের আগমন ঘটে। যেমন চিন থেকে বৌদ্ধ মহাপন্ডিত তাইসু (Ven. Tai Hsu)-র নেতৃত্বে একটি শুভেচ্ছা-মিশন ভারতশফরে এসে শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন ১৭ জানুয়ারি। তার পিছনে প্রধান উদ্যোগ ছিল অধ্যাপক তান-য়ুন-সানের।

সেদিন বিকেলে আম্রকুঞ্জে সংবর্ধনাসভায় তাঁদের অভিনন্দন জানালেন রবীন্দ্রনাথ। পরদিন ১৮ জানুয়ারি পণ্ডিত তাইসু বৌদ্ধধর্ম ও দর্শনের কয়েকটি মূল বিষয় নিয়ে আলোচনা করলেন বিশ্বভারতী আয়োজিত সভায়। সেই সভায় সভাপতিত্ব করলেন আচার্য ক্ষিতিমোহন। ১৯ জানুয়ারি চিনাভবনে চিন-ভারত সাংস্কৃতিক সমিতির উদ্যোগে বৌদ্ধ শুভেচ্ছা মিশনের বিশিষ্ট অতিথিদের এবং শিল্পী জ্যু পেয়োঁকে এক চা-চক্রে আপ্যায়িত করা হয়। রবীন্দ্রনাথ, অ্যান্ডরুজ, ক্ষিতিমোহন এবং বিশ্বভারতীর বিশিষ্ট মানুষেরা সকলেই উপস্থিত ছিলেন।[৬৭৪] এর ঠিক পরেই ছিল মহর্ষিদেবের মৃত্যুবার্ষিকী। সকালে মন্দিরে উপাসনা পরিচালনা করলেন ক্ষিতিমোহন। মহর্ষির সাধনার বিশেষত্ব কোথায় সে কথাটি বোঝাবার চেষ্টা করলেন। বললেন তিনি বাস্তববিমুখ হয়ে নিজের মুক্তি চাননি। এই শান্তিনিকেতন তাঁর ধর্মানুশীলনের ক্ষেত্র। অনন্তের সন্ধানী যে মানুষ, আজও তিনি এই পুণ্যভূমিতে মহর্ষির সাধনার দ্বারা অনুপ্রাণিত হবেন। আমরা যারা এই শান্তিনিকেতনে বাস করবার সুযোগ লাভ করেছি, আমাদের কর্তব্য আমাদের জীবনের বিভিন্ন দিকে তাঁর অন্তরের বাণীকে মূর্ত করে তোলা। বিকেলে ছাতিমতলায় তাঁর সভাপতিত্বে মহর্ষিস্মরণসভার অনুষ্ঠানে দেবেন্দ্রনাথের লেখা থেকে পাঠ করা হল, অধ্যাপকরা তাঁর জীবনকথা আলোচনা করলেন।[৬৭৫]

নানা ঘটনা

১৭ ফেব্রুয়ারি গান্ধীজি ও কস্তুরবা এলেন, সঙ্গে তাঁদের মহাদেব দেশাই ও পিয়ারীলাল। তাঁদের অভ্যর্থনা জানাতে স্টেশনে উপস্থিত ছিলেন ক্ষিতিমোহন, রথীন্দ্রনাথ ও অনিলকুমার চন্দ। বিকেলে আম্রকুঞ্জের সংবর্ধনাসভায় গান্ধীজি অল্প যে-কয়টি কথা বলেন, তার গোড়াতেই ছিল অ্যান্ডরুজের প্রসঙ্গ, তিনি কলকাতার হাসপাতালে রোগশয্যায় শুয়ে। তখনও বোধ হয় এ আশঙ্কা কেউ করেননি যে অ্যান্ডরুজ আর থাকবেন না তাঁদের মধ্যে।[৬৭৬] ১৮ ফেব্রুয়ারি সকালে গান্ধীজি শান্তিনিকেতন-বিশ্বভারতীর সব বিভাগ দেখলেন ভালো করে, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন : তিনি পুরোনো কর্মীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন এবং 'ক্ষিতিমোহন সেন, নন্দলাল বসু, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির কাজকর্ম বিশেষভাবেই দেখিলেন।' সন্ধ্যায় গিয়েছিলেন শ্রীনিকেতনের গ্রামসেবার কাজ, শিক্ষাসত্র ও শিল্পসদন দেখতে। উত্তরায়ণ-প্রাঙ্গণে 'চণ্ডালিকা' অভিনয় দেখলেন তন্ময় হয়ে। সেইদিনই রবীন্দ্রনাথ তাঁকে একটি চিঠি লেখেন, ১৯ ফেব্রুয়ারি তিনি শান্তিনিকেতন থেকে বিদায় নেওয়ার আগে সেটি তিনি তাঁর হাতে দেন। রবীন্দ্রোত্তর কালে শান্তিনিকেতন-বিশ্বভারতীর ভবিষ্যৎ নির্ধারণে এই চিঠির ভূমিকা সামান্য ছিল না। এই বিদ্যায়তন যে কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হল, গান্ধীজিকে লেখা রবীন্দ্রনাথের এই চিঠিতে তার সম্ভাবনার বীজ সুপ্ত হয়ে রইল।

২৯ ফাল্গুন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের শতবার্ষিকী পালিত হল।[৬৭৭] তার পর এল বসন্তোৎসব। এই শেষবারের মতো কবি যোগ দিলেন এই উৎসবে। এর পরেই অ্যান্ডরুজ সাহেবের মৃত্যুসংবাদ যখন এসে পৌঁছোল, ক্ষিতিমোহন তখন উপস্থিত নেই শান্তিনিকেতনে। ঢাকায় গিয়েছিলেন, সেইখানেই বেতারযোগে হঠাৎ খবরটা জানতে পারলেন। ওই দিনই অ্যান্ডরুজের প্রয়াণ উপলক্ষে ক্ষিতিমোহনের একটি কথিকা ঢাকা বেতারকেন্দ্র থেকে সম্প্রচারিত হয়। সদ্যপ্রয়াত বন্ধুর কথা বলতে গিয়ে সেই প্রায় সাতাশ-আটাশ বছর আগেকার দিনগুলো মনে পড়ছিল ক্ষিতিমোহনের. অ্যান্ডরুজ যখন প্রথম শান্তিনিকেতনে এলেন। ক্রমে আরও অনেকের মতো তাঁর সঙ্গেও বন্ধুত্ব হয়ে গেল। ভারতের নানা বিষয় নিয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনা হত। দেখতেন ভারতীয় প্রাচীন মহত্ত্বের প্রতি কতখানি শ্রদ্ধা তাঁর, কত সাদাসিধা তাঁর নিজের জীবন। এবারও খ্রিষ্টোৎসবে তাঁর সঙ্গে একত্রে উপাসনা করেছেন মন্দিরে, তাঁর মুখে শুনেছেন খ্রিষ্টজীবনকথা, খ্রিষ্টীয় ভক্তপরিবারে জন্মে, মায়ের কোলে বসে সেই মহামানবের জীবনকাহিনি শুনতে শুনতে বড়ো হয়েছেন অ্যান্ডরুজ, যা তাঁর সমস্ত সত্তার সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছিল। তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়ে বললেন তাই :

> তিনি কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন না, খ্রীষ্টের মতই তিনি ভগবানের লোক—সেই সূত্রে প্রাচীন আধুনিক সকল দেশের সকল ভক্তেরই অনুরাগী। খ্রীষ্টের নামে তাঁর হৃদয় নিয়ত প্রণত, খ্রীষ্টভক্তদের চরিতকথা বলতে বলতে তিনি তন্ময়। অথচ হিন্দু সাধকদের কথা তিনি গভীর শ্রদ্ধাসহ শুনেছেন। ভারতীয় সাধনার প্রতিমূর্ত্তি দ্বিজেন্দ্রনাথের চরণতলে তিনি আসীন, মুসলমান সাধক জাকাউল্লা সাহেব তাঁর পরম শ্রদ্ধার মানুষ। এমন লোককে বিশেষ কোনো সাম্প্রদায়িক পরিচয়ে চিহ্নিত করতে গেলে ভুল হবে।[৬৭৮]

আর-এক বন্ধুও এর কিছুদিনের মধ্যে শান্তিনিকেতনে হঠাৎ মারা গেলেন—কালীমোহন ঘোষ। বয়সে তিনি ক্ষিতিমোহনের চেয়ে ছোটো. তাঁরই সঙ্গে পরিচয়ের সূত্র ধরে রবীন্দ্রনাথের আহ্বান গিয়ে পৌঁছেছিল ক্ষিতিমোহনের জীবনে। বন্ধুকে স্মরণ করে তিনি লিখেছিলেন প্রবন্ধ 'কালীমোহন স্মৃতি'।

জীবনেরই ধর্ম এই মৃত্যু, এই বিয়োগবেদনা। তাকে অতিক্রম করে প্রাণপ্রবাহের ধারাটি বয়ে চলে তার নিজস্ব ছন্দে। ১৪ এপ্রিল বাংলা নববর্ষের দিন যথানিয়মে বর্ষবরণ ও কবির জন্মদিনের অনুষ্ঠান হল। তাঁর আয়ু স্বাস্থ্য ও কল্যাণকামনায় ক্ষিতিমোহন-কণ্ঠে উদ্গীত হল বৈদিক মন্ত্র।[৬৭৯] এ কথা সকলেই অনুভব করতে পারছেন 'রবিপ্রদক্ষিণপথে জন্মদিবসের আবর্তন হয়ে আসে সমাপন'। বেশ কিছুদিন আগে ক্ষিতিমোহন ব্যথিত মনে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন : 'এখানে গুরুদেব ভাল আছেন। যদিও তাঁর শরীর খুব দুর্বল। কাজকর্ম বিশেষ করতে পারেন না'।[৬৮০] তবু তার পরেও তো নয়-নয় করে কত কাজ করা হল। সৃজনের সরণিতে রথ চলাও বা থামল কই। সেই চিঠিটাও তো দেখেছিলাম যেখানে ক্ষিতিমোহন লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথের দেহের শক্তি কমলেও মনের শক্তি কমেনি। কবির নিজের মনের কথাটা হল : 'ক্লান্ত দশা রয়েচেই, কলম সত্যাগ্রহ করতে চায়। কান মলে

কাজ করাই—কিন্তু কর্মবিমুখতা লঙ্ঘন করা বড় কষ্টকর।'[৬৮১] আজকাল দেহটাও সত্যাগ্রহ করছে, তা সত্ত্বেও এবারও নববর্ষদিনে সকালে মন্দিরে পৌরোহিত্য করেছিলেন, আম্রকুঞ্জে অপরাহ্নে সুসজ্জিত বেদিতে এসে বসেছিলেন তাঁর জন্মদিনের অনুষ্ঠানে। সংবর্ধনা গ্রহণ করে 'রাজা' নাটকের একাংশ পাঠ করেছিলেন।[৬৮২]

গ্রীষ্মাবকাশে সম্ভবত ক্ষিতিমোহন গিয়েছিলেন দেশের বাড়িতে। তার আগের খবর যেটুকু পাচ্ছি, কলকাতায় ভবানীপুর ব্রাহ্মসম্মেলনসমাজে ব্রাহ্মযুবসংঘ আয়োজিত রবীন্দ্রজন্মোৎসবে তিনি যোগ দিয়েছেন। বিধুশেখর শাস্ত্রীর সভাপতিত্বে সভা, ক্ষিতিমোহন বক্তা। ইদানীং মধ্যযুগীয় সন্তসাহিত্যের সঙ্গে রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভাবগত সাদৃশ্যের দিকটা বিশ্লেষণ করতে আগের চেয়ে যেন বেশি আগ্রহবোধ করছেন। এই সভাতে বলছিলেন আমাদের দেশে উপনিষদের যুগ থেকে মধ্যযুগ পর্যন্ত একই ভাবের ধারা প্রবাহিত হয়ে এসেছে, রবীন্দ্রনাথ নিজের অগোচরে সেই ভাবের ধারাকেই পুষ্টি জুগিয়ে আসছেন।[৬৮৩] এর পর ক্ষিতিমোহনকে আর-একটি যে অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে দেখি তা হল নারায়ণগঞ্জের সাহিত্য-সমিতির রবীন্দ্রজয়ন্তী। ১৫-১৬ জুন সেখানে খুব সমারোহ করে তাঁরা এই অনুষ্ঠান করলেন। দ্বিতীয় দিনে সকালের অধিবেশনে "বিশ্বভারতীর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন 'মধ্যযুগের পরিচয়' সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন।" আর সন্ধ্যায় তাঁর পৌরোহিত্যে যে অধিবেশন হল তাতে "সভাপতি মহাশয় 'রবীন্দ্র জীবনকথা' আলোচনায় সভায় প্রচুর হাস্যরস ও আনন্দের সৃষ্টি করেন।"[৬৮৪]

ছুটির শেষে আবার শান্তিনিকেতন, বিশ্বভারতীর কাজ আরম্ভ হয়েছে। ১৯ জুলাই তারিখটি ভগবান বুদ্ধ কর্তৃক নির্বাণধর্ম প্রচারের প্রথম দিবসরূপে উদ্‌যাপিত হল। সকাল সাতটায় এই উপলক্ষে মন্দিরে বিশেষ উপাসনা। সংবাদপত্রের খবর : 'উপাসনায় পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন আচার্যের কাজ করেন। চিনাভবনের অধ্যাপক তান ইয়েন সান একটি প্রাঞ্জল বক্তৃতায় ভগবান বুদ্ধ কর্তৃক প্রথম প্রবর্তিত ধর্ম্মচক্রের মর্ম্মার্থ ব্যাখ্যা করেন।'[৬৮৫] কিছুদিন পরে শ্রীনিকেতনের মেলাপ্রাঙ্গণে হলকর্ষণ উৎসবের দিনে রবীন্দ্রনাথের অনুপস্থিতির কারণে ক্ষিতিমোহন ব্যাখ্যা করলেন এই উৎসবের তাৎপর্য। শ্রোতাদের মধ্যে চারপাশের গ্রামের অধিবাসীরাই সংখ্যায় বেশি। ক্ষিতিমোহন বললেন, পৃথিবীমায়ের কাছে আমাদের তো ঋণের শেষ নেই, মাঝে-মধ্যেও সেটা স্মরণ করা কর্তব্য। আজ যখন চারদিকে প্রচণ্ড খরা, তখন আরও বেশি কৃতজ্ঞতায় এ কথা মনে করতে হবে সভ্যতার সেই প্রথম যুগ থেকে এই মাটি অপর্যাপ্ত ভালোবাসার দানে তার সন্তানদের বাঁচিয়েছে। ভাইয়ে ভাইয়ে আজ যে এই হানাহানি, এও মাটির সঙ্গে মানুষের প্রাণের বন্ধন ছিন্ন হওয়ার পরিণাম। মাটির সঙ্গে পূর্বসম্পর্ক আবার যদি গড়ে না তুলি, যদি আরও দূরে সরে যাই, তবে এক ছিন্নমূল অস্তিত্বের সর্বনাশে আমাদের পড়তে হবে।[৬৮৬] অথর্ববেদের মহীসূক্ত-র মন্ত্রগুলি একে একে উচ্চারণ করে তাদের বাংলা অর্থ ব্যাখ্যা করেছিলেন প্রসঙ্গত। সেই মূল মন্ত্রগুলি বঙ্গার্থ সহ 'পৃথিবীর স্তব' নামে একটি রচনায় সংকলিত করলেন। প্রবন্ধের সূচনায় বলেছিলেন :

প্রায় চারি হাজার বৎসর পূর্ব্বে যখন বৈদিক ঋষিরা দেবতা ও স্বর্গের স্তবগানেই নিবদ্ধ তখন আথর্বণ ঋষি এক অপূর্ব্ব সত্য উচ্চারণ করিলেন। তিনি বলিলেন, "কেন কল্পিত স্বর্গ ও দেবতাদের স্তবগান করিয়া বৃথা মরিতেছ? তোমার নিকটে তোমার পায়ের নীচে এই যে পৃথিবী, ইনিই তো যথার্থ মাতা। এই মাতা তো মিথ্যা বা কৃত্রিম নন। ইনি পরম সত্য পরম আশ্রয়। ইঁহাকে উপেক্ষা করিয়া স্বর্গের জন্য যে ব্যাকুলতা তাহার কোনই অর্থ নাই।"

"আমাদের মাতা অপেক্ষাও পৃথিবী অধিকতর মাতা। পৃথিবী আমাদের মাতৃতমা। মায়ের ঋণই তো শোধ হয় না, পৃথিবীর কাছে আমরা যে আরও ঋণী। পৃথিবীমাতার কোলেই আমাদের জন্ম। যত বড়ই হই না কেন, এই মায়ের কোলের বাহিরে যাওয়ার উপায় নাই। পৃথিবীমাতার স্তন্যরস যে অন্ন, তাহাই আমাদের শেষদিন পর্য্যন্ত সাথী। পৃথিবীমাতার স্নেহের অন্ত নাই, ইঁহার ঋণ অপরিশোধনীয়।"

এই সব কারণেই আথর্বণ ঋষিরা স্বর্গের পরিবর্ত্তে পৃথিবীর মহিমা গান করিলেন, (অথর্ব ১২,১) দেবতার পরিবর্ত্তে মানুষের মহত্ত্বের স্তবগান করিলেন (অথর্ব ১০, ২ ; ১১, ৮)। মানবের কামনা ও আকাঙ্ক্ষা প্রেম-প্রীতি তাঁহারা একটুও উপেক্ষণীয় মনে করিলেন না।[৬৮৭]

৭ আগস্ট ১৯৪০, যেদিন শান্তিনিকেতনের সিংহসদনে রবীন্দ্রনাথকে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্মানিক ডক্টর অব লিটারেচার উপাধিপ্রদান অনুষ্ঠান হল, সেদিন ছিল বুধবার। সকালবেলায় মন্দির-উপাসনা কবি নিজেই করলেন। শরীর তাঁর ভালো নয়, চলাফেরা করতে অসুবিধা হয়, খুব ক্লান্তবোধ করেন, সন্ধ্যাবেলা রোজই জ্বর হয়। তবু তাঁর আশ্চর্য জীবনীশক্তি তাঁকে এখনও প্রাণিত করে, মন্দির-উপাসনার মতো অনুষ্ঠান থেকে দূরে রোগশয্যায় বন্দী হয়ে থাকতে দেয় না। বিশ্ববিশ্রুত বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ সমাবর্তন অনুষ্ঠানের মতো ঘটনায়, গণ্যমান্য দেশি-বিদেশি অতিথিদের আগমনে স্বভাবতই আশ্রমজীবন বেশ খানিকটা আলোড়িত হয়ে ওঠে। ব্যাপারটা মিটে যেতে আবার তার নিস্তরঙ্গ শান্ত দিনগুলো ফিরে এল। কবি থাকেন এখন উদীচীর দোতলায়। বিকেলে খোলা বারান্দায় আরামচৌকিতে এসে বসেন, বেশ রাত পর্যন্তই বসে থাকেন। সূর্যাস্তের পরে আপন আপন কাজের অবকাশে ক্ষিতিমোহন নন্দলাল প্রমুখ আশ্রমের অনেকেই দেখা করতে আসেন। আজকাল পাছে গুরুদেবের শরীরের কোনো ক্ষতি হয়, সেজন্য এঁরা যখন-তখন আসেন না, থাকেনও সময় মেপে। একদিন তিনি এইরকমই বসে নির্মলকুমারী মহলানবিশের সঙ্গে কথাবার্তা বলছিলেন। আলোচনা হচ্ছিল পুজোর সময় গিরিডি গেলে কেমন হয়। এমন সময় ক্ষিতিমোহন এসে বসলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বললেন কেন এবার পাহাড়ের বেশি ঠান্ডায় না-গিয়ে ছোটনাগপুর অঞ্চলে যেতে তাঁর ইচ্ছা করছে। জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি তো নানা জায়গায় ঘুরে বেড়ান, বলুন তো কোথায় গেলে ভালো হয়। ক্ষিতিমোহন বললেন, আমার মনে হয় রাজগিরে গেলে বোধ হয় আপনার সবচেয়ে উপকার হত। সুন্দর জায়গা, শুকনোও বটে, যাওয়াও কষ্টসাধ্য নয়। ওখানকার স্প্রিং ওয়াটারে স্নান করতে পারতেন যদি, শরীরের গ্লানি কমে যেত। আমি তো দেখেছি ওখানে গিয়ে অনেকের খুব উপকার হতে। শুনে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, দেখি রথীদের কাছে একবার বলে, ওরা কী মনে করে। পাহাড়ে যেতে এবারে আমার একটুও ইচ্ছে করছে না।[৬৮৮]

এইখানে ক্ষিতিমোহনকে সস্ত্রীক চা-পানের নিমন্ত্রণ জানিয়ে রবীন্দ্রনাথের নিজের ঈষৎ দুর্বল হস্তাক্ষরে লেখা ৪ সেপ্টেম্বরের একটা চিঠি যোগ করি :

ওঁ "Uttarayan"
Santiniketan. Bengal.

অদ্য পারাহ্নিক চা-রসচক্রে আচার্য শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন শাস্ত্রীর সস্ত্রীক আগমন প্রার্থনা করি। দয়া করিয়া অনুচর পরিচারিকা বর্জন করিবেন। ৩-১৫ মিনিটের পর দ্বার রুদ্ধ হইবে।[৬৮৯]
৪ঠা সেপ্টেম্বর ১৯৪০

'দেশ' পত্রিকায় পত্রসংকলক টীকায় বলছেন : 'বর্তমানে নিমন্ত্রণপত্রের রূপ কেমন পরিবর্তিত হচ্ছে এই নিয়ে অল্পদিন আগেও ক্ষিতিমোহনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কথা হয়। সেই ধারার সঙ্গে তাল মিলিয়েই রবীন্দ্রনাথ ক্ষিতিমোহনকে এই পত্রটি লিখেছিলেন।' হবে হয়তো বা, তখনও অন্তরঙ্গজনদের সঙ্গে তাঁর কী নিয়ে যে আলাপ-আলোচনা চলত আর না-চলত তার তো আর সম্পূর্ণ হদিস করা যায় না। এ হয়তো তারই এক নজির। কিন্তু এ আমন্ত্রণপত্রের সঙ্গে 'ল্যাবরেটরি' গল্প পড়ে শোনানোর দিনের যোগটাও অনুমান না-করে পারছি না। এই গল্প পড়ার প্রসঙ্গ আছে নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লেখা মীরা দেবীর এক চিঠিতে :

বাবা কাল সেই গল্পটা পড়লেন. কয়েকজনমাত্রকে ডাকা হয়েছিল। বাবা বিশেষ করে বলে দিয়েছিলেন যে এর বেশী লোক এলে আমি পড়ব না। নন্দবাবু, ক্ষিতিবাবু, মল্লিকজি, কৃষ্ণ, বুড়ি, সুধীরাদি, ঠান্‌দি, রানী ও অনিলবাবু এবং সুধাকান্ত। সুধাকান্তের স্ত্রীলিঙ্গের পরিবর্তে সুধীর কর উপস্থিত ছিলেন। পাঠান্তে অল্প চায়ের আয়োজন ছিল বাবার ঘরে। মেঝেতে সতরঞ্জি পেতে দেওয়া হয়েছিল, সেইখানে বসেই চা খাওয়া হ'ল। চা-টা কিছু জমে নি। কাল গল্প পড়ার নামে সকাল থেকে বাবা ভয়ানক নার্ভাস হয়েছিলেন, তাই ভয়ে সবার মুখ শুকিয়ে ছিল। সামান্য জিনিস নিয়ে বাবা যে এখন এত nervous হন—এ রকম কাণ্ড আমি এই প্রথম দেখলুম। ...কে আসবে না আসবে তা নিয়ে সকাল থেকে কতবার যে কতরকম মত বদল হ'ল।[৬৯০]

এই গল্পপাঠ-আসরের বর্ণনা মীরা দেবীর প্রতিমা দেবীকে লেখা চিঠিতেও আছে, তিনি তখন কালিম্পঙে। সে চিঠির একটুখানি উদ্ধৃত করছি :

বাবা এমন ইরিটেটেড মেজাজে ছিলেন, পড়া শেষ না-হওয়া পর্যন্ত যে-কটি আমরা উপস্থিত ছিলুম গল্প পড়ার সময় ভয়ে সব জুজু হয়ে বসে, কারোর মুখে হাসি নেই বা কথা নেই। উপরে গিয়ে চারিদিক তাকিয়ে মনে হল যেন আসামীরা কোর্টে হাজিরা দিতে এসেছে, এখন মনে করতে হাসি পাচ্ছে।[৬৯১]

৩০ সেপ্টেম্বর আশ্রমে গান্ধীজির সত্তর বছরের জন্মজয়ন্তী পালন করা হল। সভায় মার্জোরি সাইকস ও উপেন্দ্রনাথ দাস বক্তা, সভাপতির আসনে আছেন ক্ষিতিমোহন। গান্ধীজির সংস্পর্শে এসে এবং ভারতীয় মধ্যযুগের সন্তদের জীবন ও সাধনার চর্চা করে ক্ষিতিমোহন বহুদিন থেকেই নিশ্চিত করে বুঝেছিলেন যে, এই প্রাচীন দেশের সাংস্কৃতিক

ও আধ্যাত্মিক ইতিহাসের পথ বেয়ে সত্যানুসন্ধানীদের যে দীর্ঘ শোভাযাত্রা চলে এসেছে, গান্ধীজিও সেই পথেরই যাত্রী। তিনি যে একজন রাজনীতিক এটা আকস্মিক একটা ব্যাপার মাত্র, আসল পরিচয়ে তিনি তপস্বী, তিনি সত্যসন্ধানী। তাই ব্যক্তিগত জীবনাচরণেই হোক, জাতীয় জীবনচর্যাতেই হোক, অন্তরাত্মাই তাঁর কাছে সব। এইখানেই তাঁর মহত্ত্ব, এইখানেই তিনি সাধারণ রাজনীতিককে হতবুদ্ধি করে দেন। অহিংসানীতিও বহু প্রাচীন, নতুন যা তা হল গান্ধীজির অন্তরে এই অহিংসানীতির প্রতি এক প্রাণবান বিশ্বাসের জন্ম, এই বিশ্বাস নিয়ন্ত্রিত করছে তাঁর সমস্ত জীবনকে। সভাপতির ভাষণে তাই ক্ষিতিমোহন বললেন :

> আমাদের শান্তিনিকেতনের মানুষদের কাছে গান্ধীজীর জীবনের একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে। এ আশ্রমের লক্ষ্য এক নবজীবনাদর্শের সৃষ্টি, গুরুদেব যা তাঁর সত্যদৃষ্টিতে দেখেছেন, আর মহাত্মাজী যার ব্যাখ্যা করেছেন জাতীয় আদর্শরূপে।[৬৯২]

এ-সব অনুষ্ঠান বা সভা তো দৈনন্দিন কাজের একাংশ মাত্র। এ ছাড়া বিদ্যাভবনের যাবতীয় দায়িত্ব আছে, নিজের হাতেও অনেকগুলি কাজ। সন্ত রবিদাস সম্পর্কে যে অতিরিক্ত উপকরণগুলি সংগৃহীত হয়েছিল, সেগুলি অনুবাদ ও যথাযথ বিন্যাসের কাজ এখন চলছে। বৎসরান্ত বিশ্বভারতীর প্রতিবেদনে দেখা যাবে লেখা হয়েছে 'সন্ত রবিদাস' গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি ছাপাখানায় পাঠানোর জন্য প্রস্তুত করে ফেলতে তাঁর আর খুব বেশি সময় লাগবে না, শুধু ঐতিহাসিক পটভূমিকা লেখা বাকি। আর-একটি বড়ো কাজ একই সঙ্গে করছেন, তার বিষয় : 'ভারতে আধ্যাত্মিক চিন্তাবিকাশে সাধক কবীরের স্থান ও তাঁর ভূমিকা'। আরও বেশ কয়েকটি গবেষণা-প্রবন্ধেরও প্রস্তুতিপর্ব চলছে।[৬৯৩] তাঁর প্রথম হিন্দি বই 'ভারতবর্ষমেঁ জাতিভেদ'-ও এ বছর অক্টোবরে বেরোল। বিশ্বভারতীর বার্ষিক প্রতিবেদনে এ সংবাদ আছে। বলা হয়েছে হিন্দি গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করা হয়েছে মূল বাংলা 'জাতিভেদ' গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি থেকে।[৬৯৪] তা হলে 'জাতিভেদ'-এর কাজ এর আগেই শেষ হয়ে গিয়ে থাকবে, যদিও বিশ্বভারতী থেকে সেটি প্রকাশিত হয় আরও সাত বছর পরে। 'ভারতবর্ষমেঁ জাতিভেদ' প্রকাশের পিছনে পণ্ডিত হাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদীর উৎসাহ এবং পরিশ্রম ছিল। বইটি তিনি সম্পাদনা করেন।[৬৯৫] 'জাতিভেদ' গ্রন্থে ক্ষিতিমোহন নিজেও কথাটা উল্লেখ করেছেন।[৬৯৬] বিশ্বভারতী বাৎসরিক সাধারণসভার অধিবেশনে কর্মসচিব রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯৪০ সালের কার্যবিবরণী পাঠ করেন। বিভিন্ন বিভাগীয় কাজের পরিচয়প্রদান প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয় :

> পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেনের গবেষণা এবং কার্য্যাবলী বিশ্বভারতীর সম্পদ বৃদ্ধি করিয়াছে এবং তাঁহার অবদান বিশিষ্ট মনীষীবৃন্দের প্রশংসা লাভ করিয়াছে।[৬৯৭]

বিদ্যাভবনে নিজের ঘরে গবেষণার কাজে নিমগ্ন ক্ষিতিমোহনের একাগ্র মূর্তি যেন আমাদের চোখের সামনে ফুটে ওঠে স্মৃতিচারণ প্রসঙ্গে এক ছাত্রের বলা কয়েকটি কথায়। ঘটনাটা এই সময়েরই, ছাত্রটি তখন পড়তেন শিক্ষাভবনে। যেখানে ক্ষিতিমোহন গবেষক,

জ্ঞানান্বেষী, সেখানে তিনি একা। কিন্তু যাঁরাই তাঁর কাছে আসতেন প্রয়োজনে কিংবা অপ্রয়োজনে তাঁর সহৃদয় ভাবুক চিত্তের পরিচয় তাঁরাই নিয়ে যেতে পারতেন। দিনটা ছিল ৩ শ্রাবণ। সকালবেলা কয়েকজন অতিথিকে নিয়ে সেই ছাত্র বিশ্বভারতীর বিভিন্ন বিভাগ ঘুরিয়ে দেখাচ্ছিলেন। কলাভবন সংগীতভবন গ্রন্থাগার দেখিয়ে তাঁদের তিনি নিয়ে গেলেন :

> পন্ডিত ক্ষিতিমোহন সেনের গবেষণাকক্ষে। মেঝেতে অনেকগুলি পুঁথি খুলে রেখে কি লিখছিলেন তিনি নিবিষ্ট মনে। পরিচয় দিলাম অতিথিদের। পুঁথিপত্র একপাশে সরিয়ে রেখে সাগ্রহে বসালেন তাঁদের। নানা প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করলেন অনেকক্ষণ।[৬৯৮]

কথায় কথায় বাউলদের কথা উঠল। বাউলদের খোঁজে বাংলার গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে কী রকম পাগলের মতো ঘুরে বেড়িয়েছেন, তার দু-একটি কাহিনি শোনালেন। বললেন :

> ওরা সহজে ধরা দিতে চায় না, খুঁজে নিতে হয় ওদের। কত অমূল্য সম্পদ সবার অগোচরে আগলে নিয়ে বসে আছে ওরা হিসাব নেই তার। এদের কার ভিতরে যে কী ঐশ্বর্য লুকানো আছে তাও বুঝবার সাধ্য নেই সহজে। একবার পূর্ববঙ্গের সুদূর অখ্যাত পল্লীর এককোণে পরিচয় হয়েছিল একটি লোকের সঙ্গে আমার। সবাই জানতো তাঁকে পাগল বলে। একদিন তিনি আমাকে একটি গান গেয়ে শোনালেন। কী অপূর্ব তাঁর গলার স্বর, কী আবেগ তাঁর মনে। গানের কথাগুলিই কি ভোলা যায় কোনদিন, 'তোমার স্বর্গ তোমারই থাক, তাতে প্রয়োজন নেই আমার। কিন্তু হে দেবতা, নরকের আগুন জ্বালাবার জন্য যখন লোকের অভাব হবে, তখনি তুমি স্মরণ করো আমাকে'।[৬৯৯]

বাউলরা সবার অগোচরে অমূল্য সম্পদ আগলে বসে আছে, কথাপ্রসঙ্গে বলেছিলেন ক্ষিতিমোহন, ওদের কার ভিতরে যে কী ঐশ্বর্য লুকানো, বাইরে থেকে তা বোঝবার উপায় নেই। ক্ষিতিমোহন নিজে যে বাউলদের এই-সব সাধন-ধন আবিষ্কার করে সংগ্রহ করে আনেন, তাও গোপন ঐশ্বর্যের মতো লুকিয়ে রাখেন নিজের কাছে। এ নিয়েও আবার কারো কারো অভিযোগ তখন শোনা যাচ্ছিল। 'হারমণি' নামে খণ্ডে খণ্ডে লোকসংগীতসংগ্রহ প্রকাশ করছিলেন মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন। তিনি তাঁর বইয়ের ভূমিকায় বললেন সে কথা :

> অধ্যাপক ক্ষিতিমোহন সেন সংগৃহীত মনোহর বাউলগানসংগ্রহ রহিয়াছে। তিনি অতিশয় কৃপণ। রবীন্দ্রনাথ এবং চারুচন্দ্র প্রভৃতি দুই একজন বিশেষ অন্তরঙ্গ ব্যতীত তাঁহার সংগ্রহ কেহ চক্ষে দেখে নাই। ডক্টর আরণল্ড বাকে আমাকে শান্তিনিকেতন হইতে পত্রে জানাইয়াছিলেন যে মুক্তা যেমন গোপন থাকে, তেমন ক্ষিতিমোহনের কণ্ঠে এই সকল গান লুক্কাইত রহিয়াছে, উহা তিনি সহজে প্রকাশ করিতে চান না, ইহা ভারী আশ্চর্য। তিনি স্বয়ং বাউলদের মত uncommunicative এবং নির্লিপ্ত। বাংলাদেশে ক্ষিতিমোহনের নাম বাউলগান সংগ্রাহক হিসাবে খুব বেশী, অথচ তিনি একটি সঙ্কলন প্রকাশ করিয়া আমাদের কৌতূহল চরিতার্থ করিলেন না। ইহা সত্যই চরম দুঃখের বিষয়। তাঁহার সংগ্রহের কিছু অংশ তাঁহার প্রবন্ধাদিতে, রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধাদিতে [বিশেষ করিয়া মানুষের ধর্ম, Religion of Man, London] এবং বঙ্গবীণা, বাংলার কাব্যপরিচয় প্রভৃতি গ্রন্থে পাওয়া যায়। তাঁহার সংগৃহীত জগা কৈবর্ত্ত, বিশা ভুঁইমালী প্রভৃতির বাউলগান বাংলা দেশের একটি আশ্চর্য কাব্য ও তত্ত্বলোকের সংবাদ বহন করিয়া আনে।[৭০০]

যে সময়ে ছাত্র রথীন্দ্রকান্ত ঘটক চৌধুরী কয়েকজন অতিথিকে ক্ষিতিমোহন-সকাশে নিয়ে গিয়েছিলেন, তার কাছাকাছি কোনো সময়ই বোধ হয় অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র শান্তিনিকেতনে এসে ক্ষিতিমোহনের গুরুপল্লির বাড়িতে যান। সকালবেলায় তাঁকে চা-পানের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন ক্ষিতিমোহন। তাঁর লেখায় যে বিবরণ পেয়েছি, সম্পূর্ণই তুলে দেওয়া গেল :

> অনেকদিন পরে শান্তিনিকেতনের প্রবীণ অধ্যাপক ক্ষিতিমোহন শাস্ত্রীকে একটু কাছে পেলাম। আমি তাঁর distant admirer, নেপথ্যের ভক্ত। পথে ঘাটে এখানে ওখানে বহু বৎসর ধরে মাঝে মাঝে দেখা হয়েছে। চুম্বকে আকৃষ্ট লোহার মত লীন হয়েছি তাঁর রসালাপে। তিনি একজন অভিজ্ঞ ডুবুরি। ভারতের মধ্যযুগের ভক্তদের ভক্তিসাগরে ডুব দিয়ে সে অমূল্য রত্নাকর থেকে বহু রত্ন সংগ্রহ করেছেন। বাংলার আনাচে কানাচে বাউল সম্প্রদায়ের প্রকৃত উত্তরাধিকাবীদের দর্শন কদাচিৎ মেলে বহু সন্ধানে। তাঁদের গোয়েন্দা ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়। মাল্যচন্দনে বিভূষিত হয়ে কথকঠাকুর যখন বেদীতে বসে তাঁর অতুলনীয় বাগ্মিতা ও রসবৈদগ্ধ্যে শ্রোতৃমন্ডলীকে মুগ্ধ করেন তখন ভিড়ের চিকের আড়ালে যুগপৎ অশ্রুমোচন ও অট্টহাস্য করেছি আর সকলের সঙ্গে। এবার বোলপুরের পান্থশালায় প্রথম রাত্রিযাপনের পরদিন সকালে দেখি সুহৃদ্বর এসে উপস্থিত। তাঁর সঙ্গ নিয়ে উঠলাম তাঁর কুটিরে চায়ের নিমন্ত্রণে। এক পেয়ালা নিরাবিল ম্লেচ্ছ-মৌতাতের সঙ্গে বেলের মোহনভোগ উপভোগ করে প্রাতরাশিক মৌতাতরক্ষার সঙ্গে প্রাচ্য-প্রতীচ্যের সমন্বয় উদরসাৎ করা গেল। সেই অত্যল্প সময়ের মধ্যে কমা-সেমিকোলন-বিবর্জিত জমাট রসালাপ চলল তাঁর সঙ্গে।[১০১]

প্রসঙ্গাক্রমে ক্ষিতিমোহন বন্ধুত্ব সম্বন্ধে যে শ্লোক শুনিয়েছিলেন, সুরেন্দ্রনাথ সেটি উদ্ধৃত করেছেন তাঁর এই রচনায়, এবং পদ্যে তার অনুবাদও যোগ করেছেন :

> আরম্ভ গুর্বী ক্ষয়িমী ক্রমেণ
> লঘ্বীপুরা বৃদ্ধিমতী চ পশ্চাৎ।
> দিনস্য পূর্বার্দ্ধপরার্দ্ধ ভিন্না
> ছায়েব মৈত্রী খলু সজ্জনানাম্।*
>
> প্রথমে ঘোরালো স্বচ্ছতা লভে পরে,
> আরম্ভে ক্ষীণ ক্রমে দীঘল বিপুল,
> দিনের দুভাগে ছায়া ভিনরূপ ধরে,
> সজ্জনমিতালী হেরি তারি সমতুল।[১০২]

এমনই আর-একবার—এ সম্ভবত আরও বেশ কিছুকাল আগের ঘটনা—১৯২৭-২৮ সাল হবে হয়তো বা, —সুধীরচন্দ্র কর শান্তিনিকেতনে সদ্য-আসা মাকে নিয়ে আশ্রম দেখতে বেরিয়ে বিদ্যাভবনের দোতলায় ক্ষিতিমোহনের ঘরে এসেছেন, সঙ্গে বোন সাধনাও আছেন। ক্ষিতিমোহন হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানিয়ে তাঁদের সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন।

* এই পাঠ অভ্রান্ত নয়, মুদ্রণপ্রমাদ আছে। প্রথম ছত্রের 'ক্ষয়িমী' হবে 'ক্ষয়িণী', শেষ ছত্রের 'খলু' হবে 'খল'। এ ছাড়াও একাধিক ক্ষেত্রে অল্পস্বল্প ত্রুটি আছে। টীকা দ্রষ্টব্য।

ফরিদপুর জেলার বিঝারী গ্রামে বাড়ি শুনে গ্রামের নামের ইতিহাসটি শোনালেন। ইংরেজ কোম্পানি যখন পূর্ববঙ্গের গ্রাম-বন্দর ইজারা নেয়, জরিপের কাজ হতে হতে বাদ পড়ে গেল একটি গ্রাম, তার নাম 'বড়ই'। ভুল ধরা পড়তে কোম্পানির কাগজপত্রে লেখা হল 'বে-ইজারা'। শেষে বড়ই গ্রামের নামটাই বদলে হল 'বে-ইজারী', তার পর লোকমুখে 'বিঝারী'। এ কাহিনি শুনে সুধীরচন্দ্রের মায়ের মনে পড়েছিল তিনিও গ্রামের বয়স্ক লোকেদের মুখে শুনেছিলেন তাঁর শ্বশুরবাড়ির গ্রামের পূর্বনাম ছিল 'বড়ই'। কথাপ্রসঙ্গে আরও অনেক গল্প করেছিলেন ক্ষিতিমোহন, ফরিদপুর অঞ্চলের ছড়াও শুনিয়েছিলেন। ফরিদপুরের ও-সব জায়গায় অনেকবার গেছেন তিনি বাউলগান সংগ্রহ করতে, নানারকম ছড়াও তখন অনেক শোনা হয়েছিল তাঁর।[৭০৩]

আর-একবার গুজরাতে যাওয়ার আয়োজন

বোম্বাইয়ের হিন্দি বিদ্যাপীঠ ক্ষিতিমোহনকে সমাবর্তন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির পদ গ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। ক্ষিতিমোহনের ইচ্ছা এই সুযোগে একবার গুজরাত ঘুরে আসবেন। অনেকদিন দেখা হয়নি সেখানকার বন্ধুদের সঙ্গে। গতবারে গিয়ে তো কোসিন্দ্রায় যাওয়াই হল না। এবার যেতেই হবে, দেখা করতে হবে বন্ধুদের সঙ্গে। সেখানে বৃক্ষরোপণ উৎসবে পৌরোহিত্য করেছিলেন, যে চারাগাছগুলি লাগানো হয়েছিল তখন, কত বড়ো হল সেই নবীন 'বৃক্ষবন্ধুরা' তাও স্বচক্ষে দেখতে ইচ্ছা করে। ইতিমধ্যে যে-সব পূর্বপরিচিত মানুষগুলির পরলোকগমনসংবাদ পেয়েছিলেন চিঠিতে, জয়ন্তীলালকে চিঠি লিখতে বসে তাঁদের কথা মনে করে নতুন করে বেদনাবোধ করছেন, এবার গেলে আর দেখা হবে না তাঁদের সঙ্গে। আগের বারের মতোই আরও কয়েকটি জায়গায়ও তাঁকে যেতে হবে। লখনউতে কন্যা-জামাতা আছেন, তার পরে পুরোনো বন্ধুরাও কেউ কেউ তাঁদের কাছে যাবার জন্য বার বার ডাকছেন—বাণারসীপ্রসাদ চতুর্বেদী, রাম শর্মা। সবারই ভালোবাসার দাবি স্বীকার করতে মন চায় এবং তাঁর নিজের দিক থেকেও আকর্ষণ কম নয়। তাই গুজরাতে হয়তো বেশিদিন থাকা সম্ভব হবে না। তা হোক, তবু যাওয়া তো হবে। তারই জন্য মন উদগ্রীব। এবার তাঁর সঙ্গী হবেন তরুণ সহকর্মী পণ্ডিত হাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী। বিদ্যাপীঠের অনুষ্ঠানে তিনিও আমন্ত্রিত। জয়ন্তীলাল আচার্যকে আগস্ট মাসে লেখা যে চিঠি হাতে পেয়েছি, তার অনুবাদ সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করে দিচ্ছি, তার মধ্যেকার নানা পুনরুক্তি ও আপাত-তুচ্ছ খবর ও প্রশ্নগুলোও বাদ না দিয়ে :

প্রীতিসম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন, 26.8.40

অনেকদিন হল তোমার পত্র পেয়েছি। প্রতিদিনই তোমার কথা ভাবি কিন্তু উত্তর দেওয়া আর হয় না। তোমার পত্রে তুমি যে শ্রীঅম্বালাল প্যাটেলজীর কথা লিখেছ এতে আমি খুব সন্তুষ্ট হয়েছি। জীবনে মহৎ পুরুষের সঙ্গ পাওয়া একটি পরম লাভ এবং তাঁর সঙ্গ তোমার জীবনে যাতে যথার্থভাবে কার্যকর হয়, ভগবানের কাছে সেই প্রার্থনাই করি। তোমার সঙ্গে

যখন দেখা হবে তখন তাঁর সম্বন্ধে আমি আরও অনেক কিছু তোমার মুখে শুনতে পাব। তোমার দেওয়া সাহিত্যে আমি পেয়েছি। আমার সবটা পড়বার সময় হয়নি। মাঝে মাঝে পড়েছি। ভালোই লেগেছে। তোমাদের সঙ্গে কবে দেখা হবে সেই কথা ভাবছি। একটা সুযোগ উপস্থিত হয়েছে। বম্বে হিন্দি বিদ্যাপীঠে দীক্ষান্ত উৎসবে আমাকে মুখ্য ভাষণ দিতে নিমন্ত্রণ করেছেন। আমি যদি সেটা স্বীকার করি তবে যাবার কি আসবাব সময় তোমাদের সঙ্গে দেখা করা সম্ভব হবে। তখন এই প্যাটেলজীর বিষয়ে তোমার কাছে আরও ভালো করে জানতে পারব। করুণাশংকরজীকে আমার এই যাবার সম্ভাবনার কথা জানাবে। তাঁকে পত্র লিখবার জন্য বিরক্ত করতে আমার ইচ্ছা হয় না। তিনি যা বলেন তা শুনে তুমিই আমাকে লিখো। দীক্ষান্ত ভাষণের তারিখ তাঁরা প্রস্তাব করেছেন ১৩ অক্টোবর, কিন্তু আমরা প্রস্তাব করেছি ১৫ অক্টোবর কোজাগরী পূর্ণিমা অথবা ২০ অক্টোবর রবিবার। রবিবারটাই তাঁদের বেশি মনোমত। যা হয় তোমাকে জানাব। সাধনার (পুতুলের) যে বিবাহ বনবিহারীর সঙ্গে হয়েছে সে আমি তোমারই পত্রে জেনেছি এবং তাতে যে তার পিতার মত ছিল না তাও সে নিজেই লিখেছিল। সে আমার কাছে আশীর্বাদ প্রার্থনা করেছে। কিন্তু তার পিতাকে অতিক্রম করে তা তো আমি দিতে পারি না। হয়তো আমি আশীর্বাদদানের যোগ্যও নই। তবুও ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, যদি তার ভুলভ্রান্তি হয়ে থাকে তিনি যেন তাকে কৃপা ও আশীর্বাদ করেন। পৃথিবীতে আমরা কেউ কাউকে বিচার করতে পারি না। কারণ সবাই আমরা অপরাধী। অপরাধী হয়ে কোন সাহসে আর এক অপরাধীর বিচার করব। তবুও যখন কোনো কিছুতে দুঃখ পাই তখন ঈশ্বরকে বলি যদি এদের কোনো অপরাধ হয়ে থাকে তবে তুমি ক্ষমা করো, তোমার কল্যাণপ্রেরণা সঞ্চার করো এদের মধ্যে। যদি কখনও সাধনার সঙ্গে দেখা হয়, আমার কথা বুঝিয়ে বলবার চেষ্টা কোর। আমি লিখতে গেলে হয়তো এক লিখতে আর একরকম হয়ে যাবে এবং সে হয় তো ভুল বুঝবে। তোমার নিজের যাবার প্রয়োজন নেই। যদি দেখা হয় এবং কথা হয় তবে তুমি বুঝিয়ে বোল। তবে আমার পত্রের এই অংশটুকু তার পিতা সুধীরবাবুকে পড়ে শুনিয়ো। তাঁর নতুন ঠিকানা আমি জানি না। শুনেছি তিনি বাড়ি বদল করেছেন তাই চিঠি লিখতে পারি না। সাধনার বিষয়ে কোনো চিঠি তাঁর কাছ থেকে পাই নি। কাজেই তাঁকে ঠিক কীভাবে আমি লিখব তাও বুঝতে পারছি না। তাঁকেও আমার যাবার সম্ভাবনার কথা জানাবে। কিন্তু সবচেয়ে বেশি জানানো দরকার মাস্টারজীকে। যদি যাওয়া হয় তাহলে আমি preside করবার লোভে যাব না। আমি যাব শুধু মাস্টারজীর পুণ্য দর্শনলাভের জন্য। কারণ আমরা দুজনে জীবনের শেষভাগে—কার কখন কি হয় কে জানে।

যাই যদি তাহলে পণ্ডিত হাজারীপ্রসাদজীও আমার সঙ্গে যাবেন। উভয়ে মিলে মাস্টারজীকে দর্শন করব এবং তোমাদের সঙ্গ পাব। খেতে দিতে হবে আমাদের। আমি বুড়ো মানুষ, আমাকে খাওয়াতে কোনো কষ্ট নেই। কিন্তু পণ্ডিতজী যুবক, তাঁকে খাওয়ানো একটু কঠিন।

তুমি যে-সমস্ত আমার লেখার প্রিন্টস্ চেয়েছ, কোনটা পাঠিয়েছি কোনটা না পাঠিয়েছি মনে তো নাই। এবার পূজায় অনেকগুলি পূজা বিশেষ সংখ্যায় লেখা দিয়েছি। সে-সব লেখার যে প্রিন্টস্ পাব যাবার সময় নিয়ে যাব। ইতিমধ্যে বাউল ও সন্তদের বিষয়ে যা পেয়েছি বা সংগ্রহ করেছি তার পরিচয় তখন পাবে। এবার আমাদের হাতে সময় খুব কম থাকবে। যাবার পথে লক্ষ্ণৌতে আমার মেয়ের ওখানে তো যেতেই হবে। বুন্দেলখণ্ডে বন্ধু শ্রীবাণারসীপ্রসাদ চতুর্বেদী আছেন। আগ্রাতে শ্রীরাম শর্মাজী আছেন। তাঁরা সবাই যাবার গন্ধ পেয়েই পূর্ব থেকে

বার বার লিখছেন যেন তাঁদের ওখান হয়ে যাই। তবেই তো প্রত্যেক জায়গায় একটু একটু দেরি হবে। বম্বেতে চার পাঁচ দিন অন্তত দেরি হবে। সুতরাং তোমাদের কাছে যাবার পরে আর কটা দিনই বা হাতে থাকবে। তার মধ্যেই সম্ভব হলে মাস্টারজীকে নিয়ে একবার কোসিন্দ্রা যেতে ইচ্ছা আছে। বহুদিন সেখানকার বন্ধুদের দেখিনি, দেখিনি সেখানকার বৃক্ষবন্ধুদেরও। পণ্ডিতজীকেও সেই সমস্ত স্থান ও মানুষ দেখাতে পারব। জয়ন্তের কাছে শুনলাম সারগাই গ্রামের বৃদ্ধ গোর্ধনজীভাই মারা গেছেন। শুনে বড় দুঃখ হল। সে বৃদ্ধের মধ্যে যে একটি প্রেমের জুলুম ছিল সেই রকম বড় দুর্লভ। মাস্টারজীকে আমার এই পত্রখানা আদ্যন্ত পড়ে শুনিয়ো। তিনি যা বলেন তুমি লিখো। আমি তাঁকে লিখতে বলে বিপন্ন করতে চাই না। তোমার মাতৃদেবী কেমন আছেন? তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার জানাবে। বৌমা কেমন আছেন? তোমার সেই কন্যাটি বোধহয় এতদিনে একটু বড় হয়েছে। আর ছোটটিকেও দেখতে পাব। আর মাস্টারজীর পরিবার? শুনেছি শ্রীমান চন্দ্রকান্ত ব্যবসায় ভালই করছেন। শ্রীভগবান তার কল্যাণ করুন। শ্রীমান দীনবন্ধু এম. এ. পড়তে প্রবৃত্ত হয়েছে শুনে খুশি হলাম। শ্রীমতী কুসুমবেন কেমন আছেন? শ্রীদেবী বোধ হয় ম্যাট্রিকে এসে পৌঁছেছে। এদেব সকলের কল্যাণ প্রার্থনা করি। পূজ্য মাস্টারজী এবং তাঁর পত্নীকে আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার জানাচ্ছি। এখানে আমরা ভাল আছি। আমরা মানে আমি, আমার স্ত্রী এবং একটি নাতনী। আমার পুত্র-কন্যারা যার যার স্থানে ভালই আছে। গুরুদেব দিন দিন দুর্বল হচ্ছেন। বয়সটাও আশি হল। এই দুর্বলতায় আপত্তি করলে চলবে কেন?

এবারে গুজরাতে গেলে সবচেয়ে দুঃখ হবে প্রিয় বন্ধু গোর্ধনভাই হাথীভাইয়ের অভাবে। এমন সাত্ত্বিক সজ্জন জীবনে খুব কম দেখেছি। প্রতিবারই গুজরাতে গিয়ে তাঁর যে দর্শন পেয়েছি তাতে করে তীর্থদর্শনের কাজ হয়েছে। তবু তাঁর পরিজনদের সঙ্গে একবার দেখা করে আসতে হবে। আর মনে হবে জ্ঞানতপস্বী মোতীভাই আমীনজীর কথা। গতবারও তাঁর সঙ্গ পেয়েছি। এবার আর পাব না। মাস্টারজীর কাছে রতিভাই মোতীভাই ওকিলের বম্বের ঠিকানাটা জানবে। রতিভাইকে আমি এখান থেকে সরাসরিই লিখতাম, কিন্তু শুনেছি তিনি ঠিকানা বদল করেছেন। কাজেই নতুন ঠিকানা না জানাতে চিঠি লিখতে পারলাম না। যদিও হিন্দি বিদ্যাপীঠ আমার আতিথ্যের ব্যবস্থা করবেন, তবু রতিভাই থাকতে অন্য জায়গায় উঠতে ইচ্ছা হয় না। যদি পার, মাস্টারজীর কাছ থেকে ঠিকানা জেনে তুমি সোজা তাঁকেই লিখতে পার যে আমার যাবার সম্ভাবনা আছে। শ্রীহরিপ্রসাদ পীতাম্বরদাস মেহেতোর সঙ্গে কি দেখা হয়? তাঁকেও আমার যাবার সম্ভাবনা এবং কুশলসংবাদ জানিয়ো। আশা করি তাঁরা কুশলে আছেন। ওখানে গেলে মনিভাই এবং কিকুভাই প্রভৃতির সঙ্গে দেখা হবে। মোহনভাই ও শান্তাবেন কি ওখানেই আছে? যদি থাকে তবে আমার কথা জানিয়ো। আর যাঁরা যাঁরা আমাকে স্নেহ করেন তাঁদের সকলকে যথাযোগ্যভাবে আমার খবর দিও এবং আমার যাবার সম্ভাবনার কথাও বোল। এখানে ভাল আছি। তোমাদের কুশল লিখো। ইতি

তোমার নিত্যশুভার্থী

ক্ষিতিমোহন সেন[১০৪]

ক্ষিতিমোহনের এবারের গুজরাতভ্রমণের দিনগুলির বিবরণ দেওয়ার মতো তথ্য পাইনি। জয়ন্তীলালভাইকে লেখা এই দীর্ঘ চিঠি থেকে কেবল একটুখানি আভাস পাওয়া যাচ্ছে কেন তিনি এবারে আসতে চেয়েছিলেন, কাদের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাতের আগ্রহ ছিল।

কিন্তু বাবুজি আসবার পরে কী হল, পুরোনো বন্ধু ও ছাত্ররা তাঁকে ঘিরে বসে কী কথা শুনলেন, দু-বছর আগে 'প্রান্তিক'-এর আলোচনা যাঁদের মনোহরণ করেছিল, তাঁরা কি আবার একবার সুযোগ পেলেন 'প্রান্তিক'-উত্তর কোনো সদ্যপ্রকাশিত রবীন্দ্র-কাব্যের পাঠ ও ব্যাখ্যা শোনবার? বাউলগান-সন্তদোঁহা-মীরার ভজনে আসর কেমন জমল? সে কথা বলা যাবে না। হাতে আছে শুধু বোম্বাই হিন্দি বিদ্যাপীঠের প্রধান অতিথির ভাষণ—'জ্ঞানদীক্ষা'। ১৯৪৭ সালে হিন্দি বিদ্যাপীঠ এই নামেই একটি গ্রন্থ প্রকাশ করে, তাতে বিদ্যাপীঠের সমাবর্তনে উপাধিদান উপলক্ষে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের প্রদত্ত সাতটি ভাষণ স্থান পেয়েছিল, ক্ষিতিমোহনের 'জ্ঞানদীক্ষা' ভাষণ তার অন্যতম। তিনি দীক্ষান্তভাষণ দেন এই প্রতিষ্ঠানের তৃতীয়-চতুর্থ সমাবর্তনে, ২০ অক্টোবর ১৯৪০।[১০৫]

ভানুকুমার জৈন, যিনি বিদ্যাপীঠের পক্ষ থেকে 'জ্ঞানদীক্ষা' গ্রন্থ প্রকাশ করেন, ভূমিকায় যে ভাষায় ক্ষিতিমোহনের ভাষণের প্রশংসা করেছিলেন, তা এতদিন পরেও পাঠককে বেশ বিস্মিত করে দেয় :

> যখন আচার্য ক্ষিতিমোহন সেনের হাতে-লেখা ভাষণটি আমার হস্তগত হল, সেটি পড়ে আমি একেবারে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলাম। এদেশের বা বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের বা অন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের দীক্ষান্ত ভাষণ মাঝে মধ্যেই পড়ার সুযোগ হয়। সে-সব ভাষণের সঙ্গে তুলনা করে আমার মনে হল আচার্যজীর এই ভাষণ যেন অভূতপূর্ব, অনুপম এবং সর্বশ্রেষ্ঠ। এই প্রথম আমার জ্ঞান হল দীক্ষান্তভাষণ কেমন হওয়া উচিত।

ভানুকুমার জৈন এও বলেছেন যে সেসময় (অর্থাৎ বিদ্যাপীঠের সমাবর্তনের সময়) যদি বিদ্যাপীঠের 'সাধনসম্পত্তি' অনুকূল হত, তা হলে তিনি অবশ্যই ক্ষিতিমোহনের এই ভাষণ—শুধু হিন্দিতে নয়, কয়েকটি ভাষায় রাজসংস্করণ আকারে ছাপিয়ে বিশ্বের তাবৎ বিশ্ববিদ্যালয়ে বিনামূল্যে পাঠিয়ে দিতেন। এবার দেখা যাক কী ছিল ক্ষিতিমোহনের এই ভাষণে।

ক্ষিতিমোহন স্বভাবসিদ্ধভঙ্গিতে তাঁর ভাষণ শুরু করেছেন এই বলে যে, এই সমাবর্তনে তাঁকে নিমন্ত্রণের দ্বারা পশ্চিম ভারত প্রকৃতপক্ষে সপ্রীতি আমন্ত্রণ জানিয়েছে পূর্ব ভারতকে আর তিনি পশ্চিম ভারতের দেবমন্দিরে পূর্ব ভারতের প্রণতি বহন করে এনেছেন। এ দেশে দেবতার পূর্ণাভিষেক করতে নানা তীর্থের জল লাগে, অন্তরে-বাহিরে শুচি হয়ে সেই তীর্থোদক সংগ্রহ করতে হয়। শ্রদ্ধার চিন্ময় তীর্থোদক সংগ্রহ করা কঠিনতর—সে যোগ্যতা না-থাকা সত্ত্বেও অনুষ্ঠান-উদ্যোক্তাদের স্নেহের দাবিতে সে দুঃসাধ্য ভার তিনি গ্রহণ করেছেন। রথের সামনে থাকে কাঠের ঘোড়া—সে ঘোড়া তো রথ টানে না, রথ চলে ভক্তদলের হাতের টানে। এই অনুষ্ঠানরথের সামনে তিনিও কাঠের ঘোড়ামাত্র।

এই ভাষণের মুখ্যাংশ জুড়ে আছে হিন্দি ভাষার প্রকৃত উন্নতির প্রয়োজনীয়তা ও দায়িত্বের প্রসঙ্গ। বক্তা এই কাজে আত্মনিয়োগের আহ্বান জানাচ্ছেন হিন্দি বিদ্যাপীঠকে, বলছেন ভাষা কেবল ভাষা নয়, আমাদের বিদ্যা সংস্কৃতি ও কলার সংগমতীর্থ রচনা করে সে।

ইংরেজি ভাষার মহিমা এইজন্য নয় যে, এই ভাষা আমাদের প্রভুর ভাষা, তার মহিমা এইজন্য যে, এই ভাষা মর্তলোকের সব বিদ্যাকে আত্মসাৎ করেছে। ইংরেজ যদি এদেশে না-ও থাকে, তবু তাদের ভাষার আদর একইরকম থাকবে। হিন্দিকেও তেমনই নানা সংস্কৃতি, বিদ্যা ও কলার ত্রিবেণীসঙ্গম হতে হবে, তা না হলে ভাষার সাধনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। আপনারা যাঁরা আজ এই সাধনায় ব্রতী হয়েছেন তাঁরা যেন এ-কথা ভুলবেন না। ভাষা আমাদের জন্য সাধন, সাধ্য নয় ; পথ, গন্তব্য নয় ; আধার, আধেয় নয়।

হিন্দি ভাষা ক্ষিতিমোহনের কাছে মাতৃভাষারই সমতুল, তার সমুন্নতির ভাবনা তাঁর মধ্যে থাকতেই পারে। কিন্তু এখানে তাঁর বক্তব্যের পিছনে দেশগত বৃহত্তর ভাবনা কাজ করেছে। দীর্ঘদিন ধরে দেশে স্বাধীনতা আন্দোলন নানা ঘাত-প্রতিঘাতের বাধা ঠেলে এগোচ্ছে, অন্যদিকে আত্মকলহের সর্বনাশা সমস্যা জাতীয় ঐক্যপ্রতিষ্ঠার অটল অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, সারা দেশ প্রাদেশিক সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতার হাজারটা পাকে বাঁধা পড়ে হাঁসফাঁস করছে। আন্তর্প্রাদেশিক ঐক্যবিধায়ক সূত্রের সন্ধানও চলছে অনেকদিন ধরেই। সর্বভারতীয় ভাষামাধ্যম হিসাবে হিন্দিকে স্বীকৃতিদানের প্রস্তাব নিয়েও মতান্তর যথেষ্ট, তবু তার সম্ভাবনার দিকটাও চিন্তাশীল এবং নিরপেক্ষ বিচারকদের চোখে পড়ছে। এই পটভূমিতে দাঁড়িয়ে ক্ষিতিমোহন বিচার করছেন হিন্দি বিদ্যাপীঠের হিন্দিভাষা ও সংস্কৃতিচর্চা-বিকাশ-প্রসার কর্মসূচির তাৎপর্য। যেমন তাঁর ধরন—মহাভারত পুরাণ ইতিহাস তন্ত্র থেকে কত প্রসঙ্গ উঠে আসছে কথায় কথায়। কখনও অনুষ্ঠানে নারী-উপস্থিতির সংখ্যাধিক্য দর্শনে হৃষ্ট মনে অনুপ্রেরণা দিয়ে বলছেন শক্তির দ্বারা যুক্ত শিবই প্রকৃত সামর্থ্যের অধিকারী, কখনও সাবধান করছেন আত্মঘাতের বিরুদ্ধে—কেবল সনাতনী বা কেবল পরানুকরণনির্ভর ছল-আধুনিক হয়ে অভীষ্টার্জন করা যাবে না।

আমাদের এই অনুষ্ঠানে প্রাচীন ও নবীন, এ-দেশের বা অন্য দেশের সমস্ত বিদ্যাকে নিঃসংকোচে স্বীকার করতে হবে, তবে আমরা একে মহানরূপে গড়ে তুলতে পারব। যদি এখানে আমরা স্থানগত বা কালগত কোনোপ্রকার সংকীর্ণতাকে মনে আসতে দিই, তবে যদিও আমরা কিছু লোকের বাহবা পেতে পারি, কিন্তু তার দ্বারা সাংস্কৃতিক আত্মঘাতই সিদ্ধ হবে মাত্র। এটা দেখা গেছে যে পৃথিবীতে নানা ধরনের আত্মঘাতের দ্বারা বাহবা মেলে, কিন্তু অন্ততোগত্বা আত্মঘাত—সেও আত্মঘাতই।

এক জায়গায় বলছেন 'ভাষা আমাদের মা' ভাষাকে যারা জোড়াতাড়া দিয়ে গড়ে তোলার পক্ষপাতী তারা এ কথাটা মনে রাখলে ভালো হয় যে, পুরাণে তিলোত্তমার মতো নারীর সৃষ্টি হয়েছিল কেবল চিত্তহরণার্থে—এমন জোড়া-দেওয়া প্রতিমায় মাতৃত্বের কল্পনাও সম্ভব হয়নি, এমনকী চিত্তরঞ্জনের কাজটাও সাধিত হয়নি। প্রকৃতপক্ষে সে বিনাশের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

আমি আশা করি আপনারা মাতার যোগেশ্বরী স্বরূপের আরাধক। আমি অন্তর থেকে চাই এই বিদ্যাপীঠ সেই যোগেশ্বরী স্বরূপের সাধনক্ষেত্র হোক।

এই ভাষণে জ্ঞানচর্চা ও শিক্ষক-শিক্ষার্থী প্রসঙ্গে তন্ত্রশাস্ত্রের স্পর্শদীক্ষা ও দীপ্তদীপদীক্ষার কথা যেখানটায় টেনে এনেছেন ক্ষিতিমোহন, সেখানটা যেন মনকে সবচেয়ে বেশি স্পর্শ করে। তিনি বলছেন :

> স্পর্শমণির স্পর্শে লোহা সোনা হয়ে যায় কিন্তু স্বয়ং স্পর্শমণি হয়ে যায় না। আর কাউকে স্পর্শ করে সে সোনা করে দিতে পারে না। এ খুব উচ্চ কথা কিছু নয়। কিন্তু প্রজ্জ্বলিত দীপের স্পর্শে অদীপ্ত দীপ জ্বলে ওঠে আর প্রথম দীপের মতোই আলো দেয়। আর সঙ্গে সঙ্গে অন্য দীপকে প্রদীপ্ত করার শক্তিও তাতে এসে যায়। এই হল দীপ্তদীপদীক্ষা। পূর্ণাভিষিক্ত সাধককে এই দীক্ষা নিতে হয়। আমি আশা করি আপনাদের এই বিদ্যাপীঠে আপনারা সেই দীপ্তদীপদীক্ষা নিতে এসেছেন। এই দীক্ষায় যিনি দীক্ষিত তিনি এ-কথা না ভোলেন যে, ভারতীয় জ্ঞানতপস্যা কোনো ব্যক্তিগত সুখসমৃদ্ধির তপস্যা নয়। এ তপস্যা সবার অভ্যুদয়ের জন্য। এইজন্য প্রাচীনকালে ব্রহ্মচারীর তপস্যার জন্য আবশ্যক আয়োজন সমাজকেই করতে হত আর ব্রহ্মচারীও স্নাতক হয়ে তাঁর বিদ্যা নিজের জন্য বিক্রয় করতে পারতেন না, এই বিদ্যা সমস্ত সমাজের সম্পত্তি হত। এদিক থেকে পাশ্চাত্য জ্ঞানসাধনা ও ভারতীয় জ্ঞানসাধনা একেবারে ভিন্ন বস্তু। ...আমাদের ভয়ঙ্কর দুর্গতি এই হয়েছে যে, আজ আমরা না পারি আমাদের পূর্বপরম্পরা অনুসারে গুরুজনদেব ভক্তি ও সম্মান দিতে, না পারি য়ুরোপের মতো প্রচুর ধন দিতে। এর ফল হয়েছে এই যে, সমাজের যাঁরা শ্রেষ্ঠ মানুষ তাঁরা আর সর্বদা জ্ঞানদানকর্মে যোগ দিচ্ছেন না। কেননা এই কাজে আজ না আছে ধনের আশা, না সম্মানের সন্তোষ।

এর ফলে নবীন প্রজন্ম বঞ্চিত হচ্ছে দেশের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের সংস্পর্শ থেকে আর তার জন্য ক্রমশ সমাজের চিন্ময় জীবন ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছে। ক্ষিতিমোহন আবার বলেছেন :

> ীপদীক্ষায় যাঁরা দীক্ষিত তাঁরা প্রত্যেকে এক একটি বিশ্ববিদ্যালয়। তাঁদের চারদিকে সহযোগী কর্মীদল থাকুক বা না থাকুক, না থাকুক বিরাট ইমারৎ, এ সব বহিরঙ্গ আয়োজন ছাড়াই এঁরা নিজেরা সর্বসাধারণকে প্রদীপ্ত করতে থাকবেন। ... বৈদিক যুগে বশিষ্ঠ জনক যাজ্ঞবল্ক্য প্রমুখ গুরুরা কি উপদেশ দেবার জন্য লম্বা-চওড়া ইমারতের অপেক্ষা রাখতেন? শ্রীকৃষ্ণের বিশ্ববিদ্যালয় তো যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে উপস্থিত হল! গাছের নীচে বসে উপদেশ দিলেন বুদ্ধ, মহাবীর। জরথুস্ত্র, খ্রিস্ট, মুহম্মদ—সবার সম্বন্ধেই একই কথা। গ্রীসের সক্রোতিস প্রভৃতি আচার্যরা এখানে-ওখানে অতি সাধারণ জায়গায় বসে কাজ আরম্ভ করে দিতেন। ভারতের মধ্যযুগে শংকর রামানুজ নাগার্জুনের মতো পন্ডিতরা বা কবীর রৈদাস দাদূ প্রভৃতি নিরক্ষর জ্ঞানী সন্তরা ইমারতের পরোয়া করতেন না। ... এইজন্যই উড়িষ্যায় মহাত্মা ব্যক্তিকে বলে 'চলন্ত বিষ্ণু'। আপনাদেরও প্রত্যেককে সেই রকম সচল বিশ্ববিদ্যালয় হতে হবে। ... এ পূজা গতিশীল। ... আপনারাও থেমে যেতে পারবেন না। আপনাদেরই জন্য প্রসিদ্ধ বৈদিক মন্ত্র 'চরৈবেতি চরৈবেতি' উচ্চারিত হয়েছিল। আপনারা এক যুগ থেকে আর এক যুগ পর্যন্ত এক দেশ থেকে আর এক দেশ পর্যন্ত এই পূজাপ্রদীপ বহন করবেন। ঋষির ভাষায় যদি বলি তো—
>
> চরন্বৈ মধু বিন্দতি, চরন স্বাদুমুদম্বরম্।
> সূর্যস্য পশ্য শ্রেমাণং যো ন তন্দ্রয়তে চরন্।।
>
> চরৈবেতি চরৈবেতি।[১০৬]

শক্তির তাণ্ডবের পটভূমিতে

গিরিডি যাওয়ার ইচ্ছা যদি থেকেও থাকে, তা নিয়ে কথা বোধ হয় এগোয়নি। পুজোর ছুটির আগেই ১৯ সেপ্টেম্বর রবীন্দ্রনাথ গিয়েছিলেন কালিম্পঙে, সেখান থেকে কয়েকদিন পরে তাঁকে অসুস্থ অবস্থায় কলকাতায় জোড়াসাঁকোর বাড়িতে নিয়ে আসা হয়েছিল, কিছুটা সেরে ওঠার পরে ১৮ নভেম্বর তিনি শান্তিনিকেতনে ফেরেন আবার। ইতিমধ্যে ক্ষিতিমোহনও ফিরেছিলেন ছুটিশেষে, বিশ্বভারতীর নতুন সত্রকাল আরম্ভ হয়েছিল। ডিসেম্বরের ৯ তারিখে চিনের শিক্ষাবিভাগের অধিকর্তা তাই-চি-তাও (Tai-Chi-Tso)-এর নেতৃত্বে চিনা শুভেচ্ছা মিশনের সদস্যরা শান্তিনিকেতনে এলেন, সম্মানিত অতিথিদের স্বাগত জানাতে বিশ্বভারতীর প্রতিনিধিদল উপস্থিত ছিলেন বোলপুর স্টেশনে, ক্ষিতিমোহন দলমুখ্য। সেই দিনই বিকেলে আম্রকুঞ্জে শুভেচ্ছা মিশনকে বিশ্বভারতীর পক্ষ থেকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত ছিলেন না সেখানে। চিনা শুভেচ্ছা মিশনের প্রতিনিধিরা তাঁর ঘরে গিয়ে দেখা করেন। ২২ ডিসেম্বর ৭ পৌষের পুণ্যদিনে প্রভাতি মন্দির-উপাসনাতেও নেই তিনি, শান্তিনিকেতনে উপস্থিত থেকেও পৌষ উৎসবে যোগ দেওয়া সম্ভব হল না, এমন ঘটনা এবারই প্রথম ঘটল। দত্তাপহারক ফিরিয়ে নিচ্ছেন তাঁর অফুরন্ত শক্তি। আজকাল নিজে হাতে লিখতেও খুব কষ্ট হয়, আঙুলগুলো আড়ষ্ট হয়ে থাকে। তাই তিনি মুখে বলেছিলেন এই বিশেষ দিনটি উপলক্ষে তাঁর ভাবনা ও অনুভবের কথা, অমিয় চক্রবর্তী লিখে নিয়েছিলেন। পৌষ উৎসবে কবির এই সর্বশেষ মন্দির-ভাষণ 'আরোগ্য' পাঠ করলেন ক্ষিতিমোহন, এবং নিজেও এই দিনের যথার্থ তাৎপর্য ব্যাখ্যা করলেন, যেদিন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের দীক্ষালাভের পুণ্যদিন। সেইসঙ্গে এই দিন শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাদিবসও, চল্লিশ বছর পূর্ণ হল এই প্রতিষ্ঠানের।[৭০৭] পরদিনের কাগজে ৭ পৌষের মন্দিরের প্রভাতি উপাসনার সংবাদ প্রকাশিত হল :

> অদ্য শান্তিনিকেতনের চত্বারিংশৎ বার্ষিক উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন মন্দিরে প্রাতঃকালীন উপাসনায় পৌরোহিত্য করিয়া উৎসবের উদ্বোধন করেন। ডাঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দুর্ব্বলতাবশতঃ এই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারেন নাই। কবির "আরোগ্য" শীর্ষক লিখিত বাণী শুনিবার জন্য মন্দিরে বহু সংখ্যক আশ্রমিক প্রাক্তন ছাত্র ও অতিথি উপস্থিত ছিলেন। পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন কর্ত্তৃক উক্ত বাণী পঠিত হয়।[৭০৮]

এ কি শুধুই প্রতিষ্ঠাতা আচার্যের অনিবার্য অনুপস্থিতিতে তাঁর বাণীপাঠ? ক্ষিতিমোহনের অন্তঃকরণ জানে এ এক অমূল্য প্রাপ্তি। ৭ই পৌষে কবির এই শেষ সম্ভাষ আজকের পৃথিবীর অধঃপতিত দুস্থ মানুষকে নিরাময়ের পথনির্দেশ করছে আর-একবার। বলছে :

> যথার্থ আরোগ্য সে জীবনের সকল অবস্থারই সম্পদ। সেই আরোগ্যে আমরা সমস্ত বিশ্বভুবনের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে যোগস্থাপন করতে পারি। ...যুগ প্রতিকূল, বর্বরতা বলিষ্ঠতার

মর্যাদা গ্রহণ ক'রে আপন পতাকা আন্দোলন করে বেড়াচ্ছে রক্তপঙ্কিল মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে। কিন্তু বিকারগ্রস্ত রোগীর সাংঘাতিক আক্ষেপকে যেন আমরা শক্তির পরিচয় বলে ভুল না করি।

সে সকলকে ডাক দিয়ে বলছে :

ঋষিবাক্যে যে পরম মন্ত্র একদিন আমরা পেয়েছিলেম সে হচ্ছে শান্তং শিবম্ অদ্বৈতম্—এক সত্যের মধ্যে সত্যের এই তিন রূপ বিধৃত। শান্তি এবং কল্যাণ এবং সর্বসাধারণের মধ্যে ঐক্য—এই বাণীর তাৎপর্য মানুষকে তার সত্য পরিচয়ে উত্তীর্ণ করতে পারে, ...।[৭০৯]

এই অন্বেষণ ক্ষিতিমোহনেরও। শাস্ত্রজ্ঞানী থেকে আত্মভোলা নিরক্ষর সাধক—সকলেরই উপলব্ধিজাত বাণীতে তিনি সন্ধান করেছেন একটি প্রশ্নের উত্তর : কোন্ পথে গেলে মানুষ তার সত্য পরিচয় লাভ করবে। জগৎজুড়ে যখন হানাহানি মারামারি চলছে, মানুষের দুঃখ-দুর্গতির যখন শেষ নেই, ধর্মের কথা শুনতে যখন কেউ প্রস্তুত নয়, তখনও তাঁর মন বলে ধর্ম ছাড়া এই দুর্গতির মধ্যে আর কোনো আশ্রয় নেই। এই দুঃসময়ে ধর্মকেই জীবনের চালক হতে হবে, দিনগত প্রয়োজনময় জীবনকে ধর্মের চালক করলেই বিপদ। মহাপুরুষেরা ধর্মাধর্মের যে সংজ্ঞা দিয়েছেন, ক্ষিতিমোহন তা শোনান তাঁর পাঠককে, বলেন :

উপনিষৎবাণীগুলির মধ্যে দেখা যায় আচার-অনুষ্ঠান সম্প্রদায় বিধিনিষেধ সকলের উপরে মানুষ ও তাব মাহাত্ম্য।

তিনি অবিচল বিশ্বাসে বলেন :

শাশ্বত সত্যময় ঋষিবাক্যের সঙ্গে স্বাধীন বিচারের কোনোই বিরোধ নেই। বরং সেই সব সাধকবাণী ভিতরের বাইরের সব বৃথা দাসত্ব হতে আমাদের চিত্তকে মুক্ত করে দেয়।[৭১০]

এদিকে অবশ্য, পৃথিবীব্যাপী শক্তিমদমত্তের প্রবল দাপটে, তাদের একে অন্যকে অবদমিত করার দুঃসহ চেষ্টার অভিঘাতে নিরুপায় মানুষের ভিতর-বাইরের হিসাবনিকাশ সবই গোলমাল হয়ে যাচ্ছে যেন। পশ্চিম মহাদেশে হিংস্র শক্তির তাণ্ডব চলেছে, যুদ্ধপরিস্থিতি ভয়াবহ। ভারতের রাজনৈতিক আবহাওয়াও অশান্ত। তার স্রোত-প্রতিস্রোতের আলোড়নে আক্ষেপে সমস্ত দেশ তোলপাড়। তারই মধ্যে দিয়ে দিন এগিয়ে চলে, বছর যায়, বছর আসে। এ দুর্দিনের যেন আর শেষ হবে না কোনোদিন। সবচেয়ে দুঃখকর হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা।

৫ এপ্রিল ১৯৪১ দীনবন্ধু অ্যান্ডরুজের স্মরণদিন, তাঁর মৃত্যুর এক বছর পূর্ণ হল। সকালে মন্দিরে উপাসনা করলেন ক্ষিতিমোহন, অ্যান্ডরুজের জীবনের বিভিন্ন দিকের আলোচনাপ্রসঙ্গে মানবজাতির প্রতি তাঁর ভালোবাসা ও সেবার কথা, দরিদ্র ও সর্বহারাদের মধ্যেই তাঁর ঈশ্বরের সন্ধানলাভের কথা বললেন, বললেন তাঁর জীবনে সকলেরই সমান দাবি ছিল, সবার মনে তাঁর স্মৃতি চিরজাগ্রত হয়ে থাকবে।[৭১১]

মন্দিরে আর যেতে পারেন না বলে বেদনা বোধ করেন রবীন্দ্রনাথ। জীবনের এই অন্তিম পর্বেও তাঁর আত্মিক শক্তির এমনই জোর যে কখনও কখনও যখন আত্মজনদের উদ্‌বিগ্ন আপত্তি সত্ত্বেও কোনো অনুষ্ঠানে কিছু বলেন, সকলে আশ্চর্য হয়ে যান। যত তাঁর উপাসনা ও ভাষণের সম্ভাবনার ক্ষয় হচ্ছে, ততই শান্তিনিকেতন-বিশ্বভারতীর অধ্যাত্ম উত্তরাধিকার বহনের দায়িত্ব এসে পড়ছে অন্য যোগ্য মানুষের উপর। ক্ষিতিমোহন তাঁদের অন্যতমের চেয়েও অনেকটা বেশি। বরং এ ধারণা করা অযৌক্তিক নয় যে, এ দায়িত্ব মুখ্যত তাঁরই উপর সমর্পিত হয়েছে। বছরে বছরে রবীন্দ্রনাথ আশ্রমবাসী সকলকে নিয়ে বর্ষশেষদিনের অস্তগামী সূর্যকে প্রণাম জানিয়ে প্রত্যাসন্ন নতুন দিনের সুরটি মনের মধ্যে বেঁধে নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। এবার তিনি উপস্থিত নেই আর, সূর্যাস্তের পরে মন্দিরে উপাসনা করলেন ক্ষিতিমোহন।[৭১২] পরদিন অতি প্রত্যূষে নববর্ষবরণ অনুষ্ঠানের সূচনা হল বালক-বালিকাদের সমবেত কণ্ঠের বৈতালিক গানে। সূর্যোদয়ের একটু আগে মন্দিরে উপাসনা আরম্ভ হল। ক্ষিতিমোহন আচার্যের আসন গ্রহণ করলেন। সাম্প্রদায়িকতা-বিষজর্জর দেশে এই বিভেদজাত অনিষ্ট যে কোন্ সর্বনাশের দিকে টানছে আমাদের, সেই কথাটাই সেদিন তাঁর মুখ্য আলোচ্য ছিল। প্রসঙ্গত কখনও বাউল গান উদ্ধৃত করছেন : 'তোমার পথ ঢাইক্যাছে মন্দিরে মস্‌জেদে / ও তোর ডাক শুনে সাঁই চলতে না পাই— / আমায় রুখে দাঁড়ায় গুরুতে মুরশেদে।' কখনও আবৃত্তি করছেন সন্ত কবীরের দোঁহা : 'হিন্দু কহত হৈ রাম হমারা / মুসলমান রহিমানা / আপস মে দোউ লড়ে মরত হৈ / মরম কোই নহিঁ জানা।' আবার বেদের উপদেশ উল্লেখ করে বলছেন, শুধু শাস্ত্রপাঠে কোনো ইষ্টলাভ হয় না—প্রতিবেশীকে উপদেশ দান করবার আগে নিজেকে জীবনের সরল সত্যটি উপলব্ধি করে নিতে হবে।[৭১৩]

অস্তগামী সূর্য

যদিও কবির মন জানে 'পুরাতন আমার আপন শ্লথবৃন্ত ফলের মতন ছিন্ন হয়ে আসিতেছে', জীবন তবুও হার মানে না, 'এ মর্ত্যের লীলাক্ষেত্রে সুখে দুঃখে অমৃতের স্বাদ' পায় সে আজও। ১ বৈশাখ সন্ধ্যায় তাঁর অশীতিতম জন্মদিন উপলক্ষে উদয়নপ্রাঙ্গণে সভার আয়োজন, তাঁর স্বাস্থ্যের কারণে খুব শান্ত পরিবেশে অনুষ্ঠান হবে কথা হয়েছে। শ্রদ্ধায়-ভালোবাসায়-মাখা সেই আনন্দোৎসবে কবি জ্বরগায়ে সারাক্ষণ উপস্থিত রইলেন। এই তাঁর শেষবারের মতন সমবেত আশ্রমিক ও অভ্যাগত বন্ধুদের হাত থেকে জন্মবাসরের অর্ঘগ্রহণ। এই উপলক্ষে ভাষণরচনা করেছিলেন 'সভ্যতার সংকট'। জীবনের অবসান-বেলায় রচিত কবির সেই সুবিখ্যাত এবং সর্বশেষ ভাষণ তিনি নিজে পড়েননি, যদিচ সেই ইচ্ছাই তাঁর ছিল। সভায় সে ভাষণ পাঠের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল ক্ষিতিমোহনের উপর। তাঁর দিনপঞ্জিতে এই অনুষ্ঠানসূচির ও কবির বক্তব্যের সংক্ষিপ্ত উল্লেখ আছে।[৭১৪] 'আনন্দ-

বাজার পত্রিকা'-য় লেখা হয়েছিল : 'আচার্য্য ক্ষিতিমোহন সেন সুনির্ব্বাচিত বেদমন্ত্রসমূহ উদ্ধৃত করিয়া কবিগুরুর প্রশস্তি উচ্চারণ করেন।'[৭১৫] আর বিশ্বভারতী নিউজ লেখে, ক্ষিতিমোহন বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করে প্রার্থনা করেন কবি যেন শত শরতের আয়ু লাভ করেন।[৭১৬] তাঁর রবীন্দ্রকেন্দ্রিক জীবন আরম্ভ হয়েছিল 'শারদোৎসব' দিয়ে, আজ তিনি বুঝি নিজের অগোচরে সেই রবীন্দ্রনাথের জীবনকে শেষবিদায় জানাচ্ছিলেন শারদ শুভেচ্ছা দিয়েই। ক্ষিতিমোহন 'সভ্যতার সংকট' পাঠ করবার আগে কবি জন্মদিনের অভিনন্দনের উত্তরে কিছুক্ষণ মুখে মুখে বলেছিলেন। তার পর সভার শেষে ঘরে ফিরে সকলের সঙ্গে কথাবার্তা ও হাসিঠাট্টা করেছিলেন। বলেছিলেন : 'দেখলে তো আমি কতটা পারি, এই 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধটাও আমি অনায়াসেই পড়তে পারতুম, ক্ষিতিবাবুর চেয়ে খারাপও পড়তুম না, কিন্তু কেউ আমাকে তা দিলে না। আচ্ছা, লেখাটা তো আমারই, কাজেই পড়বার অধিকারও তো আমারই থাকা উচিত ছিল। পড়তে দিলে না, তাই ইচ্ছে করেই মুখে অতক্ষণ বললুম, কই কিছু তো হল না। এ কি তোমাদের শরীর পেয়েছো?'[৭১৭]

কী জানি এ কথা ক্ষিতিমোহন জেনেছিলেন কি না। পরদিন সন্ধ্যাবেলা তিনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন, তখন যে-সব কথাবার্তা হয়েছিল, সে-সব হাসিঠাট্টার কথা নয়, জীবনের সামঞ্জস্য রক্ষা করতে না-পারায় অতীতে প্রাণীজগতে যে মহতী বিনষ্টি ঘটেছে, বা মানবসভ্যতার কী পরিণতি ঘটতে পারে—এমন-সব গুরুগম্ভীর প্রসঙ্গ।[৭১৮]

সেবার চট্টগ্রামে সেখানকার সাহিত্য পরিষদের সহযোগিতায় সেন্ট প্ল্যাসিড স্কুল হলে মহাসমারোহে ১০-১২ মে যে রবীন্দ্রজয়ন্তী অনুষ্ঠান হল, ক্ষিতিমোহন ছিলেন তার মূল সভাপতি।[৭১৯] এ ছাড়া গরমের ছুটির সময় সম্ভবত বাড়িও গিয়েছিলেন। ছুটিশেষে বিশ্বভারতীর কাজ আরম্ভ হল। রবীন্দ্রনাথ নিজের গৃহশয্যায় বন্দী, কদাচিৎ দেখা হয় তাঁর সঙ্গে। 'রুগীকে ক্লান্ত করা হবে বলে এতদিন আশ্রমবাসী সকলেই গুরুদেবকে দেখবার ইচ্ছা দমন করে রেখেছিলেন। এমনকী তাঁদের মধ্যে যাঁরা কবির নিকটতম, তাঁরাও আসতেন না ওঁর দুর্বলতার উপর পাছে ক্লান্তির বোঝা চাপে।'[৭২০] মৈত্রেয়ী দেবী অবশ্য এ কথা বলেন না। ১৯৪০ সালের কথায় তিনি বলেন :

> কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ক্রমেই যেন নিঃসঙ্গ বোধ করছেন। উদয়ন গৃহ তাঁর কাছে 'রাজপ্রাসাদ'। ... যেমন ধীরে ধীরে আকাশের রঙ পালটিয়ে সন্ধ্যার বর্ণচ্ছটা অন্ধকারে মিলিয়ে যায় তেমনি যেন তাঁর আদর্শগুলি ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে—তিনি দূরে সরে যাচ্ছেন। 'সম্মানের উচ্চ মঞ্চে বসেছি সংকীর্ণ বাতায়নে'। সংসারের কেন্দ্রে তিনি নেই—সেখানকার কলরব শুনতে পাচ্ছি অথচ তার সঙ্গে আমার যোগ নেই—এইরকম একটা ভাব দেখেছি অস্পষ্ট কষ্টের মতো লেগে থাকত। ...উদীচীর বাগানে প্রথম গোলাপ যেদিন ফুটল সেদিন সকলের কী আনন্দ! কবি তো আনন্দিত কিন্তু সে আনন্দ একেবারে ক্ষোভশূন্য নয়—এই গোলাপ বাগান এখানে কেন? এ কেন লাইব্রেরীর সামনে নয়, এ তো হতে পারত সকলের।...

উদয়নের বৈঠকখানা বাড়িতে যে তাসের সভা বসে কবিকে তা পীড়িত করে। একে তাকে জিজ্ঞাসা করেন, "ঐ হো-হো সভা জমেছে নাকি?" কিন্তু স্পষ্ট প্রতিবাদ করেন না। যাঁদের নিয়ে শান্তিনিকেতনে নতুন বিশ্ব রচনা করেছিলেন তাঁরাও এখন বৃদ্ধ, দূরে সরে গেছেন।[৭২১]

শান্তিনিকেতনে নতুন বিশ্বরচনায় যাঁরা সাথী ছিলেন, তাঁদের পক্ষের কথাটা শোনা হয় না, স্বেচ্ছায় তাঁরা তাঁদের গুরুদেবের কাছ থেকে সরে গিয়েছিলেন, এ কথা বিশ্বাসও হয় না। ক্ষিতিমোহনের কথা বলি, ষাট বছর বয়স হল বটে, বৃদ্ধ হয়ে গেছেন এ কথা বলা চলে না, অশক্ত তো নন-ই। রবীন্দ্রনাথের চারপাশে বেশ কিছুকাল থেকে ক্রমে ক্রমে একটা অদৃশ্য পাঁচিল উঠেছে, তাঁর সঙ্গে শান্তিনিকেতনের পুরোনো কালের দূরত্ব ঘটিয়েছে সে-ই। যাই হোক, ইতিমধ্যে তাঁর অস্ত্রোপচারের সিদ্ধান্ত পাকা হতে ২৫ জুলাই তাঁকে বিশেষ সেলুনে কলকাতায় নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা হয়ে গেল। যাওয়ার আগের দিন বিশ্বভারতীর অনেকে দেখা করতে এলেন, 'সন্ধ্যের পর নন্দলালবাবু, ক্ষিতিমোহনবাবু এবং ওই রকম দু-চারজন এলেন কবিকে প্রণাম করতে। উনি খুব খুশি সকলকে দেখে।'[৭২২] পরদিন ভোরবেলাতেই যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে পুবদিকের জানালার কাছে বসেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, একটু পরে আশ্রমের ছেলেমেয়ের দল 'এদিন আজি কোন ঘরে গো খুলে দিল দ্বার' গাইতে গাইতে উদয়নের ফটক পার হয়ে কবির জানালার নীচে এসে দাঁড়াল। অনেকদিন ওরা ওদের গুরুদেবের কাছে আর আসতে পায় না, এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে : 'কবির কাছে কারো আসা নিষেধ তাঁর শরীরের ক্ষতি হবে বলে। আজ তিনি একটু পরেই বিদায় নিয়ে যাবেন'—তাই হয়তো নিয়মের গ্রন্থি একটু শিথিল, ব্যাকুল প্রাণে বহু মানুষই এসে জড়ো হয়েছেন উদয়নের সামনে।[৭২৩] যাত্রার সময় হয়ে এল। রবীন্দ্রনাথের আশ্রম থেকে এই শেষবিদায়ক্ষণের স্মৃতি ক্ষিতিমোহনের লেখায় পাই :

তাঁকে উপরতলায় স্ট্রেচারে শোয়ানো হয়েছে। কি একটি কথা জিজ্ঞাসা করবার জন্য আমাকে সবাই উপরতলায় তাঁর কাছে পাঠালেন। কথা হয়ে গেল। বিদায় চাইলাম। কিন্তু তিনি দাঁড়াতে বললেন। আমার সর্বাঙ্গে তিনি হাত বোলাবার মত আশীর্বাদ-দৃষ্টি বুলিয়ে দিলেন।

কি যেন তিনি বলতেও যাচ্ছিলেন, ঠিক তখনই তাঁকে বহন করে নিয়ে সকলে চললেন। কি যেন তাঁর বলবার ছিল বলতে পারলেন না। হয়তো কোনো দুঃখেরই কথা। তাই বড় দুঃখের দৃষ্টিতে তিনি একবার পিছনে ফিরে তাকালেন, তাঁর সেই কাতর দৃষ্টি কখনও ভুলব না। ...তাঁর সেই শেষ বেদনাভরা বিদায়দৃষ্টি চিরদিনই মনে থাকবে।[৭২৪]

মনটা কেঁদে উঠেছিল সেই বিষণ্ণ চাহনি দেখে, মনে পড়েছিল তাঁরই গান—'মনে কী দ্বিধা রেখে গেলে চলে'। গুরুদেবের শেষবিদায়দৃশ্যের সঙ্গে চিরকালের মতো জড়িয়ে গেল 'তাঁরই কণ্ঠে শোনা আর এক উদ্দেশ্যে রচিত তাঁরই গান', বার বার মনে হত 'বারেক তোমায় শুধাবারে চাই বিদায়কালে কী বলো নাই, / সে কি রয়ে গেল গো সিক্ত যূথীর গন্ধবেদনে।।'

কী কথা যে ছিল কবির মনে, সে আর কোনোদিনই জানা হল না। ৩০ জুলাই অপারেশনের খবর পাওয়া গিয়েছিল, ৩ আগস্ট থেকে অবস্থার অবনতি ঘটল, ৭ আগস্ট

২২ শ্রাবণ বৃহস্পতিবার মধ্যাহ্নে দেহের বন্ধন ছিন্ন হয়ে গেল তাঁর। রবীন্দ্রনাথ চলে গেলেন।

শান্তিনিকেতন ছিল তাঁর প্রাণপ্রিয়, তাঁর নিজের ইচ্ছা যদি মূল্য পেত এইখানেই তাঁর শেষশয্যা পাতা হত। মৈত্রেয়ী দেবীর লেখায় পড়েছি, তিনি বলতেন : 'যে নিয়মে ঝরে পড়ে শুকনো পাতা, পরিপক্ব ফল, সেই নিয়মেই আমি জীবনের বৃন্ত থেকে খসে পড়তে চাই। টানা-হেঁচড়া করে লাভ কি।'[৭২৫] এ কথা যে কেবল ব্যক্তিবিশেষকেই বলেছেন, তা নয়, কথাপ্রসঙ্গে এ কথা তাঁর মুখে অনেকেই শুনেছেন। ক্ষিতিমোহন লিখেছেন একদিন 'বলাকা'-র 'ছবি' কবিতা আলোচনার সময় তিনি বলেছিলেন :

> মৃত্যুর পূর্বক্ষণে ঔষধপত্র-মালিশের গন্ধে ঠাসা হাসপাতালী রকমের ঘর থেকে যেন সকলে আমাকে বের করে মুক্ত আকাশের তলে শান্ত নদীতীরে আমাকে যেন বিদায় দেয়, এইটিই আমি মনে মনে চাই। ....বিদায় হবে বিদায়েরই মতো শান্ত সুন্দর ও স্নেহাশীর্বাদে ভরপুর।[৭২৬]

মনে আসে, যেন তিনি গানে যা বলেছেন তারই প্রতিধ্বনি শুনছি : 'আমার যাবার বেলাতে সবাই জয়ধ্বনি কর্। / ভোরের আকাশ রাঙা হল রে, / আমার পথ হল সুন্দর।।' বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথের শেষসময়ের দায়িত্বাধিকারীরা এমন অবাস্তব ভাবুকতায় কর্ণপাতও করেননি। মর্তজীবনের যখন অবসান হয়ে গেল, তখনও যে শান্তিনিকেতনের পক্ষ থেকে মরদেহ সেখানে নিয়ে যাওয়ার জন্য আর-একবার শেষচেষ্টা হয়েছিল, তার হদিস পাওয়া গেল নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের স্মৃতিচারণে। তিনি লিখেছেন :

> শান্তিনিকেতন থেকে ২২শে শ্রাবণের অপরাহ্ণে আমরা কয়েকজন এসে পৌঁছেছিলাম কলকাতায় ক্ষিতিমোহনবাবুর অনুরোধপত্র নিয়ে যে, গুরুদেবের মরদেহ যেন শান্তিনিকেতনে নেবার ব্যবস্থা করা হয় সেখানে দাহ করার জন্যে। শেষ পর্যন্ত সম্ভব হল না সে ব্যবস্থা করা।[৭২৭]

নির্মলকুমারী মহলানবিশও লিখেছেন, রবীন্দ্রনাথের একান্ত ইচ্ছা ছিল শান্তিনিকেতনের মাটিতেই তাঁর দেহ মিশিয়ে যায়, পাছে কলকাতার উন্মত্ত কোলাহলের মধ্যে তাঁর জীবনাবসান ঘটে—এ কথা ভেবে তিনি আতঙ্কিত হতেন।[৭২৮] দায়িত্ববোধহীনতার কারণে, পূর্বপরিকল্পনার অভাবে যে অরুচিকর এবং শোচনীয় পরিবেশে কবির শেষযাত্রা সারা হয়েছিল, রবীন্দ্রানুরাগী মানুষের মন থেকে তার গ্লানি কোনোদিন মুছে যায়নি। এ কথা জেনে তবু একটু সান্ত্বনা পাওয়া যে, সেসময় শান্তিনিকেতন কিন্তু তার আপন কর্তব্যে অবিচল ছিল। নিমতলাঘাট শ্মশানে কবির শেষকৃত্য সম্পন্ন হল অপরাহ্ণবেলায়। দাহ কাজ যখন চলছে, শান্তিনিকেতনবাসীরা তখন সমবেত হয়েছিলেন মন্দিরে। একটি সশ্রদ্ধ নীরবতার মধ্যে ক্ষিতিমোহন শান্তস্বরে প্রার্থনা করছিলেন ইহজীবন থেকে সদ্যপ্রসৃত সেই মহান আত্মার শান্তিকামনায়। উপাসনাশেষে গান হল : 'সমুখে শান্তিপারাবার ভাসাও তরণী হে কর্ণধার'।[৭২৯] সে তো বেশিদিনের কথা নয়, এই তো সেদিন কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর চিরাত্মীয়দের শুনিয়েছিলেন তাঁর শেষইচ্ছার কথা। বলেছিলেন জীবনলক্ষ্মীর সঙ্গে তাঁর

শেষবিচ্ছেদের দিনে 'জীবনের পূর্ণ ঘট নিয়ে' তাঁরাও যেন যোগ দেন তাঁর অন্তিম অনুষ্ঠানে। উপাসনায় গানে আশ্রমবাসী কবির শেষইচ্ছাই পূর্ণ করছেন।

অলংকার খুলে নেবে, একে একে বর্ণসজ্জাহীন উত্তরীয়ে
ঢেকে দিবে, ললাটে আঁকিবে শুভ্র তিলকের রেখা ;
তোমরাও যোগ দিয়ো জীবনের পূর্ণ ঘট নিয়ে
সে অন্তিম অনুষ্ঠানে, হয়তো শুনিবে দূর হতে
দিগন্তের পরপারে শুভশঙ্খধ্বনি।[৭৩০]

'হয় যেন মর্তের বন্ধনক্ষয়, বিরাট বিশ্ব বাহু মেলি লয়'—আশ্রমহৃদয়ের প্রার্থনা ধ্বনিত হচ্ছিল সেই অসামান্য মানুষটির প্রয়াণপথে, ভালোবাসায়-প্রীতিতে স্নেহে-শ্রদ্ধায় যাঁর জীবনের সঙ্গে সুখে-দুঃখে তার জীবন জড়িয়েছিল এতকাল। আজ যিনি 'অনলস সাধনাময় পরম সুন্দর অশীতি বৎসরব্যাপী একটি তাপসজীবন' যাপন করে আপনার সাধনোচিতলোকে প্রয়াত হয়েছেন, তাঁর উদ্দেশে তার ঐকান্তিক কাঙ্ক্ষা বৈদিক মন্ত্রে ব্যক্ত হচ্ছিল :

তপসা যে অনাধৃষ্যাস্তপসা যে স্বর্যযুঃ।
তপো যে চক্রিরে মহস্তাংশ্চিদেবাপি গচ্ছতাৎ॥

তপোবলে যাঁহারা দুর্ধর্ষ, তপোবলে যাঁহারা স্বর্গলোকে প্রয়াত, মহতী তপস্যায় যাঁহারা সিদ্ধ, তুমিও তাঁহাদের মধ্যে গমন করো।

যে চিৎপূর্ব ঋতসাতা ঋতজাতা ঋতাবৃধঃ।
ঋষীন্ তপস্বতো যম তপোজাঁ অপি গচ্ছতাৎ॥

যে সকল পূর্বতাপসগণ সাধনাতেই উৎসর্গীকৃতপ্রাণ, সাধনার মধ্যে যাঁহারা নবজন্মপ্রাপ্ত, সাধনাকে যাঁহারা নিত্যই অগ্রসর করিয়া গিয়াছেন, হে সংযত তাপস, তুমিও তাঁহাদের মধ্যে গমন করো।

সহস্রণীথাঃ কবয়ো যে গোপায়ন্তি সূর্য্যম্।
ঋষীন্ তপস্বতো যম তপোজাঁ অপি গচ্ছতাৎ॥

যে সকল অপারদৃষ্টিসম্পন্ন কবিগণের জ্যোতির কাছে সূর্য্যের আলোকও পরিম্লান, সেইসব তপস্বী ঋষিগণের মধ্যে হে পরম তপস্বী, তুমিও গমন করো।[৭৩১]

শেষ তর্পণ

৩২ শ্রাবণ ১৩৪৮, ১৭ আগস্ট ১৯৪১। রবিবার। আশ্রমগুরু রবীন্দ্রনাথের শ্রাদ্ধবাসর। শান্তিনিকেতন আশ্রমে সকাল প্রায় সাড়ে ছটায় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত বিধুশেখর ভট্টাচার্য ও পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেনের যুগ্ম পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠান আরম্ভ হল।

ছাতিমতলায় অনাড়ম্বর আয়োজন।* গাম্ভীর্যপূর্ণ শান্ত পরিবেশে আদিব্রাহ্মসমাজ-বিধি অনুসারে অধ্যাত্মকৃত্য সম্পাদন-কর্মসূচি, কয়েকটি রবীন্দ্রসংগীত। পুরোহিতদ্বয়ের কখনও একক, কখনও যুগ্মকণ্ঠের মন্ত্রোচ্চারণের মধ্য দিয়ে ব্রহ্মোপাসনা, লোকাতীত পথের যাত্রী বিদেহী আত্মার জন্য অন্তিম প্রার্থনা :

প্রেহি প্রেহি পথিভিঃ পূর্বেভির্যত্রা নঃ পূর্বে পিতরঃ পরেয়ুঃ।

যে চিরন্তন পথে আমাদের পিতৃগণ চিরদিন প্রয়াণ করিয়াছেন সেই পথেই আজ তুমি অগ্রসর হইয়া যাত্রা করো।

হিত্বায়াবদ্যং পুনরস্তমেহি স্বংগচ্ছস্ব তন্বা সুবর্চাঃ।

যাহা কিছু মলিন তাহা আজ ত্যাগ করিয়া যাও, আজ শোভন-দীপ্ত পুণ্যতনু লইয়া সেই স্বর্গলোকে গিয়া তাঁহাদের সহিত মিলিত হও।

এই সঙ্গে উদ্‌গীত হয় আলোকের প্রার্থনা, মৃত্যুর অন্ধকার উত্তীর্ণ হয়ে অমৃতের স্পর্শ পাওয়ার প্রার্থনা। 'তমসো মা জ্যোতির্গময় মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময়'—অন্ধকার হইতে আমাকে জ্যোতিঃস্বরূপে লইয়া যাও, মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃতস্বরূপে লইয়া যাও ; 'পরৈতু মৃত্যুরমৃতং ন এতু'—মৃত্যু আমাদের নিকট হইতে অপগত হউক, আমাদিগের নিকট অমৃত আবির্ভূত হউক।[৭৩২]

তবু ব্যথায় প্রাণ কাঁদে, অভাববোধ পীড়িত করে। সমগ্র শান্তিনিকেতন আশ্রমের অস্তিত্বটাই যেন তার প্রাণপুরুষের তিরোধানে নিঃসীম সবেদন শূন্যতায় হারিয়ে যেতে চায়। রবীন্দ্রনাথের শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের পরে সেই দিনই—১৭ আগস্ট ১৯৪১ নেপালচন্দ্র রায়কে লেখা ক্ষিতিমোহনের একটি চিঠি হাতে এসেছে, তার খানিকটা উদ্ধৃত করি :

শ্রদ্ধাস্পদেষু

সকালে গুরুদেবের শ্রাদ্ধ হয়ে গেল। হায়, চিরদিন যাঁর জন্মোৎসব করেছি আর [আজ] করলাম তাঁর শ্রাদ্ধ ! ভাগ্য !

লাবুর হাতে আপনার পত্র পেলাম। তারা আমাদের এখানে এলে তাদের কিছু কষ্ট লাঘব করা যেত। যাক দুঃখ সুখ সবই চলে যায়, আজকের দিনের কথাই মনে থাকবে। আমার পত্র সময়মতো পৌঁছেও যে কোনো কাজে লাগে নি তার জন্য খেদ কিসের? জগতে কষ্ট [...] চেষ্টাই ব্যর্থ হয়। এ আর কি? তবু যদি বিধাতার অভিপ্রায় থাকে তবে একদিন এর দ্বারাও কাজ হবে।

আমাদের কাজে সবচেয়ে বোধ হোলো আপনার অভাব। মনে হোলো আপনি যেন আমাদের মধ্যেই আছেন। হয়তো অন্তরে অন্তরে ছিলেনও। এখানকার অনুষ্ঠানের কথা ও মন্ত্রাদির কথা ওদের কাছেই শুনতে পাবেন। ...

জোড়াসাঁকোতে দেখা হইলে সব কথা হইবে। ভাল আছি—লিখতে লজ্জা হয়। তবু ভালই আছি।[৭৩৩]

* 'আমার শ্রাদ্ধ যেন ছাতিম গাছের তলায় বিনা আড়ম্বরে বিনা জনতায় হয়—'
ইন্দিরা দেবীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি। ২৫ অক্টোবর ১৯৩০ : চিঠিপত্র ৫। ৭৯

ক্ষিতিমোহনের ব্যথাহত হৃদয়ের স্পর্শ রয়ে গেছে এই চিঠিতে। কিন্তু নিজের লেখা যে চিঠির উল্লেখ করেছেন ক্ষিতিমোহন, এবং সে সম্পর্কে নিস্পৃহ মন্তব্য করেছেন, মনে হয় তা নেপালবাবুর কোনো প্রাসঙ্গিক খেদোক্তির উত্তরে। সেটা কি ক্ষিতিমোহনের সেই অনুরোধপত্র, যাতে তিনি গুরুদেবের মরদেহ অন্ত্যেষ্টির জন্য শান্তিনিকেতনে নিয়ে আসবার প্রস্তাব করেছিলেন? পরের পঙ্‌ক্তির 'বিধাতার অভিপ্রায়'-প্রসঙ্গ বোঝা যায় না বলে অনুমানে একটুখানি দ্বিধা থেকে যায়, না-হলে কথাটা আর কিছু হতে পারে না। এর সামান্য কয়েকটা দিন পরেই হয়তো কারা এসেছিলেন শান্তিনিকেতন দেখতে, আগে কখনও আসেননি। ক্ষিতিমোহনের কাছে এলে তিনি বেদনার্ত কণ্ঠে বলেছিলেন, 'এখন আর কী দেখতে এলেন! নন্দপুরচন্দ্র বিনা বৃন্দাবন অন্ধকার।'[৭৩৪] ক্ষিতিমোহনের নিজের বাকি জীবনটা এই রবীন্দ্রনাথহীন রবীন্দ্রনিকেতনেই কাটবে। তাঁর জীবনের সেই অন্তিম পর্বের আঠারো-উনিশ বছরের ইতিহাস-আলোচনা এখনও বাকি। এবার সেই কথা।

রবীন্দ্রোত্তর কালের শান্তিনিকেতনে

আশ্রমই যাঁর গৃহ

শান্তিনিকেতনের সীমানা ক্রমশ বেড়েছে। বিশ বিঘা জমির উপর যে আশ্রমের সূচনা, তার দক্ষিণদিকের বিস্তীর্ণ জমি ইজারা নেন দ্বিপেন্দ্রনাথ, পরে তা রবীন্দ্রনাথ কিনেছিলেন। পূর্বদিকের জমিও সরকারি সহায়তায় কেনা হয় বিশ্বভারতীর জন্য। ১৯৩২ সালের 'প্রবাসী'-তে খবর আছে যে বিশ্বভারতী অনেক জমি কিনেছেন, তার একাংশে কর্তৃপক্ষ গৃহস্থপল্লি পত্তন করতে চান। আপাতত একত্রিশটি ভিটা বিলি করা হবে। যাঁরা জমি কিনতে চান তাঁরা নকশা মূল্য ও শর্তাদি সহ দলিলের খসড়ার জন্য বিশ্বভারতীর সাধারণ সম্পাদককে লিখতে পারেন। পরের সংখ্যায় প্রস্তাব দেওয়া হল বিশ্বভারতীর উপনিবেশ বিস্তৃততব করার সুযোগ আছে। পশ্চিমদিকে সুরুল গ্রাম ও শান্তিনিকেতনের মধ্যে যে বাইশশো বিঘা জমি কিনেছেন বিশ্বভারতী, তার মধ্যে প্রায় চোদ্দোশো বিঘা জমি উঁচু ও শুকনো বলে বাস্তুভিটা নির্মাণের অত্যন্ত উপযোগী।[১] মনে হয় এই প্রস্তাব বিশ্বভারতী বাস্তবায়িত করেছিলেন। ১৯৪০ সালে বা তার কাছাকাছি সময় থেকে নিরানব্বই বছরের লিজে ছ-সাতটি জমির প্লট বিলি করা হয়। শান্তিনিকেতন আশ্রমসংলগ্ন পশ্চিমদিকে শ্রীনিকেতনে যাওয়ার পথে এখন যে শ্রীপল্লি, এইভাবে তার পত্তন। বিশ্বভারতীর শর্তে যাঁরা এই সময়ে জমি নিলেন. অবস্থানের দিক দিয়ে তার সবচেয়ে প্রথমে ক্ষিতিমোহন সেন, তার পরে আশুতোষ সেন, তার পরে নেপালচন্দ্র রায় এবং আরও কয়েকজন। ক্ষিতিমোহনের কনিষ্ঠ জামাতা ড. আশুতোষ সেন ও কন্যা অমিতা সেন ১৯৪০ সালে বর্মা থেকে ফিরে কর্মসূত্রে দিল্লিতে বাস করতে শুরু করেন। শান্তিনিকেতনের জমিতে তাঁরা একটি বাড়ি তৈরি করলে তাঁদের অনুরোধে ক্ষিতিমোহন-কিরণবালা গুরুপল্লির বাড়ি ছেড়ে সেই গৃহে এসে উঠলেন।

এখনকার শ্যামল সরস শ্রীপল্লির সঙ্গে সেদিনের এই অঞ্চলের একেবারেই কোনো মিল ছিল না, তখন শুধু গাছপালাহীন উষর ভূমির বিস্তার চারপাশে। গুরুপল্লি ছেড়ে এসে তাই প্রথম প্রথম এখানে তাঁদের মন বসত না। ক্রমশ নিজের নিজের জমিতে সবে-লাগানো গাছপালাগুলো একটু বড়ো হয়ে উঠতে জায়গাটায় সবুজের ছোঁয়া লাগল। অমিতার বাড়ির সোনাঝুরি গাছের পাতার আড়াল থেকে যেদিন পাখি ডাকল, সে একটা বেশ মনে রাখবার মতো ঘটনা হল যেন। 'এ বাড়িতে এসে মায়ের মন টিঁকত না। কোনো গাছপালা নেই,

পাখি আসে না।' অমিতা সেনের এখনও মনে পড়ে। 'একদিন শুনছি, গরমকালের ভরদুপুর তখন, চারদিক নিস্তব্ধ, অনেক দূর থেকে চিলের ডাক শুনতে পেয়ে বাবা ডাকছেন মাকে—কিরণ, শোনো কান পেতে—চিল ডাকছে।'

ক্ষিতিমোহনের জমির পরিমাণ দু-বিঘা। সেই জমিতে একটি একতলা পাকা বাড়ি তৈরি হল ১৯৪২ সালে। ক্ষিতিমোহনের পরিবার তখন থেকে সেখানে বাস করতে শুরু করে। ক্ষিতিমোহন কন্যার বাড়ির নাম দিয়েছিলেন 'প্রতীচী', পরে নিজের বাড়ির নাম দেন 'শান্ত-শিবালয়'। হয়তো এ নামকরণ আরও অনেকদিন পরের ঘটনা। ক্ষিতিমোহনের পুত্র ক্ষেমেন্দ্রমোহন শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিক পাস করে কলকাতায় থেকে স্কটিশ চার্চ কলেজে পড়তেন। ছাত্রজীবন থেকেই দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে সক্রিয় যোগ তাঁর, অনেকবার তিনি কারাবরণ করেছেন। অমিতার বিয়ের আগের দিনও তিনি গ্রেফতার হন, শান্তিনিকেতনে বিবাহ-উৎসবের আনন্দ ম্লান হয়ে গিয়েছিল। সেবার মাত্র চার মাসের জন্য তাঁর জেল হলেও ১৯৪২ সালে ভারত ছাড়ো আন্দোলনে যোগ দিয়ে তিনি তিন বছরের জন্য বন্দী হয়েছিলেন। ১৯৪৫ সালে মুক্তি পাওয়ার পরে তাঁর চাকরিজীবনের শুরু। বিবাহ হয় ১৯৪৭ সালে, স্ত্রীর নাম অণিমা। পাঁচ বছর পরে ১৯৫২ সালে তাঁদের দুই যমজ পুত্র জন্মগ্রহণ করে। পিতামহ নামকরণ করেন শান্তভানু ও শিবাদিত্য।

যখন ক্ষিতিমোহনের বয়স সবে ষাট ছুঁয়েছে, তখনই এ কথা তাঁর মনে হচ্ছিল যে বিশ্বভারতীতে যেহেতু ষাট বছর বয়সে অবসরগ্রহণের নিয়ম হয়েছে, এবার এখানে তাঁর কর্মসমাপনের কথা। তা হলে তাঁর পক্ষে গুজরাতের বন্ধুদের কাছে যাওয়া সহজ হতে পারবে। পাঠকের মনে থাকতে পারে, ১৯৪০ সালে যে চিঠিতে তিনি ছাত্রকে এ কথা বলেছিলেন তাতেই তাঁর মনের ভাব আরও একটু ধরা পড়েছিল। ক্ষিতিমোহন প্রসঙ্গক্রমে লিখেছিলেন : 'গুরুদেব না বলিলে যে আমি কিছুই করিতে বা ছাড়িতে পারি না এই তো মুস্কিল।' যাঁর মুখের কথা তাঁর কাছে আদেশের অধিক ছিল, সেই গুরুদেব আজ লোকান্তরিত, ক্ষিতিমোহনও একষট্টিতে পা দিয়েছেন। বাঁধন তবু ছিঁড়ল কই। আগামী আরও প্রায় চোদ্দো-পনেরো বছর শান্তিনিকেতন-বিশ্বভারতীর কাজ নিয়েই তাঁর কাটবে। তিনিও ছাড়বেন না বিশ্বভারতীকে, বিশ্বভারতীও ছাড়বে না তাঁকে। ১৯৪৯ সালে এমিরিটাস অধ্যাপক হওয়ার পরেও তো তাঁকে রবীন্দ্র-সাহিত্যের ক্লাস নিতে দেখি। আর উৎসবে-অনুষ্ঠানে তো অপরিহার্য তাঁর ভূমিকা। তাঁর সেই ভূমিকার মূল্য উপলব্ধি করতে পেরেছেন বলেই অমিতাভ চৌধুরী লিখেছেন :

> যখন শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ নেই প্রশাসনের শীর্ষে রথীন্দ্রনাথ, আশ্রমগুরুর ভূমিকায় তখন ক্ষিতিমোহন। রবীন্দ্রনাথের অভাব অনুভব করেনি ছাত্ররা। উপাসনায় তিনি আচার্য, ঋতুউৎসবে তিনি পরিচালক, যে-কোনো সমস্যায় তিনি প্রধান পরামর্শদাতা। নন্দলালও ছিলেন। বুধবারের মন্দির, ৭ই পৌষ, নববর্ষ, বর্ষশেষ, ২২শে শ্রাবণ, খৃস্টোৎসব—আশ্রমজীবনের এসব অবশ্যপালনীয় দিনগুলি যথাযথ মর্যাদায় পালিত হয়েছে এঁদের তত্ত্বাবধানে।[২]

রবীন্দ্রনাথের শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের দু-দিন পরে ১৯ আগস্ট ছিল অবনীন্দ্রনাথের জন্মতিথি, শান্তিনিকেতনে যথাযোগ্য মর্যাদায় দিনটি পালিত হয়েছিল। সকালে মন্দির-উপাসনায় শিল্পাচার্যের দীর্ঘজীবন প্রার্থনা করে ক্ষিতিমোহন বলেছিলেন শিল্প হচ্ছে দেবতার স্তব। রূপের পথ ধরে অরূপের সমীপবর্তী হন শিল্পী, আপন সৃষ্টির ভিতর দিয়ে সুন্দরকে প্রকাশ করার ব্রত তাঁর। কলাভবনে সেদিন অপরাহ্ণে এই উপলক্ষে চিত্রপ্রদর্শনীর উদ্‌বোধন হবে। কিন্তু সংগীতভবন ও কলাভবনের কয়েকজন প্রতিনিধি নিয়ে ক্ষিতিমোহন-নন্দলাল কলকাতায় চলে গিয়েছিলেন জোড়াসাঁকোয় অবনীন্দ্রনাথকে অর্ঘ্য দেওয়ার জন্য।[৩] এর কদিন পরেই ৭ সেপ্টেম্বর বিশ্বভারতী সংসদের অধিবেশনে আগামী দু-বছরের জন্য বিশ্বভারতীর আচার্যপদে অবনীন্দ্রনাথকে নির্বাচনের প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হল।[৪] আচার্য অবনীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে প্রথমবার যখন এলেন ১৯৪২ সালের মার্চ মাসে, আম্রকুঞ্জে তাঁর সংবর্ধনার আয়োজন হল। আশ্রমবাসী সবাই এসে মিলেছিলেন, অনেকদিন পরে যেন এক আপনজনকে পেয়েছেন এই অনুভব নিয়ে। অনুষ্ঠানে যথারীতি ক্ষিতিমোহন মন্ত্রপাঠ করেছিলেন। অবনীন্দ্রনাথ তাঁর ভাষণে বলেছিলেন :

> একটা কথা মনে রেখো তোমরা, এই আশ্রয়নীড়—নিজের হাতে তিনি এই নীড় তৈরি করে গেছেন তোমাদের জন্য। এ যেন না ভাঙে কোনোদিন। তাহলে এত বড়ো দুর্দৈব জগতে আর ঘটবে না। মহাকবির মানসপ্রাণের মানসসৃষ্টির চমৎকারী এই রূপ। এ বস্তু রক্ষা করবার একমাত্র উপায় একপ্রাণ হয়ে একদিকে একভাবে সবাই চলো একসঙ্গে। সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং এই মন্ত্র ধরে থাকো।[৫]

অবনীন্দ্রনাথ আচার্যের ভার নিলেন এবং শান্তিনিকেতনে এলেন বলে আশ্রমের নিরানন্দ উদাস-করা পরিবেশে নতুন প্রাণের সঞ্চার হল যেন, রানী চন্দ লিখেছেন, 'আশ্রম নড়ে চড়ে উঠল।' অবনীন্দ্রনাথ এসে তাঁর ভাষণে একপ্রাণ হয়ে একসঙ্গে চলবার কথা বললেন, রবীন্দ্র-তিরোভাবের পর থেকে ক্ষিতিমোহনও আশ্রমের নানা অনুষ্ঠানে বারবার এই কথাটাই বলছিলেন দেখতে পাই। এই প্রসঙ্গে একটুখানি পিছিয়ে গিয়ে কথাটা শুরু করি। রবীন্দ্রনাথের প্রয়াণের চার মাস পরে ৭ পৌষ আশ্রমপ্রতিষ্ঠার একচল্লিশ বছর পূর্ণ হয়েছিল। ২২ ডিসেম্বর প্রভাতের মন্দির-উপাসনায় ক্ষিতিমোহন সম্ভাষণ করেছিলেন সমবেত আশ্রমিকদের। এই উৎসবদিনের আনন্দানুভবের সঙ্গে সেদিন মিশে ছিল তীব্র বেদনা ও ক্ষতির বোধ। ক্ষিতিমোহন সে কথা উল্লেখ করে বলেছিলেন আজ যখন কালো মেঘে আকাশ ছাওয়া, যখন ঝড়ের আশঙ্কা আমাদের মনে, যে মধ্যাহ্নসূর্য আলো আর উত্তাপ দিয়েছে এতদিন সে অন্তর্হিত,—তবু হতাশাকে প্রশ্রয় দিলে চলবে না। মহৎ প্রাণ তো কেবল শরীরী অস্তিত্বেই বড়ো নয়। এ কথা বলতে গিয়ে তাঁর মনে পড়ছিল ভগবান বুদ্ধের কথা—মহানির্বাণের আগে শিষ্যদের তিনি বলেছিলেন দেহগত জীবনে যদিও তিনি আর থাকবেন না, তাঁর প্রচারিত ধর্ম ও সংঘের মধ্য দিয়ে তাঁর আত্মিক অস্তিত্ব চিরদিন থাকবে। তেমনই গুরুদেবের অন্তরতম অস্তিত্ব তাদেরও অস্তিত্বে মিশে আছে, তাঁর বিদেহী

আত্মা যেমন করে তাদের ঐক্যবদ্ধ করেছে, এমনটা আর কখনও ঘটেনি। সুতরাং সব বিবাদ ভুলে গুরুদেবের আদর্শ উপলব্ধি ও অনুসরণে আমাদের উদ্‌বুদ্ধ হতে হবে।

> তিনি আন্তর্জাতিক শুভেচ্ছা ও সাংস্কৃতিক ভাববিনিময়ের কথা বলেছিলেন বলে একসময় মানুষ উপহাস করেছিল, কিন্তু তার পিছনে যে কী গভীর দূরদৃষ্টি ও মানবপ্রেম ছিল, আজ চরম বিপন্নতার মুখে দাঁড়িয়ে তার মর্ম আমাদের বুঝতে হবে। আমরা, যারা বিশ্বভারতীর মানুষ, এই পৃথিবীজোড়া বিদ্বেষ ও ঘৃণার আবহাওয়ার মধ্যেও আমরা যেন গুরুদেবের সত্য ও প্রেমের অনুসরণে দ্বিধাগ্রস্ত না হই, তাঁর বাণী আমাদের অভয় দিক, তাঁর শক্তি আমাদের মধ্যে নতুন জীবনচেতনা জাগিয়ে তুলুক।

এই শান্তিনিকেতন আশ্রমের মঙ্গলচিন্তায় গুরুদেব কীরকম উদ্‌বিগ্ন হতেন সেই প্রসঙ্গে কথা বলতে বলতে নিজের বাল্যকালে দেখা একটা ঘটনা ক্ষিতিমোহনের মনে পড়ে গিয়েছিল। তাঁদের গ্রামের এক বৃদ্ধা, স্বাস্থ্য ভেঙেছে, জীবনের শেষ কটা দিন তীর্থবাসের সংকল্প নিয়ে যাত্রা করবেন—ঘাটে তাঁর ছেলেরা এসে সব জড়ো হয়েছেন, নৌকা ছাড়ল বলে—ঠিক সেই মুহূর্তে বৃদ্ধা একবার তাকালেন সন্তানদের দিকে। ক্ষিতিমোহন কোনোদিন ভুলতে পারেননি সেই গভীর অনুভবে-ভরা নীরব অথচ বাঙ্‌ময় দৃষ্টি। সেই অন্তর্ভেদী দৃষ্টি যেন দেখতে পাচ্ছিল তাঁর ছেলেরা কেমন ছিল, এখন কেমন হয়েছে, ভবিষ্যতে কেমন হবে বা।

> এখান থেকে শেষবারের মতো চলে যাবার আগে গুরুদেবের চোখেও ঠিক সেই দৃষ্টি দেখেছিলাম—তিনি যেন আশ্রমের সমস্ত ইতিহাসটা একসঙ্গে দেখতে পাচ্ছিলেন—কি ছিল এই আশ্রম, কি হয়েছে, কি হবে ভবিষ্যতে।

আবার বললেন :

> আমার মনে পড়ছে গুরুদেব তাঁর স্মরণীয় প্রবন্ধ 'সভ্যতার সংকট' লেখবার কয়েকদিন পরেও মানবসভ্যতার ভবিষ্যৎ নিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা হয়েছে। মহেঞ্জোদড়ো, ব্যাবিলন মিশর, রোম—আয়তনে বিশাল কিন্তু পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে মানিয়ে চলতে অক্ষম সেই-সব প্রাচীন সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ প্রাগৈতিহাসিক যুগের ম্যামথের জীবাশ্মের মতো পড়ে আছে। গুরুদেব বলেছিলেন আজকের বৃহৎ রাষ্ট্রশক্তিগুলি আয়তনের বিশালতায় নিজেদের নিয়তিকে নিজেরাই ডেকে আনছে—নিজেদের কবর নিজেরাই খুঁড়ছে। একটা বিধ্বংসী আগুন জ্বলে উঠবে—আশা করব ভবিষ্যতে সভ্যতার পুনরুত্থানের জন্য 'নোয়াজ আর্ক'য়ের দেখা মিলবে। গুরুদেব আশা করতেন, সেসময় যখন আসবে তাঁর এই আশ্রম সঠিক ভূমিকাটি পালন করতে পারবে, দূর ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে তার সেই ভূমিকা তিনি তাঁর অন্তর্দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। শান্তং শিবম অদ্বৈতম্ যিনি, সেই পরমপুরুষের নামে সহযোগিতা ও সৌহার্দের মন্ত্রে সে ডাক দেবে সকল মানুষকে।

রবীন্দ্রনাথের এই ভবিষ্যদ্‌বাণী ক্ষিতিমোহনেরও অন্তরের কথা : 'যে সভ্যতা কেবলমাত্র আয়তনলুব্ধ, বস্তুগত প্রগতির লক্ষ্যে সংকীর্ণ স্বার্থের পথ যাকে টানে, যে নিজের চিন্তা ও অনুভবের জগতে মানবসভ্যতার পূর্বার্জিত শ্রেষ্ঠ ধনের সমন্বয় ঘটায় না, তার ভরাডুবি

নিশ্চিত'। প্রসঙ্গক্রমে 'নৈবেদ্য'-র কয়েকটি কবিতা শোনালেন, এই বিদ্যাশ্রমস্থাপনের সমকালেই সেগুলি লেখা।[৬]

১৯৪৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বিশ্বভারতীতে অধ্যাপনার কাজে যোগ দেন। রবীন্দ্রনাথহীন শান্তিনিকেতনের কর্মক্ষেত্রে নিত্য তাঁর বৈদেহী উপস্থিতির অনুভবধন্য পরিবেশে প্রথম কয়েকটা বছর কেমন কাটল তাঁর, সে কথা তিনি বলেছেন তাঁর লেখায়। আর বছর দশেক পরে সেই কবির পরিকল্পিত শান্তিনিকেতন-বিশ্বভারতী যে চোখের সামনে কীভাবে বদলাতে শুরু করল তারও উল্লেখ পাই সেখানে। হীরেন্দ্রনাথ লেখেন :

> এলাম শান্তিনিকেতনে। ...রবীন্দ্রনাথ তখন নেই, কিন্তু তিনি যে শান্তিনিকেতন গড়ে তুলেছিলেন, সে শান্তিনিকেতন তখনও অটুট। ...আনন্দই শান্তিনিকেতনের মূল মন্ত্র। ...আশ্রমবাসী স্ত্রীপুরুষ সকলেই ওই আনন্দমেলার শরিক ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের অবর্তমানেও শান্তিনিকেতনের ওই আনন্দময় জীবনধারাটি বেশ কিছুদিন অক্ষত ছিল। শান্তিনিকেতনে আমার প্রথম দশ বছরের স্মৃতি অবিস্মরণীয়। তার পরে চোখের সুমুখেই দেখেছি, শান্তিনিকেতন বদলাচ্ছে, বিশ্বভারতী বদলাচ্ছে।[৭]

এ কথা বলা বাহুল্য ছাড়া কিছু নয় যে, যে-সব মানুষের সতত প্রয়াস শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রভাবানুরক্ত আনন্দময় জীবনধারায় অবিরাম বেগ সঞ্চার করেছিল সেই সময়, তাঁদের অন্যতম প্রধান ছিলেন ক্ষিতিমোহন, ছিলেন নন্দলাল। যে আনন্দের কথা হীরেন্দ্রনাথ বলেছেন : 'সে আনন্দ নিতান্ত একটা হৈ চৈ ফূর্তির ব্যাপার নয়। গুণকর্মজাত স্বতঃস্ফূর্ত সে আনন্দের বিশেষ একটা চরিত্র ছিল।' ক্ষিতিমোহনের মতো মানুষ জ্ঞানে ভাবে কর্মে সেই বিশেষ আনন্দের অনুশীলন করেছেন নিজে সারাজীবন, আর তাঁর অন্তর্লোকের আলোর স্পর্শে আলোকিত হয়েছে শান্তিনিকেতনের প্রাঙ্গণ। রবীন্দ্রোত্তর কালের শান্তিনিকেতনে তাঁর যে ভূমিকা, তার একটি রূপ আপনিই ফুটে ওঠে, যখন এই দশ বছর ধরে শান্তিনিকেতনের বিভিন্ন উৎসব-অনুষ্ঠানে দেওয়া তাঁর ভাষণগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ পড়ি। শান্তিনিকেতন তাঁর উপরে নির্ভরও করেছিল তেমনই। তাঁকে লেখা রথীন্দ্রনাথের একটি চিঠিতে পাই :

> শ্রদ্ধাস্পদেষু,
>
> মন্দিরে উপাসনার ভার আপনার উপর। এ বিষয়ে আপনি যা ব্যবস্থা করবেন তাই-ই হবে। আমরা আপনার উপর এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নির্ভর করি। আমি সেইজন্য কাওকে আর কোনো ভার দিতে পারি না—দিই-ও নি।
>
> ৭ই পৌষের মন্দিরে আপনি যেমন স্থির করেছেন তাই হবে। কোনো পরিবর্তনের দরকার আছে মনে করি না। ইতি
>
> ভবদীয়
>
> শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর[৮]

১৯৪১ সালের পৌষ উৎসবের পরেও বছরে বছরে আরও কতবার ঘুরে এল সাতই পৌষের পুণ্যলগ্ন, এই দিন মহর্ষির দীক্ষাগ্রহণের দিন, শান্তিনিকেতন আশ্রমের ইতিহাস তার সূচনাকাল থেকে এই দিনের সঙ্গে অচ্ছেদ্য বাঁধনে বাঁধা। প্রভাতি বৈতালিক ও আচার্য ক্ষিতিমোহনের মন্দির দিয়ে যথাযোগ্য মর্যাদায় বরাবর পালিত হয়েছে এই দিন। ১৯৪২ সালে প্রত্যুষের মন্দিরভাষণে ক্ষিতিমোহন বলেছিলেন :

> প্রকৃতি আর মানুষ যখন একসঙ্গে ষড়যন্ত্র করে দুর্ভাগ্যের পর দুর্ভাগ্যের বোঝা চাপিয়ে দিচ্ছে মানুষের উপর, নিষ্কৃতিলাভের ব্যর্থ চেষ্টায় পৃথিবী যখন বিষাদমগ্ন, তখন কারো মনে হতেই পারে যে এই উৎসবের ইচ্ছার মধ্যে একটা স্ববিরোধ আছে। দম্ভোদ্ধত সবলের পায়ের তলায় পিষ্ট হয়ে যাচ্ছে দুর্বল, ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধের প্রবল পদপাতে শান্তি ও ন্যায়বোধ দলিত, কেউ জিজ্ঞাসা করতেই পারেন এই সময়ে কী করে আমরা উৎসাহ পাচ্ছি উৎসবের আয়োজন করতে। কিন্তু এ তো প্রমোদ উৎসব নয়। এর মূলে আছে একটি মন্ত্রের ধ্যান 'পিতা নোঽসি'। এ সত্য যখনই আমাদের পক্ষে গ্রহণীয় হবে যে স্রষ্টারূপে ঈশ্বর সব মানুষের পিতা, তখনই এ সত্যও আপনিই চোখে পড়বে যে, আমরা সকলেই তাঁর সন্তান। যে ভ্রাতৃত্ববোধ স্বাভাবিক, তা যতদিন অবহেলিত ও সুপ্ত থাকবে ততদিন পৃথিবীতে শান্তি ও শুভইচ্ছা প্রতিষ্ঠার সব চেষ্টা ব্যর্থ হবেই। এক যুদ্ধ বুখতে এই যে আর এক যুদ্ধ বাধিয়ে দেওয়া—এ যেন কেবল আগুনকে ইন্ধন জুগিয়ে তা নেভাবার চেষ্টা।
>
> এই নিতান্ত সরল দুটি শব্দাশ্রয়ী মন্ত্রের অমোঘ শক্তি এই পৃথিবীর চেহারাটাই পাল্‌টে দিতে পারে, শুধু যদি মানুষ এই মন্ত্রকে মুখের কথায় নয়, তার অন্তর্নিহিত মর্মে এবং শুধু চিন্তায় নয়, কাজে গ্রহণ করতে পারে। সব দেশের সব কালের সব সাধকের বাণীর সারসত্য এই একটি মন্ত্রে জমাট বেঁধে আছে। ভারতে বৈদিক যুগের ঋষিরা, মধ্যযুগের নানক কবীর প্রভৃতি সন্তরা মানুষে মানুষে এই সখ্য ও ভ্রাতৃভাবের উপদেশই দিয়েছেন।
>
> সাম্প্রতিককালে ভারতকে যখন দাঁড়াতে হল বিজাতীয় সংস্কৃতির মুখোমুখি, রামমোহন রায় তখন এই দেশেরই বাণী অবলম্বন করে খুঁজে বার করলেন কোথায় আছে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ঐক্য বন্ধন—সে বাণী সর্বমানবের ঐক্যের বাণী। তাঁর পরে তাঁর আরব্ধ কর্মের ভার গ্রহণ করলেন তাঁর ভাবশিষ্য মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, তাঁর পরে এই মন্ত্রের সত্যকে প্রকাশ করার দায়িত্ব বর্তেছে গুরুদেবের উপর। তিনি ছিলেন কবি, তাই পদ্মাতীরের নিঃসঙ্গতায় তাঁর প্রভু, তাঁর পরম পিতার উদ্দেশে তাঁর গান গাওয়া অনেকটা সহজ ছিল, কিন্তু তাঁর কাছে জীবনদেবতার দাবি তো এইটুকু মাত্র নয়। তাঁকে তাই তাঁর সেই জীবনস্বাতন্ত্র্য ছেড়ে শান্তিনিকেতনের উষর সমভূমিতে চলে আসতে হল। এইখানে ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপন করে জ্ঞানচর্চার ভিতর দিয়ে এই মন্ত্রের সত্যকেই তিনি প্রকাশ করবার চেষ্টা করেছেন। শ্রীনিকেতন গ্রামসংস্কারের বিচিত্র কর্মের মধ্যে দিয়ে এই মন্ত্রের সাধনা চলেছে এবং সব ক্ষুদ্র গণ্ডি অতিক্রমণের লক্ষ্যে বিশ্বভারতীর সংকল্প বাস্তবে রূপ নিয়েছে। গুরুদেবের নিজের ভাষায় বিশ্বভারতী সেই ভারতের প্রতিনিধি যার মানসবিত্ত সকল মানুষের জন্য। একদিকে অন্যকে ভারতের শ্রেষ্ঠ সাংস্কৃতিক ঐশ্বর্যের আতিথ্যদান, অন্যদিকে অন্যের যা শ্রেষ্ঠ ধন তার অধিকারলাভ—এই দুইয়েরই জন্য সাধনা তাকে করতে হবে।
>
> গুরুদেবের অন্তরের মানবসংস্কৃতির এই পূর্ণরূপকল্পনা—এই উদ্দেশ্যে আমাদের আজকের উৎসব। তিনি যে এই আশ্রম থেকে সারা বিশ্বকে আমন্ত্রণ পাঠিয়েছিলেন, তিনি যে এখানে একটি সৌহার্দ ও সহযোগিতার বাতাবরণ সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন, যাতে আমরা সমস্ত

> মানবজাতির ভিতরকার ঐক্যসূত্রটি উপলব্ধি করতে পারি, এ আমাদের গর্ব, আমাদের আশা। যে বিশ্বভারতীর স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন, মানুষে-মানুষে বিচ্ছেদের অমঙ্গলকে অপসারিত করে ধীরে এবং নিঃশব্দে কিন্তু নিশ্চিত প্রত্যয়ে সে আমাদের অগ্রসর করে দেবে এক প্রগাঢ় ঐক্যের লক্ষ্যে, যার মূলে আছে ঈশ্বর ও মানবভ্রাতৃত্বের বোধ।[৯]

১৯৪৭ সালে সদ্যস্বাধীন ভারতে শান্তিনিকেতন আশ্রমের এই বিশেষ দিবসের উদ্‌যাপন পৃথক মাত্রা লাভ করেছিল। অভূতপূর্ব উৎসাহ ও আনন্দে সম্পন্ন হয়েছিল সাত পৌষের উৎসব। আগেকার সব নজির ছাড়িয়ে গিয়েছিল সেবারের জনসমাবেশ—বিশ্বভারতীর সদস্যরাও অনেকে যোগ দিতে এসেছিলেন, সারা ভারত থেকে এসেছিলেন প্রাক্তন ছাত্র ও অন্যান্য মানুষ। প্রভাতকালীন উপাসনায় সমাগত মানুষের ভিড় মন্দিরগৃহ উপ্‌চে চারপাশের আঙিনাও পূর্ণ করে তুলেছিল। আচার্যের আসন থেকে ক্ষিতিমোহন নিস্তব্ধ ও সশ্রদ্ধ সেই শ্রোতৃমণ্ডলীর উদ্দেশে বলেছিলেন মহর্ষিদেবের কথা—অনেক বছর আগে, শান্তিনিকেতনের এই মন্দির এখন যেখানে তারই অনতিদূরে প্রাচীন সপ্তপর্ণী গাছের তলায় বসে তিনি মগ্ন হয়েছিলেন গভীর ধ্যানে। চারপাশের সেই আনন্দময় প্রাকৃতিক পরিবেশে তাঁর ধ্যাননিমগ্ন দৃষ্টির সম্মুখে ফুটে উঠেছিল এক নিভৃত আধ্যাত্মিক আশ্রয়ের ছবি—এই আশ্রম। যতদিন পর্যন্ত না রবীন্দ্রনাথ এখানে এসে বসেছেন ও এই আশ্রম বিদ্যালয়ের ভিত গড়েছেন, মহর্ষির সেদিনের সেই আনন্দানুভব ততদিন এই স্থান ব্যাপ্ত করে গুঞ্জরিত হয়ে ফিরেছে :

> আজ এই আশ্রমের সীমা বহুবিস্তৃত, প্রতিশ্রুতি ও অভীষ্টের বিচিত্র জাল ছড়ানো তার চারদিকে। তবুও যে আনন্দ ও শান্তির উৎস আছে এর কেন্দ্রে, তা থেকে কোনোদিন স্খলিত হবে না এ আশ্রম। প্রেম ও শান্তির পুণ্যবেদি শান্তিনিকেতন, নিকট ও দূরের সকল মানুষকে সে আহ্বান পাঠাচ্ছে সত্যং শিবম্ অদ্বৈতমের সাধনায় নিমগ্ন হতে।[১০]

এমনই করে বছরে বছরে এই দিনে ক্ষিতিমোহনের উষালগ্নের উপাসনা জুড়ে থেকেছে মহর্ষিদেবের পুণ্যস্মৃতি, তাঁর দীক্ষাদিনের তাৎপর্যব্যাখ্যার প্রয়াস। সশ্রদ্ধ ভালোবাসায় ভরা মন নিয়ে তিনি বলেছেন : হিরণ্ময়েন পাত্রেণ যে সত্যের মুখ আবৃত, সেই সত্য মহর্ষির কাছে আপনাকে অপাবৃত করে দেখিয়েছে। বলেছেন, বন্ধ্যা নারীর সৌন্দর্য যেমন বৃথা, মহান আত্মার অধ্যাত্ম-ঐশ্বর্যও তেমনই ব্যর্থ হয়ে যায়, যদি সেই-সব মহাত্মারা নব প্রজন্মের মধ্যে পুনর্জন্মলাভ না করেন, যদি না তাঁদের আত্মিক প্রেরণা পুনঃসঞ্চারিত হয়। সেই দিক থেকে মহর্ষির সাধনা সত্য অর্থে ফলবান হয়েছে। তাঁর আধ্যাত্মিক সাধনা পুণ্যধারার মতো তাঁর অন্তরে ক্ষরিত হয়ে ক্রমে উত্তুঙ্গ হিমালয়ের নির্জনতায় এক বিশাল সরোবরের আকার নিয়েছিল। কিন্তু সেইভাবেই শৃঙ্খলিত সুপ্ত হয়ে সে থাকেনি, প্রবল স্রোতস্বতীর মতো নেমে এসে সমভূমিকে প্লাবিত করেছে। তারই তীরে তীর্থের মতো উদ্ভূত হয়েছে শান্তিনিকেতন, সেখানে সমবেত মানুষ সেই সাধনানন্দের ভাগ নেবে। এইখান থেকে আহ্বান প্রচারিত হয়েছে, গুরুদেবের শঙ্খ ধ্বনিত হয়েছে দিকে দিকে। সে আহ্বানে ঘুম ভেঙে মানুষ সাড়া দেয় কি না তার উপর মানবসভ্যতার পুনরুত্থান নির্ভর করছে। সাড়া যদি

সত্যই দেয় সে, তবে বিদ্বেষ ও হিংসার যে বিভীষিকা সারা বিশ্বকে কলঙ্কপঙ্কে নিমজ্জিত করে রেখেছে, সে বিভীষিকা মিলিয়ে যাবে।[১১]

জানুয়ারি মাসে প্রতি ৬ মাঘ মহর্ষিদেবের মৃত্যুবার্ষিকী যখন আশ্রমে পালিত হয়েছে ভাবগম্ভীর পরিবেশে, সকালে মন্দির-উপাসনায় ক্ষিতিমোহন বলেছেন তাঁর আধ্যাত্মিক ব্যগ্রতা ও অখণ্ডতার কথা, বলেছেন যে প্রেরণা তিনি রেখে গেছেন অনিঃশেষ আলোক-শিখার মতো তা জ্বলছে আমাদের সামনে।[১২] আর সেপ্টেম্বরে রাজা রামমোহন রায়ের স্মরণদিনের মন্দিরে সেই মহাত্মার উদ্দেশে শ্রদ্ধানিবেদন করে তৎকালীন ভারতের প্রেক্ষিতে তাঁর জীবনের সম্পাদিত কর্মের মূল্যায়ন করেছেন।[১৩]

বছর যায়, বছর আসে। চৈত্রসংক্রান্তির দিনে সূর্যাস্তক্ষণে মন্দির সমাবেশে বর্ষশেষকে বিদায় জানান ক্ষিতিমোহন, আবার সে রাত্রির অবসানে সূর্যোদয়লগ্নে যখন সকলে পুনরায় মন্দিরে সমবেত হন, বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে উপাসনা ও মন্ত্রোচ্চারণ করেন তিনি। বলেন, নতুন বছর যে বার্তা বহন করে এনেছে তার সুরে বেঁধে নিতে হবে সকলের মনোবীণার তার। নববর্ষের বার্তা বলে---অতীতের নিদ্রালসতা ঝেড়ে ফেলে নতুন করে গড়ে তোলো নিজের জীবন। এইদিন আশ্রমে রবীন্দ্রজয়ন্তী পালনেরও দিন। আম্রকুঞ্জে সভা হয়। ক্ষিতিমোহন গুরুদেবের জন্মদিনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন, তাঁর রচনা থেকে পাঠ করেন, শাশ্বতজীবনবিশ্বাসী কবির প্রত্যয়ী ভাবনা যেখানে প্রকাশ পেয়েছে।[১৪]

কী আশ্রমে কী তার বাইরে ১৯৪১ সাল আর-একটি দিনকে রবীন্দ্রানুরাগী সব মানুষের বুকের মধ্যে চিরকালের মতো চিহ্নিত করে দিয়েছে—সে দিনটি ২২ শ্রাবণ। রবীন্দ্রনাথ নিজে তো কোনোদিন এ কথা বিশ্বাস করেননি যে, মৃত্যুতে পরিসমাপ্তি জীবনের। 'নাই তোর নাই রে ভাবনা / এ জগতে কিছুই মরে না'—বাইশ বছরের কবিকণ্ঠে যে বিশ্বাসের বাণী শোনা গিয়েছিল, তার পুনরুচ্চারণে কোনোদিন ক্লান্তি মানেনি তাঁর মন। জীবনপথের শেষপ্রান্তে পৌঁছেও বললেন : 'রাহুর মতন মৃত্যু শুধু ফেলে ছায়া / পারে না করিতে গ্রাস জীবনের স্বর্গীয় অমৃত'। কবির মৃত্যুর পরে দেখতে দেখতে অতিক্রান্ত হয়ে গিয়েছিল একটা বছর। ২২ শ্রাবণ ১৩৪৯, ৭ আগস্ট ১৯৪২ সকালবেলা মন্দিরে সমবেত আশ্রমবাসীদের উদ্দেশে যে কথাগুলি বলেছিলেন ক্ষিতিমোহন, তার পিছনে যে কোন্ দায়বদ্ধতা কাজ করছে তা অনুভব করা যায়।

> মর্তকায়ায় গুরুদেব আর আমাদের মধ্যে নেই, তাঁর ক্লান্ত জীর্ণদেহ এক বছর আগে চিরবিশ্রামলাভ করেছে। আমরা কি মনে করব তাঁকে হারালাম, নাকি এই বিশ্বাসে স্থিত হব যে, তিনি আরও সত্য, আরও যথার্থভাবে আমাদের মনের মধ্যে জীবিত আছেন।

কোন্ দৃষ্টিতে দেখেছেন রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুকে, তাঁর নানা সময়ে রচিত কবিতা উদ্ধৃত করে আলোচনা করেছিলেন ক্ষিতিমোহন, বলেছিলেন :

> শাস্ত্রে বলে মহাত্মাদের মৃত্যু নেই। ভারতীয় ঐতিহ্যে মহাপুরুষের জন্মতিথিই পালনীয়, মৃত্যুতিথি নয়। যাঁর জীবনালোক মানুষকে পথ দেখায়, সে আলো নিভে যায় যদি তো গতি হবে কি। ইহজীবনের সমাপ্তি এই-সব সাধক-মহাত্মার উচ্চতর আধ্যাত্মিক জীবনের প্রস্তাবনা,

> পূর্ণতর জীবনের অভিষেক। প্রাচীন সাধকদের মতে মানবদেহ হল 'ভূতকায়' আর তার যে-সত্তা সাধনার বৃহত্তর স্তরে আত্মপ্রকাশপর, সেই আত্মিক অস্তিত্ব হল 'ধর্মকায়'। গুরুদেবের কায়িক অস্তিত্ব বিলীন হয়েছে, কিন্তু তাঁর ধর্মসাধনা আমাদের স্পর্শ করে আছে, তাঁর সাধনসত্তা আমাদের মধ্যে ধর্মকায়িক অস্তিত্ব খুঁজছে। তাই আজকের দিন আমাদের আত্মজিজ্ঞাসার দিন—আমাদের হৃদয়ে গুরুদেব তাঁর পুনর্জন্ম লাভ করলেন কি।

মনে হচ্ছিল তাঁরা বুঝি গুরুদেবের জন্মদিনে উৎসব করছেন, শ্রাদ্ধানুষ্ঠান এ নয়। মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে তাঁর মতো কবির্মনিষী উত্তর উত্তর নব নব জীবনে আরও দীপ্যমান মহত্তর জন্মলাভ করেন। 'নবো নবো ভবসি জায়মানো / অহ্নাং কেতু রুষসামেষি অগ্রম্'—নব নব ভাবে জন্মিয়া তুমি নিত্য নবীন, দিনের পর দিনকে তুমিই করো প্রকাশ, উষার অগ্রে অগ্রে তোমার জয়যাত্রা। আহ্বান উচ্চারিত হল আচার্যকণ্ঠে :

> আমাদের গুরুদেব ছিলেন মহৎ হৃদয়, পবিত্রাত্মা, সৌন্দর্যোপাসক। যা কিছু অপবিত্র ও কুৎসিত, যা কিছু সংকীর্ণ ও অনুদার, আজ তাঁর স্মরণদিনে আমরা যেন তা সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করি। তাঁর সাধনার যা শ্রেষ্ঠ ফল তা গ্রহণ করবার মতো যোগ্য আধার যেন আমরা হয়ে উঠতে পারি।[১৫]

এই সময়ে বিশ্বভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর প্রবন্ধের নাম 'ব্রতের দীক্ষা', হিন্দি বিশ্বভারতী পত্রিকায় বেরিয়েছিল রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর মৃত্যুভাবনা বিষয়ে একটি প্রবন্ধ। 'ব্রতের দীক্ষা'-য় তাঁর বাইশে শ্রাবণের মন্দিরভাবনাই বিস্তৃততররূপে প্রকাশ পেল। ক্ষিতিমোহন বললেন :

> প্রাণেন প্রাণতাং প্রাণ ইহৈব ভব মা মৃথাঃ
>
> —আমাদের প্রাণের ভিতর দিয়াই তুমি থাকো বাঁচিয়া, মৃত্যুর মধ্যেও যেন তোমাকে না আমরা হারাই।

পরক্ষণেই ভাবছিলেন :

> কিন্তু এত বড় মহাপ্রাণকে ধারণ করিবার মতো প্রাণ আমাদের মধ্যে কাহার আছে? আমাদের একলা কারও এত বড় বিরাট প্রাণ নাই যে, তাঁহার মতো বিরাট পুরুষকে অধিষ্ঠিত ও জীবন্ত থাকিতে বলিতে পারি। তবে শ্রদ্ধার সহিত সকলে যুক্ত হইয়া তাঁহার মহাব্রতকে যদি এক এক দিকে কোনোমতে চালাইয়া যাইতে পারি, তবেই তাহা যথেষ্ট। বিনীতভাবে আমরা যেন তাঁহার অনুব্রত হইতে পারি।

পরে একটি সাবধানবাণীও উচ্চারণ করলেন :

> তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া আমরা কোথাও যদি এই উপলক্ষে নিজেকে জাহির করিতে চাই, তবে তাহা নিদারুণ প্রমাদ হইবে। সর্বভাবে আমাদের সাবধান হইয়া দেখিতে হইবে যেন রবীন্দ্রনাথের নিত্যমুক্ত ভাব ও সাধনাই আমাদের মধ্যে দিয়া শান্তিনিকেতনের এই নূতন ধারায় নূতন প্রবাহে প্রবাহিত হইয়া চলে।[১৬]

শুধু বাইশে শ্রাবণ কেন, মৃত্যুকে রবীন্দ্রনাথ কোন্ দৃষ্টিতে দেখেছেন তার আলোচনা ক্ষিতিমোহনের প্রবন্ধ বা ভাষণে নানা সময়ে স্থান করে নিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে নঞর্থক নয় মৃত্যু, নয় বিনাশপ্রক্রিয়া। মৃত্যুকে কবি স্বীকার করেন, স্বাগত জানান। প্রাণের

বাণী শাশ্বত, অনির্বাণ জ্বলে তার শিখা, আর মৃত্যু সেই প্রাণকে পুনঃসঞ্জীবনী শক্তি জোগায়। এ-সব কথা বলতে আনন্দ পান ক্ষিতিমোহন। আবার কখনও বা কোনো বাইশে শ্রাবণে তাঁর মনে হয় গুরুদেবের মৃত্যুতে আমাদের মনের দিগন্তটা অনেক প্রসারিত হয়ে গেছে বলে দৃষ্টিসংকীর্ণতার বাধা অতিক্রম করে আজ তাঁকে আমরা তাঁর সমগ্রতায় দেখতে পাচ্ছি। তাঁর সমস্ত জীবন ও চিন্তা ব্যাপ্ত করে যে ভাবগত ঐক্যসূত্রটি ছিল সেটিও আর আমাদের অগোচর নেই, তাঁর জীবিতকালে তাঁর যে-সব ভাবনা বিচ্ছিন্ন ও পৃথক পৃথক বলে মনে হত, আজ তাঁর প্রয়াণের পরে বুঝতে শিখেছি যে, একটিই অব্যাতিক্রমী বিশ্বতোমুখ বীক্ষার দ্বারা সে-সব ভাবনাই অনুপ্রাণিত হয়েছিল। ক্ষিতিমোহন বলেন যে দুর্বিপাকের ভবিষ্যদ্‌বাণী রবীন্দ্রনাথ করেছিলেন, আজ পৃথিবী তারই গ্রাসে। লেখায়, মুখের কথায় অসংখ্যবার তিনি মানবসভ্যতা-বিধ্বংসী এক অমঙ্গলের বিরুদ্ধে সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছেন, কোন্ পথে তার অপসারণ সম্ভব খুব স্পষ্ট করে তার নির্দেশ দিয়েছেন—কিন্তু সবই তো অরণ্যে রোদন হল। কী ব্যক্তিমানুষ কী জাতির নামে সংঘবদ্ধ মানুষ—শক্তি আর লোভে ফেঁপে-ফুলে উঠে সকলেই চলল সেই নিষিদ্ধ পথেই। প্রসঙ্গক্রমে মন চলে যায় স্বদেশভাবনার দিকে। ক্ষিতিমোহন একদিকে মধ্যযুগীয় সন্তদের উত্তরসূরি রবীন্দ্রনাথের কথা বলেন, যিনি এই প্রাচীন সভ্যতার ভিতরকার সহস্র বৈচিত্র্য ও বিরোধের উপাদান সত্ত্বেও তার ঐক্যের সাধনা উপলব্ধি করেন. অন্যদিকে তিনি বলেন গীতাঞ্জলির সেই কবিতাগুলির কবির কথা, যিনি কঠিনস্বরে ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছেন এই সাধনা থেকে ভ্রষ্ট হলে কী কঠিন মূল্য দেশকে দিতে হবে। 'যেথায় থাকে সবার অধম' বা 'বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহারো' প্রভৃতি গানের প্রসঙ্গ জড়িয়ে যায় কবির জীবনসাধনার ব্যাখ্যায়।[১৭]

বাইশে শ্রাবণের সভায় কতবার কতভাবে মৃত্যুর স্বরূপ ব্যাখ্যা করলেন ক্ষিতিমোহন, আলোচনা করলেন রবীন্দ্রদৃষ্টিতে মৃত্যু, তার নির্দিষ্ট হিসাব দেবে কে বা। তবে বিশ্বভারতী নিউজ-এর আর-একটা খবরের দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেতে পারে এই প্রসঙ্গে। তা থেকে জানা যাচ্ছে ১৯৪৩ সালের ২৪ ডিসেম্বর সকাল দশটায় বিশ্বভারতীর বার্ষিক পরিষদের সভা বসেছিল আম্রকুঞ্জে। আচার্য অবনীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীর বিভিন্ন বিভাগের সফল ছাত্রছাত্রীদের হাতে অভিজ্ঞানপত্র তুলে দেওয়ার আগে পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেনকে তাঁর 'রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর ধারণা ও পরলোক'-বিষয়ক গবেষণাকর্মের জন্য শ্রীমতী সুলতা কর প্রদত্ত রবীন্দ্রনাথ-স্মৃতিপদক উপহার দেন।[১৮]

বাইশে শ্রাবণের দিনে বছরে বছরে বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠান হয়েছে। কখনও মীরা দেবী গাছ লাগিয়েছেন ছাতিমতলায়, কখনও আচার্য অবনীন্দ্রনাথ হাসপাতালপ্রাঙ্গণে গাছের চারা রোপণ করেছেন, কখনও ইন্দিরা দেবী গাছ লাগিয়েছেন রতন কুঠির অঙ্গনে, কখনও বা অধ্যাপক তান-য়ুন-সান তা লাগিয়েছেন দ্বারিকের পাশে। আবার কখনও বা গাছ লাগিয়েছে পাঠভবনের বালক ছাত্র বা কনিষ্ঠতমা ছাত্রী খেলার মাঠের ধারে। এ ছাড়া শ্রীনিকেতনের বার্ষিক উৎসব, হলকর্ষণ, বিশ্বভারতীর সমাবর্তন—আরও কত অনুষ্ঠান হয় নিয়মিত, বারো

মাসে তেরো পার্বণেও শেষ হয় না শান্তিনিকেতনের উৎসব-অনুষ্ঠান। পূর্বপরিকল্পনা অনুসারী নির্ধারিত রীতিতে রুচিসম্মত অনুষ্ঠান, ক্ষিতিমোহন শাস্ত্রীর মন্ত্রোচ্চারণ এ-সব অনুষ্ঠানের অপরিহার্য অঙ্গ। সাত পৌষের আগে-পরে বিশ্বভারতী ও আশ্রমপরিবারের বেশ কয়েকটি সভা ও অনুষ্ঠান হয়—বিশ্বভারতী পরিষদের বার্ষিক সভা, পরলোকগত আশ্রমবন্ধুদের স্মরণসভা, প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের বার্ষিক সভা। শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সংঘের সভা এখানে হলে ক্ষিতিমোহনের আমন্ত্রণ থাকেই। ১৯৪২ সালে ২৩ ডিসেম্বর সকালবেলা প্রস্তাবিত 'পূর্বতনী' নির্মাণের জন্য নির্বাচিত স্থানে প্রাক্তনীদের সভা হল। তার পর 'পূর্বতনী' ভবনের শিলান্যাস অনুষ্ঠানে মন্ত্রপাঠ করলেন ক্ষিতিমোহন। নন্দলাল বসু রথীন্দ্রনাথকে আমন্ত্রণ জানালেন শিলান্যাস করতে, তিনিই সবচেয়ে পুরোনো ছাত্র।[১৯] ২৫ ডিসেম্বর খ্রিষ্টোৎসব হয় মন্দিরে সন্ধ্যাবেলায়। সেই দুর্গত অন্ধকার দিনে যখন মানুষ বিস্মৃত হয়েছে যে তারা সকলেই এক ঈশ্বরের সন্তান, যখন ভাই মারছে ভাইকে, আচার্যের ভাষণে ক্ষিতিমোহনের স্বভাবতই তাগিদ থাকে দিনটির তাৎপর্য সন্ধানের। দু-হাজার বছর আগে যে বাণী খ্রিষ্ট প্রচার করেছিলেন, সে বাণীর সত্যমূল্য উপলব্ধির সার্থকতা আজও স্পর্শ করল না মানবসভ্যতাকে। জীবনে ও আচরণে যাঁরা গুরুর শিক্ষা প্রতিফলিত করতে পারেন তাঁরাই প্রকৃত শিষ্য। জিশু তো তাঁর শত্রুদেরও ভালোবেসেছিলেন, মানুষের পৃথিবী যাতে রক্ষা পায় সেজন্য চরম নির্যাতন ও মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেছিলেন। তা হলে কি পশ্চিমের যুযুধান জাতিগুলো সত্যই খ্রিষ্ট-অনুগামী বলে গণ্য হতে পারে? তারা তো কেবল মুখেই খ্রিষ্টাদর্শের কথা বলে, অন্তরে তা মানে না। কিন্তু যেখানেই জিশুর প্রেমধর্ম অস্বীকৃত হয়, যখনই কেউ আঘাত করে কাউকে, সে আঘাত তাঁরই বুকে বাজে, আরও একবার ক্রুবিদ্ধ হন তিনি। যতদিন যুদ্ধ এবং রক্তপাত থাকবে, ততদিনই আমাদের অন্তরে বারে বারেই তাঁকে জন্ম নিতে হবে। তাঁর নামজড়িত এই পুণ্যদিনের প্রার্থনা উচ্চারণ করেন তাই ক্ষিতিমোহন—সেই মহাত্মা ক্ষমা ও সহমর্মিতার ধর্মে আমাদের দীক্ষা দিন, মৃত্যু ও ধ্বংসের অন্ধকার থেকে ত্রাণ করে সত্যের আলোকে উত্তীর্ণ করুন।[২০]

১৯৪২ সালে সকালবেলায় খ্রিষ্টোৎসব হয়েছিল আম্রকুঞ্জে। সেবার ক্ষিতিমোহন বলেছিলেন জিশুখ্রিষ্টের জন্ম প্রাচ্যদেশে, এই পূর্বদেশের জ্ঞানীরাই সর্বপ্রথম তাঁকে মানবত্রাতা ঈশ্বরপ্রেরিত পুরুষ বলে চিনতে পেরেছিলেন। পশ্চিম মহাদেশ থেকে খ্রিষ্টধর্ম এ দেশে এসেছে বলে খ্রিষ্ট বিদেশি নন, এ দেশে তাঁর বিশ্বাসের প্রত্যাবর্তন তাঁর জন্মভূমিতে ফেরার মতো, আমরা তা নিয়ে উৎসব করতে পারি। তিনি আজ তাঁর তথাকথিত পশ্চিমি অনুগামীদের হাতে যে মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করছেন, এমন যন্ত্রণা আর কখনও তিনি ভোগ করেননি। ক্ষমতাদর্পী যুদ্ধোন্মাদ পশ্চিমি জাতিগুলো প্রতিদিনের জীবনে অস্বীকার করছে তাঁকে। সেখানে তিনি লাঞ্ছিত, ক্রুশবিদ্ধ। আমরা যারা দরিদ্র দুর্বল ঘৃণিত নিপীড়িত—আজ আমাদেরই নামিয়ে আনতে হবে তাঁর ক্ষতবিক্ষত দেহ, তাঁর পুনরুত্থানের অপেক্ষা করতে হবে। এই আমাদেরই মধ্যে আবার যখন তিনি জন্মাবেন, আমাদেরই হৃদয়ে

যখন তাঁর প্রেম ও শান্তির সজীব মন্ত্র দ্ব্যর্থহীন স্বীকৃতি লাভ করবে, তখনই জিশুখ্রিষ্টের জন্মোৎসব নতুন ও সত্য তাৎপর্যে অভিসিক্ত হবে।[২১]

এক যথার্থ খ্রিষ্টশিষ্যের ভাবমূর্তি প্রত্যক্ষ করবার সুযোগ হয়েছিল দীনবন্ধু অ্যান্ডরুজের মধ্যে, দীর্ঘদিন আশ্রমে কাছ থেকে দেখেছেন তাঁকে, বন্ধু বলে জেনেছেন। প্রতি বছর ৫ এপ্রিল এই বন্ধুর স্মরণদিনে মন্দিরে ক্ষিতিমোহন তাঁর কথা বলেছেন। তিনি বলতেন, অ্যান্ডরুজ নিজেকে সম্পূর্ণ করে দিয়েছিলেন, শর্তহীন দায়মুক্ত সেই আত্মনিবেদন। যারা উৎপীড়িত-নিপীড়িত তাদের সঙ্গে তিনি এমনই একাত্মবোধ করতেন, তাদের বেদনা এমনই তাঁর প্রাণে তাঁর নিজের বেদনার মতো বাজত যে, আত্মদান না-করে তিনি পারতেন না। সমগ্র মানবসমাজই ছিল তাঁর নিজের দেশ। বিশ্ব থেকে দুঃখ এবং অবিচার দূর করাই ছিল তাঁর জীবনের ব্রত। তাঁর আত্মত্যাগের অর্থ এবং তাৎপর্য যতটা বুঝতে পারব, তাঁর দৃষ্টান্ত থেকে যতটা আমরা শক্তি আহরণ করব, তাঁর স্মৃতিতে অর্ঘ্যদান ততটাই আমাদের পক্ষে সত্য হয়ে উঠবে।[২২]

বহু বিশিষ্ট মানুষের বরাবরই যাতায়াত বিশ্বভারতীতে। এখনকার অনেক বিশিষ্ট মানুষের নামও এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত। তেমন কেউ যখন আসেন, আম্রকুঞ্জে সভা হয়। অভ্যাগত মানুষটির ভাষণের উত্তরে ধন্যবাদ জানিয়ে ক্ষিতিমোহন কোনোবার বলেন :

> মাননীয় অতিথিকে আমরা আপনজন বলে জানি, আমাদের গুরুদেবের বিয়োগব্যথার অংশীদার তিনিও। যে আদর্শ আমাদের জন্য গুরুদেব স্থাপন করেছেন, তার দ্বারা এঁরাও অনুপ্রাণিত। এঁদের মতো রবীন্দ্রপ্রভাবিত মানুষের সঙ্গ আমাদের সান্ত্বনা দেয়।[২৩]

আবার এমন কোনো কোনো মানুষ আছেন যাঁদের সঙ্গে অন্তরে অন্তরে সম্পর্কটি যথার্থ নিবিড়। যেমন আশ্রমবন্ধু মহাদেব দেশাইয়ের মৃত্যুর খবর পেয়ে সকলেই অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছিলেন। ২৫ জুলাই মন্দিরে বিশেষ স্মরণ অনুষ্ঠানে ক্ষিতিমোহন স্বর্গত আত্মার শান্তির জন্য প্রার্থনা করলেন। সেই আপন চরিত্রসম্পদে ঋদ্ধ এক ব্যক্তিত্ব—যিনি নিজের জীবনব্রত নির্বাচনে ভুল করেননি, আজীবন সে ব্রতের সফলতার লক্ষ্যে কাজ করেছেন, সেদিক থেকে দেখতে গেলে খুব কম মানুষই তাঁর মতো সৌভাগ্যবান। যে কাজে তিনি আপনাকে উৎসর্গ করেছিলেন, সে কাজে তাঁর পারদর্শিতার তুলনা ছিল না। মহাত্মা গান্ধী তাঁর নেতা, নির্দ্বিধায় তাঁকে অনুসরণ করে আপন ব্রতসাধনে একনিষ্ঠ মহাদেব দেশাইয়ের এই মৃত্যু ক্ষিতিমোহনের চোখে সম্মাননীয়, গৌরবান্বিত। স্বভূমির গভীরে অনুপ্রবিষ্ট ছিল তাঁর জীবনের মূল, আর এই কারণেই উর্ধ্বাকাশে বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে দিতে পেরেছিলেন তিনি তার শাখা-প্রশাখা বনস্পতির মতো। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের প্রতি এবং তাঁর এই প্রতিষ্ঠানের প্রতি এই গান্ধীশিষ্যের শ্রদ্ধার কথাটি বলতে গিয়ে ক্ষিতিমোহন তাঁর রবীন্দ্র-সাহিত্যপাঠে অনুরাগের কথা উল্লেখ করলেন, বললেন রবীন্দ্রসংগীত তাঁকে অনুপ্রাণিত করত, অনেকগুলি গান তিনি গুজরাতি ভাষায় অনুবাদও করেছিলেন। আর মুগ্ধ হয়েছিলেন

'প্রায়শ্চিত্ত' পড়ে—যে অসহযোগ নীতি ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে এমন একটা বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান ঘটাল, তার প্রথম পদধ্বনি যে এই নাটকেই শোনা গিয়েছিল, সে কথা বলতে তিনি কুণ্ঠিত হতেন না।[২৪]

কখনও আহ্বান আসে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের মতো পরম শ্রদ্ধেয় বর্ষীয়ান আশ্রম-বন্ধুকে বিশ্বভারতীর পক্ষ থেকে সংবর্ধনা জানাবার। তিনি অসুস্থ হয়ে তখন আছেন কন্যা শান্তার কাছে। রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ বিশ্বভারতীর সদস্য ও কর্মকর্তাদের সঙ্গে এক রবিবারে ক্ষিতিমোহন আসেন কলকাতায় শান্তা নাগ-কালিদাস নাগের গৃহে। অনুষ্ঠানসূচনায় বৈদিক মন্ত্রে রামানন্দবাবুর দীর্ঘ আয়ু স্বাস্থ্য ও সুখ প্রার্থনা করেন।[২৫] কখনও আবার ইউনিভারসিটি ইনস্টিটিউটের সদস্যরা শান্তিনিকেতনে এসে উত্তরায়ণপ্রাঙ্গণে প্রমথ চৌধুরীকে তাঁর সত্তর বছরের জন্মতিথি উপলক্ষে সংবর্ধনা জানান। এই ধরনের আনন্দানুষ্ঠানেও প্রায় অনুরূপ ভূমিকাই পালন করেন ক্ষিতিমোহন। আচার্য অবনীন্দ্রনাথ সভাপতির আসন অলংকৃত করেন।[২৬]

তখন রবীন্দ্রভবন সদ্যই গড়ে উঠতে শুরু করেছে। 'রবীন্দ্র-রচনাবলী' সম্পাদনার ভার যাঁদের উপর, রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপির সন্ধানে তাঁরা নানা মানুষের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করছেন। তাঁদেরই একজন নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'শারদোৎসব' নাটকের পাণ্ডুলিপি ক্ষিতিমোহনের কাছে পাওয়া যাবে ধারণা করে একদিন বিদ্যাভবনের দোতলায় মাস্টারমশায়ের ঘরে এসে হাজির হলেন। তিনি রাগের ভান করে কিছুক্ষণ তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন—'কোথায় খবর পেলি'। জবাবের অপেক্ষা না-করে তাঁকে বসতে বলে তিনি উঠে দাঁড়িয়ে উপরের তাক থেকে ছোটো একটি বাক্সো নামিয়ে অতি সন্তর্পণে সেটি খুললেন।

> পুরানো কাপড়ে জড়ানো একটি বাঁধা খাতা আমার হাতে দিয়ে বললেন—'খুলে দেখ'। খুলে দেখি 'শারদোৎসব' নয়, তার চেয়ে সহস্র গুণ মূল্যবান গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের বাংলা গীতাঞ্জলি'-র পাণ্ডুলিপি। কাটাকুটির ধরন এবং গীতাঞ্জলি-বহির্ভূত অন্যান্য সব লেখা এক ঝলকে দেখে বুঝতে দেরী হল না যে সেটিই গীতাঞ্জলির আদি পাণ্ডুলিপি। আমি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে চেয়ে আছি তাঁর দিকে। বিস্ময়ের পরিমাণ আমার পৌঁছল মাত্রাতিরিক্ত পর্যায়ে যখন তিনি ঈষৎ হেসে বললেন,—'যা, ভাল করে পড়ে দেখিস বাড়ি নিয়ে গিয়ে, যদি তোর কোনও কাজে লাগে। শারদোৎসবের অনেক গানও ওতে পাবি। তাড়াতাড়ি ফেরত দিয়ে যাস,—আর কারওকে বলিস নে বা দেখাস নে'।[২৭]

দু-দিনের মধ্যে ফেরত দেবেন কথা দিয়ে নির্মলচন্দ্র সেই পাণ্ডুলিপি এনে সারারাত জেগে সেটা কপি করে নিয়েছিলেন। তিনি লিখেছেন :

> স্নেহের এতবড় প্রশ্রয় তাঁর কাছ থেকে পাব স্বপ্নেও কোনোদিন ভাবতে পারি নি।

১৯৪৩ সালে গরমের ছুটির পরে ৭ জুলাই চিনাদিবস উপলক্ষে চৈনিক-ভারতীয় বিদ্যাবিভাগের চিনা ছাত্ররা প্রভাতের বৈতালিকে তাঁদের জাতীয়সংগীত গেয়ে আশ্রম পরিক্রমা করেছিলেন। পরে সেদিন বুধবারের মন্দির-উপাসনায় ক্ষিতিমোহন চিনাদিবসের

প্রসঙ্গ আলোচনা করলেন। আগ্রাসী অমঙ্গল শক্তির আক্রমণের বিরুদ্ধে চিন আজ তার বীর্যবান প্রতিরোধের ষষ্ঠবার্ষিকী উৎসব করছে। এই দীর্ঘ প্রতিরোধের দিনগুলিতে অমানুষিক কষ্ট করেছে সে, তবু কোনোদিন তার বলিষ্ঠ সংকল্প থেকে চ্যুত হয়নি এবং অবশেষে ঘাতকশক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করে আপন সমাজে একটি সুস্থ শৃঙ্খলাবোধ প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে। বহু অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়ে অভ্যুত্থিত হয়েছে ঐক্যবদ্ধ নতুন চিন। ন্যায় প্রতিষ্ঠায় কৃতসংকল্প এক নতুন জাতির জন্মের সাক্ষী আমরা, আমাদের মনের মধ্যে তাই এই চিনাদিবসের সঙ্গে কেবল উল্লাসের অনুষঙ্গ জড়িয়ে নেই। কতকালের প্রতিবেশী ও বন্ধু এই দুই দেশ—ভারতের মানুষ চিনের এই জয় ও আনন্দের অংশভাক। হিমালয়ের অপর প্রান্তবর্তী ভাইদের উদ্দেশে আমাদের শুভেচ্ছা পাঠাই, প্রার্থনা করি তাদের ব্রত সফল হোক। তাদের সাধনা উন্নততর এক পৃথিবীর অস্তিত্বকে সম্ভব করুক। বিকেলে সিংহসদনে চিনাদিবস উপলক্ষে আয়োজিত সভায় সভাপতির ভাষণেও এই দিনটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করলেন এবং ১৯২৪ সালে তাঁর নিজের চিনভ্রমণের অভিজ্ঞতার কথাও কিছু কিছু শোনালেন।[২৮]

প্রত্যেক বুধবারের মন্দির-উপাসনায় ক্ষিতিমোহন বরাবরই সেই বিশেষ দিনটি বা তার নিকটবর্তী কোনো বিশেষদিন কেন স্মরণীয় সে কথা বলতে ভালোবাসতেন। আমরা দেখি ৭ জুলাই তিনি যেমন চিনাদিবসের কথা বলছেন, ৮ সেপ্টেম্বর বুধবারের মন্দিরে তেমনই তিনি তাঁর শ্রোতাদের মনে করিয়ে দিচ্ছেন ঠিক একশো বছর আগে ১৮৪৩ সালে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এপ্রিল মাসে তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার সূচনা করলেন, আগস্ট মাসে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশ করলেন আর ডিসেম্বর মাসে ব্রাহ্মধর্মে আনুষ্ঠানিকভাবে দীক্ষা নিলেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি আলোচনা করলেন এই তিনটি পরস্পরগ্রথিত দিন মহর্ষির জীবনে কী প্রভাব বিস্তার করেছে, কীভাবে নিয়ন্ত্রিত করেছে তাঁর ভবিষ্যতের কর্মপরিকল্পনা, এই শান্তিনিকেতন আশ্রম প্রতিষ্ঠাও যার অন্তর্গত।[২৯] মাঝে মাঝে মন্দিরে তিনি বড়োদাদা দ্বিজেন্দ্রনাথের কথা বলতেন—সেই সহজতায় মহান ঋষিকল্প মানুষটি। তিনি যে এখানে আছেন, শান্তিনিকেতনেরই মানুষ যে তিনি—এই কথাটাই এখানকার মানুষের মনে সবচেয়ে বেশি ছাপ রেখে যেত। বোধ হয় এইজন্যই মানুষ এবং প্রকৃতি, এমনকী ছোটো ছোটো পাখি, কাঠবিড়ালি পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব করত। তাঁর মনে এই আশ্রমের জন্য যে ভালোবাসা এবং যে ভাবনা ছিল, তাতে আমাদের মতো যারা এই আশ্রমেই নিজেদের ঘর খুঁজে পেয়েছিলাম, তাদের মনে তাঁর স্মৃতি সততই প্রিয়, বলতেন ক্ষিতিমোহন।[৩০]

কত উপলক্ষেই বিশেষ মন্দির হয়, বুধবারের মন্দিরেও সদ্যপ্রয়াত কোনো আশ্রমিক বা পূর্বতন আশ্রমিক, আশ্রমবন্ধু বা দেশবরেণ্য ব্যক্তিকে স্মরণ করার রীতি পালন করেন ক্ষিতিমোহন। নেপালচন্দ্র রায় বা কমল বউঠানের মতো পুরোনো দিনের আশ্রমজীবনে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত মানুষের মৃত্যুসংবাদ নিশ্চয় একটু বেশিই নাড়া দেয় তাঁকে। প্রাক্তন প্রবীণ অধ্যাপক নেপালচন্দ্র রায়ের মৃত্যুর খবর আসতে তাঁর সম্মানে বিশ্বভারতীর সব বিভাগে

কর্মবিরতি হয়ে গেল। সন্ধ্যাবেলা বিশেষ মন্দিরে সারাজীবনের বন্ধু ও সহকর্মীকে স্মরণ করলেন ক্ষিতিমোহন। বিদেহী আত্মার শান্তির জন্য প্রার্থনা করে সকলের জ্ঞাতার্থে তাঁর জীবনের একটি পরিচয় দিলেন। বললেন গত কয়েক বছরে যে বন্ধুদের আমরা হারিয়েছি, যাঁদের অভাবে বিশ্বভারতী দরিদ্র হয়েছে, নেপালবাবু আজ তাঁদেরই সঙ্গো মিলিত হয়েছেন। তাঁদের সম্মিলিত আশীর্বাদ আমাদের উপর বর্ষিত হোক, আমরা যেন আমাদের সকল কাজে নবজীবন সঞ্চার করতে পারি, যেন সেগুলিকে রক্ষা করতে পারি প্রাণহীন যান্ত্রিকতার আক্রমণ থেকে।[৩১] আবার যখন বুধবারের মন্দিরে কমলা দেবীর মৃত্যুতে তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করেন, তাঁর মনে পড়ে এই আশ্রমের সঙ্গো তাঁর কী নিবিড় আত্মীয়তা ছিল। তাঁর স্বামী স্বর্গত দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর রবীন্দ্রনাথের গানের ভান্ডারি, শান্তিনিকেতনের উৎসবরাজ। প্রসঙ্গত তাঁরও স্মৃতিচারণ করেন ক্ষিতিমোহন, নতুন প্রজন্মকে শোনান এই শান্তিনিকেতন-বিশ্বভারতীর গঠনপর্বে তাঁর আত্মত্যাগ ও কর্মের কতখানি মূল্য ছিল।[৩২]

১৬ জুন ১৯৪৪ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের প্রয়াণ ঘটল। ২৩ জুন মন্দিরে ক্ষিতিমোহন উপনিষদের মন্ত্রযোগে এই মহান আত্মার জন্য উপাসনা করলেন। দেশের কাজে সম্পূর্ণ জীবন উৎসর্গ করেছিলেন যে মানুষ, তাঁর জীবনব্যাপী তপস্যা সমগ্র দেশকে গভীর কৃতজ্ঞতার ঋণে আবদ্ধ করেছে। আমরা সকলেই তাঁর মহৎ কর্মসাধনার ফলভোক্তা হিসাবে তাঁর সন্তানতুল্য, তাই তাঁর আত্মার তর্পণ করার অধিকার আছে আমাদের। মহাভারতে আছে ভীষ্মতর্পণের কথা। ভীষ্ম আজীবন ব্রহ্মচারী, তাঁর নিজের কোনো সন্তান ছিল না। কিন্তু তিনি মানবসমাজের জন্য জীবনউৎসর্গ করেছিলেন বলে, তাঁর দেহত্যাগের পরে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধশেষে যাঁরা জীবিত ছিলেন তাঁরা সকলেই তাঁর তর্পণ করেছিলেন। সত্যব্রত আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ভীষ্মের সঙ্গোই উপমিত হতে পারেন, সকল দেশবাসীর শ্রদ্ধাঞ্জলি পাওয়ার যোগ্যতা তাঁরই আছে।[৩৩] এর কিছুদিন আগে আর-এক পরম শ্রদ্ধেয় মানুষও চিরকালের মতো হারিয়ে গেলেন—রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। মানুষের সেবায় নিবেদিত একটি দীর্ঘায়ু জীবনের বহতা ধারা থমকে দাঁড়াল।

> যতদিন তিনি আমাদের মধ্যে ছিলেন তাঁকে শ্রদ্ধা করেছি, ভালোবেসেছি। আজ আর তিনি নেই যখন, আমাদের স্বতঃশ্রদ্ধাবিনম্র অর্ঘ্য তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করে দিই।

বলেছিলেন ক্ষিতিমোহন। তিনি বলেছিলেন :

> দেশে, দেশের বাইরে বহু মানুষ তাঁকে হারানোর বেদনা অনুভব করছেন, কেননা রামানন্দবাবুর আগ্রহ ছিল বহুমুখী, তাঁর বহুধাবিস্তৃত চৈতন্য বিশ্বের সকল সমস্যায় সদা জাগ্রত থেকেছে। জীবনের এমন কোনো দিক নেই যেখানে তিনি তাঁর সততা, ন্যায়বোধ ও সাহসের অনপনেয় সাক্ষর রাখেননি। আর ছিল তাঁর হৃদয়ভরা ভালোবাসা, যে ভালোবাসা কোনোদিন কোনোরকম জাতি-শ্রেণী-গোঁড়ামিজাত পার্থক্যের পরোয়া করেনি।

ক্ষিতিমোহন তাঁকে জানতেন তরুণ বয়স থেকে, যখন এমন মানুষের সঙ্গো কাছে গিয়ে আলাপ করতেই সাহস হত না, তখন থেকেই শ্রদ্ধায় সম্ভ্রমে লক্ষ করতেন তাঁকে। তাঁর

পরিচয় দিতে গিয়ে তাঁর প্রথম কর্মজীবন, দাসী পত্রিকা, এলাহাবাদ-বাস ও প্রবাসী পত্রিকা প্রকাশের পটভূমি, তারপর মডার্ন রিভিয়ু ও শান্তিনিকেতন এবং রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বন্ধুত্বের প্রসঙ্গ এসে গেল। ক্ষিতিমোহন প্রসঙ্গক্রমে বলেছিলেন :

> আমার মনে তাঁর নামটি চিরদিন আর এক বাঙালির নামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে—তিনি পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। উভয়েই জন্মেছিলেন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বংশে, উভয়েরই পূর্বপুরুষ জ্ঞানের চর্চা ও বিতরণের ঐতিহ্যরক্ষায় বিশ্বস্ত থেকেছেন, বিনিময়ে কখনও কোনো আর্থিক প্রতিদান প্রত্যাশা করেননি। দরিদ্র ঘরে জন্ম উভয়েরই, উভয়েই বৃত্তি অর্জন করে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। সামাজিক আচার-আচরণে দুঃসাহসী উভয়েই, তেমনই দুর্দশা বা কঠিন পরীক্ষার মুখে পড়ে দুজনের কেউই কোনোদিন সাহস হারান নি। দুজনেই অধ্যাপনা ও সমাজসেবাকে জীবনের ব্রতরূপে গ্রহণ করেছিলেন।[৩৪]

'প্রবাসী'-তে এই সময়ই ক্ষিতিমোহন প্রবন্ধ লেখেন 'পুণ্যচরিতকথা'। এতেও তিনি বলেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তুলনীয় বলে তিনি মনে করেন। ক্ষিতিমোহনের মনে হত স্বল্পভাষী, শান্ত, সংযত, চালচলনে সাদাসিধা এই মানুষটির মধ্যে ব্রহ্মনিষ্ঠ ভক্তের মতো জ্ঞান, চরিত্রবল ও ক্রিয়া একেবারে সহজভাবে এক হয়ে আছে। অল্প বয়সে এলাহাবাদে তাঁর সঙ্গে পরিচয় হতে তাঁর স্বাধীন ভাব, নির্ভীক সাধনা ও সেবাপরায়ণতা ক্ষিতিমোহনের মনকে তাঁর প্রতি ভক্তিপ্রণত করেছিল। এই শোক-প্রবন্ধে তিনি যেভাবে রামানন্দবাবুর জীবনসাধনার ব্যাখ্যা করেছেন, বোঝা যায় চল্লিশ বছরেরও বেশি দিনের পরিচয়েও তাঁর উচ্চ ধারণা সামান্য বিচলিত হওয়ারও অবকাশ পায়নি।

আচার্য হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় জীবনের অন্তিমে এসে পৌঁছেছেন। চল্লিশ বছরের নিরলস চেষ্টায় 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' প্রণয়ন শেষ হয়েছে তাঁর। একদিন শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সংঘ অর্ঘ্যদান করল তাঁকে। ১ বৈশাখ ১৩৫১ সকালে আম্রকুঞ্জে রবীন্দ্রজয়ন্তীর পরে এই সভা হল। আলপনাশোভিত আসনে আচার্যকে বসিয়ে মাল্যভূষিত করা হল। তাঁর একপাশে আসনগ্রহণ করলেন ক্ষিতিমোহন, অন্যপাশে শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সংঘের প্রতিনিধি তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়। সমবেত কণ্ঠে 'তমীশ্বরাণাং' মন্ত্রগানের পরে ক্ষিতিমোহন অনুষ্ঠান-উপযোগী কয়েকটি মন্ত্র আবৃত্তি করলেন। শান্ত হৃদয়স্পর্শী পরিবেশে সার্থক হয়ে উঠল সংবর্ধনাসভা।[৩৫]

বাইরের আহ্বান

এই-সব নানা কাজের মধ্যেই আবার নানা উপলক্ষে বাইরে যেতে হয়, অনেক সময় বিশ্বভারতীর প্রতিনিধিত্ব করবার জন্যই। ১৯৪১ সালে একবার বিশ্বভারতীর কাজে কাশী যেতে হয়েছিল। বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের রজতজয়ন্তী উৎসবে তিনি বিশ্বভারতীর

প্রতিনিধি। বিশ্বভারতীর পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে ক্ষিতিমোহন স্মরণ করেছিলেন ১৯৩৫ সালে এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রবীন্দ্রনাথকে সর্বোচ্চ সম্মানে ভূষিত করা হয় এবং তিনি সেবার এখানে সমাবর্তন ভাষণ দিয়েছিলেন। সেদিন তাঁর মানসপটে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা ও বোঝাপড়ার ভিত্তিতে গড়ে-ওঠা যে সাংস্কৃতিক বন্ধুতার বিপুল সম্ভাবনার ছবি ফুটে উঠেছিল, তার যথোচিত আলোচনার উপরই বেশি জোর পড়েছিল ক্ষিতিমোহনের এই দিনের ভাষণে, কারণ সাত বছর আগেকার গুরুদেবের এই-সব ভাবনা আজও তার মূল্য হারায়নি।[৩৬] সেবার কাশীতেই প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন, সেখানেও ক্ষিতিমোহনের আমন্ত্রণ ছিল। একটি দিনের সম্পূর্ণ অধিবেশন রবীন্দ্রনাথের স্মরণে অনুষ্ঠিত হবে স্থির হয়েছে, ক্ষিতিমোহনকে সভাপতিত্ব করতে হবে।[৩৭] ১৯৪৩ সালে সেপ্টেম্বর মাসের শেষের দিকে যেতে হয়েছিল রাজস্থানে। পিলানিতে বিড়লা কলেজের উদ্যোগে আয়োজিত একটি সম্মেলনের উদ্‌বোধন করার জন্য তিনি আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। পরে বিড়লা কলেজের অধ্যাপক ও ছাত্রদের মিলিত সভায় রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর শিক্ষাদর্শ সম্বন্ধে ভাষণ দিলেন। এ ছাড়া তিনি সেখানে ভারতীয় মধ্যযুগে সাধনধারার মূলত রাজস্থানের সাধকদের বিষয়ে বক্তৃতা দেন। ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে তিনি ও হাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী আবার কাশী গেলেন। অখিল ভারত প্রাচ্যবিদ্যা সম্মিলনে তাঁরা বিশ্বভারতীর প্রতিনিধি।[৩৮] ১৯৪৪ সালের মার্চে দোলযাত্রার ছুটিতে দিল্লিতে প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের একুশতম বার্ষিক অধিবেশন। মূল সভাপতি নলিনীরঞ্জন সরকার, সাহিত্যশাখার সভাপতি রাজশেখর বসু, দর্শনশাখার সভাপতি ক্ষিতিমোহন সেন।[৩৯]

তিনি তাঁর ভাষণের শুরুতে বলেছিলেন আজকে এই পৃথিবীব্যাপী সংকটে আমরা বাধ্য হচ্ছি আমাদের জ্ঞানবুদ্ধি ও দর্শনকে আগাগোড়া যাচাই করে দেখতে। কেননা জ্ঞানচর্চার জগতে যদি অন্ধকার নামে, যে-কোনো জাতির পক্ষেই তা আত্মহত্যার সামিল। ভারতীয় দর্শন ও ভারতীয় জীবন ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে থেকেছে। জ্ঞান ও বিশ্বাসে, দর্শন ও ধর্মে সংঘর্ষ ছিল না। ধর্মনিরপেক্ষ কবিতা এবং গানও মানুষের মনে গভীর দার্শনিক ভাব সম্প্রসারণে ব্যাপক সহায়তা করেছে। দুর্ভাগ্যক্রমে আজ সারা বিশ্বেই বিজ্ঞান ও ধর্মের বিচ্ছেদ ঘটে গেছে। পশ্চিমি সভ্যতার জাহাজখানা বিজ্ঞানের প্রবল বাত্যার কবলে, ধর্ম তার হাল ধরে নেই, সে নোঙর ছিঁড়ে চলেছে রসাতলের দিকে। আমাদের দেশে আবার উলটো বিপদ—ধর্ম হাল ধরে বসে আছে, বিজ্ঞানের অনুকূল বাতাস পালে লাগছে না। জাহাজখানা তাই গতি হারিয়ে স্থাণু হয়ে আছে। কিন্তু ভারতীয় সভ্যতার সুদিন যখন ছিল, ধর্ম ও সত্যের সর্বাঙ্গীণ মিলন ঘটেছিল। তখন সে বলিষ্ঠভাবে প্রবেশ করতে পেরেছিল জ্ঞান ও যুক্তিবাদিতার গভীরে। একদিকে বহু সংস্কৃতির স্রোতধারার মিশ্রণ, অন্যদিকে অদ্বৈত পরম-পুরুষের মর্মোপলব্ধির আকুতি—এই দুইয়ে মিলে ভারতীয় দর্শনকে আশ্চর্য সমৃদ্ধি দান করেছিল।

সেই সুবৃহৎ দর্শনের সামগ্রিক আলোচনা যেহেতু সম্ভব নয়, ক্ষিতিমোহন তাঁর আলোচনা সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন ভারতীয় দর্শনে বাংলার দান বিষয়ে। নব্যন্যায় বাংলার আবিষ্কার, শৈব দর্শন শাক্ত দর্শন চর্চার স্থান হিসাবেও তার গৌরব প্রাচীন, বৈষ্ণব দর্শন চর্চাও বহুকাল থেকে চলে আসছে। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য তার বৈষ্ণব সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি। ক্ষিতিমোহন দেখালেন এখানকার দর্শনচর্চার সবচেয়ে বড়ো বৈশিষ্ট্য মানব-কেন্দ্রিকতা। বাংলার সাধক মানুষের মধ্যেই ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ দেখেছেন। তাঁদের কাছে প্রেমই ধর্ম। সর্বশাস্ত্রবিহিত ধর্মীয় আচার ও ধর্মানুষ্ঠানকে সে অতিক্রম করে যায়, দ্বৈত-অদ্বৈত সাধনার ধারাকে সংযুক্ত করে। এই প্রেমধর্মের মধ্য দিয়ে সুন্দরের পরমতম উপলব্ধিতে উত্তরণের সাধনা প্রতিষ্ঠাকল্পে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব। সাধনদৃষ্টিভঙ্গির এই সম্পূর্ণ পরিবর্তন বাংলার প্রেমধর্মকে অমেয় ঋদ্ধিদান করেছে। বাউলরা এই প্রেমধর্মের সাধনাকে কোন্ অতুল্য চরিতার্থতায় নিয়ে গেছে তার বিশ্লেষণপ্রসঙ্গে এই দরিদ্র ও অশিক্ষিত সত্যান্বেষী সাধকরা যে গভীর জ্ঞান ও অনুভব সঞ্চয় করেছেন তাঁদের অন্তরে, তার পরিচয় ফুটে উঠল ক্ষিতিমোহনের ভাষণে।[৪০]

পরের বছর ১৯৪৫ সালে তাঁর একটি বই প্রকাশিত হয়—'বাংলার সাধনা'। বইটির পরিকল্পনাই আগে করেছিলেন, বাংলার সংস্কৃতি ও দর্শন নিয়ে এ সময় ভাবছিলেন বলেই এ হয়ে উঠেছিল তাঁর ভাষণের বিষয়বস্তু। এর দু-বছর আগে তাঁর আর-একটি ছোটো বই বেরিয়েছিল—'ভারতের সংস্কৃতি'। সেই গ্রন্থের ক্ষুদ্র পরিসরে লেখক অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সংক্ষেপে আলোচ্য বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি বলেছেন ভারতবর্ষ বহু বিচিত্র সংস্কৃতিকে আশ্রয় দিয়েছিল, তাদের মধ্যে অনেকগুলি ছিল পরস্পরবিরোধী। আবার এই ভারতবর্ষেই ইতিহাসের প্রথম প্রত্যুষ থেকে যে দুরতিক্রম্য বাধা এক জাতি থেকে আর-এক জাতিকে, এক ধর্ম থেকে আর-এক ধর্মকে বিচ্ছিন্ন করে রাখে, তার উপরে সেতুবন্ধনের একটি নিয়মিত ও নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টা দেখা যায়। বইয়ের বিষয়বস্তু আলোচনা গ্রন্থ-আলোচনা অধ্যায়ে আর-একটু করা যাবে, এখন প্রসঙ্গান্তরে যাওয়া যাক।

শিল্পোৎসব ও অন্যান্য

ভাদ্রসংক্রান্তি ১৩৫১ থেকে শ্রীনিকেতনে শিল্পোৎসবের প্রবর্তন হয়। ১৯৪৫ সালে 'বিশ্বভারতী নিউজ' ১৭ সেপ্টেম্বর শিল্পোৎসবের দ্বিতীয় বার্ষিকী অনুষ্ঠানের বিবরণ দিতে গিয়ে লিখেছে :

> এবার এই উৎসবের দ্বিতীয় বর্ষ। ইতিমধ্যে পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেনের হাতে এই অনুষ্ঠান একটি নির্দিষ্ট এবং সংহত আকার পেয়েছে। শিল্পোৎসবের জন্য তিনি সুচিন্তিত একটি পালনবিধির পরিকল্পনা করে দিয়েছেন। বেদমন্ত্রোচ্চারণধ্বনির সুষমা, নিজ নিজ যন্ত্রপাতি হাতে কারিগরদের শোভাযাত্রা, গুরুদেবের গান ও তাঁর রচনাপাঠ—সব মিলিয়ে শিল্পোৎসব একটি বিশিষ্ট অনুষ্ঠান হয়ে উঠেছে।[৪১]

এই পত্রিকাতেই এই উৎসবের আরও কয়েক বছর পরের বিবরণে পাই :

> অনুষ্ঠানে আচার্যের কাজ করেন পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন। তিনি অথর্ববেদ থেকে দেব বিশ্বকর্মার স্তবমন্ত্র আবৃত্তি করেন—'ওঁ শিল্পানি শংসন্তি দেবশিল্পানি'—যার অন্তর্নিহিত অর্থ হল মানুষের হাতে নির্মিত সব কারুশিল্পই প্রকৃতপক্ষে সেই পরম কারুকৃতের চরণে নিবেদিত অর্ঘ্য। গুরুদেবের কয়েকটি গান এই ভাবগম্ভীর অনুষ্ঠানে গীত হয়, তাতে একটি অতিরিক্ত মাত্রা যোজনা করেছিল। অনুষ্ঠান শেষ হলে নন্দলাল বসু এই উপলক্ষে আয়োজিত শিল্পমেলার উদ্বোধন ঘোষণা করেন।[৪২]

১৯৪৪ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনে লেখা হয়েছিল :

> পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেনের তত্ত্বাবধানে বিদ্যাভবনে ভারতবিদ্যা ও ইসলাম সংস্কৃতি বিষয়ক গবেষণার যথেষ্ট অগ্রগতি হয়েছে। বিশ্বভারতীর একটি মূল উদ্দেশ্য বিদ্যাভবনে প্রাচ্য মহাদেশের বিভিন্ন সংস্কৃতিগুলির অন্তরৈক্যের ভিত্তিতে সেগুলি সম্পর্কে ব্যাপক চর্চা ও গবেষণার ক্ষেত্র প্রস্তুত করা। কিন্তু অর্থাভাব বরাবরই এই উদ্দেশ্যসাধন দুঃসাধ্য করে তুলেছে। বর্তমানে বৌদ্ধ ইসলাম ও হিন্দু সভ্যতার ধর্ম সাহিত্য ও ইতিহাস বিষয়ে অধ্যয়ন ও গবেষণার সুযোগ দেওয়া যাচ্ছে। এইসঙ্গে জৈন জরোথুস্ত্রিয় ও খ্রিশ্চান সংস্কৃতির অধ্যাপনা ও গবেষণার ব্যবস্থা করতে পারলে আমরা খুশি হব।[৪৩]

বিশ্বভারতী নিউজ বিদ্যাভবনের পরিচয় ও কাজ প্রসঙ্গে প্রায় উক্ত প্রতিবেদনেরই পুনরুল্লেখ করে বলেছিল : ড. সিলভ্যাঁ লেভি, ড. উইনটারনিট্‌জ, ড. লেসনি, ড. তুচ্চি, অধ্যাপক ফর্মিকি, ড. কলিন্স, অধ্যাপক তারাপুরওয়ালা, ড. গেরমানুস, অধ্যাপক বগদানফ, আগা পুরে দাউদ, মুনি জিন বিজয়, ড. কাজিন্স, ড. স্টেন কোনো, মহামহোপাধ্যায় বিধুশেখর শাস্ত্রী এবং অন্যান্য সব প্রসিদ্ধ পণ্ডিতরা নানা সময়ে বিদ্যাভবনের সঙ্গে যুক্ত থেকেছেন এবং প্রাচ্য সংস্কৃতিগুলির বিচার-বিশ্লেষণের কাজে অংশ নিয়েছেন। ইদানীং গত কয়েক বছর ধরে পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রীর সুযোগ্য নেতৃত্বে বিদ্যাভবন পূর্বেকার গৌরবময় উত্তরাধিকার ধরে রাখবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করছে। কিন্তু এখন সেই-সব দিকপাল ব্যক্তিত্বেরও যেমন অভাব, তেমন অভাব অর্থের।[৪৪]

এই পত্রিকা থেকেই কখনও খবর পাওয়া যায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক নির্বাচকমণ্ডলীতে বিশ্বভারতীর প্রতিনিধিত্ব করার জন্য বিদ্যাভবনের অধ্যক্ষ পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন নির্বাচিত হয়েছেন। কখনও জানতে পারি পণ্ডিত সেন ভারত সরকার কর্তৃক হিস্টোরিক্যাল রেকর্ডস কমিশনের সদস্য মনোনীত হয়েছেন।[৪৫] বলা বাহুল্য, এরই পাশাপাশি আছে তাঁর ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে আচার্যের কাজ সম্পাদন, কিংবা সভায় অনুষ্ঠানে ভাষণদান।

সেবকম বিশিষ্ট কোনো অতিথি আশ্রমে এলে এখনও তিনি বোলপুর স্টেশনে আনতে যান। যেমন গিয়েছিলেন প্রতিমাদেবী ও অনিলকুমার চন্দের সঙ্গে, যখন জেনারেল ইসিমো ও মাদাম চিয়াং কাইসেক এলেন। আর-একবার বাংলার গভর্নর কেসি সস্ত্রীক

এলেন শান্তিনিকেতন-শ্রীনিকেতন পরিদর্শনে। তাঁরা আসতে তাঁদের অভ্যর্থনা করে ইন্দিরা দেবী ও রথীন্দ্রনাথ নিয়ে এলেন গ্রন্থাগারের সামনে, সেখানে ক্ষিতিমোহন ও অন্য বিভাগীয় প্রধানরা অপেক্ষা করছিলেন।[৪৬] আবার কখনও বা তামিলনাড়ুর সম্মানিত অতিথিদের নিয়ে গ্রন্থাগারের সামনে আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান হয়। তামিলনাড়ুর পক্ষ থেকে বিশ্বভারতীর জন্য সহস্রাধিক উল্লেখযোগ্য তামিল গ্রন্থের উপহার নিয়ে এসেছিলেন খ্যাতনামা তামিল পণ্ডিত টি.কে. চিদাম্বরনাথ মুদালিয়র ও আরও কয়েকজন। অনুষ্ঠানের শুরুতে সমবেত কণ্ঠে গান হল, ক্ষিতিমোহন অনুষ্ঠানটির সার্থকতা কামনায় আশীর্বাদ প্রার্থনার কয়েকটি মন্ত্র উচ্চারণ করলেন। কর্মসচিব রথীন্দ্রনাথ আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে বললেন ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক আত্মীয়তা গড়ে তোলার জন্য তামিলনাড়ুর ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হিসাবে আমরা এই গ্রন্থ-উপহার গ্রহণ করছি। বেশ কিছুকাল থেকে আমরা চেষ্টা করছি বিশ্বভারতীতে প্রধান ভারতীয় ভাষাগুলির স্থায়ী চর্চার সম্ভাবনা খতিয়ে দেখতে। সর্বভারতীয় উত্তরাধিকার সৃষ্টির ক্ষেত্রে এই-সব প্রধান ভারতীয় ভাষার ও সংস্কৃতির যে দান সে বিষয়ে বিস্তৃত গবেষণার সুযোগ আছে। এই উপহারের সূত্রে বিশ্বভারতীতে সুপ্রাচীন দ্রাবিড় সভ্যতা ও সংস্কৃতি চর্চার জন্য একটি সম্পূর্ণ বিভাগ গড়ে উঠবে বলে আশা করা যায়। উত্তরে মুদালিয়র, রথীন্দ্রনাথ ক্ষিতিমোহন ও নন্দলালের প্রতি সকৃতজ্ঞ শ্রদ্ধা জানালেন।[৪৭] এমনই এক নিত্য মননশীল এবং ভবিষ্যতে নতুনতর মননশীলতার ক্ষেত্রসন্ধানী পরিবেশে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরেও ক্ষিতিমোহন বাস করেছেন। আর গরমের ছুটি হলেই ধরাবাঁধা ছিল রবীন্দ্রজয়ন্তীর নানা অনুষ্ঠানে যোগদান, রবীন্দ্রজয়ন্তী সভায় ভাষণ দিতে আমন্ত্রণ আসত তাঁর। অখিল ভারতীয় রবীন্দ্রস্মৃতি-সমিতি তখন রবীন্দ্রজন্মোৎসবে সপ্তাহব্যাপী অনুষ্ঠানের আয়োজন করতেন জোড়াসাঁকোর প্রাঙ্গণে। সূচনার দিনে কখনও ক্ষিতিমোহন উপাসনা করেছেন, কখনও জয়ন্তী উৎসবের উদ্‌বোধন করে বলেছেন, রবীন্দ্রনাথের মতো মহান আত্মাই আজ বিশ্বব্যাপ্ত নৈতিক অবক্ষয় থেকে মুক্তি দিতে পারে।[৪৮]

সর্বভারতীয় লেখক সম্মেলন

১০ আগস্ট ১৯৪৫ জাপান আত্মসমর্পণ করল মিত্রশক্তির কাছে, শেষ হল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। সময়টা ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসের এক অবিস্মরণীয় সন্ধিক্ষণ। প্রবল রাজনৈতিক টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে চলেছে দেশ। ৯ আগস্ট ১৯৪২-এ যে মুহূর্তে গান্ধীজি সহ কংগ্রেস কার্যনির্বাহী সমিতির সদস্যরা গ্রেফতার হলেন, সেই মুহূর্তটিকেই ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সূচনাক্ষণ বলে চিহ্নিত করা যায়। ক্রমে দ্বিতীয় স্তরের নেতারাও গ্রেফতার হলে জনগণের মধ্য থেকেই নেতৃত্ব এসেছিল। এ কথা সত্য যে, সেই স্বতঃস্ফূর্ত ব্যাপক সরকারবিরোধী আন্দোলন বারবার গান্ধীজি-নির্দেশিত পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে

হিংসাত্মক হয়ে উঠেছে এবং ব্রিটিশ রাষ্ট্রশক্তির নির্মম চণ্ডনীতি অহিংস-সহিংস সব আন্দোলনকেই চরম আঘাত হেনে পর্যুদস্ত করতে চেয়েছে, তবু তার বেগ রুদ্ধ করতে পারেনি, যতক্ষণ না গান্ধীজি ১ আগস্ট ১৯৪৪ জেল থেকেই দেশবাসীর উদ্দেশে আত্মসমর্পণের আহ্বান জানিয়েছেন। কিন্তু মার এসে পড়ছিল নানা দিক থেকে। এই বছর থেকেই খাদ্যাভাবের আশঙ্কা এবং তার জন্য নিরাপত্তার অভাববোধ উদ্‌বিগ্ন করেছিল সাধারণ মানুষকে। ১৯৪৩ সালে বাংলার ভয়াবহ দুর্ভিক্ষে বিপুলসংখ্যক মানুষের—প্রধানত গ্রামের দরিদ্র মানুষের মৃত্যু হয়, তার মধ্যেও নারী ও শিশুরাই সংখ্যায় বেশি ছিল। প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং মানুষের তৈরি-করা বিপদ মিলে এক অবর্ণনীয় দুর্গতির মধ্যে ঠেলে দিচ্ছিল দেশকে। এদিকে আমাদেরই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ইংরেজ বরাবর 'ডিভাইড অ্যান্ড রুল' নীতি প্রয়োগ করে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করে এসেছে।

> যে দেশে ধর্মের মিলেই মানুষকে মেলায়, অন্য কোনো বাঁধনে তাকে বাঁধতে পারে না সে দেশ হতভাগ্য। ...মানুষ মানুষ বলেই মানুষের যে মূল্য সেইটেকেই সহজ প্রীতির সঙ্গে স্বীকার করাই প্রকৃত ধর্মবুদ্ধি। যে দেশে ধর্মই সেই বুদ্ধিকে পীড়িত করে, রাষ্ট্রিক স্বার্থবুদ্ধি কি সে দেশকে বাঁচাতে পারে?

রবীন্দ্রনাথ এ কথা লেখবার পরে চোদ্দো-পনেরো বছর কাটতে-না-কাটতেই তাঁর আশঙ্কা ফলে যাওয়ার দিকেই এগোলো ঘটনাগুলো। ইতিমধ্যেই জিন্নার নেতৃত্বে পাকিস্তানের দাবি ক্রমে জোরালো হয়ে উঠছিল। হিন্দু-মুসলমান বিভেদের তীব্রতাও বাড়ছিল। রাষ্ট্রিক স্বার্থবুদ্ধি, ব্যক্তিগত স্বার্থবুদ্ধি ও উচ্চাশার সঙ্গে জোট বেঁধে এই বিভেদকে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করছে। দেশের অখণ্ডতা রক্ষার পথ দিনে দিনেই সংকীর্ণ থেকে আরও সংকীর্ণ হচ্ছে।

এই পরিস্থিতিতে পি.ই.এন.-এর উদ্যোগে ডাকা প্রথম সর্বভারতীয় লেখক সম্মেলনে বিশ্বভারতীর প্রতিনিধিত্ব করতে জয়পুর গেলেন ক্ষিতিমোহন। ২০-২২ অক্টোবর ১৯৪৫ সেখানে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। 'ঝড়ের আকাশের উপরেও যেমন শান্ত আকাশ, তুফানের সমুদ্রের নীচে যেমন শান্ত সমুদ্র, সেই আকাশ সেই সমুদ্রই যেমন বড়ো', রাজনীতির উনপঞ্চাশ পবনের আন্দোলনের মধ্যে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন অরাজনৈতিক মানুষের চিন্তা ও বিশ্বাসের জগৎটাও তেমনই বড়ো। সে জগৎটাকে কেউ বড়ো বলুক আর নাই বলুক, তার নিজের তো আর কোনো আশ্রয় জানাও নেই। স্বদেশের সমস্যা তাকে পীড়িতও করে এবং তখনও সেই নিজের চেনা পৃথিবীর ধ্যানধারণা দিয়েই সে সমাধানের পথ খোঁজে বা সমস্যাটার স্বরূপ বুঝতে চায়। তাই দেখতে পাই, ক্ষিতিমোহন সেই আলোড়িত বিক্ষুব্ধ সময়ের পটভূমিতে দাঁড়িয়ে সহিষ্ণুতার দর্শনের কথা বলেন। তিনি বিশ্বাস করেন এখনও যে এত-সব যুদ্ধবিগ্রহ তার কারণ এখনও মানুষ তার পশুস্বভাব থেকে উত্তীর্ণ হতে পারেনি, তবু তার উচ্চতর মানবিক আদর্শগুলিও মানবপ্রগতির পথকে নিত্য আলোকিত করছে। আলোচনা করতে গিয়ে ইউরোপীয় ও ভারতীয় সভ্যতা-

সংস্কৃতির তুলনামূলক বিচারের একটা ঝোঁক এসেই পড়ে। সভ্যতাগর্বিত ইউরোপে এই সেদিন পর্যন্ত ইন্‌কুইজিশন-এর মতো বর্বরতা ছিল, আমেরিকার মায়া ও আজটেক সভ্যতাকে তারা নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। ভারতের ইতিহাস কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা। পলিমাটির আস্তরণ পড়ে পড়ে যেমন করে গড়ে ওঠে নদীমোহনার ব-দ্বীপ, যেন তেমনই করে কতকাল ধরে কত জাতির দানে গড়ে উঠেছে ভারতীয় ধর্মসংস্কৃতির বর্তমান রূপ। সংঘাত বাধেনি, সমস্যা দেখা দেয়নি। ক্ষিতিমোহন তুলে আনেন ঋগ্‌বেদ-অথর্ববেদ-কেনোপনিষদ-শ্বেতশ্বেতরোপনিষদ-তৈত্তিরীয় উপনিষদের, মহাভারতের, বুদ্ধদেবের বাণী—এই মানবদেহমন্দিরেই পরম সত্যের আবাস। প্রত্যেক মানুষের ভিতরে যদি ঈশ্বর অস্তিত্ববান হন, তবে স্বভাবতই প্রতিটি মানুষ উদার হবে। এই কথাটাই সহিষ্ণুতা-দর্শনের প্রকৃত ভিত্তি। এই ভারতে বৈদিক-প্রাক্‌বৈদিক, আর্য-আর্যপূর্ব সব ধর্ম ও সংস্কৃতিই বন্ধুতার পরিবেশে পাশাপাশি বিকশিত হয়েছে। তার আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষার বেদিমূলে যে গণনাতীত বিচিত্র মানুষের অর্ঘ্য নিবেদিত হল, ভারতীয় বা হিন্দুধর্মের গড়ে ওঠার পিছনে তাদের সকলেরই অবদান আছে, এ ধর্মের প্রবর্তক নন কোনো একজন বিশেষ মানুষ বা বিশেষ সম্প্রদায়। ক্ষিতিমোহনের মনে হয়, যে ঔদার্যের বাতাবরণ সেকালে হিন্দু ধর্মসংস্কৃতির বিকাশকে প্রাণিত করেছিল, আজকের রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে সেই বাতাবরণই অন্তরায় হয়ে দেখা দিয়েছে। যে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের মন্ত্র সেদিন সার্থকতা এনেছিল, আজ তার দিন গেছে। এখন চাই অভেদ ঐক্য, যা আমাদের জানা নেই। কিন্তু রাষ্ট্রব্যবস্থায় পশুশক্তিরই প্রাধান্য এবং পশুরাও জানে বাঁচতে গেলে দলবদ্ধ হতেই হবে।

এই বিভেদের সমস্যা অবশ্য আগেও ছিল, বিশেষত বিজেতার বেশে যখন মুসলমানরা দেখা দিল। বক্তা ভাবেন বিধাতা এ দেশে যত বা সম্প্রদায়ের পর সম্প্রদায় পাঠিয়েছেন, তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পাঠিয়েছেন ভক্ত ও সাধকদের। কেউ কাউকে কোনোদিন বিলুপ্ত করতে পারল না। এবার তিনি মধ্যযুগীয় সেই-সব অমর সন্তদের জীবনদর্শনের মধ্য দিয়ে যথার্থ 'ভারতপন্থা'-র দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, যাদের উদার স্বচ্ছ দৃষ্টিতে সহজেই প্রতিভাত হয়েছিল যে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সব ভেদই অলীক। পরম সত্য যিনি তাঁকে আল্লাই ভাব আর রামই ভাব, তাতে কিছু আসে যায় না। কিন্তু পুরাণ কোরান জপের মালার পথে তাঁর কাছে পৌঁছোনো যাবে না। প্রতিদিন প্রতি মানুষের হৃদয়ে প্রাণবান শাস্ত্র লিখছেন সেই মঙ্গলময়, পড়তে হবে তার ভাষা। তাই হল প্রকৃত কোরান। ক্ষিতিমোহন উল্লেখ করেন ভারত কোনোদিন যুদ্ধজয়ীদের বীর বলে গণ্য করেনি, এ দেশে সর্বোত্তম বীরের সম্মান পেয়েছেন রামচন্দ্র কৃষ্ণ বুদ্ধ—যাঁরা বিবিধ সংস্কৃতির মধ্যে সমন্বয়সাধন করেছেন। কবীর দাদূ রজ্জবজি রবিদাস প্রমুখ সন্তরা ও বাংলার বাউলরা সেই সাধনারই উত্তরসূরি।[৪৯]

জয়পুরের এই লেখক সম্মেলনে যোগ দিতে যাওয়ার আগে পরে আরও বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ ঘটেছিল। বনস্থলিতে কন্যা মহাবিদ্যালয়ের সমাবর্তন সভায়

ক্ষিতিমোহন ভাষণ দেন ও যে ছাত্রীরা কৃতকার্য হয়েছেন তাঁদের হাতে অভিজ্ঞানপত্র তুলে দেন। বিশ্বভারতীতে এক অধ্যাপক ছিলেন ড. দুর্গাপ্রসাদ পাণ্ডে। তিনি পরে শান্তিনিকেতনের আদর্শে মানবভারতী নামে মুসৌরির কাছে রাজপুরে একটি আবাসিক বিদ্যায়তন গড়ে তোলেন। এই প্রতিষ্ঠানটিও দেখতে গেলেন। এ ছাড়া তিনি গিয়েছিলেন হৃষীকেশের ভারত আশ্রম এবং কাংড়ার গুরুকুল পরিদর্শন করতে। দু-জায়গাতেই খুব বড়ো জনসমাবেশে বক্তৃতার সুযোগ হয়েছিল। দিল্লি দেরাদুন এবং লখনউতেও তাঁর বক্তৃতার আমন্ত্রণ ছিল। এই সভাগুলিতে তিনি গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের জীবন ও কর্ম বিষয়ে বলেন।[৫০]

বাংলার সংস্কৃতি ও আধুনিক সমস্যা

পৌষ উৎসবের পরে ক্ষিতিমোহনকে আরও একবার যেতে হল উত্তর ভারতে। মিরাটে আয়োজিত এবারকার প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি তিনি। তাঁর ভাষণের শিরনামা 'বাংলার সংস্কৃতি ও আধুনিক সমস্যা'। গত বছরের সম্মেলনে দর্শনশাখার সভাপতির অভিভাষণে তাঁর প্রধান উপজীব্য ছিল ভারতীয় দর্শনে বাংলার দান। সেখানে বাংলার দর্শনচর্চার বৈশিষ্ট্যগুলি দেখিয়েছিলেন ক্ষিতিমোহন। এবারে মূল সভাপতির অভিভাষণে হয়তো বা একটুখানি দ্বিধা নিয়েই শুরু করেছিলেন। এক তো এই সম্মেলনকে কেন্দ্র করে যে সুনির্বাচিত বিদ্বজ্জনসমাবেশ হয়েছে, তাঁদের সমক্ষে বিশেষ কথা বা নতুন কথা কী বা তিনি বলতে পারেন! তার পরে এককালে নিজেই তিনি কাশীর মানুষ ছিলেন বটে, কিন্তু দীর্ঘকাল শান্তিনিকেতনে বাস করে প্রবাসী বাঙালিদের সুখদুঃখের সব কথা জানবার সুযোগ এখন তো তাঁর আর নেই। ভাষণের মুখবন্ধে এ-সব কথা বললেও ক্রমে মন তাঁর নিবিষ্ট হল পঞ্চাশের মন্বন্তর ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ অতিক্রম করে-আসা বাঙালির স্বভাবগত বিচ্যুতিগুলির আলোচনায়। যে বাঙালি চরিত্র হারিয়ে সর্বনাশের তীরে এসে দাঁড়িয়েছে, উত্তেজনার বশে যে বাঙালি অনেক কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে কিন্তু দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনানির্ভর কাজে যার উৎসাহ বা উদ্যম নেই, বিজ্ঞানপাঠ যাকে বিজ্ঞান-মনস্ক করতে পারেনি, যে দলাদলি করবার জন্যই কেবল সমবেত হতে পারে, কিন্তু কোনো গঠনমূলক কাজের জন্য পারে না, যার অধ্যবসায় নেই, অনায়াসলব্ধ অজস্র প্রাকৃতিক সম্পদ যে অপচিত হতে দেয় আর নিত্যপ্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যের জন্যও পরনির্ভর হয়ে থাকে, যে তার টোল-চতুষ্পাঠী থেকে বিচিত্র লোকউৎসব পর্যন্ত জ্ঞানচর্চা ও আনন্দসৃজনের পূর্ব-পরিবেশ নষ্ট করে ফেলেছে, ক্ষিতিমোহনের চিত্ত সহযোগ বোধ করে না তার সঙ্গে। স্বজাতীয়দের দিকে নিছক সমালোচনার তর্জনী তুলেও সে থেমে যায় না। জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা, সমাজজীবনের উজ্জীবন এবং সংঘবদ্ধ কর্মপ্রয়াসের লক্ষ্যসাধনে কী করা যেতে পারে তার জন্য প্রভূত প্রস্তাব সে এনে হাজির করে। তার মধ্যেই আবার গম্ভীর কোনো কথার পৃষ্ঠেই এসে পড়ে মজার গল্প, এসে পড়েন রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ পরিকল্পিত

বিশ্বভারতী। ক্ষিতিমোহন বলেন যা একান্ত প্রয়োজন তা হল : 'প্রাচ্যের ভালর সঙ্গে পাশ্চাত্যের ভালর যোগ'—আর 'তা না হয়ে দুয়েরই খারাপ দিকটার যোগ হলেই সর্বনাশ'। এবার প্রশ্ন : 'পাশ্চাত্য সভ্যতার সঙ্গে জোড়কলম বাঁধবার মত সম্পদ আমাদের কি আছে?' এবার ক্ষিতিমোহন চোখ ফেরালেন বঙ্গ-মগধ-মিথিলায় যে এক বৈদিক সভ্যতার তুল্যমূল্য প্রাচীন ও সম্পদবান সভ্যতা বিকশিত হয়েছিল তার ঋদ্ধিপুষ্ট স্বদেশের প্রতি। তার জীবনচর্চা ও সংস্কৃতিব বিচিত্র দিকের আলোচনা ও উল্লেখের ভিতর দিয়ে দেখানোর চেষ্টা করলেন প্রেমের সাম্যের সমন্বয়ের তীর্থভূমি এই বাংলার স্বতন্ত্রতার দাবি কোন্‌খানে। তার পর বললেন :

> গুড় হতেই নাকি গৌড় নাম। বাংলার মূলেই তবে মাধুর্য আছে। কিন্তু ইক্ষু পিষ্ট না হলে ও ইক্ষুরসকে অগ্নিতে সিদ্ধ না করলে তো গুড় হয় না। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সাধনার মিলনে মানবসংস্কৃতিসমুদ্র মন্থন করে যে অমৃত উঠবে তার একটি প্রধান সাধনপীঠ হয়তো এই বঙ্গদেশ। তাই বাংলাদেশে এত পেষণ ও এত দাহ দেখা যাচ্ছে। কবে হ'তেই তো তার আরম্ভ। কবে তার শেষ হবে কে জানে? ... দুঃখ তো দেখছি, পরিপূর্ণতা দেখা দেবে কবে?

প্রবাসী বাঙালিদের অনুপ্রাণিত করে ক্ষিতিমোহন যোগ করলেন যে সাধনা দ্বারা সেই পরিপূর্ণতার লক্ষ অর্জন সম্ভব হতে পারে, তা যদি বাংলার মূল ভূখণ্ডে সাধ্য না হয় তা হলে সে ব্রত গ্রহণ করতে হবে তাঁদেরই। এ যে অসম্ভব প্রত্যাশা নয় তার প্রমাণ দিলেন ইতিহাসের থেকে দৃষ্টান্ত টেনে এনে—কত মানুষ দেশ থেকে কত দূরে জীবন কাটিয়েছেন, কিন্তু বহু কষ্ট স্বীকার করে প্রাণপাত পরিশ্রমে ভারতের সংস্কৃতি ও সাধনার প্রসার ঘটিয়েছেন সেখানে। নিজের অতি প্রিয় অথর্ববেদের মন্ত্র—'অংতি সংতং ন জহাতি অংতি সংতং ন পশ্যতি' উচ্চারণ করে বললেন প্রবাসী বাঙালিদেরই বাংলাকে বেশি ভালো করে চেনবার কথা, তাদেরই দেশের জন্য বেশি দরদি ও ত্যাগী হতে হবে—বিপরীত স্রোতে নৌকা নিয়ে যেতে হলে নৌকা ছেড়ে নেমে গুণ টানতে হয়। এ কথা বলেই আবার প্রবাসকে আন্তরিকভাবে নিজের ঘর করে তোলবার মনটিও যেন বিকশিত হয়, সে কথা বলতে ভোলেন না ক্ষিতিমোহন। নৌকার গুণ টানতে হলেও এক তো চাই সংহতি ও উদ্দেশ্যের ঐক্য নিজেদের মধ্যে, আবার পায়ের তলার মাটিটাও যেন শক্ত হয়। আশ্রয়ভূমিকে তুচ্ছ করা বা সে দেশের মানুষের সঙ্গে আত্মীয়তা না রাখা অন্যায়—'অন্যকে ছোট করে কে কবে বড় হতে পেরেছে'। বাংলা-অবাংলা অভেদ হয়ে জগৎব্যাপ্ত সংস্কৃতির মহাদীপাবলি উৎসবে যোগ দিতে হবে নিজের দীপটি জ্বালিয়ে নিয়ে। কোনো দীপটা বা সোনার, কোনোটা পিতলের, কোনোটা মাটির। তেল-সলিতাও নানান রকমের। 'কিন্তু যখন সার্থকতার শিখায় সবাই দীপ্যমান হয়ে উঠবেন' তখন এক সাধনার আলোয় সব ভেদ সব পার্থক্য দূর হয়ে যাবে এই তাঁর আশা। অনেক কথা বলেও যেন মনে হচ্ছে ঠিক যা বলা উচিত ছিল তা বলা হয়নি। 'যেমন বজ্রশক্তিতে মহাবাণী উচ্চারণ করা উচিত ছিল সেই শক্তিও জীবনে নেই, সেই ধ্বনিও কণ্ঠে নেই।' বৈদিক ঋষির অগ্নিমন্ত্রের শরণ নিয়ে শেষ করলেন তাই—যে বাণী মানবাত্মার উদ্দীপনের বাণী।[৫১]

আলোর ঠিকানা

এদিকে তো সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্পে আচ্ছন্ন হয়ে আসছে চারদিক, কোথায় আলো, কোথায় বা তার নিশানা! গ্রেট ক্যালকাটা কিলিঙের বছর ১৯৪৬, যার প্রতিক্রিয়ায় ও তস্য প্রতিক্রিয়ায় দেশের উত্তরে পশ্চিমে পূর্বে দাঙ্গার তান্ডব চলে। তবু তারও মধ্যে আপন আলোকবর্তিকাটি জ্বেলে রাখে শান্তিনিকেতন। বছর শুরুর ঠিক আগেটায় ৭ পৌষের পুণ্যলগ্ন শান্তিনিকেতনবাসীর কাছে নতুন প্রাণের বার্তা নিয়ে আসে। প্রভাতে মন্দিরাচার্য পন্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন আবৃত্তি করেন : 'ঈশাবাস্যমিদং সর্বম্' মন্ত্র। 'অসত্য-অন্ধকারের সঙ্গে লড়াই করার জন্য মহর্ষিদেবের কাছে পরম বিশ্বাসে জ্বলন্ত তরবারির মতো এই মন্ত্র অর্পিত হয়েছিল। সত্যই যদি আমরা তাঁর আধ্যাত্মিক ধনের উত্তরাধিকার লাভ করে থাকি তবে আমাদের প্রত্যেকের আচরণ এমন হতে হবে, যাতে এই মন্ত্র আমাদের ও আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জীবনে সার্থক হয়ে ওঠে।' এ কথা বলে ক্ষিতিমোহন সমাগত জনমণ্ডলীকে স্মরণ করিয়ে দেন এই পবিত্র অনুষ্ঠান উপলক্ষে যে উৎসবের আয়োজন, সেখানে ভিড়-বাড়ানো প্রমোদসন্ধানী মানুষের স্থান নেই। নির্বাধ আত্মদানের অন্তরে যে আনন্দানুভব বিরাজ করে, সেই আনন্দ মনে নিয়ে যেন আমরা এই উৎসবে যোগ দিতে পারি।[৫২]

বিশ্বভারতীর বার্ষিক প্রতিবেদনে ভারতবিদ্যাবিভাগের যথাযথ অগ্রগতিতে সন্তোষ প্রকাশ করে বিভাগীয় অধ্যক্ষ পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেনকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়। উল্লেখ করা হয় মধ্যযুগের ভারতীয় মরমিয়া ও ধর্মসাহিত্য নিয়ে অধ্যক্ষ মহাশয় তাঁর নিজের গবেষণার কাজ করে চলেছেন এবং জাতিভেদ প্রথার উৎপত্তি ও তার প্রকৃতি বিষয়ে রচিত তাঁর গ্রন্থ ছাপা হচ্ছে। ক্ষিতিমোহনের 'জাতিভেদ' প্রকাশিত হয় ১৯৪৭ সালের গোড়ার দিকে, এ বিষয়ে তাঁর হিন্দিতে লেখা 'ভারতবর্ষমেঁ জাতিভেদ' কয়েক বছর আগেই প্রকাশিত হয়েছিল। এই কয়েক বছরে তাঁর যে কয়েকটি বই প্রকাশিত হয় তার মধ্যে ছিল বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহভুক্ত ১৯৪৩ সালে প্রকাশিত 'ভারতের সংস্কৃতি', ১৯৪৫ সালে প্রকাশিত 'বাংলার সাধনা'। 'জাতিভেদ'-এর কয়েক মাস পরে প্রকাশিত হয় 'হিন্দু সংস্কৃতির স্বরূপ'। এর পর ১৯৫০ সালে প্রকাশিত হয় 'ভারতে হিন্দু মুসলমানের যুক্তসাধনা' এবং 'প্রাচীন ভারতে নারী'। এই বইগুলির মধ্যে একটি ভাবগত ঐক্যসূত্র সহজেই চোখে পড়ে। যে উগ্র মৌলবাদী শক্তি ক্রমশ মাথাচাড়া দিয়ে উঠে রাজনীতির হাতিয়ার হয়ে জাতীয়তাবাদী শক্তিকে পর্যুদস্ত করতে চাইছে, মনে হয় যেন এ-সব অনুসন্ধানলব্ধ তথ্য প্রকাশ করে ক্ষিতিমোহন তাঁর নিজের ধরনে তার প্রতিবাদ করছেন কোথাও, কোথাও বা স্বদেশের সমাজ ও সংস্কৃতির বিচার-বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে নিজের কাছেই নিজের জিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজছেন। 'জাতিভেদ' গ্রন্থটি অল্পদিনের মধ্যেই বেরোবে সে খবর দিয়ে ১৯৪৬ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনে কর্মসচিব লিখেছিলেন যে, বইটি প্রকাশিত হলে হিন্দুদের

সমাজবন্ধন সম্পর্কে অনেক ভুল ধারণার নিরসন হবে। এ বই জাতিভেদ-সমস্যার একটি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের ধারণা গঠনে সহায়ক হবে বলে আমরা আশা করি। হিন্দু প্রতিক্রিয়াশীলদের মন থেকে জাতিভেদপ্রথার সঙ্গে যুক্ত কুসংস্কার ও গোঁড়ামি দূর করতেও সাহায্য করবে।[৫৩]

এই-সব ভাবনা-সম্ভাবনা-প্রত্যাশার মধ্য দিয়ে পথ চলতে চলতে সহস্র ক্ষয়ক্ষতির ভয়াবহতা ভেদ করে শতাব্দীর সবচেয়ে বড়ো সংবাদটি দ্বারে এসে নাড়া দিল—ইংরেজ শাসনের অবসান, দেশ স্বাধীন হতে যাচ্ছে। ১৪ আগস্ট ১৯৪৭ মধ্যরাত্রে ভারতের শেষ ইংরেজ ভাইসরয় লর্ড মাউন্টব্যাটেন শাসনক্ষমতা তুলে দিলেন ভারতীয় জনপ্রতিনিধির হাতে। সেই দিন রাত বারোটায় শান্তিনিকেতনবাসীরা গ্রন্থাগারের সামনের প্রাঙ্গণে এসে জড়ো হয়ে এই ক্ষমতাহস্তান্তরের ক্ষণটি উদ্‌যাপন করলেন। সেই পুণ্য মুহূর্তে সমবেত উদাত্ত কণ্ঠের 'বন্দেমাতরম্' গানের সুর অন্তরকে উদ্দীপিত করে তুলছে, একটি মহিমান্বিত সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধার অনুভব নক্ষত্রখচিত আকাশের নীচে সমাগত মানুষগুলিকে অভিভূত করে ফেলছে যেন। ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্য পূর্ণ করতে যে অসংখ্য দেশপ্রেমিক মুক্তিযোদ্ধা শহিদ হয়েছেন, প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন যে অগণিত নাম-না-জানা সৈন্য, তাঁদের সম্মানে ও স্মরণে দু-মিনিট কাল নীরবতা পালিত হল। তারপর 'আমাদের যাত্রা হল শুরু' গানটি সমবেত কণ্ঠে গাইতে গাইতে সকলে আশ্রমপ্রদক্ষিণে বেরোলেন। মিছিলের অগ্রবর্তী কয়েকটি মানুষের হাতে-ধরা মশালের আলো কী এক অমিত প্রত্যাশার প্রতীক হয়ে জ্বলছে।

পরদিন ১৫ আগস্ট, বাংলা ২৯ শ্রাবণ ১৩৫৪, সকালে এই উপলক্ষে সুসজ্জিত গৌর প্রাঙ্গণে পুনরায় আশ্রমসমাবেশ। ছাত্রদল শোভাযাত্রা করে যথাবিহিত রীতিতে বহন করে নিয়ে এল ত্রিবর্ণ ভারতীয় পতাকা, স্থাপন করল নির্দিষ্ট বেদিতে। বৈদিক প্রার্থনামন্ত্র উচ্চারণ করলেন ক্ষিতিমোহন, শঙ্খধ্বনির মধ্যে প্রবীণতম আশ্রমিক পণ্ডিত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করলেন। জাতীয় সংগীত 'জনগণমনঅধিনায়ক জয় হে' সমবেত কণ্ঠে গীত হল। তার পর সমবেত আশ্রমিকমণ্ডলীর শোভাযাত্রা আশ্রম পরিক্রমায় বেরিয়ে বিশ্বভারতীর প্রত্যেক ভবন ও প্রতিটি বিভাগীয় কার্যালয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করল। পরিক্রমা সম্পূর্ণ হল গৌরপ্রাঙ্গণে ফিরে এসে সম্মিলিত কণ্ঠের সহর্ষ জয়ধ্বনিতে। স্থির হয়েছিল স্বাধীনতাদিবস-স্মারক রূপে একটি ক্লক টাওয়ার বা ঘড়িঘর নির্মিত হবে এবং তার জন্য স্থান নির্বাচিত হয়েছিল গ্রন্থাগারের সামনে শান্তিনিকেতনের মধ্যস্থলবর্তী গৌরপ্রাঙ্গণে। সেই দিনই বিকেলবেলা তার শিলান্যাস করলেন কর্মসচিব রথীন্দ্রনাথ। দেশের স্বাধীনতালাভ উপলক্ষে শান্তিনিকেতন আয়োজিত দু-তিন দিনব্যাপী আনন্দ উৎসবে আরও নানা অনুষ্ঠান ছিল। ছিল আলোকসজ্জা। ছিল সাঁওতাল নাচ। খেলাধুলা, গানের আসর। মাটির প্রদীপের উজ্জ্বল শিখায় সজ্জিত অশোকচক্র চমৎকার শোভা বিস্তার করেছিল।[৫৪]

স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে যে মন্ত্রগুলি উচ্চারণ করেছিলেন ক্ষিতিমোহন, সেগুলি অবশ্যই উল্লেখযোগ্য। আচার্য ক্ষিতিমোহন সেনের যে-সব কাগজপত্র ক্ষেমেন্দ্রমোহন সেনের সৌজন্যে আমাদের দেখবার সুযোগ হয়েছে, তার মধ্যে বিশ্বভারতীর '১৩৫৪ সালের ২৯শে শ্রাবণের (১৫ই আগস্ট) অনুষ্ঠানসূচী' আছে। তাতে এই অনুষ্ঠানের জন্য ক্ষিতিমোহন নির্বাচিত মন্ত্রগুলি স্থান পেয়েছে। তবে সম্পূর্ণ অনুষ্ঠান-পত্রীটির মূল্যও সামান্য নয় মনে হল বলে সেটি পরিশিষ্টে যোগ করা গেল।[৫৫]

সদ্যলব্ধ স্বাধীনতার যে আনন্দে সমগ্র আশ্রমের চিত্ত দেশব্যাপ্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার শরিক, ক্ষিতিমোহন তার বাইরে নেই বটে, তবু এ পর্যন্ত জাতিবৈরি ও হিন্দুমুসলমান দাঙ্গার যে বীভৎস রূপ তাঁরা নিজের চোখে দেখলেন, মনের উপর তারও প্রভাব সামান্য নয়। অদূর ভবিষ্যতে সেই ভয়াবহ অভিজ্ঞতার বোঝা আরোই বাড়ল। এই বিভেদদীর্ণ দেশে আনন্দে-বিষাদে-মেশা যে স্বাধীনতা এল, তা নিয়ে মনের মধ্যে নাড়াচাড়া চলছিল বেশ কিছুকাল থেকে, 'অখণ্ড ভারতের সাধনা', 'স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর সাবধান সাবধান', 'স্বাধীনতার সাধনা' প্রভৃতি প্রবন্ধে তা আত্মপ্রকাশ করল। মনে হচ্ছিল আমাদের রাজনীতিগত জীবনেও কয়েকটা কথা ভেবে দেখবার সময় হয়েছে। বহুদিনের পরাধীনতার পরে দেশ স্বাধীন হল। আমরা অচল দাসত্বের জড়ভূমি থেকে পা দিয়েছি স্বাধীনতার সচল নৌকায়। এখন বার বার নিজেদের শুনতে ও শোনাতে হবে 'সাবধান সাবধান'। নিয়ত লক্ষ রাখতে হবে আমাদের কর্মে চিন্তায় ব্যবহারে বাক্যে চরিত্রে কোনো ছিদ্র আছে কি না যেখান দিয়ে জল চুঁইয়ে চুঁইয়ে ঢুকে নৌকাডুবি ঘটাতে পারে। সশব্দ বিপত্তির চেয়েও এই নিঃশব্দ অলক্ষিত বিপদ বেশি ভয়ংকর, তাই সাবধান। ক্ষিতিমোহনের বক্তব্য ছিল স্বাধীন জাতির বিকাশে সাম্য এবং সামঞ্জস্যের কর্ষণটা বিশেষ জরুরি। ভারতে নানা জাতি, নানা সংস্কৃতি। নানা প্রদেশের নানা ধরনের ভালোমন্দ স্বার্থ ও প্রয়োজন। নানা ধর্মের নানা পথ। আবার ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যেরও নানা শক্তি। সবকিছুর প্রতি সুবিচার করে যথাযোগ্য প্রাপ্য সকলকে দিতে হবে। যা উপেক্ষিত হবে শেষপর্যন্ত তা এমন নিদারুণ বিপদ ডেকে আনবে যার প্রতিকার অসম্ভব। ক্ষিতিমোহনের প্রবন্ধ পড়তে পড়তে মনে হয় তিনি যেন পঞ্চাশ বছর পরেকার বাস্তব অঘটন ও সমস্যার কিছু কিছু দেখতে পাচ্ছিলেন বলেই এমন সাবধানবাণী উচ্চারণ করতে পারছিলেন। ক্ষিতিমোহন বলছিলেন স্বাধীন ভারতে যেন কোনো রকমের অনৈক্য ও বৈষম্য না থাকে, অধিক-শক্তিমান যেন মুহূর্তের ভুলেও অল্প-শক্তিমানকে অপমান না করেন, সর্বমানবে দেবতাকে প্রত্যক্ষ করতে হবে। কারও দাবি থেকে তাকে কেউ না বঞ্চিত করে, সবারই অন্নজলের অধিকার সমান। বঞ্চনা না থাকলে বিদ্বেষ দূর হবে, গড়ে উঠবে ভ্রাতৃত্ববোধ। সমাজে উচ্চ-নীচ নির্বিশেষে যথাযথ সংবিভাগ থাকে যেন, চারি বর্ণ একই পিতার সন্তান। এ বিধান শুধুমাত্র ধনী ও উচ্চবর্ণের জন্যই নয়, দরিদ্র ও মধ্যাধিকারীর জন্য একই বিধান। সেও যেন কাজে ফাঁকি না দেয়, তার শ্রমই তার ঐশ্বর্য। লক্ষণীয়, ক্ষিতিমোহন কিন্তু বর্ণ-অভেদের কথা বলছেন না, বরং তিনি বললেন সব দেশেরই

সমাজ গড়ে ওঠে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র এই চার শক্তির যোগে।* কোনো একটি শক্তি যখন অন্য শক্তিকে গ্রাস করে প্রবল হয়ে ওঠে, সামঞ্জস্য ভঙ্গ হয় তখনই। তা বলে গুটিকয়েক ধনীর ধন অগণিত দরিদ্রের মধ্যে বণ্টন করলেই সাম্য আসবে বলে ক্ষিতিমোহন বিশ্বাস করেন না, তিনি বলেন ধনী লুপ্ত হলেই দরিদ্রের দারিদ্র্যের অবসান হবে না এবং মনে করিয়ে দেন : 'সাম্যবাদ প্রভৃতি বড় জিনিসও এক এক সময়ে চতুর লোকদের সুনিপুণ উপায় মাত্র।' প্রসঙ্গত রাশিয়ার দৃষ্টান্ত তুললেন : 'যাঁহারা রাশিয়ায় সাম্যের স্বপ্ন দেখেন তাঁহারা জানেন না যে, রাশিয়াতেও আজ উচ্চনীচের বা ধনীদরিদ্রের বৈষম্য আছে কিনা।' কঠিন বাস্তবের ভূমিতে দাঁড়িয়ে তিনি স্পষ্টই বললেন কেবল জমিদাররাই শোষক নয়, আমাদের দেশে ক্ষুদ্রচাষিভক্ষক বড়োচাষির অভাব নেই। সোজা কথা হল, ধনী-দরিদ্রের ভেদ ঘোচবার নয়, কিন্তু দেশের প্রতি উভয়েরই কর্তব্য আছে। রাজনীতি শুধু আইননির্ভর, কিন্তু ভারতীয় ধর্মনীতি যে পথে চলতে বলে সে পথ উদার, তার সীমানা বহু বিস্তৃত। সমস্ত সমাজজীবনটা পারস্পরিক দাবি ও দায়িত্ববন্ধনে বাঁধা। স্বাধীন ভারতের উপর সমস্ত বিশ্বকে বিভেদ ভুলে যোগযুক্ত করার কঠিন দায়িত্ব এসে পড়েছে—এ কথা যে প্রবন্ধশেষের সাজানো উপসংহার নয়, তা স্পষ্টতর হয়ে ওঠে স্বাধীনতা ও দেশভাগের প্রসঙ্গে লেখা তাঁর অন্য প্রবন্ধগুলি থেকেও। ক্ষিতিমোহন আপন বিশ্বাসের কথা বলেন সেখানেও।[৫৬] যেমন তিনি প্রথম স্বাধীনতা দিবসের অল্পদিন পরেই শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকার প্রবন্ধ-শেষে লেখেন :

> আজ আমরা নানাভাবে দুর্গত। আত্মশক্তিতে পূর্ণ হইয়া যদি পরমা শক্তির পূজা করিতে পারি, তবেই আমাদের সব দুঃখ দুর্গতির মূল ক্লৈব্য ও দুর্বলতা দূর হইতে পারে। ঋষিদের মুখে উচ্চারিত বৈদিক মন্ত্রগুলি আমাদের নবশক্তি দান করুক।[৫৭]

বছরের বাকি কয়টা মাস বিশ্বভারতীর আপন নিয়মমতো কাটল একে একে। ১৯৪৭-এর ৩১ আগস্ট শ্রীনিকেতনের হলকর্ষণ উৎসব, ১৭ সেপ্টেম্বর শিল্পোৎসব, বৎসর অন্তিমে ৭ পৌষ। ক্ষিতিমোহন উপস্থিত থাকেন আপন ভূমিকায়। আবার কখনও আনন্দ কুমারস্বামীর মৃত্যুতে আয়োজিত শোকসভায় সভাপতিত্ব করার আহ্বান আসে, কখনও বা নন্দলাল বসু ও তিনি বিশ্বভারতীর অন্যান্য কর্মকর্তাদের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডা. প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের মতো বিশিষ্ট অতিথির অভ্যর্থনা করেন গ্রন্থাগারের সম্মুখে, গৌরপ্রাঙ্গণে তাঁর জাতীয় পতাকা উত্তোলন-অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকেন।[৫৮] ২৭ সেপ্টেম্বর ইউনেস্কোর দুই প্রতিনিধি একদিনের জন্য শান্তিনিকেতন দেখতে এলেন—একজন হলেন শিক্ষা বিভাগের অধিকর্তা ড. ক্যুয়ো-ইয়ু-স্যু (Dr. Kuo Yu-Shou) এবং অন্যজন শিক্ষা-

---

* 'ব্রাহ্মণের হইল জ্ঞান ধর্ম সংস্কৃতি, ক্ষত্রিয়ের হইল রক্ষা ও শাসনের জন্য অস্ত্রবল, বৈশ্যের হইল কৃষি ও বাণিজ্য, শূদ্রের হইল শ্রমশক্তি। এই চারিটি একই বিরাট পুরুষের চারি অঙ্গ। এক মানুষের কোনো অঙ্গই অন্য অঙ্গ হইতে হীন বা উচ্চ নয়। তাই জাতির উচ্চনীচতা মানা অন্যায়।'—স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরে—সাবধান সাবধান।

বিজ্ঞান-সংস্কৃতি কেন্দ্রের পরামর্শদাতা, লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জে.এ. লওরেজ (Prof. J. A. Lauweryes)। বিশ্বভারতীতে নানা উপলক্ষে বহু মানুষই আসেন, তার মধ্যেও এই দুটি মানুষের আগমনের একটা পৃথক মর্যাদা ছিল সন্দেহ নেই। ইউনেস্কো তখন নতুন সংস্থা, সদ্যই কাজ শুরু করেছে। দু-শো বছরের পরাধীনতার পরে মাত্র পাঁচ সপ্তাহ আগে যে দেশ এক স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে দেখা দিয়েছে, সে দেশে আসবার সুযোগে ইউনেস্কোর এই প্রতিনিধিরাও বিশেষ আনন্দ ও উত্তেজনা বোধ করেছিলেন, সে কথা জানা যায় তাঁদের নিজেদেরই কথায়। গ্রন্থাগারের সামনে আয়োজিত সংবর্ধনাসভায় ক্ষিতিমোহন স্বাগত ভাষণে আপ্যায়িত করলেন দুই অতিথিকে। বললেন :

> অনতিদূর-অতীতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ও জাতিগুলি কেবল প্রতিদ্বন্দ্বীর সাজেই পরস্পরের মুখোমুখি হয়েছে—হয় রণক্ষেত্রে আর না হয় তো বাণিজ্যক্ষেত্রে। তবু এখন এই ভয়াবহ পরিণামপথে চলবার পিছনে যে নির্বুদ্ধিতা কাজ করছে, তা যে আমরা বুঝতে পেরেছি এবং শিক্ষা বিজ্ঞান সংস্কৃতির মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে সংঘবদ্ধভাবে সুবিন্যস্ত কর্মপদ্ধতি অনুসরণে কৃতসংকল্প হয়েছি, তা থেকে এটুকু বোঝা যাচ্ছে যে মানুষ আবার সুস্থ মানসিকতায় ফিরছে। যদি জ্ঞান ও সংস্কৃতিচর্চার বিস্তীর্ণ ভূমিতে সুসঙ্গতি প্রতিষ্ঠা সম্ভব করে তোলা যায়, তাহলেই শুধু যুদ্ধ ও রক্তপাতের বিধ্বংসী পর্যাবৃত্ত থেকে পৃথিবী বাঁচবে, না হলে নয়। আমাদের বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠাতা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বহুদিন আগেই বিশ্বব্যাপী শান্তি প্রতিষ্ঠার এই একমাত্র স্থায়ী ও নিশ্চিত পথের সন্ধান দিয়েছিলেন এবং তাই এ বিষয়ে তিনি বিশ্বের অন্যান্য সকল চিন্তাবিদের তুলনায় বহু যোজন অগ্রবর্তী। আর তিনি যে কেবল তাত্ত্বিক নন, শান্তিনিকেতনে প্রতিষ্ঠিত এই আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় তার জাজ্বল্য প্রমাণ। সেখানে পৃথিবীর সব দেশ ও জাতির মানুষেরা আপনাপন ভাবধারার আদানপ্রদানের সুযোগ পান। আমরা আনন্দবোধ করছি যে রবীন্দ্রনাথের সেই আদর্শই ইউনেস্কোর কর্মকর্তাদের উদ্‌বোধিত করেছে। যে-অতিথিদ্বয় আজ এসেছেন আমাদের কাছে, তাঁরা প্রকৃত প্রস্তাবে আমাদের সহকর্মী। আমরা তাঁদের সর্বান্তঃকরণে স্বাগত জানাচ্ছি এবং তাঁদের আরব্ধ কর্মের আন্তরিক সাফল্য কামনা করছি। তাঁদের সাফল্যে আমরাও সফল হব, আর এই সাফল্যের উপর নির্ভর করে আছে সমস্ত পৃথিবীর ভবিষ্যৎ। তাই সাফল্যলাভ করতেই হবে—আমরা এ কাজ ব্যর্থ হতে দিতে পারি না।

স্বাগত ভাষণের উত্তরে ড. ক্যুয়ো ইয়ু-স্যু যা বললেন তাতে ইউনেস্কোর প্রাচ্য মহাদেশের অনগ্রসর দেশগুলিতে শিক্ষাপ্রসার-পরিকল্পনার কথা ছিল, কী শ্রদ্ধা কী সাহায্য ও প্রত্যাশা নিয়ে তাঁরা ভারতের কাছে এসেছেন সে-সব কথা ছিল।

> আমাদের প্রধান লক্ষ্য মানুষের মনে স্থায়ী শান্তিপ্রতিষ্ঠা। জ্ঞানের প্রসার ও আন্তর্জাতিক বোঝাপড়ার ভিত্তিতেই কেবল এই লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হতে পারে।

ড. ইয়ু-স্যু আরও বললেন :

> গত দশ বছর ধরে আমি এই শান্তিনিকেতনে আসবার ইচ্ছা পোষণ করে আসছি। এখানে এই অনুষ্ঠানে যে উপস্থিত থাকার সুযোগ হল, সুযোগ হল ব্যক্তিগতভাবে কবি রবীন্দ্রনাথের অমর আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানাবার, এটা মস্ত কথা। এই প্রতিষ্ঠানের সকল গঠনমূলক মূল্যবান কর্মে,

> সকল সাংস্কৃতিক ও শৈল্পিক ঐশ্বর্যময় আত্মপ্রকাশের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের ভাবের অভিব্যক্তি দেখতে পাচ্ছি। সাংস্কৃতিক সহযোগিতা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বিশ্বভারতী পথিকৃৎ। এখান থেকে আমাদের শিখতে হবে অনেক। শুধু তাই নয়, এ কথা নিশ্চিত জানবেন যে, ভবিষ্যতেও এই সাংস্কৃতিক মিলনচর্চা কেন্দ্রের ক্রমোন্নয়নের দিকে আমরা সর্বদাই সাগ্রহে তাকিয়ে থাকব।

ড. ইয়ু-স্যুর সঙ্গী অধ্যাপক লওরেজও অনেকটা এই ধরনের কথাই বললেন তাঁর ভাষণে। তিনি বললেন :

> যে সংকল্প ও বিশ্বাস মনে নিয়ে আমরা এই বিশ্বসংস্থায় কাজ করছি, আপনাদের সকলকে তার অংশীদার রূপে কাছে পেতে চাই। কারণটা সহজবোধ্য—এই আণবিক যুগে এর পর যদি আবার বিশ্বযুদ্ধ বাধে, মানবসভ্যতা তাহলে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

ইউনেস্কোর কাজ এখনই যে কোনো বিরাট পরিবর্তন ঘটাতে পারবে না সে কথা স্বীকার করে অধ্যাপক লওরেজ বললেন :

> আমরা হৃদয়ের পরিবর্তন আনতে চাই যাতে সব সংঘর্ষের অবসান ঘটে, মানুষে মানুষে ভ্রাতৃত্বের বোধ গড়ে ওঠে। এ কাজে রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজীর চিন্তাধারা যে-ভারতীয় ভাবনাকে সমৃদ্ধ করেছে তার কাছ থেকে আমাদের অনেক কিছু জানবার আছে, অনেক সহায়তা পাবার আছে।

তাঁরা যে দাতা নয়, গ্রহীতার মন নিয়ে এসেছেন ভারতের দ্বারে, এ কথায় উজ্জীবিত ও আনন্দিত বোধ করছিলেন নিশ্চয় বিশ্বভারতীর সব মানুষ, ক্ষিতিমোহনও সেই সার্থকতাবোধের অংশীদার। সমবেত কণ্ঠে জাতীয়সংগীত গেয়ে শেষ হয়েছিল সংবর্ধনা সভা।[৫৯]

গান্ধীজি প্রসঙ্গে

তখনও বিশ্বভারতীর সব চিন্তায় ও কাজে রবীন্দ্রনাথ জড়িয়ে আছেন নিত্য। তাঁর ভাব ও আদর্শের রূপায়ণে তখনও একটি অকৃত্রিম নিরলস চেষ্টা যে আছে তা অনুভব করা যায়। সেই সঙ্গে আর-এক মহান ব্যক্তিত্বের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ শান্তিনিকেতনে সহজ অধিকারে ছড়িয়ে থাকে সকালবেলার আলোর মতো। সেই অসামান্য মানুষটি মহাত্মা গান্ধী, যাঁর সঙ্গে শান্তিনিকেতন আশ্রমের সুদীর্ঘকালের সম্বন্ধ। ১৯৪৫ সালে দু-দিনের জন্য তিনি স্বয়ং এসেছিলেন, ১৮-২০ ডিসেম্বর ছিলেন এখানে। তারও আগে রবীন্দ্রনাথ থাকতে তিনি শেষ এসেছিলেন ১৯৪০ সালের ফেব্রুয়ারিতে, তার পরে এই আসা হল। যেদিন এলেন, সেদিন সন্ধ্যাবেলা গৌরপ্রাঙ্গণে তাঁর প্রার্থনাসভা আয়োজিত হয়েছিল। পরদিন বুধবারের প্রভাতি মন্দিরোপাসনায় তিনিই ছিলেন আচার্য। বিকেলবেলা দীনবন্ধু অ্যান্ডরুজ মেমোরিয়াল হাসপাতালের শিলান্যাস করলেন এবং সন্ধ্যায় দীর্ঘসময় বিশ্বভারতীর বিভিন্ন বিভাগের প্রধানদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করলেন।[৬০]

বেশ কয়েক বছর থেকে আশ্রমে ২ অক্টোবর গান্ধীজয়ন্তী উৎসব পালিত হয়ে আসছে। বছরের এই দিনে উষালগ্নে বৈতালিকদল গান গেয়ে আশ্রমপরিক্রমা করেছে। সকালে মন্দিরে এই উপলক্ষে প্রার্থনা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আচার্য ক্ষিতিমোহন রবীন্দ্র-রচনা থেকে গান্ধীজি সম্পর্কে পড়ে শুনিয়েছেন কখনও, কখনও বা নিজে ব্যাখ্যা করেছেন গান্ধীয় বিশ্বাসের মূলগত ভিত্তি যে সত্য ও অহিংসা, তার ভিতরকার আত্মিক তাৎপর্যটি কী। জিশুখ্রিষ্ট ও মহাত্মা গান্ধীর তুলনা করে বলেছেন এঁদের উভয়েরই প্রচারিত বাণী অত্যন্ত সরল, তার কারণ সব মৌলিক সত্যই সরল। ক্ষিতিমোহন তাঁর শ্রোতাদের কাছে সনির্বন্ধে আবেদন করেছেন :

> নম্র মনে বিচারবুদ্ধি দিয়ে বুঝে গান্ধীপন্থার অনুসরণ করো, সাবধান থেকো, অন্ধ গান্ধীভক্তির ভান যেন তোমাদের পেয়ে না বসে। খ্রীস্টধর্ম মানুষে মানুষে ভ্রাতৃত্বসম্বন্ধের সহজ শিক্ষা দেয়, সেই শিক্ষা ভুলে খ্রিস্টভক্তরা অস্বীকার করছে তাঁকে প্রতি মুহূর্তে। নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থপর উদ্দেশ্য পূরণে ব্যবহার করছে তাঁর নাম। সাম্রাজ্যবাদী খ্রিশ্চান জাতিরা যেমন করে অগ্রাহ্য করেছে খ্রীষ্ট্রীয় ধর্মবিশ্বাস, আমাদের যেন মহাত্মার উচ্চভাবের উপদেশগুলিকে তেমন করে কলুষিত করবার দুর্ভাগ্য না হয় কখনও। একথা যেন উপলব্ধি করি জগতের আর সব মহনীয় শ্রেষ্ঠ পুরুষের মতোই গান্ধীজী দেশকালের সব সংকীর্ণ সীমাকে অতিক্রম করে গেছেন, জাতি সম্প্রদায়ের সব গন্ডিবদ্ধতার উর্ধ্বে তিনি। এই দৃষ্টিকোণ থেকেই তাঁকে দেখতে হবে আমাদের এই জাগতিক অনিত্য আশা-আকাঙ্ক্ষাসিদ্ধির যুদ্ধে তাঁকে বিজয়ী সেনাপতির বেশে দেখতে চাওয়ার চেয়ে তাঁকে আমাদের আত্মিক জীবনের অধিনেতারূপে দেখতে চাওয়াই বেশি সঙ্গত। তাঁর উপদেশগুলি একদিকে যেমন আমাদের অমূল্য প্রাপ্তি, অন্যদিকে তেমনই মস্ত দায়। আমরা যদি নিজেদের গান্ধীঅনুগামী বলে দাবি করি, তবে সর্বাত্মক সাধনায় ও কঠিন পরিশ্রমে আমাদের সে-দাবির উপযুক্ত এবং সে দায় বহনের অধিকারী হয়ে উঠতে হবে।

সেকালের শান্তিনিকেতনে গান্ধীজয়ন্তীর দিন অনেক সময় সারাদিনব্যাপী উৎসব হয়েছে। সকালে মন্দিরের পরে সূত্রযজ্ঞ, কোনোবারে বিকেলে গান্ধীজির কর্মজীবন অবলম্বনে হাতে-আঁকা পোস্টারপ্রদর্শনী, ছাত্ররা নিজেদের হাতে-কাটা সুতো গান্ধীজিকে উৎসর্গ করেছেন। খদ্দরের তৈরি জিনিসপত্রের চার্ট যেমন মানুষের তথ্যসহায়ক হয়েছে, তেমনই নন্দলাল বসুর আঁকা ডান্ডি অভিযানের অসামান্য ছবি প্রদর্শনীর শোভা ও সম্ভ্রম বাড়িয়েছে।[৬১]

২রা অক্টোবর ১৯৪৭ শান্তিনিকেতন সশ্রদ্ধ ভাবগম্ভীর পরিবেশে মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিন পালন করল। এই উপলক্ষে আশ্রমের সব গুরুত্বপূর্ণ গৃহ ও কার্যালয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়েছিল। সকালের মন্দিরে আচার্য ক্ষিতিমোহন উপাসনা করলেন। সেদিন গান্ধীজির কথা বলতে গিয়ে অতীতচারী হয়েছিল তাঁর মন। সেই অ্যান্ডরুজ সাহেবের মধ্যস্থতায় ফিনিক্স স্কুলের ছাত্রদের শান্তিনিকেতন আশ্রমে আতিথ্যলাভ, গান্ধীজি ও কস্তুরবার এখানে আসা, গান্ধীজির সেই 'অন্তর মম বিকশিত করো' গান শুনে মুগ্ধ হওয়া। তার কয়েক বছর পরে গান্ধীজির আমন্ত্রণে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ গুর্জর সাহিত্য সম্মেলনে সভাপতিত্ব করতে গিয়ে সাবরমতী আশ্রমে গেলেন, ক্ষিতিমোহন, অ্যান্ডরুজ তাঁর সঙ্গী।

সেখানে কস্তুরবার সস্নেহ আতিথ্যের স্মৃতি কোনোদিন ভোলবার নয়। বক্তার মনে পড়ছিল সেবার বরোদায় অস্পৃশ্য সম্প্রদায়ের আহ্বানে তাঁদের সভায় গিয়ে কীরকম বিচলিত হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ, পরে ফিরে এসে গান্ধীজিকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন দেশ থেকে অস্পৃশ্যতা দূর করার পরিকল্পনা তাঁর কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত করতে।

> তখন গান্ধীজীর উপরে অসহযোগ আন্দোলনের কাজের চাপ এত বেশি ছিল যে, তিনি গুরুদেবের এ প্রস্তাবে তেমন সাড়া দিতে পারেননি। তারপর যখন এ কাজকে তিনি তাঁর কর্মসূচিতে স্থান দিলেন, তখনও বেশ কয়েক বছর অন্য সব পূর্বনির্ধারিত কাজের ব্যস্ততায় এ কাজ চাপা পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, গান্ধীজীর গঠনমূলক কাজের তালিকায় অস্পৃশ্যতাদূরীকরণ সবচেয়ে প্রাধান্য লাভ করেছে।

অসহযোগ আন্দোলনের প্রসঙ্গসূত্রে ক্ষিতিমোহন বললেন :

> যখন গান্ধীজী তাঁর অহিংসার দর্শনের উপর দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের ভর স্থাপন করলেন, গুরুদেব নির্দ্বিধায় তাঁকে ভারতের ভবিষ্যৎ মুক্তিদাতা রূপে স্বাগত জানিয়েছিলেন। আজ আমরা দেখছি অহিংসার পথে গান্ধীজী এক নিঃসঙ্গ পথিক। যে ঘৃণা ও রক্তপাতের মারাত্মক উন্মত্ততার মধ্য দিয়ে ভারত চলেছে, তার সামনে তাঁর ভালোবাসা ও পারস্পরিক বোঝাপড়া বা সমন্বয়ের বাণী নিতান্তই যদি অরণ্যে রোদন বলে মনে হয়, তবে তা অস্বাভাবিক কিছু নয়। বিশ্বের যাঁরা উদ্ধারকর্তা ও মুক্তিদাতা, ইতিহাসের সূচনা থেকেই পৃথিবী জুড়ে তাঁদের প্রতি এই রকমই ব্যবহার করা হয়েছে। এই বিকলগমন পথে গান্ধীজী যে সম্পূর্ণ একা তা অবশ্য নয়, বুদ্ধ খ্রীষ্ট প্রমুখ সব মহান ধর্মগুরুকেই এই নিঃসঙ্গ নির্জন পথে নিজেকে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে চলতে হয়েছে। আজ এমন একটা সময়ে আমরা এসে পৌঁছেছি যে, এখন আর গান্ধীজীকে শুধু আমাদের মৌখিক শ্রদ্ধা জানালে চলবে না। ভারতবাসীরা যদি যথার্থই তাঁকে শ্রদ্ধা করেন, তাহলে সকলে তাঁর পদচিহ্ন অনুসরণ করুন শান্তির সৈনিক হয়ে। প্রেমের শান্তি জয় করে নিন তাঁরা, যুদ্ধ ও রক্তপাতের বিনিময়ে যে শান্তি আসে তার চেয়ে সে অনেক বড়। আমরা গান্ধীজীর নীরোগ শরীরের জন্য প্রার্থনা করি, প্রার্থনা করি তাঁর দীর্ঘ জীবন। ভারতকে শান্তির বিজয়যাত্রায় নেতৃত্ব দেবার জন্য তিনি যেন আরও অনেক দিন বেঁচে থাকেন।[৬২]

তখন কোথায় বা শান্তি, কোথায় বা মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে অহিংস সত্যব্রতে আদর্শ স্বাধীন ভারতের দীক্ষা! ক্ষিতিমোহন যে বলছেন 'অরণ্যে রোদন', সেই কথাটাই খাঁটি। এমন আশঙ্কাই হচ্ছিল যে, সেই দেশ জুড়ে দাবানলের মতো ছড়িয়ে-পড়া হিংস্রতা এবার যেন মানবহৃদয়ে সত্য ও মঙ্গলবোধের উদ্‌বোধনে কৃতসংকল্প, প্রবীণ বয়সে উপনীত, ভগ্নস্বাস্থ্য মানুষটির অস্তিত্বই টলিয়ে দিচ্ছে। তাঁর সব আবেদন নিষ্ফল মনে হচ্ছিল, মনে হচ্ছিল তাঁর কথায় যে আশ্চর্য জাদু ছিল তা হারিয়ে গেছে। একটা চরম ব্যর্থতার বোধ বেষ্টন করে ধরছিল তাঁকে। ২ অক্টোবর ১৯৪৭ গান্ধীজি দিল্লিতে ছিলেন। সারা পৃথিবী থেকে তাঁর আটাত্তর বছরের জন্মদিনের অভিনন্দনবার্তা আসছিল অজস্র ধারায়, আর গান্ধীজি বলছিলেন এমন দিনে অভিনন্দনের বদলে বরং শোকবার্তা এলেই যথাযোগ্য হত।[৬৩]

সেপ্টেম্বরের গোড়ায় গান্ধীজি আসবার পরে কিন্তু দিল্লিতে অরাজকতা ও হিংসা অনেকটা প্রশমিত হয়েছিল, তবুও গান্ধীজি স্বস্তি পাননি। তিনি জানতেন এই অপেক্ষাকৃত শান্ত ভাব অনেকটাই বহিরঙ্গা। ১ জানুয়ারি ১৯৪৮ তিনি একটি চিঠিতে লিখেছিলেন :

> শহরটা পুলিশের ভয়ে শান্ত হয়ে আছে। কিন্তু মানুষের মনে জ্বলছে ক্রোধের আগুন। হয় এই আগুনে আমাকে পুড়ে মরতে হবে আর না হয় তো এই আগুন আমাকে নেভাতে হবে। আর কোনো তৃতীয় পথ আমি দেখতে পাচ্ছি না।[৬৪]

দাঙ্গা-উন্মত্ত ভারত ও পাকিস্তানের মানুষের মধ্যে প্রকৃতিস্থতা ও ভ্রাতৃত্ববোধ পুনরুদ্ধারে গান্ধীজি আত্মশুদ্ধির জন্য অনশন করছেন—এ খবরে সকলেই উদ্‌বিগ্ন। তাঁর ব্রতের সাফল্য কামনা করে দেশব্যাপী প্রার্থনাসভা আয়োজিত হচ্ছে। শান্তিনিকেতনের মনও তার সঙ্গো একসুরে বাঁধা। ১৬ জানুয়ারি তাই একটি বিশেষ মন্দির হল। ক্ষিতিমোহন তাঁর ভাষণে বললেন :

> আজ পৃথিবী জুড়ে রাজনৈতিক ক্ষমতার আধিপত্য চলছে, বিজ্ঞান আজ যুদ্ধ ও ধ্বংসলীলার সেবাদাসী। এখন ধর্মই কেবল পারে ভারসাম্য ফিরিয়ে আনতে। ভারত তার ঐতিহ্য নিয়ে, আধ্যাত্মিক ধন নিয়ে, শান্তি ও অহিংসার প্রতি তার ভালোবাসার টান নিয়ে সমকালীন ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে, এমন আদেশ ছিল বিধাতার। সে পারত তার নিজের দৃষ্টান্ত দিয়ে পৃথিবীকে প্রকৃতিস্থ করতে। জাতিগুলির মধ্যে মানবিক সম্পর্ক গড়তে। সমগ্র বিশ্বের প্রতি এই হত স্বাধীন ভারতের শ্রেষ্ঠ দান। যুদ্ধদীর্ণ পৃথিবীও সেই আশায় তাকিয়েছিল মহাত্মাজীর দিকে। শান্তির এই প্রাণরসে বিশ্বকে অভিষিক্ত করতে প্রস্তুত ছিলেন তিনিও। কিন্তু তাঁর নিজের দেশই প্রত্যাখ্যান করল তাঁকে, যে পানপাত্র তাঁর হাতে তুলে দিল, মানুষের রক্তে তা কানায় কানায় ভরা। যে ধর্ম একসূত্রে বাঁধে, সমতা আনে, তারই নামে এই দেশেই শুরু হয়ে গেল সাম্প্রদায়িক ধর্মীয় গোঁড়ামির ক্রোধোন্মাদ তাণ্ডব। ভয়ঙ্কর পাশবিক শক্তি বাঁধন ছিঁড়ে বেরিয়ে পড়েছে, সব মানবিকবোধ বিপর্যস্ত। ধূলায় লুটিয়েছে এ দেশের সম্মান, বিশ্ববাসীর চোখে হেয় হয়ে গেছে ভারত। সদ্য স্বাধীনতা অর্জনের পায়ে পায়েই এই আত্মাবমাননার লজ্জা যে আমাদের কলঙ্কিত করল, এর বেদনা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। দেশ জুড়ে চলছে ভ্রাতৃহত্যা—যে ভয়ানক অন্যায় আমরা প্রত্যেকে আমাদের ভাইদের উপরে করছি, সেই সমস্ত অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত করতে একা গান্ধীজী প্রায়োপবেশনে বসেছেন। আমরা শুধু ভারতের আত্মিক শক্তিকে অস্বীকার করিনি, ভারতের এই মহাসাধককেও অস্বীকার করেছি যিনি জীবনে ও কর্মে সেই শক্তিরই প্রতিরূপ। আজ আর বৃথা বাক্যে সময় নষ্ট করব না, শান্ত হৃদয়ে শপথ নেব গান্ধীজীর জীবনব্রত সার্থক হবার। তাঁর বাণীই তাঁর জীবন আর এই প্রেম ও ভ্রাতৃত্বের বাণীর মধ্যেই বিশ্বের জন্য শান্তির স্থায়িত্বের আশ্বাস আছে।[৬৫]

এর ঠিক চোদ্দো দিন পরে ৩০ জানুয়ারি মহাত্মা গান্ধীর নিধনসংবাদের আকস্মিক অভিঘাতে সারা পৃথিবী কেঁপে উঠল। শান্তিনিকেতনের শান্ত নিস্তরঙ্গ জীবনের উপর এই ভয়ানক সংবাদ একটা অতর্কিত আঘাতের মতন এসে পড়ে যেন হতবুদ্ধি করে দিল সকলকে। আকাশবাণী প্রচারিত খবরটা অবিশ্বাস্য রকমের শোচনীয়, তবু এতই স্পষ্ট যে সংশয় করবার কোনো অবকাশই নেই—এক ঘাতকের হাতের আগ্নেয়াস্ত্র কেড়ে নিয়েছে

সেই অমূল্য প্রাণ। ক্ষিতিমোহন বিকেলে বেড়িয়ে ফিরছিলেন, পথে বিশ্বভারতীর ছাত্র হায়দার চৌধুরী ছুটে এসে খুব উত্তেজিত কণ্ঠে খবরটা তাঁকে দিলেন।[৬৬] ক্ষিতিমোহনের নিজের লেখায় পাই :

> ৩০শে জানুয়ারি। সারাদিনের পরে সন্ধ্যাবেলা যখন দিবাবসানের শান্ত অন্ধকারে একটু চুপ করিয়া বসিতে যাইব তখন একটি ছাত্র দৌড়াইয়া আসিয়া বলিলেন, "আসুন আশ্রমের মধ্যে। রেডিয়োতে এই মাত্র খবর আসিল মহাত্মাজীকে গুলি করিয়া হত্যা করা হইয়াছে। সকলে আপনাব প্রতীক্ষা করিতেছে।" —কী ভীষণ সংবাদ! বিশ্বাসই করিলাম না। ছাত্রটি বলিলেন, "শুনিতেছেন না আশ্রমে বিপদের ঘণ্টা বাজিতেছে।" শুনিলাম। তখনই দ্রুত চলিয়া গেলাম, অথচ পা আর চলিতে চাহে না।[৬৭]

তখন সন্ধ্যা হয়ে আসছিল। একটা ভয়ংকর অমঙ্গালের আশঙ্কায় বাতাসটা যেন ভারী। গৌরপ্রাঙ্গাণে বিপদের ইঙ্গিতসূচক ঘণ্টাধ্বনি সমস্ত আশ্রমকে সেখানে সমবেত হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছে। ছাত্ররা, শিক্ষকরা, আশ্রমিকরা ধীরপায়ে একে একে এসে জড়ো হলেন ফ্ল্যাগপোস্টের কাছে। এই তো মাত্র কদিন আগে স্বাধীন ভারতের আনন্দ ও গর্বের প্রতীক হয়ে তেরঙা পতাকাটা পতপত করে উড়ছিল। সবাই উজ্জ্বলমুখে স্বাধীনতা দিবসের নতুন প্রভাতকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। আর আজ এই ৩০ জানুয়াবির বেদনাবিবর্ণ সন্ধ্যা বাক্যহারা। দুঃখে লজ্জায় নির্বাক মানুষগুলি নতমস্তকে দাঁড়িয়ে শুধু। সেই বিষন্ন নীরবতা ভঙ্গা করে শোনা গেল পন্ডিত ক্ষিতিমোহন সেনের গম্ভীর কণ্ঠস্বর। থেমে থেমে অল্প কয়েকটি কথায় তিনি গান্ধীহত্যার ভয়াবহ ঘটনা বিবৃত করলেন, যা অতর্কিতে সমস্ত জাতিকে অভিভূত করেছে।

পরদিন ৩১ জানুয়ারি সকালবেলা পুনরায় সকলে মন্দিরে মিলিত হলেন বিশেষ এক স্মরণ-উপাসনায়। দু-বছর আগে গান্ধীজি শান্তিনিকেতনে এসে যে-সব কথা বলেছিলেন, সেগুলি আজ তাঁরই সম্পর্কে প্রযুক্ত হওয়ার যোগ্য, ভাবছিলেন ক্ষিতিমোহন। সাহস ও আশার বাণী শুনিয়েছিলেন মহাত্মাজি। বলেছিলেন গুরুদেবের বিয়োগজাত বিষাদ ঝেড়ে ফেলে শান্তিনিকেতন-বিশ্বভারতীকে সম্মিলিতভাবে তাঁর আদর্শের যোগ্য প্রতিনিধিত্ব করতে হবে :

> ব্রোঞ্জ সোনা বা মার্বেল পাথর দিয়ে গড়া যায় না মহতের স্মৃতিস্তম্ভ। তাঁদের উত্তরাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা এবং তার সম্প্রসারণ—শুধুমাত্র এরই মধ্যে দিয়ে সেই স্মরণচিহ্ন আমরা নির্মাণ করতে পারি। যে পুত্র তার পিতার উত্তরাধিকার কবরস্থ বা বিনষ্ট করে ফেলে, পিতার স্বত্ব লাভ করবার যোগ্যতাই নেই তার।

বাপুজির ১৯৪৫ সালের ভাষণ উদ্ধৃত করে ক্ষিতিমোহন তাঁর আচার্যের ভাষণে বললেন :

> আমাদের কাজের মধ্যেও সেই অযোগ্য উত্তরাধিকারীর চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত রইল। গান্ধীজীর এই মৃত্যু কুরুক্ষেত্রের রণভূমিতে দ্রোণাচার্যের মৃত্যুর সঙ্গে তুলনীয়। যুযুধান দুই গোষ্ঠীরই তিনি গুরু

ছিলেন, তবু মহাত্মা গান্ধীর মতোই এক অতি হীন কৌশল-প্রতিকৌশলের রেষারেষির শিকার হতে হয়েছিল তাঁকে। এই জরিমানা সব মহান ব্যক্তিকেই দিতে হয়। রামচন্দ্র কৃষ্ণ বুদ্ধদেব খ্রীষ্ট—শান্তিতে জীবনসমাপন হয়েছে কারই বা। এক মুঠো রজতমুদ্রার লোভে বিশ্বাসঘাতকতা করে জুডাস ধরিয়ে দিয়েছিল যিশুকে। তিনি সাধারণ একটা চোরের মতো ক্রুশবিদ্ধ হয়ে প্রাণ দিলেন, তাঁর দুপাশে দুই দাগী আসামী—একই ভাবে তাদেরও মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে। তবু সেই যন্ত্রণাময় মৃত্যুবরণক্ষণেও তাঁর প্রার্থনা ছিল 'হে পিতা, এদের তুমি ক্ষমা কর, এরা কি করছে এরা তা জানে না।' নিশ্চিত করে বলতে পারি মর্তজীবনের কোলাহল থেকে মুক্ত হয়ে গান্ধীজীও এখন ঈশ্বরের চরণপ্রান্তে বসে একই প্রার্থনা করছেন।

এমন কে আছে আমাদের মধ্যে যে বলবে 'আমি নিরপরাধ'? তাঁর প্রতি বিশ্বাসের অভাব ঘটেছে আমাদের, তাঁকে বুঝতে পারিনি—সেজন্য মৃত্যুতুল্য যন্ত্রণা কি তিনি ভোগ করেননি। বুকের মধ্যে মিথ্যা ও হিংসার সাপ পুষে রেখে তাঁকে আমরা মৌখিক আনুগত্যের দ্বারা প্রতারিত করি নি কি? আমাদেরই ভিতরকার লুকানো পাপ শক্তি জুগিয়েছে দুর্বৃত্তের হিংস্র হাতকে। আমরা যে-কেউ যে-কোনো আকারেই হোক না কেন, যদি কখনও লোভ অথবা ঘৃণার বশীভূত হয়ে থাকি, তবে এই মৃত্যু-আঘাতের অংশীদার আমরা প্রত্যেকেই। দেশ জুড়ে যে অবাধ হিংসার তাণ্ডব চলেছে, গান্ধীজীর হত্যাকারী শুধু তার এক সামান্য প্রতীকমাত্র। গান্ধীজীর স্মৃতির প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদনের অধিকার যদি দাবি করতে চাই, তবে তার আগে আমাদের চিন্তায় বাক্যে কাজে সর্বপ্রকার হিংসা বর্জন করতে হবে।

আচার্য ক্ষিতিমোহন আরও বললেন :

গান্ধীজীর আত্মার শান্তির জন্য আমাদের প্রার্থনানিবেদনের প্রয়োজন নেই, এই শান্তিতে তাঁর স্বাভাবিক অধিকার। তাঁর মৃত্যুর জন্য আমাদের শোক করবার প্রয়োজন নেই, মৃত্যু তাঁর মতো মানুষের জন্য নয়। এই পার্থিব লোকের অমঙ্গল ও পাপ থেকে তাঁর আত্মা যাত্রা করেছে শুভময় শান্তিময় লোকে, ক্রোধ ঘৃণা ও যন্ত্রণার অন্ধকার থেকে তিনি উত্তীর্ণ হয়েছেন প্রেম ও আলোকের রাজ্যে, মৃত্যুং তীর্ত্বা তিনি লাভ করেছেন অমৃতের অধিকার। তাঁর অমর আত্মা আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ বা প্রার্থনার অপেক্ষা রাখে না। বরং আমাদের নিজেদেরই দায়ে আমাদের উচিত তাঁর মৃত্যুর পাপ থেকে মুক্তিলাভের জন্য সচেষ্ট হওয়া। সে মুক্তির পথ প্রেম ও সত্যে উৎসর্গীকৃত তাঁর জ্যোতির্ময় জীবন অনুসরণের দ্বারাই কেবল মিলবে। তাই আজকের দিন প্রার্থনা ও আত্মশোধনের দিন। অনুশোচনার তীর্থোদকে স্নান করে আজ অন্তরকে শুদ্ধ করি। অধঃপতনের যে অতলে নিমজ্জিত হয়ে আছি তা থেকে উত্তরণের প্রার্থনাই আজকের প্রার্থনা। গান্ধীজীর আত্মা আমাদের ধর্ম ও মঙ্গলের পথে চালিত করুক।

এর পর 'তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে' গানটির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ব্যাখ্যা করলেন ক্ষিতিমোহন এবং সবশেষে সমবেত কণ্ঠে 'সমুখে শান্তিপারাবার' গানটি গীত হল।

প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু আবেদন জানিয়েছিলেন ৩১ জানুয়ার বিকেল চারটে বাজার সঙ্গে সঙ্গে যমুনাতীরে রাজঘাটে যখন বাপুজির শেষকৃত্যানুষ্ঠান শুরু হবে, তখন যেন সারা দেশ জুড়ে প্রার্থনা অনুষ্ঠিত হয়। সেই আবেদন অনুসারে যথাসময়ে ছাতিমতলার পুণ্যভূমিতে একত্রিত হয়ে শান্তিনিকেতন আশ্রম যোগ দিয়েছিল সেই

সম্মিলিত প্রার্থনায়। মহাত্মাজির দেহাবশেষ যখন চিতার উপরে স্থাপিত হল, তখন ভক্তিমূলক সংগীতে, ক্ষিতিমোহনের কণ্ঠে উদ্‌গীত অনুষ্ঠান-উপযোগী বৈদিক মন্ত্রে ও জনমণ্ডলীর মিলিত চিত্তের নিঃশব্দ প্রার্থনায় ভারতের মহান সন্তানের প্রতি শেষ শ্রদ্ধা নিবেদিত হল।[৬৮]

৬ ফেব্রুয়ারি শ্রীনিকেতন মেলা ও প্রদর্শনী বন্ধ হয়ে গেল এ বছর, তখনও জাতীয় শোক পর্ব চলছে। শুধুমাত্র খুব শান্ত পরিবেশে সেই দিনটিতে ছাব্বিশতম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে প্রভাতি অনুষ্ঠানে বৈদিকমন্ত্র উচ্চারণ করলেন ক্ষিতিমোহন, রথীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের লেখা থেকে গান্ধীপ্রসঙ্গ পাঠ করলেন। তার পর ১২ ফেব্রুয়ারি গান্ধীজির চিতাভস্মবিসর্জন-দিবসও পালিত হল শান্তিনিকেতনে বৈতালিক কণ্ঠে 'বরিষ ধরা-মাঝে শান্তির বারি' গানে ও অন্যান্য অনুষ্ঠানে। সন্ধ্যায় মন্দির। নিঃশব্দ শান্ত পরিবেশে ক্ষিতিমোহন উপাসনা করলেন। শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের মন্ত্রগুলি উচ্চারিত হল তাঁর কণ্ঠে।[৬৯] প্রায় মাসখানেক পরে ১০ মার্চ গান্ধীপুণ্যাহ। তিরিশ বছরেরও বেশি আগে গান্ধীজি স্বাবলম্বী হতে বলেছিলেন এই প্রতিষ্ঠানকে। যদিও নানা বাধায় দৈনন্দিন কাজকর্মে সম্পূর্ণ স্বাবলম্বন বেশিদিন চালানো যায়নি, কিন্তু সেই অবধি প্রতি বছরই এই দিনটিতে ভৃত্যদের ছুটি দিয়ে শিক্ষক-ছাত্র-কর্মীরা দল বেঁধে সব কাজ নিজেরা করেন। সেদিন সকালে বুধবারের মন্দির-ভাষণে ক্ষিতিমোহন বললেন :

> গান্ধীপুণ্যাহের দিনটি আমাদের কাছে এক বিশেষ বাণী বহন করে আনে, কায়িক শ্রমের মর্যাদা ও স্বাবলম্বনের মূল্য সম্পর্কে সচেতন করে তোলে। যে সামাজিক অন্যায় মানবসমাজকে প্রভু ও দাস—এই দুই ভাগে বিভক্ত করে, সচেতন করে সে সম্পর্কেও। যারা আমাদের কাজ করে, নিছক বেতনটুকুর অতিরিক্ত আর কিছুও পাওনা হয় তাদের। আমাদের শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা যেন তারা পায়, তাদের কাজের বিনিময়ে আমাদেরও উচিত তাদের পরিচর্যা করা।

পরে প্রতিবেশী গ্রাম ভুবনডাঙার বাসিন্দাদের বিনোদনের জন্য শিক্ষাভবন একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। তারা খুব খুশি হয়েছিল, নিজেরাও অংশ নিয়েছিল অনুষ্ঠানে।[৭০]

আরও কিছু কথা

এরই মাঝখানে আসতে-যেতে চোখে পড়ে স্থলে-জলে-বনতলে বসন্ত দোলা দিয়েছে, উৎসবের সুর বাজিয়েছে আকাশে-বাতাসে। বসন্তোৎসবের অন্তর্নিহিত অর্থ রবীন্দ্রনাথ যেমন উপলব্ধি করেছিলেন, সাপ্তাহিক মন্দির-ভাষণে সেই কথাটা মনে আসে ক্ষিতিমোহনের। প্রকৃতির ভিতরে সৃষ্টির যে আনন্দ সহজাত, এ উৎসব তারই প্রতীক। মানুষকে সে প্রকৃতির সঙ্গে ব্যবধান ঘোচাবার আহ্বান জানায়। সব নৈরাশ্য ও অবসাদ ঝেড়ে ফেলে যে প্রাণ প্রতিনিয়ত নিজেকে নবীন করে তুলছে, তার অন্তর্গূঢ় তত্ত্বটির মুখোমুখি দাঁড় করায়, তাকে আবাহন করবার প্রেরণা দেয়।[৭১]

আবার বছরের শেষ সূর্যাস্তের দিকে চেয়ে মনে ভাবেন মহাপ্লাবনের তরঙ্গোচ্ছ্বাসে আন্দোলিত একটা বছর চলে গেল। একটা যুগের অবসান হয়ে আর-একটা যুগের উদ্‌বোধন ঘটছে। শেষ তো শেষ নয়, আর-এক আরম্ভের সূচনা। আমরা কোনো কিছুকে সামগ্রিক দৃষ্টিতে দেখতে অপারগ বলেই নানা অসংগতির সৃষ্টি করি, নিজেরাই যত দুর্দশা-দুর্গতির ভার আরোপ করি নিজেদের উপর। বিচ্ছিন্নতাবোধের মানসিকতা ত্যাগ করতে হবে। কেবল এই পথেই অহেতুক দুর্গতির অবসান ঘটাতে পারি, শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ্যের বার্তাবাহী নূতন যুগকে বরণ করতে পারি।[৭২] পরদিন সকালের মন্দিরে সমবেত আশ্রমবাসীকে সেই সংকল্পে উদ্‌বুদ্ধ করতে চাইলেন, যার দ্বারা কর্তব্য থেকে বিচ্যুতি এড়াবে শান্তিনিকেতন, রুদ্রদেবের পূজায় দুঃখের অর্ঘ সাজাবে, বৃহত্তর মঙ্গলের জন্য ত্যাগের দীক্ষা নেবে। মানুষকে তো সাড়া দিতে হবে বৃহতের আহ্বানে। মহৎ তার জীবনের লক্ষ্য, সে লক্ষ্যসাধনের জন্য যে চেষ্টায় তাকে ব্রতী হতে হবে, সেও মহৎ হওয়া চাই। ব্যক্তিস্বার্থ ও সংকীর্ণ উচ্চাকাঙ্ক্ষায় বদ্ধ হয়ে সে কোথাও পড়ে থাকবে না। কায়িক অস্তিত্বে যতই ক্ষুদ্র সে হোক, ভিতরে যে অন্তরাত্মার অধিষ্ঠান, তার বিস্তার অগাধ। মানুষকে অনুসরণ করতে হবে বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও প্রেমের পথ। সুদুর অতীতকাল থেকেই তো ভারতবর্ষ কেবলমাত্র জাগতিক উন্নতির লক্ষ্যপথে চলতে অস্বীকার করেছিল। আধ্যাত্মিক সাধনার দুঃসাহসিক বীরত্বের পথই তার পথ। সেই মানবাদর্শের কথাপ্রসঙ্গে বিশ্বভারতীর কথা এল। বক্তার প্রার্থনা বিশ্বজনীন সমন্বয়ের বাণী তার সাধনা সফল করুক।[৭৩]

রবীন্দ্রজন্মোৎসবে কলকাতায় গিয়েছিলেন। নিখিল ভারত রবীন্দ্র-স্মৃতিসমিতির উদ্যোগে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির অঙ্গনে রবীন্দ্রজন্মোৎসবের আয়োজন। পঁচিশে বৈশাখ সকালে তার উদ্‌বোধন করলেন ক্ষিতিমোহন। ১০-১৬ মে আর-একটি উৎসবের আয়োজন ছিল অখিল বঙ্গ রবীন্দ্র-সাহিত্য সম্মেলনের চতুর্থ বার্ষিক সভার পক্ষ থেকে। বক্তাদের মধ্যে তিনিও ছিলেন।[৭৪] জুন মাসেও কলকাতায় সভা ছিল। দক্ষিণী আয়োজিত চারদিনব্যাপী রবীন্দ্রসংগীত সম্মেলনে রবীন্দ্রসংগীতের বিভিন্ন দিক নিয়ে উদাহরণযোগে আলোচনার বিভিন্ন দিনে বক্তারা ছিলেন কালিদাস নাগ, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, ক্ষিতিমোহন সেন। ক্ষিতিমোহন তাঁর বক্তৃতায় দেখালেন নতুন নতুন সৃষ্টিধর্মী উদ্যোগের পরিণতিতে ভারতীয় সংগীত কীভাবে নানা পরিবর্তন ও বোঝাপড়ার মধ্য দিয়ে বিকাশলাভ করেছে। রক্ষণশীল ভারতীয় সংগীতধারার প্রবক্তারা যতই মনে করুন না কেন যে সংগীতরচনা রবীন্দ্রনাথের অনধিকার চর্চা, যতই তাঁরা ভাবুন রবীন্দ্রনাথের বিপুল ও অত্যাশ্চর্য এই সৃষ্টির জগৎ ভারতীয় ঐতিহ্যের দিক থেকে বেমানান, আসলে কিন্তু ভারতীয় সৃজনমুখী সংগীতঐতিহ্যের ধারার সর্বশেষ মহৎ বাহক রবীন্দ্রনাথ।[৭৫]

১ জুলাই খুলল বিশ্বভারতী। ১৫ আগস্ট ভারতের স্বাধীনতার এক বছর পূর্ণ হল। শান্তিনিকেতন-বিশ্বভারতীর বছরে বছরে পালনীয় অনেকগুলি দিন আছে, তার মধ্যে এটি নবতম সংযোজন। সেদিন বৈতালিকের পর আশ্রমিকরা সকলে গৌরপ্রাঙ্গণে এসে জড়ো হয়েছিলেন। ইন্দিরা দেবী পতাকা উত্তোলন করলেন, আনুগত্যের শপথবাক্য পাঠ করালেন

সকলকে। 'বন্দেমাতরম্' ও 'জনগণমন-অধিনায়ক' এবং অন্যান্য কয়েকটি দেশাত্মবোধক রবীন্দ্রসংগীত হল। আর ক্ষিতিমোহন কয়েকটি বৈদিক মন্ত্র আবৃত্তি করলেন, মুক্তির উদ্দীপনা তাতে।[৭৬]

কয়েক মাস পরে নিয়মিত কৃত্যতালিকার বাইরে আর-একটি দিনও পালিত হল স্বতঃস্ফূর্ত উৎসাহে—২৮ নভেম্বর, সেদিন আশ্রমসচিব রথীন্দ্রনাথের জন্মদিন ছিল। সকাল সাড়ে সাতটায় সিংহসদনে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন। রথীন্দ্রনাথের দীর্ঘ ফলবান আয়ু কামনা করে বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করলেন ক্ষিতিমোহন, আশ্রমের পক্ষ থেকে জন্মদিনের অভিনন্দন জানালেন। প্রীতি ও গুণগ্রাহিতার স্পর্শমাখা তাঁর কয়েকটি কথা সবার মনকে নাড়া দিল। ক্ষিতিমোহন বললেন :

> কোনো মহামানবের মৃত্যুর পরে তাঁর শিষ্য ও উত্তরাধিকারীর সম্পর্কের মধ্যে ফাট ধরেছে—কৃষ্ণ বুদ্ধ দ্রোণাচার্য থেকে মধ্যযুগের সাধক নানক দাদূ রজ্জব পর্যন্ত এমন নজির পৃথিবীর ইতিহাসে অজস্র। বিশ্বভারতী ও তার ঐতিহ্যের পক্ষে এটা সৌভাগ্যের কথা যে রথীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে কিন্তু তা হয়নি। তিনি জন্মসূত্রেও রবীন্দ্রনাথের উত্তরাধিকারী, আদর্শসূত্রেও। কেননা তিনি আশ্রমের আবহাওয়াব মধ্যে বেড়ে-ওঠা সবচেয়ে পুরোনো ছাত্রদের একজন। কর্তব্যের খাতিরে আশ্রমসচিবের ভূমিকা প্রায়শই তিক্ত হয়, আর এ কাজে ধন্যবাদও মেলে না। সহকর্মীদের ভিন্ন মত ও অসন্তোষের মুখোমুখি হতে হয়। কিন্তু বিশ্বভারতীর মঙ্গল যারা চায় তাদের সকলেরই মনে রাখা উচিত যে, আজকের এই নিশ্চয়তা ও ভারসাম্যের অভাবের দিনে রথীন্দ্রনাথের মতন দৃঢ় ও সুপরীক্ষিত কাণ্ডারীর একান্ত প্রয়োজন। আমাদের নৌকার পালে যদি সেই ভাবাদর্শের বাতাস লাগে যার উত্তরাধিকার আমরা বহন করছি, তাহলে ছোট ছোট সাময়িক গোলযোগে বা অসুবিধায় আত্মহারা হবার দরকার নেই। তবে বিশ্বভারতীর আদর্শ আক্রান্ত হবে এমন সব কিছু থেকেই আমাদের ভয়ের যথেষ্ট কারণ আছে এবং সেজন্য সাবধান আমাদের হতেই হবে, যাতে এই প্রসার ও বৃদ্ধির মুহূর্তে বিশ্বভারতীর দায়িত্ব কোনো ভুল লোকের হাতে না পড়ে।[৭৭]

বছরটা শেষ হয়েই এসেছিল। সেবার সমাবর্তনে বিশ্বভারতীর আচার্যা সরোজিনী নাইডু উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে স্নাতকদের আচার্যাসমক্ষে উপস্থাপিত করলেন অধ্যাপক চিত্তরঞ্জন দাস এবং তার উত্তরে ক্ষিতিমোহন উচ্চারণ করলেন স্নাতকদের উদ্দেশে আচার্যের উপদেশ ও আশীর্বাদ-সংবলিত বৈদিক মন্ত্র। ছাত্রছাত্রীরা আচার্যার আশীর্বচন সহ তাঁর হাত থেকে শান্তি ও সমন্বয়ের প্রতীক সপ্তপর্ণী বৃক্ষের পাতা গ্রহণ করলেন ও তাঁদের আপন আপন বিভাগীয় অধ্যক্ষের হাত থেকে নিলেন উপাধিপত্র।[৭৮]

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৪৯ সালের লীলা বক্তৃতা দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন ক্ষিতিমোহনকে, বিষয় বাংলার বাউল।[৭৯] সেই কিশোর বয়স থেকে তো তিনি বাউল ধর্মের সারকথা বুঝতে চেষ্টা করেছেন, বাউল গান সংগ্রহের নেশাও তাঁর সেই বয়স থেকেই। সে তাঁর নিভৃত প্রাণের আনন্দের জিনিস ছিল। কোনোদিন বাউলদের দর্শন বা গান বিদ্বজ্জনসমাজে কোনো স্থান পাবে এ কথা ভাবেননি।

> এই সব নিবক্ষব দীনহীনের কথা বহুকাল ভারতের কোনো পন্ডিতজনের লেখায় আত্মপ্রকাশ করিতে পাবে নাই।

কিন্তু ববীন্দ্রনাথ যে ১৯২২ সালে An Indian Folk Religion লিখলেন, ১৯২৫ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালযেব সিনেট হলে ভারতীয় দর্শন মহাসভার সভাপতির ভাষণে এই-সব নিবক্ষর বাউলদের কথা বললেন, পরে আবার ১৯৩০ সালে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁব হিবার্ট বক্তৃতাতে যে এদের প্রসঙ্গ স্থান পেল, এতে ক্ষিতিমোহন বিস্মিত হয়েছিলেন, আবার প্রকাশ্যে বাউলপ্রসঙ্গ আলোচনার সাহস সঞ্চয় কবতে পেরেছিলেন। 'বাংলার বাউল'-এ এ কথা বলেছেন তিনি। তা ছাড়া অধর মুখার্জী বক্তৃতায় মধ্যযুগের সন্তসাধনার ধারাবাহিক পরিচয় দেওয়ার পরেও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পন্ডিতজনেরা যে লীলা বক্তৃতামালায় বাউলদের সম্পর্কে বলবার জন্য তাঁকে আহ্বান জানিয়েছেন, এও কম বিস্ময়ের কথা নয় বলে তাঁর মনে হচ্ছিল :

> এই পন্ডিতজনসমাজ প্রাকৃত জনগণের ধর্মেব কথা বলিতে আমাকে কেন ডাক দিলেন?

ক্ষিতিমোহন ভাবছিলেন :

> সন্তদেব সম্প্রদায়বন্ধন আছে এবং তাই কিছু মর্যাদা আছে। যদিও কবীব প্রভৃতি তাহা চাহেন নাই। কিন্তু বাউলদের তো তাহাও নাই। তাঁহাদেব কথা কি কেহ শুনিবেন?[৮০]

তাঁব এই জিজ্ঞাসাব কাবণ ছিল, তাঁর দ্বিধা অমূলক ছিল না। ববীন্দ্রনাথের আগ্রহে ও বন্ধু চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুরোধে যে কয়টি বাউলগান তিনি প্রকাশ করেছিলেন, তার সমালোচনা হয়েছিল। অনেকে মনে করেছিলেন গানগুলি আসলে আধুনিক শিক্ষিত মানুষের রচনা। সেজন্য ক্ষিতিমোহন আর গান প্রকাশ করতে উৎসাহ বোধ করেননি। 'বাংলার বাউল' বক্তৃতা ও বিশ্বভারতী পত্রিকায় তার ধারাবাহিক প্রকাশের পরে তারও বেশ কঠোর সমালোচনা হল। এই জীবনীতে পূর্বে আমরা এ প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছি এবং এও দেখেছি যে তাঁব সংগৃহীত বাউলগানগুলি কিন্তু যথোচিত মর্যাদা পেয়েছিল স্বয়ং রবীন্দ্রনাথেব কাছে। পরে গ্রন্থপরিচয়ে বাউলপ্রসঙ্গ আবার আসবে।

বিশ্বভারতীতে ক্ষিতিমোহনের কাজ চলে যথানিয়মে। নতুন বছরের শুরুতে ইউনিভারসিটি কমিশনের সদস্যরা শান্তিনিকেতনে এলে আম্রকুঞ্জে সংবর্ধনাসভায় তাঁদের স্বাগত জানালেন। বিকেলে সিংহসদনে আয়োজিত সভায় কমিশন-সভাপতি ড. রাধাকৃষ্ণন সহ চারজন সদস্য বক্তৃতা দিলেন, ক্ষিতিমোহন সভাপতি। ১৫ জানুয়ারি দু-দিনের জন্য তাঁরা এসেছিলেন শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতন পরিদর্শনের উদ্দেশ্যে। তখন বিশ্বভারতী যাতে কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়রূপে স্বীকৃতি লাভ করে সেজন্য ভারত সরকারের প্রসঙ্গে আলাপ-আলোচনা চলছিল।[৮১] এর পরেই এসেছিলেন প্যারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ও ভারততত্ত্বের অধ্যাপক ড. লুই রনু। ১৭ জানুয়ারি বিকেলে চিনাভবনে ক্ষিতিমোহনের সভাপতিত্বে তাঁর বক্তৃতা হল, বিষয় ফরাসি ভাবুকদের উপর ভারতীয় চিন্তার প্রভাব।

ক্ষিতিমোহন আন্তরিক স্বাগতবচনের সঙ্গো বক্তার সাংস্কৃতিক মিশনের সাফল্যকামনা করলেন। শ্রোতাদের কাছে ড. র‍্যনুর পরিচয়প্রসঙ্গো বিশ্বভারতীব সূচনালগ্নে যিনি তার সঙ্গো যোগযুক্ত হয়েছিলেন সেই মহাপণ্ডিত ড. সিলভ্যাঁ লেভির সঙ্গো তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের উল্লেখ করে পাণিনি বিষয়ে অসাধারণ কাজ ও মিস্‌টিসিজম সম্বন্ধে তাঁর আগ্রহের কথা বললেন। শান্তিনিকেতনে বিশেষ অতিথি কেউ এলে আপ্যায়নের দায়িত্ব নিতেন রথীন্দ্রনাথ-প্রতিমা দেবী। তখন খাওয়ার টেবিলে প্রায়শই ক্ষিতিমোহন আমন্ত্রিত হতেন। বিদেশি অতিথিরাও আগ্রহপ্রকাশ করতেন তাঁর সঙ্গো আলাপ করতে। যেমন, সম্ভবত ড. র‍্যনু আসবার পরদিনে রথীন্দ্রনাথকে তাঁকে লিখতে দেখি :

> শ্রদ্ধাস্পদেষু,
>
> Prof Renou আজ আছেন। আপনাদের সঙ্গো আলাপ কবতে চান। যদি অসুবিধা না হয় দুপুরে এখানে খেতে আসতে পারলে খুসী হব। ১২।। টার সময় গাড়ি পাঠিয়ে দিতে পারি— তা না হলে যাতায়াতে আপনার কষ্ট হবে। ইতি
>
> ভবদীয়
>
> শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর[৮২]

১৫ ফেব্রুযারি আর একটি সংবর্ধনাসভা হল। হিন্দিভবনের অধ্যক্ষ ড. হাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী লখনউ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সাম্মানিক ডি.লিট. উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন, তাঁর সম্মানে সভা। ক্ষিতিমোহনের দীর্ঘদিনের পরিচয় দ্বিবেদীজির সঙ্গো। তিনি সহকর্মী শুধু নন, অত্যন্ত স্নেহভাজন। তিনি তাঁর ভাষণে উচ্চপ্রশংসা করলেন পুত্রতুল্য সতীর্থের, বললেন যথার্থ জ্ঞানের ক্ষেত্রে বিচরণ করে হাজারীপ্রসাদের গবেষক মন, আবার শিক্ষিত মানুষের চোখের আড়ালে যেখানে অশিক্ষিত জ্ঞান ও অকৃত্রিম লোকসংস্কৃতি বিকশিত হয়ে ওঠে, তার গভীরে প্রবেশ করবার চেষ্টায় তিনি আন্তরিক। মধ্যযুগীয় সন্তদেব জীবন ও চিন্তা তাঁর মূল অনুসন্ধানের বিষয়। কবীর সম্পর্কে তিনি অত্যন্ত সফল গবেষণা করেছেন।[৮৩]

ক্ষিতিমোহনের বয়স সত্তর হতে চলল। এই বছর থেকেই বিদ্যাভবনের অধ্যক্ষতাকর্ম থেকে অবসর মিলেছে। জানা যাচ্ছে বিশ্বভারতীর দুই অধ্যাপক—আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন ও আচার্য নন্দলাল বসু 'ইমারিটাস প্রফেসর'-এর সম্মানে ভূষিত হয়েছেন।[৮৪] তবু এখনও নানা কাজে ব্যস্ত থাকেন, লেখাপড়ার কাজ হাতে বিস্তর। সামনের বছর তাঁর দুটি গবেষণার কাজ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হবে, সুতরাং অনুমান করি এ সময় সে দুটির লেখা সম্পূর্ণ করার কাজ চলছিল। তার একটি 'ভারতে হিন্দু মুসলমানের যুক্তসাধনা', অন্যটি 'প্রাচীন ভারতে নারী'। আগেও এ দুটি বইয়ের নাম উল্লেখ করেছি। কাজ তো চলছে অনেকদিন থেকেই। ১৩৫১ সালে (১৯৪৪-১৯৪৫) বিশ্বভারতী পত্রিকা-র কার্তিক-পৌষ ও মাঘ-চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত হয় 'প্রাচীন ভারতে নারীর আদর্শ ও অধিকার' এবং ১৩৫৪ সালে (১৯৪৭) শ্রাবণ-আশ্বিন সংখ্যায় 'নারীর দায়াধিকার'। দেশ ২০ ভাদ্র ১৩৫৪ (১৯৪৭)-এ প্রকাশিত 'ভারতের চিত্রশিল্পে সাধনার যোগ', শারদীয়া দেশ ১৩৫৪ (১৯৪৭)-এ প্রকাশিত 'ভারতের সাহিত্য ও মুসলমানের সাধনা', দেশ ৩ আশ্বিন ১৩৫৪ (২০ সেপ্টেম্বর ১৯৪৭)-এ

প্রকাশিত 'আমাদের স্থাপত্যশিল্পে যুক্তসাধনা', দেশ ১০ আশ্বিন ১৩৫৪ (২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৪৭)-এ প্রকাশিত 'জ্যোতিষাদি শাস্ত্রে হিন্দু মুসলমানের যুক্তসাধনা', বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৫৬ (১৯৪৯)-এ প্রকাশিত 'ভারতীয় সংগীতে হিন্দু মুসলমানের যুক্তসাধনা' প্রভৃতি প্রবন্ধগুলি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এখনও ক্ষিতিমোহন প্রতিদিন সকালবেলা বিদ্যাভবনে আসেন, নিজের ঘরটিতে বসে কাজ করেন। ইদানীং আবার রবীন্দ্র-কাব্য আলোচনা শুরু করেছেন, প্রতি শুক্র ও সোমবার এখন বিকেলে পড়ান 'চিত্রা'। একটু বয়স্ক ছাত্ররা এবং কর্মীদের অনেকেই খুব আগ্রহের সঙ্গে এই ক্লাসে যোগ দিতে আসেন।[৮৫] ক্ষিতিমোহন যে 'শর্টকাট' রাস্তা ধরে বাড়ি থেকে বিদ্যাভবনে আসেন নন্দলাল বসুর গৃহসংলগ্ন জমির উপর দিয়ে তার পথ। নন্দলাল বাড়ির লোককে বলেন : 'ক্ষিতিবাবু এখান দিয়ে যান, দেখো যেন জঞ্জাল হয়ে না থাকে, পথটা পরিষ্কার রেখো।'[৮৬] অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ দত্তের কলমে আমরা যে ছবি পেয়েছি—খালিপায়ে হাতে বই-খাতাপত্রের থলি নিয়ে লাল মাটির রাস্তা দিয়ে চলেছেন ক্ষিতিমোহন, পথ চলতে চলতে যার সঙ্গে দেখা হচ্ছে দাঁড়িয়ে দুটো কথা বলছেন, সেই ছবি মনে আসে। শান্তিনিকেতন আশ্রম পরিবেশের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এই ছবি। অমিতাভ চৌধুরীও ঠিক এই একই ছবি এঁকেছেন।[৮৭]

এই সময়ে পেঙ্গুইন প্রকাশনসংস্থার পক্ষ থেকে তাঁর উপরে একটি নতুন গ্রন্থ প্রণয়নের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল, সে কথাটা এইবার বলি। এই সংস্থা খ্রিষ্টান, ইসলাম, বৌদ্ধ, হিন্দু প্রভৃতি পৃথিবীর বড়ো বড়ো ধর্মগুলি সম্পর্কে সর্বশ্রেণির কৌতূহলী পাঠকের উপযোগী গ্রন্থপ্রকাশে উদ্যোগী হয়েছিলেন। তাঁদের ইচ্ছা ছিল হিন্দুধর্ম-বিষয়ক গ্রন্থটির দায়িত্ব নেন অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণন। কিন্তু তাঁর অতিরিক্ত ব্যস্ততার কারণে সেটা সম্ভবপর নয় দেখে তাঁরা ক্ষিতিমোহনকে অনুরোধ জানালেন। সম্ভবত অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণন ক্ষিতিমোহন সেনের নাম প্রস্তাব করেছিলেন তাঁদের কাছে। ২১ অক্টোবর ১৯৪৮ পেঙ্গুইন সম্পাদকীয় বিভাগ প্রথম চিঠি লেখেন। এ কাজে সহযোগিতার হাত বাড়াতে ক্ষিতিমোহনের আপত্তি ছিল না। ১ নভেম্বর ১৯৪৮-এর চিঠিতে এই আমন্ত্রণকে স্বাগত জানিয়ে পেঙ্গুইনের সম্পাদকীয় দপ্তরে যে চিঠি লিখলেন, তাতে জানতে চেয়েছিলেন এ জন্য কতদিন সময় পাওয়া যাবে, যাতে তিনি বর্তমানে তাঁর হাতে যে কাজ রয়েছে তার ব্যাঘাত না ঘটিয়ে এ কাজ করবার সুযোগ পান। পেঙ্গুইন ক্ষিতিমোহনের প্রশ্নের উত্তরে ১১ নভেম্বর ১৯৪৮-এ জানালেন এই গ্রন্থের জন্য লেখকের আর্থিক পাওনা কী হবে, প্রস্তাবিত গ্রন্থের সম্ভাব্য আয়তন কী হবে ইত্যাদি। আরও জানালেন যে অবিশেষজ্ঞ কিন্তু আগ্রহী ও বুদ্ধিমান পাঠকের জন্য এই বই, তাদের জন্য আলোচ্য বিষয়ের কী ধরনের উপস্থাপনা অভিপ্রেত। ১৯৪৯ সালের শেষদিকে পাণ্ডুলিপি পেতে চাইছিলেন তাঁরা। ক্ষিতিমোহনও আশা করছিলেন আগামী বছরের শেষে তিনি লেখা সম্পূর্ণ করতে পারবেন। যেহেতু ডিসেম্বর মাসটা বিশ্বভারতীর সবচেয়ে ব্যস্ত মাস, প্রস্তাবিত বইয়ের অধ্যায়-শিরনামা ও বিভিন্ন অধ্যায়ের সারসংক্ষেপ তার পরে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পাঠাতে পারবেন বলে তাঁর মনে হচ্ছিল। এই মর্মে ২৫ নভেম্বর ১৯৪৮

ক্ষিতিমোহন চিঠি লিখেছিলেন পেঙ্গুইনকে। তার পর ২৮ জানুয়ারি ১৯৪৯ তিনি Hinduism গ্রন্থের সারাংশ পাঠালেন যথাস্থানে। লিখলেন :

> আশা কবি এটি আপনাবা গ্রহণযোগ্য মনে করবেন। বলা বাহুল্য, এই সারসংক্ষেপ পরীক্ষামূলক বা সাময়িকভাবে গৃহীত বলে গণ্য করতে হবে এবং লেখার সময কিছু পরিবর্তন ঘটবে।

স্বভাবতই তিনি স্থির করেছিলেন যে পেঙ্গুইন তাঁর প্রেরিত গ্রন্থ-সারাংশের প্রাপ্তিস্বীকার করে চিঠি দিলে তবেই লেখার কাজে হাত দেবেন। কিন্তু উত্তর আসতে বেশ দেরিই হচ্ছিল।[৮৮]

ইতিমধ্যে সরোজিনী নাইডুর মৃত্যুসংবাদ এল ২ মার্চ, পরদিন এই উপলক্ষে বিশেষ মন্দির হল। উপাসনা পরিচালনা করলেন ক্ষিতিমোহন, বিশ্বভারতীর আচার্যার স্মৃতির উদ্দেশে আশ্রমবাসীদের সবার পক্ষ থেকে অর্ঘ নিবেদন করলেন। বললেন :

> তাঁর সঙ্গে আমরা এক যথার্থ কবি ও বিশিষ্ট নেত্রীকে হারালাম। তাছাড়াও তাঁর প্রয়াণে শোক করবার আমাদেব নিজেদের একটা বিশেষ কারণ আছে। গুরুদেবের প্রতি এবং বিশ্বভারতীতে রূপায়িত তাঁর আদর্শের প্রতি গভীর শ্রদ্ধায় তিনি এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। যখন তাঁর সহায়তা ও নেতৃত্বের অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল, তখনই মৃত্যু তাঁকে আমাদের কাছ থেকে নিয়ে গেল। তবু ভালোবাসার বন্ধন ছিন্ন হবে না, বরং দৃঢ়তর হবে। তাঁর আত্মিক সান্নিধ্য আমরা পাব চিরদিন, তিনি আমাদের প্রেরণা দেবেন।

সরোজিনী নাইডুর সঙ্গে ক্ষিতিমোহনের প্রথম পরিচয় বোম্বাইতে, ১৯২৩ সালে। মনে পড়ে কিরণবালাকে তিনি লিখেছিলেন : 'সরোজিনী নায়ডু আলাপের সেরা রমণী *বটে।*' ৯ মার্চের মন্দিরে পুনরায় তাঁর স্মৃতিচারণ প্রসঙ্গে *ক্ষিতিমোহন বললেন* :

> একবার একটি মুসলমানদের আয়োজিত সভায় গুরুদেবের বাংলা ভাষণের তাৎক্ষণিক ইংরেজি অনুবাদ করে দিয়েছিলেন তিনি, আর একদিন গুরুদেবের সঙ্গে নারীর আদর্শ ও দায়িত্ব প্রভৃতি নিয়ে কথাবার্তা হয়েছিল। আদর্শ নারীর সংজ্ঞা যা ছিল গুরুদেবের চোখে, সরোজিনী নাইডুর মধ্যে তারই প্রতিফলন ঘটেছিল। আর তাই জন্যই রাজনৈতিক সহযোদ্ধাদের মধ্যে এমন একটি বিশিষ্ট স্থান তিনি অধিকার করতে পেরেছিলেন।[৮৯]

কয়েক দিন আগে ৬ মার্চ বিনয়ভবনে শিক্ষা সম্পর্কে একটি আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। বক্তারা ছিলেন এস.কে. জর্জ, সুনীলচন্দ্র সরকার, নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং সভাপতি পন্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন। বক্তাদের বিষয় ছিল যথাক্রমে ধর্মীয় শিক্ষা, গুরুদেবের শিক্ষাদর্শ, বুনিয়াদি শিক্ষা এবং প্রাচীন ভারতে শিক্ষা। সভাপতির বিষয়টি তাঁর পুরোনো প্রিয় বিষয়।[৯০]

শান্তিনিকেতনে নববর্ষ ও রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনের অনুষ্ঠান হয়ে গেলে ২৮ এপ্রিল গরমের ছুটি পড়ল। ক্ষিতিমোহন কলকাতায় গিয়েছিলেন। মহাজাতিসদনে নিখিল বঙ্গ রবীন্দ্র-সাহিত্য সম্মেলন কমিটির উদ্যোগে ৮-১৫ মে সপ্তাহব্যাপী রবীন্দ্রজন্মোৎসবের আয়োজন হয়েছে। ৮ মে তার উদ্‌বোধন করলেন পন্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী। এই কদিন প্রতি

সন্ধ্যায় বিভিন্ন বক্তারা রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করলেন, শান্তিনিকেতনের শিল্পীরা গান গাইলেন। ক্ষিতিমোহনও অন্যতম বক্তা। রবীন্দ্র-পরিষদের আমন্ত্রণে পাটনাতেও গিয়েছিলেন বক্তৃতা দিতে। সেখানেও একই সময়ে রবীন্দ্রজন্মোৎসব, বিহারের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ সিংহ অনুষ্ঠানের উদ্‌বোধন করলেন।[৯১]

পাটনায় থাকতে পেঙ্গুইনের চিঠি পেলেন। শান্তিনিকেতনে লেখা চিঠি কলকাতার ঠিকানায় এবং সেখান থেকে পাটনার ঠিকানায় তাঁকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তিন মাস পরে ৩ মে ১৯৪৯ পেঙ্গুইন সম্পাদকীয় বিভাগের প্রধান মি গ্লোভার লিখেছেন :

> আমি অত্যন্ত দুঃখিত যে আপনার হিন্দু ধর্ম-সম্পর্কিত গ্রন্থটির প্রস্তাবিত সারাংশের প্রাপ্তিস্বীকারে আমাদের এত বিলম্ব হল। আপনি যে সারাংশ পাঠিয়েছেন, এ তো দেখছি বিষয়ক্ষেত্রের পক্ষে অত্যন্ত সম্পূর্ণভাবে পর্যাপ্ত হবে এবং আমি মনে করি আমরা যে ধরনের গ্রন্থ চাইছি, এই ছকই তার উপযুক্ত হবে।

কাজের কথা আরও ছিল চিঠিতে এবং এই গ্রন্থের যারা সাধারণ পাঠক হবে তাদের বিষয়ে বেশ বিস্তারিত ধারণা দেওয়ার চেষ্টা ছিল। মি. গ্লোভার প্রস্তাব করলেন সম্পূর্ণ লেখার একটি নমুনা-অধ্যায় তাঁকে পাঠাতে। লিখলেন :

> কথা দিচ্ছি, আমরা সেটি আটকে রাখব না এবং আশা করি তার ভিত্তিতে বইটির জন্য একটি যুক্তিপত্র প্রস্তুত করা সম্ভব হবে আমাদের পক্ষে।[৯২]

ক্ষিতিমোহন ১৬ মে উত্তর লিখলেন :

> সারাংশটি আপনারা গ্রহণযোগ্য মনে করেছেন জেনে খুশি হলাম। একটি নমুনা-অধ্যায় আপনাদেব পাঠাব যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, লেখা হলেই। প্রথম অধ্যায়েরই নমুনা পাঠাতে হবে এমন প্রয়োজন আছে কি?

তখন বিশ্বভারতীর ছুটি চলছিল এবং গ্রন্থ-সারসংক্ষেপের গ্রহণীয়তা স্বীকার করে পেঙ্গুইনের চিঠিও এল অনেকটা দেরিতেই। তাই হয়তো লেখা শেষ করতে একটু দেরিই হয়ে যাবে। তবু তাঁদের জানালেন তিনি আশা করছেন যে, এক বছরের মধ্যে পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হয়ে যাবে। বিশ্বভারতী খুললে তিনি কাজ শুরু করবেন।[৯৩]

২৩ মে-র চিঠিতে মি. গ্লোভার ক্ষিতিমোহনের চিঠির প্রাপ্তিস্বীকার করে জানালেন তাঁর পছন্দমতো যে-কোনো অধ্যায়ের নমুনা তিনি পাঠাতে পারেন, তাতেই তাঁদের কাজ চলবে। এর পরে মি. গ্লোভারের ৮ নভেম্বরের চিঠিতে ক্ষিতিমোহনের ২ নভেম্বরের একটি চিঠির প্রাপ্তিস্বীকার পাচ্ছি। তিনি লিখছেন বই লেখার কাজ যতটা তাড়াতাড়ি ক্ষিতিমোহন শুরু করবেন আশা করেছিলেন, বাস্তবিক তা হয়নি বলে তাঁর উদ্‌বিগ্ন হওয়ার কারণ নেই। Hinduism-এর প্রথম দুটি অধ্যায় ক্ষিতিমোহন মি. গ্লোভারকে পাঠান ৩১ মার্চ ১৯৫০ এবং লেখেন কোনো প্রস্তাব থাকলে জানাতে। এও জানালেন যে সম্পূর্ণ গ্রন্থ যখন চূড়ান্ত আকার নেবে, তখন এ অধ্যায়গুলির কোথাও কোথাও কিছু পরিবর্তন হতে পারে। তাঁর

নিজের প্রস্তাব ছিল বইয়ের মধ্যে কয়েকটি ছবি থাকলে ভালো হয়, যাতে পশ্চিমি পাঠকদের কাছে বিষয়টা আরও বেশি প্রামাণিক হয়ে ওঠে। মনে জিজ্ঞাসা ছিল পরিভাষার প্রয়োগ কি বেশি হয়ে গেছে। এর উত্তরে মি. গ্লোভার ১৪ আগস্ট ১৯৫০ জানালেন যে, ইতিমধ্যে তিনি তাঁর পাঠানো অধ্যায় দুটিতে চোখ বুলিয়েছেন। এগুলি নিখুঁতভাবে তাঁদের অভীষ্টসাধন করবে, যদি অধ্যাপক সেন তাঁদের ওখানকার সম্পাদকীয় বিভাগ-কৃত কোনো কোনো শব্দের সামান্য পরিবর্তনে সম্মত হন, ইংরেজি ভাষাটাকে তার বাগ্‌ধারাসম্মত করতে গেলে হয়তো তার প্রয়োজন হবে। মনে হয় না এতে আপত্তির কোনো কারণ ঘটবে। পরিবর্তনের সংখ্যা অল্পই হবে এবং বলা বাহুল্য যে, যথেষ্ট সাবধানতা থাকবে যাতে লেখকের অভিপ্রেত অর্থের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না হয়। পরিভাষা ব্যবহার বেশি হয়নি এবং উপযুক্ত ছবি দেওয়ার দায়িত্ব অধ্যাপক সেন নিলে তাঁরা ছবি ছাপতে রাজি আছেন জানিয়ে মি. গ্লোভার যোগ করলেন গ্রন্থের বাকি অংশ পাওয়ার জন্য তিনি উৎসুক হয়ে আছেন।[৯৪]

পেঙ্গুইনের সঙ্গে ক্ষিতিমোহনের পত্রবিনিময় এইখানেই থেমে যায় তখনকার মতন, ক্ষিতিমোহন মি. গ্লোভারের চিঠির উত্তর হয়তো দিয়েছিলেন, কিন্তু আমাদের হাতে আর তথ্য নেই, Hinduism প্রকাশিতও হয় অনেকদিন পরে। সে প্রসঙ্গ পরে দেখা যাবে। আপাতত বলি, ১ জুলাই ১৯৪৯ বিশ্বভারতী খুললে ক্ষিতিমোহন যথানিয়মে কাজে যোগ দিয়েছিলেন। পুনরপি ২৪ সেপ্টেম্বর থেকে ২৭ অক্টোবর পর্যন্ত শারদ অবকাশের পরে বিশ্বভারতীর কাজ আরম্ভ হল। ঠিক তার পরই ১-১০ নভেম্বর শ্রীনিকেতনে গ্রামকর্মীদের একটি প্রশিক্ষণশিবির হল, উদ্দেশ্য তাদের মধ্যে সহযোগিতা ও নৈতিক মূল্যবোধ পুনর্গঠন। ৩১ অক্টোবর সেই প্রশিক্ষণশিবিরের উদ্‌বোধন অনুষ্ঠান হল। ক্ষিতিমোহন তাঁর সভাপতির ভাষণে প্রাক্‌ব্রিটিশ যুগে ভারতের সমাজ ও সম্প্রদায় সংগঠন কেমন ছিল তার এক চমৎকার বিবরণ দিলেন, জানাচ্ছে বিশ্বভারতী নিউজ। তখন গ্রামগুলি ছিল দেশের প্রকৃত স্নায়ুকেন্দ্র। গ্রামীণ অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভরতা ছিল বলে এত বহিরাক্রমণ সত্ত্বেও দেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কাঠামো বজায় রাখা সম্ভব হয়েছিল। জীবন এত সুসংবদ্ধ ছিল যে, সমাজদেহ হানাহানি অনেকটাই এড়িয়ে বিদেশি উপকরণগুলিকে আত্মীকরণ করে নিত। এই গ্রামসমাজ ভেঙে গেল ব্রিটিশশাসনে আর সব ধন জমা হল ব্যবসাকেন্দ্রগুলিতে। ইংরেজরা রেখে গেছে এই নাগরিক সভ্যতার অভিশাপ। এই অভিশাপ থেকে মুক্ত হওয়ার একটা পথ হল ভারতের গ্রামগুলিকে সহযোগিতা ও গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনযাপনের ভিত্তিতে পুনরুজ্জীবিত করে তোলা। 'গ্রামধর্ম' যদি ফেরানো যায় তবেই আমাদের মধ্যে আবার সংঘবদ্ধ জীবনের দায়িত্ববোধ ফিরে আসবে। স্বাধীন ভারত যদি এই পথ ধরে তার দায়িত্ব ও দায়বদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন হয়ে না ওঠে, তবে আমাদের ভবিষ্যৎ যে অন্ধকার তাতে কোনো সন্দেহ নেই।[৯৫]

পরের বছর গ্রামকর্মী-শিক্ষণশিবিরের উদ্‌বোধনী ভাষণে ক্ষিতিমোহন যা বলেছিলেন তার বিবরণ দিতে গিয়ে বিশ্বভারতী নিউজ লিখেছে :

তাঁর ভাষণে, যা প্রকাশভঙ্গির স্বচ্ছতায়, বিষয় বৈভবে উল্লেখযোগ্য, মাঝে-মধ্যেই কৌতুকে-হাস্যে আনন্দময়, আচার্য সেন এই শিবিরের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি বলেন এদেশে এই ধরনের শিবির নতুন কিছু নয়। পুরোনো কালে ধর্মোৎসবে মেলায় তীর্থস্থানে যেখানে বহু লোকসমাগম হত, সেখানে মানুষে মানুষে একটি আত্মিক বন্ধন গড়ে উঠত। আজকের এই আধুনিক শিবিরের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যও তাই। বক্তা তার পরে প্রাচীন ভারতের গুরুগৃহের পরিচয় দিলেন। প্রাচীন গুরুর কর্মে ও বাক্যের পিছনে যে অভিপ্রায় কাজ করত, শ্রোতাদের মনে তার ভাব সঞ্চারিত করে উদ্‌বুদ্ধ করলেন তাদের। বললেন এখন শিক্ষা শহর থেকে গ্রামের দিকে প্রবাহিত হয়ে থাকে, এই স্রোত বিপরীতমুখী হোক। পুনরায় গ্রাম হোক শিক্ষা ও সংস্কৃতিচর্চার কেন্দ্র, যেমন আগেকার কালে ছিল। উপসংহারে আচার্য সেন এই আশা প্রকাশ করেন যে, শিক্ষার্থীরা এই কয়দিনের শিবিরে যা শিখবেন, বাস্তবে তার সফল প্রয়োগ করবেন এবং তার দ্বারা গ্রামসমাজের সুখ ও কল্যাণবৃদ্ধির সহায়ক হবেন।[৯৬]

সমাজকর্মীদের শিক্ষণশিবিরে এর পরেও কখনও শিক্ষা সম্বন্ধে বলেছেন। যেমন বলেছিলেন শ্রীনিকেতনের গ্রামপুনর্গঠন বিভাগ আয়োজিত বিনুরি গ্রামের শিবিরে।[৯৭]

বিশ্বশান্তিবাদী সম্মেলন

১৯৪৯ সালে একটি বেশ বড়ো ও মর্যাদাবান দায়িত্ব পালনীয় ছিল বিশ্বভারতীর। স্থির হয়েছিল ডিসেম্বরের ১-৮ তারিখে বিশ্বশান্তিবাদী সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন হবে শান্তিনিকেতনে। এ তাঁদের শ্রদ্ধার্ঘ রবীন্দ্রনাথের স্মৃতির প্রতি এবং পৃথিবীতে তাঁর একতা ও শান্তিস্থাপনপ্রয়াসের প্রতি। পরে বড়োদিনের সময় এর দ্বিতীয় অধিবেশন হবে সেবাগ্রামে। সমস্ত আয়োজনের পিছনে প্রায় এক বছরের প্রস্তুতি চলেছে। বিদেশ থেকে প্রায় সত্তরজন প্রতিনিধি আসছেন, আসছেন সব কটি মহাদেশ থেকেই। শান্তিনিকেতনে সাজ-সাজ রব, মেলামাঠে এই অধিবেশনের জন্য স্বয়ংসম্পূর্ণ তাঁবু-শহর গড়ে তোলা হচ্ছে। নানা ভাষা নানা ধর্ম নানা জীবিকার মানুষ এক লক্ষ্যসাধনের সংকল্প বুকে নিয়ে এই কদিন নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করবেন। ২৯ নভেম্বর থেকেই সম্মেলন-প্রতিনিধিরা আসতে শুরু করলেন। কয়েক দিন আগে ২৩ নভেম্বরের সাপ্তাহিক মন্দিরে ক্ষিতিমোহনের ভাষণের অনেকখানি জুড়ে রইল এই সম্মেলনপ্রসঙ্গ। সন্দেহ আর ঘৃণার বিষবাষ্পে ভরা আজকের এই পৃথিবীতে এই ধরনের একটি সম্মেলনের গুরুত্ব অপরিসীম। ঈশ্বরকামী বা শান্তিকামী মানুষরা যখন সম্মিলিত হন, সে তো সামান্য ব্যাপার নয়। মানুষের শ্রেষ্ঠ সংকল্পের অর্জন এই খাঁটি হৃদয়গুলির মিলন। প্রসঙ্গত মনে হল অতীতকালে কিন্তু এই ধরনের চেষ্টা ভারতবর্ষে যে হয়নি তা নয়। রজ্জব ছিলেন মধ্যযুগের এক মহান মরমিয়া সন্ত। তিনি তৎকালীন সব ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মসম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের এক সম্মেলন আহ্বান করেছিলেন। আর-একটা কথাও মনে হল—এই সম্মেলনের জন্য শান্তিনিকেতনের

মতো স্থানের নির্বাচন খুব যথাযথ হয়েছে। শান্তিনিকেতন-বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠাতা আধুনিক যুগের প্রথম ব্যক্তি যিনি বিশ্বের সমস্ত মানুষকে উদাত্ত কণ্ঠে আহ্বান করেছেন পারস্পরিক বিশ্বাস ও সহযোগিতার খোলা রাস্তায় বেরিয়ে আসবার জন্য। ক্ষিতিমোহন বললেন :

> আশা করা যায় সম্মেলনপ্রতিনিধিরা শান্তিনিকেতনের উত্তরাধিকার ও ভাবসম্পদে এমন কিছু পাবেন যা তাঁদের বিশ্বাসকে বলশালী ও চিন্তাকে সহায়বান করবে।

৩০ নভেম্বর বিকেলে ও ১ ডিসেম্বর সকালে সম্মেলন-প্রতিনিধিদের জন্য শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতন ঘুরে দেখবার ব্যবস্থা হয়েছিল। সম্মেলনের কদিন প্রতি সন্ধ্যায় এক একটি ধর্মীয় রীতি অনুসারে প্রার্থনা ও উপাসনা অনুষ্ঠিত হল। আশ্রমবাসীরা অনেকেই নিয়মিত যোগ দিলেন। এক সন্ধ্যায় 'চিত্রাঙ্গদা' অভিনয় হল সম্মেলন-প্রতিনিধিরা দেখবেন বলে। ১ ডিসেম্বর বেলা আড়াইটের সময় আম্রকুঞ্জে তাঁদের অভ্যর্থনা-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সম্মেলনের উদ্‌বোধন হল। আচার্য ক্ষিতিমোহন সেনের মন্ত্রপাঠ, 'হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী' গান, রাজ্যপাল কৈলাসনাথ কাটজু, সভানেত্রী রাজকুমারী অমৃত কাউর ও রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষণ। সবশেষে শান্তিবচন পাঠ করলেন আচার্য ক্ষিতিমোহন, ছাত্রছাত্রীরা গান গাইলেন 'মোরা সত্যের পরে মন'।

সম্মেলন-শেষের আগের দিন ৭ ডিসেম্বর বুধবার সাপ্তাহিক মন্দির-উপাসনা ছিল। সম্মেলন-প্রতিনিধিদের বোঝবার সুবিধার জন্য ক্ষিতিমোহন তাঁর ভাষণের মূল বক্তব্য ইংরেজিতে বললেন। তাঁদের অনুরোধে এই ভাষণ মুদ্রিত করে তাঁদের প্রত্যেককে দেওয়া হয়েছিল। ক্ষিতিমোহনের যা বিশ্বাস, এই শান্তিবাদী সম্মেলনকে যে দৃষ্টিতে তিনি দেখছিলেন, স্বভাবতই তাঁর ভাষণে তারই প্রকাশ ঘটেছে :

> রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনে শান্তিতীর্থের যাত্রীরা সমবেত হয়েছেন, গোটা সপ্তাহটা আনন্দময় ও অর্থবহ হয়ে উঠেছে। সব ধর্মেই তীর্থস্থানের বিশেষ মূল্য, তবে লোককবিরা বলেন সব-চেয়ে পবিত্র তীর্থ হল সেই অন্তর্লোক, যেখানে পরম পুরুষের অধিষ্ঠান। ভৌগোলিক বাধা অপসারণের কোনো অর্থ নেই, কেননা মানুষে মানুষে ভুল-বোঝাবুঝি তো আকাশচুম্বী। শপথভঙ্গ, পক্ষপাত—মানুষে মানুষে ভেদ ঘটাচ্ছে, সংঘাত বাধাচ্ছে জাতিতে জাতিতে। এ সবই লৌহযবনিকার আড়াল গড়ে তোলে। ইতিহাসের এক চরম সময়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে এই আধুনিক তীর্থযাত্রা, এই সম্মিলিত আত্মানুসন্ধান। যদিও এ কথা সত্য যে পৃথিবীর সব বৃহৎ ধর্মেই বিশ্বমানবতার ভাবাদর্শ অন্তস্যূত হয়ে আছে, তবু এ কথাও মানতে হবে যে সত্য আজ দেশ ও ধর্মবিশ্বাসের ছোট গন্ডিতে বন্দী। কিন্তু আজ যখন নানা দেশ নানা জাতি নানা সম্প্রদায়ের মানুষ এই অভিশপ্ত মানবসভ্যতাকে বাঁচাবার পথ খুঁজতে গুরুদেবের 'এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে' এসে মিলিত হয়েছেন, তখন এই মঙ্গলপথের অন্বেষণ কি বৃথা হবে?
>
> চারশো বছর আগে রাজপুতানার এক গন্ডগ্রামে দাদূ নামে এক মরমিয়া সাধু সারা দেশের সন্ত ও সাধকদের সম্মেলন আহ্বান করেছিলেন। সেকালের মানুষজন কৌতূহলী চোখে সেই সম্মেলনের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করেছিল—ধর্ম হল ব্যক্তিগত ব্যাপার, ভিন্ন ভিন্ন ধর্মবিশ্বাসের এত সব মানুষকে কেন জড়ো করছ তুমি? কি মঙ্গল ঘটবে এর দ্বারা? উত্তরে দাদূশিষ্য রজ্জব

বললেন, জলের প্রতি বিন্দুটি নিজের ভিতরে সুদূর সাগরের ডাক শুনতে পায়। সে যদি একা যাত্রা করে বেরোয় তবে মরুবালুতে শুকিয়ে যাবে। সম্মিলিতভাবে তারাই কিন্তু আনন্দ-কল্লোলে ধাবিত হয় অসীম সমুদ্রের দিকে, সমুদ্র-সম্মিলনে সব বিচ্ছিন্নতার অবসান। সেই আহ্বানই আমাদের এই বিক্ষুব্ধ সময়ে আজ আবার এসেছে, প্রেম শান্তি ও অভেদের সিন্ধুতে গিয়ে মেলবার আহ্বান।

এমন দিন ছিল যখন এ-সব আদর্শবাদের কথা উপহাস করে উড়িয়ে দেওয়া হত, মনে করা হত এ-সব অন্ধবিশ্বাসের চিহ্ন কিংবা বড়জোর অকেজো নিরীহ মতবাদ মাত্র। আজ কিন্তু সব দিকেই শোনা যাচ্ছে—হয় এক সংবদ্ধ পৃথিবী থাকবে আর না হলে কোনো পৃথিবী থাকবে না। কে গড়বে সেই অখণ্ড পৃথিবী, কী করে গড়বে? একদিকে এই শাশ্বত কালের দর্শন, আর একদিকে এই জটিল সমকালীন পরিস্থিতি। আমাদের এই সম্মানিত অতিথিরা—যাঁরা এই সমস্যার সমাধান খুঁজছেন, কোনো সহজ সমাধানের পথ তাঁদের সামনে নেই। উত্তুঙ্গ অপ্রশস্ত এই পথে যে গুটিকয়েক মানুষ চলতে পারেন তাঁরাই মানুষের শ্রেষ্ঠ বন্ধু। এই শান্তি সম্মেলন মানবতার বিবেকের প্রতীক। মানবসমাজকে নতুন প্রতিষ্ঠা দেবার জন্য আপনারা কাজ করছেন, স্বয়ং বিশ্বস্রষ্টার ভাবরূপ প্রতিবিম্বিত হবে যে মানবাত্মায় তারই আগমনের জন্য পরিবেশ প্রস্তুত করছেন—আপনাদের আমরা অভিবাদন জানাই।

ভারতীয় শাস্ত্রে যে সামান্য জ্ঞান আমার আছে, তার দ্বারা এ আশ্বাস আমি আপনাদের দিতে পারি যে, যে-কর্মে আপনারা প্রবৃত্ত, ভারতবর্ষের অনন্তকালের জ্ঞান ও চেষ্টা তারই অভিমুখী। ভারতবর্ষের নামে, শান্তিনিকেতনের নামে আপনাদের হার্দিক স্বাগত জানাই আমি। এই বান্ধব সম্মেলন যেন কোনোদিন বিচ্ছেদ না জানে, শুভেচ্ছাবন্ধনে আবদ্ধ হোক মানববিশ্ব।

বন্ধুগণ, প্রায় একশ বছর আগে সিপাহি বিদ্রোহের সময় একজন সরকারি সৈন্য এক সাধুকে দেখে ফেরারি সিপাই মনে করে জেরা করবার চেষ্টা করছিল, আর সেই গভীর ধ্যানমগ্ন সাধুর কাছ থেকে কোনো উত্তর না পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বুকে বেয়নেট ঢুকিয়ে দিয়েছিল। হয়তো বা সেই সাধু প্রশ্নকর্তার ভাষাই বুঝতে পারেননি। আহত মুমূর্ষু সাধু চোখ খুলে হাসলেন, বললেন, 'হা মেরা রাম, আজ ইসি রূপসে তুয়া মুঝে দরশন দিয়া'। গত বছর ৩০ জানুয়ারি সন্ধ্যায় আর এক শহীদ বলতে গেলে এই কথারই প্রতিধ্বনি করেছিলেন।

অনেক বছর আগে এক অতি বৃদ্ধ ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল—তিনিই সেই সাধুর হত্যাকারী। কে জানে গান্ধীজীর শহীদের মৃত্যুবরণ এক কঠিন আত্মসংগ্রামের আহ্বানের রূপ নেবে কিনা, তার তেমনই পরিবর্তন আনবে কিনা।

বন্ধুগণ, আজ আপনারা সংখ্যায় অল্প, অচিরেই অনেক হবেন। কিন্তু যদি কেউ আপনাদের অনুসরণ নাও করে, কোথাও কোনো পুরস্কার নাও জোটে, সন্দেহ নেই যে তবুও আপনারা একাই পথ চলবেন। হে 'নূতন পৃথিবী'র পথিকৃৎগণ, আপনাদের উদ্দেশে আমাদের প্রণাম। আর আমাদের সম্মিলিত প্রণাম পরমপিতার উদ্দেশে।

শেষ হল সম্মেলন। ৮ ডিসেম্বর বিকেলবেলা শেষ অধিবেশন হল আম্রকুঞ্জে। এই অধিবেশন সবার জন্য উন্মুক্ত ছিল বলে আশ্রমিকরাও সোৎসাহে যোগ দিলেন।[৬৮]

এই সম্মেলনের ভাবগত দিক নিয়ে এই সময় দুটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন ক্ষিতিমোহন। 'বিশ্বশান্তি সম্মেলন ও ভারতবর্ষ' (আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৪ অগ্রহায়ণ ১৩৫৬) এবং 'মহর্ষির আশ্রমে বিশ্বশান্তি সম্মেলন' (দেশ, ২ পৌষ ১৩৫৬)।

রতন কুঠির পূর্বদিকে একটি ও পশ্চিমদিকে একটি গৃহনির্মাণের কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল ডিসেম্বরের শুরুতেই। খ্রিষ্টীয় ও পশ্চিম মহাদেশীয় জ্ঞানচর্চার পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য দীনবন্ধু অ্যান্ডরুজের নামে এই দুটি গৃহ নির্মিত হয়েছে। এটা সকলেই অনুভব করছিলেন যে এই সময় বিশ্বশান্তিবাদী সম্মেলন-প্রতিনিধিরা শান্তিনিকেতনে থাকতে থাকতে গৃহপ্রবেশ অনুষ্ঠানটি করতে পারলে সবচেয়ে ভালো হয়। ৭ ডিসেম্বর বিকেলে এই উপলক্ষে প্রায় সব সম্মেলন-প্রতিনিধি এখানে সমবেত হলেন। এই দীনবন্ধুভবনের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য মানুষের মধ্যে ভালোবাসা ও বোঝাপড়ার পথ প্রস্তুত করা, যে পথ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের শ্রেষ্ঠ মানস ও কর্মশক্তিকে একত্রিত করবে। তাই সারা পৃথিবীর শান্তিপ্রেমী মানুষদের উপস্থিতি এ অনুষ্ঠানকে বিশেষ তাৎপর্য দিল। সমবেত কণ্ঠে 'যেথায় থাকে সবার অধম' গানের পরে ক্ষিতিমোহন গৃহপ্রবেশ সম্বন্ধে কয়েকটি বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করলেন। তার পর মিস্ আগাথা হ্যারিসন, যিনি বছর বিশেক আগে বড়োদিনের সময় আশ্রমে এসেছিলেন ও কিছুদিন কাজ করেছিলেন, তিনি গ্রন্থাগারের বন্ধ দরজায় জড়ানো মালা ছিন্ন করে দ্বারোদ্‌ঘাটন করলেন এবং প্রজ্জ্বলিত দীপ হাতে নিয়ে সে ঘরে প্রবেশ করলেন।[৯৯]

বেতারকেন্দ্র উদ্‌বোধন। বৃক্ষরোপণ ও অন্যান্য

অল ইন্ডিয়া রেডিয়োর তরফে ঘোষণা করা হয়েছিল যে শান্তিনিকেতন থেকে অনুষ্ঠান সম্প্রচারণের জন্য কলকাতা বেতারকেন্দ্রের একটি সহায়ক স্টুডিয়ো এখানে খোলা হবে। সেখান থেকে সময়ে সময়ে রবীন্দ্রসংগীত, ঋতুউৎসব বা অন্য উৎসব ও জাতীয় গুরুত্বের অনুষ্ঠান, রবীন্দ্রনাথের নাটক, গীতিনাট্য প্রভৃতি সম্প্রচারিত হবে। এ ছাড়া মাসে মাসে সম্প্রচারের জন্যও একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করবে বিশ্বভারতী। বেতার-স্টুডিয়োর জন্য বিশ্বভারতী সংগীতভবনে একটি ঘর নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। উদ্‌বোধনের দিন স্থির হল ১৯৫০ সালের রবীন্দ্রজন্মদিন, ২৫ বৈশাখ ১৩৫৬। যথানির্দিষ্ট দিনে অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা করা হয়েছিল এখানকার আম্রকুঞ্জে। আকাশবাণীর বেতারঅধিকর্তা এ.কে. সেন ও অন্যান্য বেতারকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। সকালে ছিল ক্ষিতিমোহন সেনের উদ্‌বোধনী ভাষণ, তার পর সন্ধ্যায় কণিকা মুখোপাধ্যায়ের রবীন্দ্রসংগীত এবং 'বসন্ত' গীতিনাট্যের অভিনয়। ক্ষিতিমোহনের ভাষণ একটি উঁচু ভাবের সুরে বেঁধে দিল শ্রোতার মন, যেমন তা বরাবর বেঁধেছে। শান্তিনিকেতনে বেতারকেন্দ্র স্থাপনের এই উদ্যোগের সুদূরপ্রসারী তাৎপর্যটুকু বিশ্লেষণ করলেন অল্প কথায়। বললেন গুরুদেব যদিও তাঁর স্বদেহে আমাদের মধ্যে নেই, তবু এক অর্থে আজ তাঁর পুনর্জন্ম হল। আত্মিক শক্তিতে তিনি তো শান্তিনিকেতনে ছিলেনই, কিন্তু এখন থেকে তাঁর সেই ভাবরূপ ব্যাপকতর ক্ষেত্র পাবে কর্মসম্পাদনের। বেতারতরঙ্গে বাহিত হয়ে তাঁর ভাব সুনীল আকাশের বিপুল শূন্যে বিস্তৃত হবে এবং

পৃথিবীর সুদূর কোণে কোণে পৌঁছোবে। এই বেগবর্ধক সম্প্রসারণের গতি সেই সত্যকে বহন করে নিয়ে যাবে, যে সত্য আছে তাঁর বাণীতে। সেই সত্যবাণী মানুষের হৃদয়ে পৌঁছে এই বিশ্বকে অবিশ্বাস ও অনৈক্যের সর্বনাশ থেকে মুক্তি দিক, যে সর্বনাশের পথে সে দ্রুত এগিয়ে চলেছে। সত্যের জয় হোক— যে অমঙ্গল আজকের পৃথিবীকে বিনাশের পথে ঠেলছে তাকে উত্তীর্ণ হয়ে জয়যুক্ত হোক সে।[১০০]

এই বছরে এ সময়টাতে অন্য আর-এক কাজে বারবারই তাঁর ডাক পড়েছে শান্তিনিকেতনের বাইরে। বিশ্বজুড়েই মানুষ উপলব্ধি করতে পারছে যে, এই অরণ্যচ্ছেদ ও ভূমিক্ষয় নিবারিত না হলে এবং বনসৃজনে তৎপর না হলে পৃথিবীর সমূহ সর্বনাশ। আজ থেকে বাইশ বছর আগে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনে প্রবর্তন করেছিলেন এই উৎসব, সেই অবধি এখানে এই উৎসব অব্যতিক্রমে পালিত হয়ে আসছে। কবির মৃত্যুর পর থেকে এই উৎসবের দিনটি ২২ শ্রাবণ। ক্ষিতিমোহন প্রথম থেকে এই উৎসবের সঙ্গে জড়িয়ে আছেন। এবার ভারত সরকার উদ্যোগ নিয়েছেন সারা দেশে এই উৎসবের প্রচলন করতে। শান্তিনিকেতন বনমহোৎসবের প্রসার বাড়াতে তার নিজের চারপাশের এলাকায় বরাবরই সচেষ্ট। এখনও দেখা গেল পশ্চিমবঙ্গই দেশে অগ্রণীর ভূমিকা নিয়েছে এ ব্যাপারে। এই উৎসব জনপ্রিয় করতে যথেষ্ট আগ্রহী পশ্চিমবঙ্গ সরকার। সেজন্য তাঁরা সব প্রধান প্রধান বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠানেই অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে শান্তিনিকেতন-অনুসৃত অনুষ্ঠান-পদ্ধতি অনুসরণ করছেন—গাছের চারা বহন করে আনবার সেই রীতি, সেই-সব গান এবং মন্ত্র। আর সেই মন্ত্রপাঠের দায়িত্বগ্রহণে পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেনকেই অনুরোধ জানানো হচ্ছে। ৯ জুলাই শান্তিনিকেতন ডাকঘর পালন করল বনমহোৎসব। ইন্দিরা দেবী রোপণ করলেন বৃক্ষচারাগুলি, বলা বাহুল্য আচার্যের ভূমিকায় উপস্থিত আছেন ক্ষিতিমোহন।[১০১]

আশ্রম-বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব অনুষ্ঠান-উৎসবগুলি যথাবিধি সারা বছর ধরে হয়ে চলেছে, ২২ শ্রাবণ বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠানও বাদ যায়নি। এ বছর রবীন্দ্রভবনের অধ্যক্ষ অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেন বাইশে শ্রাবণ উপলক্ষে রবীন্দ্রসপ্তাহের পরিকল্পনা করেন। তাঁর ভাবনামতো বিষয় স্থির হয়েছিল বৈদিক থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত ভারতীয় ঐতিহাসিক যুগ ও আন্দোলনগুলি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের প্রতিক্রিয়ার ধারাবাহিক আলোচনা। প্রথম দিনের অনুষ্ঠানসূচনা হল 'ভারততীর্থ' কবিতা আবৃত্তি দিয়ে। সেদিনের বক্তা ছিলেন ক্ষিতিমোহন সেন, কিন্তু ভাষণ দেওয়ার আহ্বান যখন পেলেন সভার সময়াভাবে দীর্ঘ আলোচনার অবকাশ ছিল না। তবু অল্প সময়ের মধ্যে তিনি পর্যাপ্ত ইঙ্গিত দিলেন বেদ ও উপনিষদ সম্পর্কে যে পথে রবীন্দ্রনাথের মন ক্রিয়াবান ছিল সেই ধারা ধরে গবেষণার সম্ভাবনা কী কী আছে। 'বিশ্বভারতী নিউজ' পত্রিকা লিখেছে যে, প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেন তাঁর নিজের বহু সুযোগ হয়েছে বেশ অনেকগুলি বৈদিক ও ঔপনিষদিক অভিধেয়ের গুরুদেবের নিজস্ব ব্যাখ্যা তাঁর মুখে শোনবার এবং সেগুলি লিখে নেওয়ার। সেই ব্যাখ্যা অনেক মূল পাঠের উপরে নতুন আলোকপাত করেছিল তাঁর কাছে এবং সেই লেখাগুলি মুদ্রিত হওয়া উচিত। পণ্ডিত সেন বর্ণনা দিলেন গুরুদেবের জীবনে তাঁর মধ্যে কীরকম

উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছিল, যে পরিবর্তন তাঁর 'আরোগ্য' 'প্রান্তিক' ও সমধর্মী কাব্যগ্রন্থে তো নির্ণয় করা যায়ই, এমনকী তাঁর চেহারাতেও সেই পরিবর্তনের ছাপ পড়েছিল। ক্রমশই তাঁর বাইরের আকৃতিতেও তাঁর বড়োদাদার মতো একটি পারিবারিক ঋষিভাবের বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছিল।[১০২] আর-একবার রবীন্দ্রসপ্তাহে ক্ষিতিমোহন খানিকটা লঘুসুরে শুনিয়েছিলেন শান্তিনিকতনে ঋতুউৎসব প্রবর্তনের কাহিনি। সেই তাঁর আশ্রমজীবনের শুরুর দিনগুলির কথা, গুরুদেবের অনুপস্থিতিতে তাঁরা বর্ষাউৎসব করলেন, তার পর রবীন্দ্রনাথ লিখলেন 'শারদোৎসব', অভিনয়ে কে কী ভূমিকা নিলেন। তার পরে সেই অভিনয়ের সময় গুরুদেবের নেপথ্য থেকে তাঁর গলায় গান গাওয়া, সে কথা বুঝতে না-পেরে দর্শকরা কীরকম চমৎকৃত হলেন তাঁর গান শুনে।[১০৩]

১৯৫০ সালের শেষের দিকে ইউনাইটেড স্টেটস থেকে ড. মিস টেট এলেন ভিজিটিং প্রফেসর হিসেবে। সেসময় তিনিই প্রথম এবং একমাত্র অশ্বেতকায় আমেরিকান, যিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চতর গবেষণার জন্য উপাধি লাভ করেছেন। ১৯৫০-৫১ সালের শিক্ষাবর্ষে তাঁর কর্মস্থল হাওয়ার্ড বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদিত ছুটিতে শান্তিনিকেতনে এসেছেন। পড়াবেন আধুনিক ইউরোপের ইতিহাস, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও কূটনৈতিক ইতিহাস। ২৩ নভেম্বর সন্ধ্যায় চিনাভবনে একটি সভা হল। এ-সব জ্ঞানী-গুণী মানুষ এলে এখনও সাধারণত ক্ষিতিমোহনের উপরই দায়িত্ব পড়ে শান্তিনিকেতনবাসীদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দেওয়ার।[১০১]

এই সময়ই ৫ ডিসেম্বর ঋষি অরবিন্দের তিরোভাব-সংবাদে আশ্রমবাসীরা সকলে এসে সমবেত হন গৌরপ্রাঙ্গণে। সেই মহান আত্মার জন্য নিঃশব্দ প্রার্থনায় ক্ষিতিমোহনেরও অন্তর সহযোগী। বুধবারের নিয়মিত মন্দির-উপাসনা সেই প্রয়াত মহাসাধকের আত্মার প্রতি সম্মানে বিশেষ ও ব্যতিক্রমী হয়ে ওঠে। পরম শ্রদ্ধা এবং একান্ত বেদনায় আচার্য ক্ষিতিমোহন যখন উচ্চারণ করেন জ্ঞান ও অধ্যাত্মদৃষ্টির সর্বশেষ পূত দীপশিখাটি এবার নিভে গেল, তখন সবারই মনের কথা ভাষা পায় তাঁর কথায়। এও সত্য যে শ্রীঅরবিন্দের মতো সর্বোচ্চ বিন্দুস্পর্শী যাঁর সাধনা, সর্বমানবের হৃদয়ে তাঁর আত্মার দীপ চিরদেদীপ্যমান থাকবে, তবু এ কথাও ভোলা যায় না যে, যখন ভারতবর্ষে এবং সারা বিশ্বে তাঁকে সবচেয়ে প্রয়োজন ছিল, তখন তাঁর তিরোধান এক অত্যন্ত শোকাবহ ঘটনা, বলেন ক্ষিতিমোহন।[১০৫]

পরের বছর ওই একই দিনে শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের প্রয়াণ ঘটল। পরদিন সন্ধ্যায় বিশেষ মন্দিরে আচার্য উচ্চারণ করেন ঋগ্‌বেদের মন্ত্র : শ্রদ্ধা প্রাতর্হবামহে শ্রদ্ধাং মধ্যদিনং পরি। শ্রদ্ধাং সূর্যস্য নিম্র চি শ্রদ্ধ শ্রদ্ধাপয়েহ নঃ।। —আমরা শ্রদ্ধা নিবেদন করি উষালগ্নে, করি দ্বিপ্রহরে এবং পুনরায় সূর্যাস্তবেলায় ; শ্রদ্ধা আমাদের অনুপ্রাণিত করুক, ভরসা দিক। বলতে বলতে প্রসঙ্গজাত চিরকালের অভ্যাসমতো এ কথা তাঁর মনে হয় আচার্য অবনীন্দ্রনাথ দীর্ঘকাল আমাদের মধ্যে ছিলেন বলে অতিনৈকট্য তাঁর ব্যক্তিত্বের বিরাটত্ব আড়াল করেছে, আমরা তাঁর ভিতরকার সম্পূর্ণ মূর্তিটি দেখতে পাইনি। নিঃসংশয়ে তিনি এক প্রতিভাবান

সাহিত্যিক ও শিল্পী, ভারতীয় সাংস্কৃতিক নবজাগরণের অন্যতম পথিকৃৎ। কিন্তু আজ যখন এই মৃত্যু উত্তীর্ণ শান্ত অবকাশে যবনিকা সরে গিয়ে যথার্থ পরিপ্রেক্ষিতটি রচিত হয়েছে, তাঁর সত্তার এক-একটি খণ্ড খণ্ড দিক আর আমাদের আকর্ষণ করছে না, আজ আমরা দেখব তাঁর মানবসত্তা বা অন্তরাত্মাটিকে, যা তাঁর অখণ্ড ব্যক্তিত্ব গঠন করেছিল, সম্ভব করেছিল তার বিচিত্র প্রকাশকে। অবনীন্দ্রসত্তা সৃজনী-আত্মপ্রকাশের লক্ষ নিয়ে সর্বকর্মে নিত্য অর্ঘ্য দিয়েছে বিশ্বকর্মার চরণে। আজ তাঁর সেই তদ্গত অন্তরাত্মার প্রতি আমাদের বন্দনা জানাবার দিন। তাঁর জীবনীলেখকেরা সুন্দরের বেদিতে তাঁর বিচিত্র দানের পরিমাণ করুন, করুন তার মূল্য বিচার। আমরা কেবল সেই আত্মোৎসর্গিত মহাপ্রাণের স্মৃতির স্থাপনা করব হৃদয়ে, ঔপনিষদিক মন্ত্রের সুরে বেঁধে নেব অন্তরের সুর : 'বায়ুরানিলমমৃতমথেদং ভস্মান্তং শরীরম্। ওঁ ক্রতো স্মর কৃতং স্মর ক্রতো স্মর কৃতং স্মর।।' প্রাণবায়ু মিশে যায় মহাজাগতিক বায়ুতে, ভৌত দেহ ভস্মে পরিণত হয়। কিন্তু অনন্তরাগত তুমি স্মরণে রেখো যা কৃত হয়েছে।[১০৬]

এই-সব নানা গুরুগম্ভীর ভাবনা ও কৃত্যের মধ্যে আবার কোনোদিন বা ক্ষিতিমোহনের ডাক পড়ে শিশুবিভাগে। দিনটি ৯ আগস্ট ছিল, ২৩ শ্রাবণ। সন্তোষালয়ে এই কালের শিশুদের কাছে জমিয়ে বসে প্রথম যুগের আশ্রমে ছোটোদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কটি কেমন ছিল তার গল্প করেন। একদিন ছিল যখন বীথিকা বা বাগানবাড়ির অধ্যক্ষ ক্ষিতিমোহনকে প্রায়ই বিনোদনপর্বে ছেলেদের গল্প বলতে হত। বহু যুগের ওপার থেকে আজও হয়তো তারই স্মৃতি একটুখানি তাঁকে স্পর্শ করে যায়।[১০৭]

ইতিমধ্যে ভারত সরকারের বিশ্বভারতীর দায়িত্বগ্রহণ করবার প্রস্তাব নানা আলোচনার ভিতর দিয়ে কার্যকর হওয়ার পথে অনেকদূর অগ্রসর হয়ে গিয়েছিল। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে যে প্রস্তাবের সূত্রপাত, এবার তা বাস্তবায়িত হল। ১৯৫১ সালে এই প্রতিষ্ঠান স্বীকৃতি লাভ করল কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় রূপে। যদিও ক্ষিতিমোহনের মতামত মুদ্রিত আকারে পাই না, তথাপি রথীন্দ্রনাথ, সুধীরঞ্জন দাস বিষয়টি নিয়ে বিগত দু-তিন বছর ধরে যে-ভাবে ভাবছিলেন, যে-ভাবে কাজ অগ্রসর হয়েছিল, সে সম্পর্কে ক্ষিতিমোহন বা নন্দলালের মতো আশ্রম-প্রবীণদের অনবহিত থাকার প্রশ্ন ওঠে না। আমরা দেখেছি ১৯৪৯ সালের গোড়ায় যখন ইউনিভারসিটি কমিশনের সদস্যরা শান্তিনিকেতন পরিদর্শন করেন, তখন প্রথম দিন বিকেলের সভায় ক্ষিতিমোহন সভাপতিত্ব করেছিলেন।

কথা ছিল বিশ্বভারতী ১ জুলাই ১৯৫১ থেকে একটি বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে কাজ শুরু করবে।[১০৮] কার্যত ১৪ মে থেকে এই কাজ শুরু হল। সংসদে বিল পাস করবার সময় শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আজাদ তাঁর ভাষণে বলেছিলেন এই প্রস্তাব গ্রহণের দ্বারা মহাত্মা গান্ধীর একটি ইচ্ছা পূর্ণ করবেন সংসদ। তিনি শিক্ষামন্ত্রকের দায়িত্ব নেওয়ার পরে গান্ধীজি তাঁকে স্পষ্ট নির্দেশ দিয়ে বলেছিলেন গুরুদেব যে নির্ভরতায় তাঁর প্রতিষ্ঠানের সুরক্ষার জন্য তাঁদের প্রতি বিশ্বাসস্থাপন করেছিলেন, তার সম্মানে সরকারের উচিত বিশ্বভারতীর মঙ্গলের প্রতি

দৃষ্টি দেওয়া। সেইসঙ্গে বিশ্বভারতীর চরিত্র যেন বদল হয়ে না যায় সেই সদিচ্ছা সর্বস্তরে ছিল। পণ্ডিত নেহরু বারবার এই ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতী পরিচালনার যে বিধিনিয়ম রচনা করেছিলেন, সেই বিধিনিয়মেই চলবে বিশ্বভারতী। রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদের ইচ্ছানুযায়ী এই বিল ৯ মে রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক স্বাক্ষরিত হয়।[১০৯] সুতরাং এতবড়ো বিশাল পরিবর্তন সত্ত্বেও এই আশ্রম-বিদ্যায়তন আমূল পরিবর্তিত হয়ে যাবে এমন আশঙ্কা ছিল না।

এই বছরেই শান্তিনিকেতন মন্দিরের যাট বছর পূর্ণ হল আর পূর্ণ হল ব্রহ্মচর্যাশ্রমের পঞ্চাশ বছর। গত বছর থেকেই ৭ পৌষের প্রভাতি উপাসনার আয়োজন হচ্ছে ছাতিমতলায় মহর্ষিদেবের ধ্যানের বেদির সামনে। আজকাল প্রচুর মানুষের সমাগম হয়, এত মানুষের স্থানসংকুলান হয় না মন্দিরে, এখন মুক্তাঙ্গানই প্রশস্ত। ক্ষিতিমোহন তাঁর চিরাচরিত ভাবনা অনুযায়ী এই দিনটির অন্তর্নিহিত সত্যের ব্যাখ্যা করেন, ব্যাখ্যা করেন মহর্ষিদেবের আত্মোপলব্ধির মন্ত্র 'ঈশাবাস্যমিদং সর্বম্'। বলেন এই মন্ত্রেরই অনুপ্রেরণা কীভাবে মহর্ষিপুত্র রবীন্দ্রনাথকে এই শান্ত নির্জনে প্রথমে বিদ্যালয় ও পরে বিশ্বভারতী গড়ে তুলতে উদ্দীপিত করেছিল। তিনি বলেন এই পুণ্যদিনে এই প্রাচীন মন্ত্রে আমাদের বিশ্বাস নবপ্রতিষ্ঠা লাভ করুক। কায়েমি স্বার্থের মানুষ এ কালের জেহাদ শেখবার জন্য আমাদের প্রলুব্ধ করতে চাইছে, আমরা যেন তার ফাঁদে না পড়ি। এ তো কেবল ঘৃণা আর বিভেদ জাগিয়ে তুলবে। আমাদের মন্ত্র বিশ্ববোধের মন্ত্র, এই সৃষ্ট জগৎ যাঁর প্রকাশ, সেই ঈশ্বরের দৃষ্টিসীমানায় গড়ে-ওঠা সৌহার্দ এবং সহমর্মিতার মন্ত্র।[১১০]

পরদিন ২৪ ডিসেম্বর সমাবর্তন অনুষ্ঠান। সুসজ্জিত আম্রকুঞ্জ, বহু দর্শকের সমাগম-উপযোগী বিশাল ব্যবস্থা। এবারকার সমাবর্তন যেন এক বিশেষ মাত্রা পেয়েছিল। বিশ্বভারতী সোসাইটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এই সবশেষ সমাবর্তন। ড. সর্বপল্লি রাধাকৃষ্ণন সভাপতিত্ব করলেন এবং দীক্ষান্তভাষণ দিলেন। নবস্নাতকদের উপদেশ দিতে গিয়ে বললেন :

> এইমাত্র যে পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন তোমাদের উদ্দেশে উচ্চারণ করলেন সত্যান্ন প্রমদিতব্যম্। ধর্মান্ন প্রমদিতব্যম্। কুশলান্ন প্রমদিতব্যম্। আমার তো মনে হয় না এর পরে আর আমার বলবার প্রয়োজন আছে।

বিশ্বভারতীপ্রধান (রেকটর) ড. হরেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁর ভাষণে উল্লেখ করলেন :

> প্রথম বিশ বছর বহু বিঘ্নের মধ্যে দিয়ে চলেছে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়, সেকালের সরকার শুধু সাহায্য করেনি তা নয়, নানাভাবে বাধার সৃষ্টি করেছে ১৯১৩ সাল পর্যন্ত, যতদিন না আমাদের জাতীয় কবি প্রাচ্যমহাদেশের জন্য নোবেল পুরস্কার অর্জনের সম্মান এনেছেন। কিন্তু সে সময় ক্ষিতিমোহন সেন ও মহামহোপাধ্যায় বিধুশেখর শাস্ত্রীর মতো বিশিষ্ট পণ্ডিতেরা, জগদানন্দ রায় ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় অনিমানন্দ সতীশচন্দ্র রায় অজিতকুমার চক্রবর্তী প্রমুখ আত্মত্যাগপরায়ণ সব মানুষ দাঁড়িয়েছিলেন কবির পাশে এবং নামমাত্র পারিশ্রমিকে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছিলেন।[১১১]

সংস্কৃতি সংগম

এ বছরে ক্ষিতিমোহনের একটি হিন্দি গ্রন্থ প্রকাশিত হয় 'সংস্কৃতি সংগম' নামে। এটি তাঁর অনেকগুলি প্রবন্ধের সংকলন। বইটি বছরের গোড়ার দিকেই প্রকাশিত হয়ে থাকবে, ক্ষিতিমোহনের নিজস্ব কপিতে স্বাক্ষর সহ তারিখ দেওয়া আছে ২৯ মার্চ ১৯৫১। শুরুতে লেখক স্বয়ং একটি ছোটো ভূমিকায় সাংস্কৃতিক মিলনের তাৎপর্য ও উপযোগিতাই ব্যাখ্যা করেছেন— শিরনামা 'সাংস্কৃতিক মিলনকে পিয়াসিয়োঁসে'। বোঝা যায় এই গ্রন্থ প্রকাশের পিছনে দেশের সাংস্কৃতিক মিলনের আদর্শ কাজ করেছিল। ১৯৩৮ সালে বিশ্বভারতীতে হিন্দিভবনের ভিত্তিস্থাপন অনুষ্ঠানে ক্ষিতিমোহনের স্বাগতভাষণ 'সংস্কৃতির যোগসাধনা' নামে ছাপা হয়েছিল। সেই ভাষণই ঈষৎ সংক্ষেপে অনুবাদ করে দেওয়া হয়েছে দেখতে পাচ্ছি। বলতে গেলে পূর্ববর্তী ভাষণে যেখানে বিশেষ করে বাংলা ও হিন্দি ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির আদানপ্রদান প্রসঙ্গে কথা আছে, এই ভূমিকায় সেইটুকুই যা বর্জন করা হয়েছে। গ্রন্থারম্ভে 'আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন' নামে একটি লেখক-পরিচিতি আছে ড. হাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদীর লেখা। হিন্দিভবনের প্রাক্তন অধ্যক্ষ দ্বিবেদীজি এই মানুষটি সম্পর্কে যে সশ্রদ্ধ ধারণা পোষণ করতেন, তারই স্বাক্ষর আছে এ লেখায়। ক্ষিতিমোহনের পরিচয় দিয়ে তিনি লিখেছেন :

> যদিও এখন তিনি অবসরগ্রহণ করেছেন কিন্তু শান্তিনিকেতন তাঁকে ছাড়তে প্রস্তুত নয়। এখন অবকাশগ্রহণের পরে তিনি সেখানে 'কুলস্থবির' রূপে আশ্রমবাসীদের কর্মপ্রেরণা দিচ্ছেন। প্রগাঢ় পান্ডিত্য যেমন তিনি লাভ করেছেন তেমনই পেয়েছেন উন্মুক্ত সহজ দৃষ্টি। এ রকম মণিকাঞ্চনযোগ প্রায় মেলে না।

ক্ষিতিমোহনের পান্ডিত্য যে পুথিপত্রের সীমানায় বদ্ধ হয়ে থাকেনি, দেশের নানা দিকে ঘুরে ঘুরে তিনি যে এ দেশের মধ্যযুগীয় সাধক ও তাঁদের উপলব্ধিজাত মর্মবাণীর সঙ্গে নিজের ঘনিষ্ঠ পরিচয়সাধন করেছেন, সে কথার উল্লেখ করে হাজারীপ্রসাদ লিখলেন :

> আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন মধ্যযুগীয় ভারতীয় ধর্মসাধনার খুব বড় পন্ডিত। তাঁর জ্ঞানপিপাসা গ্রন্থের সীমানায় বাঁধা পড়ে নি। ভারতবর্ষের প্রতিটি দিকে গিয়ে তিনি সাধকদের সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন। প্রাচীন সন্তদের মৌখিক পরম্পরায় বাণীর যে রূপ চলে আসছে তিনি সেগুলি সংকলন করেছেন এবং তার প্রতি আধুনিক পন্ডিতমন্ডলীর মনোযোগ আকৃষ্ট করেছেন।

এর পরে যে কথাগুলি লিখলেন হাজারীপ্রসাদ, তাতে ক্ষিতিমোহন সম্পর্কে তাঁর ব্যক্তিগত অনুভব ও অভিজ্ঞতার ছোঁয়া আরও বেশি লাগল :

> গত বিশ বছর আমি আচার্যজির সংস্রবে রয়েছি। এর মধ্যে তাঁর অদ্ভুত জ্ঞান নিষ্ঠা, মনোহর বাক্‌শক্তি, সরস লিখনশৈলী, উদার হৃদয় আর অপরিমিত স্নেহের যে পরিচয় আমি পেয়েছি, তা আশ্চর্যজনক। তিনি কেবল সন্তসাহিত্যের পন্ডিতই নন, তিনি নিজেও এই পরম্পরার অন্তর্গত। ভারতীয় সংস্কৃতি বিষয়ে তাঁর অধ্যয়নের পরিধি বিশাল, গোটাকতক সংস্কৃতগ্রন্থ আশ্রিত তথ্যকেই তিনি ভারতীয় সংস্কৃতির বিষয়ে অধ্যয়নের প্রধান সাধন মানেন না। ভারতীয়

> জনতা এ-সব তথ্যের চেয়ে বড়। বহু জাতি ও উপজাতির অনুশ্রুতি, আচারপরম্পরা ও ইতিবৃত্তগুলি তাঁর দৃষ্টিতে সামান্য নয়। এই বহুধা-বিস্রস্ত সামগ্রীর জঞ্জাল থেকে সামাজিক ও ধর্মীয় বিকাশের সন্ধান করা বড় কঠিন কাজ। আচার্যজির তীক্ষ্ণদৃষ্টি এই আবরণ সহজেই ভেদ করে সত্য পর্যন্ত পৌঁছে যায়। যাঁরা তাঁর 'ভারতবর্ষে জাতিভেদ' নামক বইটি পড়েছেন তাঁরা এ কথার সত্যতা অনুভব করতে পারবেন।[১১২]

হিন্দি ভাষায় আচার্য ক্ষিতিমোহন সেনের সব গ্রন্থ যে জ্ঞানচর্চার জন্য অনূদিত হওয়া একান্ত উচিত, সে বিষয়ে এই লেখায় অধ্যাপক দ্বিবেদী সকলকেই সচেতন করতে চেয়েছেন। তিনি নিজে কর্মব্যস্ততার কারণে হিন্দি ভাষায় ক্ষিতিমোহন-গ্রন্থ সম্পাদনা ও প্রকাশে আরও বেশি মনোযোগ দিতে পারেননি বলে দুঃখপ্রকাশ করেছেন। 'ভারতবর্ষে জাতিভেদ' বেরিয়েছিল ১৯৪০ সালে এবং ১৯৫১ সালে প্রকাশিত হল 'সংস্কৃতি সংগম'। 'সংস্কৃতি সংগম' প্রকাশিত হওয়ার পরে ক্ষিতিমোহন 'রাষ্ট্রভাষা প্রচার সমিতি, ওয়ার্ধা'-কর্তৃক মহাত্মা গান্ধী পুরস্কারে সম্মানিত হলেন। খবর পাওয়া যাচ্ছে :

> নিখিল ভারতীয় গান্ধী স্মারক নিধি থেকে প্রতি বছর একটি পুরস্কার দেবার ব্যবস্থা হয়েছে। হিন্দিভাষী ছাড়া বাহিরের অন্যান্য ভাষার লেখকদের মধ্যে থেকে শীর্ষস্থানীয় হিন্দি লেখককে এই পুরস্কার দেওয়া হয়। পুণার অধিবেশনে গত ১৯৫১ সনের মে মাসে এই ব্যবস্থায় সর্বপ্রথম ক্ষিতিবাবুকেই এই পুরস্কারে পুরস্কৃত করা হয়েছে।[১১৩]

রাষ্ট্রভাষা হিন্দি নিয়ে তখন আলোচনা-সমালোচনার শেষ নেই। সেই প্রেক্ষিতে 'লোকসেবক' দৈনিক পত্রিকায় ক্ষিতিমোহনের পুরস্কারপ্রাপ্তি প্রসঙ্গে লেখা হয়েছিল :

> শান্তিনিকেতনের আচার্য শ্রীক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় হিন্দী সাহিত্যে সংস্কৃতিমূলক-রচনার জন্য গান্ধী পুরস্কার লাভ করিয়াছেন। আচার্য সেন মহাশয় সংস্কৃতিবান ও বিদ্বানরূপে বহুপূর্বেই সর্বভারতীয় খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন এবং বিদগ্ধ মহলের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধার অধিকারী হিসাবে তাঁহার স্থান ভারতীয় সংস্কৃতি জগতে বহু উর্ধ্বেই রহিয়াছে। সে হিসাবে তাঁহার এই পুরস্কারপ্রাপ্তিকে আমরা বৃহৎ কিছু বলিয়া মনে করি না। পুরস্কার যাঁহারা দিয়াছেন তাঁহারাই নিজদিগকে সম্মানিত করিয়াছেন এবং সাহিত্যপ্রেমের উদাহরণ সৃষ্টি করিয়াছেন। আমরা এ বিষয়টিকে আর একটি দৃষ্টিকোণ হইতে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। হিন্দী আজ রাষ্ট্রভাষা হইলেও বাঙ্গালী শিক্ষিতের মধ্যে উহার প্রতি একটি উপেক্ষার ভাব এখনও রহিয়াছে। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে যে এই হিন্দী ভাষাই একদিন ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতার বাহনের কাজ করিবে এ সত্যটি আমরা এখনও স্বীকার করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। মাতৃভাষার প্রতি সর্বশ্রেষ্ঠ প্রীতি সংরক্ষণ করিয়া এবং মাতৃভাষার ব্যাপক অনুশীলন করিয়াও যে রাষ্ট্রভাষাকে সমভাবে সমান উৎকর্ষের সহিত আয়ত্ত করা যায়—এ বিশ্বাস আচার্য সেনের পুরস্কারপ্রাপ্তি হইতে বাঙ্গালী শিক্ষিতেরা গ্রহণ করিবেন, ইহাই আমরা আশা করি। বাঙ্গালী মনীষা সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে এভাবে বিকীর্ণ হইবে এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি চলিতে থাকিবে, এই প্রার্থনাই আমরা করি।[১১৪]

'লোকসেবক' আচার্য ক্ষিতিমোহনের প্রতি প্রভূত সম্মান প্রদর্শন করেই এ কথাগুলি লিখেছেন সন্দেহ নেই। তথাপি ক্ষিতিমোহনের হিন্দিচর্চাকে মাতৃভাষার ব্যাপক অনুশীলন

করেও রাষ্ট্রভাষাকে সমান উৎকর্ষের সঙ্গে আয়ত্ত করার আদর্শ দৃষ্টান্ত বলে দেখলে কীসের যেন অনেকখানি ঘাটতি রয়ে যায়। ক্ষিতিমোহনের কাছে হিন্দি দ্বিতীয় মাতৃভাষাও নয়, বরং সে ভাষাই তিনি জীবনে প্রথম শিখেছিলেন মাতৃভাষার মতো। রাষ্ট্রভাষা-আয়ত্ত-উদ্যোগের সঙ্গে তার কোনোই যোগ নেই। বাংলা ভাষাচর্চার গভীরে বরং তিনি প্রবেশ করেছেন অনেকটাই রবীন্দ্র-সাহিত্য অনুশীলনের সূত্র ধরে। অহিন্দিভাষী লেখকদের মধ্যে হিন্দিভাষার শ্রেষ্ঠ লেখক হিসেবে তিনি নির্বাচিত হয়েছিলেন গান্ধীপুরস্কারের জন্য। মনে হয়, মহাত্মা গান্ধীর নামে যে পুরস্কারের প্রচলন হল, প্রথম বছর তার প্রাপক হিসেবে তাঁর নির্বাচন তাঁর সুদীর্ঘকালের নিরলস সারস্বতসাধনার জন্যও বটে। এ কথাটাও মনে হয় যে প্রাদেশিক সংকীর্ণতার গন্ডি অতিক্রম করে দেশের প্রদেশগুলির মধ্যে সাহিত্য-সংস্কৃতিগত সংযোগ স্থাপিত হোক, একটি আন্তরিক সৌহার্দ-বন্ধন গড়ে উঠুক, না হলে দেশের সামগ্রিক ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হবে না, বহুদিন থেকেই এ কথা তিনি বোঝাতে চেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ ও বিশ্বভারতীর আদর্শব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এ-সব কথা এসেছে। তাঁর নিজেরও মনের কথা এই। নিবিড় আন্তরিকতায় সারা দেশটাকে নিজে তিনি আপন বলে চিনে নিয়েছিলেন, প্রদেশে প্রদেশে সম্মিলনের পথের নিশানা দেখিয়েছিলেন দেশের মানুষকে। কতবার দেশের হিন্দি বলয়ে ও অন্যান্য স্থানে সমাবর্তন সম্মিলন প্রভৃতি উপলক্ষে ভাষণ দিতে গিয়ে প্রাদেশিক সম্প্রীতির কথা বলেছেন, শিক্ষা প্রভৃতি মূল্যবান বিষয়ে স্বীয় ভাবনা প্রকাশ করেছেন। তাই মনে হয় এ পুরস্কারের জন্য তাঁকে নির্বাচন করার সহজবোধ্য যুক্তি বিচারকমণ্ডলীর সামনে ছিল।

নিজের অন্তরের তাগিদে আজীবন তিনি বাঙালির কাছে ভাষণ ও প্রবন্ধের মাধ্যমে হিন্দি ভাষার যা অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ—প্রাচীন সন্তদের মর্মোপলব্ধির বাণী, তা পৌঁছে দিয়েছেন। ১৯৫২ সালেও তিনি শান্তিনিকেতনে মধ্যযুগীয় ভক্ত কবিদের উপর মনোগ্রাহী ভাষণ দিয়েছিলেন তাঁদের বিচিত্র রচনার দৃষ্টান্ত সহ।[১১৫] এই বছরের শেষের দিকে তাঁকে হায়দরাবাদ যেতে হয়েছিল। হায়দরাবাদের রাজ্য হিন্দিপ্রচারসভার আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন তিনি ও হিন্দিভবনের অধ্যাপক রামপূজন তিওয়ারি তাদের বার্ষিক সমাবর্তন উপলক্ষে। ক্ষিতিমোহন সেখানে উদ্‌বোধনী ভাষণ দিলেন।[১১৬]

দেশিকোত্তম। শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সংঘের অর্ঘ্য দান

১৯৫২ সালেই বিশ্বভারতী তাঁকে দেশিকোত্তম (ডি. লিট.) সম্মানে ভূষিত করেন। ২২ মার্চ ১৯৫২ একটি বিশেষ সমাবর্তন অনুষ্ঠানে যখন মিসেস ইলিনর রুসভেল্ট্‌কে দেশিকোত্তম প্রদান করা হয়, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে দেশিকোত্তম উপাধিদানের সেই প্রথম সূচনা। জাতিগুলির মধ্যে সৌহার্দ ও বন্ধুত্ব স্থাপনের দ্বারা বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যসাধনকল্পে যে অসামান্য কাজ তিনি করেছিলেন, তারই স্বীকৃতিতে এই সম্মান। সে অনুষ্ঠানে যথারীতি

ক্ষিতিমোহন বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ করেছিলেন, প্রণাম জানিয়েছিলেন সকল বন্ধুর মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ বন্ধু তাঁর উদ্দেশে, যিনি অগ্রগামী হৃদয়ের বাণী বহন করে আনেন। তার পরে ডিসেম্বরের সমাবর্তনে তাঁকে ও আচার্য নন্দলাল বসুকে এই সম্মান জানাল বিশ্বভারতী। নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য হয়েছেন পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু আর উপাচার্য রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর। আচার্য এই সমাবর্তনে উপস্থিত থাকতে পারেননি, উপস্থিত ছিলেন ভারতের রাষ্ট্রপতি ড. রাজেন্দ্রপ্রসাদ। তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিদর্শকপদে আসীন তখন, সমাবর্তনে তিনি সভাপতিত্ব করেন। পণ্ডিত নেহরু তাঁর অনুপস্থিতির কারণে দুঃখপ্রকাশ করে আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন ও আচার্য নন্দলাল বসুকে সম্মানজ্ঞাপন প্রসঙ্গে লিখেছিলেন :

> আমি খুশি হয়েছি যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালকমণ্ডলী এই সমাবর্তনে বিশ্বভারতীর দুই প্রবীণ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিত্বকে সাম্মানিক ডক্টর অব লেটার্সে ভূষিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন—মহান শিল্পী শ্রীনন্দলাল বসু ও পণ্ডিত শ্রীক্ষিতিমোহন সেন। তাঁদের সম্মানিত করে বিশ্বভারতী নিজেকেই সম্মানিত করছে, তাঁদের আপনাপন ক্ষেত্রে তাঁদের শ্রেষ্ঠত্বের জন্য এবং গুরুদেবের শিক্ষাদর্শের প্রতি তাঁদের আজীবনের পরম বিশ্বস্ত সেবার জন্য তাঁদের অর্ঘ্য নিবেদন করছে।

বিশ্বভারতীর কর্মসচিব যথাসময়ে যথাবিধি পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেনকে উপাচার্যের নিকট উপস্থাপিত করলেন :

> আমাকে অনুমতি প্রদান করুন, আপনার সম্মুখে পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন মহোদয়কে উপস্থাপিত করতে, যিনি তাঁর বিপুল পাণ্ডিত্য উৎসর্গের দ্বারা, বিদ্যাচর্চার নিমিত্ত তাঁর জীবনব্যাপী সাধনার দ্বারা, ভারতীয় চিন্তা ও সংস্কৃতিচর্চার ক্ষেত্রে স্বীয় বিশিষ্টতায় উল্লেখযোগ্য অবদানের দ্বারা, আমাদের বিদ্বজ্জনসমাজ মধ্যে একটি অনন্য স্থান অর্জন করেছেন।
>
> আমাকে পুনরপি অনুমতি প্রদান করুন, এই সমাবর্তন অনুষ্ঠানে সমবেত বিশ্বভারতীর উচ্চপদাধিকারী-শিক্ষক-কর্মীবৃন্দের এই আন্তরিক ইচ্ছা আপনাকে জ্ঞাপন করতে যে, পণ্ডিত লেখক ও চিন্তাবিদ রূপে তাঁর সবিশেষ গুণাবলীর স্বীকৃতিতে পণ্ডিত সেনকে এই বিশ্ববিদ্যালযের সংবিধিবদ্ধ সর্বোচ্চ সম্মান অর্পণ করা হোক।

উত্তরে উপাচার্য আচার্য ক্ষিতিমোহনকে নিম্নলিখিত ভাষায় সম্বোধিত করলেন :

> পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন, ভারতীয় বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে আপনার সর্বাধিক মূল্যবান কীর্তিসমূহের স্বীকৃতিতে এবং প্রায় অর্ধশতাব্দীব্যাপ্ত কাল ধরে এইদিকে আপনার অবিরত প্রয়াসের দ্বারা আপনি যে আত্মত্যাগপরায়ণ একমুখিনতার অনুপম দৃষ্টান্ত আমাদের সম্মুখে স্থাপন করেছেন তার স্বীকৃতিতে এবং এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতার অনুপ্রেরণাদায়ী পথনির্দেশে আপনি যে সর্বান্তঃকরণে ভারতের ঐতিহ্যিক সংস্কৃতির ব্যাখ্যায় আত্মনিয়োগ করেছেন, যে কাজ বিশ্বভারতীর একটি মৌলিক উদ্দেশ্যের অন্তর্গত,—তা উপলব্ধি করে এবং আমাদের মধ্যযুগীয় সাধকগণের বাণীসমূহের আবিষ্কার সংরক্ষণ ও তাৎপর্য ব্যাখ্যায় আপনি যে মূল্যবান কর্ম করেছেন তারও স্বীকৃতিতে—আমি আপনাকে, আমার উপরে অর্পিত এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদাধিকার বলে, সাম্মানিক দেশিকোত্তম (ডক্টর অব লেটার্স) উপাধি অর্পণ করি।

অতঃপর পণ্ডিত সেনকে উত্তরীয় বিভূষিত করে প্রাচীন পুথির অনুরূপ কাষ্ঠাচ্ছাদনে নিম্নলিখিত উপাধিপত্র প্রদত্ত হল :

> বিশ্বভারতী / বিশ্ববিদ্যালয়তঃ / অদ্য ২০০৮ বিক্রমাব্দীয়-পৌষমাসস্যাষ্টম দিবসে / বার্ষিক সমাবর্তনোৎসবে / দেশিকোত্তম / ইত্যুপাধিনানর্ঘেণার্ঘ্যেণাত্রভবতো / বয়ংসম্ভাবয়াম ইতি / শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুরঃ / বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়স্যোপাচার্যঃ।।[১১৭]

আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন বা শিল্পাচার্য নন্দলাল বসুর মতো মানুষ দেশিকোত্তম উপাধিভূষিত হলে অথবা গান্ধীপুরস্কার লাভ করলে তার দ্বারা তাঁদের পরিচয়ে নতুন বিশেষণের অলংকার যোগ হয় না, সে কথা বলা বাহুল্য। মানুষের কাছ থেকে মর্যাদা বা পুরস্কারপ্রাপ্তি সম্বন্ধে নানা সময়ে নানা উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ তাঁর মতামত জানিয়েছেন। একটি ভাষণে বলেছিলেন : 'সম্মানের জন্য মানুষ শিরোপা প্রার্থনা করে এবং তার প্রয়োজনও থাকতে পারে, কিন্তু শিরোপা দ্বারা মানুষের মাথা বড়ো হয় না। আসল গৌরবের বার্তা মস্তিষ্কেই আছে, শিরোপায় নেই।'[১১৮]

১৯৫৩ সালে প্রয়াগে অনুষ্ঠিত হিন্দি সাহিত্য সম্মেলন ক্ষিতিমোহনকে মুরারকা পুরস্কার দিয়ে সম্মান জ্ঞাপন করেন।[১১৯] ১৯৫৪ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সরোজিনী বসু স্বর্ণপদক লাভ করেন তিনি, এত-সব সত্ত্বেও ক্ষিতিমোহনের আসল গৌরবের বার্তা এর কোনোটির মধ্যেই নেই, সে আছে অন্য আর কোথাও।[১২০]

বিশ্বভারতী ক্ষিতিমোহনকে দেশিকোত্তম দিলেন, আর সেই সময়ই শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সংঘ তাঁকে অর্ঘ্যদান করলেন। সেই ৭ পৌষ ১৩৫৯ তারিখের সভায় আচার্যের প্রতিভাষণে ক্ষিতিমোহন বলছেন :

> হে আয়ুষ্মানগণ, তোমাদের শ্রদ্ধা-প্রীতি অমৃতের মত। কিন্তু সম্মান জিনিসটি বড় সাংঘাতিক, সেই কালকূটকে নীলকণ্ঠ ছাড়া কে কণ্ঠে ধারণ করতে পারে?
>
> এখানে সম্মানের আসল পাত্র গুরুদেব। তাঁরই একটি কবিতা আজ মনে আসছে—
>
> রথযাত্রা, লোকারণ্য, মহাধুমধাম,
ভক্তেরা লুটায়ে পথে করিছে প্রণাম।
পথ ভাবে আমি দেব, রথ ভাবে আমি,
মূর্তি ভাবে আমি দেব, হাসে অন্তর্যামী।
>
> এখানে আমার আবার সম্মানের কথা কি? আমরা তাঁর সাধনা নিয়েই অগ্রসর হয়েছিলাম।

নিজের প্রসঙ্গে তিনি এই প্রতিভাষণে যা বলেছিলেন, তার দু-এক কথা এই জীবনীগ্রন্থের কোথাও কোথাও প্রসঙ্গক্রমে পূর্বে উল্লেখ করেছি। তাঁর দৃষ্টিতে দেখলে :

> যাঁদের পরামর্শে গুরুদেব আমাকে এখানে ডেকেছিলেন তাঁরা আমাকে তাঁদের প্রীতির দৃষ্টিতে অনেক বড় করে দেখেছিলেন। তাই গুরুদেব আমার কাছে অনেক অসঙ্গত উচ্চ আশা করেছিলেন। তাঁর আশার অনুরূপ কিছু করা আমার সাধ্যের অতীত ছিল, তবু তিনি আমাকে দিয়ে যতটুকু কাজ করিয়েছিলেন ততটুকুও সম্ভব হয়েছিল শুধু তাঁর নিজের গুণে। সেই গৌরবের কোনো দাবী আমার নেই। সবই ঘটেছে তাঁরই মহত্ত্বে।[১২১]

সব গৌরবের দাবিহীন এই মানুষটাকে নিরুপাধিক মনে করতে পারলেই ভালো হত। তাঁর গৌরবের আসল বার্তাটির সন্ধান তাঁর জীবনপথের কোন্ বাঁকে যে মিলবে তার হদিস পাওয়াও তো সহজ নয়। তবে সেই যে ড. হাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী 'সংস্কৃতি সংগম'-এর লেখক-পরিচিতিতে লিখলেন আচার্য ক্ষিতিমোহন শান্তিনিকেতনের কুলস্থবির রূপে আশ্রমবাসীদের কর্মপ্রেরণা দিচ্ছেন, সেই অবধি কুলস্থবির উপাধিটি তাঁর নামের অনুষঙ্গ রচনা করল যেন। প্রায় ওর কাছাকাছি সময় থেকেই 'বিশ্বভারতী নিউজ'-এ এই অভিধা তাঁর নামের আগে মাঝে মাঝেই ব্যবহার করা হয়েছে। ১৯৫২ সালের মাঝামাঝি যুগান্তর পত্রিকায় 'বিশ্বভারতীর প্রথম কুলস্থবির' নামে একটি রচনা প্রকাশিত হয়েছিল, আচার্য ক্ষিতিমোহন সেনের জীবিতকালে কোনো সাময়িক বা সংবাদপত্রে সহজ ভাষায় তাঁর একটি সম্পূর্ণ পরিচয় দেওয়ার সেই প্রথম চেষ্টা। লেখাটি সুধীরচন্দ্র করের। তখন রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর দশ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। তাঁর জীবন ও কর্মের দিগ্‌দিগন্ত সন্ধানের ঔৎসুক্য এবং সচেতনতা ধীরে ধীরে বাড়ছে বলেই হয়তো এই প্রবন্ধের শুরুতে লেখক এ কথাটা লেখবার তাগিদ বোধ করেছেন :

> রবীন্দ্রনাথ কী ধরনের লোক সংগ্রহ করেছিলেন, তাঁদের সঙ্গে তাঁর কী রকমের যোগাযোগ ঘটেছিল, লোকসমাজই বা তাঁদের থেকে কী পেয়েছে, বাহিরে শান্তিনিকেতনের দান কোন কোন দিক দিয়ে কতখানি, এসব জানবার বেলায় আশ্রমের এই বিখ্যাত লোকদেব জীবন ও কার্যাবলীর প্রতিই আগে দৃষ্টি পড়া স্বাভাবিক।

এইটুকু বলে প্রবন্ধের বিষয়বস্তুর মধ্যে সরাসরি প্রবেশের পথ করে নিয়েছেন লেখক :

> আশ্রমে এরূপ যে দু একজন ব্যক্তি বর্তমান আছেন, আচার্য শ্রীক্ষিতিমোহন সেন তাঁদের মধ্যে অগ্রণী বলা যেতে পারে। বিদ্যাভবনের অধ্যক্ষপদ ছেড়ে সম্প্রতি তিনি বিশ্বভারতীর কুলস্থবির পদে আসীন।[১২২]

১৯৫২ সালটি ক্ষিতিমোহন-কিরণবালার জীবনে আর-একদিক থেকেও বিশিষ্ট এবং স্মরণীয়। এই বছরে তাঁদের বিবাহের পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হল। এই উপলক্ষে একটি চমৎকার পারিবারিক উৎসবের আয়োজন হয়েছিল সন্তান ও সন্তানস্থানীয়দের এবং নাতি-নাতনিদের উদ্যোগে। নাতি-নাতনিদের নামে নিমন্ত্রণের চিঠি ছাপা হয়েছিল বিয়ের চিঠির মতো। সে-সময় শান্তিনিকেতনের আশ্রমজীবনে রথীন্দ্রনাথ অনেকের চোখেই পতিত বলে গণ্য হচ্ছেন। এই বিবাহবার্ষিকীর প্রাক্কালে কর্মকর্তারা কয়েকজন ক্ষিতিমোহনের বাড়ির বারান্দায় বসে যখন নিমন্ত্রিতদের তালিকা ঠিক করছিলেন, রথীন্দ্রনাথকে বাদ দেওয়ার কথা ওঠে। শুনতে পেয়ে কিরণবালা রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এলেন, খুন্তিখানা হাতেই আছে। 'রথীবাবুকে তোমরা নিমন্ত্রণ করবে না?' প্রশ্নের উত্তরটা নেতিবাচক পেয়ে বললেন 'তাহলে আমি যাব নিমন্ত্রণ করতে। অমিতা, আমার ফর্সা কাপড়খানা দে তো।' তখন কর্মকর্তারা তাঁকে থামাবার পথ পান না, উপায় রইল না রথীন্দ্রনাথকে না বলে। রথীন্দ্রনাথ বিবাহবার্ষিকীর দিনে সবার আগে এসে হাজির হয়েছিলেন, অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে খুব

আনন্দ করেছিলেন, মালাবদল করিয়েছিলেন দুজনের।[১২৩] এ বোধ করি এত দীর্ঘকালের সম্পর্কের প্রতি এক ধরনের বিশ্বস্ততা ও আনুগত্য, বন্ধুত্বের বন্ধনও। তাঁদের বাড়িতে আনন্দ-উৎসব হবে, গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের পুত্র রথীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণ থাকবে না সেখানে, এ কথা কিরণবালা ভাবতেই পারেননি। বলা বাহুল্য রথীন্দ্রনাথও সাড়া দিয়েছিলেন আনন্দিত মনে। যাহ হোক, ক্ষিতিমোহন-কিরণবালার বিবাহের সুবর্ণজয়ন্তী উৎসবের যে বিবরণটুকু বিশ্বভারতী নিউজ-এ বেরিয়েছিল, সেটি এখানে বাংলা অনুবাদে তুলে দেওয়া যেতে পারে :

> কুলস্থবির পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন ও শ্রীমতী কিরণবালা সেনের বিবাহের সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে তাঁদের গৃহে একটি মনোরম উৎসবের আয়োজন করা হয়। যদিও আমাদের এখন গীষ্মাবকাশ চলছে, তবু এই উপলক্ষে শ্রদ্ধেয় দম্পতিকে সংবর্ধনা জ্ঞাপনের জন্য বন্ধু আত্মীয় ও গুণগ্রাহিদের বেশ বড়ো সমাবেশ সেদিন হয়েছিল।[১২৪]

এখনও আশ্রমই দাবিদার

১৯৫৩ সাল। দীর্ঘদিন ধরে আশ্রমজীবনের তালে তাল মিলিয়ে ক্ষিতিমোহনের জীবনটা যেমন চলছিল, এ বছরের শুরুটাও তেমনই ছিল। বছর শেষ হওয়ার আগেটাতে বড়োদিন, পরলোকগত আশ্রমবন্ধু-স্মরণসভা ইত্যাদি উপলক্ষে উপাসনা, সভাপতিত্ব করে এসেছেন, যেমন তিনি করে থাকেন। নতুন বছর পড়তেও তেমনই চলছিল— মহর্ষিদেবের তিরোধানদিবস, মহাত্মা গান্ধীর প্রয়াণদিবস, শ্রীনিকেতন বার্ষিক উৎসব, বর্ষশেষ ও নববর্ষ উৎসব, রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন। ২৫ বৈশাখ সকালে মহর্ষিভবনে রবীন্দ্রজন্মোৎসবের উদ্‌বোধন-অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন গ্রহণ করলেন। এগুলি প্রায় সবই তাঁর বাৎসরিক কৃত্য। এর মধ্যে মার্চ মাসে পূর্বপল্লিতে এন.সি.সি.-ভবনের ভিত্তিপ্রস্তরস্থাপন অনুষ্ঠান হল, অনেক সরকারি উচ্চপদাধিকারী ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। শিলান্যাস করলেন হীরালাল মূলজিভাই পটেল, ভারত সরকারের প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের সচিব। এখানে যে গৃহ নির্মিত হবে ক্ষিতিমোহন তার নামকরণ করেছেন কুমারসদন। তিনি ঋগ্‌বেদের সংগচ্ছধ্বং ও অথর্ববেদের অভয়মন্ত্র উচ্চারণ করে তাঁর সভাপতির ভাষণে এ নামের তাৎপর্যটুকু বিশ্লেষণ করলেন, কালিদাসের কুমারসম্ভবম্ নাটকের কাহিনিপ্রসঙ্গ উল্লেখ করলেন তার পর। যখন দেবরাজ্য অসুর কবলিত হল, সেই আগ্রাসী শক্তির হাত থেকে যিনি মুক্তি দেবেন, সেই বীরের আবির্ভাবের জন্য দেবতারা তপস্যায় রত হলেন। এর প্রসাদে জন্ম হল কুমার কার্তিকেয়ের। তিনি সৌন্দর্য ও সৌকুমার্যেরও প্রতীক। এমন অনেক মানুষ আছে যারা বীরত্ব ও সাহসিকতার সঙ্গে সৌন্দর্য ও সুকুমারবৃত্তির এই সমন্বয়ের রহস্য বুঝতে পারে না। তারা ভাবে যে উপাদান বীর ও সাহসীদের গড়ে তোলে সে বুঝি একেবারেই অনমনীয়। কিন্তু প্রকৃতির পথ ভিন্ন পথ। সেখানে দেখি বিশাল গাছের গুঁড়ি থেকে যে শক্ত

কাঠ পাওয়া যায় সে গাছের জন্ম অতি সুকুমার ফুল থেকে। তাই ন্যাশনাল ক্যাডেট কোরের যে তরুণ বীরদের জন্য এই ভবন তার নাম কুমারসদন দিয়ে আমরা এই আশা ব্যক্ত করতে চেয়েছি যে এই তরুণরা তাদের বাহুবলের সঙ্গে হার্দিক গুণাবলির সম্মেলন সম্ভব করবে, তাদের সাহস ও সংবেদনশীলতা হাতে হাত মিলিয়ে চলবে। একমাত্র এই পথেই এন.সি.সি.-র মতো সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার সামঞ্জস্য ঘটতে পারে এ দেশের ঐতিহ্যগত জলহাওয়ার।[১২৫]

পরের মাসে এক সন্ধ্যায় একটি বক্তৃতা দিতে হয়েছিল। তখন বিশ্বভারতীর তত্ত্বাবধানে বিনয়ভবনে একটি বিশেষ প্রশিক্ষণ পাঠক্রমের ক্লাস চলছিল। এপ্রিল-মে মাসে আমন্ত্রিত বিশিষ্ট বক্তারা এসে শিক্ষার্থীদের কাছে বিভিন্ন বিষয়ে বললেন। তাঁদের মধ্যে ক্ষিতিমোহনও একজন। বিশ্বভারতী নিউজ লিখেছে :

> কুলস্থবির ক্ষিতিমোহন সেন 'ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাস' সম্বন্ধে একটি কৌতূহলোদ্দীপক বক্তৃতা দেন।[১২৬]

এর আগে মার্চ মাসের ১৭ তারিখে সন্ধ্যাবেলা সংগীতভবনে একটি বিশেষ সভার আয়োজন করেছিলেন শান্তিনিকেতনের কর্মীমণ্ডলী আচার্য ক্ষিতিমোহনকে কেন্দ্র করে, সেটি উল্লেখযোগ্য। দেশিকোত্তম ক্ষিতিমোহন সেন, সুদীর্ঘ চুয়াল্লিশ বছর ধরে যিনি একটানা আশ্রমের সেবা করে এসেছেন, তাঁর সেই অমূল্য সেবার প্রতি গভীর শ্রদ্ধার বোধ নিয়ে সকলে মিলিত হয়েছিলেন। অবশ্য এ সভার বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া গেল না, এইটুকু উল্লেখ পেলাম যে কর্মীমণ্ডলীর সম্পাদক উপেন্দ্রকুমার দাস বিশ্বভারতীর কর্মী ও শিক্ষকদের পক্ষ থেকে পণ্ডিত সেনকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করলেন এবং পণ্ডিত সেন পুরোনো আশ্রমের স্মৃতিচারণ প্রসঙ্গে ছোটো-বড়ো নানা কাহিনি শোনালেন।[১২৭]

সে বছর বাইশে শ্রাবণের মন্দির-উপাসনায় ক্ষিতিমোহন যখন আচার্যের আসনে বসলেন, তাঁর মন ব্যক্তিগত শোকের বেদনায় বড়ো পীড়িত ছিল। আগের রাতেই খবর এসেছিল বড়োজামাই হরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের মৃত্যু হয়েছে। খবর পেয়ে কিরণবালা সহ বাড়ির সকলেই কলকাতায় চলে গিয়েছিলেন। পরদিন ২২ শ্রাবণ বলেই যেতে পারেননি ক্ষিতিমোহন। এবার ৮ আগস্ট রবীন্দ্রনাথের দ্বাদশতম মৃত্যুবার্ষিকী। সকালে মন্দিরে 'পণ্ডিত সেন মৃত্যুর তাৎপর্য এবং সৃষ্টিপ্রক্রিয়ায় তার অবস্থান ব্যাখ্যা করলেন।' তিনি বললেন :

> মৃত্যু বিলয় নয়, মর্তলোক ছেড়ে চলে গেল যে আত্মা, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জীবনের মধ্যে এই পৃথিবীতেই সে জীবিত থাকে। যতই আমরা গুরুদেবের আদর্শগুলি সম্পূর্ণ ও সার্থক করে তোলবার দিকে যাব, ততই তাঁকে আমাদের নিকটতর সান্নিধ্যে পাব।[১২৮]

পত্রিকার সংক্ষিপ্ত বিবরণ থেমে যায় এইখানেই, এবং এ কথাও মনে হবেই যে এ-সব কথা আরও বহুবার বলেছেন ক্ষিতিমোহন, কিন্তু এও যেন অনুভব করা যায় যে, মৃত্যুপ্রসঙ্গ

আলোচনা করতে করতে সেদিন তিনি প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্র থেকে সময়োপযোগী মন্ত্র আবৃত্তি করছেন যত, যত উদ্ধৃতি দিচ্ছেন রবীন্দ্র-রচনা থেকে, ততই পুত্রসম প্রিয়জনবিয়োগের প্রেক্ষাপটে মৃত্যুর স্বরূপ ধ্যান করছে তাঁর অন্তরাত্মা।

সেই দিনই রবীন্দ্রসপ্তাহ উদ্‌বোধন করার কথা ছিল তাঁর এবং তিনিও প্রস্তুত ছিলেন সে দায়িত্ব পালনের জন্য। শুনেছি, বেলা হতে সকলেই জেনেছিলেন তাঁর পরিবারের অঘটনের খবর। তখন বিশ্বভারতী-পরিচালকমণ্ডলীর তরফ থেকে সুরেন্দ্রনাথ কর তাঁর বাড়িতে এসে দুঃখপ্রকাশ করেন এবং তখনকার মতো আর সব দায়িত্ব থেকে অব্যহতি দিয়ে যান। বিশ্বভারতী নিউজ-এ যে লেখা হয়েছে : 'বাড়িতে অপ্রত্যাশিত মৃত্যুজনিত শোকসন্তাপের কারণে ক্ষিতিমোহন সেন রবীন্দ্রসপ্তাহের উদ্‌বোধন করতে উপস্থিত হতে পারেন নি'।[১২৯] তার পিছনে কিন্তু এই অনুক্ত কথাটুকুও আছে।

রবীন্দ্রসপ্তাহান্তে ক্ষিতিমোহন অবশ্য শেষদিনে সংক্ষিপ্ত সমাপ্তিভাষণে রবীন্দ্র-জীবনাদর্শের মর্মার্থ বিশ্লেষণ করেন। সেবার রবীন্দ্রসপ্তাহের আলোচ্য বিষয় ছিল কবির জীবনসাধনা, তাঁর মূল্যবোধের দুনিয়ার বিশিষ্টতা :

> তিনি বলেন যে-ভাবে গুরুদেব সৃষ্টির সৌন্দর্য ও ঐক্য দেখে তাতে সাড়া দিয়েছেন, তাঁর জীবনদর্শনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক সেটাই। মধ্যযুগীয় সাধক-কবি রজ্জবের বাণী উদ্ধৃত করেন পণ্ডিত সেন—এই সৌন্দর্যময়ী সৃষ্টির আনন্দরস যাঁরা পান করেন, তাঁরা আবার সেই প্রাপ্তির জবাব দেন নিজেরাও সৃষ্টিরই পথ ধরে। কেউ কথা দিয়ে, কেউ ছন্দ দিয়ে, কেউ আবার বর্ণ ও রেখা দিয়ে। কোনো সাধক আবার সাড়া দেন নিজের ভিতর থেকে তাঁর সমগ্র জীবনটি সৃজন করে তুলে। ড. সেন বলেন, গুরুদেব সাড়া দিয়েছিলেন এই সবগুলি পথেই এবং তাঁর এই সাডাব যে-গভীরতা সেই গভীরতাই প্রমাণ দেয় তাঁর জীবন ও দর্শনের সমৃদ্ধির।[১৩০]

ক্ষিতিমোহনের সত্তার কেন্দ্রে আছেন রবীন্দ্রনাথ, আছেন কবীর-দাদূ-রজ্জব-রবিদাস-বাউলের দল। চিরজীবন কাটল তাঁদের সাধনা ও উপলব্ধির সত্যসন্ধানে। যে অমৃত পান করে নিজে ধন্য হয়েছেন, তারই আস্বাদ দিতে চেয়েছেন সকলকে। ক্রমশ জীবননদীও এগিয়ে চলেছে সমাপনের মোহনার দিকে। অবশ্য স্বাস্থ্য বেশ ভালোই, কর্মক্ষম, তবু বয়সটাও হল তিয়াত্তর। এমন সময় হঠাৎ যদি শোনা যায় ক্ষিতিমোহন সেন বিশ্বভারতীর উপাচার্য হয়েছেন, একটু অবাক হওয়ারই কথা। অবশ্য দায়িত্বটা খুব সাময়িককালের জন্যই, তবু এতকাল পরে এরকম একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক পদে তাঁকেই কেন নির্বাচন করা হল, তারও তো নিশ্চয় কোনো কারণ ছিল। যাই হোক, আমরা মুদ্রিত আকারে যেটুকু তথ্য পাচ্ছি সেইটুকুই আলোচনা করবার অধিকারী। সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত কারণে উপাচার্য রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর পদত্যাগ করেছিলেন। বিশ্বভারতী নিউজ লিখেছে :

> কিছুদিন যাবৎ শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বাস্থ্য ভালো যাচ্ছে না। যেহেতু তাঁর এই অবিরত অসুস্থতা উপাচার্যের মতো দায়িত্বপূর্ণ পদের কাজকর্মে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে. . . তিনি স্বাস্থ্যের কারণে গত মে মাসে পদত্যাগপত্র দাখিল করেন এবং জুলাই মাসে তা পরিদর্শক কর্তৃক গৃহীত হয়। আচার্যের অনুরোধে শ্রীযুক্ত ঠাকুর তাঁর অফিসের কাজকর্ম আরও কিছুকাল দেখাশোনা করেন এবং অবশেষে আচার্যের অনুমতিক্রমে ২২ আগস্ট দায়িত্ব হস্তান্তরিত করেন।

শ্রীযুক্ত ঠাকুর ২৪ আগস্ট শান্তিনিকেতন ত্যাগ করেন।

কর্মসমিতির একটি প্রস্তাবক্রমে পরিদর্শক অন্তবর্তীকালীন উপাচার্য হিসাবে ড. ক্ষিতিমোহন সেনের নাম অনুমোদন করেন। ড. সেন সংসদের পরবর্তী অধিবেশন পর্যন্ত এই দায়িত্বে থাকবেন।[১৩১]

উপাচার্যের দায়িত্ব গ্রহণ করে ক্ষিতিমোহন প্রথম যে বিবৃতি দেন তা থেকে কেন তিনি এই দায়িত্ব নিলেন তার ধারণা করা যায়। সেই বক্তব্যের অনুবাদ করে দিচ্ছি :

উপাচার্য ড. ক্ষিতিমোহন সেনেব বাণী

একথা বলা নিতান্ত বাহুল্য যে, যতদিন বিশ্বভারতী অ্যাক্টের প্রতিবিধান অনুসারে একজন স্থায়ী দায়িত্বাধিকারী নির্বাচিত না হন, সেই অন্তর্বর্তীকালের জন্য বিশ্বভারতীর উপাচার্য হিসাবে আমার নিয়োগে আমি অত্যন্ত সম্মানিত বোধ করেছি।

স্বাস্থ্যের কারণে শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অকাল-অবসর গ্রহণ, যার জন্য অন্তর্বর্তীকালীন উপাচার্য নিয়োগের প্রয়োজন হল, খুবই দুঃখজনক ঘটনা। এই প্রতিষ্ঠানের সূচনা থেকে রথীন্দ্রনাথ এর সঙ্গে যুক্ত। আমাদের সকলের পক্ষেই এটা আনন্দের কথা যে, এই শিক্ষায়তনের যিনি প্রথম ছাত্র তিনিই এর প্রথম উপাচার্য হয়েছিলেন। অত্যন্ত পরিতোষের কারণ ঘটত যদি তিনি যথাবিধি তাঁর কর্মকাল অবসানে অবসরগ্রহণ করতেন। যাই হোক যে দীর্ঘকাল তিনি এর সমস্ত কর্মের হাল ধরেছিলেন সে-সময় তিনি তাঁর 'আলমামেটার'-এর সেবায় যে-মূল্যবান কাজ করেছেন, এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কর্মীরা সে-কাজ সকৃতজ্ঞ অন্তরে স্মরণে রাখবেন। এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি এত অজস্র বন্ধনে বাঁধা এবং সে বন্ধন এতই দৃঢ় যে তা হঠাৎ এক কথায় ভেঙে যেতে পারে না। এটা সান্ত্বনার কথা, আশ্রমবাসীদের কাছে দেওয়া তাঁর বিদায়ী ভাষণে তিনি তাদের এই আশ্বাস দিয়েছেন যে বিশ্বভারতীর মঙ্গল নিয়ে তাঁর আগ্রহ চিরদিন থাকবে।

এই পদ, যে-পদ আমার প্রার্থিত ছিল না, আমি গ্রহণ করছি এই বিদ্যায়তনের একজন বয়োজ্যেষ্ঠ মানুষ হিসাবে আমার প্রতি ন্যস্ত বিশ্বাসের কারণে এবং সেই সঙ্গে আশা করছি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ একজন স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগের কাজ ত্বরান্বিত করবেন। বিশ্বভারতী, যা গুরুদেবের আদর্শগুলির পূত ভাণ্ডার বলতে পারি, তার চেয়ে প্রিয় আমার কাছে কিছু নেই। যদিও আমার এই বয়সে আর এ ধরনের গুরুভার দায়িত্বগ্রহণ কষ্টকর, তবুও আমি আমার এই অল্পকালের কার্যকালে এই বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখতে যথাসাধ্য করব, জীবনের শ্রেষ্ঠকাল যে প্রতিষ্ঠানের সেবা করবার গৌরব আমি লাভ করেছি। এইটুকু কেবল বলব, এই বিশাল দায়িত্ব সম্পাদনে এই প্রতিষ্ঠানের সমস্ত ছাত্র শিক্ষক ও কর্মীদের সর্বান্তঃকরণের সহযোগিতা আমার একান্ত প্রয়োজন। আশা করি সেই সহযোগিতা আমি পূর্ণমাত্রায় পাব।[১৩২]

এ বছর আগস্ট মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে পরের বছরের অর্থাৎ ১৯৫৪ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত উপাচার্যপদের দায়িত্ব বহন করেছিলেন ক্ষিতিমোহন। ১৯৫৪ সালে বিশ্বভারতীর উপাচার্য পদে নিযুক্ত হন ড. প্রবোধচন্দ্র বাগচী। ১৯৫৩ সালের শারদাবকাশের আগে ৫ অক্টোবর উপাচার্য ক্ষিতিমোহন সেন সিংহসদনে বিশ্বভারতীর সমস্ত কর্মীকে একটি সভায় আহ্বান করেছিলেন। সেই সমাবেশে তিনি যে কথাগুলি বলেছিলেন তার বিবরণ থেকে বোঝা যায় বিশ্বভারতীকে এক ভয়ানক আত্মখণ্ডনের পথ থেকে ফেরাবার জন্য,

তাকে এক আত্মবিনষ্টির সর্বনাশ থেকে বাঁচাবার জন্য তিনি যেন শেষ চেষ্টা করে দেখছেন। কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃতি লাভ করবার পর থেকে বিশ্বভারতীর সর্বস্তরে যে বিপজ্জনক প্রবণতা লক্ষ করা যাচ্ছে, তারই প্রেক্ষিতে যে এ-সব কথা বলা একান্ত আবশ্যক হয়ে উঠেছিল তাতে সন্দেহ নেই। তাঁর ভাষণে দুটি বিষয়ের উপর জোর পড়ল . এক, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবন ও বিভাগগুলির কাজকর্মের সমন্বয়বিধানের জন্য তাদের মধ্যে অন্তরঙ্গ সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা ; দুই, বিশ্বভারতীর কতকগুলি অনুপম বৈশিষ্ট্য ও ঐতিহ্যের সংরক্ষণ, যেগুলি ভারতের সংস্কৃতিগত ও জাতীয় নবজাগরণের ক্ষেত্রে তার বিশিষ্ট অবদান বলে স্বীকৃতি লাভ করেছে। উপাচার্যের অনুরোধে রবীন্দ্রনাথের একটি প্রাসঙ্গিক ভাষণ* সভায় পড়ে শোনানো হয়। সেই ভাষণে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের কর্মীবৃন্দের প্রতি আন্তরিক ঐক্যবন্ধন গড়ে তোলবার আবেদন জানিয়েছিলেন, তা সে কর্মী যে বিভাগেরই হোন, বা যে দায়িত্বপালনেই রত থাকুন। উপাচার্য নিজেও সেই আবেদনেরই পুনরুচ্চারণ করলেন। এই বিশ্বভারতীর সব মানুষ—যাই হোক তার দায়িত্ব, যে পদেই তিনি কাজ করুন, যেন পারস্পরিক সহযোগিতার বন্ধনে বাঁধা থাকেন। সকলের মধ্যে সামাজিক মেলামেশা ও ভাববিনিময়ের ধারা যেন অব্যাহত থাকে; না হলে কেবল স্বকর্তব্য পালন অর্থহীন ও যান্ত্রিক হয়ে পড়বে। একটি বৃহৎ ও অভিন্ন আদর্শের সম্পূর্ণতাসাধনে অবিচল ও সুসমঞ্জস অগ্রগতির সঙ্গে যোগ থাকবে না তার।

এই আবেদন জানাবার আগে ক্ষিতিমোহন সেদিন বলেছিলেন বিশ্বভারতীর কতকগুলি স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্য আছে। এই বৈশিষ্ট্যগুলি কী, আশ্রমের গোড়ার দিনগুলি থেকে কীভাবে এই বৈশিষ্ট্যগুলির প্রচলন হল এবং একটি আদর্শ গড়ে উঠল, গুরুদেব ও তাঁর কাজের সঙ্গে যাঁরা অন্তরঙ্গ সম্পর্কে জড়িয়ে ছিলেন তাঁরা তা জানেন। ক্ষিতিমোহনের বলার কথাটা এই ছিল যে, বিশ্বভারতী তার স্বাতন্ত্র্যগুণেই 'জাতীয় প্রতিষ্ঠান' বলে স্বীকৃতি পেয়েছে। সুতরাং এটা খুবই বেদনার ও দুর্ভাগ্যের কথা হবে যদি নতুন মর্যাদা লাভ করে নিজেকে সে সেকেলে ছাঁচেই ঢালাই করতে চায়। যে কর্মসূচি অবলম্বন করে প্রতিদিন আমরা একটা সুদৃঢ় এবং সক্ষম ভূমির উপর দাঁড়িয়েছিলাম, তা হলে তো সেই কর্মসূচিটাই হারিয়ে যাবে। অন্য অনেক পুরোনো সুপ্রতিষ্ঠিত জ্ঞানচর্চাকেন্দ্র আছে যা আয়তনে বিশাল। তাদের আয়তন বা বহুমুখিনতা আমরা আয়ত্ত করতে পারব না। সত্য বলতে কী, যদি আমরা আমাদের স্বকীয় প্রকৃতিগত সাদাসিধা চরিত্র বিসর্জন দিয়ে বৃহদায়তনের অন্ধ মোহের দিকে ঝুঁকি, সে একেবারে নিরর্থক হবে। একজন ব্যক্তিরও যেমন তেমনই একটি প্রতিষ্ঠানেরও মধ্যে ক্রমে ক্রমে কতকগুলি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বিকশিত হয়ে ওঠে। সে বৈশিষ্ট্য কখনোই কারও কর্কশ হস্তক্ষেপ কিংবা সুনির্দিষ্ট কোনো ছকের নিয়ন্ত্রণ সহ্য করে না।[১৩৩]

* ২ আগস্ট ১৯৩৭ প্রদত্ত ভাষণ। বিশ্বভারতী পত্রিকা, প্রথম সংখ্যা, একাদশ খণ্ড।

কোনো আপাত লোভে চরিত্রবদল করতে গেলে বিশ্বভারতী যে অচিরেই নিজের বিনাশের পথে পা বাড়াবে—এই সাবধানবাণী সেদিন উচ্চারিত হচ্ছিল ক্ষিতিমোহনের কণ্ঠে, তাঁর আবেদন ছিল এই পথ থেকে যেন বিশ্বভারতী বিরত থাকে। তাঁর মতো বর্ষীয়ান অভিজ্ঞ দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মানুষেরা যে বিপদের সম্ভাবনা প্রত্যক্ষ করেছিলেন চোখের সামনে, তখনও বাইরে তার প্রকাশ অনেকটাই অস্পষ্ট। ভিতরে ভিতরে একটা বিচ্ছিন্নতা, একটা বিশ্বভারতীর প্রকৃত উদ্দেশ্য ও আদর্শ দেখতে না-পাওয়া আত্মকেন্দ্রিকতা যে দেখা দিয়েছে এবং ব্যাধির মতো ছড়িয়ে পড়ছে, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই তো তা বুঝতে পারছিলেন। আর এখন বিশ্বভারতীর কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর যে আশীর্বাদ নয়, অভিশাপ, তারও সংকেত ধরা পড়েছিল ক্ষিতিমোহনের মতো মানুষদের কাছে। এই ভাষণে তার প্রমাণ রয়ে গেছে।

উপাচার্য হলেও কুলস্থবিরের ভূমিকা তাঁর আগের মতোই ছিল। ইন্দিরা দেবীর জন্মদিনে গীতবিতানের অর্ঘ্যদান অনুষ্ঠানে বা শিল্পাচার্য নন্দলাল বসুকে শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সংঘের অর্ঘ্যদান অনুষ্ঠানে বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ তো আছেই, ২৩ ডিসেম্বর ৭ পৌষের উপাসনা করলেন যথারীতি, সেই দিনই উপাচার্য হিসাবে সমাবর্তনে প্রধান অতিথি বিচারপতি সুধীরঞ্জন দাসকে প্রত্যুদ্‌গমন করলেন, এককালে যিনি এই ব্রহ্মচর্যাশ্রমে তাঁদের ছাত্র ছিলেন। স্বাগতভাষণে প্রগাঢ় আন্তরিকতায় সকল শুভানুধ্যায়ীর প্রতি বিশ্বভারতীর চারপাশে সমাবিষ্ট হয়ে এর লক্ষ্যসাধনে সচেষ্ট ও সহায়ক হতে আহ্বান জানালেন। ২৪ ডিসেম্বর সকালবেলা আম্রকুঞ্জে আশ্রমবন্ধু-স্মরণদিবসের সভায় প্রীতি ও শ্রদ্ধায় স্মরণ করলেন পরলোকগত আশ্রমিকদের। ২৫ ডিসেম্বর হোরেস আলেকজান্ডার দিলেন বড়োদিনের ভাষণ। আচার্যের আসনে বসে ক্ষিতিমোহন প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করলেন উপনিষদ ও খ্রিষ্টবাণীর গভীর সাদৃশ্য এবং নানা ধর্ম ও মানবজাতির সাম্যের কথা।

শিশুরঞ্জনীর কাজ থেমে যাওয়ার পর থেকে ছ-বছরের কম বয়সের শিশুদের উপযুক্ত শিক্ষার কোনো ব্যবস্থা শান্তিনিকেতনে ছিল না এবং তার প্রয়োজন অনুভব করা যাচ্ছিল খুব তীব্রভাবেই। ইতিমধ্যে আলাপিনী মহিলা সমিতি যখন এমন একটি শিশুবিদ্যালয়ের পরিচালনভার নিতে রাজি হলেন, প্রতিমা দেবী তখন সানন্দে 'শ্যামলী' ছেড়ে দিলেন এই কাজের জন্য। ২৬ জানুয়ারি ১৯৫৪ সকালে এই শিশুশিক্ষাকেন্দ্রের উদ্‌বোধন হল। উল্লেখ পাচ্ছি এই উপলক্ষে আশীর্বাদ জানিয়ে ক্ষিতিমোহন একটি দীর্ঘ পত্র লিখেছিলেন ইন্দিরা দেবীকে।

শ্রীনিকেতনের বার্ষিক উৎসবে তো বরাবর উপস্থিত থাকেন। বত্রিশ বছর পূর্ণ হল তার। এ বছরে উৎসবের আগেটাতেই প্রয়াগে কুম্ভমেলায় সেতু ভেঙে পড়ে ভয়ানক বিপর্যয় ঘটেছে, মৃত্যু হয়েছে বহু মানুষের। উপাচার্য ক্ষিতিমোহন তাঁর সভাপতির ভাষণে এই বেদনাবহ ঘটনার উল্লেখ করেন, আর সেই সঙ্গেই দ্বিধাহীন কণ্ঠে নিন্দা করেন সেই কুসংস্কারের, যা এক বিশেষ দিনে এক বিশেষ স্থানে স্নান করার এতখানি মূল্য দেয়। তিনি বলেন মহৎ উদ্দেশ্যের প্রতি বিশ্বাসের বহতা ধারায় অবগাহন মানুষের প্রত্যহের পালনীয় আচার, সে অবগাহন অন্তরের মলিনতা বিধৌত করে :

> যেখানেই মানুষ সর্বজনের হিতার্থে কর্মসমবায়ে মিলিত হয়, নদীসঙ্গমের মতোই পবিত্র সে স্থান। আজকের উৎসব তেমনই এক তীর্থ-উদ্‌বোধন দিবসের বর্ষপূর্তি উদ্‌যাপন। এখানে আমরা সমবেত হতে পারি স্থান-কাল বিচার না করেই। যেখানে কর্মই আরাধনা, সেখানে আমাদের কর্ম শান্তি-সমৃদ্ধি-সুখ আনবে—এই লোকে এবং লোকান্তরে।

মহাত্মা গান্ধীর, দীনবন্ধু অ্যান্ডরুজের, গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের তিরোধানদিবসের উপাসনা, হলকর্ষণ, শিল্পোৎসব পরিচালনা, পূর্বাঞ্চলীয় সাহিত্য-বিষয়ক কর্মশালার সমাপ্তি দিনে ভাষণদান, উড়িষ্যার বিখ্যাত শিক্ষাবিদ ও রাজনৈতিক নেতা নীলকণ্ঠ দাসের 'কাল্‌ট অব জগন্নাথ' বক্তৃতার দিনে সভাপতিত্ব—বিশ্বভারতীর কাজের চাকা ঘোরে, ক্ষিতিমোহন বাঁধা তার সঙ্গে।[১৩৪] বছর এগিয়ে চলে। উপাচার্য থাকাকালে আফগানিস্তান থেকে একটি সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিদল এসেছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে স্বাগত জানিয়ে ক্ষিতিমোহন স্মরণ করেন গান্ধার দেশের সঙ্গে হিন্দুস্থানের দীর্ঘ ও ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের কথা। তিনি বললেন আফগানিস্তানের কাছে ভারতবর্ষের, ভাষাবিদ্যা (Philology), ব্যাকরণ, শিল্পকলা ও সংগীতের অনেক ঋণ। এর প্রায় সমকালেই অধ্যাপক জুলিয়ান হাক্‌স্‌লি ও তাঁর পত্নী দু-দিনের জন্য এলে তাঁদের অভ্যর্থনাপ্রসঙ্গে তাঁর মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথ কী গভীরভাবে শ্রদ্ধাশীল ছিলেন এঁর ঠাকুরদা টমাস হেনরি হাক্‌স্‌লির প্রতি, সাহিত্য আর বিজ্ঞানকে যিনি নিজের মধ্যে অনায়াসে মিলিয়েছিলেন। সেই ঐতিহ্যের সুযোগ্য উত্তরাধিকারী অধ্যাপক জুলিয়ান হাক্‌স্‌লির পরিচয় দেন ক্ষিতিমোহন। শ্রোতাদের কাছে এ কথাটা বিশদ করেন যে তিনি সত্যসন্ধানী, পূর্ব-পশ্চিমের মেলবন্ধনের প্রয়াস তাঁর।[১৩৫]

বৃদ্ধবয়সে

এখনও এত তৎপর, এত প্রত্যুৎপন্নমতি, এখনও এত কর্মঠ, তবু ভিতরে ভিতরে অবসান-দিনের প্রস্তুতিও চলছে সবার অলক্ষ্যে। এখনও সলতেটা সর্বদাই উস্‌কানো থাকে, তবে তেলের জোগান কমছে প্রদীপটায়। এই সময় থেকে একটি রোগের লক্ষণ ধীরে ধীরে দেখা দিতে লাগল—পারকিন্‌সনস ডিজিজ। অমিতা সেনের মুখে শুনেছি :

> হয়তো ভিতরে ভিতরে আরও অনেক আগেই সূচনা হয়েছিল, কিন্তু বাইরে যখন প্রকাশ পেল তার পিছনে একটা ঘটনা জড়িত হয়ে আছে আমার মনে। সেবার নন্দলালবাবুর ছবির বিরাট প্রদর্শনী কলকাতায়, ড. রাধাকৃষ্ণন উদ্বোধন করতে এসেছিলেন। সে অনুষ্ঠানের সূচনালগ্নে মন্ত্রপাঠ করতে গিয়েছিলেন বাবা। তখন তিনি অ্যাকটিং ভাইসচ্যান্সালার। চিত্রপ্রদর্শনীর উদ্‌বোধনের ঠিক পরেই শান্তিনিকেতনে তাঁরই ডাকা মিটিঙে তাঁর যোগ দেবার কথা। কিন্তু দুটি গোষ্ঠীর মতাদর্শগত বিরোধে অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁকে জড়িয়ে ফেলা হল।

কিছুতেই মনস্থির করতে পারছিলেন না ক্ষিতিমোহন। 'তখন তাঁর বয়স হয়েছে, শক্তিক্ষয় হয়ে গেছে'—বলেছিলেন অমিতা সেন। তিনি চোখের সামনে দেখেছিলেন এই টানাপোড়েনে তাঁর পিতা কী ভয়ানক অসহায় বোধ করছিলেন। শেষপর্যন্ত সময়মতো শান্তিনিকেতনে ফিরে যাওয়া হল না—'বাবার আশ্রমে যে সম্মান, যে পদমর্যাদা, তার পক্ষে সেটা ক্ষতিকর হল, অসঙ্গত হল।' তাঁর কনিষ্ঠা কন্যার ধারণা :

> এই মানসিক চাপ তাঁর পক্ষে সহ্য করা হয়তো কঠিন হয়েছিল। যখন প্রদর্শনী উদ্‌বোধনের সময় মন্ত্রপাঠ করলেন, আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম তাঁর পা কাঁপছে। শান্তিনিকেতনে ফিরে আসবার পরেও এই মিটিঙে অনুপস্থিতির কারণে সাময়িকভাবে তিনি ধিক্কৃত হলেন। গোষ্ঠীভুক্তির অপরাধে তাঁকে অপরাধী হতে হল। অথচ তিনি তো তা চান নি। আমার যেন ধারণা সেই অবধি বাবার এই অসুস্থতা ধীরে ধীরে শুরু হল। শান্তিনিকেতনের আবহাওয়া আবার শান্ত হয়ে গেল, কিন্তু বাবা ক্রমশ শয্যাশায়ী হয়ে গেলেন।[১৩৬]

নন্দলাল বসুর ছবির প্রদর্শনীর উদ্‌বোধন হয় ২৭ মার্চ ১৯৫৪। এই উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে ক্ষিতিমোহনের ভূমিকা কী ছিল তা স্পষ্টতর হল ক্ষিতিমোহনের নিজস্ব সংগ্রহের অনুষ্ঠানপত্রী দেখে। নির্বাচিত কয়েকটি মন্ত্র ও রবীন্দ্রসংগীতে এটি সাজানো, অনুমান করতে দ্বিধা নেই মন্ত্র নির্বাচন ক্ষিতিমোহনেরই, তিনি মন্ত্রপাঠ করেন ও ড. রাধাকৃষ্ণনকে অভ্যর্থনা করেন।[১৩৭]

আগেই বলেছি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সরোজিনী বসু স্বর্ণপদক লাভ করেন ক্ষিতিমোহন। ১৯৫৫ সালের ২৪ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক সমাবর্তনে এই স্বর্ণপদক দেওয়া হয়। বিশ্বভারতী নিউজ লিখেছে, 'বাংলা সাহিত্যে গবেষণার জন্য ড. ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় এই পুরস্কার লাভ করেছেন, এই পুরস্কারের জন্য তাঁকে আমাদের সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি।'[১৩৮] পরের বছরও ক্ষিতিমোহন ২২ শ্রাবণের উপাসনা করেছেন এবং হলকর্ষণ উৎসব পরিচালনা করেছেন, তার বিবরণ পাচ্ছি।[১৩৯] তবে তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক জীবনটাতে প্রায় অকস্মাৎই যবনিকাপাত হয়ে গেল। তার পর থেকে তিনি গৃহবাসীই বলা চলে। গতিবিধি সীমিত হলেও মন এখনও যথেষ্ট সচল। মনে হয় এ সময়টা বেশি ব্যস্ত আছেন 'চিন্ময় বঙ্গ' নিয়ে, আগামী বছরে বইটা প্রকাশিত হবে। 'সাধনাত্রয়ী'-র পিছনের মলাটে ক্ষিতিমোহনের বৃদ্ধবয়সের একটা ছবি আছে, তাঁর পরিচিত মুখ সে ছবিতে শ্মশ্রুতে ঢাকা পড়েছে। শান্তিনিকেতনের পুরোনো ছাত্র মোহনদাস পটেল ১৯৫৬ সালে শান্তিনিকেতনে এসে এমনটিই দেখেছিলেন ক্ষিতিমোহনকে। যেদিন তিনি দেখা করতে গেলেন ক্ষিতিমোহন দুই পৌত্রের হাতেখড়ি দিচ্ছিলেন, সেই ছবিটি মোহনদাস ভাইয়ের অন্তরে এখনও আঁকা আছে।[১৪০] আর-এক পুরোনো ছাত্র সুধীরঞ্জন দাস আরও কিছুদিন পরে লিখেছেন :

> সম্প্রতি দাড়িগোঁফে মাস্টারমশায়ের হাসিটি অল্পবিস্তর চাপা পড়লেও বচনগুলি পূর্বের মতোই সতেজ ও সরস আছে।[১৪১]

তিনি তাঁর শান্তিনিকেতন স্মৃতিকথা 'আমাদের শান্তিনিকেতন' উৎসর্গ করেন ক্ষিতিমোহনকে। উৎসর্গপত্রটি সম্পূর্ণ তুলে দেওয়া গেল :

উৎসর্গ

শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমে বালক ও কিশোর বয়সে যে সকল শিক্ষকের পদপ্রান্তে শিক্ষালাভ করবার সুযোগ পেয়েছিলাম, যাঁরা তাঁদের জীবনের দ্বারা আমাদের মধ্যে জীবন সঞ্চার করেছেন এবং তাঁদের স্নেহের দ্বারা আমাদের কল্যাণসাধন করেছেন, যাঁরা জীবিকার অনুরোধে কিছু বেতন নিলেও তার চেয়ে অনেক বেশি দিয়ে আপন কর্তব্যকে মহিমান্বিত করে গিয়েছেন, যাঁরা নিভৃতে সাধনা করে বিদ্যার্জন করেছেন ও সেই লব্ধ বিদ্যার বিতরণে কার্পণ্য করেন নি এতটুকুও, যে-সকল শিক্ষকরা সত্যিকারের গুরু ছিলেন, তাঁদেরই বিশিষ্ট একজন, যিনি উত্তরকালের বিশ্বভারতীর উপাচার্য পদ অলংকৃত করেছেন ও আমাদের সৌভাগ্যক্রমে আমাদের মধ্যে আজও বর্তমান রয়েছেন সেই

পরম পূজনীয় পণ্ডিত
শ্রী ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রী
মহাশয়ের শ্রীচরণে

আমার এই শান্তিনিকেতন-স্মৃতি পরম শ্রদ্ধাভরে এবং ঐকান্তিক কৃতজ্ঞতা জানিয়ে উৎসর্গ করলাম।

১ আষাঢ় ১৩৬৬ প্রণত
স্বপনপুরী। কালিম্পং শ্রীসুধীরঞ্জন দাস[১৪২]

১৯৫৬ ও ১৯৫৭ সালে বিশ্বভারতী নিউজ আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন ও আচার্য নন্দলাল বসুর জন্মদিনে তাঁদের প্রতি বিশেষভাবে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করল। '২ ডিসেম্বর ১৯৫৮ আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রীর আটাত্তর বছর বয়স হল। ৩ ডিসেম্বর ১৯৫৮ আচার্য নন্দলাল বসুর ছিয়াত্তর হল। আমরা তাঁদের অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং সর্বশক্তিমানের নিকট তাঁদের দীর্ঘ জীবন প্রার্থনা করছি।' —পরের বছরে লিখেছে এই পত্রিকা। খবর দিচ্ছে উভয়েরই জন্মদিনে প্রত্যুষে বৈতালিক হয় এবং পরে একটি সভা হয়। ২ ডিসেম্বর আচার্য ক্ষিতিমোহন সেনের সম্মানে চিনাভবনে যে সভা হয় ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী তার সভানেত্রী পদে ছিলেন। সুজিতকুমার মুখোপাধ্যায় ও সৈয়দ মুজতবা আলী ভাষণ দেন এই দিনের সমাবেশে।[১৪৩] ১৯৬০ সালের খবর :

আশ্রমের তিন প্রবীণ, দেশিকোত্তম ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী, দেশিকোত্তম আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী ও দেশিকোত্তম আচার্য নন্দলাল বসুর জন্মদিন ডিসেম্বর মাসে পালিত হল। আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী ২ ডিসেম্বর উনআশি পূর্ণ করলেন, আচার্য নন্দলাল বসু ৩ ডিসেম্বর সাতাত্তর পূর্ণ করলেন এবং শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী ২৯ ডিসেম্বর ছিয়াশি পূর্ণ করলেন। এই শ্রদ্ধেয় প্রবীণদের প্রত্যেকের জন্মদিনে ছাত্রছাত্রী ও কর্মী এবং আশ্রমের বাসিন্দারা যেদিন যাঁর জন্মদিন তাঁর গৃহে সমবেত হয়েছিলেন তাঁকে অভিনন্দন ও শ্রদ্ধা জানাতে।

ফেব্রুয়ারি সংখ্যার পত্রিকায় এই তিন প্রবীণের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার নিদর্শন হিসেবে তাঁদের সম্পর্কে এক-একটি অনতিদীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। 'ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী' প্রবন্ধটি লিখেছিলেন হিরণকুমার সান্যাল।[১৪৪]

সেই প্রবন্ধে ক্ষিতিমোহনকে না-জানা ঘরে-বাইরের মানুষ শুনল কাশীতে টোলে পড়ে হিন্দুশাস্ত্রজ্ঞ এবং অসাধারণ স্মৃতিশক্তিধর হয়ে-ওঠা মানুষটির কথা, অথচ যিনি বয়ঃসন্ধিপর্বেই হিন্দুধর্মের বেড়া-ভাঙা, সত্যান্বেষী সাধকের কাছে দীক্ষা নিয়ে মনের দিগন্তটাকে সব সংকীর্ণ সীমানা থেকে মুক্ত করে নিতে পেরেছিলেন। তারা শুনল জ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতার বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে তাঁর অভিযানের কথা, যা তাঁকে সমতলে-পর্বতে ঘুরিয়েছে দেশটার এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত, উত্তরে পশ্চিমে যেদিকে যখন তিনি গেছেন বিভিন্ন সন্ত ও তাঁদের সম্প্রদায় সম্পর্কে বিস্তারিত জানবার জন্য, সহজ দক্ষতায় সেদিককার মানুষদের একজন হয়ে তাদেরই ভাষায় কথা বলেছেন এবং অজস্র তথ্য সংগ্রহ করে এনে দেশের সামাজিক ও ধর্মীয় সুবৃহৎ ইতিহাসের আগাগোড়া অঙ্গীভূত এক অমূল্য এবং প্রায় হারিয়ে-যাওয়া সম্পদকে বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করেছেন। তারা শুনল সুপ্রচুর স্বাস্থ্য ও জ্ঞানের ঐশ্বর্য নিয়ে পঞ্চাশ বছর আগে এই মানুষটি আটাশ বছর বয়সে শিক্ষক হয়ে এসেছিলেন সেদিনকার এই ছোটো আশ্রমবিদ্যালয়টিতে। তাঁর ব্যক্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্য আকর্ষণ করেছিল সকলকে, এমনকী রবীন্দ্রনাথকেও। তাঁর স্মৃতির তহবিলে জমা-করা সন্ত দোঁহা ও বাউলগানের অতুল বৈভব আবিষ্কার করে সেই মানুষটি বিস্মিত ও আনন্দিত হয়েছিলেন। আর নিজের অগোচরেই এবং অনায়াসে সেই কবির সঙ্গে তিনি একটি দেওয়া-নেওয়ার সম্পর্ক গড়তে পেরেছিলেন, আর পাঁচজনের মতো তাঁর কাছে কেবলমাত্র অধমর্ণ হয়ে থাকেননি। হিরণকুমার সান্যালের লেখা এই প্রবন্ধের সব-শেষ কয়েকটি পঙ্‌ক্তি মনে রাখবার মতো, যেখানে তিনি লিখেছেন :

> এককালে ক্ষিতিমোহন সেনের অতিপরিচিত যে-চেহারাটা শান্তিনিকেতনের চৌহদ্দির মধ্যে এখানে-ওখানে দেখতে পাওয়া যেত, এমন কি এই ক'বছর আগেও নিত্য সকালে-বিকালে যে নজরে পড়ত শান্তিনিকেতনের চারপাশের খোলা অঞ্চলে তিনি হাঁটতে বেরিয়েছেন, সে আর দেখা যায় না। কিন্তু তাঁর মনের সজীবতা যে হারায় নি সে আপনি যদি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যান আর তাঁকে বাউল সূফি বা সন্তদের বিষয়ে প্রশ্ন করেন তাহলেই বুঝতে পারবেন। এবং কৃতজ্ঞবোধ করবেন যে এই আশি বছর বয়সেও এতখানি প্রাণবন্ত আছেন তিনি—এক প্রতিষ্ঠানের ভিতরে আর একটি প্রতিষ্ঠান।[১৪৫]

১৯৫৯ সালে একদিন শান্তিনিকেতন তাঁকে সশরীরে হাজির দেখেছিল আম্রকুঞ্জে। এই শেষবার তাঁর আম্রকুঞ্জে আসা। সেদিন ছিল বসন্তোৎসব। তাঁর প্রবন্ধগুলি মনে পড়ে, যেখানে তিনি দোল উৎসবের নিহিতার্থ ব্যাখ্যা করেছেন। কতবার উৎসবের দিনেও বলেছেন সে-সব কথা। এই আম্রকুঞ্জের বেদিতে বসে ঋতুরাজ বসন্তকে অর্ঘ্য দিয়েছেন বৈদিক মন্ত্রে, রবীন্দ্র-রচনায়। কবীর রবিদাসই কি আর তাঁর সেই অর্ঘ্যের কুসুম

জোগাননি ?* সাপ্তাহিক মন্দির-উপাসনায় শ্রীচৈতন্যের কথা বলেছেন কখনও এই দিনে। বলেছেন এমন ঈশ্বরভক্তির দৃষ্টান্ত ইতিহাসে বিরল। বিশ্বাসের জোর যত তত জোর নম্রতার—এমন একটা দেখা যায় না কোনো সাধকের মধ্যে। সত্যের সন্ধানে তিনি ত্যাগ করেছিলেন তাঁর কুলের অভিমান, পাণ্ডিত্যে শ্রেষ্ঠত্বের অভিমান। আত্মবিলুপ্তির পথে আত্মোপলব্ধির সাধনা তাঁর। আর-একবার—সেটা ১৯৫০ সাল। দেশজুড়ে হিংসা আর হানাহানির মত্ততা। সেবার বসন্তোৎসবের অনুষ্ঠানের মাঝখানে ক্ষিতিমোহনের ভাষণ ছিল। এই বীভৎসতা, যন্ত্রণা ও দুর্দশার দিনে কারো মনে হতেই পারে এ আনন্দানুষ্ঠান অত্যন্ত বেমানান, কিন্তু নিছক বিনোদনের জন্য এ অনুষ্ঠান নয়—বলেছিলেন ক্ষিতিমোহন। এই উৎসবগুলি গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টি করেছিলেন প্রকৃতির সঙ্গে জীবনের সুর মেলাবার জন্য—যে প্রকৃতি প্রকাশের প্রেক্ষিতে সুন্দর ও উপভোগ্য, কিন্তু ভিতরে ভিতরে সেই শক্তি ও সম্ভাবনার সাধনায় নিমগ্ন। তার সে বলবত্তা বিধ্বংসী প্রাকৃতিক বিনাশের উন্মত্ততা রোধ করে, সুকোমল পুষ্পকলিটি প্রস্ফুটনের নেপথ্যেও তারই ক্রিয়া। আজকের এই উৎসব যা মিথ্যা ও কুৎসিত তার উপরে সত্য ও সুন্দরের জয়ের প্রতীক।

সে-সব দিন পিছনে ফেলে এসেছেন ক্ষিতিমোহন। এবার শুধু কয়েকটি অনুষ্ঠান-উপযোগী উপনিষদের মন্ত্র আবৃত্তি করলেন, সহকারী ছিলেন সুপ্রিয় ঠাকুর। বিশ্বভারতী নিউজ পড়লে ঘটনাটা এই রকমই ঘটেছিল মনে হয়। কিন্তু স্বয়ং সুপ্রিয় ঠাকুরের কাছে জানা গেল কিছুদিন আগে থেকে বড়োদের নির্দেশে তিনি ক্ষিতিমোহনের কাছে গিয়ে বসন্তোৎসবে উচ্চার্য মন্ত্রগুলি শিখেছিলেন। বড়োরা বলেছিলেন : 'এখন থেকে তুই মন্ত্র আবৃত্তি করবি।' তার পর উৎসবের আগের দিন ক্ষিতিমোহন বললেন : 'আমি কাল যাব।' পরদিন তাঁকে নিতে গেলেন ভ্রাতুষ্পুত্র বীরেন্দ্রনাথ সেন তাঁর জিপ নিয়ে, দেখা গেল তিনি একেবারে তৈরি হয়ে বসে আছেন, গলায় উত্তরীয়টি পর্যন্ত দেওয়া। উৎসবসভায় গিয়ে বসলেন।

> সামনে দাঁড়িয়ে আমি মন্ত্র আবৃত্তি করছি—তখন আমার আঠারো-উনিশ বছর বয়স, সেই প্রথম সভায় মন্ত্রোচ্চারণ, ভয়ে-উত্তেজনায় গলা কাঁপছে—এমন সময় অনুভব করলাম পিছন থেকে ক্ষিতিবাবু ধরেছেন, আমার গলা মিলে যাচ্ছে তাঁর গলার সঙ্গে।

মন্ত্র শেখাবার সময় অসুস্থতাজনিত উচ্চারণের জড়তা একটু ব্যাঘাত ঘটাত, এখন যেন পরিষ্কার জড়িমাহীন জোরালো কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে তাঁর। কী একটা বোধ নিঃশব্দে সঞ্চারিত হয়ে যাচ্ছে সমস্ত প্রাঙ্গণজুড়ে—পুরাতন তার আপন সম্পদ সমর্পণ করে দিচ্ছে নবীনের প্রসারিত অঞ্জলিবদ্ধ হাতে।

দিনটা ছিল ২৪ মার্চ। এর পরে বোধ করি আর-একবারই মাত্র ক্ষিতিমোহন বিশ্বভারতীর কোনো অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। পিয়র্সনপল্লিতে পূর্বভারতের এগ্রো-

---

* 'ঋষি সাধকের বসন্ত উৎসব', 'ভক্ত কবীরের বসন্ত উৎসব', 'ভক্ত রবিদাসের বসন্তোৎসব' 'মীরার গান ও বসন্তোৎসব'—এ-সব প্রবন্ধ তাঁর পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

ইক্‌নমিক রিসার্চ সেন্টার-এর নতুন একতলা বাড়ির উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে বিশ্বভারতী নিউজ-এ ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রীর নাম আছে। সেদিন ২৫ এপ্রিল ১৯৫৯।[১৪৬] ক্রমশ আরও অচল হয়ে পড়লেন, শেষে একেবারে শয্যাগত। ক্রমে এমন হয়েছিল উঠিয়ে বসিয়ে দিতে হত, আবার শুইয়ে দিতে হত, নিজে আর কিছুই পারতেন না। চিরদিন অতি ভোরে ওঠার অভ্যাস, কিন্তু যতক্ষণ না কিরণবালা এসে সাহায্য করতেন আর উঠতে পারতেন না, অপেক্ষা করে থাকতেন। নিজের কাপড় নিজেই তো ধুতেন বরাবর, অসুস্থ হওয়ার পরে অনেকদিন পর্যন্ত ধুয়ে রেখে আসতেন, নিংড়াবার শক্তি ছিল না। অমিতা সেনের মুখে শুনেছি :

> মা যেমন তাঁর চিরজীবনের সঙ্গী, জীবনের শেষ লগ্নেও তাই। কী সেবাই যে মা করেছেন বাবার। মায়ের উপর তাঁর সম্পূর্ণ নির্ভরতা ছিল।

শুয়ে শুয়ে আপনমনে গুনগুন করে গান গাইতেন। অনেক সময় ডানহাতখানি একটু ঘুরিয়ে গাইতেন 'কেউ কখনো খুঁজে কি পায় স্বপ্নলোকের চাবি জেগে তাই তো ভাবি।'[১৪৭] পিতার স্মৃতিচারণ করতে করতে কখনও আবার বলেছেন অমিতা সেন :

> চিবকালই সূর্যাস্তের সময়ও বাইরে নির্জনে বসতেন। শেষ বয়সে যখন বাইরে বেরোতে আর পারতেন না তখনও দুবেলা বাড়িতেই এক প্রান্তে শান্ত হয়ে বসতেন। মৃদুস্বরে মন্ত্রোচ্চারণ করতেন। ক্রমশ শরীরের শক্তি যখন তাঁব চলে গেল, যখন শেষের দিকে মায়ের সাহায্য ছাড়া বিছানা থেকে উঠতে পারেন না, অতি প্রত্যূষে শয্যায় শুয়ে প্রতীক্ষা করে থাকতেন কখন মা এসে তুলবেন, ঠোঁট দুটিতে মৃদু কম্পন দেখেছি, অস্ফুট মন্ত্রধ্বনি শুনেছি কানে।[১৪৮]

বিধুশেখর শাস্ত্রীর জীবনাবসান হল ৪ এপ্রিল ১৯৫৯। লিখিত আকারে ক্ষিতিমোহনের কোনো প্রতিক্রিয়া নজরে পড়েনি। কতকালের বন্ধু, একসঙ্গে টোলে পড়েছেন। যখন তরুণ বয়স, ছুটিতে হয়তো ক্ষিতিমোহন দেশে গেছেন—সোনারঙে। বিধুশেখর চিঠি লিখতেন তাঁকে, তার শেষে থাকত 'ইতি তোমারই বিধু'। বাড়িতে সন্দেহ দেখা দিত—কী ব্যাপার, ক্ষিতিমোহন কি কোনো মেয়ের পাল্লায় পড়েছেন—এ কী কোনো বিধুমুখী কী বিধুবালা! ক্ষিতিমোহনও কিছু ভাঙতেন না, মিটিমিটি হাসতেন। বিধুশেখর আগে এসেছিলেন শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমে, ক্ষিতিমোহন এলেন পরে। সেই অবধি দীর্ঘদিন দুজনের কর্মক্ষেত্রও এক। এতদিনের বন্ধু এবার চিরবিদায় নিলেন। কিছুদিন আগে 'দুই বন্ধুতে বৃদ্ধ বয়সে শেষবার দেখা শান্তিনিকেতনে। বিধুশেখর বললেন : 'একি, ক্ষিতি, তোমার হাত কাঁপছে কেন!' ক্ষিতিমোহন বললেন : 'বিধু, শুধু আমারই হাত কাঁপছে না, তোমারও মাথাটা নড়ছে, তুমি বুঝতে পারছ না।' দুই বন্ধু একসঙ্গে হেসে উঠলেন। আমরাও উপস্থিত ছিলাম সেখানে—আমি আর লাবু, — তাঁদের সেই খোলা হাসিতে আমাদেরও হাসি মিলে গেল।'[১৪৯]

তাঁর 'চিন্ময় বঙ্গ' বেরিয়েছিল ১৯৫৭ সালের শেষদিকে। এইটিই তাঁর জীবিতকালে প্রকাশিত সর্বশেষ গ্রন্থ। ক্ষিতিমোহন লিখেছেন ১৯২০ সালে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যখন

আমেদাবাদে যান, তখন গান্ধীজির সঙ্গে বঙ্গাদেশ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘ আলোচনা শোনবার সুযোগ তাঁর হয়েছিল। আরও বেশ কিছু মানুষ উপস্থিত ছিলেন সেই আলোচনায়। আলোচনার পরে কারও মনে সংশয় ছিল না যে কোনো জাতি বা গোষ্ঠী যখন নিজের সংস্কৃতিগত ঐতিহ্য বা চিন্তাধারা হারিয়ে ফেলে তখন তারা ফাঁকা বুলি দিয়ে জাতি বা সমাজগত বাহবা পেতে চায়, একদল অপর দলকে হেয় প্রতিপন্ন করতে চায়। এই প্রবণতা থেকেই ভারতে প্রাদেশিক সংকীর্ণতা জন্ম নিয়েছে। কখন এই সংকীর্ণতার উর্ধ্বে উঠতে পারে মানুষ? যখন সে নিজেকে প্রসারিত করে দিতে পারে, চিন্ময় কায়াকে কর্ম জ্ঞান ও প্রেমের দ্বারা বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত করতে পারে। এ অধিকার মানুষেরই, পশুর এ অধিকার নেই। নিঃস্বার্থ নিষ্কাম অহেতুক ব্যাপ্তির মূলে বীর্য ও সাধনা থাকে। এরই নাম বীরাচার, এর বিপরীত হল পশ্বাচার। বীর সাধকেরও জৈব কায়া থাকে, কিন্তু আত্মপ্রসারণই লক্ষ্য হলে জৈব কায়ার দাবি গৌণ হয়ে যায়, সাধক তাঁর অভীষ্ট সাধনে অশেষ দুঃখবরণ করেন অনায়াসে। ব্যক্তির মতো জাতিরও পশু এবং বীর এই দুই সাধনাই আছে। আলো দেওয়ার জন্য প্রদীপ তার সব সঞ্চয় ক্ষয় করে পলে পলে জ্বলে মরে, অথচ এই ব্যাপ্তি ছাড়া তার সার্থকতাই নেই। অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্ব যখন সব দেশ জয় করে ফেরে তখনই সে মেধ্য অর্থাৎ যজ্ঞের যোগ্য। আস্তাবলের ঘোড়াকে দিয়ে মজুরি করানো চলে বটে, কিন্তু যজ্ঞ করা চলে না। জাতীয় জ্ঞান ও সংস্কৃতি যদি আপন সংকীর্ণ সীমার মধ্যে বদ্ধ থাকে তবে তার সম্পর্কে নেভানো প্রদীপ বা আস্তাবলের ঘোড়ার উপমাটাই খাটে, যজ্ঞীয় অশ্ব বা প্রদীপ্ত আলোকবর্তিকা সে নয়। প্রাচীন ও মধ্যযুগে ধর্ম-বিদ্যা-সংস্কৃতির বিচিত্র দিকের চর্চার মধ্য দিয়ে বঙ্গাদেশের চিত্ত প্রসারণের ইতিহাস সর্বসমক্ষে প্রকাশ করার অভিপ্রায় ক্ষিতিমোহনের মনে দানা বেঁধেছিল সেই রবীন্দ্রনাথ-গান্ধী আলোচনার সময় থেকেই। অনেকদিন ধরে ধীরে ধীরে অবকাশমতো তাকে রূপ দিলেন, এর অনেক লেখা অনেককাল আগে প্রবাসী প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এই কাজ সম্পূর্ণ হয়ে তাঁর জীবনসায়াহ্নে প্রকাশিত হল। নন্দলাল বসুর আঁকা একখানি শ্রীচৈতন্যদেবের রেখাচিত্র আছে এই গ্রন্থের প্রচ্ছদে, ক্ষিতিমোহনের আর কোনো গ্রন্থপ্রচ্ছদ অলংকরণের এই বিশিষ্টতা অর্জন করেনি। গ্রন্থকার তাঁর এই গ্রন্থ উৎসর্গ করলেন মহাত্মা গান্ধীর উদ্দেশে।

কিন্তু ক্ষিতিমোহন যে রবীন্দ্রপরিচয়সভার দাবিতে সংকল্প গ্রহণ করেছিলেন 'ভারতীয় মধ্যযুগের ভাব ও সাধনধারার সহিত রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধ' বিষয়ে কাজ করবেন তিনি, তার কী হল? রবীন্দ্রপরিচয়সভার এক অধিবেশনে তিনি একটি প্রবন্ধ পড়েছিলেন—'রবীন্দ্রনাথ ও বাউল'। এটি ছাপা হয়েছিল বলে তো মনে হয় না। সংকল্প যা ছিল সেই বিষয় নিয়ে এক সর্বদিকস্পর্শী সম্পূর্ণ আলোচনা যে গ্রন্থাকারে রূপ নিয়েছে এমন বলা চলে না। তবে তাঁর অনেক প্রবন্ধে মধ্যযুগীয় সাধকদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের রচনা ও ভাবনার তুলনামূলক আলোচনা লক্ষ করা যায়। 'ভারতীয় সাধনার ধারায় রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধে অনেকগুলি এইজাতীয় তুলনামূলক দৃষ্টান্ত পাশাপাশি দেখিয়েছিলেন। আর আছে তাঁর

'সীমা ও অসীম' গ্রন্থ। বইটি লেখকের মৃত্যুর অনেক পরে প্রকাশিত হয়। ১৯৪২ সালের একটি হিন্দি প্রবন্ধের উল্লেখ থেকে জানা যায় মধ্যযুগীয় সাধকদের সঙ্গো রবীন্দ্রনাথের ভাবের সাম্য বিষয়ে গবেষণার কাজ ক্ষিতিমোহনের উপরে বিশ্বভারতী অর্পণ করেছিলেন। এই প্রবন্ধে ক্ষিতিমোহন জানাচ্ছেন :

> আপনারা আমাকে রবীন্দ্রনাথ ও মধ্যযুগীয় সন্তদের বাণী বিষয়ে লিখতে আদেশ দিয়েছেন। কিন্তু এই বিষয় নিয়ে এখন আমি কিছু বলতে পারব না। এই বিষয় নিয়ে বিশ্বভারতীতে আমার গবেষণার কাজ চলছে, সেজন্য সে-সব এখন প্রকাশ করা যাবে না। আর এ নিয়ে হঠাৎ মোটা কথায় কিছু বলা বিপদও বটে—লোকে সহজেই তা ভুল বুঝতে পারে। রবীন্দ্রনাথ সন্তসাহিত্যের সঙ্গো একেবারেই পরিচিত ছিলেন না। আমি যে-সময় তাঁকে সন্তসাহিত্য সম্পর্কে কখনও কখনও পরিচিত করতে শুরু করলাম সে-সময় তাঁর 'গীতাঞ্জলি'-র যুগ শেষ হয়ে আসছে। তিনি তাঁর স্বীয় মহত্ত্ব ও সার্বভৌমিক দৃষ্টির দ্বারা সন্তসাহিত্যের অনেক গম্ভীর ও নিগূঢ় রহস্য উদ্‌ঘাটিত করে দিলেন।

কিন্তু মনে হয় অন্যান্য লেখার চাপে ক্ষিতিমোহন 'সীমা ও অসীম' হয়তো সম্পূর্ণ করার অবকাশ পাননি। তাঁর মৃত্যুর বছর পাঁচেক পরে বিশ্বভারতী পত্রিকায় ১৩৭২ ও ১৩৭৩ সালে এই লেখা কয়েকটি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। ধারাবাহিক প্রকাশে শেষপূর্ব অধ্যায় ছিল 'রবীন্দ্রনাথ : সীমা ও অসীম'। এর পরে শেষের অধ্যায় ছিল 'সীমা ও অসীম : মরমীদের যুক্তমত'। এই শেষ অধ্যায়েও রবীন্দ্রনাথ বেশ কিছুটা আছেন বলে এই বিন্যাস ততটা অযৌক্তিক মনে হয় না। কিন্তু বইতে দ্বিতীয় অধ্যায়েই রবীন্দ্রনাথ এসেছেন, কবীর এবং রজ্জবেরও আগে। অথচ রবীন্দ্র-অধ্যায়ে এমন উল্লেখও আছে 'কবীর ও রজ্জবের বাণীর সঙ্গো মিল দেখাইতে গিয়া রবীন্দ্রনাথের দুই একটি কবিতা পূর্বেই উদ্ধৃত করা গিয়াছে।'

যাই হোক না কেন আমাদের মনে হয়েছে মধ্যযুগের সাধকদের সঙ্গো রবীন্দ্রনাথের ভাবের সাম্য বিষয়ে আলোচনার জন্য ক্ষিতিমোহনের গ্রন্থপরিকল্পনা মূলত আরও ব্যাপক ছিল, তা বোঝানোর জন্য তাঁর পূর্বোক্ত প্রবন্ধ থেকে পুনরপি একটু উদ্ধৃতি দিয়ে এ প্রসঙ্গ শেষ করব। খুব কিছু নতুন কথা নয়, ক্ষিতিমোহন বহু প্রসঙ্গো এই ধরনের কথা বলেছেন, তবু এই অংশটুকুই নির্বাচন করে নেওয়া গেল :

> বেদপূর্ব যুগ ও বৈদিক সাহিত্যের সময় থেকেই ভারতবর্ষে সহস্রবর্ষব্যাপী সাধনা চলছিল, তাতে সব কালের সাধক এবং ভক্ত একই সাধনায় রত ছিলেন। সেজন্য এক কালের সন্তের বাণীর সঙ্গো অন্য কালের সন্তের বাণীর আশ্চর্য সাম্য দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথের বাণীতেও আমি এমনই সাম্য দেখতে পাই। এঁদের মধ্যে যাঁরাই বাস্তবিক সাধক তাঁদের প্রত্যেকেরই একের অপরের সঙ্গো এক না এক প্রকারের যোগ চিরদিন আছে, অথচ কেউ কারো কাছে ঋণী নন। কারণ ভারতীয় সাধনার যিনি অধীশ্বর তিনি ভারতীয় সাধনার মহাসত্যকে এই ভক্তদের মুখ দিয়ে যুগোচিত রূপে বারবার উদ্‌ঘোষিত ও প্রকাশিত করেন। এইজন্য তাঁদের সাধনায় তাঁদের আপন আপন যুগের অনুরূপ বাণীও আমরা শুনতে পাই এবং সেই সঙ্গোই তার অখণ্ড ধারার এক বিলক্ষণ ঐক্যও অবিচ্ছিন্নভাবে দেখতে পাই।

আর-একটি বইও তাঁর মৃত্যুর অনেক পরে প্রকাশিত হয়েছিল 'বেদোত্তর সঙ্গীত'। ঠিক সময়ে প্রকাশিত হলে প্রকাশকাল হতে পারত ১৯৪৬-৪৭। এ বইতে ক্ষিতিমোহনের নিজের লেখা ভূমিকার তারিখ আছে ১৬ অগ্রহায়ণ ১৩৫৩। সুতরাং এ বইয়ের কাজ অনেকদিন আগেই সম্পূর্ণ করেছিলেন তিনি।

আর Hinduism ? ক্ষিতিমোহনের দুটি অধ্যায়ের পাণ্ডুলিপি পাঠানোতে ১৪ আগস্ট ১৯৫০ মি. গ্লোভার তাঁকে লিখেছিলেন এ লেখা তাঁদের অভীষ্ট সিদ্ধ করবে। তবে ক্ষিতিমোহনের সম্মতি থাকলে পাণ্ডুলিপির কোনো কোনো জায়গায় শব্দের সামান্য পরিবর্তন করা হবে—অবশ্য মূলের অর্থপরিবর্তন না ঘটিয়ে। তার আগেই ৩১ মার্চ ১৯৫০-এর চিঠিতে ক্ষিতিমোহন তাঁকে জানান লেখার কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, সম্ভবত গরমের ছুটির মধ্যে সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। তবে বাংলায় লিখে তার অনুবাদ করা হচ্ছে বলে অনুবাদের কাজ শেষ হতে অক্টোবর পর্যন্ত সময় লাগবে মনে হয়। এর পরের আর কোনো চিঠিপত্র আমাদের হাতে পড়েনি এবং বইও বেরোয়নি।

১৯৫৮-৫৯ সালে ট্রিনিটি কলেজ, কেমব্রিজ থেকে ক্ষিতিমোহনের দৌহিত্র ড. অমর্ত্যকুমার সেনের লেখা তিনটি পত্রের সন্ধান পাচ্ছি, দুটি পেঙ্গুইন বুকস-এর সম্পাদকীয় বিভাগের ড. এ.এস. গ্লোভারকে লেখা এবং একটি ওই বিভাগের সচিবকে। প্রথম চিঠি থেকে জানা যাচ্ছে 'হিন্দুইজম' পাণ্ডুলিপি সম্পর্কে পেঙ্গুইন কী সিদ্ধান্ত নিল অধ্যাপক ক্ষিতিমোহন সেন তা জানতে চান, যে পাণ্ডুলিপি তিনি পাঠিয়েছিলেন ১৯৫১ সালে। ড. অমর্ত্যকুমার সেন লিখলেন মি. গ্লোভার যদি মনে করেন পাণ্ডুলিপির কোনো কোনো অংশের কিছুটা পুনর্লিখনের আবশ্যক আছে, তার ব্যবস্থা করা যেতে পারে, যদি না লেখক যা বলেছেন তার কোনো গুরুতর পরিবর্তনের প্রস্তাব তাঁদের থাকে। সচিবকে লেখা চিঠিটা এই চিঠির প্রায় অনুরূপ, মি. গ্লোভারের কাছ থেকে কোনো উত্তর না পেয়ে লেখা। ইতিমধ্যে ড. সেনের সঙ্গে তাঁদের সাক্ষাতে কথাবার্তা হয়েছিল। দেখতে পাচ্ছি তৃতীয় ও শেষ চিঠি পুনরায় মি. গ্লোভারকে লেখা হয়েছে এক বছর পরে। ড. সেন ৪ মে ১৯৫৯ সালে লিখছেন :

> এই সঙ্গে আমার দাদামশায় ড. কে.এম. সেনের হিন্দুধর্ম সম্বন্ধীয় বইটির সংশোধিত পাণ্ডুলিপি দিলাম। মনে তো হয় সাক্ষাতে যে যে বিষয় আমরা আলোচনা করেছিলাম, এটি সেগুলি সব পূরণ করতে পেরেছে। ড. সেন অধ্যায় পুনর্বিন্যস্ত করেছেন এবং একটি নতুন অধ্যায় সংযোগ করেছেন—'ভারতের বাইরে হিন্দুধর্ম'।

'হিন্দুইজম'-এর এই সংশোধিত পাণ্ডুলিপিটি সম্পর্কে মি. গ্লোভারের অভিমত জানবার জন্য তিনি অপেক্ষা করে থাকবেন এ কথা জানিয়ে ড. সেন যোগ করলেন :

> প্রসঙ্গত, আমার দাদামশায় আপনাকে বিশেষ করে লিখতে বলেছেন যে বইটির ভাষাগত উন্নতির জন্য পেঙ্গুইন বুক্‌সের কর্মীদের যে-কোনো রকমের সহায়তার জন্য তিনি কৃতজ্ঞতা বোধ করবেন।

এই তৃতীয় চিঠি লেখার মধ্যবর্তী এক বছর সময়ের মধ্যে, আমরা শুনেছি, ড. সেন এ বিষয়ে দাদামশায়কে অবহিত করার পরে তিন মাসের ছুটি নিয়ে শান্তিনিকেতনে এসে ক্ষিতিমোহনের নির্দেশমতো শ্রুতিলিখন নিয়ে এই পাণ্ডুলিপির প্রয়োজনীয় পরিমার্জন ও পুনর্বিন্যাসের কাজ করেন।[১৫০]

Hinduism গ্রন্থের ভূমিকাটি এই বছরের গোড়াতেই লেখা হল। ক্ষিতিমোহন বিশেষ ধন্যবাদ জানালেন বিশ্বভারতীর অধ্যাপক ড. শিশিরকুমার ঘোষ ও দৌহিত্র ড. অমর্ত্যকুমার সেনকে, যাঁদের সক্রিয় সহায়তা ও সহযোগিতা ছাড়া এই ইংরেজি গ্রন্থ লেখা সম্ভব হত না তাঁর পক্ষে। তিনি লিখলেন :

> আমার শিক্ষা ও আমার পটভূমি প্রায় সম্পূর্ণতই প্রাচ্যদেশীয় এবং ইংরেজির চেয়ে আমার মনের ভাবনা ভারতীয় ভাষাতেই সহজতর প্রকাশভঙ্গি খুঁজে পায়। এ পর্যন্ত আমার প্রায় সব কাজই প্রকাশিত হয়েছে ভারতীয় ভাষায়। আমার বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ীদের সাহায্য ব্যতীত ইংরেজিতে এই বই প্রস্তুত করতে আমাকে অত্যন্ত অসুবিধার মুখোমুখি হতে হত।

স্বাভাবিক কারণেই এ বিষয়ে তাঁর সচেতনতার অভাব ছিল না যে, যে হিন্দুধর্ম পাঁচ হাজার বছরের অধিককাল ধরে ভারতের সমস্ত ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে আত্মসাৎ করে ক্রমশ বিকাশলাভ করেছে, তার সম্পর্কে সাধারণ পাঠকের উপযোগী বই লেখা খুব কঠিন এবং তার বহুধাবিভক্ত চিন্তাধারার কোন্ দিকটির প্রতি কতটা গুরুত্ব দেওয়া সংগত সে সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ নয়। তিনি বললেন :

> আমি যতটা সম্ভব নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গি বজায় রাখবার চেষ্টা করেছি, কিন্তু এ ক্ষেত্রে কাজ করতে গিয়ে ব্যক্তিগত সংস্কার বা প্রবণতাকে সম্পূর্ণ এড়িয়ে যাওয়া দুঃসাধ্য। অনেকদিন থেকে হিন্দুদর্শন সম্পর্কিত বহু গ্রন্থ সম্পর্কে আমার সমালোচনাই হল যে সেগুলি সমাজের শিক্ষিততর শ্রেণীর শাস্ত্র, তারা প্রমাণাদির প্রতি বেশি মনোযোগ দিয়েছে, সমাজের নিম্নস্তরবর্তী ধর্মীয় আন্দোলনের প্রতি সামান্যই গুরুত্ব আরোপ করেছে। লোকায়ত ধর্মান্দোলনের পিছনে যে দর্শনচিন্তা কাজ করেছে তার সাধারণ রূপটি দেখাতে গিয়ে ধর্মের বিস্তৃততর রূপ বলতে আমার যা মনে হয়েছে তাকে ধরবার চেষ্টা করেছি। আশা করি এই উপস্থাপনার ভারসাম্য রক্ষিত হয়েছে বলেই মনে করবেন অধিকাংশ পাঠক, যদিও আমি সম্পূর্ণ সচতেন যে এমন একটি কাজের ক্ষেত্রে মতামতের পার্থক্য ঘটবেই।
>
> এ বইয়ের লক্ষ্য সেইসব পাঠক যাঁদের হিন্দুধর্ম সম্পর্কে কোনো পূর্বজ্ঞান নেই। সেজন্য পাঠকের কাছে নতুন মনে হতে পারে এমন সব শব্দ বা ধারণাই আমি ব্যাখ্যা করেছি। কিন্তু পাঠককে হিন্দুধর্মবিশেষজ্ঞ করে তোলবার চেষ্টা করি নি। 'হিন্দুইজম্' সম্পর্কে বহু উচ্চমানের বৃহদাকার গ্রন্থ আছে, আগ্রহী পাঠকের পক্ষে সে-সব দেখে নেওয়া কিছুমাত্র কঠিন নয়। এ বইকে একটি ভূমিকামাত্র মনে করলেই যথেষ্ট হবে, যার একটা উদ্দেশ্য হল যে-পাঠক হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে কিছুই জানেন না তাঁকে এই ধর্মের স্বরূপ ও প্রক্রিয়া সম্পর্কে কিছুটা মূলগত ধারণা দেওয়া, আর অন্য উদ্দেশ্য হল তাঁকে এ সম্পর্কে আরও পড়াশোনা করতে প্ররোচিত করা। কোনো কোনো পাঠক হয়তো বা হতাশ হবেন ষড়দর্শনের মতো কোনো কোনো অধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত পরিসর দেখে, কিন্তু এ ধরনের সংক্ষিপ্তকরণ সম্পূর্ণ ইচ্ছাকৃত। তবে হিন্দুধর্ম বিষয়ে

বৃহদায়তন একটি গ্রন্থ প্রণয়নের কোনো বাসনাই ছিল না আমার, বরং এ নিয়ে আমি এমন কিছু লিখতে চেয়েছি যা এমন মানুষও পড়তে পারেন যাঁর আরও নানা কাজ করতে হয়।

এ লেখার শেষাংশে লেখক বইয়ের তিনটি বিভাগের উল্লেখ করলেন : এক, হিন্দুধর্মের প্রকৃতি ও মূল সূত্র ; দুই, হিন্দুধর্মের ঐতিহাসিক বিবর্তন এবং তিন, হিন্দুধর্মগ্রন্থের নির্বাচিত অংশের অনুবাদ।

ক্ষিতিমোহনের 'হিন্দুইজম'-সংক্রান্ত কাগজপত্রের ফাইলে দৌহিত্র অমর্ত্যকে লেখা দুখানি মূল চিঠি রাখা আছে। হাতের লেখা ক্ষিতিমোহনের নিজের নয়, কিরণবালা সেনের। ক্ষিতিমোহন তখন আর নিজের হাতে লিখতে পারেন না। প্রথম চিঠির প্রথম অংশ উদ্ধৃত করা গেল :

শান্তিনিকেতন
২৭/১/৬০

কল্যাণীয়েষু

স্নেহের বাবলু, তোমার ২৯। ১২। ৫৯ এর লেখা চিঠিখানি আমি ৪ঠা জানুয়ারী পেয়েছি। উত্তর দিতে একটু দেরী হয়ে গেল। মাঝখানে আমি একটু অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। এখন ভাল আছি। যেমন থাকি।

তুমি জানতে চেয়েছ বাউলের ইংরাজী অনুবাদ গুরুদেবের কিনা। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছেলে ইন্দিরা দেবীর দাদা সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই অনুবাদগুলি করেন। গুরুদেবের হাতে এই অনুবাদগুলি পৌঁছলে তিনিও তার মধ্যে কিছুটা হাত চালালেন। সুরেন ঠাকুরের অনুবাদগুলি দেখে গুরুদেব মুগ্ধ হয়েছিলেন। গুরুদেব নানা কাজে ব্যস্ত থাকায় সুরেন ঠাকুরকে অনুবাদ করতে বলেছিলেন।

পেঙ্গুইনের লোকটির বাউলের চ্যাপ্টারটা খুব ভাল লেগেছে জেনে খুশী হয়েছি। ...

দ্বিতীয় চিঠিটা প্রায় সম্পূর্ণই উদ্ধৃত করে দিলাম :

শান্তিনিকেতন
২৬।২।৬০

কল্যাণীয়েষু

স্নেহের বাবলু, তোমার চিঠি ৩।৪ দিন হয় পেয়েছি। কাল সন্ধ্যায় কঙ্কর এসেছে। কঙ্করের নির্দেশমত সই করলাম। কঙ্কর রেজিষ্ট্রী করে কাগজটা পাঠিয়ে দেবে।

তোমার চিঠিতে বড় রকমের প্রশ্ন আছে একটা। ওতে যে সব উদ্ধৃতিগুলি আছে তার প্রমাণস্বরূপ যে গ্রন্থগুলো তার নাম বানান কেমনতর। এইটে আগে জানলে প্রত্যেকটা বইএর নাম ও ডায়াক্রিটিকাল বানান আগে থেকে ঠিক করে দেওয়া থাকত। তবে আমার একটা নিয়ম আছে যে কোথাও শুধু বিদ্যা ফলাবার মত বানান না দিয়ে যে রকম স্বাভাবিকভাবে কথাবার্তা বলি সেই রকমই আমার রচনা রেখে দেওয়া। তাই আমি বলি তুমি এই গ্রন্থে যে সব প্রমাণগ্রন্থের নাম পেলে তা মনিয়ার উইলিয়ামসের রচিত ডিক্সনারীটাই প্রায় সর্ব্বত্র অনুসৃত হয়েছে। যদি কোন স্থানে অনুসৃত না হয়ে থাকে তবে মনিয়ার উইলিয়ামসের উদ্ধৃত বানান তোমরা স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করতে পার। এমন ক্ষেত্রে আমার মতে না মিললেও আমি মনিয়ার উইলিয়ামসের [উইলিয়ামস্‌কে] প্রমাণস্বরূপ বলে গ্রহণ করব।

এখন তোমাদের বই প্রেসে দেবার অনেক বাকি আছে। মার্চ্চ এপ্রিলে এসব প্রমাণ গ্রন্থগুলো দেখে দরকার হলে শুদ্ধ করে নিও। তোমার পত্রে ও ওদের মুদ্রিত কন্ট্রাক্ট ফর্মে আমার প্রশ্নের সব মীমাংসা হয়ে গেছে।

... .

শুভার্থী দাদু
ক্ষিতিমোহন সেন

দিন অবসান বেলা

এ চিঠি যখন লিখেছিলেন ক্ষিতিমোহন তখনই তিনি এই গ্রন্থ প্রকাশ-বিষয়ক চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন। বোধ করি সেই কাজ সারা হয়েছিল বলেই বইটি তাঁর মৃত্যু সত্ত্বেও সহজেই প্রকাশিত হয়েছিল। এই চিঠি লেখার অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই যে তাঁর জীবনসমাপন হবে এ তো কেউ ধারণা করেনি। তখনও মাথা পরিষ্কার, শেষ পর্যন্ত তাই ছিল। শারীরিক অক্ষমতা চেতনাকে বিন্দুমাত্র প্রভাবিত করতে পারেনি। কয়েক দিন পরেই হার্নিয়া স্ট্র্যাঙ্গুলেশনে হঠাৎ তিনি ভয়ানক অসুস্থ হয়ে পড়লেন। প্রথম যৌবনে তাঁর হার্নিয়া অপারেশন হয়েছিল। জানা যাচ্ছে বছর পনেরো আগে একবার সে রোগ আবার দেখা দেয়, তখন চিকিৎসকরা অস্ত্রোপচারের ঝুঁকি নেননি। এবার ৫ মার্চ আবার তার আক্রমণ হলে শান্তিনিকেতনের ডা. শচীন মুখার্জি বর্ধমানের ডা. শৈলেন মুখার্জির সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করেন এবং তাঁর নার্সিংহোমে পাঠাবার সিদ্ধান্ত নেন। সেইমতো ক্ষিতিমোহনকে স্ট্রেচারে শুইয়ে ট্রেনে বর্ধমানে আনা হয়। স্ট্রেচারে তোলবার তোড়জোড় হতে তিনি চোখ বুজেছিলেন, ডা. শৈলেন মুখার্জির নার্সিংহোমে বেলা তিনটের সময় পৌঁছে যখন তাঁকে একটি কেবিনে বিছানায় শোয়ানো হল, তখন চোখ মেলে চাইলেন। ডা. মুখার্জি অপারেশন করলেও তিনি রোগীর জীবনের আশা দেননি। তাঁকে বর্ধমানে আনতে যতটা বিলম্ব হয়েছিল ততটা বিলম্ব এ রোগের পক্ষে অনেকটাই ক্ষতিকর। তবু প্রথম কয়েকটা দিন অবস্থা যেন ভালোর দিকেই যাচ্ছিল। অমিতা সেনের কাছে শুনেছি :

> নার্সিং হোমে মা তাঁর কাছে থাকতেন, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আমি আর রাঙাদিও থাকতাম, রাঙাদা তো থাকতই। সন্ধ্যার পর একটা বাংলোয় ফিরে রাঙাদি আর আমি রাতটা শুতাম। ওই নার্সিং হোমেই একটুখানি রান্না করে নিতাম। বাবার যে-কদিন জ্ঞান ছিল, রান্না করলে নার্সকেও খেতে দিতে বলতেন।

৫ মার্চ থেকে ৯ মার্চ এইরকম করে কাটল, শনি থেকে বুধবার পর্যন্ত। ১০ মার্চ বৃহস্পতিবার থেকে অবস্থার অবনতি হল, অপরাহ্ণে সংজ্ঞাহীন হয়ে গেলেন। সেই অবস্থাতেই কাটল দেড় দিন, আর তারই মধ্যে তিনি চলে গেলেন। শনিবার, ১২ মার্চ, সবে ভোর হচ্ছে তখন, রাত তখন প্রায় চারটে। শান্তিনিকেতনে বরাবর এই সময়েই তো—দিন ও রাত্রির এই মিলনক্ষণে ক্ষিতিমোহন শান্ত মনে খোলা জায়গায় বসে অনন্তের অনুভবে

হৃদয় পূর্ণ করে নিতে চাইতেন, যখন নিকষ কালো আকাশের গায়ে প্রথম সোনার রেখাটি ফুটবে বলে সমস্ত বিশ্ব প্রতীক্ষায় স্তব্ধ হয়ে আছে। আগের দিন বৃষ্টি হয়েছিল। শেষরাতে মেঘ কেটে গিয়ে জ্যোৎস্নার প্লাবনে চারদিক ভেসে গেল আর সব পাখি ডেকে উঠল। পরে মীরা দেবী বলেছিলেন কিরণবালাকে—'তখনই আমার মনে হল ঠাকুরদা চলে গেলেন।'

শেষ অসুস্থতার সময় 'বাবার একসময়ের সহপাঠী ডা. বিধানচন্দ্র রায় প্রতিদিন কলকাতা থেকে ফোনে খোঁজ করতেন, শেষ দিনে প্রত্যেক ঘণ্টায় খোঁজ নিয়েছেন।' ধীরেন্দ্রমোহন সেনকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন—বলেছিলেন : 'ক্ষিতি আর কয়েক ঘণ্টা, গাড়ি লাগে, যা লাগে, নিয়ে চলে যাও।' 'আমরা এ-সব কথা পরে শুনেছি। বাবা যখন চলে গেলেন, তখন দেখি সকলে বাইরে অপেক্ষা করছেন'—বলেছিলেন অমিতা সেন।

শান্তিনিকেতনে ফিরলেন সকলে। বৃষ্টিভেজা সকাল, পূর্ণ বসন্তের সৌন্দর্য সমস্ত প্রকৃতিতে। পলাশ ফুলে ফুলে ছেয়ে আছে বৃষ্টির জলে ধোয়া পথ। সব যেন প্রস্তুত হয়ে আছে আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রীকে শেষবিদায় জানাবে বলে। সেই ফুলবিছানো পথ দিয়ে তাঁর মরদেহ বহন করে গাড়ি এসে দাঁড়াল বাড়ির সামনে। সেখানে লোকে লোকারণ্য—ছাত্রছাত্রীরা, কর্মীরা, আশ্রমবাসী অন্যান্যরা সকলেই এসে জড়ো হয়েছেন আচার্যকে তাঁদের শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করবেন বলে। নিজের শয্যায় অল্পক্ষণের জন্য রক্ষিত হল তাঁর দেহ, সুজিতকুমার মুখোপাধ্যায় সংক্ষিপ্ত অন্ত্যেষ্টি-প্রার্থনা করলেন। তার পর পুষ্পাচ্ছাদিত দেহাবশেষ নিয়ে শোকযাত্রা আশ্রম পরিক্রমায় বেরোল—সংগীতভবন, কলাভবন, শ্রীভবন, রান্নাবাড়ি, বেণুকুঞ্জ, দিনান্তিকা, গুরুপল্লি, নিচুবাংলা, চিনাভবন, শিক্ষাভবন, পাঠভবন, হিন্দিভবন, দেহলি, নতুনবাড়ি, আম্রকুঞ্জ, শালবীথি, গ্রন্থাগার, বিদ্যাভবন, পাঠভবন হয়ে ছাতিমতলার পুণ্যভূমিতে কিছুক্ষণ অবস্থান। সেখান থেকে শান্তিনিকেতন গৃহ ও মন্দির ঘুরে শ্মশানের পথ। 'করো তাঁর নাম গান'—মিলিতকণ্ঠে গান হচ্ছে যাত্রাপথে। শেষকৃত্য করলেন পুত্র ক্ষেমেন্দ্রমোহন। পশ্চিমের আকাশটা সূর্যাস্তের রঙে রাঙা। চিতাটা জ্বলছে, পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে যাচ্ছে পার্থিব শরীর। সন্তান ও আত্মীয়রা, পরিচিত সব মানুষ, আশ্রমের স্নেহভাজন মানুষ কত—সকলে এখানে-ওখানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দাঁড়িয়ে, অল্প দূরে বসে আছেন সাবিত্রী কৃষ্ণন। আপনমনে ভজন গাইছেন একটার পর একটা। আর-একধারে বসে আছেন শৈলজারঞ্জন মজুমদার, তিনি গাইছেন রবীন্দ্রনাথের গান—অমনি আপন মনেই।

আচার্য ক্ষিতিমোহনের প্রয়াণসংবাদ এসে পৌঁছোলে তাঁর পরলোকগত আত্মার প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শন রূপে বিশ্বভারতীর সব বিভাগ বন্ধ রাখা হয়। পরের দিন ১৩ মার্চ বসন্তোৎসব ছিল, স্থগিত হল সে অনুষ্ঠানও। বন্ধ হয়ে গেল বিশ্বভারতীর কলকাতার অফিস। ১৩ মার্চ সকালে তাঁর স্মরণে শান্তিনিকেতন মন্দিরে উপাসনা করলেন সুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়। অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ভাষায় তিনি আচার্য ক্ষিতিমোহনের জীবন ও কর্মের কথা বললেন, বললেন বিশ্বভারতীর বৃদ্ধি ও অগ্রগতিতে তাঁর বিবিধ দানের কথা। সেদিনকার সংবাদপত্রগুলিতেও মৃত্যুসংবাদের সঙ্গে তাঁর জীবনপরিচয় প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর

লোকান্তরের সংবাদে ভারতবর্ষের নানা দিক থেকে পুরোনো ছাত্রছাত্রী, পরিচিত বন্ধুজন ও বিশ্ববিখ্যাত ব্যক্তিদের শোকবার্তা একে একে পৌঁছোতে শুরু করেছে শান্তিনিকেতনে।

২১ মার্চ তাঁর বাসগৃহে বৈদিক বিধিমতে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান হল। সন্ধ্যায় সেখানে সমবেত হলেন শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক ও অন্যান্য কর্মীরা, আশ্রমবাসীরা। সুজিতকুমার মুখোপাধ্যায় উপাসনা করলেন, উচ্চারণ করলেন বৈদিক মন্ত্র। সমবেত ও একক কণ্ঠে রবীন্দ্রসংগীত হল। এমন একটি মানুষের স্মরণ-উপাসনা বিচিত্র অনুভবে পূর্ণ করে তুলছে সবার হৃদয়, তাঁর স্বকণ্ঠে শোনা বৈদিক মন্ত্রের ধ্বনি এখনও শ্রোতাদের শ্রবণ থেকে হারিয়ে যায়নি। নানা উপলক্ষে আচার্যের আসনে উপবিষ্ট সেই মানুষের অবিস্মরণীয় উপাসনা কতবার কত শ্রোতার অন্তরে সোনার কাঠির স্পর্শ ছোঁয়াল যে।[১৫১]

সেই মানুষের সরল জীবনযাত্রা ও সুসমৃদ্ধ জীবনচর্যা, গভীর পাণ্ডিত্য ও বিস্ময়কর স্মৃতিভান্ডার আর সেই সঙ্গে অন্তরের সদা উৎসারিত আশ্চর্য রসবোধের গৌরব, গল্প বলায় ও আলাপচারিতায় তাঁর সহজাত ক্ষমতার জৌলুস, লোকধর্ম-সংস্কৃতির প্রতি তাঁর টান, সনাতন ভারতীয় ধর্মের প্রবাহ-বিশ্লিষ্ট এই ধারার জীবনদর্শনের প্রতি তাঁর সমর্পিত চিত্তের অনন্য আকর্ষণ, রবীন্দ্রনাথের পাশে থেকে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় ও বিশ্বভারতী গড়ে তোলার কাজে তাঁর সহযোগী ও সহকর্মীর ভূমিকা পালনের অবিস্মরণীয়তা, ছাত্রদের জন্য ভালোবাসা, একদিকে তাঁর বৈদগ্ধ্য এবং বাগ্মিতা আর অন্যদিকে তাঁর গভীর মানবতাবোধ ও সব গোঁড়ামিমুক্ত মনের বিনিময়ে পাওয়া দেশজোড়া শ্রদ্ধা সম্মান ও খ্যাতি, শান্তিনিকেতন-বিশ্বভারতীতে রবীন্দ্রোত্তর কালের প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তনের মধ্যেও আপনার চারিত্রগুণে অনায়াস-অর্জিত কর্তব্যে-আনন্দে বিজড়িত তাঁর কুলস্থবিরের মর্যাদা—সকল ঐহিক পরিচয়ের বন্ধন ছিঁড়ল এবার। 'একদিন তরীখানা থেমেছিল এই ঘাটে লেগে'—অবসিত হয়েছে সেই কাল। চিরদিন 'চরৈবেতি' মন্ত্র তাঁর প্রিয় অতি, এবার তাঁর যাত্রা শুরু কোন্ রহস্যময় অমৃতলোকে তা কে জানে।

কয়েকটি গ্রন্থপ্রসঙ্গ

'কবীর'

ক্ষিতিমোহন লিখেছেন :

> আশ্রমে যোগ দিয়ে দেখি, এক-একদিন সন্ধ্যাকালে আলোচনাসভা বসে। তাতে যোগ দিয়ে অসাবধানে কবীর দাদূ বাউল প্রভৃতির বাণী দুই-একটা বলে ফেলেছি। আমাদের প্রাচীন প্রথা অনুসারে এইগুলি প্রচার না করারই নিয়ম। নিরক্ষর ভক্তদের এই সব বাণী গুরুদেব প্রচার করবার জন্য ব্যাকুল হলেন।
>
> প্রথমে তিনি আমাকে ধরলেন কবীরের বাণী প্রকাশ করতে। তখন শিক্ষিত সমাজে কবীর অনাদৃত। কবীরের দুই-একখানা মুদ্রিত বাণী যা পাওয়া যেত তা তাঁকে দেখালাম, কিন্তু তিনি আমার সংগৃহীত ভক্তদের মুখে শ্রুত কবীরবাণী পছন্দ করলেন। কাজেই লোকমুখে শ্রুত ক্রমে চার কিস্তি কবীরবাণী প্রকাশিত হল।[১]

রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন : 'শান্তিনিকেতন গ্রন্থাবলীতে ধর্মপিপাসু লোকদের জন্য একত্রে নানা ব্যঞ্জনের ভোজের সৃষ্টি' করতে। 'কবীর' প্রথম খণ্ড এই শান্তিনিকেতন গ্রন্থাবলির অন্তর্ভুক্ত হয়ে প্রকাশিত হয়। তার ক্ষিতিমোহন লিখিত ভূমিকার তারিখ ১ আশ্বিন ১৩১৭। দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ খণ্ড যথাক্রমে প্রকাশিত হয় ২৮ জানুয়ারি ১৯১১ (১৪ মাঘ ১৩১৭), ২০ মে ১৯১১ (৬ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮) ও ২৮ আগস্ট ১৯১১ (১১ ভাদ্র ১৩১৮)।[২]

রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি চিঠি থেকে 'কবীর' প্রকাশের উদ্যোগপর্বের একটু আভাস পাই। তিনি চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন : 'কবীর শীঘ্র ক্ষিতিমোহন-বাবুকে পাঠাইবে।'[৩] প্রেরণীয় বস্তু হয়তো 'কবীর'-এর প্রুফ, কেননা বই তখনও প্রকাশিত হয়নি। অন্য একটি চিঠিতে পাচ্ছি : 'ভক্তবাণী ২য় খণ্ড পেয়েছি। তোমাদের ছাপার খরচ উঠে গেলে যে রকমভাবে দিতে চেয়েছ সেই কথা রইল।'[৪] মন অনুমান করতে চায় প্রসঙ্গটা সংকলক-অনুবাদকের সম্মানদক্ষিণার। এই দুটি চিঠিই ১৯০৯ সালে লেখা এবং পত্রপরিচিতিতে 'ভক্তবাণী' ক্ষিতিমোহনের 'কবীর' বলা হয়েছে। কিন্তু আমাদের ধারণা তা বোধ হয় নয়। 'কবীর' আশ্বিন ১৩১৭-র আগে প্রকাশিত হয়নি।

'কবিরের প্রত্যাশায় পথ চাহিয়া আছি—বিলম্ব ঘটাইবেন না।'[৫] —ক্ষিতিমোহনকে লিখেছিলেন : রবীন্দ্রনাথ। পরে আবার লিখলেন : 'কবীরকে আমার নমস্কার জানাইবেন।'[৬] পুনশ্চ : 'কবীর যতটা প্রস্তুত হইয়াছে মণিলালকে অবিলম্বে পাঠাইবেন। সে সেজন্য প্রস্তুত আছে। এখন হইতে পরবর্তী খণ্ডগুলির জন্য আর দেরি চলিবে না।'[৭] মনে হয় প্রথম খণ্ড প্রকাশের পরে অন্য খণ্ডগুলির জন্য কাজ ত্বরান্বিত করতে বলছেন রবীন্দ্রনাথ ক্ষিতিমোহনকে।

বইয়ের প্রুফ দেখতে গিয়ে তিনি নিজেও অনুবাদের কোথাও কোথাও প্রয়োজনবোধে কিছু পরিবর্তন করেছিলেন। একটি চিঠিতে তাঁকে ক্ষিতিমোহনকে লিখতে দেখি :

শিলাইদহে থাকতে অনেকটা প্রুফ আমার হাতে পড়েছিল—ক্রমে আমার সাহস বেড়ে যাচ্ছে এবার হস্তক্ষেপের মাত্রা যেন একটু বেশি হয়েছিল। ... এই সময়ে আপনার কাছে থাকিতে পারিতাম তবে দুইজনে পরামর্শ করিয়া প্রুফ দেখিতাম। শিলাইদহ হইতে চলিয়া আসিয়াছি বলিয়া শেষ অনেকখানি অংশের প্রথম প্রুফ দেখা আমার ঘটে নাই। প্রথম প্রুফ এইজন্য দেখিতে চাহিয়াছিলাম যে, আমার সংস্করণ যেখানে অসঙ্গত বোধ করবেন সেখানে আপনি সংশোধন করে নিতে পারবেন। যদি এখান থেকে শীঘ্র ফিরি তাহলে এখনো হয়তো সময় থাকবে।[৮]

এই চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ অনুবাদের দিকনির্দেশসূচক অনেকগুলি কথা বলেছেন। তিনি লিখেছেন :

কিন্তু আপনাকে ত বলেইছি—মূলকে অতি সামান্য পরিমাণেও ছাড়িয়ে যেতে আমার ইচ্ছা হয় না, তাতে যদি ভাব অস্পষ্ট হয় সেও ভাল। ভাবের কিছু পরিমাণ অস্পষ্টতাই দরকার—অতি স্পষ্ট হলে তার অর্থ ছোট হয়ে যায়—কবিতা ত তত্ত্ববিদ্যার ব্যাখ্যা নয় এইজন্যে তার কাছে স্পষ্ট কথার দাবী খাট্‌বে না।

কবিতায় কোন abstract কথা মানায় না—এই জন্যে কবিরের সাহেব কথাটিকে আমি বাংলায় স্বামী প্রভৃতি কোন নিকট সম্বন্ধসূচক শব্দের দ্বারাই তর্জ্জমা করা ভাল মনে করি—ঐ একটি কথা নানা জায়গায় নানাভাবে প্রকাশ পাবে—যেমন আমাদের মানুষ বন্ধু বিচিত্র অবস্থা ও উপলক্ষ্যে আমাদের কাছে নব নব ভাবে ব্যক্ত হন অথচ প্রত্যেক বারেই সেজন্যে তাঁকে নবরূপ গ্রহণ করতে হয় না এও সেই রকম।

"আপা" শব্দ ত অভিমান অর্থে ব্যবহৃত হতেই পারে। কিন্তু অভিমান কথা abstract। "আপনা" কথাটাও অভিমান বোঝায় অথচ তার চেয়ে সহজে অনেক বেশী বোঝায়।

"শব্দ" কথা সঙ্গীত বল্লে খাটো করা হয়—এবং দেখেছি কবীর যে বিশেষ কবিতায় "শব্দ" নিয়ে মেতেছেন সেখানে "সঙ্গীত" কথাটা সব জায়গায় ভালো করে খাটে না—"শব্দ" কথার মধ্যে একটি আদিম ধ্বনির ভাব আছে—সে যেন সৃষ্টির প্রথম মন্ত্র, ভূমিষ্ঠ শিশুর প্রথম কান্না, তা ওঙ্কারের মত—অর্থাৎ তা অত্যন্ত সহজ এবং ব্যাপক—তা গানের চেয়ে সরল এবং গভীর। যাই হোক্ কবির যখন শব্দ কথাটা ব্যবহার করেছেন, তখন তিনি ওটাকে যে অর্থেই ব্যবহার করুন না কেন মূল শব্দটা রেখে দেওয়াই ভাল। বরঞ্চ এ সম্বন্ধে ভূমিকায় আলোচনা করা চলে।[৯]

'কবীর' প্রথম খণ্ড প্রকাশকালে ক্ষিতিমোহন যে ভূমিকা লিখলেন সেটি আয়তনে ছোটো হলেও বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কথা ছিল তাতে।

...তাঁহার [কবীরের] নামে প্রথিত যে সব জঞ্জাল ও সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণ দোহা প্রভৃতি প্রচলিত আছে, তাহাতে তাঁহার সত্যকে আরও আচ্ছন্ন করিয়াছে।

সুতরাং তাঁর বিবেচনায় সংকলনের প্রয়োজনে পদগুলির যথার্থ বিচার ও নির্বাচনের প্রয়োজনীয়তা ছিল। তিনি জানিয়েছেন বিভিন্ন পাঠের মধ্যে যে পাঠটি তাঁর সংগত মনে হয়েছে এবং সাধকরা যে পাঠটি সংগত মনে করেছেন, এই সংগ্রহে সেইটিকেই গ্রহণ করেছেন তিনি। যাঁদের কণ্ঠে শোনা কবীরভজন থেকে এবং যাঁদের সংগ্রহ করা কবীর

সাথীর হাতে-লেখা পুথি থেকে তিনি সাহায্য পেয়েছেন তেমন কয়েকজন সাধকের নাম উল্লেখ করলেন। অনেকে কবীরের বচনের মধ্যে থেকে নানা শব্দ তুলে তার স্থানে 'রাম' শব্দ বসিয়েছেন, বর্তমানে যাঁরা অনেকেই রামোপাসক। কিন্তু দশরথপুত্র রামকে কবীর যে একেবারেই মানতেন না এবং তাঁর উপাস্য যে রাম তার অর্থ যে আত্মাতে যিনি রমণ করেন এ কথা ক্ষিতিমোহন উল্লেখ করলেন এই ভূমিকায়। কবীরের পরিভাষাগত কিছু কিছু সমস্যা যে অনুবাদে সমস্যা ঘটায় এই প্রসঙ্গে বললেন এ কথা। কেন এবং কোথায় অনুবাদ করতে গিয়ে মূল থেকে সামান্য সরতে হয় তার ব্যাখ্যা দিয়ে বললেন অনুবাদ যতটা সম্ভব যথাযথ করেছেন তিনি। অনুবাদপ্রসঙ্গে এবং তার সুবিধা-অসুবিধা নিয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর নানা সময় আলোচনা হয়েছিল, এ ব্যাপারে রবীন্দ্রভাবনার সামান্য একটু পরিচয় তাঁর চিঠিতে পেয়ে উদ্ধৃত করেছি। আমরা দেখি 'সাহব' শব্দ কবীরের অনুবাদে রবীন্দ্র-প্রস্তাব-মতোই কোথাও 'ঈশ্বর' কোথাও 'ব্রহ্ম' প্রভৃতি করা হয়েছে, যদিও ভূমিকায় কবীর-পরিভাষার পরিচয়প্রসঙ্গে ক্ষিতিমোহন শুধু লিখেছেন 'সাহব = স্বামী'। 'শব্দ' শব্দের বড়ো চমৎকার ব্যাখ্যা রবীন্দ্রনাথ তাঁর চিঠিতে দিয়েছেন, সে তুলনায় সংক্ষেপে ক্ষিতিমোহন শুধু বলেছেন, 'সাধনার সঙ্গীতকেই শব্দ বলা হয়, কবীরের সঙ্গীতাবলীর নাম শব্দাবলী'।

ভূমিকায় ক্ষিতিমোহন কবীরের জীবনপরিচয় সম্পর্কে সামান্য দু-এক কথা বলেছেন। এই বইয়ের প্রথম আনন্দ সংস্করণ (অখণ্ড)-এর প্রাক্‌কথন-এ তবু সেই সামান্য দু-চার কথার উপর ভিত্তি করে ড. সব্যসাচী ভট্টাচার্য বেশ দীর্ঘ আলোচনা করেছেন, দেখতে পাই। তুলনামূলকভাবে অনেকদিন পরে লেখা 'কবীর' (১৩২৯) প্রবন্ধে ক্ষিতিমোহন বরং কবীরের জীবনপরিচয় বেশ একটু বিস্তৃতভাবে দিয়েছিলেন। সে প্রবন্ধে তিনি কবীরের জন্মমৃত্যুর সন-তারিখ বিচার করতে চাননি, তাঁর অভীষ্ট ছিল এই সন্তপ্রবরের জীবন ও বাণীর মর্মবিশ্লেষণ। আর-একটিও বেশ বড়ো প্রবন্ধ আছে তাঁর—'ভক্ত কবীর' (১৩৫৯)। এ ছাড়া 'কবীরের গুরুবন্দনা', 'ভক্ত কবীরের বসন্তোৎসব' প্রভৃতি প্রবন্ধও উল্লেখ করবার মতো। তা ছাড়া তো অনেক প্রবন্ধেই প্রসঙ্গত কবীরবাণী এসেছে, এসেছে কবীরের জীবনের কোনো প্রসঙ্গ।

কিন্তু এটাও আমরা লক্ষ করি, সারাজীবনে ক্ষিতিমোহন নানা বিষয়ে গবেষণা করলেন, অনেকগুলি গ্রন্থ প্রকাশিত হল তাঁর, কিন্তু কবীর-বিষয়ে এই চার খণ্ড পদসংকলন ছাড়া আর কোনো বই প্রকাশিত হল না। অথচ কবীরপ্রেম তাঁর সুগভীর, চোদ্দো বছর বয়স থেকেই তিনি কবীরপন্থী, সেটা মাত্র কথার কথা নয়। তাঁর 'দাদূ' প্রকাশিত হয় ১৯৩৫ সালে। এই বইতে যে-ভাবে সাধক দাদূর প্রামাণ্য জীবনী ও সানুবাদ বাণীসংকলন স্থান পেয়েছে, সেই একই আদর্শে 'কবীর'-এর নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হওয়া প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তা হয়নি কেন? হয়তো অনেক কাজের চাপে ক্ষিতিমোহন আর এ কাজ করতে পারেননি। কিন্তু বিশ্বভারতী নিউজ পত্রিকায় এই কাজ যে ক্ষিতিমোহন করছেন তার খবর আছে। ১৯৩০-৩১ সালের বিশ্বভারতী বার্ষিক বিবরণে লেখা হয়েছে তিনি কবীরজীবনী

লেখা ও তাঁর পদসংকলন সম্পাদনার কাজ শেষ করেছেন, তা গ্রন্থাকারে প্রকাশের অপেক্ষায়।[১০] তবে?

'কবীর'-এর ভূমিকায় তিনি বলেছিলেন : 'কবীরের একটি বিস্তৃত প্রবেশিকা ও জীবনী কবীরের রচনাবলী সব খণ্ড মুদ্রিত হইলে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা আছে। এইরূপ অনেক খণ্ড ছাপিবার মত সংগ্রহ আমাদের হাতে আছে।' বহুদিন পরে 'ভারতীয় মধ্যযুগে সাধনার ধারা'-য় কবীর প্রসঙ্গে 'নিবেদন'-এ তাঁর বক্তব্য আমরা যা পাই তা হল :

> প্রথম সকলের কাছে এই-সব বিষয়ে জানাইতে আমার সংকোচ ছিল। তারপর ইহাও জানিতাম যে গ্রন্থপ্রকাশক আমার এই কাজে হাত দিবেন তাঁহাকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে। তবু ইন্ডিয়ান প্রেস রাজী হইলেন আর কবিবরের অসহনীয় তাগিদে কবীরের কয়খণ্ড প্রকাশ করিতে হইল। কবীরের মুখ্য বাণীর মাত্র চারটি খণ্ড প্রকাশ হইয়াছিল। এই রকম দশটি খণ্ড বাহির হইলে কবীরের কতকটা পরিচয় দেওয়া যাইত।[১১]

মাত্র এই চার খণ্ড কবীর-পদসংকলন প্রকাশের লক্ষ্য নিয়ে যে ক্ষিতিমোহন কাজ আরম্ভ করেননি, তার একটা ইঙ্গিত কবীর বইয়ের ভূমিকা থেকেই পাওয়া যায়। পরে তিনি একবার এই সংকলনের পশ্চাদ্‌বর্তী রবীন্দ্রনাথের বিস্তীর্ণ পরিকল্পনা প্রসঙ্গে লিখেছিলেন :

> অনেকদিনের কথা, তখনও বিশ্বভারতী স্থাপনা হয় নাই, তিনি শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম লইয়াই আছেন। তখনই তিনি আমাকে আদেশ করিলেন মধ্যযুগে ভারতের প্রাকৃত অক্ষরজ্ঞানহীন সাধকদের সাধনার মধ্যে সেই একই সত্য যে আগাগোড়া চলিয়াছে তাহা সকলের দৃষ্টির সম্মুখে ধরিতে। শাস্ত্র ও গ্রন্থের মধ্য দিয়া যেই সংস্কৃত সাধনা দেখান যায় সেইখান হইতে তিনি আমাকে অন্যক্ষেত্রে সরাইয়া লইয়া গেলেন।[১২]

ক্ষিতিমোহনের কবীর-পদসংকলনের মূল্যায়নপ্রসঙ্গে ড. হাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী যা বলেছেন, তার উল্লেখ এখানে করলাম না, সে আলোচনা আসবে এর পরে One Hundred Poems of Kabir-এর আলোচনায়।

'One Hundred Poems of Kabir'

> কবীরের রচনা ও জীবন আলোচনা করিলে স্পষ্টই দেখা যায় তিনি ভারতবর্ষের সমস্ত বাহ্য আবর্জনাকে ভেদ করিয়া তাহার অন্তরের শ্রেষ্ঠ সামগ্রীকেই ভারতবর্ষের সত্য সাধনা বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছিলেন। এইজন্যে তাঁহার পন্থীকে বিশেষরূপে ভারতপন্থী বলা হইয়াছে। বিপুল বিক্ষিপ্ততা ও অসংলগ্নতার মধ্যে ভারত যে কোন্ নিভৃতে সত্যে প্রতিষ্ঠিত আছেন তাহা যেন ধ্যানযোগে তিনি স্পষ্ট দেখিতে পাইয়াছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন : 'ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা' প্রবন্ধে। এ প্রবন্ধ লেখা হয় 'কবীর' প্রকাশের পরে, ১৯১২ সালে। ক্ষিতিমোহনের কবীরচর্চা রবীন্দ্রনাথকে উদ্দীপিত করেছিল।[১৩] সত্যদ্রষ্টা কবীরের উপলব্ধিতে প্রতিভাত ভারতের সত্যপ্রতিষ্ঠার এই অনুভব

রবীন্দ্রনাথের হৃদয় থেকে হারিয়ে গেল না কোনোদিন। এর কিছুদিন পরেই তিনি ইংল্যান্ডে গেলেন, সেখান থেকে আমেরিকা ঘুরে আবার ইংল্যান্ড। সব জায়গাতেই পণ্ডিত ও বোদ্ধা মানুষের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার সময় ভারতীয় মরমিয়াদের সত্যদর্শনপ্রসঙ্গ বারবার এল। সেসময়ে পশ্চিমের মানুষের কাছে ভারতীয় মিস্টিকদের সাধনার ব্যাখ্যা করবার জন্য ক্ষিতিমোহনকে নিয়ে যেতে তাঁর ইচ্ছা হয়েছিল। সে প্রসঙ্গ আগেই আলোচনা করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ নিজেও কবীরদোঁহার ইংরেজি অনুবাদে উদ্যোগী হলেন। অজিতকুমার চক্রবর্তীও কবীরবাণীর রসে আকৃষ্ট হয়ে নিজের খেয়ালে অনেকগুলি পদ ইংরেজিতে অনুবাদ করে সেগুলি একটি খাতায় কপি করেছিলেন পিয়র্সন সাহেব। মনে হয় রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছায় ১৯১৩ সালের মাঝামাঝি সময়ে সেই খাতা তাঁর কাছে ইংল্যান্ডে পাঠানো হয়। সেগুলি থেকে বেছে, পরিবর্তন-পরিমার্জন করে তিনি একশোটি দোঁহা প্রকাশার্থে প্রস্তুত করেন। এই নির্বাচিত কবীর-পদসংকলন 'One Hundred Poems of Kabir' নামে ফেব্রুয়ারি ১৯১৫-তে প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ 'কবীর'-এর প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড থেকে দোঁহাগুলি নির্বাচন করেছিলেন।[১৪]

অনুবাদপ্রসঙ্গে অজিতকুমার চক্রবর্তীকে লেখা ও সন্তোষচন্দ্র মজুমদারকে লেখা রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি চিঠি আমরা টীকা অংশে যোগ করলাম।[১৫] কেন রবীন্দ্রনাথ কবীর-দোঁহা অনুবাদে প্রবৃত্ত হলেন, কেন সেগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশে উদ্যোগী হলেন, তার উত্তর রবীন্দ্রনাথের লেখা চিঠিতে পাই, সে চিঠি আমরা আগে দেখেছি। ক্ষিতিমোহনকে তিনি লিখেছিলেন ভারতের ভক্তি আন্দোলনের বিচিত্র ধারার পরিচয় তিনি পাশ্চাত্য সমাজের গোচরে আনতে চান। কবীর দাদূ মীরাবাই জ্ঞানদাস প্রমুখ সাধক-কবিদের রচনা, বাউলদের গান প্রভৃতি নিয়ে ক্ষিতিমোহনকে ইংল্যান্ডে যেতে তিনি আহ্বান করেছিলেন, তার কারণ তাঁর মনে হচ্ছিল ভারতবর্ষ তার নিজের দেশবাসীর কাছে অনাদৃত ও প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে। তাই শুধু ইংরেজদের কাছে ভারতীয় মিস্টিকদের পরিচয় দিয়ে তাদের উপকার করবার জন্য নয়, সে দেশের স্বীকৃতি ও প্রশংসা লাভ করে না এলে স্বদেশের প্রকৃত পরিচয় আমাদের দেশের মানুষের কাছে উন্মোচিত হবে না বলেও রবীন্দ্রনাথ ক্ষিতিমোহনকে নিয়ে যাওয়ার কথা ভাবছিলেন। এই সময়কার একটি চিঠি এখানে তুলে দেওয়া যেতে পারে, এটি এই গ্রন্থে পূর্বে উদ্ধৃত হয়নি। ভারতের মধ্যযুগীয় ধর্মান্দোলনের ইতিহাস সব মানুষের অবগতির সীমানায় এনে দেওয়ার জন্য রবীন্দ্রনাথের মাধ্যমে যে আগ্রহ ও উদ্যোগের সৃষ্টি সেসময় হয়েছিল, তার পরিচয় এতেও আছে :

> ক্ষিতিমোহনবাবুকে এখানকার India Society ইংলণ্ডে আনিয়ে নিয়ে এই mystic সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়ে তাঁর কাছ থেকে ভারতের মরমিয়াদের জন্মকথা আদায় করে নেবে বলে স্থির করেছে। India Society-র সেক্রেটারি Fox Strangways এই প্রসঙ্গ নিয়ে আমার কাছে এসেছিলেন। তিনি স্বয়ং এ সম্বন্ধে ক্ষিতিমোহনবাবুকে চিঠি লিখবেন বলেছেন। বোধ হয় দুই এক মেলের মধ্যে তিনি পত্র পাবেন। Fox Strangways বলছেন যে ওঁদের সমস্ত পাকা স্থির হয়ে গেলে সম্ভবত তিনি ক্ষিতিমোহনবাবুকে টেলিগ্রাফ করবেন। সেই

টেলিগ্রাফ পেয়ে তিনি এখানে চলে এলে পর এরা তাঁর পথখরচ সমস্ত শোধ করে দেবেন—এ সম্বন্ধে ক্ষিতিমোহনবাবু মনে যেন কোন দ্বিধা না করেন। তাঁর পুঁথিপত্র সব নিয়ে আসেন যেন। এঁরা তুকারামের অভঙ্গের কথা আমাকে বলছিলেন, তাই আমি তুকারামের কথা তাঁকে পূর্ব্বেই লিখেছি। এই সব লোকদের জীবনী প্রভৃতি সম্বন্ধে যা কিছু তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব তা যেন তিনি না ভোলেন। ভারতের মধ্যযুগের ধর্মান্দোলনের ইতিহাসটি মানব ইতিহাসের মধ্যে একটি মস্ত জিনিষ—একে সাধারণের গোচর করবার সময় এসেছে। এখানে India Office এর Library তে তিনি এ সম্বন্ধে সকল রকম বইই পাবেন। যা কিছু বই ভারতবর্ষে ছাপা হয়েছে তা সবই এখানে আছে। তাছাড়া ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যা কিছু বই কোথাও প্রকাশ হয়েছে তা সমস্তই তিনি হাতের কাছে পাবেন। তাঁর সঙ্গে একত্রে কাজ করবার জন্যে যাতে মনের মত লোক তিনি পান সে সম্বন্ধেও ব্যবস্থা করা যাবে। এখন থেকে সেপ্টেম্বরের প্রায় শেষ পর্য্যন্ত এখানকার সকল কাজেই ছুটি এই একটি মুস্কিল হয়েছে। আমার বিশেষ ইচ্ছা ছিল আমি থাকতে থাকতেই ক্ষিতিমোহনবাবু আসেন তাহলে আমি তাঁর সম্বন্ধে সকল বিষয়েই অনেকটা গুছিয়ে দিয়ে যেতে পারতুম। যা হোক এখনো চেষ্টা করব।[১৬]

ফক্স স্ট্রাঙ্গওয়েজের কোনো চিঠি বা টেলিগ্রাফ সম্ভবত আসেনি ক্ষিতিমোহনের কাছে। তাঁর যাওয়া হয়নি শেষপর্যন্ত। উদ্যোগটা থেমে যায়। যাই হোক, রবীন্দ্রনাথের উদ্যোগের আর-এক কারণ অনুমান করেছেন অধ্যাপক সৌরীন্দ্র মিত্র তাঁর 'খ্যাতি অখ্যাতির নেপথ্যে' গ্রন্থে, সে অনুমান যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ হয়তো নয়।[১৭] ক্ষিতিমোহন নিজে কিন্তু আর-এক কারণের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তিনি রবীন্দ্রনাথের মুখের কথা উদ্ধৃত করে বলেছেন :

ইংরেজী গীতাঞ্জলি প্রকাশিত হলে যখন পাশ্চাত্ত্য একদল ধর্মব্যবসায়ী বলতে প্রবৃত্ত হলেন, এইসব কথা খ্রীষ্ট ধর্মেরই প্রভাবে লেখা, তখন আমাদের দেশেরই বহু লোক সেই সব কথা আরও জোরে প্রতিধ্বনিত করতে প্রবৃত্ত হ'লেন। ... তখন আমাকে বাধ্য হয়ে কবীরের অনুবাদ করে দেখাতে হোলো, এই জাতীয় চিন্তা ভারতে ইংরাজ আমলেই আসে নি। এইসব চিন্তা তারও পূর্বে এই দেশে ছিল, কবীরের মধ্যেও ছিল। কবীরের পূর্বেও ছিল। কতকাল হতে এইসব ভাব চলে আসছে তা বলা শক্ত। হয়তো বেদ উপনিষদের পূর্ব হতে চলে আসছে এইসব চিন্তার ধারা।[১৮]

রবীন্দ্র-কাব্যে পাশ্চাত্যপ্রভাবপ্রতিষ্ঠায় মিশনারিদের চেষ্টার প্রসঙ্গ ১৯৪৪ সালে লেখা ক্ষিতিমোহনের 'ভারতীয় সাধনার ধারায় রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধে আরও বিস্তারিত আলোচনা আছে।

প্রথমে রবীন্দ্রনাথ আমেরিকাতে থাকাকালে কবীরজীবনী ও কবীর দোঁহাবলির ইংরেজি অনুবাদ সেখান থেকেই প্রকাশ করা সম্ভব হবে বলে মনে করেছিলেন। ক্ষিতিমোহনকে লিখেছিলেন :

সম্ভবত এখানে এঁদের সহযোগে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কবীরের গ্রন্থ ও জীবনী প্রকাশের ব্যবস্থা হতে পারবে অতএব তার মালমসলা নিয়ে আসবেন। আমি এ সম্বন্ধে এঁদের সঙ্গে কথা কয়ে রেখেছি।[১৯]

লন্ডনে ফিরে এ সিদ্ধান্ত বদলে যায়, আমরা দেখেছি। ইভলিন আনডারহিলের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয় আমেরিকাযাত্রার আগেই এবং আলাপের আগেই শুনেছিলেন 'ইনি খুব ক্ষমতাশালিনী বিদুষী।'[২০] লন্ডনে আবার ফিরে এসে যখন রবীন্দ্রনাথ ক্ষিতিমোহনকে সেখানে নিয়ে যাওয়ার জন্য উদ্যোগী হয়েছিলেন, তখন মধ্যযুগীয় সাধক ও বাংলার বাউলদের রচনা যতটা সম্ভব সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে তিনি তাঁকে লেখেন :

> এখানে Evelyn Underhill প্রভৃতি কোনো একজন রসজ্ঞ লোকের সহযোগে এই জিনিষগুলি ইংরেজি ভাষায় প্রকাশ করবার আয়োজন করতে হবে।[২১]

এতটা করা সম্ভব না হলেও কবীর-অনুবাদে ইভলিন আনডারহিলকে রবীন্দ্রনাথ সহযোগী পেয়ে আনন্দিত হয়েছিলেন বলে মনে হয়। অজিতকুমার চক্রবর্তীকে লিখেছিলেন কবীর সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখে পাঠাতে, যেটি এই অনুবাদ গ্রন্থের ভূমিকারূপে ব্যবহৃত হবে। সন্তোষচন্দ্র মজুমদারকেও লেখেন :

> Mrs. Stuart Moore (Evelyn Underhill) এই কাজে আমার সঙ্গে যোগ দেবেন বলে প্রতিশ্রুত হয়েছেন। তাতে আমাতে মিলে জিনিষটাকে সম্পূর্ণ খাড়া করে তুলতে পারব বলে মনে হচ্চে। কবীরের কবিতার ভিতরকার তত্ত্ব সম্বন্ধে অজিত যদি একটি প্রবন্ধ লিখে পাঠান তাহলে সেটি গ্রন্থের গোড়ায় প্রকাশ করা যেতে পারবে।[২২]

সম্ভবত একটা প্রত্যাশা জেগেছিল যে এ বই অজিতকুমারের নামে প্রকাশিত হবে, তা হয়নি। কার্যত, কবীর-অনুবাদ সংকলন-সম্পাদনা ছাড়াও ইভলিন আনডারহিলের উপরই এর ভূমিকা লেখার দায়িত্বও বর্তেছিল। এ কাজে তাঁরও ঔৎসুক্য যথেষ্ট ছিল।[২৩] ভূমিকায় আনডারহিল যথোচিত সৌজন্যে ক্ষিতিমোহন সেন ও অজিতকুমার চক্রবর্তীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। তিনি লিখেছেন ক্ষিতিমোহন সেনের বাংলা অনুবাদ সহ কবীরের দোঁহাবলির যে হিন্দিপাঠ বই আকারে প্রকাশিত হয়েছে, One Hundred Poems of Kabir তারই ভিত্তিতে রচিত। ক্ষিতিমোহন সেন যে মূল কবীরদোঁহার পাঠগুলি বহু সূত্র থেকে সংগ্রহ করেছেন, করেছেন ছাপা বই ও পাণ্ডুলিপি থেকেও কখনও, কিংবা ভবঘুরে সাধু ও চারণ কবিদের মুখে শুনেও কখনও বা, কবীরের নামে অসংখ্য দোঁহা প্রচলিত আছে, তার মধ্যে থেকে ক্ষিতিমোহন সেন যে অতি সতর্ক ও সূক্ষ্মভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করে কেবলমাত্র অকৃত্রিম কবীরপদগুলি সংকলনে স্থান দিয়েছেন, সে কথা ভূমিকায় গুরুত্বের সঙ্গে বলা হয়েছে। বলা হয়েছে তাঁর এই অত্যন্ত শ্রমসাধ্য যত্নশীল কাজের উপর নির্ভর করেই এই অনুবাদসংকলন প্রকাশ করা সম্ভব হল। এই ভূমিকা থেকে আরও জানতে পারি যে অনুবাদগুলি করার সময় তাঁদের সামনে ক্ষিতিমোহন সেনের 'কবীর'-এর একশো ষোলোটি পদের ইংরেজি অনুবাদের একটি পাণ্ডুলিপি ছিল, সেটি অজিতকুমার চক্রবর্তীর করা এবং সেই পাণ্ডুলিপি থেকে যথেষ্ট সাহায্য তাঁরা পেয়েছেন। এঁরই লেখা একটি কবীর-সম্পর্কিত ইংরেজি প্রবন্ধ থেকেও বেশ কিছু তথ্য

তিনি ব্যবহার করেছেন ভূমিকায়। এই উদার ও নিঃস্বার্থ সাহায্যের জন্য অজিতকুমারকে সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানিয়েছেন ইভলিন আনডারহিল।[২৪] এ কথা মনে করতে দ্বিধা নেই যে, ক্ষিতিমোহনের কাছ থেকে উপকরণ নিয়ে এবং তাঁর সঙ্গে আলোচনা করে অজিতকুমার চক্রবর্তী ইংরেজি প্রবন্ধটি প্রস্তুত করেছিলেন।

অজিতকুমারের কবীর-অনুবাদের খসড়া খাতাখানি One Hundred Poems of Kabir-এর পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতে সহায়ক হয়ে থাকলেও রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি চিঠি অনুসরণে এও জানা যায় যে, ইভলিন আনডারহিলের সঙ্গে কাজ আরম্ভ করার আগে এই খসড়া-অনুবাদগুলিকে প্রকাশযোগ্য রূপ দিতে তাঁকে যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হয়েছিল। তা সত্ত্বেও অজিতকুমারকে লেখা তাঁর চিঠি থেকে বোঝা যায় যে, তিনি নিজেও ভেবেছিলেন অজিতকুমারের নামেই এই অনুবাদ সংকলন প্রকাশিত হবে। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে এমনও লেখেন :

> তোমার এ বইয়ে অর্থলাভের সম্ভাবনা কত দূর তা বলতে পারি নে। অবশ্য চেষ্টার ত্রুটি হবে না কিন্তু বেশি আশা কোরো না। যা পাও তাই যথেষ্ট। কেন না এ জিনিষের উপর তোমার দাবীও অল্প কারণ এর ভিত্তিতে ক্ষিতিমোহনবাবু আছেন. এখানকার ব্যবসায়ের নিয়মে একটা মোটা প্রাপ্য তাঁরই। কবির তিনি কেবল সংগ্রহ করেছেন তা নয়, তাঁর অনুবাদ অবলম্বন করেই এই অনুবাদগুলি রচিত—যথার্থ পরিশ্রম সে তাঁরই...।[২৫]

অজিতকুমারকে লেখা রবীন্দ্রনাথের ২১ জুলাই ১৯১৫ তারিখের চিঠিতেও কবীরপ্রসঙ্গ আছে। One Hundred Poems of Kabir তার কয়েক মাস আগেই প্রকাশিত হয়ে গেছে।

> কবীর গ্রন্থ সম্বন্ধে তুমি একটু ভুল বুঝেচ। প্রথমত গ্রন্থ থেকে তোমার নাম বাদ দেওয়া হবে Evelyn Underhill এমন ইচ্ছা করেন না। দ্বিতীয়ত আর্থিক হিসাবে তোমাকে ও ক্ষিতিমোহনবাবুকে যে বঞ্চিত করা হবে এমন ইচ্ছাও আমার নয়। সম্ভবত E. Underhill কিছুই নেবেন না। কিম্বা ১৫/২০ পাউণ্ড একযোগে নিয়ে সন্তুষ্ট থাকবেন। তারপর জানই ত আমি কিছুই নেব না। কেবল আমার নাম ও কাজের পরিবর্ত্তে যে মূল্য পাওয়া যাবে তা আমি বিদ্যালয়কেই দেব এবং সেই সঙ্গে তোমাদের দুজনকেও স্মরণ করব। এ কথা আগে থেকে বলবার ইচ্ছা ছিল না কিন্তু বলে রাখাই ভাল। এক কাজ করব Macmillanদের লিখে দেব এ সম্বন্ধে তোমাদের সঙ্গে কোনোভাবে একটা কিছু কথাবার্তা তারা ঠিক করে দেবে।[২৬]

সত্যিই কি কথাবার্তা কিছু হয়েছিল প্রকাশকের সঙ্গে? অজিতকুমার বা ক্ষিতিমোহনের অর্থ প্রাপ্তির সুযোগ হয়েছিল কি? ইভলিন আনডারহিলের ভূমিকায় এঁদের নামোল্লেখটুকু প্রামাণ্য, বাকি সবটাই অপরিজ্ঞাত।[২৭]

ইভলিন আনডারহিল যে One Hundred Poems of Kabir-এর ভূমিকা লিখলেন, ক্ষিতিমোহন এবং অজিতকুমার সেটা সুনজরে দেখেননি। ক্ষিতিমোহন স্পষ্টই বলেছেন যে, তিনি উপযাচিকা হয়ে এই ভূমিকা লেখবার জন্য কবিকে ধরেন।

> মহিলাটি খৃষ্টীয় মরমীদের সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ হইলেও ভারতীয় ক্ষেত্রে তাঁহার কোনো জানাশোনা ছিল না। অথচ কবি এই সহসাগত দাবীদারটিকে চক্ষুলজ্জার খাতিরে সরাইতে পারিলেন না। বাধ্য হইয়া কবি আমাদের কাছ হইতে ভূমিকার উপকরণ লইয়া তাঁহাকে দিলেন। তিনি যে ভূমিকা লিখিলেন তাহাতে কবির প্রভৃতি মধ্যযুগের সন্তদের উপরেও আগাগোড়া খৃষ্টীয় প্রভাবই প্রতিপন্ন করার জন্য ধনুর্ভঙ্গপণ।

ইভলিন আনডারহিলের রবীন্দ্রনাথকে লেখা চিঠি থেকে যা জানা যায় সেই অনুসারে বলা চলে ক্ষিতিমোহন ও অজিতকুমার দেখে দেবেন বলে এই ভূমিকার খসড়া রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে পাঠিয়েছিলেন। ক্ষিতিমোহন লিখেছেন যে কবীর প্রমুখ ভারতীয় মধ্যযুগীয় সন্তদের উপরে খ্রিষ্টীয় প্রভাব ছিল—আনডারহিলের এ বক্তব্যের প্রতিবাদ করা তাঁদের পক্ষে জরুরি হয়ে পড়ে।

> আমার হইয়া তখন রবীন্দ্রনাথের চিরঅনুরাগী গুণজ্ঞ পরলোকগত অজিতকুমার চক্রবর্তী এক সুদীর্ঘ প্রতিবাদ লিখিলেন। ফলে ভূমিকার একটু পরিবর্তন হইল। তাহাতে সিদ্ধান্ত দাঁড়াইল এই যে "কেহ কেহ এইসব সন্তদের উপর খৃষ্টীয় প্রভাব মানিলেও এই বিষয়ে নানাপ্রকার মত আছে, কাজেই এই বিষয়ে কিছু লেখা হইল না।" (ঐ ভূমিকার ৭ম পৃষ্ঠা)। তবে নানা স্থানে সমতুল্য পূর্ববর্তী খৃষ্টীয় চিন্তাগুলি তিনি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। যদিও তাহার পূর্ববর্তী ভারতীয় বাণীগুলির কথা হয়তো তিনি জানেন না, অথবা দেওয়া প্রয়োজনীয় মনে করেন নাই।[২৮]

কবীরের সময়কাল চতুর্দশ শতাব্দী। ক্ষিতিমোহন তাঁর সময় নির্ধারণ করেছেন ১৩৯৮-১৫১৮। ইভলিন আনডারহিল তাঁর ভূমিকায় যে-সব খ্রিষ্টীয় সন্তদের উল্লেখ করেছেন তাঁদের মধ্যে বেশ কয়েকজনের সময়কাল চতুর্দশ থেকে ষোড়শ শতাব্দী, একজন আছেন দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীর, একজন আছেন চতুর্থ-পঞ্চম শতাব্দীরও। দেখা যাচ্ছে ক্ষিতিমোহন-অজিতকুমার ইভলিন আনডারহিলের এই দাবি মানতে প্রস্তুত ছিলেন না যে, রামানন্দ ও কবীরের মতো ধর্মগুরুরা খ্রিষ্টীয় চিন্তা ও জীবনের দ্বারা প্রভাবিত। 'ভারতীয় সাধনার ধারায় রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধে এই ব্যাপারে তাঁর প্রতিবাদের একটি যুক্তি হল কবীরের সমভাবের খ্রিষ্টীয় চিন্তাগুলি দেখাবার দিকে ইভলিন আনডারহিল নজর দিয়েছেন, কিন্তু তার পূর্বেকার সমতুল ভারতীয় ধর্মোপলব্ধির বাণীগুলি সম্পর্কে তিনি নির্বাক অথবা অজ্ঞ।

১৯১৩ সালের শরৎকালে বইটি প্রকাশের ইচ্ছা কাজে পরিণত হয়নি। রবীন্দ্রনাথ স্বদেশে ফিরে এসেছিলেন বলেও বিলম্ব বাড়ে। অবশেষে One Hundred Poems of Kabir-এর India Society সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯১৪ সালে, পরের বছরে Macmillan সংস্করণ। ইভলিন আনডারহিলের প্রতি এই গ্রন্থের ব্যাপারে ক্ষিতিমোহনের অপ্রসন্নতাটুকু কোনোদিন যায়নি বটে, তবু বই প্রকাশিত হলে অন্তত দুটি বিষয়ে ক্ষিতিমোহনের আন্তরিক আনন্দের কারণ ঘটেছিল।

> ...কবির আগ্রহাতিশয্যে ১৯১৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে কবীরের অনুবাদের প্রথম সংস্করণ বাহির হইল। ছয় মাস পরেই আবার গ্রন্থখানি ছাপিতে হইল। সারা য়ুরোপ ও আমেরিকায় গ্রন্থখানি সাদরে গৃহীত হইল। এই উপলক্ষে পৃথিবীর নানা অংশ হইতে জিজ্ঞাসুদের সুন্দর

> সুন্দর সব প্রশ্ন আসিতে লাগিল ; তার মধ্যে রুশদেশীয় কয়েকজন জিজ্ঞাসুর জিজ্ঞাসা যেমন যুক্তিযুক্ত ও গভীর তেমনই শ্রদ্ধাপূর্ণ।[২৯]

রবীন্দ্রনাথ কি এ-সব চিঠির উত্তর দেওয়ার জন্য ক্ষিতিমোহনকে দায়িত্ব দিতেন? বোঝা যাচ্ছে চিঠিগুলি পড়বার সুযোগ তাঁর হয়েছিল। কবীরের পদ পাশ্চাত্যের মানুষকে জিজ্ঞাসু করে তুলেছে, এতে যেমন তিনি আনন্দ পাচ্ছিলেন, আর-এক কারণে তাঁর আনন্দের কারণ ঘটেছিল। One Hundred Poems of Kabir প্রকাশিত হলে যখন বিদেশে কবীরপদ পরিচিত ও সমাদৃত হল, তখন—

> ...হিন্দী সাহিত্যেও কবীরের মাহাত্ম্য স্বীকৃত হইল। পূর্বে হিন্দী নবরত্নের মধ্যে কবীরের স্থান ছিল না। বাবু শ্যামসুন্দর দাসও তাঁহাকে সেই স্থান দেন নাই। অনেক হিন্দী লেখকই কবীরকে এবং সন্তদিগকে এতদিন উপযুক্ত স্থান ও সম্মান দিতে চাহেন নাই। সেই ভাব দূর হইল। কবীরও নবরত্নের মধ্যে গৃহীত হইলেন।[৩০]

হিন্দিভবন প্রতিষ্ঠার প্রসঙ্গে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের একটি প্রবন্ধের উল্লেখ করে বলেছিলাম যে, সেখানে তিনি বলেছেনঃ শান্তিনিকেতনে হিন্দিপ্রীতির একটি পরিবেশ রচিত হয়েছিল ক্ষিতিমোহনের মাধ্যমে, হিন্দিভবন প্রতিষ্ঠার বহু পূর্বেই। রবীন্দ্রজীবনীতে আবার এই লেখকই ক্ষিতিমোহন-কৃত 'কবীর' অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথের করা One Hundred Poems of Kabir আলোচনার সময় যে মন্তব্য করেছেন সেটি ভিন্ন প্রকৃতির :

> রবীন্দ্রনাথ-কৃত কবীরের ইংরেজি অনুবাদ যথাসময়ে অন্যান্য গ্রন্থের ন্যায় য়ুরোপীয় ভাষাসমূহে অনূদিত হয়। সকল দেশই প্রসন্ন চিত্তে এই অনুবাদ গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু এদেশে যাঁহারা কবীর সম্বন্ধে বিশেষভাবে ওয়াকিবহাল তাঁহারা এই অনুবাদ পড়িয়া সুখী হইতে পারেন নাই। তাঁহাদের মতে কবীর হইতে কবির ভাবই ব্যক্ত হইয়াছে বেশি করিয়া; মূল কবীরকে কবির অনুবাদ হইতে পাওয়া যায় না।[৩১]

এ দেশে কারা যে 'কবীর সম্বন্ধে বিশেষভাবে ওয়াকিবহাল' তার স্পষ্ট কোনো উল্লেখ নেই প্রভাতকুমারের লেখায়। কিন্তু তাঁর এই মন্তব্যসংলগ্ন পাদটীকায় তিনি কেবলমাত্র রেভা. আহমদ শাহ-র একটি গ্রন্থ থেকে যে-উদ্ধৃতি দিয়েছেন, তাতে এমন মন্তব্যের আভাসমাত্র নেই যে রবীন্দ্রনাথের এই কবীর-অনুবাদে তাঁকেই পাওয়া যাবে, কবীরকে নয়। আমাদের মনে হয়েছে রেভারেন্ড রবীন্দ্রনাথের নির্ভেজাল প্রশংসাই করেছেন :

> The poems indeed are very beautiful, and as we might expect from the skilled hand of Rabindranath Tagore, are very fine also in their English dress.

তাঁর অনাস্থা ক্ষিতিমোহনের 'কবীর' সংকলনের বাংলা অনুবাদের প্রতি, প্রভাতকুমারের উপরিউক্ত পাদটীকার উদ্ধৃতি সেই কথা বলে।

১৯৩১ সালে The Religious Life of India Series-এ F.E. Keay-র Kabir and His Followers প্রকাশিত হয়। লেখক তাঁর গ্রন্থে প্রচলিত কবীরসংকলন গ্রন্থগুলির পরিচয়প্রসঙ্গে উল্লেখ করলেন যে, এই-সব বইয়ের পাশাপাশি সম্প্রতি

১৯১৫ সালে বিখ্যাত বাঙালি কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক ইভলিন আনডারহিলের সহায়তায় একশো কবীর-পদের ইরেজি অনুবাদ সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। ক্ষিতিমোহন সেন বাংলা অনুবাদ সহ যে হিন্দি কবীর-দোঁহা সংকলন প্রকাশ করেছেন, রবীন্দ্রনাথের এই One Hundred Poems of Kabir সেই সংকলন অনুসরণে রচিত। ক্ষিতিমোহন-সংকলনে নানা স্থান থেকে অনেক হিন্দি দোঁহা সংগৃহীত হয়েছে, যেগুলির সঙ্গে কবীরের নাম যুক্ত আছে। ড. কেয়ি যে যুক্তির উপর নির্ভর করে ক্ষিতিমোহন-সংকলনের সমালোচনা করেছেন, তার কোনো প্রত্যক্ষ ভিত্তি নেই। তিনি সম্পূর্ণ নির্ভর করেছেন রেভারেন্ড আহমেদ শাহের উপর*, যিনি, তাঁর মতে, One Hundred Poems of Kabir-এর অনুবাদগুলি খুব সতর্কতার সঙ্গে পরীক্ষা করে দেখে বুঝতে পেরেছেন যে, এই অনুবাদগুলি সরাসরি মূল হিন্দি পদ থেকে করা হয়নি, করা হয়েছে ক্ষিতিমোহনের বাংলা অনুবাদ থেকে। রেভারেন্ড আহমেদ শাহর মতে :

এক. ক্ষিতিমোহন সেনের বাংলা অনুবাদ একেবারেই যথাযথ নয়।

দুই. তাঁর সংকলনের কেবল আঠারোটি পদ (Poems) এবং উনচল্লিশটি সাখীর সঙ্গে তবু বীজকের পদের কিছুটা মিল আছে।

তিন. আর কিছু পদের কোনো কোনো পঙ্‌ক্তি বা বাক্যাংশ বীজকের, নাহলে বাকিটা সবই বহু পরবর্তীকালের অজানা পদকর্তাদের রচনা থেকে নেওয়া।

চার. ক্ষিতিমোহন-সংকলনের পদগুলি কতকগুলি পারসিক ও পাঞ্জাবি শব্দের ব্যবহারের জন্য, কতকগুলি পাঞ্জাবি পদের জন্য, হিন্দি ভাষার অপেক্ষাকৃত সরলতা ও স্পষ্টতার জন্য এবং ভাবের দিক থেকেও মূল কবীর-পদের সঙ্গে পার্থক্যের জন্য খাঁটি নয়।

পাঁচ. One Hundred Poems of Kabir-এর মূল পদগুলি অবশ্য খুবই চমৎকার এবং যেমন আমরা আশা করতে পারি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরেব মতো সুদক্ষ কবির হাতের গুণে এগুলির ইংরেজি রূপও অতি সুন্দর।

ছয়. তবু এ কথাও ঠিক যে, মাঝে-মধ্যে কোথাও কোথাও খণ্ডিতভাবে ছাড়া এগুলিকে কবীরের রচনা মনে করা যায় না। উদাহরণস্বরূপ : Nos. 29, 42, 47, 65, 91—কবীর-রচনা হতে পারে না।

সাত. হয়তো এ-সব অন্য বিশিষ্ট কবিরই রচনা, কিন্তু কবীরের নয়। কতকগুলি পদ তাঁর উপদেশের সমতুল, কিছু আছে যা তাঁরই পদ, কিন্তু সবটা মিলিয়ে এই সংগ্রহের রচনাগুলি অন্যদের কৃত। কতকগুলি হয়তো শিখগুরুর রচনা। কতকগুলি সুফিরচনা হতে পারে, কেননা সেগুলিতে সুফিভাব আছে।

The Bijak of Kabir : translated by Rev. Ahmed Shah Hamirpur, U.P. 1917 G. Westcoth-এর Kabir and Kabirpath (1907) গ্রন্থের ভূমিকায় রেভারেন্ড আহমেদ শাহের উল্লেখ আছে, তিনি তখন 'বীজক' সংকলন করছিলেন।

আট. এই একশো পদের মধ্যে কেবলমাত্র পাঁচটি, তাও খণ্ডিতভাবে, নিরাপদে কবীরের পদ বলে চিহ্নিত করা যায়।

একজন সাধারণ পাঠক হিসেবে ক্ষিতিমোহন সেনের কবীর-সংকলনের দোঁহাগুলি তার বাংলা অনুবাদ সহ পড়ে দেখেছি। তাঁর বাংলা অনুবাদ একেবারে যথাযথ নয় এমন মনে করবার কারণ খুঁজে পাইনি, তার বিপরীত ধারণাই হয়েছে। One Hundred Poems of Kabir-এর সব কবিতাই পড়েছি, পাশাপাশি ক্ষিতিমোহনের কবীর-সংকলনের দোঁহা ও তার অনুবাদগুলি রেখে। এমন মনে হয়নি যে, রবীন্দ্রনাথের কবীর-অনুবাদে কবি রবীন্দ্রনাথকেই পাওয়া যায়, কবীরকে নয়। রবীন্দ্রনাথ ও ক্ষিতিমোহন উভয়ের অনুবাদই আমাদের কাছে সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য ও যথাযথ মনে হয়েছে। এমন নয় যে, কোনো কোনো পদে মূল ও অনুবাদে কোনো পার্থক্য চোখে পড়েনি, কিন্তু সে পার্থক্য বা ভিন্নতা অতি সামান্যই, তার জন্য মূল পদের অর্থ বা তাৎপর্যগত কোনো উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন কেন, অল্পস্বল্প পরিবর্তনও ঘটে যায়নি।

কোনো কোনো পদ কবীরের রচিত হতে পারে না বলেছেন Dr. Keay, যার সংখ্যাগুলির উল্লেখ পূর্বেই করেছি। এঁরা পদগুলি একেবারে বাচ্যার্থে গ্রহণ করেছেন বলেই এগুলির শুদ্ধতা সম্পর্কে তাঁরা সন্দিহান হয়েছেন বলে আমাদের ধারণা। কবীর যেখানে বলছেন : 'সংসকিরত ভাষা পঢ়ি লীন্হা, জ্ঞানী লোগ কহোরী' (No 91; ৩। ১২) তখন তিনি পাণ্ডিত্যাভিমানীর মুখের কথাটা তুলে ধরেন মাত্র—'আমি সংস্কৃত ভাষা শিখিয়া ফেলিয়াছি, আমাকে সকল লোক বলুক জ্ঞানী'। সনাতন ধর্মাচরণের অসারতার কথাটাই বলেন কবীর এ-সব পদে, সংস্কৃতভাষাজ্ঞানীর মানের বোঝা ফেলে দেওয়ারই ডাক দেন। বলেন 'তীর্থ তো কেবল জল, তাহাতে কোন ফল নাই—সে আমি স্নান করিয়া দেখিয়াছি। প্রতিমাগুলি তো জড়, কোন কথাই বলে না—আমি ডাকিয়া দেখিয়াছি, (No.42 ; ১। ৭৯)। উত্তমপুরুষে পদ রচনা করে আসলে এখানে তিনি অন্ধ সংস্কারবদ্ধ মানুষের চোখ ফোটাতে চেয়েছেন, নিজেকে সংস্কৃত পণ্ডিত, প্রতিমাপূজক বা তীর্থস্নাতক বলা তাঁর উদ্দেশ্য নয়। এ কথাটা বুঝতে হবে যে কবীরতত্ত্বজ্ঞ হওয়া দরকার তা নয়, সাধারণ জ্ঞানই যথেষ্ট।

উত্তর ভারতের হিন্দিভাষী-বলয়ে হাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী একজন অত্যন্ত নাম-করা পণ্ডিত। তরুণ বয়সে তিনি শান্তিনিকেতনে বিদ্যাভবন ও হিন্দিভবনে বেশ কয়েক বছর অধ্যাপনা করেছেন এবং বরাবর ক্ষিতিমোহনের খুব স্নেহভাজন ছিলেন। ১৯৪২ সালে তাঁর 'কবীর' প্রকাশিত হয়। সাধক কবীরের জীবন, তাঁর সাধনা ও উপলব্ধির বিবরণ, পরবর্তীকালের কবীরপন্থী সম্প্রদায়গুলির পরিচয় প্রভৃতি সহ নির্বাচিত কিছু কবীরপদ এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। 'হিন্দীভবন শান্তিনিকেতন। ফাল্গুনী পূর্ণিমা ১৯৯৮'-এ লেখা তাঁর ভূমিকায় তিনি বলেছেন :

> গ্রন্থের শেষে উপযোগী মনে করে কবীরবাণী নামে কিছু নির্বাচিত পদ সংগ্রহ করা হয়েছে। তার প্রথম একশো পদ আচার্য ক্ষিতিমোহন সেনের সংগ্রহের। এগুলিই কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ইংরেজিতে অনুবাদ করেছিলেন। আচার্য সেন এই পদগুলি গ্রহণ করার অনুমতি দিয়ে আমাকে অনুগৃহীত করেছেন।

পুনরপি গ্রন্থের দ্বিতীয় পরিশিষ্টে, যেখানে কবীরবাণী সংকলিত হয়েছে, ড. দ্বিবেদী সেখানে বলেছেন যে, এর প্রথম এক থেকে একশো পদ আচার্য সেনের কবীর-সংগ্রহ থেকে উদ্ধৃত আর এই পদগুলি আন্তঃরাষ্ট্রীয় খ্যাতির অধিকারী, কেননা এগুলি মহাকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো ব্যক্তিত্বকে আকর্ষণ করেছে। তিনি চেয়েছিলেন ভারতীয় মনীষার প্রতি পাশ্চাত্য পন্ডিতদের উপেক্ষা ও অজ্ঞতা দূর করতে সক্ষম হোক এই পদগুলি, আর তাই নিজে তিনি এগুলি অনুবাদ করেছিলেন। পদগুলির নির্বাচনও করেছিলেন পশ্চিমদেশের পাঠকদের কথা মনে রেখে।

হাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদীর মতে ক্ষিতিমোহন সেনের সম্পাদিত এই 'কবীরের পদ' এক নতুন রীতির প্রয়াস, এতে ভক্তদের মুখে শুনে শুনে সংগ্রহ করা হয়েছে। সংগ্রাহক তাঁর প্রামাণিকতার জন্য কোনো পুথির মুখাপেক্ষিতা রাখেননি। তবে পরম্পরাক্রমে একজনের মুখ থেকে আর-একজনের মুখে চলে আসার কারণে এই স্মৃতিবাহিত পদগুলির ভাষা পরিবর্তিত হয়ে গিয়ে থাকতেই পারে, কিন্তু এগুলির অন্তর্নিহিত ভাবের প্রামাণিকতায় সংশয় করার কোনো কারণ নেই।

মিশনারিদের সমালোচনা প্রসঙ্গে হাজারীপ্রসাদ খুব সংক্ষেপে শুধু এইটুকু বলেছেন, কোনো বিশেষ স্বার্থপোষক গোষ্ঠীকর্তৃক এই পদসংগ্রহকে তুচ্ছ করা হয়েছে এই যুক্তিতে যে এই পদগুলি প্রাচীন কবীর-পুথিতে অলভ্য। এই স্বার্থপোষক গোষ্ঠী না দেখতে চান ভারতীয় মনীষার কোনো প্রতিষ্ঠা, না বরদাস্ত করতে পারেন তার সমাদর। পূর্বে উল্লিখিত ওই একশো পদ ছাড়া হাজারীপ্রসাদ নিজে ক্ষিতিমোহনের পদসংগ্রহের সহায়তা নেননি এই কথা মনে করে যে, যাঁরা ভারতীয় মনীষাকে অস্বীকার করতে চান তা তাঁরা সোজাসুজি করুন, প্রাচীন-নবীন পুথির বাহানা তুলে নিজেদের উদ্দেশ্য ও পাঠকের নির্ণয়াত্মিকা বুদ্ধির মধ্যে পর্দার ব্যবধান খাড়া করার সুযোগ না পান। তবে এই সঙ্গেই তিনি বলেছেন :

> আমি এখানে অত্যন্ত কৃতজ্ঞভাবে নিবেদন করতে চাই যে, যদিও আমি আচার্য সেনের গ্রন্থের পাঠ এই গ্রন্থে নিই নি, কিন্তু তাঁর উপদেশের সাহায্য যথেচ্ছ নিয়েছি। তাঁর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ এতটাই গভীর যে, এখানে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেও সংকোচবোধ করছি। প্রকৃত কথা এই যে, যদি তাঁর কাছ থেকে প্রেরণা না পেতাম তাহলে এ গ্রন্থ লিখতে পারতাম না। তাঁর দৃষ্টিকোণ ও এই বইতে ব্যবহৃত আমার দৃষ্টিকোণে কিঞ্চিৎ মৌলিক পার্থক্য আছে। তিনি সন্তদের বাণীগুলিকে ম্যুজিয়ামে প্রদর্শনের জিনিস বলে মানেন না আর সে-কথা যথার্থও বটে। যাকে আজকাল 'একাডেমিক' আলোচনা বলে সে আলোচনা খানিকটা ম্যুজিয়ামের রুচিকেই উত্তেজনা যোগায়।

হাজারীপ্রসাদের খুব ভালো করেই জানা ছিল যে, ক্ষিতিমোহন সন্তদের জীবন্ত বাণীকে বলেন 'জ্বলন্ত মশাল' এবং বিশ্বাস করেন যথাসময়ে এই বাণী ভারতবর্ষের সমস্যাবলির সমাধান করবে।[৩২]

১৯৩৫ সালে ক্ষিতিমোহনের 'দাদূ' বেরোয়। বছর চারেক আগে তাঁর দীর্ঘ পঁচিশ বছর আগে করা 'কবীর' সংকলনের যে সমালোচনা হয় সেই প্রসঙ্গে এবার মনের কথা বলবার সুযোগ হল। বললেন :

> আমার সংগৃহীত 'কবীরের' বাণীগুলি দেখিয়া অনেক খ্রীষ্টীয় মিশনারী মহাশয় অভিযোগ জানাইয়াছেন যে কেন আমি কেবলমাত্র কবীর বীজকের বাণীই ছাপাই নাই। কবীরের প্রথম খণ্ডের ভূমিকা দেখিলেই তাঁহারা জানিতে পারিতেন যে আমার প্রধান চেষ্টা ছিল (মরমিয়া) সাধকদের মধ্যে মুখে মুখে প্রচলিত পাঠগুলিকে সংগ্রহ করিয়া রক্ষা করা। কারণ এই সব পাঠগুলি অতিশয় গভীর ও সুন্দর ; আর মরমিয়া সাধুদের সঙ্গে সঙ্গে এই সব বাণীও লোপ হইয়া আসিতেছে। যে-সব সাধুদের নিকট আমার সংগ্রহ, তাঁহাদের অনেকেরই নাম আমি সেখানে দিয়াছি। যাঁহারা তাঁহাদের নাম প্রকাশের অনুমতি দেন নাই তাঁহাদের নাম অবশ্য প্রকাশ করিতে পারি নাই। যাঁহারা বীজক ও অন্যান্য মুদ্রিত গ্রন্থের পাঠ দেখিতে চান তাঁহাদের জন্য সে সব সন্ধানও সেখানেই দিয়াছি। মুদ্রিত বীজকাদি গ্রন্থের বাণীগুলি এখনই নষ্ট হইবার ভয় নাই বলিয়াই আপাততঃ সেইদিকে মন দেই নাই। আমার প্রিয় ও যোগ্য ছাত্র শ্রীমান দুলারে সহায় শাস্ত্রী নিজে কবীর পংথী। তিনি সম্প্রতি কবীর বীজক বাহির করার ইচ্ছা করিয়াছেন। আমার সংগৃহীত কবীরের বাণী হইতে শ'খানেক পদ শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের অনুবাদের সাহায্যে দেশে দেশে ছড়াইয়াছে ও অতিশয় সমাদৃত হইয়াছে।

মিশনারিদের সমালোচনা প্রসঙ্গে ক্ষিতিমোহন এইটুকু বললেন যে পরবর্তীকালের ভক্ত সাধকদের দ্বারা প্রাচীন সাধকদের বাণী ক্রমশ কিছু রূপান্তরিত হতেও পারে, সব ধর্মেই তা হয়ে থাকে। বিদেশি কৌতূহলীদের কাছে ভারতীয় ধর্ম জ্ঞেয় বস্তু মাত্র :

> জানিবার ইচ্ছার ঝোঁকে অনেক সময় জ্ঞেয় বিষয়টির প্রতি এই সব সন্ধানীরা নিষ্ঠুর হইয়া ওঠেন। জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে নানা ভাবেই vivisection অর্থাৎ জীবন্ত জ্ঞেয় বস্তুকে ছেদন করিয়া দেখা হয়।

তাঁরা ভুলে যান যে বিষয়ে তাঁদের কৌতূহল 'তাহার জীবন বলিয়া একটা বালাই থাকিতে পারে' কিন্তু যাঁরা এই ভারতের ধর্ম ও সাধনার মর্মগ্রাহী, তাঁদের বুঝতে অসুবিধা হয় না যে এই-সব বস্তুর জীবন আছে এবং সেই কারণে দরদি মন নিয়ে বিচার করতে হবে তাদের। ক্ষিতিমোহন বলেন মহাসাধকরা যে-সব আশ্চর্য প্রাণবান জ্বলন্ত ও উদার বাণী রেখে যান, অনেক সময়েই তা সমাজ গ্রহণ করতে পারে না। তাই সাধারণত লোকেরা তাঁদের মহাবাণীগুলিকে বাদসাদ দিয়ে আগুন নিভিয়ে নিরাপদ ও নিজেদের পছন্দমতো করে নেয়। প্রায়ই দেখা যায় মহাপুরুষদের নামে প্রতিষ্ঠিত মঠ ও সম্প্রদায়গুলি তাঁদের অগ্নিময়ী বাণী যথাসাধ্য পরিহার করে। সাধকরা সর্বপ্রকার ভেদবুদ্ধি ও সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে, বরং অভেদ ঔদার্য ও মিলনের বাণীই তাঁরা প্রচার করেন। মঠে, সম্প্রদায়ে এবং সাম্প্রদায়িক গ্রন্থে এই-সব বাণী পরিবর্তিত হয়ে যায় বা পরিত্যক্ত হয়। অনেক মধ্যযুগীয় সাধকই নিম্নকুলোদ্ভব। ট্র্যাজেডি এই যে, যাঁরা সহস্র প্রতিকূলতার মধ্যেও সারাজীবন জাতিভেদের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের চেতনাকে জাগাতে চাইলেন, হিন্দু ও মুসলমানের মতো দুই

বিরোধী সম্প্রদায়কে মেলাতে চাইলেন, তাঁদেরই নামে সংঘ গড়ে তথাকথিত উচ্চজাতীয় সম্প্রদায়মনস্ক মানুযেরা জাঁকিয়ে বসে এই-সব অমর সাধকদের জাতি-সম্প্রদায়ের বেড়াজালে আবদ্ধ করতে ব্যগ্র হন। সাধকদের মূল বাণীর বিকৃতি বা লোপের এটাও অন্যতম প্রধান কারণ।

প্রসঙ্গক্রমে ক্ষিতিমোহন নিজের অভিজ্ঞতার কথাও একটু বললেন। তাঁর শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক সুধাকর দ্বিবেদীর উক্তি স্মরণ করলেন :

> বড় দুঃখের কথা এখনকার সম্প্রদায়পতি ও মঠাধিকারী মহন্তরা অনেকেই এই কথা সব মহাপুরুষদের গ্রন্থাদিও দেখিতে দেন না, নানা স্থানে এইসব গ্রন্থ লোকলোচনের অন্তরালে পচিয়া যাইতেছে, তবু ইঁহারা যথাসম্ভব সব জ্ঞাতব্য বিষয় লুকাইবেন।

এই প্রসঙ্গেই ক্ষিতিমোহন ধুনকর বংশজাত দাদূসাহেবকে নাগর ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভূত প্রমাণ করার তাগিদের কথা বলে আজমিরের চন্দ্রিকাপ্রসাদ ত্রিবেদীর উল্লেখ করলেন। এই গবেষক তাঁকে বলেছিলেন লিখিতভাবে দাদূর প্রকৃত পরিচয় সর্বজনসমক্ষে আসায় 'মঠের মহন্ত ও সাধুরা দাদূর সম্বন্ধে মঠে রক্ষিত সব প্রামাণিক পুঁথিগুলি নষ্ট করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।' ক্ষিতিমোহনের বক্তব্য অনুসারে বিদেশি ধর্মপ্রচারকরা এ-সব সমস্যার গভীরে প্রবেশ করেন না, প্রাচীন-অর্বাচীন পুথির কূটতর্কে মনোযোগ দেন বেশি। তা ছাড়া কবীরের ঐতিহাসিক সময় নির্ধারণে তাঁরা যতটা উৎসুক, জিশুখ্রিষ্টের বেলাও কি তাই?[৩৩]

ভারতীয় মধ্যযুগে সাধনার ধারা

'কবীর' প্রকাশেব কুড়ি বছর পরে ক্ষিতিমোহনের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত 'অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বক্তৃতা ১৯২৯' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হল—'ভারতীয় মধ্যযুগে সাধনার ধারা'। এই বক্তৃতায় তিনি কেবল সেই যুগের সাধকদের নামমাত্র পরিচয় দিয়ে তাঁদের সাধনার একটু পরিচয় দেওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন। তাতেই এই বক্তৃতার বিষয়বস্তু যে অভিনব ও সমৃদ্ধ মনে হয়েছিল সবার কাছে, সেটা এখনও এই বই থেকে অনুমান করা যায়। স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এ কথা আমাদের বলেও ছিলেন। গ্রন্থভূমিকায় ক্ষিতিমোহন নিজে বিশেষ করে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছিলেন সেই-সব সাধকদের প্রতি যাঁদের বাণী মানবসাধনার পথে নানাভাবে সহায়তা করবে। এই-সব উচ্চস্তরের সাধকদের বলেছিলেন :

> ...বিষয়ে অনেকটা সাচ্চা খবর পাওয়া যায় সে সব সাধুর কাছে যাঁরা হৃদয়ের অনুরাগে সাধক হইয়াছেন কিন্তু কোনো সম্প্রদায়ের বন্ধনে ধরা দেন নাই। সম্প্রদায়ী সাধুরা এই সব গভীরজ্ঞানী সাধুদিগকে সম্প্রদায়হীন বলিয়া আমল দিতে চাহেন না। কিন্তু যদি পুরাতন সব সাচ্চা খবর পাইতে হয় আর গভীরতম বাণীর সংগ্রহ পাইতে হয় তবে তাহা মিলিবে এই সব সাধুদেরই কাছে।

যে-সব অসম্প্রদায়ী সাধুদের কাছ থেকে সন্তধারার সাধনার সাচ্চা সংবাদ পাওয়া সম্ভব ছিল, দেশ-কালের অবস্থানুসারে তাঁদের সংখ্যা ক্রমশ বিরল হয়ে আসছে।

> আর কিছুকাল পরে ইঁহাদের স্মৃতিমাত্র অবশেষ থাকিবে, অথবা হয়তো স্মৃতিও থাকিবে না কারণ ইঁহাদের সম্বন্ধে সকলে এতই কম খবর রাখেন।

ক্ষিতিমোহন তখনই স্পষ্টই বলছেন যে-সব সাধু এখনকার বাজারে রীতিমতো ভালো ব্যাবসা চালাতে পারেন তাঁরাই জাঁকিয়ে বসেছেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল, সম্ভব হলে ভবিষ্যতে সেই যুগকে আর-একটু পূর্ণতরভাবে দেখতে চেষ্টা করবেন।

> জীবন্ত একটি যুগের কেবল কঙ্কালমাত্র দেখাইয়া বিশেষ কিছু বুঝানো যায় না। তার উপর একটু রক্ত মাংস না থাকিলে জীবনের রূপটি বুঝিতে পারা কঠিন হয়। তখনকার সাধকদের সাধনা ও বাণীর একটু পরিচয় দিতে পারিলে সেই যুগের রূপটি প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিতে পারে।

সামান্য দু-একটা বক্তৃতায় এত বড়ো বিষয়ের 'কতটুকু পরিচয়ই বা দেওয়া সম্ভব। আমাদেরও কর্মশক্তি ক্রমশ ক্ষীণ হইয়া আসিবে'—এই কথা বলে এই বিশাল কাজের ক্ষেত্রে দেশের তরুণ জ্ঞানার্থীদের আহ্বান করলেন। উপাধিলাভ বা থিসিস লেখার জন্য যাঁরা প্রয়োজনের মাপে সীমাবদ্ধ অন্বেষণ করেন, কোনোদিনই তাঁর মন তাঁদের প্রতি খুব প্রসন্ন নয়। তাঁর কাছে কাজ করতে এলে কার আগ্রহ কতটা খাঁটি, কে কতটা পরিশ্রমী তা যাচাই করে দেখে নিতেন। এই ভূমিকাতেও তেমন গবেষকদের প্রতি অনুযোগটুকু বাদ গেল না, বললেন :

> ভবিষ্যৎ কালকে যাঁহারা সৃষ্টি করিবেন সেই সব তরুণ কর্মীদের এখনো তেমন করিয়া এই ক্ষেত্রে দেখা পাওয়া গেল না।

কিন্তু এ কাজে যাঁরা এগিয়ে আসবেন তাঁদের সামনে বিস্মৃতির অতলে নিমজ্জিত ভারতবর্ষের যে রত্নভাণ্ডার উদ্‌ঘাটিত হবে তার আভাস একটু দিলেন :

> এই সব ক্ষেত্রে যাঁহারা নাবিবেন তাঁহাদের জ্ঞানতপস্যা ব্যর্থ হইবে না। এই কাজে নাবিলে তাঁহারা দেখিবেন যে ধর্মজগতে এমন কোনো পরীক্ষা (experiment) সম্ভবপর নয় যাহা ভারতের মধ্যযুগে কোনো-না-কোনো সাধক সাধনা করিয়া যান নাই। এই সব সাধকেরা শাস্ত্রজ্ঞানহীন, কাজেই কোনো বাঁধা পথে তাঁহারা চালিত হন নাই। তাঁদের প্রতিভা ও তাদের দৃষ্টি সদাই উন্মুক্ত ছিল। শাস্ত্রশাসিত ধর্ম সম্প্রদায়গুলি সবই প্রায় গতানুগতিকভাবে বাঁধা রাস্তায় চলিয়া আসিয়াছে কিন্তু ইঁহাদের প্রত্যেকের নূতন দৃষ্টি নূতন ভাবনা নূতন পথ। এই পথে মানবমনের ভালমন্দ নানাভাবে পরখ করিবার সাহসের পরিচয় মিলিবে। নানা দিক দিয়া ধর্মভাবকে সার্থক করিবার চেষ্টা দেখা যাইবে।

ক্ষিতিমোহনের খেদ :

> শাস্ত্রশৃঙ্খলিত ও গ্রন্থবদ্ধ আমরা ভাল করিয়া চাহিয়াও দেখিলাম না যে চক্ষের সম্মুখে কত বড় একটি সুযোগ বৃথা চলিয়া গেল।

তাঁর মনে হয় এ কালে তাঁরা হয়তো সেই ঐশ্বর্যের মাত্র এক আনা অংশের খবর পেয়েছেন, বাকি পনেরো আনা অংশ আগেই বিলুপ্ত হয়ে গেছে। যা আছে সেও অচিরেই লুপ্ত হয়ে যাবে। তরুণ বয়সে সন্তসাধনার পরিচয় লাভ করতে গিয়ে নিজে তিনি এমন সব দুর্লভ পথপ্রদর্শকের প্রসাদ পেয়েছিলেন, যাঁদের মতন মানুষ এ যুগে দিন দিন কমে আসছে। 'কবীর' প্রথম খণ্ডে তিনি গভীর শ্রদ্ধায় কয়েকজন সাধুর নাম করেছিলেন, 'ভারতীয় মধ্যযুগে সাধনার ধারা' গ্রন্থেও বললেন :

> এই সেদিন বোম্বাই নগবে শাণ্তা ক্রুসে কাঠিয়াবাড়-ভাবনগরের লাখনকা গ্রামবাসী বৃদ্ধ সাধুবাবা মোহনদাস পরলোকগমন কবিলেন। তাঁহার কণ্ঠে তি্ন হাজারের অধিক ভজন ছিল। বাণী যে কত হাজার হাজার তাঁর মুখে মুখে ছিল তাহা বলা যায় না।

হয়তো আমাদের মনে পড়বে মীরার ভজনের না-শেখা আধখানা শেখবার জন্য তাঁর সেই উটের পিঠে চড়ে মরু-অভিযান। এমনই নানা বিরল অভিজ্ঞতায় ধনবান তাঁর জীবন। তাই তিনি যখন 'ভারতীয় মধ্যযুগে সাধনার ধারা' গ্রন্থে বলেন : 'এখনো যদি প্রাণপণ চেষ্টা করা যায় তবু সেই বিরাট ঐশ্বর্যের অতি সামান্য অংশ মাত্র উদ্ধার করা সম্ভব হইবে।'[৩৪] তখন তাঁর অন্তরের ব্যাকুলতা অনুভব করা যায়। এই গ্রন্থটির কোথাও কোথাও লেখকের উল্লেখ থেকে ধারণা করা যায় ক্ষিতিমোহন ভারতের কী বিস্তীর্ণ এলাকায় ঘুরে তাঁর তথ্য সংগ্রহ করেছেন, যেমন আমরা জীবনী আলোচনাকালে কখনও কখনও দেখেছি। বিশেষত কাশ্মীর, রাজস্থান, গুজরাত অঞ্চলে তাঁর নানা স্থানে ভ্রমণের কিছু কিছু পরিচয় আমরা লক্ষ করেছিলাম। প্রধানত তিরিশ ও চল্লিশের দশকে ক্ষিতিমোহন জ্ঞাত ও অজ্ঞাত সন্তদের জীবন ও বাণী নিয়ে অনেকগুলি প্রবন্ধ লেখেন। 'ভারতীয় মধ্যযুগে সাধনার ধারা'-য় যেমন এই কাল সম্পর্কে তাঁর চর্চার সুবিস্তীর্ণ ক্ষেত্রের হদিস মেলে, এই প্রবন্ধগুলিও সেই কাজে অনেকখানি সহায়তা করে। শিখধর্ম ও শিখগুরুদের সম্পর্কেও তাঁর পড়াশোনার পরিধি খুব সামান্য ছিল না। তাঁর সেই চর্চাব খুব বেশি প্রমাণ ছাপার অক্ষরে মিলবে এমন নয়, অন্য কাজের চাপে এ কাজের স্রোত সম্ভবত হারিয়ে গিয়েছিল। 'শিখদেব মহাগ্রন্থ' প্রবন্ধে তিনি এ কথাও লিখেছেন :

> শিখধর্ম্ম সম্বন্ধে আমি নিজে এখনও বিশেষভাবে কিছু কাজ প্রকাশ কবি নাই। তাহার কারণ তাঁহাদের বিস্তর শিক্ষিত ভক্ত আছেন। আমি এখন প্রধানতঃ এমন সব পন্থ লইয়া কাজ করিতেছি যাহাদের বিষয় এখনই কিছু না করা হইলে তাঁহাদের বহু অমূল্য রত্ন নষ্ট হইবে। শিখ ধর্ম্মের সে বিপদ নাই। আমার কয়েকজন প্রীতিভাজন কর্ম্মসহচর এই কাজে হাত দিয়াছেন। আশা করি তাঁহাদের দ্বাবা এই বিষয়ে অনেকে অনেক ভিতরের কথা জানিতে পারিবেন। আমার সেই সব প্রীতভাজন সহকর্ম্মীর প্রয়োচনায় এই শিখধর্ম্মের আলোচনাতেও আমাকে ভবিষ্যতে কিছু কিছু কাজ সম্ভবতঃ করিতে হইবে।[৩৫]

আগেই বললাম, কয়েকটি প্রবন্ধ তিনি লিখেছিলেন শিখধর্ম ও শিখগুরু সম্পর্কে, এর অধিক বিস্তৃত কাজ করা সম্ভব হয়নি। সন্ত রজ্জব সম্পর্কে অনেকদিন ধরে তথ্যসংগ্রহ করেছিলেন, সংগ্রহ করেছিলেন তাঁর বাণী। আমরা এই জীবনীতে উল্লেখ পেয়েছি তার।

পরে সম্ভবত যথেষ্ট তথ্য না পেয়ে সম্পূর্ণ জীবনীরচনার কাজে হাত দেননি, কিন্তু অনেক প্রবন্ধেই রজ্জবজির বাণী প্রসঙ্গাত উদ্ধৃত করেছেন। অনেক মানুষের সঙ্গে ঘরোয়া আলোচনা প্রসঙ্গেও নিশ্চয় রজ্জবজির বাণী শোনাতেন। ১৯৩৫ সালে অ্যান্ডরুজ তাঁর প্রবন্ধ The Hindi Poets of the Middle Ages-এ ক্ষিতিমোহনের রজ্জব-বাণীসংগ্রহের মুগ্ধ উল্লেখ করে বলেন দাদূর চেয়ে রজ্জব কোনো অংশে খাটো নন।

কখনও কখনও ক্ষিতিমোহনের অন্য-বিষয়ক প্রবন্ধে কোনো সন্ত সম্পর্কে অত্যন্ত মূল্যবান আলোচনা স্থান পেয়েছে, যেমন রামমোহন সম্বন্ধে। প্রবন্ধে রামমোহন-সমসাময়িক সন্ত-কবি তুলসীদাস্ হাথরসী, পলটু সাহেব, দেধরাজ-এর বিস্তারিত পরিচয় দিয়েছেন। যে ঘটনায় লল্লা বা লালদেদ নামে সাধিকার পরিচয় পেয়ে তাঁর সম্পর্কে খোঁজখবর ও পড়াশোনা করেন, তাঁর কথা কোনো গ্রন্থে বা পৃথক প্রবন্ধে স্থান পেল না, কেবল 'কাশ্মীরে তপস্বিনী' প্রবন্ধে তাঁর ইতিহাসটুকুর আভাস দিলেন। একটিমাত্র পদের উল্লেখ সেখানে পাই। এত-সব সন্তদের সম্পর্কে এতদিন ধরে চর্চা করেছিলেন, সংগ্রহ করেছিলেন তাঁদের পদ, দুঃখ হয় ভাবলে, সেগুলি সব কোথায় গেল?

সন্তবাণী ক্ষিতিমোহনের নিভৃত জীবনের সঙ্গী ছিল, প্রথম জীবনে বাইরে প্রকাশ করতে অন্তরে বাধা অনুভব করতেন। এঁদের সম্পর্কে লিখেছেন যেটুকু তার তুলনায় অলিখিত কিন্তু নিয়ত চর্চিত রয়ে গেছে অনেক বেশি। সমব্যথী মানুষ পেলে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করতেন। সবচেয়ে মাতিয়ে তুলেছিলেন রবীন্দ্রনাথকে। একটা সময় এই-সব পদের কিছু নির্বাচন করে তিনি ইংরেজিতে অনুবাদ করতে আগ্রহী হয়েছিলেন, আমরা দেখেছি। One Hundred Poems of Kabir ছাড়াও আরও কয়েকটি সন্তপদ তিনি অনুবাদ করেন। অনুবাদের জন্য সন্তপদ রবীন্দ্রনাথকে জুগিয়ে দিতেও ক্ষিতিমোহন যে খুব অকৃপণ ছিলেন এমন বলা চলে না। এগুলি পাওয়ার জন্য রবীন্দ্রনাথকে রীতিমতো অনুনয় করতে হয়েছে তার প্রমাণ পাই তাঁর দুটি তারিখহীন চিঠিতে। প্রথমটি ক্ষিতিমোহনকে লেখা :

ওঁ

সবিনয় নমস্কার নিবেদন—

আমার প্রতি দয়া যদি করেন তবে কিছু কিছু জ্ঞানদাস ও অন্যান্য তর্জ্জমাযোগ্য কবিতা অল্প পরিমাণে প্রত্যহ পাঠালে আপনারও কষ্ট হবে না আমারও আনন্দ হবে এবং সেগুলি যাতে বহুলোকের আনন্দজনক হয় আমি তার চেষ্টা করব। কৃপণতা করবেন না। যেটুকু আমাকে দিয়েছেন তার জন্য অন্তরের কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করবেন।

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর[৩৬]

আর-একটি তারিখহীন চিঠি সম্ভবত জগদানন্দ রায়কে লেখা। তাতেও বাউল ও হিন্দি গান অনুবাদের জন্য পেতে রবীন্দ্রনাথ ঔৎসুক্য প্রকাশ করেছেন। এ চিঠিতে বেশ একটু অনুযোগও প্রকাশ পেয়েছে ক্ষিতিমোহনের কাছে চেয়ে পাননি বলে। তবে যে-ভাবে তিনি লিখেছেন তার সুর থেকে বোঝা যায় তিনি ভালো করেই জানতেন কেন ক্ষিতিমোহন এগুলি দিতে অনিচ্ছুক :

ক্ষিতিমোহনবাবুকে অনুনয়পূর্ব্বক জানিয়েছিলাম আমাকে প্রত্যহ বা একদিন অন্তর দুটি একটি করে অনুবাদযোগ্য বাউল বা হিন্দী গান পাঠালে বিশেষ উপকার হবে। কোনো সাড়া পাই নি। পিয়ার্সনকে বলেছিলুম তাঁকে আমার বিশেষ অনুরোধ জানাতে, বোধহয় তাও ব্যর্থ হয়েছে কেননা আজও কিছু পাওয়া যায়নি। তুমি একবার চেষ্টা করে দেখো—এবং তিনি যেগুলি পাঠাতে ইচ্ছা করেন আমার একাউণ্টে তার মাশুল দিয়ে আমাকে যেন পাঠানো হয়। আমি এই কবিতাগুলি নিয়ে কোনো রকম অন্যায় ব্যবহার করব না—এর ইংরেজি অনুবাদগুলি ছাড়া মূলগুলি কোনো লোকের কাছে বা পত্রিকায় প্রকাশ করব না। তাঁর কাছে যেমন প্রচ্ছন্ন আছে আমার কাছে তেমনি প্রচ্ছন্নই থাক্‌বে—এমনকি, তিনি যদি ইচ্ছা করেন, অনুবাদ হয়ে গেলে মূলগুলি তাঁর কাছে ফেরৎ দেব। ইতি রবিবার [১৯১৩]

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর[৩৭]

শেষপর্যন্ত তিনি যে কয়টি জ্ঞানদাস ও অন্যান্য সন্তের পদ ইংরেজিতে অনুবাদ করেন বলে জানা সম্ভব হয়েছে তার উল্লেখ করছি :

ইয়হ শ্রবণ মাতালো। জ্ঞানদাস। An Indian Folk Religion / Creative Unity
খোতে মেঁ তু রৈণ গবাঁয়া কহাঁ রহারে গানা। জ্ঞানদাস। Fugitive
লোক লোক মেঁ জুগ মে একাহি। জ্ঞানদাস। Fugitive
ফজর মেঁ জব আয়া য়লচী পুসাক সনহলী তৈরী। জ্ঞানদাস। Fugitive
ক্যোঁরে লড়ক ক্যোঁরে ময়না তব ক্যোঁ উপর জানা। জ্ঞানদাস
ভীতর হৈ নো ভীতর হৈ জী বাহর কভী নহি আবৈ।[৩৮]

'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থের তৃতীয় প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করেছেন রজ্জবজির বাণী :

ভারতীয় মধ্যযুগের কবিস্মৃতিভাণ্ডার সুহৃদ ক্ষিতিমোহনের কাছ থেকে কবি রজ্জবের একটি বাণী পেয়েছি। তিনি বলেছেন—

সব সাঁচ মিলৈ সো সাঁচ হৈ, না মিলৈ সো ঝুঁঠ।
জব রজ্জব সাঁচী কহী ভাবই রিঝি ভাবই রূঠ।।

সব সত্যের সঙ্গে যা মেলে তাই সত্য, যা মিলিল না তা মিথ্যে ; রজ্জব বলছে এই কথাটি খাঁটি—এতে তুমি খুশিই হও আর রাগই কর।

আরও অনেক আগেই শান্তিনিকেতন ভাষণমালার 'আত্মবোধ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ জ্ঞানদাস বঘেলির পদ ব্যবহার করেছেন। রজ্জবের বাণী ব্যবহার করেছেন Man of My Heart প্রবন্ধে। ব্যবহার করেছেন রবিদাসের বাণীও।[৩৯]

এমনই করে ক্ষিতিমোহন-সংগৃহীত সন্তবাণী কিছু কিছু রক্ষিত হয়েছে মাত্র, বাকিগুলি প্রকাশ্যে আসেনি, হয়তো কোনোদিনই আসবে না। সবচেয়ে দুঃখ হয় তাঁর 'মীরার গান ও বসন্তোৎসব' প্রবন্ধটি পড়লে। সেখানে তিনি জানিয়েছেন তাঁর মীরার গানের সম্পূর্ণ সংগ্রহ তিনি ছাপতে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত করে রেখেছিলেন, সেই সময়ে সেটি হারিয়ে যায়, আর তা পাননি।

> বহু বৎসর ধরিয়া আমি নিজে রাজপুতানা, কাঠিয়াওয়াড়, গুজরাত, সিন্ধু, পঞ্চনদ, উত্তর-পশ্চিমাদি প্রদেশ ঘুরিয়া ঘুরিয়া সাধুসন্ত ও গ্রামবৃদ্ধদের কাছে শুনিয়া শুনিয়া মীরার একটি বৃহৎ সংগ্রহ করিয়াছিলাম। তাহার সম্পাদন শেষ করিয়া কাপি তৈয়ার করিয়া যেইদিন ছাপাখানাতে দিব সেইদিন বইখানি যে হঠাৎ অন্তর্হিত হইল, আর তাহার দেখা পাই নাই। সেই সঞ্চয় ছিল আমার বহু বৎসরের। সেইরূপ সংগ্রহ করিবার অবসর আমার আর নাই।

এর পরেও তাঁর ইচ্ছা ছিল টুকরো-টাকরা একটু-আধটু মীরার গান যা তাঁর অন্যান্য সংগ্রহের মধ্যে ছড়িয়ে আছে তা দিয়ে মীরার একটি সংকলন বার করবেন, যদিও তা পূর্বতন সংগ্রহ থেকে অনেক ছোটো হবে। সেও হয়ে ওঠেনি শুধু রয়ে গেছে 'মীরার গান ও বসন্তোৎসব' নামে প্রবন্ধটি। এই প্রবন্ধে ক্ষিতিমোহন লিখেছিলেন : 'মীরার জীবনী লিখিবার জন্য এখন বসি নাই।' তবু প্রাসঙ্গিকবোধে মনে হয়েছিল তাঁর জীবনের দু-একটা কথা না বললে চলবে না।

প্রবন্ধের মুখবন্ধে রাজপুতানায় বর্ষা ও বসন্তের গানের প্রাচুর্যের কথা বলছিলেন ক্ষিতিমোহন। কার্যত প্রবন্ধের শেষে একটিমাত্র মীরার ভজন উদ্ধৃত হয়েছে স্বরলিপি সহ, যার বিষয় বসন্ত—'ফাগুনকে দিন জায় রে'। প্রশস্ত পরিমাপের প্রবন্ধটিতে ক্ষিতিমোহন কুলদেবতার সাধনরতা জন্মসিদ্ধ গীতকবি মীরার সন্তমার্গের সাধনায় রবিদাসের শিষ্যত্ব গ্রহণ ও সেই পথে চলতে চলতে অফুরন্ত গান রচনার বহু উদাহরণ দিয়েছেন। তাঁর মতে সাম্প্রদায়িক ধর্মের রেষারেষিতে পড়ে মীরার ভজন বিকৃত হয়েছে। মুদ্রিত সংকলনে তারই সহস্র সহস্র দৃষ্টান্ত ছড়িয়ে আছে। কৃষ্ণপন্থী-রামপন্থী কেউই মীরার ভজনের উপর নিজেদের দখল ছাড়তে রাজি হননি। কিন্তু মীরার অধ্যাত্মসাধনা যখন ক্রমে ক্রমে নিরঞ্জন অসীমের অন্বেষণে মগ্ন হয়েছে, তখন সাধনার এই দ্বিতীয় স্তরে উন্নীত অবস্থায় রচিত গানগুলির সঙ্গে কবীরের গানের মিলগুলি চোখে পড়ে ক্ষিতিমোহনের। তিনি বিশ্লেষণ করেন তাদের সন্তপ্রকৃতি। বহু ক্ষেত্রে মীরা কবীরের বাণী সম্পূর্ণই গ্রহণ করেছেন। অথচ পরবর্তীযুগে মীরার ভজনের পূর্বযুগীয় ভণিতা 'গিরিধারী নাগর' সমস্ত গানে প্রয়োগ করা হয়েছে, সাম্প্রদায়িক ধর্মচর্চায় সেগুলি ব্যবহার করা হয়েছে। মীরার এই পর্যায়ের গানের যথার্থ রূপ সবই হারিয়ে গেছে বলা চলে। ক্ষিতিমোহন লিখেছেন :

> এখনও রাজস্থানের থার প্রদেশ, সিন্ধুদেশ, পশ্চিম রাজস্থান প্রভৃতিতে সাধু-সূফীদের মধ্যে সন্ধান করিলে কিছু পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু অধিকাংশই এখন নষ্ট হইয়া গিয়াছে। মীরার এই ধর্মবিপ্লবের কথা এখন প্রায় চাপা পড়িয়া আসিয়াছে। তবু গিরিধারলাল প্রভৃতি সম্প্রদায় প্রথিত দেবতার প্রতি আস্থাহীন অব্যক্তলিঙ্গাচার অস্পৃশ্য বংশোদ্ভব সদ্‌গুরু রবিদাসের পদতলেই যে মীরা জীবনের নবদীক্ষা স্বীকার করিলেন তাহা তো চাপা দিবার উপায় নাই। বার বার মীরা তাহা ঘোষণা করিয়া চাপা দিবার পক্ষে বড়ই অসুবিধা করিয়া গিয়াছেন।

ক্ষিতিমোহন দেখিয়েছেন যে বৈষ্ণব ধর্ম বা গিরিধারলালকে পূজা করার জন্য মীরার দুঃখ ঘটেনি। দুঃখ ঘটল তাঁর পূর্ববর্তী ধর্মজীবনের সঙ্গে বিচ্ছেদের কারণেই। কুলপ্রতিষ্ঠিত

দেবতার পূজক বর্ণোত্তম ব্রাহ্মণ গুরু ত্যাগ করে তিনি যখন অব্যক্তলিঙ্গাচার চামার রবিদাসকে গুরুপদে বরণ করলেন, তখনই তাঁর দুঃখদুর্দশার কারণ ঘটল। ক্ষিতিমোহন লিখেছেন :

> তাহাদের কুলাচরিত বৈষ্ণব ধর্মকে যে স্বাভাবিক নিয়মে তিনি ছাড়াইয়া গিয়াছিলেন তাহার পরিচয় সাম্প্রদায়িক লেখকেরা যথাসাধ্য গোপন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। তাঁহার যে-সব গান তাঁহার আদিযুগের তাহাতে তো গিরিধরলাল প্রভৃতির নাম থাকিবেই। কিন্তু পরে যখন তিনি সেইসব সীমা অতিক্রম করিয়া গেলেন, তখনকার গানগুলিও সাম্প্রদায়িকগণ হয় অস্বীকার করিয়াছেন, নয় তো তাহাতে ইচ্ছামত গিরিধরলাল প্রভৃতি শব্দ বসাইয়া শুদ্ধ করিয়া তাহাকে পাঙ্‌ক্তেয় করিয়া লইয়াছেন।

মীরার কতকগুলি ভজনের রাম-ভণিতা থেকেও এই ইচ্ছামতো পরিবর্তনের প্রমাণ মেলে। মীরার ধর্মজীবনে এই বিপ্লব ঘটেছিল বলেই শিখদের গ্রন্থসাহেবে তাঁর গান স্থান পেয়েছে, মুসলমান সুফিদের সাধনাতেও তাঁর গান চলে। ক্ষিতিমোহন বলেছেন, 'মীরার পরিণত ধর্মজীবনের গানগুলি পাইলে তাহা জগতের সর্বত্র সকল সম্প্রদায়ের আদরের ধন হইত।'

> অতি কঠোর সাধনা করিলে এখনও যদি তাঁহার সেইসব উদার গানের কিছু কিছু মেলে, পরে তাহাও আর মিলিবে না। কিন্তু নকলেরই এখন এমন প্রতিষ্ঠা যে আসল আসিলে হয়তো তাহাকেই হইতে হইবে লজ্জিত।

এই কথা বলে সাবধান করে ক্ষিতিমোহন প্রশ্ন তুলেছিলেন :

> এখন কি কেহ এইজন্য এত দুঃখ স্বীকার করিবেন? দুই একখানা বই, দুই একটি প্রবন্ধ পড়িয়াই যাঁহারা এইসব বিষয়ে সস্তা উপায়ে লেখক সাজিতে পারেন, তাঁহারা এত দুঃখ কেনই বা বৃথা করিবেন![৪০]

তার উপরে ছাপা পুথিকেই যখন আমরা প্রামাণ্যতার শেষ মাপকাঠি বলে মানি। প্রবন্ধ-শেষে ক্ষিতিমোহন বললেন তাঁর ইচ্ছা ছিল মীরার বসন্তোৎসবের গানগুলির পরিচয় দেবেন। কিন্তু পাঠকের ধৈর্যচ্যুতির আশঙ্কায় একটিমাত্র গানের দৃষ্টান্ত দিয়ে তিনি প্রবন্ধ শেষ করেছেন, সে কথা আগেই উল্লেখ করেছি। এও বলেছিলেন :

> যদি সকলের অভিমত হয় তবে ভবিষ্যতের বসন্তোৎসবে, মীরার বসন্তোৎসবের গানগুলি ভালো করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিজস্ব সংগ্রহ থেকে যে গানটি তিনি প্রবন্ধের সঙ্গে দিয়েছেন সেটি সিন্ধুদেশে মুসলমান সুফিদের উৎসবে তিনি শুনেছিলেন। 'ইহার কতকটা প্রতিরূপ যাহা মুদ্রিত গ্রন্থে পাইয়াছি, ইহার সহিত তাহার তুলনাই চলে না!' ভবিষ্যতে কিন্তু আর কোনোদিনই মীরার বসন্তোৎসবের গান ও তার পরিচয় দেওয়ার সুযোগ হল না ক্ষিতিমোহনের।

দাদূ

'দাদূ' প্রকাশিত হয় ১৯৩৫ সালে। তার দশ বছর আগে প্রবাসী ভাদ্র ১৩৩২ সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথ একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন, এই প্রবন্ধটিই ক্ষিতিমোহনের 'দাদূ' গ্রন্থের ভূমিকা। বহুকাল আগে ক্ষিতিমোহনের মুখে জ্ঞানদাস বঘেলির একটি পদ শুনে আনন্দ পেয়েছিলেন, সেটি ব্যবহার করেছিলেন 'আত্মবোধ' প্রবন্ধে। সেই পদটি শোনার আনন্দের কথা এই ভূমিকায় তিনি স্মরণ করেছেন :

> আমার অপরিচিত হিন্দীসাহিত্যের মহলে কাব্যের বিশুদ্ধ রসরূপটি যখন খুঁজছিলুম, এমন সময় একদিন ক্ষিতিমোহন সেন মশায়ের মুখ থেকে বঘেলখণ্ডের কবি জ্ঞানদাসের দুই একটি হিন্দী পদ আমার কানে এল। আমি বলে উঠলুম এই ত পাওয়া গেল। খাঁটি জিনিষ, একেবারে চরম জিনিষ, এর উপরে আর তান চলে না।
>
> ... ...
>
> জ্ঞানদাসের কবিতা যখন শুন্‌লুম তখন এই কথাটি বার বার মনে এল, এ যে আধুনিক। আধুনিক বলতে আমি এই কালেরই বিশেষ ছাঁদের জিনিষ বল্‌চি নে। এ সব কবিতা চিরকালই আধুনিক। কোনো কালে কেউ বল্‌তে পার্‌বে না এর ফ্যাশান বদ্‌লেচে।

মধ্যযুগীয় এই সাধকদের রচনার কাব্যমূল্য বিচার করতে গিয়ে এ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ এই ভেদবহুল ভারতবর্ষীয় সমাজে এই সৃষ্টির তাৎপর্যটুকু ধরিয়ে দিয়েছেন। আর প্রসঙ্গত বলেছেন :

> ক্ষিতিবাবুর কল্যাণে ক্রমে হিন্দুস্থানের আরো কোনো কোনো সাধক কবির সঙ্গে আমার কিছু কিছু পরিচয় হল। আজ আমার মনে সন্দেহ নেই যে হিন্দী ভাষায় একদা যে-গীত-সাহিত্যের আবির্ভাব হয়েচে তার গলায় অমর সভার বরমাল্য। অনাদরের আড়ালে আজ তার অনেকটা আচ্ছন্ন ; উদ্ধার করা চাই, আর এমন ব্যবস্থা হওয়া চাই যাতে ভারতবর্ষের যারা হিন্দীভাষা জানে না তারাও যেন ভারতের এই চিরকালের সাহিত্যে আপন উত্তরাধিকার-গৌরব ভোগ করতে পারে।

রবীন্দ্রনাথের অন্তর্দৃষ্টিতে এ কথাটা ধরা পড়েছিল যে 'এঁরা হলেন এক বিশেষ জাতের মানুষ।' তিনি বলেছেন :

> ক্ষিতিবাবুর কাছে শুনেচি, আমাদের দেশে এঁদের দলের লোককে বলে থাকে "মরমিয়া"। এঁদের দৃষ্টি, এঁদের স্পর্শ মর্ম্মের মধ্যে ; এঁদের কাছে আসে সত্যের বাইরের মূর্ত্তি নয়, তার মর্ম্মের স্বরূপ।[৪১]

'ভারতীয় মধ্যযুগে সাধনার ধারা'-য় একটি সুদীর্ঘকালের সাধনা ও সৃষ্টির ইতিহাসকে সংক্ষিপ্ত পরিসরে ধরেছিলেন ক্ষিতিমোহন, 'দাদূ'-তে সেই সময়কারই এক বিশিষ্ট সাধকের জীবনসাধনা ও বাণীকে অবলম্বন করে সেই কালের অমৃতরসধারার একটি প্রবাহকে বাংলা-ভাষীর সান্নিধ্যে তিনি এনে দিতে পারলেন, যার প্রত্যাশা ব্যক্ত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের ভূমিকায়। তিনি শোনালেন এক অসামান্য মরমিয়ার কথা, যাঁর দৃষ্টি মর্মকে স্পর্শ করেছে,

যিনি সত্যের অন্তরের মূর্তি দেখেছেন। রবীন্দ্রনাথকেই উৎসর্গ করলেন এই বই। একান্ত কৃতজ্ঞতা জানালেন : 'পূজনীয় কবিগুরু শ্রীমদ্ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের উদ্দেশ্যে'। বললেন : 'তাঁহার উৎসাহেই এই কার্য্যে হাত দিয়াছিলাম, তাঁহার সহায়তাতেই এই সংগ্রহ বাহির করা সম্ভব হইয়াছে এবং তাঁহার কাছে আমি এই জন্য কত যে ঋণী তাহা কহিয়া বুঝাইবার নহে।' তাঁর 'নিবেদন'-এ আর যা বললেন ক্ষিতিমোহন তা থেকে তাঁর অন্তরের একটি প্রবণতা বুঝতে পারা যায়। তিনি বললেন .

> জানি না এই গ্রন্থের দ্বারা কাহারও কোনো উপকার বা আনন্দ হইবে কি না। এই গ্রন্থ প্রকাশিত করার যাহা উদ্দেশ্য তাহা আমার দ্বারা ঠিক সাধিত হইয়াছে কিনা তাহাও ঠিক জানি না ; কারণ এই বিষয়ে আমার যোগ্যতার কোনো দাবী নাই। তবু শ্রদ্ধাভরে সকল ভক্তিরসপিপাসু সজ্জনের কাছে এই ভক্তবাণী সংগ্রহখানি উপস্থিত করিতেছি। মধ্যযুগের সাধনার যাঁহারা রসিক তাঁহাদের যদি ইহাতে কিছুমাত্র সন্তোষ হয় তবেই আমার সকল প্রয়াস সার্থক হইবে।[৪২]

অর্থাৎ তাঁর মনের আকর্ষণটা ছিল সম্পূর্ণত ভক্তিরসপিপাসুদের দিকে, যাঁরা মধ্যযুগের সাধনার রস অন্তরে জেনেছেন তাঁদেরই প্রতি দায়িত্ব বোধ করছেন তিনি, নিছক সাহিত্য-প্রীতিতে যাঁরা দাদূর সাধনবাণীর দিকে তাকাবেন, তাঁদের প্রতি নয়।

গ্রন্থের দাদূবাণী সংকলনের সূচনায় যে 'উপক্রমণিকা' আছে, তাতে ক্ষিতিমোহন সন্ত দাদূর জীবন ও সাধনার বিস্তৃত পরিচয় দিয়েছেন, দাদূবর্ণিত পূর্ব ভাগবতগণের ও দাদূ-শিষ্যদের পরিচয় দিয়েছেন, দাদূসম্পর্কীয় গ্রন্থমালা ও বিশেষজ্ঞগণের পরিচয় দিয়েছেন, দাদূ-সংগ্রহপরিচয়ের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এ ছাড়া একটি অধ্যায় আছে 'শূন্য ও সহজ'। উপক্রমণিকার কোথাও কোথাও ক্ষিতিমোহনের বক্তব্য অনুসরণে ধারণা করা যায় দাদূর জীবন ও বাণীর সন্ধানে ভারতবর্ষের সুবিস্তীর্ণ অঞ্চলে দীর্ঘসময় ঘুরেছেন ক্ষিতিমোহন। উপক্রমণিকার 'দাদূসংগ্রহ পরিচয়'-এর একটি মন্তব্য বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ক্ষিতিমোহন লিখেছেন :

> এই সংগ্রহে যে বাণী ও সবদ প্রকাশ হইতেছে তাহা সাধুদের কণ্ঠ হইতে নেওয়া। তবু তার প্রত্যেকটি আমি পুঁথির সঙ্গে মিলাইয়া দেখিয়াছি। যে সব পদ ও গানের কাছাকাছি কিছুই কোনো পুঁথিতে নাই অর্থাৎ যে সব ভাব পুঁথিতে গৃহীত হয় নাই তাহা আপাততঃ এইবার প্রকাশ করিলাম না।

এই প্রসঙ্গে বললেন একটি-দুটি পদ ছাড়া সবই কোনো পুথিতে আছে তবে আকার ও সন্নিবেশের কিছু পার্থক্য থাকতে পারে, এমনও হতে পারে কোনো একটি শ্লোক পুথির নানা শ্লোকে ছড়িয়ে আছে। এ কথা বলে আবার যোগ করলেন :

> অনেক মূল্যবান ও চমৎকার পদও কোনও পুঁথিতে এখনও দেখি নাই বলিয়া এই গ্রন্থে বাদ দিলাম। প্রয়োজন বোধ করিলে পরে সে সব প্রকাশ করা যাইবে।[৪৩]

কেন তিনি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তা বোধ হয় আমরা অনুমান করতে পারি। যাই হোক, তা হলে দেখা যাচ্ছে, ক্ষিতিমোহন দাদূর যে-সব পদ অপ্রকাশিত রাখার সিদ্ধান্ত নেন,

সেগুলি আর কোনোদিনই প্রকাশ্যে আসেনি, তাঁর নিজের সংগ্রহেই থেকে যায়। কিন্তু কোথায় আজ এগুলির হদিস মিলবে কে বলবে? মনে তো হয় না পাণ্ডুলিপি আকারে এগুলির পৃথক কোনো অস্তিত্ব আছে। এগুলি ছিল তাঁর সংগ্রহের খাতা ও পুথিপত্রের মধ্যে এবং তার হদিস জানত তাঁর মন।

'দাদূ' বাজারে বেরোবার আগেই রবীন্দ্রনাথ হেমন্তবালা দেবীকে একখানি কপি পড়তে পাঠিয়েছিলেন। কিছুদিন পরে তাঁর চিঠির উত্তরে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে লিখলেন :

> ক্ষিতিমোহনবাবু দাদূ-চরিতের যে উপক্রমণিকা লিখেচেন সেটি আমার ভালো লেগেছে বলেই তোমাকে পড়তে পাঠিয়েছি। ভারতের মধ্যযুগে এই যে সব বড়ো বড়ো সাধকদের আবির্ভাব হয়েছিল এঁরা সমাজ ও শাস্ত্রের প্রাচীর তোলা দুর্গের বাইরে বাস করতেন বলেই এঁদের প্রতিভার স্বচ্ছতায় আধ্যাত্মিক সত্যের প্রকাশ এমন বিশুদ্ধ ও সার্ব্বভৌমিক হয়েছিল। এই সকল ধর্ম্মসাধকদের প্রায় সকলেরই উৎপত্তি অন্ত্যজ জাতির থেকে। সমাজ তাঁদের বাইরে বসিয়ে রেখেছিল,—সেই অনাদর অবজ্ঞাতেই তাঁদের মুক্তির সহায়তা করেছিল। ঐ বই বাজারে বের হবার পূর্ব্বে আমাকে দেখতে দেবার জন্যে যে কপি পাঠানো হয়েছিল, সেই কপিই তোমাকে দিয়েছি। ঐ মলাটে যে আঁকাজোখা আছে সে আমার নয়, কার তা জানি নে।[৪৪]

কয়েক মাস পরে দাদূবাণীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কবিতার আশ্চর্য মিল লক্ষ করে পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী রবীন্দ্রনাথকে যে চিঠি লিখেছিলেন, তার প্রাসঙ্গিক অংশটুকু উদ্ধৃত করা যাচ্ছে :

> ৬৩ সাউথ এণ্ড পার্ক
> বালিগঞ্জ
> ২৪শে কার্ত্তিক, ১৩৪২
>
> শ্রীচরণকমলে প্রণামপূর্ব্বক নিবেদন
>
> কয়েকদিন হইতে মনের মধ্যে একটা প্রশ্ন উঠিয়াছে তাহা লিখিতেছি। ক্ষিতির 'দাদূর' ২১৮ ও ৬৪০ পৃষ্ঠা দেখুন। 'ধূপ আপনারে মিলাইতে চাহে গন্ধে'*—আপনার এই কবিতাটি লিখিবার পূর্ব্বে দাদূর কবিতাটির সহিত আপনার কোনো পরিচয় ছিল কি? আশ্চর্য্য মিল!
>
> সেবক
> বিধুশেখর ভট্টাচার্য্য

রবীন্দ্রনাথ এ চিঠির যে উত্তর দিলেন সেটি তাঁর স্বকীয় রসবোধে ভাস্বর :

> প্রীতিনমস্কার সম্ভাষণ,
>
> দাদুর সঙ্গে আমার পরিচয় আপনাদের ঠাকুর্দ্দাদুর সঙ্গে পরিচয়ের পরে। "ধূপ আপনারে" কবিতাটি তার অনেক পূর্ব্বের লেখা। এমন একটি নয়, ক্ষিতিবাবু প্রমাণ করতে

* 'ধূপ আপনারে মিলাইতে চাহে' : মোহিতচন্দ্র সেন সম্পাদিত 'কাব্যগ্রন্থ' (১৯০৩/১৩১০)-এর রূপক বিভাগের প্রবেশক কবিতা। এই প্রয়োজনসাধনের জন্যই রচিত। অনেক পরে 'উৎসর্গ' কাব্যগ্রন্থে ১৩২১/ ১৯১৪ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। উৎসর্গ ১৭, র-র ১০/৩৩।

বসেছেন যে আমার অনেক কবিতার ভাব, এমন কি তার বাক্য আমার জন্মের পূর্ব্বেই মধ্যযুগের সাধকেরা বিনা স্বীকৃতিতেই চুরি করে নিয়েচেন, অদৃশ্যে সিঁধ কাটবার কোথাও একটা সহজ পথ নিঃসন্দেহ আছে। অধিকাংশ কবিই চোর কবি, তাঁরা না জেনেও ভূত ভবিষ্যতের ভাণ্ডারে হস্তক্ষেপ করে থাকেন।...

ইতি ২৬ কার্ত্তিক ১৩৪২ আপনাদের

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর [৪৫]

বিধুশেখর দাদূ গ্রন্থের ২১৮ ও ৬৪০ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত দাদূবাণীর প্রতি রবীন্দ্রনাথের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চেয়েছিলেন। দাদূবাণীর প্রথম প্রকরণের দ্বিতীয় অঙ্গ 'সাধু'। এই বিভাগের অন্তর্গত 'রূপ ও ভাবের পরস্পরে পূজা' অংশে আলোচ্য বাণীটি স্থান পেয়েছে ২১৮ পৃষ্ঠায়।

বাস কহৈ হম ফূল কো পাউঁ, ফূল কহৈ বাস।
ভাস কহৈ হম সত কো পাউঁ সত কহৈ হম ভাস।।
রূপ কহৈ হম ভাব কো পাউঁ ভাব কহৈ হম রূপ।
আপস মেঁ দউ পূজন চাহৈ পূজা অগাধ অনূপ।।

'গন্ধ বলে, যেন আমি ফুলকে পাই (তবে আমি আশ্রয় ও প্রকাশ পাইতাম), ফুল বলে, যেন আমি গন্ধকে পাই (তবে আমি সার্থক হইতাম)।
ভাস (প্রকাশ) বলে যেন আমি সত্যকে পাই ; আর সত্য বলে, যেন আমি ভাসকে পাই। রূপ বলে যেন আমি ভাবকে পাই, আর ভাব বলে যেন আমি রূপকে পাই। পরস্পরে উভয়ে উভয়কে করিতে চাহে পূজা। অগাধ (অসীম, অপার, অতলস্পর্শ) অনুপম হইল এই পরস্পরকে পরস্পরের পূজা।'

ক্ষিতিমোহন পাদটীকায় জানিয়েছেন এই বাণীটি তৃতীয় প্রকরণের তৃতীয় অঙ্গ 'বিচার' অংশেও আছে। সেই অনুসারে ২৯৩ পৃষ্ঠায় এ বাণী পুনরুল্লিখিত, সংকলয়িতা তার যে বঙ্গানুবাদ সেখানে দিয়েছেন তা ভাবগত দিক থেকে একই, বলা বাহুল্য, তবে শব্দের প্রয়োগগত দিক থেকে একটু-আধটু পার্থক্য যে নেই তা নয় :

"গন্ধ বলে আহা আমি যেন পাই ফুলকে, ফুল কহে হায় আমি যেন পাই গন্ধকে। ভাস (প্রকাশ বা ভাষা) কহে আমি যেন পাই সৎ (সত্য) কে, সৎ বলে আমি যেন পাই ভাসকে। রূপ বলে আমি যেন পাই ভাবকে, ভাব বলে আহা আমি যেন পাই রূপকে। দুই-ই পরস্পরে এ ওকে করিতে চাহে পূজা ; অগাধ এই পূজা, অনুপম এই পূজা।"

বিধুশেখর অবশ্য এই দ্বিতীয়টির উল্লেখ করেননি তাঁর চিঠিতে। 'দাদূ'-র শেষ ভাগে সাধক দাদূর সাধনা ও উপলব্ধি বিষয়ে কয়েকটি অতিরিক্ত আলোচনা আছে। উপক্রমণিকার পরিশিষ্টে 'শূন্য ও সহজ'-এর আলোচনা ছিল। গ্রন্থশেষে পুনরপি 'সহজ ও শূন্য'-এর আলোচনা প্রসঙ্গে ৬৪০ পৃষ্ঠায় উক্ত বাণী তৃতীয় বার উল্লিখিত হয়েছে এবং রবীন্দ্রনাথের 'ধূপ আপনারে মিলাইতে চাহে' কবিতার সঙ্গে এই দাদূবাণীর আশ্চর্য ভাবসাদৃশ্যের কথা সেখানে বলা হয়েছে।

ভারতের সংস্কৃতি

জ্ঞানচর্চার বিচিত্র ধারার সঙ্গে যাতে সাধারণ মানুষেরও পরিচয় ঘটে সেজন্য বিশ্বভারতী সহজ ভাষায় ছোটো ছোটো বই প্রকাশের উদ্দেশ্যে 'বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ গ্রন্থমালা'-র পরিকল্পনা করেন, ১৩৫০ সাল থেকে বই প্রকাশ শুরু হয়। এই সিরিজের তিন নম্বর বই 'ভারতের সংস্কৃতি'। প্রথম প্রকাশ আষাঢ় ১৩৫০ (১৯৪৩), দ্বিতীয় মুদ্রণ কার্তিক ১৩৫০। বহুদিন থেকে রবীন্দ্রনাথ এ কথা বলে এসেছেন যে ভারতের প্রকৃত ইতিহাস লেখা হয়নি। বিদেশি উপদ্রব ও তাদের রাজ্যবিস্তারের কাহিনির মধ্যে তার ইতিহাস নেই :

> তখন প্রকৃত ভারতবর্ষের মধ্যে যে জীবনস্রোত বহিতেছিল, যে চেষ্টার তরঙ্গ উঠিতেছিল, যে সামাজিক পরিবর্তন ঘটিতেছিল, তাহার বিবরণ ইতিহাসে পাওয়া যায় না।
>
> কিন্তু বর্তমান পাঠ্যগ্রন্থের বহির্ভূত সেই ভারতবর্ষের সঙ্গেই আমাদের যোগ। সেই যোগের বহুবর্ষকালব্যাপী ঐতিহাসিক সূত্র বিলুপ্ত হইয়া গেলে আমাদের হৃদয় আশ্রয় পায় না। আমরা ভারতবর্ষের আগাছা-পরগাছা নহি, বহু শত শতাব্দীর মধ্য দিয়া আমাদের শত সহস্র শিকড় ভারতবর্ষের মর্মস্থান অধিকার করিয়া আছে।[৪৬]

সেই যে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন : 'ঐক্যমূলক যে সভ্যতা মানব জাতির চরম সভ্যতা, ভারতবর্ষ চিরদিন ধরিয়া বিচিত্র উপকরণে তাহার ভিত্তি নির্মাণ করিয়া আসিয়াছে।' বরাবরই ক্ষিতিমোহনেরও নাড়ির টান ভারতের সঙ্গে ভারতবাসীর সেই ইতিহাসের লিখিত বিবরণের বাইরে তার আসল যোগসূত্রের প্রতি। ভারতীয় সভ্যতার সেই অলিখিত উপকরণের অনুসরণের অনুপ্রেরণা বোধ করেছিলেন অনেকদিন থেকেই, তবে এ-সব বিষয় নিয়ে বই লেখার সংকল্পের পিছনে রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছা অনুরোধ তাগিদ সবই ছিল। কবির সঙ্গে তাঁর এ-সব নিয়ে অনেকসময় আলোচনা হত। ১৯২৩ সালে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যখন তিনি কাশীতে যান, সেখানে সব প্রদেশের সব ভাবের মানুষের বাস দেখে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে আঞ্চলিক বিশিষ্টতাবৈচিত্র্যের তুলনামূলক আলোচনা করবার জন্য অনুরোধ করেছিলেন, সে কথা তিনি ভোলেননি। তাঁর কাজের ক্ষেত্র ভিন্ন হলেও সেই সময় থেকেই তিনি এই বিষয়ে অল্প অল্প কাজ করতে থাকেন। ভারতের ধর্ম ও সংস্কৃতির এই বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য ও ঐক্যের মধ্যে বৈচিত্র্যের অনন্য স্বভাবের স্বরূপ সন্ধানের চেষ্টা আছে ক্ষিতিমোহনের 'ভারতের সংস্কৃতি' ও 'হিন্দু সংস্কৃতির স্বরূপ' গ্রন্থে। বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ গ্রন্থমালার ৬৬ সংখ্যক গ্রন্থ 'হিন্দু সংস্কৃতির স্বরূপ' 'ভারতের সংস্কৃতি' গ্রন্থের সহযোগী। এই সঙ্গেই নাম করতে হয় তাঁর 'প্রাচীন ভারতে নারী' (১৯৫০) ও 'জাতিভেদ' (১৯৪৭) গ্রন্থের। এই চারটি বই একই অন্বেষণধারার ফসল মনে করবার কারণ আছে এবং প্রকাশকালের পার্থক্য যাই থাক, ক্ষিতিমোহন বোধ হয় খুব অল্প সময়ের ব্যবধানেই এই গ্রন্থগুলির খসড়া-পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেছিলেন। দু-একটি ছোটোখাটো প্রমাণে এ অনুমানের সমর্থন মেলে। 'জাতিভেদ' গ্রন্থের শেষে ছোটো একটা 'নোট' আছে,

ক্ষিতিমোহন লিখেছেন অক্টোবর ১৯৪০-এ তাঁর হিন্দিতে 'ভারতবর্ষমেঁ জাতিভেদ' প্রকাশিত হয়, সে বই বেরিয়েছিল 'জাতিভেদ'-এর বাংলা পাণ্ডুলিপি নির্ভর করে। 'জাতিভেদ' তো বেরিয়েছে তার চেয়ে অনেকটা পরে, এ বইয়ের ৩৪ পৃষ্ঠায় ক্ষিতিমোহন একটি পাদটীকায় ভারতবর্ষ ভাদ্র ১৩৩৭ সালে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধের উল্লেখ করেছেন : "দেখিলাম আমাদের বন্ধুবর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ বেদশাস্ত্রী মহাশয় 'বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্র-সন্দেশ' নামে একটি চমৎকার প্রবন্ধ লিখিয়াছেন।" উল্লেখের ধরন দেখে মনে হয় ক্ষিতিমোহন বোধ হয় সেই সময়ই অর্থাৎ ১৯৩০ সালে 'জাতিভেদ' লিখছিলেন।

'ভারতের সংস্কৃতি'-র ভূমিকায় ক্ষিতিমোহন বললেন এমন সাংঘাতিক ভেদও কোথাও নেই, সাম্য ও অভেদের বাণীও আর কোথাও এমন করে শোনা যায়নি। ভারতের এই সমন্বয়সাধনার গতিটি সহজ কথায় অল্প পরিসরে দেখানোই এ বইয়ের উদ্দেশ্য। অন্য দেশে যেমন একটি প্রবল ধর্ম বা সংস্কৃতি অন্য সব দুর্বল সভ্যতা সংস্কৃতিকে ধ্বংস করে বিভেদ-সমস্যার সমাধান করেছে, সেই সহজ পথ ভারতের নয়। এ দেশের ইতিহাস ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম-সংস্কৃতির উচ্ছেদের ইতিহাস নয় বলেই এখানকার ধর্ম ও সংস্কৃতির সম্পদ নানা দিকে পূর্ণ। এখানে পাশাপাশি উন্নত ও অনুন্নত নানা সংস্কৃতির যোগাযোগ জীবন্ত। হিন্দু ধর্মকে ভারতীয় ধর্ম-সংস্কৃতির সঙ্গে এক করে দেখালেন তার বৃহত্তর অর্থগৌরবে, বললেন ভূত ও ভব্যের মধ্যে যতই অসংগতি থাক, ভারতের মহাপুরুষ তাঁরাই যাঁরা বিচ্ছেদ ও বিভেদের সমস্যা মেটাতে চেয়েছেন প্রীতি ও মহত্ত্ব দিয়ে। এই সমন্বয়সাধনাকেই মহাত্মা কবীর বলেছেন ভারতপন্থ, সে পথের সাধন আজও অব্যাহত। এরই মর্মব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে ক্ষিতিমোহন যখন বললেন মৃন্ময়লোক ছাড়িয়ে চিন্ময় জগতেই মানুষের সম্পূর্ণ পরিচয়, যেখানে তার মনুষ্যত্ববোধের উদ্ভব ও স্থিতি, এবং সেটাই তার সংস্কৃতির উৎস, যার জন্য দরকার ব্যক্তিত্ব ও বৈচিত্র্য, তখনই সেই ব্রিটিশ শাসনের অন্তপর্বের আলোড়িত রাজনৈতিক পটভূমিতে দাঁড়িয়ে এই খেদও তাঁর মনে এল যে, ইউরোপ যেমন করে রাষ্ট্রীয় সংহতি আনতে পেরেছে আমরা তা পারিনি বলে আমরা বিড়ম্বিত, নিগৃহীত, অথচ অন্যকে ধ্বংস না করার শুভবুদ্ধিই ছিল এই সংহতিহন্তারক বৈচিত্র্যের মূলে।

আশি পৃষ্ঠার বই, ভূমিকার পরে মূল বিষয়ে হাত পড়েছে সাত পাতা থেকে। আলোচ্য বস্তু কয়েকটি উপশিরনামায় বিভক্ত। কীভাবে ভারতে উৎপন্ন ও আগত সকল ধর্ম-সংস্কৃতিই হিন্দুধর্মে সমন্বিত হয়েছে এবং কীভাবে উভয় ক্ষেত্রেই গ্রহণে-দ্বিধার নিদর্শনগুলি মূর্তিমান আত্মখণ্ডনের মতো তাতে বিরাজ করেছে, সে আলোচনার পাশাপাশি ক্ষিতিমোহন দেখালেন ভারতীয় সংস্কৃতির এই সমন্বয়ধর্মিতার ঔদার্য ভাগবতদের দান, জৈন ও বৌদ্ধমতের সহায়তাও ছিল। এই তিন ধর্ম-সংস্কৃতির অসংকীর্ণ সাম্যবাদী দৃষ্টি ক্ষিতিমোহনের লেখায় বিশেষ মর্যাদা পেল। সন্তমতের মতোই এই তিন ধারার প্রতি তাঁর মন সতত শ্রদ্ধাপরায়ণ। তার প্রমাণ তাঁর সব লেখাতেই মেলে। পরম্পরা-অন্বেষণের যে প্রবণতা তাঁর স্বভাবধর্ম তারও প্রসঙ্গ সহজ অধিকারে নিজের স্থান করে নিল, যখন তিনি

দেখালেন ভাগবত-পূর্বসূরিদের চিন্তার মধ্যেই ভাগবতদের উদার দৃষ্টিভঙ্গির মূল আছে, বুদ্ধদেবের জীবনেও তাঁর পূর্বকালের ঔপনিষদিক সত্য মূর্তিমান এবং জৈন পাহুড দোঁহার উদার উপলব্ধিগুলিও একদিকে যেমন পরম্পরাবাহিত হয়ে এসেছে অন্যদিকে তেমনই পরবর্তীকালের চিন্তা ও অনুভবকে সমৃদ্ধ করেছে। তাই নিশ্চিত প্রত্যয়ে বললেন : 'ভারতের সাধনার মধ্যযুগের সব সম্পদ বহুকাল থেকেই চলে আসছিল।'

মুসলমানরা যখন এ দেশে এলেন, তাঁদের ধর্ম চারিদিক থেকে এমন সাবধানে চৌহদ্দি-বাঁধা যে, তাকে মিলিয়ে নেওয়া কঠিন বলে এই বহু শতাব্দীবাহিত সমীকরণধারায় ব্যাঘাত ঘটল, ক্ষিতিমোহন সংক্ষেপে তার ব্যাখ্যা দিলেন। তাঁর মতে তার বিপদটা বেশি হল পণ্ডিতদের মধ্যেই, পল্লিগ্রামে সাধারণ মানুষের মধ্যে সমন্বয়ের বাধা তেমন হল না। এই অসমন্বয়ের বাধা দূর করার কাজে এগিয়ে এলেন মধ্যযুগের সাধকরা, তাঁদের সাধনার দীর্ঘ ইতিহাস আলোচনায় ক্ষিতিমোহন বিরত থেকেছেন এই গ্রন্থে। কারণটা সহজবোধ্য। এর আগে 'ভারতীয় মধ্যযুগে সাধনার ধারা' ও 'দাদূ' গ্রন্থে এই সন্তসাধনার ইতিহাসটির নানা দিক তিনি প্রভূত শ্রমে উদ্‌ঘাটিত করেছিলেন। তবে ক্ষিতিমোহনের যে-কোনো আলোচনায় সন্তপ্রসঙ্গ এসেই পড়ে, ভারতের সংস্কৃতির গতিপথ নির্দেশে সে প্রসঙ্গ অনুল্লিখিত থাকতেও পারে না, সুতরাং সংক্ষিপ্ত উল্লেখ আছেই।

ক্ষিতিমোহনের মতে আর্য-অনার্য সংস্কৃতির সম্মিলনের দুটি শ্রেষ্ঠ ফল, (এক) শিবের অপূর্ব রূপকল্পনা ও (দুই) ইতরার পুত্র ঐতরেয়, মহীদাস পরিচয়ে যিনি ঋগ্‌বেদের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগ্রন্থ রচনা করেন—যার 'চরৈবেতি' বা 'আত্মসংস্কৃতির্বাব শিল্পানি' প্রভৃতি চির-আধুনিক মন্ত্রগুলি বর্তমান যুগের পক্ষেও বিস্ময়কর, সেই মানুষটি। আর ক্ষিতিমোহনের মতে এই সম্মেলনের নিকৃষ্টতম ফল হল জাতিভেদ, 'এই একটি আর্যেতর প্রথা আমাদের সমাজে গভীরভাবে বদ্ধমূল হয়ে গেছে।' এই প্রসঙ্গে Hinduism গ্রন্থে দেবতার মানবায়ন সম্বন্ধে ক্ষিতিমোহন যা বলেছেন তার উল্লেখ করা যেতে পারে। সেখানে 'অবতার' প্রসঙ্গে তিনি যে সিদ্ধান্ত করেছেন সেও আর্য-অনার্য সংস্কৃতির একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত :

> This doctrine of the *avatara* is non-Vedic and possibly non-Aryan and it seems to be an advance on the dependence on the extra human gods of the Vedic period. ...The cultural influences of the non-Aryan certainly humanized the Vedic religion.[৮৭]

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ বা ওইজাতীয় কাজের একটা বৈশিষ্ট্য হল অল্প পরিসরে প্রচুর তথ্যের সমাবেশ। তথ্যসমাবেশপ্রাচুর্য ক্ষিতিমোহনেরও স্বভাব। তাঁর সব লেখাই জ্ঞাতব্য বস্তুর ভাণ্ডারবিশেষ। 'ভারতের সংস্কৃতি'-তেও প্রচুর তথ্যসমাবেশ দেখতে পাই। কিন্তু সাজানোর ধরনটা একটু শিথিল, এলোমেলো। পড়তে পড়তে মনে হয় তাঁর এত কিছু বলবার আছে যে খুব ধীরেসুস্থে ভেবেচিন্তে চূড়ান্ত শৃঙ্খলবিধান করে এগোতে গেলে তাঁর যেন চলে না। তাই কখনও কখনও ঈষৎ প্রসঙ্গান্তর ঘটে যায় হয়তো, কিন্তু লেখকের চলার গতি

অব্যাহত থাকে। অত্যন্ত সহজ প্রাঞ্জল ভাষায় অজস্র অত্যন্ত মূল্যবান উপকরণ তিনি উপস্থাপন করেন, তাঁর নিজের বিচারশীল স্বচ্ছ দৃষ্টি নিঃশব্দে তাকে অনুসরণ করে এবং যথাপ্রয়োজন যে মন্তব্যটি করে, তাতে অনেক সময়েই সেকালের সঙ্গো একালের সেতুবন্ধ ঘটে যায়। সবটা মিলিয়ে একটা আপাত শিথিল ভঙ্গি ক্ষিতিমোহনের লেখারই বিশেষ ধরন বা 'স্টাইল', তাঁর ভারতবিদ্যাবিষয়ক এই চারখানি বইতে এটা খুব যেন চোখে পড়ে। তারই মধ্যে কত যে কথা বলা হয়ে যায়, কখনও কখনও তাঁর অনুসন্ধানের স্তূপাকৃতি ফসল সাজাতে সাজাতে বলে ওঠেন 'কত আর বলিব', কখনও বা কোনো প্রসঙ্গো অনেক কথা বলতে বলতে পাঠকের ধৈর্যের প্রতি যেন করুণা প্রকাশ করে ক্ষিতিমোহন থেমে যান।

জাতিভেদ

রবীন্দ্রনাথেরই অভিপ্রায় ও নির্দেশের সঙ্গো যোগ এই গ্রন্থেরও, ক্ষিতিমোহন তাঁর স্মৃতিতে উৎসর্গ করলেন এই বই। 'জাতিভেদ' প্রকাশিত হয় ফাল্গুন ১৩৫৩, ১৯৪৭ সালের প্রথম দিকে। আগেই বলেছি, এ বইয়ের পাণ্ডুলিপি অবলম্বনে ১৯৪০ সালে এর হিন্দি অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গো আর্য ও আর্যেতর সভ্যতার বৈশিষ্ট্য ও সম্মিলন সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে ক্ষিতিমোহনের মনে হয় জাতিভেদ জিনিসটা ভারতবর্ষে এসে চারিদিকের প্রভাবের মধ্যে পড়ে আর্যরা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এই বিশ্বাসের পক্ষে কয়েকটা সহজ যুক্তি ছিল। শুধু অনার্য সব দেবতা বা উপকরণ নয়, অনার্যসংস্পর্শে বৈদিক আর্যদের মধ্যে এমন আরও বহু জিনিস এল যা আগে সমাজে চলিত ছিল না। সাধারণত অনেক বিরুদ্ধতার মধ্য দিয়েই তা ঘটেছে, হয়তো সমাজে প্রবেশ লাভ করবার সময় তাকে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছে। কিন্তু কোনোমতে একবার প্রবেশ করে একটু পুরোনো হতে পারলে তখন সমাজের সনাতনী শক্তিই তাকে প্রাণপণে রক্ষা করেছে। এইভাবেই জাতিভেদও আর্যসমাজে প্রচলিত হয়েছিল, এ কথা অনুমান করার কারণ হল, এটা দেখা যাচ্ছে যে, আর্যেতর জাতিগুলি একটা উদ্ধত স্বাতন্ত্র্যবুদ্ধির দ্বারাই নিজের নিজের সংস্কৃতি বজায় রাখতে পেরেছিল। তাই মনে হয় জাতি ও কুল বিশুদ্ধ রাখার জন্য অন্যের সংস্পর্শ থেকে নিজেকে বাঁচাবার এই চেষ্টা আর্যরা শিখেছিলেন এ দেশের দ্রাবিড় ও দ্রাবিড়পূর্ব জাতিগুলির কাছ থেকেই। এও লক্ষণীয়, প্রাচীন আর্যভূমিগুলির থেকে অনার্যভূমিতে ও আর্যেতর জাতিদের মধ্যেই ছোঁয়াছুঁয়ির বিচার অনেক বেশি তীব্র। এ জিনিস আর্যদের আমদানি যে নয়, তার আরও প্রমাণ হল, অন্যান্য দেশে যেখানে আর্য জাতির নানা শাখা আছে তাদের মধ্যে জাতিভেদ নেই। পাঞ্জাব দিয়ে আর্যরা ভারতে প্রবেশ করেন, কিন্তু পাঞ্জাব বা অন্যান্য আর্যপ্রধান অঞ্চলে এ প্রথার তীব্রতা তত বেশি নয়, দক্ষিণ ভারতে ও অনার্যপ্রধান অন্যান্য স্থানে যেমন। আর্য উপনিবেশগুলি যত অনার্য-অধ্যুষিত এলাকায় ছড়িয়ে পড়ল তাদের মধ্যে ভেদবুদ্ধির চর্চা তত বাড়তে লাগল। তা ছাড়া আর্যরা

চিরদিন অদ্বৈত-অভেদকেই বড়ো বলে জেনেছিলেন, এই বিভেদের মানসিকতা তাঁদের সহজাত নয়, তাঁরা জ্ঞানপন্থী।

ভারতে যুগে যুগে কত যে জাতি (ethnic group) এসেছে এবং পূর্বাগত জাতিকে হারিয়ে বা সরিয়ে নিজেদের স্থান করে নিয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই। সেই সব নানা জাতির স্তরের উপর নদীর পলিমাটির মতো ভারতের মানবসমাজ গড়ে উঠেছে। আপন আপন ধর্মকর্ম ও সংস্কৃতি নিয়ে পাশাপাশি বাস করেছে, তাতে ভারতে ধর্ম ও মতের বহু বৈচিত্র্য হয়েছে, বহু জাতি ও সমস্যারও উদ্‌ভব হয়েছে। তার মধ্যে এই ভেদের সমস্যাটাই সবচেয়ে তীব্র হয়ে উঠল, ক্রমে ক্রমে বিশ্বের সঙ্গে ভারতের লেনদেনের পথে মস্ত বাধা হয়ে দাঁড়াল। স্বভাবতই এই জ্বলন্ত সমস্যা নিয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে অনেক সময় আলোচনা হত। এই জাতিভেদের দরুন ভারতের অধিকাংশ মানুষ—বিশেষ করে নারী ও শূদ্ররা তাদের শ্রেষ্ঠ সম্পদ বিশ্বমানবকে দিয়ে যেতে পারল না, মনে হত তাঁদের। রবীন্দ্রনাথ বলতেন সেজন্য দেশের এই নির্বাকদের যতটা সম্ভব পরিচয় প্রকাশ করার প্রয়োজন আছে।

অবশ্য ক্ষিতিমোহনের কাজ যে ঠিক এই উদ্দেশ্যসাধনের পথে লক্ষ রেখে চলেছে এমন বলা চলে না। আর্যসমাজে যে উদার বিধান এদের সম্বন্ধে ছিল এবং পরবর্তীকালে অনুদার হিন্দুসমাজে যে তা হৃত হল, এই বিবরণই প্রাধান্য পেয়েছে। তবে নারী ও শূদ্রদের এই অবজ্ঞা করার জন্যই আজ দেশের এমন দুর্গতি, সে কথাটা বোঝাবার তাগিদ আছে লেখকের এটা বোঝা যায়। এদের সম্পদের পরিচয়দান প্রসঙ্গে একটি দৃষ্টান্ত কয়েকবারই ঘুরে এসেছে—গান শেখবার জন্য দেবর্ষি নারদকে নারী ও শূদ্রের কাছে যেতে হয়েছিল।

'জাতিভেদের পুরাবৃত্ত' নামে যে একটি অধ্যায় 'জাতিভেদ'-এর পরিশিষ্ট অংশে আছে, সেটাই প্রথম ক্ষিতিমোহন লিখে দেখিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথকে। সে লেখা পড়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন এ-সবই তো শাস্ত্রের কথা। সমাজ তো পুরোপুরি শাস্ত্রের অনুশাসনমতো চলে না। তাই তাঁর প্রস্তাব ছিল বঙ্গদেশের সামাজিক জীবন থেকে জাতি ও কুলের কথা কিছু আলোচনা করতে হবে। সেইমতো পড়াশোনা করতে গিয়ে 'জাতিভেদ ও কুলশাস্ত্র' নামে পরিশিষ্টে যে অধ্যায় আছে সেটা লেখা হয়েছিল। তখন রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়েছে, তাঁর পক্ষে আর এ-সব নিজে পড়া দুঃসাধ্য। তবে তা নিয়ে তাঁর সঙ্গে একটু আলোচনার সুযোগ হয়েছিল। বেদ-পুরাণেও যেমন, কুলশাস্ত্রেও তেমনই তখনকার বাংলা দেশের সমাজের বহু দুষ্কৃতির কথা আছে। তা নিয়ে বাগ্‌বিস্তার করতে মন চায় না, উল্লেখ না করেও উপায় নেই। তা নিয়ে যে দ্বন্দ্বে পড়েছিলেন, তার নিরসন হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলোচনায়। সমাজের প্রাণশক্তি আছে বলেই সমাজজীবনের নানা স্খলন ও বিচ্যুতি সত্ত্বেও সে-সব জয় করে মানুষ এগিয়ে চলেছে, এ কথা যদি আমরা না ভুলি তবে এ-সব আলোচনায় ক্ষতি নেই। এই দৃষ্টিভঙ্গি মূলত ক্ষিতিমোহনেরও দৃষ্টিভঙ্গি, নানা প্রসঙ্গেই তার প্রমাণ মেলে। 'জাতিভেদ' গ্রন্থেও এ দেশের এই ভেদবুদ্ধিগত সংকীর্ণতায় সমাজজীবনের ভয়ানক ক্ষতির কথা তিনি প্রচুর আলোচনা করেছেন। আর যখন তিনি

মন্তব্য করেন জাতিভেদ ও তার কঠিন নিয়মকানুন থাকা সত্ত্বেও তা লঙ্ঘন করে ও তাকে উত্তীর্ণ হয়ে সমাজে বর্ণান্তরের রাস্তা সব কালেই খোলা থাকে—এই সচলতা সমাজের প্রাণশক্তির পরিচায়ক, তখনও ঠিক তাঁর নিজস্ব কণ্ঠস্বরটি শুনতে পাওয়া যায়।

জাতিভেদ সত্ত্বেও প্রাচীনকালে অনেকখানি ঔদার্য ছিল। এটা ঠিক যে ক্রমে ক্রমে উদার মতগুলি গোঁড়া মতের দ্বারা ঢাকা পড়ে গেছে, তবু স্থানে স্থানে যে-সব উদার মতবাদ রয়ে গেছে সেগুলি উদ্ধার করে পাঠকের লক্ষ্যগোচর করা ক্ষিতিমোহনের উদ্দেশ্য ছিল। তিনি নিঃসংশয় হতে পেরেছিলেন যে বৈদিক যুগে আধুনিক কালের জাতিভেদ ছিল না এবং উপনিষদেও একটি উদার সামাজিক ব্যবস্থার পরিচয় আছে। বৈদিক কাল থেকে মেগাস্থিনিসের সময় পর্যন্ত ভারতে অস্পৃশ্যতাদোষ যে ছিল না এ বিষয়েও তিনি নিশ্চিত ছিলেন। তা ছাড়া জাতিভেদ প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজে সবরকম কড়াকড়ি আরম্ভ হয়নি, সে-সব ক্রমে ক্রমে আমদানি হল।

জাতিভেদের মতো যে কুপ্রথা ক্রমশ সমাজশরীরে অনুপ্রবিষ্ট হল তার বিরুদ্ধে যুক্তির শাণিত অস্ত্র সব যুগেই নিক্ষিপ্ত হয়েছে। আপাত অশিক্ষিত আউল-বাউল ও মধ্যযুগীয় সন্তরা, দক্ষিণ ভারতীয় সাধক ও কবিরা, জৈন ও বৌদ্ধদের মতো বহু মানুষই যে এই প্রথাকে প্রবল আক্রমণ করেছেন তার ইঙ্গিতমাত্র দিয়ে ক্ষিতিমোহন সবচেয়ে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করেছেন বজ্রসূচীকোপনিষদ ও ভবিষ্যপুরাণের জাতিভেদবিরোধী মন্ত্রগুলি। জাতিভেদ সমর্থনে যাঁরা বেদ-উপনিষদ-পুরাণের মান্যতার দোহাই দেন, তাঁদের মুখের মতো জবাব দিতে এর চেয়ে ভালো আলোচনা কিছু হতে পারত না। এ কথাও তিনি স্মরণ করিয়ে দিতে ভোলেননি যে, পরবর্তীকালের আদর্শভ্রষ্ট ব্রাহ্মণ যতই সমালোচনার যোগ্য ও দোষী হোন, বরাবরই সমাজসংস্কারের জন্য জাতিভেদপ্রথার বিরুদ্ধে যাঁরা সরব ও সক্রিয় হয়েছেন তাঁদের সংখ্যাগরিষ্ঠই ব্রাহ্মণ। ক্ষিতিমোহন দেখিয়েছেন শাস্ত্র অনুসারে শ্ববৃত্তি বা চাকুরিয়া, যবনসেবী, কুশীদজীবী প্রমুখ ব্রাহ্মণ শূদ্রেরও অধম। অথচ আজকের দিনে সনাতনধর্মের প্রচারে যাঁরা অগ্রগণ্য, যাঁরা শাস্ত্রের দোহাই দেন, এ কথাটা তাঁরা মনে রাখেন না। এ-সব শাস্ত্রবাক্য প্রণিধান করে দেখলে হয়তো অনেকের ধর্মাভিমান একটু শান্ত ও সংযত হত। ক্ষিতিমোহনের মতে গুণকর্মবিভাগ অনুসারে যে কর্মভেদের কথা গীতায় আছে, ভারতে তার প্রতিষ্ঠা থাকলে উপকারই হত, সমাজে একটা সচলতা ও প্রাণস্পন্দন দেখা যেত। তার অভাবে সব বর্ণেরই নৈতিক আদর্শ ক্রমশ হীন হয়েছে। যে যেখানে জন্মাল সেখানেই তার চিরন্তন স্থিতি, এ চূড়ান্ত তামসিকতা। সম্ভবত এই কারণেই ক্ষিতিমোহন যখন এ কথা বলেন যে, উচ্চতর জাতির লোকেরা এখনও বর্ণাশ্রমব্যবস্থাকে ভালো বলেন, বা স্বামী দয়ানন্দ আধুনিক কালে গ্রহণযোগ্য চাতুর্বর্ণ্যবিধি নির্ধারণ করতে চেয়েছেন, এমনকী মহাত্মা গান্ধীও অস্পৃশ্যতাবিরোধী কিন্তু বর্ণবিভাগ বিরোধী নন, তখন ক্ষিতিমোহন এই-সব মানুষের যুক্তিনির্ভর দৃষ্টিভঙ্গিরই পরিচয় দিতে চান। এঁদের চিন্তার সঙ্গে তাঁর নিজের চিন্তার যে খানিকটা সাযুজ্য আছে তাও বোঝা যায়। তবে বাস্তব জীবনে

যে বর্ণবিশুদ্ধি সম্ভব নয় তাও তিনি স্বীকার করেছেন। প্রায়ই দেখা যায় যে, ভারতের প্রাচীন আর্যভূমি থেকে যে-সব প্রদেশ যত দূরে ততই সেখানে আর্যরক্ত ক্ষীণ এবং নানা জাতির মধ্যে রক্তসংমিশ্রণ বেশি। অথচ ধর্মের গোঁড়ামি ও সামাজিক মতের সংকীর্ণতা সেই সব প্রদেশে ততই বেশি। প্রাচীন সমাজে এক জাতি থেকে অন্য জাতি হওয়াটা সর্বদাই ঘটত। পরবর্তীকালের রক্ষণশীলতার সঙ্গে এও দেখা গেল যে, সমাজে অর্থ ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধির সঙ্গে নিম্নবর্ণের লোকেরা উচ্চবর্ণভুক্ত হওয়ার পথ করে নিতে পারেন। গুণগত উত্তরণের দৃষ্টান্ত নয় সেগুলি। তবে ক্ষিতিমোহন এ কথা বলেছেন যে, আরও পরবর্তীকালে এইভাবে উচ্চবর্ণভুক্ত হওয়ার পথে শিক্ষাদীক্ষাগত পরিবর্তনের প্রভাবও পড়ল।

ক্ষিতিমোহনের আলোচনায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে ক্রমে ক্রমে প্রাচীন আর্যদের উদার বিচারবুদ্ধি চারদিকের প্রভাবে কেমন করে সংকীর্ণ হয়ে এল। সমাজে নারী ও শূদ্রের স্থান ক্রমশ হেয় হয়ে গেল। ধীরে ধীরে তিনি বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন জাতিভেদের প্রসার ক্রমশ অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠল। এমনকী ব্রাহ্মণ্যধর্মবিরোধী ধর্মসম্প্রদায়ও নতুন জাতি হিসাবে বহু জাতির একধারে আসন নিল এবং এ দেশের মানুষ হয়ে মুসলমান বা খ্রিষ্টানরাও জাতিভেদ-বর্ণভেদের প্রভাব এড়াতে পারল না। এই কুসংস্কার এমনই জাতির মজ্জায় প্রবেশ করেছে যে এই কুপ্রথা রদ করার জন্য বলিষ্ঠ সংস্কারকের চেষ্টাও বার বার ব্যর্থ হয়ে যায়। অনেক সময় আবার খুব আধুনিক সংস্কারকও তাঁর উদারতা সত্ত্বেও এ ব্যাপারে সমাজমনকে জোরালো আঘাত করেন না।

সমাজপতিদের বিধিবিধানের মধ্যে যে পরস্পরবিরোধিতা ও অসংগতি আছে তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন ক্ষিতিমোহন। তাঁরা যে বংশগত জাতিভেদ রাখলেন তার শুদ্ধি সম্পূর্ণরূপে নারীর শুদ্ধতার উপর নির্ভরশীল। সেখানে তাঁরা নারীকে বলবেন পরম পরিশুদ্ধ, অথচ বেদ ও মন্ত্রাদি থেকে বঞ্চিত করার বেলায় ও তাদের স্বাধীনতাহরণ করার বেলায় তাঁরাই আবার বলবেন নারীর কামুকতা ব্যভিচার ও পুংশ্চলীত্বের তুলনা দেওয়া যায় না। গৌরীদান সমর্থনে তাঁদের যুক্তি হল না-হলে কন্যাদের ধর্ম থাকে না, নারী স্বভাবত অসংযত ও কামুক; আর বালবিধবার পুনর্বিবাহের প্রয়োজন অস্বীকারে তাঁদের যুক্তি হল নারীরা শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপিণী, কামপ্রবৃত্তির অতীত। কোনো যুক্তিতেই এমন বিচার মানা যায় না, ক্ষিতিমোহনও মানতে পারেননি। বরং তিনি দেখতে পেয়েছেন প্রাচীনকালে নারীর চারিত্রিক স্খলন ঘটলে শুদ্ধিকরণবিধি অনেক উদার ছিল। ধর্ষিতা হলে তো ছিলই, এবং প্রবলের জুলুম থেকে তাকে রক্ষা করতে না পেরে তাকেই অপরাধিনী করা নিরর্থক, বরং অপরাধ দুর্বল পুরুষেরই—এই সহজ বিচারবুদ্ধি হারায়নি।

এটা ক্ষিতিমোহন মেনেছেন যে, তখনকার দিনের সমাজনেতাদের কাছে সমস্যা বড়ো কঠিন ছিল। তেমনই পরবর্তীকালেও প্রাচীনপন্থী বিদ্বান বুদ্ধিমান মানুষের তৈরি অসংগত পরস্পরবিরোধী বিধানের নমুনাও অল্প নয়। অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগেও তাই। আবার বঙ্গদেশের কৌলীন্যের লজ্জাকর ইতিহাসেও যে সহিষ্ণুতার দৃষ্টান্তও মিলবে অনেক, সে

কথাটাও তাঁর নজর এড়িয়ে যায় না। ভক্তি ও জ্ঞানমার্গের প্রবক্তারা যে উদার সরল মনুষ্যোচিত বিচারবুদ্ধিতে মানুষের যথার্থ কৌলীন্য নির্ধারণ করতেন, সেই স্বচ্ছ দৃষ্টির গৌরবটুকু অল্প কথা পাঠককে ধরিয়ে দিতে ক্ষিতিমোহনের যে সবচেয়ে আনন্দ এটা সহজেই ধরা পড়ে।

এখনকার দিনে যে দেখা যায় চারিত্রিক স্খলন নারী-পুরুষ উভয়েরই যেখানে ঘটছে সেখানে পুরুষকে অব্যাহতি দিয়ে সমাজকর্তারা সব দোষ চাপিয়ে দেন নারীর উপর আর বাস্তব অসম্ভবতা সত্ত্বেও জাতিভেদের দ্বারা বংশগত একটি বিশুদ্ধ ধারা অর্থাৎ ethnic purity রক্ষিত হয় বলে একদল বিশেষ শিক্ষিত লোকও জাতিভেদকে সমর্থন করেন—এই-সব জায়গায় ক্ষিতিমোহনের বাধে। তাঁর মতে বাস্তব অবস্থাবিচারে নিষ্কলুষ জাতিগত বিশুদ্ধির আশা করাই মূঢ়তা। অনন্ত পরম্পরার মধ্য দিয়ে কুল ও জাতি চলেছে, জাতিগত নির্দোষতা আশা করাই অন্যায়, শ্লোক উদ্ধার করে তিনি দেখালেন এও শাস্ত্রেরই কথা। সুতরাং স্পষ্ট করেই নিজের সিদ্ধান্ত জানিয়েছেন ক্ষিতিমোহন—জাতিপরিকল্পনার কোনো অর্থই হয় না।

জাতিভেদের মূল আছে পরস্পরের বিদ্বেষবুদ্ধিতে এবং কোনো কোনো শ্রেণির সুবিধালাভে—দীর্ঘকালের বাস্তব অভিজ্ঞতায় এ কথা তিনি জানতেন। বাস্তব জ্ঞানের ভিত্তিতে এ মন্তব্যও তিনি করতে পেরেছেন যে জাতিভেদবিরোধী আন্দোলনে সবচেয়ে বড়ো বাধা আসবে নিম্নতম বর্ণের মানুষের কাছ থেকে, তাঁদের অনেকেই চাইবেন উচ্চবর্ণের সমান অধিকার পেতে, কিন্তু নিজেরা হীনতর বর্ণের সংস্পর্শ সহ্য করবেন না। এমনকী নাকি মুসলমানরাও জাতিভেদপ্রথার নড়চড় চান না। ভেদবুদ্ধির সংক্রমণ এমনই প্রবল।

অবশেষে এই ভেদবুদ্ধির ভয়ানক পরিণামের দিকে ক্ষিতিমোহন একে একে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি বলেন :

> এক। জাতিভেদপ্রথা সমাজে প্রতিষ্ঠা পাবার আগে বহিরাগতরা ভারতীয় সমাজের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতেন, উদাহরণ প্রচুর। এখনও কোনো কোনো প্রত্যন্ত দেশে এই প্রক্রিয়া চলছে এ-কথা মেনে নিয়েও বলা যায় এই আত্মীয়করণ প্রক্রিয়ার মধ্যে হিন্দুসমাজের সেই পূর্বশক্তি আর নেই। বরং নানা সামান্য কারণে মানুষকে সমাজ থেকে ক্রমাগত নির্বাসন দিয়ে আত্মহত্যার পথ প্রশস্ত করার দিকেই তার ঝোঁক। সারা ভারতেই এমন উদাহরণ প্রচুর যে সমাজের অবিচারে সেই-সব নির্বাসিত মানুষের দল শেষপর্যন্ত বাধ্য হয়ে ধর্মান্তর গ্রহণ করেছে। তার উপরে এ সমাজে জাতিভেদের কারণে ভিতরে প্রবেশের পথ রুদ্ধ, ফলে ক্রমাগতই হিন্দুসমাজ স্বজনকে হারিয়েছে, আপনজন পর এবং বিরুদ্ধ হয়েছে।
>
> দুই। আবার এমনও অনেক জাতি বহুকাল থেকে হিন্দুসমাজভুক্ত বলে স্বীকৃত হয়ে আসছে, শাস্ত্রে যাদের মূল খুঁজে পাওয়া যায় না। সমাজের এই বর্ণভেদগত দৃষ্টিভঙ্গির কারণে এইসব জাতির লোককে হিন্দুবিরোধিতায় প্ররোচিত করা সহজ হতে পারে।
>
> তিন। এক সময় উপনিবেশ স্থাপনের ফলে ভারতীয় সংস্কৃতির বিস্তার ঘটেছিল বিশেষ করে

পূর্বাঞ্চলের নানা দেশে এবং তার ফলে তারা কোনোদিন এ দেশে আঘাত করে নি। জাতিভেদের ফলে স্পর্শাস্পর্শ বিচার প্রবল হতে বিদেশযাত্রা পরিত্যক্ত হল। তার জন্য পৃথিবীর সঙ্গে আত্মীয়তা গেল, সকলের সঙ্গে পরিচয় অবলুপ্ত হল। তখনই ভারতেব উপর পশ্চিমের আঘাত এসে পড়েছে।

বোঝা যায় যে বাইরের আঘাত থেকে আত্মরক্ষাব জন্যই হয়তো গন্ডিটানা হয়েছিল, কিন্তু এর ফলেই সমাজ হয়েছে নির্জীব, শক্তিহীন।

চার। দেখা গেল বৃথা সম্মান পেয়ে পেয়ে ব্রাহ্মণরা ব্রাহ্মণত্বের আসল গুণগুলিব অধিকারভ্রষ্ট হয়ে পড়লেন, তামসিকতার কারণে তাঁদের পতন ঘটল। ব্রাহ্মণোচিত বৈশিষ্ট্য নেই বলে সমাজের উপর পূর্বপ্রভাবও তাঁদের নেই, এতে সমাজও নিম্নগামী হয়েছে। সে সমাজব্যবস্থা আর নেই বলে এখন আর বৃত্তিভেদ বজায় রাখাও সম্ভব নয়।

পাঁচ। জাতিভেদের দ্বারা দেশরক্ষার কাজে ক্ষতি হয়েছে। কারণ ক্ষত্রিয়েরা নষ্ট বা অসমর্থ হলে সমাজের অন্য বর্ণের মানুষের অসহায় বিপন্নতা গুরুতর হয়ে উঠত।

ছয়। লেখক দেখেছেন কোনো ভারতীয় বিদেশী বিবাহ করলে নিজের সমাজের ভয়ে স্ত্রীকে দেশে আনেন না, সন্তানদের ভিন্ন ধর্মের আশ্রয়ে পাঠান। এতে সমাজের শোচনীয় ক্ষয় ঘটে।

সাত। আমরা একালের হিন্দুধর্মবিশ্বাসী বিদেশীদের সমাজভুক্ত করতে পারি নি। এমন কি এই সমাজভুক্ত মেধাবী কৃতি যশস্বী অব্রাহ্মণ সন্তানদেরও কোনোদিন শ্রেষ্ঠবর্ণের সম্মান দিতে পারিনি, শাস্ত্রের যুক্তিতেই যে সম্মান তাঁদের পাওনা ছিল।

আট। নীচবৃত্তি ব্রাহ্মণও পূজ্য আর যে-মানুষ নিম্ন স্তরে পড়ে আছে, কোনো সাধনার জোরেই তার উঠবার পথ নেই। এই অবস্থায় ভারত মানবসাধনার ক্ষেত্রে যে উৎসাহ ও উদ্যোগ হারিয়েছে, সে ক্ষতি অপরিমেয়।

নয়। এর ফল চিত্তদৈন্য, সে-দৈন্য আজ দেশের ধনে জ্ঞানে শক্তিতে সামর্থ্যে সর্বত্র পরিলক্ষিত।

জাতিভেদজনিত সমস্যার দীর্ঘ আলোচনা করতে গিয়ে ক্ষিতিমোহনের মনে হয়েছিল সব দেশের মানুষের মধ্যেই উচ্চনীচ ভেদ ঘটাবার মনোবৃত্তি আছে কিন্তু সে-সব জায়গায় সব অনৈক্যপ্রতিষেধক মহাবস্তু হল ধর্ম, আর আমাদের এই ভেদের মূলেই ধর্ম, তাই প্রতিকার অসম্ভব হয়েছে।

হিন্দু সংস্কৃতির স্বরূপ

'হিন্দু সংস্কৃতির স্বরূপ' বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহের ৬৬ সংখ্যক বই, উপশিরনামা বিভাগ এ বইয়েরও আছে। প্রকাশ ভাদ্র ১৩৫৪, ইংরেজি ১৯৪৭ সাল। আগেই বলেছি এটি 'ভারতের সংস্কৃতি'-র পরিপূরক। আরও বলেছি ক্ষিতিমোহন লিখেছেন যে, তিনি রবীন্দ্রনাথের অনুপ্রেরণায় একটু একটু করে এই বিষয় নিয়ে অনেক দিন থেকেই কাজ করছিলেন। কাশীর মতো তীর্থস্থানে থাকার ফলে ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য দেখবার সুযোগ নিজে তিনি অনেকটাই পেয়েছিলেন শৈশব থেকে। তার মূল্য যে কতখানি রবীন্দ্রনাথের কথা শুনে সে সম্পর্কে তিনি সচেতন হয়ে ওঠেন।

> তখন হইতেই নানা তীর্থ পরিক্রমকালে ও নানা গ্রন্থ ও শাস্ত্র পড়িবার সময় এই দিকেও একটু দৃষ্টি রাখিলাম। দেখিলাম ভারতের সংস্কৃতিতে বৈচিত্র্যেরও অন্ত নাই অথচ তাহাতে ঐক্যও নষ্ট হয় নাই।[৪৮]

দীর্ঘকাল অন্যান্য জাতির সঙ্গে বাস করলেও এক-একটি জাতি আপন বিশিষ্ট পরিচয় রক্ষা করে তার ভাষায়, আচারব্যবহারে, বেশভূষায়, মুখের চেহারায়, পূজ্যাপূজ্য ও খাদ্যাখাদ্য বিচারে। খ্রিষ্টান ও বৌদ্ধ ধর্মেরও দেশভেদে ভিন্ন রূপ, এমনকী কঠোর শাস্ত্রশাসিত মুসলমান ধর্মও প্রদেশ ও ক্ষেত্রভেদে নানা বৈচিত্র্যের হাত এড়াতে পারেনি। ভারতে প্রচলিত হিন্দুধর্মেও প্রদেশগত ও মানবশ্রেণিগত বিশেষত্বের সীমা নেই। এই ধর্ম ও সংস্কৃতিতে সম্প্রদায়গত বিশেষত্ব লোপ করার চেষ্টা এখানে তো হয়ইনি, বরং দেশাচার কুলাচার সংরক্ষণের বিধান দেওয়া হয়েছে। ক্ষিতিমোহন দেখালেন কীভাবে দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে গিয়ে সম্পূর্ণ নতুন পরিবেশে আগন্তুক-সম্প্রদায় যুগপরম্পরায় তাদের স্বকীয় বৈশিষ্ট্যগুলি রক্ষা করেছে। বহু কৌতূহলজনক কাহিনি ও তথ্যের ভিত্তিতে হিন্দুধর্ম-সংস্কৃতির আঞ্চলিক বিচিত্র বৈশিষ্ট্য ও স্বকীয়তার প্রতি, আর তার পাশাপাশি এদের পারস্পরিক প্রভাবের প্রতি নতুন কালের গবেষকদের মনোযোগ আকর্ষণ করাই যে এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য ছিল, সে কথা তিনি নিজেই বলেছেন স্পষ্ট করে।

> ...যাঁহারা ধর্ম সমাজ ও সংস্কৃতির ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস আলোচনা করিতে চাহেন, ভারতীয় হিন্দুধর্মের মধ্যে তাঁহাদের কাজের চমৎকার ক্ষেত্র এখনো বিদ্যমান। এখনকার নূতন শিক্ষায় দীক্ষায় আবার এই-সব পুরাতন সংস্কার ও আচারবিচারগুলি মুছিয়া গেলে তখন কাজ তত সহজ থাকিবে না।[৪৯]

তাঁর অভিপ্রায় :

> ..যাহাতে ভালো করিয়া আলোচনার দ্বারা ধরা পড়ে কি করিয়া এক-একটি মত বা সংস্কৃতির ধারা কালে কালে স্থান হইতে স্থানান্তরে চলিয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে সংস্কৃতির ইতিহাসের অনেক গূঢ় রহস্য প্রকাশিত হইতে পারে।

এ কথা বলে আবার যোগ করলেন :

> এই-সব আচার বড়ো বড়ো পণ্ডিতদের মতামতে ততটা ধরা পড়ে না যত ধরা পড়ে প্রাকৃতজনের সংস্কার দেখিলে।[৫০]

এটা কথার কথা মাত্র নয়, এই সাংস্কৃতিক ঐক্য হিন্দুর সাধনার ধন। জীবনে ও মরণে সকল ক্রিয়াকর্মে ও অনুষ্ঠানে সেই অখণ্ড ঐক্যেরই সাধনা। একই আর্যসংস্কৃতি নানা কারণে কালে কালে নানা দেশে ছড়িয়ে পড়লে আচারব্যবহার-ধর্মাচরণের সাম্যের দ্বারা, বা কর্তব্য-সংশয় উপস্থিত হলে সমাধান পেতে কীভাবে একে একে বৈদিক যুগের উত্তর ভাগে সূত্রগ্রন্থগুলির, আরও বহুকাল পরে স্মৃতিগুলির, আরও পরে স্মৃতিগ্রন্থের ভিত্তিতে ধর্ম-নিবন্ধগুলির জন্ম হল। 'প্রাচীন ভারতে নারী' গ্রন্থে প্রসঙ্গক্রমে ক্ষিতিমোহন ভারী চমৎকার

আলোচনা করেছেন। যাই হোক, তাঁর মতে এই অখণ্ডতাই হিন্দু-সংস্কৃতির স্বরূপ। প্রাদেশিকতার সংকীর্ণতা এখানে নতুন আমদানি বস্তু। এজাতীয় সংকীর্ণতার বাইরে দাঁড়িয়ে স্বদেশের সংস্কৃতির চিন্ময় রূপটি সর্বসমক্ষে উপস্থিত করার তাগিদেই পরে লিখলেন 'চিন্ময় বঙ্গ'। রবীন্দ্রনাথ-গান্ধীজির আলোচনা থেকেই একসময় এই গ্রন্থ লেখার কথা ভেবেছিলেন। ভারতের স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে প্রকাশিত 'হিন্দুসংস্কৃতির স্বরূপ' গ্রন্থে এই ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন ক্ষিতিমোহন যে, যাওয়ার আগে প্রাদেশিকতার এই বিষ আমাদের দিয়ে গেল ইংরেজরা। 'আমরা যে ইহা সাদরে লইলাম ইহাই বিস্ময়কর।' গ্রন্থ-শেষে অমোঘ সত্য উচ্চারণ ছিল—যেখানে সংকীর্ণ রাজনীতিব আপাত লাভের লোভ দেশজননীকে পরশুরামের কুঠারের মতো প্রদেশে প্রদেশে টুকরো টুকরো ভাগ করে দেখতে চাইছে সেখানে তার অখণ্ড সত্য রূপ আচ্ছন্ন না হয়ে যায় না। যে কর্ম ও সাধনায় এই অখণ্ডতার রূপটির আন্তরিক উপলব্ধি সত্য ছিল, তা ছেড়ে মহাত্মাজির অহিংসা ও অভেদের স্লোগানমাত্র জপমন্ত্র করে ভারত তার অখণ্ডতা বজায় রাখতে পারবে না।

> ....সত্যকার অভেদ স্থাপন করিতে হইলে উপর নীচ দুই দিকেরই জাতিগত বাধা সরাইতে হইবে। 'বিপ্রলব্ধে'র মতো 'শূদ্রলব্ধ' হওয়াও দুর্গতি।[৫১]

প্রাচীন ভারতে নারী

এ বইয়ের কোনো ভূমিকা নেই। গ্রন্থাকারে ১৯৫০ সালে প্রকাশিত হলেও কেন আমাদের মনে হয়েছে এ গ্রন্থটির উপকরণ সংগ্রহের কাজ বেশ কয়েক বছর আগেই করেছিলেন ক্ষিতিমোহন সে কথা আগেই বলেছি। এ বইটির বিষয়বস্তু নিম্নরূপ :

প্রাচীন ভারতে নারী পুরুষের চেয়ে কোনো অংশে ন্যূন ছিলেন না, নারীদের উচ্চ সম্মান ছিল। স্বামী ও স্ত্রী উভয়ে যুক্ত না হলে সাধনা সম্পূর্ণ হত না, গার্হস্থ্য জীবনের যাগযজ্ঞক্রিয়াতে পত্নী স্বামীর অর্ধাঙ্গিনী ছিলেন। নারী ব্রহ্মচর্য ও উপনয়নের অধিকারিণী ছিলেন, বিদ্যালাভে তাঁর কোনো বাধা ছিল না। সাধনার ক্ষেত্রে তাঁর যথেষ্ট স্বাধীনতা ছিল, অনেক নারী ব্রহ্মবাদিনী রূপে স্বীকৃতি পেয়েছেন। বেদে নারীর অবরোধের উল্লেখ নেই, সমাজে তাঁরা সহজেই বিচরণ করতেন, যাগযজ্ঞে যোগ দিতেন। শাস্ত্রচর্চায়, মন্ত্র ও স্মৃতিগ্রন্থ রচনায়, নৃত্যগীতবাদ্যচর্চায়, কবিত্বশক্তির পরিচয়ে, শিক্ষকতায় পারংগমা বহু বিদুষী ও সাধিকা নারীর পরিচয় এই গ্রন্থের প্রথমেই আছে। বেদজ্ঞা নারীদের সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধ সাধিকারা, মধ্যযুগীয় সন্তনারীরা ও ক্ষিতিমোহনের নিজের দেখা কাশীর তপস্বিনীরাও উল্লিখিত হয়েছেন। নির্বাধ সুযোগলাভের ফলে নারীসম্পদ কীভাবে বিকশিত হয়েছিল তার একটু আভাস দেওয়ার তাগিদ স্বভাবতই লেখকের মনে ছিল। বীর নারী হিসাবেও ভারতের বহু নারী প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন এককালে, সে কথা একটুখানি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। সংসারেও বুদ্ধিমতী মনস্বিনী নারীর মর্যাদা সমাজে স্বীকৃত ছিল। বেদের যুগে নববধূ তার মহত্ত্ব ও দাক্ষিণ্যগুণে সম্রাজ্ঞী হওয়ার আশীর্বাদ নিয়ে পতিগৃহে আসতেন, সুমঙ্গালীরূপে

স্বাগতা হতেন। নারী ছিলেন 'নিষ্কল্মষা' অর্থাৎ নিষ্পাপা। যেখানে নারী পূজিতা সেখানে দেবতারা প্রসন্ন, নারীরা অপূজিতা হলে সব ক্রিয়াই অফলা, নারী প্রসন্না না থাকলে কুলও রক্ষা হয় না। সেকালে যুবতি বয়সে কন্যার বিবাহ হত, অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত ছিল, জাতিভেদপ্রথার কারণে নানারকম বিধিনিষেধ আরোপিত হওয়ার আগে পর্যন্ত বিবাহে বর-কন্যার নিজেদের পছন্দই গুরুত্ব পেত। এ-সব নিয়ে 'জাতিভেদ' গ্রন্থের বিস্তারিত আলোচনার পুনরুল্লেখ না করে এখানে প্রাচীন কালের ভারতীয় বিবাহ-অনুষ্ঠানবিধির কিছু বর্ণনা দিলেন। বিবাহের নানা রীতি এবং বিবাহবন্ধন ছেদনের শাস্ত্রীয় ও রাজবিধির বিবরণও স্থান পেল। ক্ষিতিমোহন বলেছেন বৈদিক সাহিত্য দেখলে মনে হয় বহুবিবাহপ্রথা থাকলেও একটি পত্নী নিয়েই সাধারণত সকলে ঘর করতেন, এবং এক নারীর বহু পতি থাকা আর্যেতর জাতির মধ্যে প্রচলিত থাকলেও আর্যদের মধ্যে তার চল ছিল না। তবে তা একেবারে ছিল না বলা চলে না। ছিল যে তার আলোচনা করলেন 'বিবাহবন্ধন' অধ্যায়ে।

সহমরণপ্রথা যা একসময় এ দেশে তীব্র সমস্যার সৃষ্টি করেছিল তার সম্পর্কে ক্ষিতিমোহনের বক্তব্য আর্যদের মধ্যে খুব প্রাচীন বৈদিক যুগে এ প্রথা ছিল না। রামকৃষ্ণ গোপাল ভান্ডারকরের মত উদ্ধৃত করে তিনি বললেন, এ দেশে আর্যদের মধ্যে এ প্রথা বিদেশি অনার্যদের কাছ থেকে এসেছে। আর বললেন, বেদের যে-সব মন্ত্র এই প্রথার প্রমাণরূপে ব্যবহৃত হয় তাদের অর্থ কিন্তু সতীদাহ সমর্থন করে না। বরং ঋগ্‌বেদে পতির মৃত্যুর পরে শোকাকুলা নারীকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনারই উপযোগী মন্ত্রের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। অথর্ববেদে স্বামীর মৃত্যুর পরে তাঁর অনুগমনের প্রসঙ্গ আছে। তবে কেউ কেউ স্বামীর অনুমৃতা হলেও অনেকে আবার তা হতেন না এবং পুনরায় বিবাহবিধি যে ছিল তার নিয়মকানুনগুলি শাস্ত্রীয় প্রমাণ সহ উল্লেখ করলেন। শুধু তাই নয়, প্রথম স্বামীকে ত্যাগ করে বা কেউ যদি অন্য কোনো কারণে স্বামী জীবিত থাকতেই বিধবার মতো হয়ে পড়েন তা হলেও পুনর্বিবাহের বিধান যে ছিল, তার আলোচনা করলেন। অনেক ক্ষেত্রে সমাজবিধায়ক কোনো ঋষি এ রীতি পছন্দ করেননি, কিন্তু প্রচলন ছিল।

অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিবাহ এবং পতি-পত্নীর পবিত্র সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা—এ একদিনে সাধিত হয়নি। বহু যুগের সংস্কৃতি ও সভ্যতার ক্রমবিকাশের মধ্যে দিয়ে সমাজে এ জিনিস প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অতি পুরাতন যুগ উচ্ছৃঙ্খল স্বেচ্ছাচারী ছিল। সব বর্ণের নারীরাই অনাবৃত অর্থাৎ স্বেচ্ছাবিহারিণী ছিলেন এবং সেটাই চিরকালের রীতি বা সনাতন ধর্ম বলে সকলে স্বীকার করে নিতেন। মহর্ষি উদ্দালকের পুত্র শ্বেতকেতু নিজস্ব ভালোমন্দ বিচারশক্তির প্রয়োগে সেই নিকৃষ্ট সনাতন ধর্মের স্থানে নতুন ধর্ম অর্থাৎ বিবাহপ্রথার প্রবর্তন করলেন। ক্রমশ সুব্যবস্থিত সংসারযাত্রার যুগ এল। তবে বহু শাস্ত্রীয় প্রমাণের ভিত্তিতে ক্ষিতিমোহন এই সিদ্ধান্তেও এসেছেন যে, বিবাহপ্রথা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরেও বহুকাল পরপুরুষসংগমে বাধা ছিল না স্ত্রীদের। পরে বহুকাল ধরে বহু মুনিঋষির বহু চেষ্টায় এ-সব প্রথা ক্রমশ সংযত হয়ে এল। নারীদের যৌনজীবন ইচ্ছামতো যাপনের প্রথা যে ক্রমে সংযত হয়ে এল, ক্ষিতিমোহনের মতে তাতে নারীর সম্মতি ছিল, তা না হলে শুধু বাইরে থেকে চাপানো

সামাজিক অনুশাসনে তা এত সহজে গ্রাহ্য হতে পারত না। নারী তার আপন মাতৃত্বের খাতিরে এবং অন্তরস্থিত কল্যাণ-আদর্শের তাগিদে ক্রমে ক্রমে আপনা হতেই স্বেচ্ছাচারিতার পথ থেকে সরে এলেন।

আর্যদের মধ্যে পিতাই পরিবারের কর্তা, দাম্পত্যসম্পর্কেও পতি প্রধান। দ্রাবিড়-সভ্যতায় নারীদের প্রাধান্যের যতটা পরিচয় মেলে আর্যসভ্যতায় তা নয়। তেমনই কন্যা তাঁদের কাছে স্নেহের কিন্তু পুত্রের মতো নয়। তখনকার দিনে সকলেই পুত্র কামনা করতেন। তবে কোনো কোনো শ্রেণির মধ্যে কন্যাহত্যার নিষ্ঠুর প্রবণতার জন্য ভারতের যে দুর্নাম, সে প্রবণতা খুব প্রাচীন নয় বলে ক্ষিতিমোহন ধারণা করেছেন। তিনি বরং দেখিয়েছেন জাতিভেদের যুগে স্ত্রীদের মধ্যে ব্যভিচার ঘটলে পাছে অজ্ঞাতসারে বর্ণসংকর ঘটে তাই অনেক সাবধানতা নেওয়া হতে লাগল, তবু তখনও শুধু সেই কারণে পত্নীত্যাগ করা চলত না। তার বহু পূর্ব থেকেই নৈতিক ব্যাপারে বেশি কড়াকড়ি করা যায়নি। গূঢ়োৎপন্ন সন্তান প্রভৃতির ব্যবস্থা ও অন্যান্য নানা ব্যাপার নিয়ে যে সমাজপ্রধানদের অনেক ভাবতে হত তা দেখিয়েছেন ক্ষিতিমোহন। বলেছেন ভ্রূণহত্যাও যে ছিল তা বোঝা যায় তার বিরুদ্ধে সর্বত্র উচ্চারিত বিধিবিধান থেকে। সাংসারিক অভাবে ও রক্ষাকর্তার অভাবে যেমন নারীর স্খলন ঘটত, তেমন ব্যভিচারও ছিল। সুরাপান প্রভৃতি দোষও যে নারীর ছিল না এমন নয়। নারীর বিশুদ্ধতা নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা আছে 'জাতিভেদ' গ্রন্থে, এই গ্রন্থেও এ প্রসঙ্গো আলোচনা কম করলেন না। নারীর ব্যভিচার বা স্খলনে বা অনিচ্ছাকৃত দূষণে বিশুদ্ধিকরণের যে-সব উদার বিধান সেকালে ছিল তার বিস্তৃত আলোচনা করতে গিয়ে ক্ষিতিমোহন জানিয়েছেন যে, সেকালে কেবল তিনটি পাপ করলে নারী পতিতা হতেন—পতিবধ, ভ্রূণহত্যা ও নিজের গর্ভপাত।

ক্ষিতিমোহন মনে করতেন ভারতে চিরদিনই নারীর প্রতি সর্বসাধারণের চিত্তে একটি শ্রদ্ধার ভাব চলে আসছে। মহাভারতের যুগে নারীর অধিকারের বিরুদ্ধে কিছু কথা শোনা গেলেও সামাজিক জীবনে তার অনেক অধিকারই দেখা যেত। পরেও কোনো ব্যবস্থাপক নারীদের সম্পর্কে বিরূপ কিছু বললেও সাধারণের মধ্যে নারীমাহাত্ম্যের গৌরব ক্ষুণ্ণ হয়নি। সমাজমুখ্য ঋষিরাও কোনো দোষে নারীকে ত্যাগ করা পছন্দ করতেন না, দণ্ডনীয়া হলেও কঠোর দৈহিক শাস্তি অসংগত এবং কোনো কারণেই তাদের প্রতি পরুষ ব্যবহার গর্হিত, এই কথাই তাঁরা বলেছেন। পরবর্তীকালে এমন যুগ এল যখন আসল নারীকে নির্বাসন দিয়ে তাদের সম্বন্ধে বড়ো বড়ো আদর্শ ও সম্মানের কথা বলে রামচন্দ্রের স্বর্ণসীতা বাঁদিকে রেখে যজ্ঞ করার মতো সমাজ চলতে লাগল, এই হল ক্ষিতিমোহনের সিদ্ধান্ত। মনুর যুগ থেকে নারীর অধিকার খণ্ডিত হল, আর ততই পুরুষের অধিকার বাড়তে লাগল। বিভিন্ন যুগে ভারতীয় নারীর অধিকার-অনধিকারের আলোচনায় তুলনামূলক বিচারের টানে অনেক সময়ই তিনি পুরুষের প্রসঙ্গা এনেছেন।

ব্যাপার এইরকম দাঁড়াল যে, দ্রাবিড়-কন্যাদের যে-সব অধিকার পূর্বকালে ছিল আর্য-প্রাধান্যে ক্রমশ তা তাঁরা হারালেন, পূর্বমাহাত্ম্য থেকে ভ্রষ্ট হলেন। আবার আর্যেতর একটি

উচ্চাঙ্গ সংস্কৃতিধারায় যে বৈরাগ্য, নিষ্কাম কর্ম, সন্ন্যাস, কামনাজয় প্রভৃতির সাধনা ছিল, প্রতিরোধ করতে চাইলেও আর্যসংস্কৃতিকে তা ক্রমে প্রভাবিত করল। চতুরাশ্রমবিধি প্রণয়ন করে সামঞ্জস্য করবার চেষ্টা হয়েছিল। তবে শেষে দেখা গেল পুরুষরা চতুরাশ্রমের সব ছেড়ে কেবল গৃহস্থাশ্রমে আরামে রইলেন, যতিব্রত কেবল বিধবা নারীদেরই পালনীয় হল। উচ্চবর্ণীয় নারীরা বৈধব্যে ব্রহ্মচারিণী হলেন, সমাজের সমস্ত সুখ ও আনন্দ থেকে তাঁরা বঞ্চিতা, পুনর্বিবাহের প্রশ্নই আর রইল না। অনেক ব্রত যা যতিব্রতী-বিধবার পালনীয় ছিল, তা কেবল তাঁদেরই পালনীয় হয়ে রইল। তাঁদের দৃষ্টান্তে নিম্নতর বর্ণের বিধবা নারীরাও পুনর্বিবাহ প্রভৃতি প্রচলিত রীতি ছাড়লেন, কৃচ্ছ্র সাধনের নানা দায়ভাগ আগে যা তাঁদের ছিল না তাও আরোপিত হল। উত্তর ভারতের তুলনায় পূর্ব ও দক্ষিণ ভারতে যে বৈধব্য-কৃচ্ছ্র প্রভৃতির প্রকোপ বেশি সে কথা মনে রেখেও ক্ষিতিমোহন আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন যে, এই সমাজক্ষয়কর প্রথার দাপটে ক্রমশ হিন্দুধর্ম লুপ্ত হয়ে যেতে পারে। তিনি বলেছেন, সতীদাহ বন্ধ করতে যেমন বহু হাঙ্গামা করতে হয়েছিল, পুড়ে মরবার ভয়ে নারীরা হিন্দুধর্ম ছেড়ে মুসলমানধর্মের আশ্রয় নিতেন, তেমনই এই বৈধব্যপ্রথার বাড়াবাড়িতেও সমাজে নানা অনাচার ঢুকে সমাজক্ষয় ঘটাচ্ছে। ক্ষিতিমোহনের আশঙ্কার উত্তরে এ কথা বলতে পারি যে, গত পঁচিশ-তিরিশ বছরে বিধবাদের কৃচ্ছ্র সাধন ও ব্রহ্মচর্যপালনবিধানের জোর অনেকটা শিথিল হয়েছে, ক্ষিতিমোহন তা দেখে যাননি। তবে পূর্ব এবং দক্ষিণ ভারতে শোনা না গেলেও, এবং উত্তর ভারতেও না ঘটলেও, পশ্চিম ভারতে অতি সাম্প্রতিক কালে একটা 'রূপ কানোয়ার'-ও যে ঘটতে পারল এবং তার প্রতিক্রিয়াজাত সতীমায়ের থানের ব্যাবসা যে আজও জমজমাট শোনা যায় তাতে বুঝতে পারি বহু বিকারের প্রাবল্যে এই দেশের বহু প্রাচীন ধর্ম-সংস্কৃতির প্রকৃত রূপটি লুপ্ত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা অনেককাল ধরেই খুব প্রবল।

এ-সব ছাড়া ক্ষিতিমোহনের এই গ্রন্থে স্ত্রীধন ও নারীর উত্তরাধিকার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে। সবশেষে আছে দক্ষিণ ভারতীয় নিবন্ধকার বরদরাজের ব্যবহারনির্ণয় থেকে নারীর অধিকার ও তার উত্তরাধিকারের আলোচনা। ব্যবহারনির্ণয় গ্রন্থের সহজ অসংদিগ্ধ ভাষায় সোজাসুজি মত ও সিদ্ধান্ত প্রকাশরীতি ক্ষিতিমোহনের খুব মনের মতো, প্রগাঢ় পণ্ডিত গ্রন্থপ্রণেতা বরদরাজের যুক্তি ও বিচার খুব গভীর ও স্বাধীন, বিদ্যা ফলাবার চেষ্টামাত্র তাঁর নেই, এ জন্য তাঁর লেখা তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল।

বেদোত্তর সঙ্গীত

এইসঙ্গে ক্ষিতিমোহনের ভারতবিদ্যা-বিষয়ক আর-একখানি গ্রন্থের নাম করতে হয়, যেটি তাঁর মৃত্যুর বহু পরে ১৯৮৪ সালে প্রকাশিত হয়েছিল—'বেদোত্তর সঙ্গীত'। প্রকাশক জানিয়েছেন লেখক গ্রন্থের কাজ সম্পূর্ণ করে গিয়েছিলেন। বইয়ের প্রথমেই লেখকের যে ভূমিকা আছে তার তারিখ ১৬ অগ্রহায়ণ ১৩৫৩ (১৯৪৬)। ফাল্গুন ১৩৫৩-তে 'জাতিভেদ'

প্রকাশিত হয়, দেখা যাচ্ছে 'বেদোত্তর সঙ্গীত'-এর ভূমিকা তারও আগে লিখেছিলেন তিনি। আবার সমস্যায় পড়ি যখন দেখি ক্ষিতিমোহন এই বইয়ের এক জায়গায় লিখেছেন :

> বাউলদের কথা এই প্রসঙ্গে বলিবার মত অবকাশ নাই। ইতিমধ্যে বই লিখিয়াছি কিন্তু তাহাতেও আমার মন মানিতেছে না।[৫২]

মন না মানলেও বাউলগানের বিস্তৃত আলোচনা এ বইতে নেই। কিন্তু যে কথা বলছিলাম, তাঁর 'বাংলার বাউল' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯৫৪ সালে, সেটি তাঁর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লীলা বক্তৃতা ১৯৪৯ সালের। হয়তো তিনি এর পরেও 'বেদোত্তর সঙ্গীত'-এর কাজ করেছিলেন, উপরোক্ত মন্তব্য থেকে সে কথাই মনে হয়। অথচ ভূমিকা লিখেছেন ১৯৪৬ সালে! এ বইয়ের কিছুটা উপকরণ যে তিনি 'ভারতের সংস্কৃতি' প্রভৃতি গ্রন্থগুলির জন্য উপকরণসংগ্রহের সঙ্গে সঙ্গেই করেছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। কেন এ বই লিখলেন তার কৈফিয়ৎ বিস্তারিতভাবেই দিয়েছেন গ্রন্থভূমিকায়। ভক্ত ও সাধকদের কথা বলতে গিয়ে গানের সংস্পর্শে তাঁকে আসতে হয়েছে, জীবনে অজস্র ভালো গান শুনেছেন। ভক্তবাণীর সঙ্গে তার সব সুর সংগ্রহ করে আনতে পারেননি নিজের অক্ষমতায়, সে আক্ষেপ কম নয়। কিন্তু এ কথা তাঁর মনে হত যে, ভারতীয় ভক্তিধারার সঙ্গে পরিচিত হতে হলে সংগীতধারার সঙ্গে পরিচিত হওয়া দরকার। যেখানে ভক্তিধারা চলে সেখানে গান থাকবেই। সেজন্য প্রাচীন প্রথাগত আশ্রমে তো বটেই, এমনকী একালের রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজি ও শ্রীঅরবিন্দের আধুনিক সাধনাশ্রমেও গান অপরিহার্য। এ কাজ যোগ্য লোকে করলেই ভালো হত জেনেও তিনি এ দায়িত্ব স্বয়ং গ্রহণ করেছিলেন, তার পিছনে একটা আন্তরিক তাগিদ কাজ করেছে বোঝা যায়, ভাবভক্তি ও গানের সংগতি দেখানোই তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। আর তাঁর মনে হচ্ছিল :

> ইহাতে যে-সব ত্রুটি আছে তাহাতেই আহত হইয়া যথার্থ গুণী যদি এই কাজে যোগ্যতর উদ্যম প্রয়োগ করেন, তবেই আমার এই অনধিকারচর্চা ধন্য হইবে। তাঁহারা আমাকে তিরস্কার করিলেও তাহা আমার পক্ষে পুরস্কার হইবে।[৫৩]

নিজেকে অনধিকারী মনে করা সত্ত্বেও ভারতীয় সংগীত ও তদীয় সংগীতশাস্ত্র সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান যথেষ্ট গভীর ছিল এবং এই গ্রন্থরচনার জন্য তিনি যে বেশ পরিশ্রম করেছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। অন্তত সাধারণ পাঠকের পক্ষে এ কথা মেনে নেওয়া কঠিন যে সংগীতের তাত্ত্বিক আলোচনা ক্ষিতিমোহনের অধিকারের একেবারেই বাইরে। প্রসঙ্গত তাঁর সমসাময়িক কালের সংগীতকলাকারদের যে অল্পবিস্তর উল্লেখ করেছেন তা থেকে বোঝা যায় ভারতীয় মার্গসংগীত ও সংগীতশিল্পীদের সম্পর্কে তিনি যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। কাশীতে ও অন্যত্র ভক্তকণ্ঠে গান শোনা ছাড়াও উচ্চাঙ্গসংগীত আসরেও যে তিনি উপস্থিত থাকতেন কখনও কখনও, গ্রন্থে তার উল্লেখ করেছেন। ক্ষিতিমোহন যখন প্রসঙ্গত বলেন, 'সঙ্গমেশ্বর শাস্ত্রী কিছুদিন শান্তিনিকেতনে ছিলেন। তাঁহার বীণাতে যেন অন্তরাত্মা কথা

`বলিত'[৫৪] তখন বেশ অনুভব করা যায় অধিকারের ভূমি থেকেই তিনি কথা বলছেন, অনধিকারের দ্বিধা তাঁর মধ্যে কিছুমাত্র নেই।

'বেদোত্তর সঙ্গীত' প্রকাশিত হলে আনন্দবাজার পত্রিকায় তার একটি সমালোচনা লিখেছিলেন খ্যাতনামা সংগীতশাস্ত্রবিদ রাজ্যেশ্বর মিত্র।* বইটিকে তিনি সুখপাঠ্য ও তথ্যসমৃদ্ধ বলেছেন, বলেছেন :

> একসঙ্গে এতগুলি সংস্কৃত পারসী ও অন্যভাষায় রচিত গ্রন্থ ও নিবন্ধের উল্লেখ একত্রে পাওয়া কঠিন। ক্ষিতিমোহন বহু পূর্বে এই কাজটি করে আমাদের কৃতজ্ঞতা অর্জন করেছেন।[৫৫]

তবে বলা চলে, এই সমালোচনা-নিবন্ধের বাকিটুকুতে এই বইয়ের কয়েকটি তথ্য ও কয়েকটি শব্দার্থ নিয়ে লেখকের মতের সঙ্গে সমালোচকের মতের যে পার্থক্য আছে, সেই পার্থক্যগুলির আলোচনাই শুধু প্রাধান্য পেয়েছে। বইটি 'হয়তো বিশেষজ্ঞের পরিকল্পনা নিয়ে রচিত হয় নি', সমালোচকের এই কথার সমর্থন লেখকের গ্রন্থ-ভূমিকাতেও মেলে। কিন্তু এ কথা আমাদের মনে হয়েছে যে, বইটিতে যে বৈদিক যুগ থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত ভারতীয় সংগীতের ধারাবাহিক বিকাশের ইতিহাসকে ধরবার চেষ্টা আছে, সেটা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। লেখকের তথ্যঅন্বেষণক্ষমতা ও তার প্রতি তাঁর আকর্ষণ এবং বিপুল বস্তুস্তূপের মধ্যেও কিছুমাত্র খেই না হারিয়ে স্বচ্ছন্দে এগিয়ে যাওয়া ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ, এ-সব বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে আমরা সুপরিচিত। এখানেও নিজস্ব ধারাতেই তিনি এগিয়েছেন। তবে বিষয়বস্তু এত বড়ো যে তার আলোচনা যথেষ্ট বিস্তারিতভাবে করতে হলে আরও অনেক দীর্ঘকালব্যাপী পরিশ্রমে লেখককে বিস্তৃততর গ্রন্থ রচনা করতে হত। অন্য গবেষণাকর্মের অবিরত চাপে সম্ভবত তার সুযোগ পাওয়া যায়নি। এ গ্রন্থের তথ্যসমাবেশ যথেষ্ট সুসংবদ্ধ নয় বলেও পাঠকের অতৃপ্তি থেকে যায়। পড়তে গিয়ে মনে হয় এ বই যেন তাঁর উদ্দিষ্ট বইয়ের প্রথমাংশের প্রাথমিক খসড়া মাত্র। কেননা তিনি ভূমিকায় বলেছিলেন যে এ দেশের ভক্তি আন্দোলনের সঙ্গে সংগীতধারাব সংগতি দেখানোই তাঁর এই গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য, কিন্তু ঠিক সে উদ্দেশ্যসাধনের কথা স্মরণে রেখে এ বইয়ের বিষয়বস্তুর বিন্যাস, বিশ্লেষণ ও পরিণামচিন্তা করা হয়নি।

তবে প্রসঙ্গটা যে নেই তা নয়। ভারতের নানা ধারার ভক্তিসাধনায় এক অপরিহার্য উপকরণ গান এবং হৃদয়ের আবেগ প্রকাশ করার অনিঃশেষ ব্যাকুলতায় সাধক-ভক্তরা যে ভক্তিসংগীত রচনা করেছেন, তা প্রচলিত রীতি মেনে চলেনি। প্রচলিত রাগরাগিণী ভেঙে ও মিশ্রিত করে তাঁরা নতুন নতুন সুর রচনা করেছেন, তালের ক্ষেত্রেও প্রথাবদ্ধ পথ ধরে চলেননি। মধ্যযুগীয় সুফি, সন্ত, আউল-বাউল, কীর্তনীয়া থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত এই অভিনব সুরস্রষ্টাদের পরিচয় ক্ষিতিমোহন দিয়েছেন। আর যেখানে নিয়মমানা বাঁধাপথের বাইরে স্বকীয় চিন্তা ও সৃজনের প্রবণতা, যেখানে বিচিত্র উপকরণের সার্থক মিশ্রণ, যেখানে

* কাগজের কাটিংটা আমার কাছে আছে, তার তারিখ লিখে রাখতে ভুলে গেছি। সেজন্য দুঃখিত।
—প্র মু

সমন্বয়ধর্মিতা, ক্ষিতিমোহন সেখানেই প্রাণের প্রকাশ দেখেন, সংগীত আলোচনার ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। কিন্তু যে সুবিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে এই ভাবভক্তি ও ভারতীয় সংগীতসাধনার সমন্বয় প্রসঙ্গে আলোচনাব প্রয়োজন ছিল তার যথাযথ আয়োজন কবা হয়নি তাঁর এই গ্রন্থের পরিসরে।

'য়ুরোপীয়দের আগমন' অধ্যায়ের 'রবীন্দ্রনাথ' অংশে এবং 'রূপান্তরিত বাংলা গান' অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে যে আলোচনা আছে, সংক্ষিপ্ত হলেও সে আলোচনা যথেষ্ট আধুনিক ও মৌলিক বলে বিবেচিত হতে পারত যদি এই বই যথাসময়ে প্রকাশিত হত। ইন্দিরা দেবীর 'রবীন্দ্রসঙ্গীতের ত্রিবেণীসঙ্গম' প্রকাশিত হয় ১৫ পৌষ ১৩৬১ (জানুয়ারি ১৯৫৫), তিনি এর প্রবন্ধ অংশ শান্তিনিকেতনে পড়ে শোনান ১৪ আগস্ট ১৯৪৭। সেখানে হিন্দি ভাঙা গানের তালিকা তুলনায় অনেক দীর্ঘ, তবে 'বেদোত্তর সঙ্গীত'-এর ১৮২ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত 'পুষ্প ফুটে কোন্ কুঞ্জবনে' গানটি ইন্দিরা দেবীর তালিকায় নেই। 'গাও মায়ী সো হে দেতা / নন্দ মহারাজ ঘব ত্যাজ'—এই মূল গানটির উল্লেখ করেছেন ক্ষিতিমোহন। এই গান ভেঙে রবীন্দ্রনাথ 'পুষ্প ফুটে কোন্ কুঞ্জবনে' গানটি সৃষ্টি করেছিলেন। সরাসরি পাণ্ডুলিপি থেকে রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি হিন্দি ভাঙা গান উদ্ধৃত করেছেন ক্ষিতিমোহন, রবীন্দ্রনাথ-ব্যবহৃত মূল গানগুলি সম্পূর্ণ দিয়েছেন, সেগুলির রাগ তাল ও যে শাস্ত্রীয় সংগীতগ্রন্থে সে-সব গান মুদ্রিত হয়েছে তারও উল্লেখ করেছেন এবং তার পাঠের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ মূলের যে বাণী নিয়েছেন তাও মিলিয়ে দেখেছেন। শুধু সুর নয়, যে গানগুলির ভাব রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করেছেন, যেখানে কোনো কোনো ক্ষেত্রে মূলের বাণীও প্রায় অপরিবর্তিত আছে, এই গ্রন্থে তার কয়েকটি উদাহরণ ক্ষিতিমোহন দিয়েছেন। নিজেই বলেছেন :

> প্রবন্ধে সন্নিবিষ্ট সঙ্গীতের অনেক পদ এই প্রথম প্রকাশিত হইল। আলোচ্য সব গানেই রচয়িতার আবেগ সেইসঙ্গে দ্বিধা সবই পাওয়া যাইবে। পাণ্ডুলিপিপত্রেই অনেক পরিবর্তন পাঠকের চোখে পড়িবে। রবীন্দ্রনাথের গ্রহণ-বর্জন-সৃজন পরেও সম্পাদিত হইয়াছে।[৫৬]

দুঃখের বিষয় গ্রন্থমধ্যে একটিও পাণ্ডুলিপি-চিত্র ছাপা হয়নি। এমনকী ক্ষিতিমোহন যেখানে স্পষ্টতই ১৮৯ পৃষ্ঠায় বলেছেন : 'অমৃতের সাগরে আমি যাব রে' এই গানের পাণ্ডুলিপি-চিত্র এইসঙ্গে ছাপানো হইল' সেখানেও লেখকের উক্তি অনুসরণে পাণ্ডুলিপি-চিত্র মুদ্রিত হয়নি এবং না-ছাপানোর কারণ জানানোরও প্রয়োজন প্রকাশক বোধ করেননি।

বাংলার সাধনা ও চিন্ময় বঙ্গ

বঙ্গদেশের সাধনা-সংস্কৃতি নিয়ে ক্ষিতিমোহনের তিনখানি বই আছে, তার প্রথমখানি 'বাংলার সাধনা' ও শেষটি 'চিন্ময় বঙ্গ'। 'বাংলার সাধনা'-র 'নিবেদন' বেশ বড়ো। একদিন রবীন্দ্রনাথ ও ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের মধ্যে কথাবার্তা হচ্ছিল, ক্ষিতিমোহনও উপস্থিত ছিলেন

এবং তাঁদের কথায় যোগ দিয়েছিলেন। হয়তো সেটা ১৯২১ সালের ঘটনা হতে পারে, যখন ব্রজেন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠাদিবসের সভায় সভাপতিত্ব করেন। বোঝা যায় ক্ষিতিমোহন তাঁর দিনলিপি থেকে এই দীর্ঘ আলোচনা উদ্ধৃত করেছেন। কথায় কথায় ভারতবর্ষের বৈশিষ্ট্য তার বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য— এই কথাটা এসে পড়েছিল, তা থেকে বাংলা দেশের বৈশিষ্ট্যের কথা উঠল। রবীন্দ্রনাথ বললেন :

> নদীর পলিমাটিতে তৈরি এই বাংলাদেশ। এখানে ভূমি উর্বর। বীজমাত্রই এখানে সজীব সফল হয়ে ওঠে। তাই এখানে প্রাণধর্মের একটি বিশেষ দাবি আছে। পলিমাটির দেশ বলেই এখানকাব ভূমি কঠিন নয়। তাই পুরাতন মন্দির প্রাসাদ প্রভৃতির গুরুভার এখানে সয় না। সেইসব গুরুভার এখানে ধীরে ধীরে তলিয়ে যায়। বাংলাদেশে তাই তীর্থ প্রভৃতি বেশি নেই। পুরাতনের ঐশ্বর্য তার খুবই কম। তাকে দুর্ভাগ্য বলব কি সৌভাগ্য বলব?

রবীন্দ্রনাথের আলোচনায় যে-সব বিশেষত্বের কথা জানা গেল সেগুলির দ্বারা বাংলা দেশের দুর্ভাগ্য নয় সৌভাগ্যের লক্ষণই সূচিত হয়। এ দেশ বরাবরই উদার ও মুক্তদৃষ্টি। 'প্রাণের নামে মানবতার নামে দাবি করলে এখানে সাড়া মিলবে।' উত্তরের আর্য ও দক্ষিণের দ্রাবিড় সংস্কৃতি মিলিত হয়েছে এই বাংলার সাধনক্ষেত্রে। তার সঞ্চয়নপ্রতিভা গ্রহণীয়কে গ্রহণ করে ত্যজ্যকে পরিত্যাগ করেছে, কাব্যসংকলনে তার বিশিষ্টতার নিদর্শন। নানা উপকরণে সে তার শিল্পকলাকে জীবন্ত করে তুলেছে। সংস্কৃত রচনায় তার শব্দ ও অলংকারের বাহুল্য, প্রাকৃত সাহিত্য, গান—বিশেষত কীর্তন ও বাউলগান—বাংলার পরিচয় বহন করে। উপকরণ-বাহুল্য তার কোনো সৃষ্টিতেই নেই, শিল্পের ব্যঞ্জনাটুকুতেই সে প্রাধান্য দিয়েছে। তার দরদি হাতের স্পর্শে সে মসলিনের সূক্ষ্মতা সৃষ্টি করেছে, সন্দেশ নামক মিষ্টান্ন তৈরি করেছে, পাকশালায় নানা শাকসবজির মিশ্রব্যঞ্জনের স্বাদ সৃষ্টি করেছে। গৌড় নামক এই দেশটার সঙ্গে নাকি গুড়ের যোগ আছে, আর মাধুর্যের সঙ্গে এ দেশের চিরকালের যোগ। 'নীরস শুষ্ক পথ এ দেশের নয়।' নদীমাতৃক এই দেশের মানুষের চলার পথও সরস জীবন্ত জলধারা। তীর্থের ভার এখানে নেই এই প্রসঙ্গ ধরে আবার এ কথাটাও এল যে বাংলা দেশ দেবভূমি নয়, 'এ দেশ মানবের দেশ। বাঙালী মানুষকেই জানে। দেবতাকেও সে ঘরের মানুষ করে নিয়েছে।' মানবতাধর্মই আমাদের ধর্ম। এমনই সব নানা আলোচনা চলতে চলতে রবীন্দ্রনাথ ক্ষিতিমোহনের উপরই দায়িত্ব দিলেন বঙ্গাদেশের বিশেষত্বগুলি প্রকাশ করার। তার পরে ক্ষিতিমোহন এ দেশের নানা সাধনার সন্ধান ও সংগ্রহ করতে লাগলেন :

> কিছু কাজও হল। বই লেখা হল। বইখানা ছোট হল না। কিন্তু বাজারে নেই কাগজ, ছাপাও দুঃসাধ্য। ইতিমধ্যে দিল্লীতে প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলন হবার কথা হল। সেখানকার পরিচালকেরা আমাকে দর্শন শাখার কাজে ডাকলেন।[৫৭]

১৯৪৪ সালের মার্চ মাসে ক্ষিতিমোহন এই ভাষণ দিলেন, পরের বছর 'বাংলার সাধনা' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হল। বঙ্গাদেশের সাধনার বিশিষ্টতা সম্পর্কে গভীর গবেষণাজাত মননশীল আলোচনা তাতে স্থান পেল। তবে ভূমিকায় তিনি তাঁদের তিনজনের আলোচনার

যে সারাৎসার উদ্ধৃত করেছেন, যা থেকে অল্পবিস্তর আমরা উল্লেখ করেছি, তাঁর লেখায় বঙ্গাদেশের সাধনার বৈশিষ্ট্যগুলি দেখাবার সময় তিনি ঠিক তার অনুগমন করে চলেছেন যে তা নয়। তাতে আলোচনায় অনেক প্রসঙ্গের বিস্তারিত বিশ্লেষণ স্থান পায়নি, আবার এমন বহু বিষয়ের আলোচনা এসেছে, যা তাঁদের আলোচনায় আসেনি। 'বাংলার সাধনা'-য় যা আছে তার অনেকটা পরিপূরণ হয়েছে 'হিন্দুসংস্কৃতির স্বরূপ' ও 'চিন্ময়বঙ্গ'-এ।

'চিন্ময় বঙ্গ' ক্ষিতিমোহনের জীবিতকালে প্রকাশিত সবশেষ গ্রন্থ, প্রকাশকাল ১৯৫৭। আগেই আমরা দেখেছি, তিনি এ গ্রন্থ রচনার প্রেরণাও লাভ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথের কাছে। আমেদাবাদে গান্ধীজির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘ আলোচনা হয়েছিল বাংলা দেশ নিয়ে :

> আলোচনায় এই কথাই স্বীকৃত হয় যে, কোনো জাতি বা গোষ্ঠী যদি নিজের সংস্কৃতিগত ঐতিহ্য বা চিন্তাধারা হারাইয়া ফেলেন তাহা হইলেই এক দল অপর দলকে হেয় প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টিত হয়। ফাঁকা বুলির সাহায্যে জাতিগত বা সমাজগত বাহবা লইয়া থাকেন। ইহাই বর্তমান ভারতের প্রাদেশিকতার রূপ লইয়াছে। সাবরমতী আশ্রমে এবং পরে সাহিবাগে গুরুদেবের সঙ্গে মহাত্মার আলোচনার সময়ে এই ধরনের লেখার কথা আমার মনে আসে।[৫৮]

সুতরাং এই গ্রন্থে ক্ষিতিমোহনের অনুসন্ধানের বিষয় বঙ্গাদেশের আত্মপ্রসারণপরায়ণ সত্তা। লেখার শুরুতেই তিনি বলেছেন :

> প্রদীপ যেমন মৃৎপাত্রে যতদিন সীমাবদ্ধ ততদিন সে সুখেই থাকে। যেই মুহূর্তে সে আলোক পরিবেশনের দ্বারা আপনাকে বহুদূরে ব্যাপ্ত করিতে চায় তখন হইতে তাহাকে আপন সকল সঞ্চয় ক্ষয় করিয়া পলে পলে জ্বলিয়া মরিতে হয়। অথচ এই ব্যাপ্তি ছাড়া তাহার সার্থকতাই নাই।[৫৯]

আপন কায়াগত ক্ষুদ্র বা মৃন্ময় সীমাকে অতিক্রম করে মানুষ যখন তার চিন্ময় কায়াকে কর্ম জ্ঞান ও প্রেমের দ্বারা বহু দূর বিস্তৃত করে দেয়, তখনই তার সার্থকতা। 'মানুষেরই এই আত্মবিস্তৃতির অধিকার, পশুর ইহাতে অধিকার নাই।' ব্যক্তির মতো জাতিরও আপনার সীমার বাইরে না গেলে চলে না। 'জাতীয় জ্ঞান ও সংস্কৃতি যদি আপন সংকীর্ণ সীমার মধ্যে বদ্ধ থাকে তবে তাহা অমেধ্য।' অর্থাৎ অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্বের মতো যজ্ঞীয় সে নয়। একদিন যখন ভারতের জাহাজ সব দিকে বাণিজ্যে যেত তখন তার শক্তি ও সম্পদের অন্ত ছিল না। সেই সমুদ্রযাত্রা বন্ধ হওয়ার অনতিকালের মধ্যে সে বাইরের শক্তির দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে, বন্ধু-দেশগুলির সঙ্গে সম্পর্ক বিনষ্ট হয়েছে। যুগে যুগে বঙ্গাদেশও নিজেকে প্রসারিত করে দিয়েছিল। সে তীর্থযাত্রায় গেছে, জ্ঞান ও ধর্মপ্রচারে বিদেশযাত্রা করেছে, নিজ দেশসীমা পার হয়ে দেশজয়ের জন্য গেছে, গেছে বাণিজ্যবিস্তারে। এই তিন যাত্রা যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য যাত্রা। আর ব্রিটিশ রাজত্বে যখন বাঙালি কেরানিরা দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়েছে, ক্ষিতিমোহনের মতে তা হল শূদ্রযাত্রা। এ ছাড়া এখনকার কালে যুদ্ধের নামে যে পৈশাচিকতা, তার জন্য চেষ্টাকে ক্ষিতিমোহন বলেন রাক্ষসযাত্রা। যাই হোক, সেকালে উল্লিখিত প্রথম তিন যাত্রায় যখনই মানুষ গেছে, তখনই সে আত্মপ্রসারণের

পথে অগ্রসর হয়েছে, এই যাত্রার সুযোগে পরিব্যপ্ত হয়েছে তার নিজের জ্ঞান ধর্মসাধনা ও সংস্কৃতির বিচিত্র দিকের প্রসারণক্ষেত্র। এইজাতীয় প্রসারণসাধনায় বঙ্গদেশ একসময় বিশেষ যোগ্যতা দেখিয়েছিল। বইটির পঁচিশটি অধ্যায়ে ক্ষিতিমোহন একে একে প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলি সম্পর্কে তথ্যসমাবেশ ও তার বিশ্লেষণ করেছেন।

আলোচনাপ্রসঙ্গে কখনও কখনও তাঁর রীতি অনুসারে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা এসে পড়েছে। ক্ষিতিমোহন কখনও বলেছেন :

> অতি প্রাচীন কবিরাজবংশে আমার জন্ম। বাল্যকালে এই শাস্ত্র পড়িতেও হইয়াছে। তাই এই শাস্ত্রের অনেক গ্রন্থের নাম ও পরিচয় আমাদের জানার কথা। বাংলাদেশের বৈদ্যশাস্ত্রের তালিকার কতক উপকরণও আমার হাতে ছিল।[৬০]

এই প্রসঙ্গে জানা যাচ্ছে সেই উপকরণ নিয়ে একটি প্রবন্ধ লেখার ইচ্ছা করেছিলেন, কিন্তু একটি প্রবন্ধ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে দেখে তিনি নিবৃত্ত হন। 'আমার অনেক পরিশ্রম বাঁচিয়া গেল', লিখেছেন ক্ষিতিমোহন। মন্তব্য করেছেন :

> আমাদের স্বভাবেব মধ্যে বিপুল আলস্য আছে। তাই ভাবিলাম আমি যদি সামান্য দুই একটি কথা লিখি তবেই হইবে। যাঁহারা আরও কিছু জানিতে চাহিবেন তাঁহাদের ঐ প্রবন্ধটি দেখিলেই হইবে।

সারাজীবন ক্ষিতিমোহন প্রবন্ধে ও গ্রন্থে মিলিয়ে যত কাজ করেছেন, তাতে তাঁর নিরলস অধ্যবসায়ী চিত্তের পরিচয়ই আমাদের সামনে উদ্‌ঘাটিত হয়। তিনি নিজেই যখন নিজের সম্পর্কে উপরোক্ত মন্তব্য করেন তখন ঈষৎ কৌতুক বোধ করি। অবশ্য এ কথা হয়তো ঠিক যে, যত কাজ তিনি কবলেন তার তুলনায় না-করা কাজের পরিমাণও কিছু কম নয়, তবে আলস্য তার কারণ নয়। আরও কাজ করলে হয়তো ভালো হত, কিন্তু বাস্তবে তা কি সম্ভব ছিল?

কখনও বা তাঁর মন্তব্য থেকে এ কথাটা স্পষ্ট হয় যে, তিনি ভারতের নানা অঞ্চলে ঘুরে বেড়িয়েছেন সে যেমন তাঁর সন্তসত্তার প্রবল টানে, তেমনই তাঁর গবেষকসত্তার অনুসন্ধিৎসার টানে। তাঁকে বলতে শুনি :

> বাজপুতানায় ও কাথিয়াবাড় জৈনভাণ্ডাবে দেখিয়াছি বঙ্গাক্ষরে লেখা বৈদ্য-গ্রন্থ সংগৃহীত। কাথিয়াবাড় সায়লাতে গ্রন্থভাণ্ডারে এইরূপ দুইখানি বাংলায় লেখা যোগ-ওষধি গ্রন্থ আছে। বহুদিন ধরিয়া নানা প্রদেশ হইতে বাংলাদেশেই ছাত্রেরা বৈদ্যশাস্ত্র পড়িতে আসিতেন। গঙ্গাধর, দ্বারিকানাথের ছাত্র গুজরাতে, রাজপুতানায় ও পঞ্চনদে দেখিয়াছি।[৬১]

তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ বুঝতে এর পাশাপাশি এই গ্রন্থ থেকেই আরও কয়েকটি পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করা যেতে পারে :

> ভারতের নিরক্ষর সাধকদেব চিন্তাধারা লইয়া আমি জীবনের অধিকাংশ দিন কাটাইয়াছি। জ্ঞানময় বিদগ্ধ জগতের সান্নিধ্যে আসিয়াছি শুধু লোক-সাধনার সঙ্গে ছন্দের মিল দেখিতে।[৬২]

এ কথা বললেও 'চিন্ময় বঙ্গ'-এ ক্ষিতিমোহন এ দেশের লোকশিল্প প্রভৃতির অল্পবিস্তর পরিচয় দিয়েছেন, নাথ যোগী প্রভৃতি ধর্মসম্প্রদায়ের কথা বলেছেন কিন্তু লোকধর্ম ও লোক-সংস্কৃতির বিস্তৃত পরিচয়দানে বিরত থেকেছেন।

বাংলার বাউল

সম্ভবত ক্ষিতিমোহন ইচ্ছা করেই 'চিন্ময় বঙ্গ'-এ বাউলদের সম্পর্কে কোনো আলোচনা করেননি। আগেই তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালযে ১৯৪৯ সালের লীলা বক্তৃতা দেওয়ার আহ্বান পেয়ে 'বাংলার বাউল ' সম্পর্কে বলেন। এই বক্তৃতা ১৯৫৪ সালে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। বঙ্গাদেশ-সম্পর্কিত তিনটি বইয়ের মধ্যে 'বাংলার সাধনা' ও 'চিন্ময় বঙ্গা'-এর মাঝখানে আছে এই বইটি। ক্ষিতিমোহন বলেছেন :

> বাংলাদেশেব সাধনার কথা বলিতে গেলে বাংলাদেশের বাউলদের কথা বলিতেই হইবে। বাউল-সাধকেরা বাংলাদেশেব মর্মের কথা বলিয়াছেন। . দীর্ঘকাল কাজ করিয়া দেখিলাম এই সন্তমত ও বাউলমত অনেকটা একই। ... তাঁহাদের সব কিছুই মানবের মধ্যে, কাজেই তাঁহাদেব উভয়ের ধর্মকেই মানবধর্ম বলা চলে।[৬৩]

বাউল অর্থে পাগল, বায়ুগ্রস্ত। বহু শতাব্দী ধরে জাতপাতবহির্ভূত নিরক্ষর একদল সাধক শাস্ত্রভারমুক্ত মানবধর্মেরই সাধনা করে আসছেন। তাঁরা মুক্তপুরুষ, সমাজের কোনো বাঁধন মানেন না। 'কত কালের এই বাউল মত ও বাউলিয়া সাধনা'—এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন ক্ষিতিমোহন প্রথম দুই অধ্যায়ে, যেখানে বেদ, উপনিষদ, পুরাণ প্রভৃতিব মধ্যে বিধৃত বাউলের সহধর্মী মতের বিস্তৃত আলোচনা করে দেখিয়েছেন। এই দুই অধ্যায়ে তিনি বেদসংহিতা ও সংহিতাপরবর্তী নানা ক্ষেত্রের প্রেক্ষিতে অনেকটা পরোক্ষে বাউলমতের বিশেষত্বগুলির পরিচয় দিয়েছেন, তার পর তৃতীয় অধ্যায়ে বাংলার বাউলদের আপনকথা বলবার সুযোগ করে নিয়েছেন। বলেছেন বাউলরা শাস্ত্রাচার বা লোকাচার মানেন না, মানেন শুধু রস ও ভাবের পথ। তাঁরা সত্য খোঁজেন মানুষের মধ্যে, মানব-জমিন তাঁরা পতিত রাখেন না। 'অপুঁথিয়া' বাউলদের প্রতিই তাঁর টান—উত্তর পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গের এই-সব অপুঁথিয়া বাউলদের কথা কিছু কিছু বলেছেন এই বক্তৃতায়। এঁদের অনেকে তাঁর পরিচিত, কারো কারো সম্পর্কে আবার কোনো বাউলের সঙ্গে অন্তরঙ্গতার সূত্রে জেনেছিলেন।

অধিকাংশ বাউলই নিরক্ষর মুসলমান বা হিন্দু নিম্নজাতির লোক। এঁরা বেশ-বাস পরেন, ঝুলি লাঠি কিশ্‌তি (দরিয়াই নারকেলের ভিক্ষাপাত্র) নিয়ে বেরোন, সর্বকেশ রক্ষা করেন। বিগ্রহ মানেন না, ব্রত-উপবাস করেন না, দেহতত্ত্বের গান করেন। এই পথে হিন্দুর মুসলমান শিষ্য ও মুসলমানের হিন্দু শিষ্য বিস্তর আছেন। কর্তাভজা, সাহেবধনি, বলরামি, সহজি প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায় আছেন, যাঁরা সকলেই বাউল বলে নিজেদের পরিচয় দেন। এ ছাড়াও বাউলদের মধ্যে নানা ভাগ-উপভাগ আছে। বাউলদের বাইরেও বাউলিয়া মতের

বহু লোক এবং সাধনা আছে। আবার বাউলদের মধ্যেও অবাউল অনেক আছে। বাউল-ভাব হল অন্তরের সত্য। বাইরের ভাগ-বিভাগে তার পরিচয় দেওয়া চলে না। সহজিয়া ও বাউলমত অনেক ক্ষেত্রে পরস্পর যুক্ত হলেও বিশুদ্ধ বাউলদের অনেকে তাঁদের সঙ্গে সহজিয়াদের পার্থক্য দেখেন।

বাউল বলেন দেহেই সর্ববিশ্ব অবস্থিত—'যা আছে ভাণ্ডে। তা আছে ব্রহ্মাণ্ডে।' সর্বতীর্থ সর্বসাধনা এই দেহেরই মধ্যে। এই পথের পথিক লোকসমাজে লোকধর্মকে মানলেও অন্তরে তা মানেন না। এঁদের সাধনার এক প্রধান অঙ্গ কায়াসাধন। ক্ষিতিমোহন বলেছেন. এদের 'দেহসাধনায় চারিচন্দ্রের ভেদ' অতি গোপন ব্যাপার এবং তা অতি বীভৎস। বাউলসাধনার যে চিন্ময় পথ তা হল আপনার মধ্যে বিশ্বের পরিচয়। একে বাহ্যরূপে পরিণত করতে গেলেই বিপদ। 'চারিচন্দ্রের ভেদ হইল তন্ত্রের ও যোগশাস্ত্রের দাসত্ব। তাহাতে অনুরাগ-পথের কি আছে?' —এ সম্পর্কে এই পর্যন্তই বলেছেন ক্ষিতিমোহন, এর বেশি ব্যাখ্যা করেননি, সে কাজ তাঁর উদ্দেশ্যবিরহিত। তাঁর মতে 'কিন্তু চারচন্দ্রভেদও কায়িক ব্যাপার। তাহা হইতেও উচ্চতর ভাব-সাধনাওয়ালা বাউল আছেন।'

ক্ষিতিমোহনের বক্তৃতার অবশিষ্টাংশ ব্যয়িত হয়েছে সেই উচ্চতর ভাবসাধক বাউলদের পরিচয় দিতে। অবশ্য তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে এই পরিচয় সর্বাংশে প্রকাশযোগ্য নয়, কেবলমাত্র অনুভববেদ্য। তিনি উল্লেখ করেছেন :

> বাউলিয়া প্রেমতত্ত্বের পরিচয় দিতে গেলে একবার এক বাউল সাধু বলিয়াছিলেন, "এই সব ব্যাকরণ ও পরখ হইল বাহ্যপন্থীদের, আমাদের ক্ষেত্রে ইহা চলিবে কেন?" তিনি তাই গান করিয়াছিলেন,—
>
> ফুলের বনে কে ঢুকেছে রে সোনার জহরী
> নিকষে ঘসয়ে কমল আ মরি মরি।[৬৪]

ক্ষিতিমোহন মনে করেন মিশনারিরা যেমন ভারতীয় ধর্মের ঠিক পরিচয় বোঝেননি এবং তা দিতেও পারেননি, তেমনই গ্রন্থাশ্রয়ী পণ্ডিতদের দল ঠিক বাউলিয়া ভাব ও মর্ম ধরতে পারেননি বলে তার পরিচয়ও দিতে পারেননি। যাঁরা নির্গ্রন্থ তাঁদের পরিচয় গ্রন্থে কেমন করে মিলবে। ঝুটা বাউলরাই তাঁদের পরিচয় গ্রন্থে রেখে গেছেন। তিনি বলেছেন :

> আসল বাউলরা নিরক্ষর। পুঁথির ধার তাঁহারা ধারেন না। শিক্ষা-ব্যবসায়ী আমরা তো পুঁথিই জানি। তাই আমরা পুঁথি-আশ্রয়ী। পুঁথিতে পাইলেই আমাদের সুবিধা হয়। তাহাতে 'পুঁথিয়া' সহজিয়াদের অনেক কথা জানা গেলেও 'অপুঁথিয়া'দের খবর পাওয়া কঠিন। তবে অনেক ক্ষেত্রে পুঁথি দেখিয়াও অনেক কিছু খবর মেলে। পুঁথির বাহিরের খবর খোঁজ করিতে হইলে মানুষের সন্ধানই করিতে হয়।[৬৫]

ক্ষিতিমোহনের মতে আসলে ধীরভাবে এঁদের সঙ্গে থেকে এঁদের জীবন ও বাণী নিঃশব্দে সংগ্রহ করতে হয়। আমরা সব সংক্ষেপে সারতে চাই, হুড়মুড় করে গিয়ে পড়ে প্রশ্নে প্রশ্নে তাঁদের ব্যাকুল করে তুলি, তাতে সাধকদের ব্যাঘাত ঘটে।

ক্ষিতিমোহন তাঁর বক্তৃতায় যে-ভাবে বাউলদের প্রেমতত্ত্বের ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন তা হল, বাউলরা চান মুক্তির পরমানন্দ। তাঁরা বলেন মুক্তি হল প্রেমের চিন্ময় প্রকাশ। স্বর্গের অমৃতের চেয়ে পৃথিবীর এই প্রেমরস মহত্তর। আমাদের প্রেম যখন বিশ্বব্যাপী হবে তখনই তা হবে শুদ্ধ ও ভাগবত। তখন সাধকও ভগবানের মতো প্রেমময় হয়ে যাবেন।

জ্ঞান থেকে প্রেম মহত্তর। প্রেমহীন মানুষ সত্যের আংশিক প্রকাশমাত্র। প্রেমে যুক্ত মুক্ত হলেই নরনারী পূর্ণস্বরূপ হতে পারে। একে অন্যকে যে বিশুদ্ধ প্রেমে পরিপূরণ করবে তা কামের রাজ্যের কথা নয়। তার জন্য চাই নরনারী উভয়েরই অন্তরের মুক্ত ভাব। এই মুক্ত ভাব সমাজের বাহ্যবিধিতে মেলে না। বাউলমতে শাস্ত্রবিধি যেমন মান্য নয়, কায়াকে ক্লেশ দিয়েও তেমনই কোনো লাভ নেই। নরনারীর বন্ধনের মধ্যে অধ্যাত্মযোগ ছাড়া আর কোনো বন্ধন থাকলে তা সত্য নয়। সেই অধ্যাত্মযোগেরই প্রকাশ হল আমাদের প্রেমে।

এই অধ্যাত্মসত্যের দীক্ষা মেলে সদ্‌গুরুর কাছে। গুরু একজন নন, চিরদিনই যত জনই আমাদের চেতনা দেন ততজনই গুরু। একদিনে তো জীবনের দীক্ষা সমাপ্ত হয় না। প্রেমের ক্ষেত্রে বরবধূর মধ্যে আর কেউ ব্যবধান রচনা করতে পারে না। বাসরঘরে সখীদেরও প্রবেশ নেই। জ্ঞানে দ্বৈতাদ্বৈত বিরোধ ঘোচে না, ঘোচে প্রেমে। 'কারণ প্রেমে দুইকেই চায় এবং দুইকে এক করে। বাউলেরাও বলেন—নিত্য দ্বৈতে নিত্য-ঐক্য প্রেম তার নাম।' পরকে আপন করতে পারে এবং ভেদের মধ্যে মধুর অভেদকে সাধন করে বলেই প্রেমের মহত্ত্ব। এই কথাটির বিস্তারিত ব্যাখ্যা করে 'পরকীয়া' প্রার্থনা যে সমাজনীতিদলনের জন্য নয়—সে কথা বুঝিয়েছেন ক্ষিতিমোহন, যে একান্ত নিজের তাকে নিজেরই বলে জানলে প্রেমের সার্থক রূপ উপলব্ধি হয় না। তাকে দূরের জেনে আপন করে পেতে হবে :

> প্রেম হইবে দুইজনের মধ্যে। এই উভয়ের মধ্যে সাম্য এবং সমান মুক্তভাব চাই। .. দাসীকে প্রেম করার কিছু অর্থ নাই। ...তাই ভগবান প্রেমের ক্ষেত্রে মানবকে অপার মুক্তি দিয়াছেন। প্রেমের অপরূপত্বই হইল অনিশ্চয়তা।[৬৬]

ক্ষিতিমোহন দেখিয়েছেন বাউলদের আর-একটি বড়ো তত্ত্ব হল প্রকৃতি বা সখীভাবে সাধনা। জ্ঞান ও কর্মে দিনের পর দিন ক্রমে ক্রমে শিক্ষা লাভ করে একটু একটু করে স্বীকার্যকে স্বীকার করতে হবে। এ পথ পুরুষের, এ পথ indirect। প্রেমে হঠাৎ স্বীকার করতে হয়, নারীর এই পথ immediate। পুরুষ বিয়ে করে ক্রমশ স্ত্রীকে চেনে, সন্তানকে ক্রমে ভালোবাসলেও কোনো ক্ষতি নেই। জীবধর্মের বিধিতেই নারীকে সবুর করবার সময় বিধাতা দেননি। কিন্তু এই নারীর বে-সবুরি পথে ভ্রান্তিরও আশঙ্কা। পুরুষ যখন তার জ্ঞানে ও কর্মে ক্রমে ক্রমে অনন্ত অসীমের দিকে অগ্রসর হয়, তখন পর্দা সরাতে সরাতে হয়তো মানবজন্মই শেষ হয়ে যায়—তবু পর্দার আর শেষই হয় না। সাধক কখনও নারীর মতো একমুহূর্তে ঝাঁপিয়ে পড়তে চায়, তা সম্ভব হয় প্রেমে। ক্ষিতিমোহন উল্লেখ করেন চৈতন্যদেব যেমন আপনার অপার জ্ঞানে অকৃতকার্য হয়ে সখীভাবে একনিমেষে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছিলেন। কাশীতে যে নিতাই বাউলের সঙ্গে ক্ষিতিমোহনের পরিচয় ছিল তাঁর কথা

আমরা আগেই উল্লেখ করেছিলাম, ক্ষিতিমোহনের প্রবন্ধে-ভাষণে তাঁর নাম উচ্চারিত হয়েছে অনেক বার। সাধারণত বাউলরা ফকির হলেও বহু বাউল গৃহস্থ আছেন। সমাজবিধি না মানলে তো গৃহস্থনীতি চলে না। তাঁরা কী করেন?

> বাউল গৃহস্থ বলেন, "বিধি বা মন্ত্রের দ্বারা আমরা অধিকার সাব্যস্ত করি না। বিধিকে সাময়িকভাবে স্বীকার করিয়া আমরা দেহের কাছে দেহ রাখিয়া সংসারযাত্রা চালাইয়া যাই। তারপর যদি কখনও ভগবানের কৃপায় তাহাকে প্রেমেতেও পাই, তবেই জীবনকে ধন্য মনে করি।"[৬৭]

'কভু মিলে কভু না মিলে দৈবের লিখন' প্রসঙ্গে নিতাই বাউলের কথা এসেছে। তিনি ক্ষিতিমোহনকে বলেছিলেন, দেহের কাছে দেহ রেখে স্ত্রীকে পাওয়া হয়নি তাঁর, বারো-তেরো বছর পর স্ত্রী পরলোকে গেলেন। তারও কত বছর পরে :

> একদিন হঠাৎ অর্ধদণ্ডের জন্য তাঁহাকে পাইলাম। তৎক্ষণাৎ আমার সব দীপ্ত হইয়া গেল। পরশমণিতে সব লোহা সোনা হইয়া গেল।[৬৮]

আর-এক প্রসঙ্গে ক্ষিতিমোহনের মনে এসেছে সাধক বলা কৈবর্তর কথা। একটি বাউল গানের দু-পঙ্ক্তি উদ্ধৃত করেন তিনি :

> থামাইওরে ঢোল, ঢুলী ভাই কাঁসির ঝন্‌ঝনি।
> ধীরে ধীরে বাইওরে মাঝি, যেন মায়ের কাঁদন শুনি।।

শ্বশুরগৃহগামী নৌকায় বসে কন্যা অনুনয় করছেন মাঝিকে ধীরে ধীরে নৌকা বাইতে, আর বাজনদারকে থামতে বলছেন, ঘাটে পড়ে মা কাঁদছেন, সে কান্নার শব্দ যাতে স্পষ্ট শোনা যায়। বাউল সাধক কেবল একা কাঁদেন না তাঁর প্রেমাস্পদের জন্য। তাঁরও বিশ্বব্যাপ্ত ক্রন্দন তিনি শোনেন। পাছে সংসারের কোলাহলে সে কান্না চাপা পড়ে যায় সেজন্য তাঁর ব্যাকুলতা। সেই ব্যাকুলতা নিয়ে গুরুর কাছে দীক্ষা নিতে গেলে তিনি বললেন ওই কন্যাই তোমার গুরু।[৬৯]

বাউল সাধক পুরাতনের সংগ্রহ-পুথির চেয়ে নতুন জীবন্তকে বেশি বিশ্বাস করেন। শাস্ত্রসংগ্রহ তাঁদের কাছে উচ্ছিষ্টমাত্র। তাঁরা বলেন প্রয়োজনে নতুন উৎসব করব, নতুন নতুন অন্ন আসবে। তাঁদের বিশ্বাস যতদিন বাণীর প্রয়োজন ততদিন জগতে নব নব বাণী আসবে, অভাব হবে না। তাঁদের কাছে প্রশ্ন করলে কথায় বড়ো-একটা উত্তর দেন না, উত্তর দেন গানে :

> আমরা পাখীর জাত। আমরা হেঁটে চলার ভাও জানি না, আমাদের উড়ে চলার ধাত।

ক্ষিতিমোহন আরও উল্লেখ করেছেন এই-সব বহু গানেই ভণিতা নেই, রচয়িতার নামও জানা নেই। কেন তাঁরা মনে রাখেন না রচয়িতাদের, এর উত্তরে তাঁরা বলেন নদীতে নৌকা যখন ভরাপালে চলে, সে কোনো পথচিহ্ন রেখে যায় না। কাদার উপর দিয়ে নৌকা ঠেলে নিতে হলেই কাদার উপর দাগ পড়ে।

'প্রবাসী'-তে 'হারামণি' শিরনামায় প্রকাশিত ক্ষিতিমোহন-সংগ্রহের নটি গানের তিনি 'বাংলার বাউল'-এ উল্লেখ করেছেন। এগুলি চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'বঙ্গবাণী'-তেও মুদ্রিত করেছিলেন। অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে ক্ষিতিমোহন লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং অতি বিদগ্ধ পণ্ডিতসমাজের সামনে ভারতীয় দর্শন-সভার অধিবেশনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট হলে এবং অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে হিবার্ট বক্তৃতায় এই নিরক্ষর দীনহীন সন্ত-বাউলদের মানবধর্ম-বিষয়ে আলোচনা করেন। তিনি জানিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ যা আলোচনা করেছেন এই প্রসঙ্গে, তার পুনরুল্লেখ তিনি নিষ্প্রয়োজন মনে করেন। রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি বাউলগান ইংরেজিতে অনুবাদ কবেছিলেন, সেগুলি হল : 'আজি তোমার সঙ্গে আমার হোরি', 'আমার আজব অতিথি', 'আমায় পথের মাঝে ডাকো যদি', 'গোপালকে তোর দিতে হবে', 'নয়ন দেখে গায়ে ঠেকে', 'নয়ন যাচা যে-জন তারে', 'ওগো মূলাধার, তুমি আপ্‌নে কর পার', 'প্রেমের মেলে প্রেমেরই বান্দা'। সবগুলির অনুবাদ Fugitive গ্রন্থে আছে।[৭০]

এইরকম মুষ্টিমেয় কয়েকখানি ছাড়া ক্ষিতিমোহন-সংগ্রহের বাউলগান আজ পর্যন্ত লোকচক্ষুর গোচরে আসেনি। সেজন্য মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন তাঁকে কৃপণ বলেছেন, ক্ষিতিমোহন যে সমালোচনার মুখোমুখি হয়েছিলেন তার উল্লেখ পূর্বে করা হয়েছে, তাঁর প্রতিক্রিয়াও আমরা দেখেছিলাম। 'বাংলার বাউল'*-এ সে-সব কথা আছে। তাঁর দেওয়া তথ্য থেকে জানা যায় আর তিনি নিজে বাউলবাণী বার করেননি, যদিও তা সাজিয়ে লিখে রেখেছিলেন। প্রায় চল্লিশ বছর অর্থাৎ বলা চলে ১৯০৯-১৯১০ সাল থেকে এগুলি নিজের কাছেই রেখে নিজেই আলোচনা করেছেন, যার জন্য তাঁর এই সংগ্রহ। বন্ধুবান্ধবদেরও দেখিয়েছেন, এর থেকেই রবীন্দ্রনাথ ও চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে কখনও দিয়েছেন। মনে প্রশ্ন জাগে, এই সাজিয়ে-রাখা বাউলগান-সংগ্রহের পাণ্ডুলিপি কোথায় গেল?

ক্ষিতিমোহন কেবলমাত্র 'হারামণি' সংগ্রহগ্রন্থের সংকলক-সম্পাদক মৌলবি মুহম্মদ মনসুরউদ্দীনের সমালোচনার উত্তরে তাঁর মনোভাব জানিয়েছেন। এ ছাড়া ড. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য তাঁর 'বাংলার বাউল ও বাউল গান' গ্রন্থে ক্ষিতিমোহনের বাউলমত বিশ্লেষণের ও তাঁর সংগৃহীত বাউলগানগুলির বিস্তারিত সমালোচনা করেছেন। তাঁর গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৯৫৭ সালে। 'প্রবাসী' ও 'বঙ্গবীণা'-য় ক্ষিতিমোহন সেনের সংগৃহীত কয়েকটি বাউল গান দেখে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন। তার পর বাউলগান সংগ্রহের জন্য বাংলার নানা স্থানে ঘুরে যে-সব বাউল গান পেতে লাগলেন তার বাগ্‌বৈদগ্ধ্য ও কাব্যরস সেগুলির সমকক্ষ নয়। প্রথম প্রথম হতাশ হতেন, মনে হত আসল জিনিস পাচ্ছেন না। পরে দীর্ঘদিন ধরে বাউলগান সংগ্রহ ও বাউলতত্ত্ব নাড়াচাড়া করতে করতে দেখলেন ক্ষিতিমোহন সেনের

* 'বাংলার বাউল' ধারাবাহিকভাবে বিশ্বভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। অপিচ 'বাউল পরিচয়' নামে একটি পৃথক রচনাও এই পত্রিকার দ্বাদশবর্ষ প্রথম থেকে চতুর্থ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।

সংগ্রহ-করা গানের অনুরূপ ভাবপ্রকাশক গান দু-একটি মিললেও ওরকম প্রকাশভঙ্গি দেখা যায় না। এরপর যখন ক্ষিতিমোহন সেন লীলা বক্তৃতা দিলেন ড. ভট্টাচার্য মনোযোগ দিয়ে তা শোনেন ও 'বিশ্বভারতী পত্রিকা'-য় প্রকাশিত হলে তা পড়েন। তাতে অতৃপ্তি বাড়ল। মনে হল :

> যে ঐতিহাসিক ও বিচারমূলক দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া বাংলার বাউল মতবাদের প্রকৃত স্বরূপ ও তাহাদের সাধনার বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা করা প্রয়োজন, তাহার সন্ধান মিলিল না।

ড. ভট্টাচার্য ক্ষিতিমোহনের 'বাংলার বাউল' গ্রন্থের প্রথম দুই অধ্যায়কে সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক বলেছেন এবং তাঁর মতে তৃতীয় অধ্যায়টির বিশ্লেষণ যথাযথ বিষয়ানুসারী নয়। কেন তিনি ক্ষিতিমোহন সেনের বিচার-বিশ্লেষণ মানতে পারছেন না তার বিস্তৃত ব্যাখ্যা দিলেন :

> ক্ষিতিমোহনবাবুর গান কয়টি সারা বাংলায় প্রাপ্ত বাউল গান হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন পর্যায়ের। বাংলার বর্তমান বাউলদের ধর্মসাধনা ও তত্ত্বাদির কোনো ইঙ্গিত বা সঙ্কেত, যাহা তাহাদের প্রায় প্রতি গানেই আছে, তাহা এই গান কয়টির মধ্যে নাই। ভাব ভাষা উপস্থাপন প্রভৃতিতে এই গান কয়টি আধুনিক যুগের কবিদের রচিত বা এগুলির উপর আধুনিক হস্তের প্রসাধন আছে বলিয়া বোধ হয়।

তিনি আরও বলেছেন :

> বাংলার বাউলদের সাধনতত্ত্ব ও সাধনপদ্ধতির কথা ক্ষিতিমোহনবাবু তাঁহার দুইটি প্রবন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা বাংলায় বর্তমানে যে বাউলদের দেখিতেছি ও যাহাদের গান পাইতেছি, তাহাদের সম্বন্ধে ঠিক খাটে না। বাংলার বাইরের মধ্যযুগের সাধকদের মধ্যে এই প্রকার ধর্মসাধনা হয়তো প্রচলিত ছিল, কিন্তু বাংলার বাউলদের মধ্যে বর্তমানে তাহা প্রচলিত নাই—অন্ততঃ আড়াই শত তিনশত বৎসরের মধ্যে রচিত গানের ভিতর তাহার নিদর্শন পাই না এবং প্রাচীন বাউলদের শিষ্যদের মধ্যেও তাহা প্রচলিত নাই। ... এই প্রকার সাধনরীতি তিনি বাংলার বাউলদের উপর আরোপ করিয়াছেন মাত্র ...।
>
> ইংরেজীতে একটি উক্তি আছে : "Truth is no respecter of persons" যাহা সত্য তাহা চিরকাল অবিকৃত ও ব্যক্তিপ্রভাব বর্জিত। ...এখানে ব্যক্তিবিশেষ বা তাঁহার ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোনো মূল্য নাই, সত্য সন্ধানই একমাত্র উদ্দেশ্য।

এর পর 'নিঠুর গরজী তুই কি মানস-মুকুল ভাজবি আগুনে', 'হৃদয়কমল চলতেছে ফুটে কত যুগ ধরি', 'আমি মেলুম না নয়ন', 'আমি মজেছি মনে', 'আমার ডুবল নয়ন রসের তিমিরে' —গানগুলি বিশ্লেষণ করে তিনি প্রতিপাদন করতে চেয়েছেন যে সেগুলির রচনাভঙ্গি আধুনিক, রবীন্দ্রনাথের গান ও কবিতার সঙ্গে তার যোগ, তার মিল রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্মদর্শনের সঙ্গে, বাউলগানের সঙ্গে নয়।[৭১]

সমান্তরালে এই প্রসঙ্গে ড শশিভূষণ দাশগুপ্তের গ্রন্থ Obscure Religious Cults থেকে আলোচনা করলে আমরা ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাব। তিনি এই গ্রন্থে বাউলসাধনার 'চারিচন্দ্রভেদ'-এর আলোচনা যেমন করেছেন, তেমনই সপ্তম অধ্যায়ে

ক্ষিতিমোহন-সংগৃহীত বাউলগানগুলির কয়েকটির তাদের রচয়িতার উল্লেখ সহ সম্পূর্ণ ইংরেজি অনুবাদ পাঠকের জন্য উপস্থাপিত করেছেন। গানগুলি হল 'নিঠুর গরজী তুই কি মানস-মুকুল ভাজবি আগুনে', 'হৃদয়কমল চলতেছে ফুটে কত যুগ ধরি', 'ধন্য আমি বাঁশিতে তোর আপন মুখের ফুঁ', 'আমার ডুবল নয়ন রসের তিমিরে', 'ফুলের বনে কে ঢুকেছে রে সোনার জহরী'। এই সঙ্গেই তিনি জানিয়েছেন বাউলগান সংগ্রহে পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেনই প্রথম উদ্যোগী হন, তিনি পথিকৃৎ। তবে তাঁর সংগ্রহের বাউলগান অতি অল্পই মুদ্রিত হয়েছে। এর পর এই বিষয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ করেন মৌলবি মনসুরউদ্দীন এবং আরও পরে ড. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। আরও কয়েকটি বিশিষ্ট বাউলগান-সংগ্রহের নামোল্লেখ ড. দাশগুপ্ত করেছেন। তার পর বলেছেন :

> এ পর্যন্ত প্রাপ্ত বাউলগানের ভিত্তিতে এ কথা বলা অত্যন্ত কঠিন যে কারা যথার্থ এই বাউল কবি ছিলেন। আমরা গত কয়েক দশক ধরে এ ব্যাপারে কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতা ও অন্যান্য লেখায় যা বলেছেন, যা বলেছেন তাঁর অন্তরঙ্গ সহযোগী পন্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন তার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছি। তাঁরা মনে করেন বাউল বলতে কোনো বিশেষ ধর্মীয় বিশ্বাসের অনুশীলনের চেয়ে অকৃত্রিম ভক্তি ও অনুরাগের পথে অপ্রথাগত ঈশ্বরসাধনা বোঝায়। যথার্থত এই বাউল-নামধারী নিরক্ষর গ্রাম্য গায়করা বাংলার নিম্নস্তরের মুসলমান ও হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত এবং তাঁদের কিছু আছেন গৃহস্থ, তবে অধিকাংশই ভিক্ষুক। যে-বাউলরা হিন্দু সম্প্রদায়ের তাঁরা সাধারণত বৈষ্ণব ধর্মবিশ্বাসী, আর যাঁরা মুসলমান তাঁরা সাধারণত সূফী সম্প্রদায়ের। উভয় গোষ্ঠীরই ঝোঁকটা মরমিয়া ঐশ্বরীয় প্রেমের প্রতি বিশ্বাসে।...
>
> এই বাউল সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন বিভিন্ন সাধনপথে বিশ্বাসী ধর্মীয় মানুষ। সাধনপন্থায় বৈচিত্র্য সত্ত্বেও তাঁদের ধর্মীয় বৈশিষ্ট্যের বিশেষত্ব হল তাঁদের শাস্ত্রাচারহীন প্রথাবিরুদ্ধ ধরন। পন্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন ও কবি রবীন্দ্রনাথ বাউল গানের সেই দিকটার প্রতি জোর দিয়েছেন, যেখানে সীমার ভিতর দিয়ে অসীমের রহস্য অত্যন্ত সাদাসিধা সরল ভাষায় আত্মপ্রকাশ করেছে এবং মনের মানুষের জন্য মানবমনের আকুতি প্রাধান্য পেয়েছে।

ড. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য যে এই ধরনের বাউলসাধনার ধারাকে অস্তিত্বহীন বলে আক্রমণ করেছেন, ড. শশিভূষণ দাশগুপ্ত তার উল্লেখ করে বলেছেন ড. ভট্টাচার্য এই কথাটা প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন যে বাউলধর্মের গোষ্ঠীগত লক্ষণাত্মক বৈশিষ্ট্য হল, এ এক যৌন-যৌগিক সম্পর্কস্থাপনের গুপ্ত প্রক্রিয়াভিত্তিক মতবাদ ও তার চর্চা। বৈষ্ণব সহজিয়া ও তাদের সহযোগী তন্ত্রের সাধকদের মত ও তার অনুশীলনের ক্ষেত্রে ড. ভট্টাচার্যের দাবি সাধারণভাবে সত্য। এতদ্‌সত্ত্বেও ড. দাশগুপ্ত স্পষ্টই বলেছেন ড. ভট্টাচার্য যা প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন সে কথা বাউলদের সম্পর্কে শেষ কথা নয়। তিনি বলেছেন :

> কিন্তু মনে হয়, এই-সব বাউলদের মতবাদ ও তাঁদের সাধনপদ্ধতির চর্চার মধ্য থেকে সব চেয়ে আকর্ষণীয় যে-বৈশিষ্ট্যটি উদ্ভূত হয় তা হল সেই 'অচিন পাখি'র জন্য তাঁদের সন্ধান, যে পাখি মানবদেহের খাঁচার ভিতর 'কমনে আসে যায়'।

পরে ড. দাশগুপ্ত বাউলের 'মনের মানুষ' সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন :

> মনের মানুষের সঙ্গে বাউলের সপ্রেম মিলনের দ্বারা প্রকৃতপক্ষে বোঝায় সহজ-এর বা আত্মার স্বরূপের উপলব্ধি। যে-প্রেমের কথা আমরা বাউল গানে শুনি, সে হল আমাদের মানবাত্মার সঙ্গে আমাদেরই অন্তস্থিত পরমাত্মার প্রেম।...
>
> সুতরাং বাউলদের ধর্মবিশ্বাস মূলত আত্মোপলব্ধির প্রশ্নের উপর ভিত্তি করে আছে।

ড. দাশগুপ্ত দেখালেন ঔপনিষদিক মরমিয়াবাদের যুগ থেকে এই আত্মোপলব্ধির প্রশ্নকে কেন্দ্র করেই ভারতের ধর্মীয় চিন্তা আবর্তিত হয়েছে। সহজিয়াদের বিভিন্ন শাখা প্রভৃতি অপ্রধান ধর্মসম্প্রদায়গুলি উপনিষদের এই আত্ম-উপলব্ধির চিন্তার দ্বারা সম্পৃক্ত হয়েছিল। এরই সঙ্গে এদের মধ্যে এসে মিশেছে সুফিতন্ত্রের প্রভাব। একথা ঠিক যে সাধারণ মানুষ অনায়াসে সুফিমতকে গ্রহণ করেছিল। কিন্তু যখন আমরা বাংলার বাউলধর্ম ও উত্তর ভারতে সন্তসাধনার মতো অপ্রধান ধর্মসম্প্রদায়গুলির বিবর্তনে সুফিমতের প্রভাবের আলোচনা করব, আমরা যেন ভুলে না যাই যে উপনিষদিক ভাবধারা ও প্রধানত বৈষ্ণবীয় ধারার ভক্তিবাদী আন্দোলন ভারতীয় ধর্মচিন্তার পটভূমি রচনা করেছে। বাউল তাঁর সত্তার গভীরে তাঁর চরম সত্যকে খুঁজছেন—অনেকগুলি উদাহরণ দিয়ে ড. দাশগুপ্ত এই সন্ধানের স্বরূপ ব্যাখ্যা করলেন। তাঁর আলোচনার আলোয় আমরা ক্ষিতিমোহনের বাউল আলোচনার গভীরে প্রবেশের পথ খুঁজে পাই এবং এই সত্য দ্বিগুণ বললাভ করে যে 'বাংলার বাউল'-এর প্রথম দুই অধ্যায়ে ক্ষিতিমোহন যে বেদ উপনিষদ প্রভৃতি ক্ষেত্রে বাউলের সংজ্ঞা পরিচয় সন্ধান করেছেন, তা বৃথা বা অবান্তর নয়।

এই প্রসঙ্গে যেখানে 'বাংলার বাউল'-এর প্রথম দুই অধ্যায় ড. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের কঠিন সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে, সৈয়দ মুজতবা আলী তাঁর প্রবন্ধের স্বল্প পরিসরে তার বিরুদ্ধে ক্ষিতিমোহনের বিচারপদ্ধতিকে সমর্থন করে এই রীতির ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এখানে সেটুকু উদ্ধৃত করা যেতে পারে :

> এবং সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, ক্ষিতিমোহন আউল-বাউল গান নিয়ে আলোচনা করার সময় যে পদ্ধতি অবলম্বন করলেন সেটি সম্পূর্ণ শাস্ত্রচর্চা পদ্ধতি। অর্থাৎ উপনিষদ বা গীতার টীকা লেখার সময় শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত যেরকম অতি শ্রদ্ধার সঙ্গে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পাঠোদ্ধার করেন, অন্যান্য শাস্ত্রের সঙ্গে তুলনা করেন, ঐসব শাস্ত্রের মূল উৎসের অনুসন্ধান করেন, ঠিক সেই পদ্ধতিতে তিনি আউল-বাউলের 'শাস্ত্র' অধ্যয়ন করে, টীকা লিখে তাদের জীবনদর্শন অধ্যাত্মদর্শন লোকচক্ষের সামনে তুলে ধরলেন।[৭২]

ড. দাশগুপ্তের আলোচনার একটি শিরনামা 'Poet Tagore and the Baul Songs'। এই বিষয়ের আলোচনায় লেখক এক জায়গায় বলেছেন :

> ...রবীন্দ্রনাথ তাঁর সব গানে ও কবিতায় এক অনন্ত সত্তার কথা বলেন, সেই সত্তা আত্মোপলব্ধির জন্য সমগ্র সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশের পথ খুঁজছেন এবং তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ মানবব্যক্তিত্বের ভিতর দিয়ে। ...মানুষেরই মধ্যে এই মানবসত্তা ও ঐশ্বরিক সত্তার যে-দ্বৈতরূপ

> ওতঃপ্রোত হয়ে আছে তা হল, 'আমি' এবং 'তুমি', 'প্রেমিক' এবং 'প্রেমাস্পদ'। কবির গানে-কবিতায় এরই কথা এত অজস্রবার ব্যক্ত হয়। যে-রবীন্দ্রনাথ মানুষের মধ্যে এই 'আমি' ও 'তুমি', মানুষ ও মনের মানুষের গান করেন, তিনি বাংলাদেশের বাউলদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বাউল।[৭৩]

এই কথাই ক্ষিতিমোহনেরও মনের কথা। তিনিও বলেন কবি যেমন করে বাংলা দেশের বাউলধর্মের বিশ্লেষণ করেছেন, তার উপরে আর কথা চলে না। ক্ষিতিমোহন তন্ত্র ও যোগশাস্ত্রমতে যে বাউলরা কায়াসাধন করেন তাঁদের চেয়ে উচ্চতর ভাবের বাউল-সাধকদেরই পরিচয় তাঁর গ্রন্থে দিয়েছেন, রবীন্দ্রনাথও তাঁদেরই কথা বিশ্বজনসভায় জানিয়েছিলেন তাঁর অক্সফোর্ডের বক্তৃতায়।

Hinduism

Hinduism প্রকাশিত হয় ১৯৬১ সালে, ক্ষিতিমোহনের মৃত্যুর পরে। কিন্তু এর কাজ তিনি আগেই শেষ করেছিলেন। অভারতীয় পাঠকের কাছে হিন্দুধর্মের প্রকৃত পরিচয় দেওয়ার লক্ষ্য নিয়ে লেখা এই বই প্রণয়ণের দাবি যে ক্ষিতিমোহন স্বীকার করেছিলেন তার কারণ : এক, এককালে এই ধর্মের (জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম এরই শাখা) এতই প্রসার ঘটেছিল যে পৃথিবীর জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক মানুষের চিন্তাকে এর মূল সূত্রগুলি প্রভাবিত করেছে, এটা সামান্য কথা নয় ; আর দুই, একালের সব জটিল সমস্যার পূর্ণ সমাধান করে দিতে পারে এই ধর্ম, এমন দাবি না থাকলেও এ বিশ্বাস তাঁর ছিল যে হিন্দুদর্শনের আলোচনা কেবল অতীত বিষয়মাত্র নয়, এই আধুনিক কালেও হিন্দুধর্ম তার প্রাসঙ্গিকতা হারায়নি।

বইটির তিন ভাগ : ১. The Nature and Principles of Hinduism ; ২. Historical Evolution of Hinduism এবং ৩. Extracts from Hindu Scriptures। প্রথম ভাগের আলোচনাপ্রসঙ্গে ক্ষিতিমোহন বললেন—প্রচলিত হিন্দুধর্মের বহুরূপে দেবপূজার ঐতিহ্য আছে ঠিকই, আসলে কিন্তু নিরুপাধিক নিরাকার ব্রহ্মই নানা সম্প্রদায়ে নানা নামে নানা মূর্তিতে পূজিত হন, একমেবাদ্বিতীয়ম্-এর তত্ত্ব এ দেশে চিরকালের। এক সর্বব্যাপী সর্বানুস্যূত, অদ্বিতীয় ঈশ্বরে বিশ্বাসের সঙ্গে বহু দেবদেবী পূজার বিরোধ নেই। ভারতীয় সাধনায় বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের যে আদর্শ সক্রিয়, তার প্রকাশ আছে চারশো বছর আগে রচিত সাধক রজ্জবের গানে—বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পূজা অজস্র ছোটো ছোটো নদীর ধারার মতো একত্রে অগ্রসর হয়ে যাচ্ছে সমুদ্ররূপী ভগবানের দিকে। এই বৃহৎ দেশের ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে ও ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও উৎসবে এবং সামাজিক প্রথায় বৈচিত্র্যের কোনো শেষ নেই। তা ছাড়া এই ধর্ম পরম সত্যে পৌঁছোবার নানা পথে বিশ্বাসী বলে একই ধর্মানুষ্ঠান সব হিন্দু ধর্মাবলম্বীর পক্ষে অবশ্য পালনীয় বলে মনে করা হয় না। সপ্তদশ শতাব্দীতে এক ফরাসি পর্যটক—

Francis Bernier, প্রচলিত হিন্দুধর্মের আচার-অনুষ্ঠানের আধিক্য আর প্রতিমাপূজা দেখে বিচলিত হলে কাশীর হিন্দু পণ্ডিতরা তাঁর প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন। Humphrey Milford-এর Travels in the Mogul Empire গ্রন্থ থেকে ক্ষিতিমোহন তা প্রসঙ্গত উদ্ধৃত করে বললেন, কোনো হিন্দু যখন বিদ্যার দেবী জ্ঞানদাত্রী সরস্বতীর পূজায় যোগ দেয়, তখন এ কথা সে ভাবে না যে, দেবী সরস্বতী বীণাহস্তে শ্বেতহংসের উপর বিরাজিতা। একটি সৃজনধর্মী কল্পনার ক্রিয়া আছে প্রতিমাপূজার পিছনে। ঈশোপনিষদে ঈশ্বরকে কবি বা দ্রষ্টা বলা হয়েছে। ক্ষিতিমোহন আরও বোঝাতে চেষ্টা করেছেন যে হিন্দুধর্মের ঈশ্বর শুধু সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান, সর্বব্যাপী একমেবাদ্বিতীয়ম্ নন, সর্বজীবের হৃদয়ে তাঁর অধিষ্ঠান—'ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি' (গীতা ১৮।৬১)। আসলে হিন্দুধর্ম সবরকম ধর্মের খুব ভালো গবেষণাগার।

ধর্মীয় পূজা-অর্চনার ব্যাপারে খুব উদার এই ধর্ম, শাস্ত্রাচার-লোকাচার সবই বাহ্য। মূল আদর্শ না ছেড়েও বাউল বা ভাগবতদের মতো যে-কেউ এ-সব আচারপালনের রীতি বর্জন করতে পারে। সিস্টার নিবেদিতা ধর্ম আর রিলিজিয়ন যে এক নয় তা বোঝাতে বলেছিলেন পাশ্চাত্য দেশ যাকে civilization বলে, সেটাই এ দেশের dharma বা national righteuousness-এর প্রকৃত প্রতিশব্দ। সেই ব্যাখ্যাই ঠিক। একটা মানুষ সম্পর্কে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথাটা হল তার ধর্ম, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান নয়। হিন্দুধর্মের যথার্থ ঐক্যবন্ধনসূত্রটি হল তার জীবনাচরণসংহিতা,—নিঃস্বার্থ কর্ম, নিরাসক্তি, সততা, প্রেম—'অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।/ নির্মমো নিরহংকারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী।।' (গীতা ১২।১৩) আর যা যোগ করা যেতে পারে তা হল ঈশ্বরসমীপবর্তী হওয়ার ক্রমবর্ধিত চেষ্টা—সে যে পথ যিনি প্রশস্ত মনে করেন সেই পথেই।

হিন্দুসমাজজীবনের চতুরাশ্রমের আদর্শ ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে ক্ষিতিমোহন এ অভিযোগ খণ্ডন করেছেন যে হিন্দুরা যে দৃষ্টিতে জীবনকে দেখতেন তাতে তাঁদের শিক্ষায় কেবল পরাবিদ্যা আর ধর্মশাস্ত্রের চর্চা হত, বস্তুজাগতিক জ্ঞানচর্চা উপেক্ষিত ছিল। বরং ঋষিদের দ্বারাই যে বহু প্রাচীন যুগেও সাহিত্য ব্যাকরণ গণিত প্রভৃতি লৌকিক শাস্ত্রের আশ্চর্য গভীর চর্চা হয়েছিল সে কথা স্মরণীয়। প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে যখন বাস্তবের ভূমিতে আমাদের প্রতিষ্ঠা ধ্রুব (মাতা ভূমিঃ পুত্রো অহং পৃথিব্যাঃ—অথর্ববেদ), তখনই কেবল অপার্থিব আধ্যাত্মিক জ্ঞান সম্পূর্ণতায় ও সর্বোচ্চতায় আয়ত্তগত হতে পারে এবং মোক্ষ হল অস্তিত্বের পরিপূর্ণতা, এ আদর্শ কখনও নেতিবাচক নয়।

ক্ষিতিমোহন যেমন অস্বীকার করেননি হিন্দুদের মূল্যবোধের ধারণা যথেষ্ট জটিল, তেমনই A.C. Bouquet-এর এই মূল্যায়ন তিনি স্বীকার করেননি যে, গান্ধীজি যে দেশের মানুষের জন্য নিঃস্বার্থ কর্মের ব্রত গ্রহণ করেছেন সে তাঁর মহৎ আত্মখণ্ডন। হিন্দুরা যে যার কৈবল্য-মুক্তিসন্ধানী, গান্ধীজির এই আত্মবিস্মৃত পরহিতব্রত খ্রিষ্টান জীবনদর্শন, হিন্দুদর্শনে এ জিনিস নেই। ভগবদ্গীতা ও বৌদ্ধধর্মের সেবা ও ত্যাগের আদর্শ উল্লেখ করলেন ক্ষিতিমোহন, উদ্ধৃত করলেন ইংরেজ ভ্রমণকারীর অভিজ্ঞতা, ষোড়শ শতাব্দীতে

কোচবিহারে তিনি মনুষ্যেতর প্রাণীসেবার উচ্চ আদর্শ দেখেছিলেন। এ কথা ঠিক যে অন্য ধর্মের মতোই হিন্দুধর্মেও ধর্ম ও নীতিচর্চার সংঘাত বার বার বেধেছে, তেমনই এও ঠিক যে, সংস্কার-আন্দোলনগুলির প্রাণশক্তি এই ধর্মের নীতিগত আদর্শগুলি সজীব রেখেছে। সব আদর্শচ্যুতির বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদী মানুষগুলি মাথা তুলে দাঁড়িয়েছেন তার মধ্যে বুদ্ধও যেমন আছেন, তেমনই আছেন গান্ধী, বিবেকানন্দ, তিলক, আছেন রবীন্দ্রনাথ। অধ্যায়শেষে A.C. Bouquet-এর মূল্যায়নের বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদ মূর্ত হল 'গীতাঞ্জলি'-র বিখ্যাত কবিতার উদ্ধৃতি দিয়ে :

> Leave this chanting and singing and telling of beads ! Whom dost thou worship in this lonely dark corner of a temple with all doors shut ? Open thine eyes and see thy God is not before thee ! He is there where the tiller is tilling the hard ground and where the path-maker is breaking stones. Gitanjali 11 / গীতাঞ্জলি ১১৯

হিন্দুধর্ম বদ্ধঘরে নিজের মুক্তিচিন্তায় বিভোর হলে তাকে সচেতন করে তুলে, শ্রমে সহানুভূতিসেবায় আত্মবিসর্জন দেওয়ার আহ্বান এসেছে তারই ভিতর থেকে, সেবার আদর্শ তাকে পশ্চিম থেকে আমদানি করতে হয়নি, এই কথাটা ক্ষিতিমোহন বলতে চেয়েছিলেন।

আর-এক বড়ো প্রসঙ্গ জাতিভেদপ্রথা। এর পক্ষে-বিপক্ষে এতকাল ধরে যত কথা জমেছে এমন আর কোনো প্রসঙ্গে নয়। ক্ষিতিমোহন লিখলেন, যে রীতিতে বর্তমানে এই প্রথা চলছে, হিন্দুধর্মের মূল সুরের সঙ্গে তার সংগতি নেই। তেমনই আবার সব প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রগ্রন্থে এ প্রথার উল্লেখও নেই, যেখানে উল্লেখ আছে সেখানেও তার উপর খুব গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। কোথায় এ প্রথার শিকড় তার আলোচনা করলেন, পাদটীকায় বিস্তারিত নোট দিলেন অস্পৃশ্যতা সম্পর্কে, যাকে অর্বাচীন প্রথাও বলা যায় না, অথচ যার শাস্ত্রীয় ভিত্তিও বলতে গেলে নেই। দক্ষিণ ভারতেই যে এর প্রকোপ সবচেয়ে তীব্র, 'জাতিভেদ' গ্রন্থের মতোই তার তাৎপর্য বিশ্লেষণ করলেন। বাস্তবে এ প্রথার সংকীর্ণতা মেনে নিয়েও মহাভারত উপনিষদ প্রভৃতির দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে দেখালেন প্রাচীন ভারতীয় সমাজে জন্মের চেয়ে জ্ঞান কর্ম ও সত্য-আচরণের মর্যাদা কত বেশি ছিল। মার্কো পোলোর ভ্রমণবৃত্তান্ত থেকেও উল্লেখ করলেন ত্রয়োদশ শতকেও ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায় কীভাবে তাঁদের জীবনচর্যার দ্বারাই শ্রেষ্ঠ বর্ণের অধিকার লাভ করেছেন, জন্মের দ্বারা নয়। হিন্দু সভ্যতার ইতিহাসে যে বারবারই সমাজ থেকে বর্ণবৈষম্য উচ্ছেদ করার জন্য আন্দোলন জেগে উঠেছে তার প্রতি বিদেশি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন, দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন ভাগবতদের ঔদার্যের প্রতি।

হিন্দুইজম গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে আছে হিন্দুধর্মের বিবর্তনের ইতিহাস। যে অধ্যায়গুলিতে বিষয়বস্তুকে ক্ষিতিমোহন বিন্যস্ত করেছেন তা থেকেই তাঁর পরিকল্পনা ও দৃষ্টিভঙ্গির আভাস পাওয়া যায়। সেই প্রাচীন কালে ভারতের মাটিতে বৈদিক ও প্রাক্-বৈদিক সংস্কৃতির যে মিশ্রণ ঘটেছিল, তার পরিচয় দিয়ে শুরু করে হিন্দুধর্মের শরীরে চিরদিনই যে

বিচিত্র বিপরীতমুখী স্রোত-প্রতিস্রোত মিলে-মিশে এক হয়ে গেছে ও হিন্দুধর্মের বিশিষ্টতাগুলির জন্ম দিয়েছে, তার সম্যক ধারণা দিতে চাইলেন। হিন্দু সভ্যতা-সংস্কৃতি-ধর্মের মূলে তো কেবল বৈদিক ধর্মই নেই, বেদবিরোধী চার্বাক এবং জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাবও কীভাবে পড়েছে তা দেখালেন, দুই মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারত এবং পুরাণের, আর বিশেষ করে ভগবদ্গীতার পরিচয় দিলেন, যে বই লোকমান্য তিলক ও মহাত্মা গান্ধীর মতো আধুনিক ভারতের নেতাদের পথ দেখিয়েছে। আলোচনায় ক্ষিতিমোহনের মানসিকতার ছাপ পড়ল অথর্ববেদে তাঁর সেই-সব অতি প্রিয় সূক্তগুলি ব্যাখ্যার ঝোঁকে, যেগুলি এই বেদসংকলনকে সনাতনী বিশুদ্ধতার বাইরে টেনে এনে আধুনিকতার মর্যাদা দিয়েছে ; বা তাঁর সেইরকমই প্রিয় ঐতরেয় উপনিষদের 'চরৈবেতি' ও 'আত্মসংস্কৃতির্বাব শিল্পানি'-র মতো মন্ত্রের বিশ্লেষণের ঝোঁকে, মানুষের জীবন ও শিল্পের আদর্শরূপে 'ইতরার পুত্র মহীদাস ঐতরেয়' রচিত এই অমূল্য মন্ত্রগুলির ব্যাখ্যা শোনাতে ক্ষিতিমোহনের মন কোনোদিনই ক্লান্তি মানেনি। তাঁর লেখায় এ কথাটা জোর পেল যে উপনিষদের যুগে হিন্দুধর্ম বৈদিক যুগের পার্থিব সম্পদার্থে যজ্ঞানুষ্ঠানের সীমাবদ্ধতা উত্তীর্ণ হয়ে গেল, তখন ধর্মের প্রকৃত উদ্দেশ্য হল আত্মোপলব্ধি, ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দরূপে গণ্য হলেন—জীবমাত্রের মধ্যে যাঁর অবস্থিতি। বিদেশির কাছে এই ঔপনিষদিক দর্শনের পরিচয় দিতে গিয়ে ক্ষিতিমোহন তাঁর পরম্পরা অন্বেষণের স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে এ কথা বলেছেন যে এই ভাবনার বীজ বেদের মধ্যেই সুপ্ত ছিল, ঔপনিষদিক জীবনসাধনায় তার বিকাশ ঘটেছিল। জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মেও বৈদিক দেবতার স্থান নিয়েছিল মানুষ, তার সমান্তরালে আর যে-সব অবৈদিক ধমসাধনায় আধ্যাত্মিক রহস্যের সবটাই মানবদেহকেন্দ্রিক, হিন্দুধর্মে তারাও জায়গা নিয়েছে, বিভেদেব শক্তি হার মেনেছে সমন্বয়ের শক্তির কাছে, সে কথা স্পষ্ট করে তুলতে চেয়েছেন। মধ্যযুগীয় সন্তসাধনা ও বাউলধর্মের যে সংক্ষিপ্ত পরিচয় স্থান পেয়েছে এই গ্রন্থে, ক্ষিতিমোহনের লেখার সঙ্গে যে পাঠকের পরিচয় আছে, তিনি সেখানে তাঁর চেনা কণ্ঠস্বরই শুনতে পাবেন এবং লক্ষ করবেন যে ক্ষিতিমোহন এই-সব সন্ত ও বাউলদের রচিত সেই পদগুলিরই অংশ-ভগ্নাংশ উদ্ধৃত করেছেন, যা অসাম্প্রদায়িক ভাবের কথা বলে, বলে সনাতন পুথিগত ধর্মের অসারতার কথা, আর বলে মনের মানুষের কথা। হিন্দুধর্মের ইতিহাসগত বিববণ দিতে গিয়ে সন্ত-বাউলদের পূর্বসূরি সুফি সাধকদের পরিচয় দেওয়াও অপরিহার্য মনে হয়েছে তাঁর কাছে। ভারতে হিন্দু-মুসলমানের প্রাণঘাতী সাম্প্রদায়িক বিরোধের খবর তো পৃথিবীর লোক জানে, সে কথা মনে রেখে ক্ষিতিমোহন আলোচনা প্রসঙ্গে এদের উভয়ের ধর্ম-সংস্কৃতি-শিল্পের উপর পারস্পরিক প্রভাবের নিদর্শনগুলিই জানানোর তাগিদ বোধ করলেন, যার খবর সাধারণ পাঠক রাখে না। বাউলদের কায়াসাধন-প্রণালির বিস্তৃত আলোচনায় ক্ষিতিমোহনকে সবসময়ই বিরত থাকতে দেখা যায়, এখানেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি, সে কথা বলা বাহুল্য। তবে যথোচিত উল্লেখের অভাব ঘটেনি এবং তন্ত্রের মতোই এ পথে পদস্খলনের মারাত্মক সম্ভাবনা থাকে বলে অনেক সময়ই সমগ্র বাউল আন্দোলনই কুখ্যাতির শিকার হয়ে যায়, এই কথাটুকু শুধু জানিয়ে দেওয়া প্রয়োজন

মনে করেছেন। না-হলে তাঁর আসল উদ্দেশ্য ভারতীয় ধর্মসাধনার লোকায়ত ধারায় বাহ্যাচারমুক্ত এবং দেহমন্দির-অধিষ্ঠিত অন্তরাত্মার সত্যস্বরূপ উপলব্ধির যে বহুযুগবাহিত ঐতিহ্য এই ধর্মের অমূল্য সম্পদ, তার পরিচয় সবার কাছে প্রকাশ করা। এর পরে Present Trends নামে একটি শেষ অধ্যায় আছে। গত দু-শো বছরে হিন্দুধর্মের উপর যে পাশ্চাত্য প্রভাব পড়েছে এবং আধুনিক যুগে পদার্পণের স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারে যে পরিবর্তন ঘটেছে এ দেশের সমাজজীবনে, তার প্রেক্ষিতে হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবন ঘটেছে। তার বিভিন্ন ধারার পরিচয় দিলেন ক্ষিতিমোহন।

গ্রন্থের তৃতীয় বা শেষ ভাগে ঋগ্‌বেদ অথর্ববেদ উপনিষদ ও ভগবদ্‌গীতার নির্বাচিত কিছু অংশের অনুবাদ স্থান পেল।